আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ

সম্পাদিত।

তৃতীয় খণ্ড।

১২৮৩ সাল।

কলিকাতা।

১১ নং পটুয়াটোলা লেন, নূতন ভারতযন্ত্রে,

শ্রীহরিনাথ খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩॥০ টাকা।

ডাকমাশুল সমেত ৪৲ টাকা।

সূচিপত্র।

আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র ও জ্যোতিষ ... ১
আধুনিক ভারত ... ৪৩৩
আর্য্যজাতির ব্যবহার-বিজ্ঞান ৪৯০, ৫৪৪
কপালকুণ্ডলা ৬৮, ৯৭, ১৫৩ ২০৭
কার্য্যের সোপান ... ২৫৭
গ্রীক এবং হিন্দু ... ৪৫১, ৪৯৫
জাতীয় চরিত্র ... ১৪
চিকিৎসা-কল্পদ্রুম ... ২৩২
তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত ১৪৫
তড়িতের ইতিবৃত্ত ... ৫০৬
দিল্লী ... ২৭৫
দুখ-সঙ্গিনী ... ৪৮১
প্রণয় ও শ্রীকৃষ্ণ .. ১১১, ২৪১
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৪৫, ৯৫, ১৯১, ২৪০, ২৮৪, ৩৩২, ৪৭৮, ৫২২, ৫৭৩
পরিত্যক্তা রমণীর প্রতি .. ২৩৭
পাণিনি ... ৩২১, ৩৬৪, ৪১৬
পরলোক ও সমাজ ৩৩৭, ৩৯৭, ৪৭২
পৌরাণিকী গাথা ... ৫৩৯
ফুলবালা ... ৫৩৫
বাঙ্গালী গরিব কেন ... ৫২৯
বেদ পুরাণ ও তন্ত্র ... ৫৫৬
ব্যবহার-বিজ্ঞান ... ২৫১
বৃক্ষচ্যুত লতা .. ৩০৪
বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি .. ৩১৯, ৪১১
বিবিধ সমালোচন ... ৩৪৮, ৫৫৭
ভারতের ভাবী পরিণাম ১৭৪
ভারতীয় ইতিহাস ... ৩৭
মহাপুরুষের নাম ... ১৯৩
মেহেব আলি ২৬, ১১৬. ১৮৪. ১৯৮, ৩১৪, ৩৫৫, ৪২৪, ৪৪৪
ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী ৭৮, ১৩১ ২৬৬, ৫৬২
মনুষ্য-বংশ ... ২৮৯
যুনানী নাট্যপ্রণালী ৪২০, ৫৯৯
শরীর ও মন ... ৪৯
শারদীয় জলদখণ্ড ... ২৮২
শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি ২১৬
সজল প্রতিমা ... ৯৩
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ৫৮, ১০৫, ১৫১, ২২২
সন্ধ্যা ... ১৭২
স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ ৩০৬
সাময়িদ্ জাতি ... ৩৮৫
সম্বন্ধ-নির্ণয় ... ৪১৭

৯

আর্য্যদর্শন।

৭

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

তৃতীয় খণ্ড। বৈশাখ ১২৮৩ সাল। ১ম সংখ্যা।

আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র ও জ্যোতিষ।

জ্যোতিষ অতি প্রাচীন বিজ্ঞান। যখন পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাব অধিক দিন হয় নাই, যখন গ্রীক্ ও রোমীয় সভ্যতার অঙ্কুর ও উঠে নাই, অধিক কি, যখন মানব—বিজ্ঞান কাহাকে বলে জানিত না সেই প্রাচীন কালে ইহার জন্ম। মানব সহজ কবি। যে সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে সেই কবি। সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে না এমন মনুষ্যই নাই। চান্দ্রমসী নিশিতে মন্দাকিনী-শোভিত, নক্ষত্রমালা-বিভূষিত নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়না এমন মনুষ্যই নাই। এই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যেদিন মানব মনে

Twinkle, twinkle little star,

How I wonder what you are,

এই ভাব উত্থিত হইয়াছিল সেই দিন হইতেই জ্যোতিষের সূত্রপাত। এই সৌন্দর্য্য সকল কালেই বিস্ময় ও জ্ঞান-পিপাসা উত্তেজিত করিয়াছে। মিশর, আরব, পারস্য, সিরিয়া, ক্যাল্‌ডিয়া প্রভৃতি দেশ সকল মানব-জাতির শৈশব-দোলা। এই সকল দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও তদানীন্তন আচার ব্যবহার তত্রত্য অধিবাসীদিগকে এই জ্ঞান-পিপাসু হইতে বাধ্য করিয়াছিল। তাহারা বিষদ নীলিম আকাশে প্রতিভাত নক্ষত্রাবলির যে ঔজ্বল্য দেখিত, অপেক্ষাকৃত উত্তরে সে ঔজ্বল্য—সে সৌন্দর্য্য অজ্ঞাত ছিল। অপরন্তু মৃগয়া ও পশু-পালন যাহাদের জীবনোপায় ছিল—রৌদ্রে, বৃষ্টিতে তরুতল যাহাদের আশ্রয় ছিল, তৃণাচ্ছাদিত অনাবৃত ভূমি যাহাদের শয্যার কার্য্য করিত—সুতরাং এই উজ্বল নভোমণ্ডল সর্ব্বদা যাহাদের চক্ষুর উপর থাকিত তাহারা কি উহার বিষয় না ভাবিয়া; তাহারা কি উহার পরিবর্ত্তন সকল পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া থাকিতে

* Being the substance of a lecture delivered by Very Revd. Father Lafont at the last meeting of the Bethune Society.

পারিত ? ফলতঃ এই সকল অবস্থায় এই সকল রাখাল-দার্শনিক দিগের দ্বারা—যে জ্যোতিষ এক্ষণে এত উন্নতি-পথে ধাবিত—সেই জ্যোতিষের সূত্র পাতিত হয়। যদিও তাহাদের নিকট হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কাল্পনিক ভাব সকল ভিন্ন আর কিছুই পাই না এবং ইহা অপেক্ষা অধিক আশাও করিনা তাহারা বহু পরিশ্রমে, বহুদর্শনে যে সকল ঘটনা, যে সকল প্রত্যক্ষ সঞ্চয় করিয়াছিল ভবিষ্যৎ জ্যোতির্বিদ্ গণ সেসকলের সাহায্যে যথেষ্ট উপকৃত হন। কিরূপে তদানীন্তন তারাতত্ব (Astrology) হইতে অধুনাতন জ্যোতিষের আবির্ভাব হইল কিরূপে নক্ষত্রগণ দেবত্ব ও অদৃষ্টের বিধাতৃত্ব হইতে জড়ত্বে উপনীত হইল তাহা এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু যে বিজ্ঞান এত অধিক কাল অনুশীলিত হইয়াছে তাহা সময়ের উপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছে কিনা তাহাই দেখা যাউক।

অন্যান্য আধুনিক বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সহিত তুলনায় উহা যে নিতান্ত মন্দ-গতি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি-সম্বন্ধে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছিল তাহাকেবল পর্য্যবেক্ষণ ও অঙ্ক শাস্ত্রের বলে এবং কেবল দূরত্ব, আকৃতিও গতি সম্বন্ধে। প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি অল্পই ছিল এবং তাহাও আবার অস্পষ্ট এবং অধিকাংশ কল্পনা প্রসূত। এ পর্য্যন্ত দূরবীক্ষণই এবিষয়ে আমাদের প্রধান সহায় ছিল। দূরবীক্ষণ দ্বারাই চন্দ্রের কলঙ্কে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক-ভ্রম অপনীত হইয়াছিল। এবং ইহার দ্বারাই চন্দ্রে পাহাড় পর্ব্বতের সত্বার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু দূরবীক্ষণের ক্ষমতা অতি সঙ্কীর্ণ। ইহাদ্বারা আমরা কোন কালেই এক নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ সীমার অতিরিক্ত যাইতে পারিতাম না। দূরবীক্ষণ দূরবর্ত্তী সুতরাং ক্ষুদ্র-প্রতীয়মান বস্তু সকলকে নিকটবর্ত্তী ও বৃহদায়তন করিয়া দেখায়। অসহায় চক্ষুতে অর্দ্ধহস্তপরিমিত চন্দ্রে আমরা যাহা দেখিতে সক্ষম হই দূরবীক্ষণ-সাহায্যে শতগুণ আয়তি-প্রাপ্ত অথচ সমীপাগত চন্দ্রে তাহা অপেক্ষা শতগুণ দেখিতে পারি। এবং দূরবীক্ষণ যে পরিমাণে বৃহদায়তন করে আমরাও সেই পরিমাণে অধিক দেখি। কিন্তু দূরবীক্ষণ যথেচ্ছ আয়তির বৃদ্ধি করিতে পারেনা অর্থাৎ করিলে আমরা দেখিতে পাই না। দূরবীক্ষণের সে ক্ষমতা থাকিলে গ্রহনক্ষত্রাদির প্রকৃতি-জ্ঞানে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইত না। যে পরিমাণে আয়তির বৃদ্ধি হয় সেই পরিমাণে আলোকের হ্রাস হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আলোকের হ্রাস আমাদের দৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা করেনা অর্থাৎ যতক্ষণ দূরবীক্ষণ-দৃষ্ট বৃহদায়তি প্রাপ্ত বস্তুর প্রতিকৃতিতে এত আলোক থাকে যে আমরা তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইচ্ছামত আয়তির বৃদ্ধি করা যায়। তাহার অধিক করিতে গেলেই প্রতিকৃতি অস্পষ্ট ও ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং এইখানেই

দূরবীক্ষণের ক্ষমতার সীমা। এই সীমা অতিক্রম করা অসাধ্য। সুতরাং স্বতন্ত্র উপায়, স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন ভিন্ন জ্যোতিষের উপায় নাই এত কালের পর সেই স্বতন্ত্র এবং উন্নতি-অভিমুখ যথার্থ পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং এই পথই বাস্তবিক যুক্তি-সঙ্গত। মনে কর চীন-দেশের বিষয় আমরা কিছুই জানি না সেখানে কখন যাই নাই এবং সেখানে কখন যাইতে পারিব না ; কিন্তু সেই দেশ হইতে কোন দূত আমাদের দেশে আসিয়াছে এরূপ স্থলে চীনের বিষয় কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে যে সেই লোকের নিকট যাইতে হয়—ইহা সামান্য বুদ্ধিতেও উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা যদি চীন ভাষায় অজ্ঞ হই আমরা তাহার নিকট কিছুই জানিতে পারি না। সহস্র সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী নক্ষত্রমণ্ডলীতে কেহ কখন যায় নাই এবং যাইবেও না কিন্তু প্রত্যেক নক্ষত্র প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক সূর্য্য হইতে এক একটী দূত আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। সেই দূত উহাদের কিরণ। সকল দূতেরই ভাষা একরূপ। জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আপনাদের ভাষায় আপন আপন দেশের অনেক কথা কহিতে পারে। যদি আমরা তাহাদিগকে তাহাদের দেশের গল্প করাইতে পারি তাহা হইলে অনেক জানিতে পারি। কিন্তু এতদিন আমরা তাহাদের ভাষা জানিতাম না সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই এবং সেই-জন্য তাহাদের নিকট কিছুই জানিতে পারি নাই। তাহাদের ভাষার মধ্যে এক কথা কেবল বুঝিতাম তাহার অর্থ তাহাদের দেশ আছে এবং তাহারা না বলিলে ইহাও জানিতাম না। এক্ষণে আমরা সেই ভাষা শিখিয়াছি এখন হইতে আমরা তাহাদিগকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিব এবং তাহারাও আপন আপন দেশের কত গল্প বলিবে !

এইরূপে আমরা তাহাদিগকে যত গল্প বলাইতে পারিব ততই শিখিতে পারিব। এই ভাষা কাণে শুনা যায় না চক্ষে দেখিতে হয়। তুমি চন্দ্র-রশ্মিকে জিজ্ঞাসা কর "হে দূত ! তোমাদের দেশে জল আছে কি ?" দূত মুখে কোন উত্তর দিবে না লিখিয়া উত্তর দিবে। আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র (Spectroscope) ইহার লিখিবার কাগজ। এই কাগজে উত্তর লিখিত হইবে। তুমি যদি ভাষা শিখিয়া থাক, এই কাগজ দেখিলেই উত্তর বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে এই ভাষা কি ? ইহা হইতে আমরা কি শিখিয়াছি ? আর কত শিখিতে পারিব ? এই সকল বিষয় দেখা যাউক। ইহাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

পাঠক ! অর্দ্ধঘোষবৃত্ত, অর্দ্ধ-মুক্ত আকাশে রামধনুকের শোভা দেখিয়াছ এবং বেলওয়ারি কাচের ভিতর দিয়াও অবিকল সেইরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখিয়াছ। এই সকল বর্ণ কোথা হইতে আইসে ?—সূর্য্য-কিরণ হইতে। সূর্য্য-কিরণ শুভ্র

ইহা হইতে বর্ণ বৈচিত্র্য উদ্ভূত হওয়া আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু, যেমন কতক গুলি রূঢ়-পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে সম্পূর্ণ বিসদৃশ এক যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কতক গুলি রূঢ় বর্ণের সংযোগে বর্ণের শুভ্রত্ব উৎপাদিত হয়। শুভ্র সূর্য্য-কিরণের উপাদান ও এইরূপ কতক গুলি রূঢ় বর্ণ। সহজ অবস্থায় সেই রূঢ় বর্ণ গুলি সংশ্লিষ্ট থাকে। বেল্ওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া যাইবার সময় সেই শুভ্র কিরণসকল ময়ূর পুচ্ছের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া তাহাদের উপাদানীভূত রূঢ়-বর্ণ সকলে বিশ্লিষ্ট হয়।



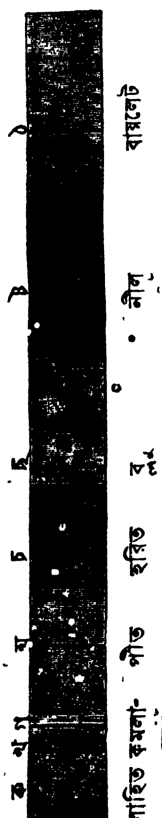
মনপ কোন অন্ধকার গৃহ। একটী সঙ্কীর্ণ ছিদ্রের ভিতর দিয়া সরু এক-তুলিকা (Pencil) সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করিয়াছে।

যদি কোন প্রতিবন্ধক না দেওয়া যায় ইহা সোজা চলিয়া যাইবে এবং ইহার পতন-স্থান নয় সূর্য্যের এক প্রতিমূর্ত্তি পড়িবে। কিন্তু যদি একটী ত্রিমুখ বেল্-ওয়ারি কাচ(triangular prism)চ ইহার গতির পথে ব্যবহিত হয় সে কিরণ-তুলিকা আর সে পথে না যাইয়া ভূমির দিকে অবক্ষিপ্ত (deflected) ও বিকীর্ণ (dispersed) হইবে এবং দূরস্থ এক পরদায় (screen) ঈষদায়ত লম্ব-দণ্ডে পরিণত হইবে। এই লম্ব-দণ্ড রামধনুকের সমস্ত বর্ণে রঞ্জিত। চিত্রে বা হইতে লো পর্য্যন্ত ভাগই সেই দীর্ঘীকৃত দণ্ড। ইহাকে সৌর আলোক-চিত্র (Solar Spectrum) বলে ইহাতে উপর হইতে ক্রমান্বয়ে বায়লেট্, নীল, ব, হরিত, পীত, কমলা লেবুরবর্ণ ও লোহিত এই সকল বর্ণ থাকে। চিত্রে আদি অক্ষরের দ্বারা সেই সকল বর্ণের স্থান চিহ্নিত আছে। প্রত্যেক বর্ণের নির্দ্দিষ্ট অবক্ষেপণীয়তা (Refrangibility) আছে অর্থাৎ সকল বর্ণ ভূমির দিকে

* সকল দীপ্তমান্ বস্তু হইতেই আলোক সরল রেখায় বিকীরিত হয়। প্রত্যেক রেখাকে রশ্মি বা কিরণ ও কতক গুলি রশ্মির সমবায়কে এক তুলিকা বলা যায়। এই নাম-করণ কেবল সাদৃশ্য হইতে। নতুবা আর কোন কারণ নাই।

সমভাবে অবক্ষিপ্ত হয় না। বায়লেট্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকও লোহিত সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অবক্ষেপণীয়। চিত্রেও দেখ বায়লেট্ ভূমির দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবক্ষিপ্ত সুতরাং সর্ব্বোপরি; এবং লোহিত সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অবক্ষিপ্ত—সুতরাং সর্ব্ব নিম্নে। অন্যান্য বর্ণ আপন আপন অবক্ষেপণীয়তা অনুসারে ইহাদের মধ্যে অবস্থিত। যে কয়েকটী বর্ণ লিখিত হইয়াছে এই কয়েকটী ভিন্ন যে আর বর্ণ ইহাতে নাই তাহা নহে। বর্ণ অসংখ্য, কিন্তু লিখিত-বর্ণ হইতে সে সকলের প্রভেদ এত অল্প যে আমাদের চক্ষুতে অনুমিত হয় না। অপরন্তু ইহাও দেখা যায় যে বর্ণ সকল নিরবচ্ছিন্ন নয়। তাহাদের মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে কোন বর্ণই নাই। এবং বর্ণের অসদ্ভাবে সেই সকল স্থান কাল দেখায়। এবং তজ্জন্য বর্ণের মধ্যে মধ্যে কাল রেখা দেখা যায় (২য় চিত্র দেখ)

আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে সৌর আলোক-চিত্র যেরূপ দেখায় ২য় চিত্রে তাহা দেখান গেল। ইহা ১ম চিত্রের বা হইতে লো ভাগ ভিন্ন আর কিছুই না। কেবল বৃহদায়তি প্রাপ্ত। সুতরাং ১ম চিত্রের সঙ্গেই ইহার বিষয় সমস্ত বলা হইয়াছে। ইহাতে ক খ গ ঘ প্রভৃতি কাল রেখা গুলি অতি বিষদ। এবং ইহাদের অবস্থানও সহজে নির্ণেয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঐ সকল স্থানে বর্ণের অসদ্ভাব প্রযুক্ত ঐ কাল রেখা গুলির উৎপত্তি। ১ম চিত্রে ঐ রেখা গুলি দেখান সম্ভব নয় বলিয়া দেওয়া যায় নাই। আমরা ক্ষণ পূর্ব্বে স্বর্গীয় দূতদিগের যে ভাষার কথা বলিয়াছি এই রেখা গুলি সেই ভাষার বর্ণমালা।



পাঠক! এক্ষণে আলোক-চিত্রের (Spectrum) ভাব মনে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছ। এখন ইহার অন্য অন্য বিষয় বলা যাউক। আলোক-চিত্র তিন প্রকার। ১ম, নিরবচ্ছিন্ন (Continuous)—কেবল প্রজ্বলিত ঘন বা তরল পদার্থের আলোক হইতে উদ্ভূত। ২য়, অবচ্ছিন্ন বা রৈখিক (Discontinuous or line spectrum)—কেবল প্রজ্বলিত বাষ্প-প্রদত্ত। ৩য়, শোষণ—(Absorptin) সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির আলোক-প্রদত্ত।

তড়িতাগ্নিতে প্রজ্বলিত অঙ্গারের আলোক হইতে এমন আলোক-চিত্র পাওয়া যাইতে পারে যাহাতে বায়লেট হইতে লোহিত পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বর্ণের ক্রম থাকে, কোন স্থলেই বর্ণের অভাব থাকে না। ইহাই নিরবচ্ছিন্ন আলোক-চিত্রের উদাহরণ। বাষ্পীয় পদার্থ প্রজ্বলিত অবস্থায় এক স্বতন্ত্র

প্রকারের আলোক-চিত্র প্রদান করে। ইহাতে কতক গুলি রঞ্জিল রেখা বা রেখা সমষ্টি এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখা যায়। অর্থাৎ সৌর আলোক-চিত্রে (২য় চিত্র দেখ) যেমন বর্ণ-বিশিষ্ট জমির উপর কাল রেখা আছে ইহাতে সেই রূপ কাল জমির উপর বর্ণ বিশিষ্ট রেখা সকল থাকে। ইহাকে অবচ্ছিন্ন বা রৈখিক আলোক-চিত্র বলে। তৃতীয় প্রকারের অর্থাৎ শোষণ আলোক চিত্রের উদাহরণ ২য় চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন আলোক-চিত্র সহজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ অবচ্ছিন্ন আলোক-চিত্র সহজেই পাওয়া যায়। কোন বাষ্পীয় পদার্থ প্রজ্বলিত করিলেই তাহা হইতে ইহা উদ্ভূত হয়। যদি কোন ধাতু এত অধিক উত্তপ্ত হয় যে তাহা বাষ্পীভূত হইতে থাকে তাহা হইলে উহা হইতে দ্বিতীয় প্রকারের অতি সুন্দর আলোক-চিত্র উৎপন্ন হয়। ইহাতে রেখা গুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও বিষদ হয়। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যেক বাষ্পেরই রেখা-প্রণালী স্বতন্ত্র। কোন দুইটীরই একরূপ নয়। থেলিয়ম ও রৌপ্য উভয় হইতেই সম্পূর্ণ একরূপ হরিত আলোক উৎপন্ন হয়। একের আলোক দেখিলে অপরের আলোক বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু যন্ত্র দ্বারা উভয়ের আলোক-চিত্র দেখিলেই সে ভ্রম অপনীত হয়। প্রথমটীর আলোক-চিত্রে একটী ও দ্বিতীয়টীতে দুইটী হরিত রেখা বা দণ্ড দেখা যায়। এই রেখা গুলির অবস্থান সৌর আলোক-চিত্রের ক খ গ (২য় চিত্র দেখ) ইত্যাদি রেখার অবস্থানেরসহিত তুলনায় নির্ণীত হয়। থেলিয়ম বাষ্প-প্রদত্ত হরিত রেখাটী চ রেখার স্থান অধিকার করে। সোডিয়ম-বাষ্প ঘ রেখার স্থানে একটী পীত রেখা প্রদান করে। এইরূপে অবস্থান ভেদেও সংখ্যাভেদে সকল বাষ্পেরই রেখা প্রণালী স্বতন্ত্র। আবার যদি দুই কি ততোধিক ধাতু একত্র মিশ্রিত থাকে সেই মিশ্র ধাতুর আলোকচিত্রে তাহার উপাদানীভূত সকল ধাতুগুলিরই রেখাপ্রণালী দৃষ্ট হইবে। একবস্তুর রেখা প্রণালীর অবস্থান ও প্রকৃতির কখন ব্যত্যয় হয় না। সুতরাং একজন বিচক্ষণ দর্শক আলোক চিত্রের রেখা গুলি দেখিয়া—অনুমানে নয় সাক্ষাৎ প্রমাণে—উহা কোন্ বাষ্প বা ধাতু হইতে উদ্ভূত তাহা বলিয়া দিতে পারেন। সেই বাষ্প বা ধাতু যেন আলোক-চিত্র হইতে তাঁহার চক্ষুকে ডাকিয়া বলে "এই দেখ আমি এখানে রহিয়াছি।" দ্বিতীয় প্রকার আলোক-চিত্রের এই ক্ষমতা পার্থিব রসায়নের অনেক উপকার করিয়াছে। ইহা হইতে অনেক নূতন ধাতুর সত্ত্বা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং এতদ্ভিন্ন কোন অজ্ঞাত পদার্থের রাসায়নিক উপাদান নিরাকারণে কখন কখন ইহাই একমাত্র সহায়। অজ্ঞাত পদার্থ যখন এত অল্প পরিমাণ হয় যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভবে

না তখন ইহার সাহায্য ভিন্ন উপায় নাই।

সৌর বা নাক্ষত্রিক রসায়নের উন্নতি অথবা উৎপত্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার আলোক-চিত্রের সংযোজনে। যদি সৌর আলোক-চিত্রে পার্থিব ধাতুসকলের রেখা-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলা যাইতে পারিত যে সেই ধাতু সকল সূর্য্যের উপাদান। কিন্তু আমরা তাহা দেখিনা। আমরা সৌর আলোক-চিত্রে উজ্জ্বল রেখার পরিবর্ত্তে কাল রেখা দেখিয়া থাকি। এই কাল রেখা গুলি প্রথম উলাষ্টন (Wolaston) দেখিতে পান। কিন্তু পরে ফ্রনহফার (Frauhhofer) তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন বলিয়া এই রেখাগুলি তাঁহারই নামে অর্থাৎ ফ্রনহফারের রেখা বলিয়া আখ্যাত। এই কাল রেখা গুলির কারণ নির্ণয়ে অনেক প্রতিভা শালী ব্যক্তির মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইয়াছিল। ফলতঃ ধাতু সকল যে উজ্জ্বল রেখা প্রদান করে তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত কাল রেখা গুলির সম্বন্ধ বহু দিন অজ্ঞাত ছিল। অবশেষে কারকফের (Kirchhoff) সূক্ষ্ম দৃষ্টি হইতে এই সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। তিনি চূর্ণালোকের (Lime-light) এক চিত্র Spectrum প্রস্তুত করিয়া যখন দেখিলেন যে ঘ চিহ্নিত স্থানে কাল রেখার লেশও নাই তখন সেই আলোক যে পথ দিয়া আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রের ছিদ্রে প্রবেশ করিতেছে সেই পথে সোডিয়ম-সম্ভূত আলোক স্থাপন করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ কাল ঘ রেখার আবির্ভাব হইল। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই সোডিয়মই আলোক-চিত্রে উজ্জ্বল ঘ রেখা প্রদান করে। কারকফ শুদ্ধ সোডিয়মের পরীক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি অন্যান্য বস্তুর ও এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে যে আলোক নিরবচ্ছিন্ন আলোক-চিত্র প্রদান করে সেই আলোক কোন বাষ্প বা ধাতব বাষ্পের মধ্য দিয়া গমন করে তখন তাহার আলোক-চিত্রে এই বাষ্প নিজে যে কয়টী উজ্জ্বল রেখা প্রদান করে ঠিক সেই কয়টী কাল রেখা থাকে। অর্থাৎ সোডিয়ম যদি ঘ উজ্জ্বল রেখা প্রদান করে আর যদি সোডিয়ম ব্যবধান রাখা যায় অঙ্গারের নিরবচ্ছিন্ন আলোক-চিত্রে সেই ঘ রেখা কাল হইবে। ইহার কারণ কি? কারকফ এই কারণ স্থির করিয়া নক্ষত্র সূর্য্যাদির রাসায়নিক বিশ্লেষণ আমাদের করায়ত্ত করিয়াছেন।

শব্দ ও আলোকের সাদৃশ্য।

পূর্ব্বোক্ত কারণ বুঝিতে হইলে শব্দ ও আলোকের সাদৃশ্য ভাব অতি বিষদরূপে মনেঅঙ্কিত করা আবশ্যক। মনে কর গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া আছ, অদূরে এক বাষ্পীয় পোত যাইতেছে, বাষ্পীয় পোত হইতে ক্রমে তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়া তোমার দিকে আসিতেছে। তরঙ্গের অর্থ আর কিছুই না—বেগ সঞ্চালন। বাষ্পীয় পোতের চাকার বেগ এক স্থানে প্রহিত হইয়া চতুর্দ্দিকে

সঞ্চালিত হইল। যখন তোমার নিকট সেই তরঙ্গ উপস্থিত হইল তখন তুমি তরঙ্গের অভিঘাত অনুভব করিতে লাগিলে। এবং ইহাও অনুভব করিলে যে ঐ আঘাত সবিরাম (intermittent)। থাকিয়া থাকিয়া তোমার শরীরে আঘাত লাগিতেছে। জলের এই রূপ তরঙ্গের ন্যায় বায়ুসাগরেও তরঙ্গ বিস্তৃত হয়। জল-তরঙ্গ সমস্ত শরীর অনুভব করিতে পারে অর্থাৎ পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যেখানেই তরঙ্গের আঘাত লাগুক অনুভূত হইবে। বায়ু-তরঙ্গ শরীরের এক মাত্র স্থান অনুভব করিতে পারে সে স্থান কর্ণ-পটহ। মনে কর সেতারের একটী তার ধ্বনিত হইয়াছে। তার একবার অগ্রে যাইতেছে, আবার পশ্চাতে আসিতেছে। তারের অগ্র পশ্চাৎ গমনে বায়ুতে স্পন্দ উঠিল। বায়ু তারের কম্পন গ্রহণ করিল অর্থাৎ বায়ু ও তারের সঙ্গে সঙ্গে একবার অগ্রে যাইতে লাগিল আবার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। সেই বায়ু-তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়া ক্রমে কর্ণ-পটহে আসিল কর্ণ-পটহ থাকিয়া থাকিয়া অভিহত হইতে লাগিল। সেই অভিঘাত শ্রুতিশিরা দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইল এবং শব্দ-শ্রবণের সংজ্ঞা হইল। আবার সে তারটী ছাড়িয়া তদপেক্ষা ছোট একটী তার ধ্বনিত হউক, ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় তরঙ্গ উঠিবে ও বিস্তৃত হইবে এবং কর্ণ পটহ ও থাকিয়া থাকিয়া অভিহত হইবে। কিন্তু এ তারের স্বর ত পূর্ব্ব তারের স্বরের মত নয়। এ যেন আর একস্বর। একই রূপে একই বস্তুতে উভয়ের উৎপত্তি, তবে উভয়ের প্রভেদ কিসে?—একটী বিষয়ে। ছোট তারের কম্পন বড় অপেক্ষা দ্রুত সুতরাং তরঙ্গের গতি ও দ্রুততর সুতরাং এক সময়ে বড় অপেক্ষা ছোট তার হইতে কর্ণ-পটহে অধিক তরঙ্গের আঘাত লাগে। এবং এই অধিক তরঙ্গাঘাত হইতেই স্বর-বৈষম্য। প্রত্যেক স্বরের নির্দ্দিষ্ট আঘাত আছে অর্থাৎ কর্ণ-পটহ এক সেকেণ্ডে সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বার অভিহত হইলে সেই নির্দ্দিষ্ট স্বরের অনুভূতি হয়। সুতরাং মূল হইতে ধরিলে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কম্পন এক নির্দ্দিষ্ট স্বর উৎপাদন করে।

ইথর নামে এক প্রকার অতীন্দ্রিয় অতোলনীয় সূক্ষ্মতম পদার্থ সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপিয়া আছে। ইহা এত সূক্ষ্ম যে সকল বস্তুর ভিতরে ভিতরে অণু সকলের মধ্যে মধ্যে ইহার স্থিতি। ফলতঃ জগতের সমস্ত বস্তু সমস্ত পরমাণু ইথর-সমুদ্রে মগ্ন। যেমন কোন কম্পন শীল (Vibrating body) বস্তু হইতে বায়ুতে তরঙ্গ উঠে সেইরূপ কোন উত্তপ্ত বা প্রজ্বলিত বস্তু হইতে এই ইথর সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে। বায়ু তরঙ্গের আঘাত যেমন শুদ্ধ কর্ণ পটহে অনুভূত হয়। এই ইথর তরঙ্গের আঘাত কেবল চক্ষু-আনায় (Retina) অনুভব করিতে পারে। বস্তু উত্তপ্ত বা প্রজ্বলিত হইলে তাহার অণু সকল কম্পিত হইতে থাকে এই অণুস

লম্কম্পিত হইতে থাকে। এই অণু সকলের কম্পনে ইথর-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে অর্থাৎ ইথরের অণু সকল ঐ কম্পন গ্রহণ করে, ক্রমে তরঙ্গ বিস্তৃত হয় এবং বিস্তৃত হইয়া যখন চক্ষুর নিকট আসে তখন ঐ তরঙ্গের সবিরাম (intermittent) আঘাত উহাতে লাগে অর্থাৎ চক্ষু-আনায় থাকিয়া থাকিয়া ইথর তরঙ্গ কর্ত্তৃক অভিহত হয়। শব্দের পক্ষে স্বর ও আলোকের পক্ষে বর্ণ একই রূপ। কর্ণপটহ এক সেকেণ্ডে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বার অভিহত হইলে যেমন নির্দ্দিষ্ট স্বরের অনুভূতি হয়, চক্ষু-আনায় সেইরূপ এক সেকেণ্ডে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বার ইথর তরঙ্গের অভিঘাত প্রাপ্ত হইলে নির্দ্দিষ্ট বর্ণের অনুভূতি হয়। বায়লেট্ বর্ণে এই সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও লোহিতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এবং অন্যান্য বর্ণ ইহাদের মধ্যবর্ত্তী সংখ্যক আঘাতের ফল। সুতরাং মূল হইতে ধরিলে বলিতে হইবে স্বরের ন্যায় বর্ণ সকল বস্তুগত অণু সকলের কম্পন-পরিমাণের বৈষম্যে উৎপাদিত হয়।

সোডিয়মের আলোক পীতবর্ণ দেখায়। তাহার কারণ এই, সোডিয়মের অণু সকল এরূপ কম্পন-শীল যে সেরূপ কম্পন ইথরের দ্বারা চালিত হইয়া চক্ষুতে লাগিলে চক্ষু এক সেকেণ্ডে যে সংখ্যক বার অভিহত হয় সে সংখ্যা পীত বর্ণের অনুভাবক। আবার আলোক চিত্রে (Spectrum) দেখিয়াছ, পীত বর্ণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের মধ্য স্থান নিতান্ত অল্প নয়। সুতরাং এই মধ্যবর্ত্তী সকল স্থানের পীতবর্ণই কি একরূপ কম্পন হইতে উদ্ভূত হয়? তাহা নহে। প্রত্যেক স্থানের বিশেষ বিশেষ কম্পন আছে। এবং সোডিয়ম-অণুসকলের কম্পন কেবল উভয় প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী ঘ রেখাস্থ পীতবর্ণ উৎপাদন করিতে পাবে। কম্পনের ন্যূনাধিক্য অনুসারেই বর্ণের অবক্ষেপণীয়তা (Refrangibility) হয়। আবার সকল ধাতুই কিছু সোডিয়মের ন্যায় একটী উজ্জ্বল রেখা প্রদান করে না। কোনটীতে, দুইটী কোনটীতে তিনটী, কোনটীতে বা ততোধিক রেখা প্রদত্ত হয়। এরূপ স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে সেই বস্তুর এক স্থানের অণু সকল এক ভাবে কম্পিত ও অপর স্থানের অণু সকল অপর ভাবে কম্পিত হয়। এবং এই বিভিন্ন কম্পন হইতে বিভিন্ন রেখার স্থানীয় বর্ণ উৎপন্ন হয়।

পাঠক! এক্ষণে বুঝিতে পারিলে আলোক চিত্রে বিভিন্ন বাষ্পের বিভিন্ন রেখা প্রণালী কেন? এক্ষণে সৌর আলোক চিত্রের কাল রেখা গুলি কেন হয় তাহাই বলা যাউক। কোন গৃহে একটী তার অপর একটী সম-স্বর-বদ্ধ তার হইতে যথেষ্ট দূরে আছে; একটী তার ধ্বনিত হউক, ক্ষণ পরে অপরটী ধ্বনিত হইবে। ইহার কারণ এই যে একটী তারের কম্পন বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া অপরটীতে ক্রমাগত লাগিতে

লাগিতে, সম-কম্পন-শীলতা গুণে অপরটীও ঠিক্ সেইরূপে কম্পিত হয়। ঠিক্ এই কারণে যখন কোন সর্ব্ব-বর্ণ-বিশিষ্ট আলোক কোন বাষ্পের ভিতর দিয়া যায় তখন ঐ বাষ্প নিজে যে বর্ণের আলোক প্রদান করিতে পারে ঐ সর্ব্ব-বর্ণ-বিশিষ্ট আলোক হইতে সেই বর্ণ শোষণ করে অর্থাৎ ঐ বাষ্পের অণু সকল যেরূপ ভাবে কম্পিত হইতে সক্ষম, তাহারা ইথর হইতে সেই কম্পন গ্রহণ করে। ইথরের সেই কম্পন ঐ বাষ্পের অণু সকলকে কম্পিত করিতেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং ঐ বাষ্পের ভিতর দিয়া বহির্গত আলোকে ইথরের সেই কম্পনের অভাব হয় এবং তজ্জন্য সেই কম্পেনোদ্ভূত বর্ণের ও অভাব হয়। যদি বল এই কারণে সর্ব্ব-বর্ণ-বিশিষ্ট আলোকে যে বর্ণের অভাব হয় কম্পন-শালী বাষ্প হইতে আলোক উদ্ভূত হইয়া সেই বর্ণের অভাব পূরণ করে না কেন? তাহার কারণ অতি সহজ। যে কারণে অতি তেজোবিশিষ্ট আলোকের নিকট হীন-তেজ আলোক নিষ্প্রভ হয়, যে কারণে দিবসে প্রদীপের আলোক অনুভূত হয় না, ইহাও সেই কারণে হইয়া থাকে। চূর্ণালোক সোডিয়ম-বাষ্পের ভিতর দিয়া গেলে আলোক-চিত্রে সোডিয়ম-বাষ্প যে উজ্জ্বল ঘ রেখা প্রদান করে, সেই ঘ রেখা কাল দেখায়। অর্থাৎ সোডিয়ম-বাষ্প ঘ স্থানীয় বর্ণের উৎপাদক ইথরের কম্পন শোষণ করে। সেই শোষণে যে সোডিয়ম-বাষ্পের অণু-সকল কম্পিত হইতে থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং তুমি বলিতে পার অণু সকলের কম্পনে সোডিয়ম হইতে যে আলোক বিকীর্ণ হয়, সে আলোকের ঘ রেখা উজ্জ্বল করা যুক্তি-সঙ্গত এবং বাস্তবিকও করিয়া থাকে। কিন্তু চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইবাতে সোডিয়ম আলোকের যে হ্রাস হয়, চতুঃপার্শ্বস্থ চূর্ণালোকের ঔজ্জ্বল্যে সে হ্রাস-প্রাপ্ত আলোক অনুভূত হয় না; এবং সেই জন্য ঘ রেখা সোডিয়ম-আলোকে যে ঈষৎ ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়, পার্শ্বস্থ বর্ণ সকলের ঔজ্জ্বল্যে তাহা অনুভূত হয় না।

সে যাহাহউক এক্ষণে এই সকল যুক্তি হইতে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে সূর্য্য বাষ্পাবৃত কোন প্রজ্বলিত ঘন বা তরল (সম্ভবতঃ তরলই) পদার্থ। উক্ত ঘন বা তরল পদার্থ হইতে বিকীরিত আলোক বাষ্পাবরণের ভিতর দিয়া আসাতে সূর্য্য-কিরণে নিরবচ্ছিন্ন আলোক চিত্র উৎপন্ন না হইয়া ঐ বাষ্পের কিরণ-শোষণে শোষণ-আলোক-চিত্র দেখিয়া থাকি। এই শোষণ আলোক-চিত্রের কাল রেখা গুলি দেখিয়া আমরা সূর্য্যের বাষ্প-গোলকে (Atmosphere) আমাদের পৃথিবীর কোন্ কোন্ ধাতু বা কোন্ কোন্ বাষ্প আছে, তাহা জানিতে পারি। এই কাল রেখা-গুলির সহিত ধাতুর যে বাষ্পের উজ্জ্বল রেখা প্রণালীর অবস্থান ও সংখ্যা মিলিবে, সেই বাষ্প বা সেই ধাতু সূর্য্যের বাষ্প-

গোলকে আছে। সূর্য্যের আলোক-চিত্রে ঘ রেখা আছে কিন্তু সোডিয়ম উজ্জ্বল ঘ রেখা প্রদান করে, সুতরাং সূর্য্যকিরণ সোডিয়ম-বাষ্পের ভিতর দিয়া না আসিলে কাল ঘ রেখা হওয়া অসম্ভব। সুতরাং সূর্য্য-কিরণ যে সোডিয়মের ভিতর দিয়া আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সোডিয়ম-বাষ্প কিছু ভূবায়ুতে নাই, কারণ আমরা ভূবায়ুর উপাদান সকল জানি। সুতরাং নিশ্চয়ই এই সোডিয়ম সূর্য্যের বাষ্প-গোলকে আছে। এইরূপে সূর্য্যে অধিকাংশ পার্থিব ধাতুরই সত্ত্বার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা পৃথিবী যে সূর্য্যের বিচ্যুত অংশ এই অনুমান অত্যন্ত দৃঢ় হইতেছে।

পাঠক! স্বর্গীয় দূতদিগের যে ভাষার কথা বলিয়াছিলাম তাহা জানিলে। আলোক চিত্রের ক খ গ ঘ রেখা গুলি সেই ভাষার বর্ণমালা তাহাও জানিয়াছ। দূতেরা এই বর্ণমালায় লিখিয়া আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহাও দেখান হইয়াছে। সৌর আলোক-চিত্রে লিখিত সৌর দূতের অনেক গল্প আমরা শুনিয়াছি এবং এখনও কত গল্প শুনিব। সে দূত সূর্য্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহাও বলিয়াছি। নক্ষত্রগণের দূতেরা উহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধেও একই কথা বলিয়াছে। সুতরাং সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের প্রকৃতি একই অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত তরল পদার্থ ইহাদের শরীর এবং বাষ্প-গোলক ইহাদের আবরণ।

নভোমণ্ডলের যে দৃশ্যকে কবির কল্পনা মন্দাকিনী অথবা স্বর্গগঙ্গা আখ্যা দিয়াছিল এবং ইংরাজীতে যাহাকে (Milky way) "দুগ্ধ পথ" বলে, এক্ষণে সে স্বর্গগঙ্গায় আর দেবতারা অবগাহন করেন না; উহা বহুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রমণ্ডলের সমষ্টি বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। কারণ সূর্য্য নক্ষত্রাদির ন্যায় উহা শোষণ-আলোক-চিত্র (Absorption spectra) প্রদান করে।

ধূমকেতু প্রভৃতি কতকগুলি দৃশ্য দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ অবচ্ছিন্ন আলোক চিত্র, (discontinuous spectra) প্রদান করে। এবং আমরা জানি যে বাষ্পীয় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুতেই এরূপ আলোক-চিত্র প্রদান করে না। সুতরাং ধূমকেতু সকল নিশ্চয়ই বাষ্পীয় পদার্থ। ধূমকেতু নাম হইতে অনুমান হয় যে প্রাচীন আর্য্যেরা এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন নতুবা এ নাম-করণ কেন?

আলোক বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা নক্ষত্র ইত্যাদি নভশ্চারীদিগের প্রকৃতির বিষয় ব্যতীত আরও একটী বিষয় অবগত হওয়া যায়। যেমন সোজা রাস্তায় অধিক দূরের লোক আসিতেছে কি যাইতেছে অনুমান করা সহজ নয়, সেইরূপ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আকাশে নিজস্থানে থাকিয়া যদি আমাদিগের নিকট আইসে বা আমাদিগের নিকট হইতে দূরে যায় তাহা হইলে আমরা তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। একটী ধূমকেতু উঠিল, আকাশে তাহার অবস্থান দেখিয়া আমরা বলিলাম পশ্চিম হইতে

পূর্ব্বে গেল কি উত্তর হইতে দক্ষিণে গেল; কিন্তু ঐ ধূমকেতু পৃথিবীর নিকট আসিতে লাগিল কি পৃথিবী হইতে দূরে গেল তাহা জানিতে পারি না। আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র সেই অভাব পূরণ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দীপ্তি-শালী বস্তু হইতে ইথর-তরঙ্গ বিসৃত হইয়া চক্ষুতে লাগে। যেমন কোন নৌকা একস্থানে নঙ্গর করিয়া থাকিলে এক সময়ে যত তরঙ্গের আঘাত প্রাপ্ত হইত, তরঙ্গের প্রতিকূলে গমন করিলে, সেই সময়ে তাহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক তরঙ্গের আঘাত প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ কোন দীপ্তিমান্ বস্তু নিকটে আসিতে থাকিলে তাহা হইতে ক্রমশঃই অধিক-সংখ্যক ইথর-তরঙ্গের অভিঘাত চক্ষুতে লাগিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তরঙ্গের অভিঘাত-সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত বর্ণের বৈষম্য হয়। অর্থাৎ অভিঘাত অধিক হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবক্ষেপণীয় (Refrangible) বর্ণের অনুভূতি হয়। সুতরাং সূর্য্য যদি পৃথিবীর নিকট আইসে, সৌর আলোক-চিত্রের ঘ রেখা আরও অবক্ষিপ্ত (Reflected) হইবে অর্থাৎ আরও বায়লেট্ বর্ণের দিকে যাইবে। দীপ্তিমান্ বস্তু দূরে গেলে ঠিক্ ইহার বিপরীত ক্রিয়া হয়। এই রূপে একটী মহৎ অভাবের পূরণ হইয়াছে। আমরা আর একটী বিষয় বলিয়া এ প্রস্তাবের শেষ করিব।

আমরা চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্য-মণ্ডল বিশদ-রূপে দেখিতে পাই না। যদি সূর্য্য-মণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে সূর্য্যের চাকচিক্যে আচ্ছন্ন না হইত, তাহা হইলে সূর্য্যের বাষ্প-গোলকে আমরা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইতাম। কিন্তু যেমন উচ্চ শব্দ লঘু শব্দকে বিলুপ্ত করে, যেমন অতি তেজো-বিশিষ্ট আলোক লঘুতেজকে নিষ্প্রভ করে, সেইরূপ সূর্য্যের চাক্‌চিক্যে সেই সকল দৃশ্য দৃষ্ট হয় না। সূর্য্য-গ্রহণের সময় সর্ব্বগ্রাস হইলে যখন এই চাকচিক্য তিরোহিত হয়, তখন সূর্য্য-মণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে লোহিত উদগ্র পর্ব্বত শ্রেণীর ন্যায় দৃশ্য দেখা যায়। কখন কখন ইহারা সূর্য্যমণ্ডলের সীমা হইতে সহস্র মাইল দূর পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়। ১৮৪২খৃঃ অব্দে এই দৃশ্যে বৈজ্ঞানিকদিগের চিত্ত অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। এবং তাঁহারা ইহা দেখিয়া সায়াহ্ন-সূর্য্য কৃত-লোহিত তুষার-মণ্ডিত আল্পস্ পর্ব্বতের শিখর সকলের সহিত ইহার তুলনা করেন। ইহার যথার্থ প্রকৃতি নির্ণীত হইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। কারণ গ্রহণের সময় ভিন্ন ইহা দেখা যাইত না। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ১৮ই আগষ্ট যে সূর্য্যগ্রহণ হয়, সেই সময় জ্যানসেন (Jansen) ভারতবর্ষে থাকিয়া ইহার পরীক্ষা করেন। তিনি ইহার আলোক-চিত্রে উদজানের ন্যায় উজ্জ্বল রেখা দেখিলেন। ঠিক্ এই সময় লকইয়ারও পরীক্ষা করিয়া ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এইরূপে ঐ পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় দৃশ্য সকল প্রজ্বলিত

উদ্‌জান বাষ্প বলিয়া স্থির হইল। কিন্তু এ সকল পর্য্যবেক্ষণের জন্য কবে গ্রহণ হইবে বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকা এবং গ্রহণের ক্ষণ-স্থিতির মধ্যে ঈপ্সিতানুযায়ী পরীক্ষা সম্পন্ন করা—এ সকল অতি অসুবিধার বিষয়। এবং যত দিন এই অসুবিধা নিরাকৃত হয় নাই, তত দিন এ সম্বন্ধে অধিক উন্নতি হয় নাই। এক্ষণে সৌর বাষ্পগোলকের (Solar atmosphere) দৃশ্য সকল যখন তখন ইচ্ছাপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সূর্য্যের চাক্‌চিক্যে আমরা এই সকল দৃশ্য দেখিতে পাই না। সুতরাং ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়, যে যদি কোন উপায়ে সূর্য্য-কিরণে ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস করিতে পারা যায়, অথচ সৌর বাষ্প-গোলকের আলোক যেমন তেমনই থাকে তাহা হইলে আমরা সেই সকল দেখিতে পাই। এবং ইহা অতি সহজেই হইতে পারে। আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে একখানির পরিবর্ত্তে অধিক-সংখ্যক বেল্‌ওয়ারি কাচ্‌ ব্যবহার করিলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্রে সূর্য্য-কিরণের সঙ্গে সঙ্গে তত্রস্থ প্রজ্জ্বলিত বাষ্প-গোলক হইতেও কিরণ প্রবেশ করে। সূর্য্য-কিরণ একখানি বেল্‌ওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া গেলে যত বিকীর্ণ হইবে, দুই খানির ভিতর দিয়া গেলে তাহার দ্বিগুণ বিকীর্ণ হইবে অর্থাৎ এক তুলিকা কিরণ একখানি কাচের ভিতর দিয়া গিয়া যে পরিমাণ স্থান আলোকিত করিবে দুইখানির ভিতর দিয়া গিয়া তাহার দ্বিগুণ স্থান আলোকিত করিবে। এবং আলোক যত অধিক স্থান ব্যাপিয়া পড়ে ততই তাহার হ্রাস হয়। সুতরাং দুই বা ততোধিক বেলওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে সূর্য্য-কিরণের ঔজ্জ্বল্যের যথেচ্ছ হ্রাস করা যায়। কিন্তু বাষ্প-গোলকের কিরণ যত কাচের ভিতর দিয়াই যাউক একইরূপ থাকিবে। সূর্য্য-কিরণ বিকীর্ণ হয়, তাহার কারণ ইহার বর্ণ সকল বিশ্লিষ্ট হয়। কিন্তু সৌর-বাষ্পগোলকস্থ বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে যে বিশেষ বিশেষ বর্ণের কিরণ বিকীরিত হয় তাহা এরূপে বিশ্লিষ্ট হয় না। কারণ একবর্ণের কিরণ যত বেল্‌ওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া যাউক না কেন উহা বিকীর্ণ (dispersed) হইবে না, কেবল উহার গতির দিকের পরিবর্ত্ত হইবে। বর্ণের সংশ্লেষ ভিন্ন বিশ্লেষ অসম্ভব; সুতরাং একবর্ণের কিরণ আর কি বিশ্লিষ্ট হইবে?

এইরূপে সূর্য্য-কিরণের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস করিয়া সৌর বাষ্প-গোলকের দৃশ্য সকল আমরা সকল সময় দেখিতে পাই। পূর্ব্বে যে পর্ব্বতশৃঙ্গাকার উদ্গ্রভাগ সকলের (Solar protuberances) কথা বলা হইয়াছে সে সকল এক্ষণে উক্ত বাষ্প-গোলকে বাত্যাদির ফল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ফলতঃ এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ কিছু দিন চলিলে সৌর গগণের পরিবর্ত্তন

সকল (Solar-meteorology) শীঘ্রই আমাদের আবায়ত্ত হইবে—স্বর্গীয় গ্রহমণ্ডলীর প্রকৃতি আর আমাদের অবিদিত থাকিবে না; এবং কালে এই সকল প্রকৃতি-জ্ঞান হইতে স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীগণের প্রকৃতিও জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। এবং কে ভাবিয়াছিল যে বিশ্বরাজ্যের কণাবৎ অংশ পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র জীব মনুষ্য হইতে এই সকল সাধিত হইবে? শ্রীম—

জাতীয় চরিত্র। *

স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ!

আমার অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় "জাতীয় চরিত্র"। জাতীয় চরিত্র, অতি অমূল্য জাতীয় সম্পত্তি। লৌহবর্ত্ম, তাড়িত বার্ত্তাবহ, বাণিজ্য বিস্তার প্রভৃতি বাহিক সভ্যতা ও উন্নতির উপকরণ সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার সংশয় কি; কিন্তু জাতীয় চরিত্র অনেক গুণে অধিকতর মূল্যবান্ পদার্থ। জাতীয় চরিত্র অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার উন্নতির ভিত্তি মূল স্বরূপ। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার লেকি (Leckey) সাহেব বলিয়াছেন, "A nation's character is its most sacred possession" অর্থাৎ কোন জাতির চরিত্র তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র সম্পত্তি। এ দেশের তাঁতি কুল উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টর আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে, আমাদের জাতি ক্রমশঃ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে, ইত্যাদি যতপ্রকার অনিষ্ট বিদেশীয় জাতি কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা ব্যথিত হৃদয়ে ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু সে সকল অনিষ্ট বরং এক দিন সহ্য করা যায়, জাতীয় চরিত্রের প্রতি আক্রমণ আমরা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারি না। সহ্য হয় না বা কি করিয়া বলি? এ কাল পর্য্যন্ত ইংরেজেরা আমাদিগের প্রতি যে প্রকার অন্যায় গালি বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা ত আমরা অনায়াসে সহ্য করিতেছি। আমরা এতদূর দুর্ব্বল, নির্জীব ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছি, যে আমাদের এখন সকলই সহ্য হয়।

অতি অল্প দিন হইল বেথুন সভায় যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহা বোধ হয় আপনারা অনেকেই অবগত আছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাতে ইংরেজ চরিত্রের কএকটি অভাব বা দোষের কথা বলিতে-

* শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিগত হিন্দুমেলায় অভিব্যক্ত।

ছিলেন; সভাপতি ফিয়ার সাহেবের তাহা অসহ্য হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করাতে কালীচরণ বাবু তাঁহার বক্তৃতার শেষ অংশ ভাল করিয়া বলিতে পারিলেন না। এই প্রকার ব্যবহারে ফিয়ার সাহেব কলিকাতার সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। বাস্তবিক ফিয়ার সাহেব যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার যাহা বক্তব্য ছিল, কালীচরণ বাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে বলিতে পারিতেন। কিন্তু ফিয়ার সাহেবের ব্যবহারে কি প্রশংসার বিষয় কিছুই নাই? কেবল প্রশংসার, কেন? আমাদের শিক্ষার বিষয়ও কি কিছুই নাই? যে স্বজাতি অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া ফিয়ার সাহেব প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কি প্রশংসনীয় নহে? তাঁহার দৃষ্টান্তে কি আমরা এই শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না, যে তিনি যেমন আপনার জাতির নিন্দা সহ্য করিতে পারিলেন না, সেইরূপ আমাদের জাতির কেহ অন্যায় নিন্দা করিলে আমরা কোন ক্রমেই তাহা সহ্য করিব না।

লর্ড মেকলে হইতে চুনো গলির ফ্যাগু পিড্ পর্য্যন্ত কেহই আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতি আক্রমণ করিতে কখন ত্রুটি করেন নাই। হ্যাট্ কোট্ পরা প্রত্যেক চাটগেঁয়ে তেঁতুলে বাগ্দি পর্য্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে দু কথা বলিতে পারিলে ছাড়েন না। মেকলে আমাদের কি না বলিয়াছেন?

"What the horrs are to the buffalo, what the paw is to the tiger, what the sting is to the bee, what beauty, according to the old Greek song, is to woman, deceit is to the Bengali. Large promises, smooth execuses, elaborate tissues of circumstantial falsehood, chicanery, perjury, forgery, are the weapons, offensive and defensive, of the people of the lower Ganges."

ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের জন্য ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ বলিতে যদিও আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে, তথাচ বাধ্য হইয়া উহার মর্ম্ম বলিতে হইতেছে:—শৃঙ্গ, যেমন মহিষের হুল যেমন মধুমক্ষিকার, এবং প্রাচীন গ্রীক্ কবিতানুসারে সৌন্দর্য্য যেমন স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বাভাবিক, প্রবঞ্চনা সেইরূপ বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাভাবিক। ছল, মিথ্যা সাক্ষ্য, ও জাল বঙ্গবাসীগণের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অস্ত্র স্বরূপ।

মহাশয়গণ! এ কথায় কি আপনাদের উষ্ণ শোণিত প্রত্যেক ধমনীতে দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয় না? যদি তাহা না হয়, যদি বিদেশীয় জাতি কর্ত্তৃক এ প্রকার অপমান প্রাপ্ত হইয়াও মস্তিষ্ক শীতল থাকে, যদি মন হইতে অপমান বোধ একেবারে চলিয়া গিয়া থাকে, তবে বলি হে দক্ষিণ মহাসাগর! তুমি তরঙ্গের উপর

তরঙ্গ আঘাত করিয়া এই হতভাগ্য দেশকে আপনার উদরসাৎ করিয়া লও।

ইংরেজ জাতির স্বভাবই এই যে তাঁহারা নিপীড়িত জাতির অন্যায় নিন্দা করিতে বড় ভাল বাসেন। তাঁহারা আইরিসদিগের প্রতিও অবিকল এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কেবল অন্যায় রাজনিয়ম সকল প্রচার করিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইত এমন নহে, তাহাদিগকে প্রবঞ্চক, ও মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতিও যার পর নাই আক্রমণ করা হইত। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার অসহ্য বোধ হওয়াতে, কতক গুলি আইরিস স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ফরাসি দেশে গিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহারা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটি আইরিস সৈন্যদল (Brigade) প্রস্তত করেন। ফণ্টেনোর যুদ্ধে ফরাসীদিগের পরাস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল; এমন সময়ে কেবল অওল সাহেবও আইরিস যোদ্ধাগণের সাহায্যে তাঁহারা জয়লাভ করেন। এই ঘটনায় ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় জর্জ বলিয়াছিলেন, 'cursed be the laws that deprive me of such subjects" আইরিসেরা ইংরেজদিগের অপেক্ষা অধিকতর সাহসী ছিলেন। ইংরাজেরা বলেন যে, সাহস ও সত্যপ্রিয়তা একত্র বাস করে। এ কথা সত্য হইলে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর সাহসী আয়লণ্ডবাসীগণ অবশ্য অধিকতর সত্যপ্রিয় ছিলেন।

ইংরেজেরা কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্রের উপর আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত নহেন, প্রাচীন আর্য্যদিগের প্রশংসাও তাঁহাদের সহ্য হয় না। এল্‌ফিন্‌ষ্টন প্রণীত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত শ্রীযুক্ত কাওয়েল সাহেব সটীক প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সেকেন্দর সাহেব সমভিব্যাহারে আরিয়ান নামক জনৈক গ্রীক পণ্ডিত ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি তাঁহার প্রণীত ইণ্ডিকা নামক পুস্তকে এতদ্দেশীয় লোকের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতবাসীগণ, আসিয়ার অন্যান্য জাতি সকল অপেক্ষা অধিকতর সাহসী। তৎপ্রণীত পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট লেখা আছে যে, কোন ভারতবাসীকে কখন মিথ্যা বলিতে দেখা যাইত না। এ কথাটি কাওয়েল সাহেবের ভাল লাগে নাই। তিনি টীকা করিয়াছেন যে, উহা অবশ্য অত্যুক্তি হইবে। অত্যুক্তি কেন? বোধ হয় কাওয়েল সাহেবের যুক্তি এই যে, অধুনাতন হিন্দুগণ মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ইত্যাদি। সেকেন্দার সাহেবের সময়ের হিন্দুরাও হিন্দু, সুতরাং তাহারাও অবশ্য মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ইত্যাদি ছিল। কি চমৎকার যুক্তি! যদি স্বীকার করা যায় যে, আধুনিক হিন্দুগণ যথার্থই প্রবঞ্চনাপরায়ণ, তাহা হইলেও কি ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে প্রাচীন আর্য্যগণও সেই রূপ ছিলেন? শতাব্দীর পর শতাব্দী

চলিয়া গেল, শতশত রাজ্য ও রাজার সমুত্থান ও বিলোপ হইল. কত প্রকার অত্যাচার ও অধীনতায় ভারতভূমি জর্জ্জরিত হইল, ইহাতে কি জাতীয় চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না? কি চমৎকার যুক্তি! আমাদের দেশী গৌতম ও বিলাতি হোয়েটলি ও মিলকে নিশ্চয়ই ইঁহার নিকট হার মানিতে হইবে।

কিন্তু কাওয়েল সাহেবের কথা অযুক্ত হইলেও গ্রীক্ পণ্ডিত আরিয়ানের কথা যে সত্য তাহার প্রমাণ কি? তাঁহার তো ভ্রম হইতে পারে? আরিয়ানের যে ভ্রম হয় নাই তাহার প্রমাণ আছে। চীনদেশ হইতে হিউনসাং নামক জনৈক পণ্ডিত সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতবাসীগণ অত্যন্ত সত্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা প্রবঞ্চনা-পরায়ণ ছিলেন না। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে তাঁহারা মোকদ্দমা প্রিয় ছিলেন না, বিষয় কর্ম্মে কোন প্রকার লেখা পড়ার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়াই তাঁহারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। হিউনসানের কথা বিশেষ রূপে গ্রাহ্য এই জন্য যে, তিনি এদেশে ষোড়শ বর্ষ বাস করিয়া যথোচিত অনুসন্ধান দ্বারা হিন্দু আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বেদ ও পানিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যখন বিপরীত দিক্ হইতে দুইজন পর্য্যটক, পরস্পরের সহিত কোন প্রকার সংস্রব অসত্ত্বেও হিন্দুচরিত্র সম্পর্কে একই কথা বলিয়া গিয়াছেন তখন সে কথায় যে সত্য আছে ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু আরিয়ান ও হিয়ুন্সাং আমাদিগের পিতৃ পুরুষগণের চরিত্র সম্পর্কে যে প্রকার প্রশংসা করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাহার উপযুক্ত কি না ইহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে নীতি সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ অবনতি হইয়াছে। আত্মাদরের আতিশয্য বশতঃ লোক যেমন আপনার দোষ আপনি দেখিতে পায় না, সেইরূপ স্বদেশানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে স্বজাতির দোষ দেখিতে পায় না। স্বদেশানুরাগ আদরণীয়, কিন্তু সত্য অধিকতর আদরণীয়! সুতরাং আমাকে ব্যথিত হৃদয়ে বলিতে হইতেছে যে আমাদের অবনতি হইয়াছে। লর্ড মেকলের কথা অসত্য ও অশ্রদ্ধেয় হইলেও আমরা কখনই অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি না যে, আমাদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু অবনতির কারণ কি? আমার বোধ হয় পরাধীনতাই প্রধান কারণ। অত্যাচারের পর দুর্ব্বিষহ অত্যাচারে ভারত সন্তানগণ প্রপীড়িত হইল, বিদেশীয় জাতির যুদ্ধাশ্বের পদাঘাতে ভারতের বক্ষ পুনঃ পুনঃ ক্ষত বিক্ষত হইল, ইহাতে আমাদের জাতীয় চরিত্র কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত না হওয়াই আশ্চর্য্য। যে জাতি সাতশত বৎসর বিদেশীয় জাতির

পাদুকা মস্তকে বহন করিল, তাহাদের চরিত্রে পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হওয়াই আশ্চর্য্য। আজও যে আমরা পৃথিবী-তলে অবস্থিতি করিতেছি, অদ্যাবধি যে সংসার হইতে হিন্দু নাম বিলুপ্ত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।

কিন্তু যাঁহারা আমাদের নিন্দা করেন, তাঁহারা যদি স্বর্গের দেবতা হইতেন, তাহা হইলে আমরা অবনত মস্তকে উহা সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহারা তাহা নহেন। কোন প্রকৃত সাধু ব্যক্তি আমার দোষের জন্য আমাকে তিরস্কার করিলে তাঁহার কথায় অত্যুক্তি থাকিলেও আমার উচিত যে, উহা অতি বিনীতভাবে গ্রহণ করা। ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে যেরূপ জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। ইংরেজেরা স্বর্গের দেবতা হইলে আমরা তাঁহাদের অন্যায় তিরস্কার সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু তাঁহারা যে তত উচ্চ-প্রকৃতি-সম্পন্ন নহেন তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু আমি "কালাবাঙ্গালী হিদেন"। সুসভ্য ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আমার সাহস হয় না। সুতরাং আমি নিজে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। ইংরেজ জাতির মধ্যে যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও পণ্ডিত তাঁহারা স্বজাতির ধর্ম্মনীতি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাই আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি। হ্যালাম সাহেব তৎপ্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাস নামক পুস্তকে বলেন যে, মধ্যকালে ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে সত্যানুরাগের এতদূর অভাব ছিল যে, বিচারকগণ উভয় পক্ষের সাক্ষীর উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিতে পারিতেন না। তজ্জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা ছিল যে, অর্থী প্রত্যর্থীদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া যে জয় লাভ করিত, বিচারক তাহার পক্ষেই রায় দিতেন।*

হার্বার্ট স্পেন্সর একজন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক। অনেকের মতে তিনি বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি

---

* One crime as more universal and characteristic than others, may be particularly noticed. All writers agree in the prevalence of Judicial perjury. It seems to have almost invariably escaped human punishment; and the barriers of superstition were in this, as in every other instance; too feeble to prevent the commission of crimes, many of the proofs by ordeal were applied to witnesses as well as to those whom they accused, and undoubtedly trial by combat was preserved in a considerable degree on account of the difficulty experienced in securing a just cause against the perjury of witnessess. Hallam's Middle Ages P. 309 vol. III.

তাঁহার স্বজাতির নীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, মদ ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর দোকানে দোকানদার ক্রেতাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে অতি তীব্র খাদ্য আস্বাদ করিতে দেয়, সুতরাং তৎপরে তাঁহারা অন্য কোন প্রকার পদার্থের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণে অক্ষমতা হেতু প্রতারিত হন। স্পেন্‌সর বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের বিষয়ে বলিয়াছেন যে, ক্রেতাদিগকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য বস্ত্র সকল এরূপ প্রণালীতে তাহাদিগের সম্মুখে স্থাপিত করা হয় যে, তাহারা সহজেই প্রবঞ্চিত হন।*

বিখ্যাতনামা পণ্ডিত সকল কি বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন।

What is lightly taken is easily broken. And the best observers of English society,—observers too whose characters are very different, and who hold the most opposite opinions, are all agreed on this, that, the perjury habitually practiced in England, and of which Government is the imme diate creator, is so general, that it has become a source of national curruption, has diminished the value of human testimony, and shaken the confidence which men naturally place in the word of their fellow creature.

মনোবিজ্ঞানের উন্নতিসাধক সুপ্রসিদ্ধ সর উইলিয়ম হামিলটন ইংরেজদিগের সত্যপ্রিয়তার বিষয় যাহা বলিয়াছেন শ্রবণ করুন:—

But if the perjury of England stands preeminent in the world, the perjury of the English Universities, and of Oxford in particular, stands preeminent in England.

আপনারা অনেকেই ম্যাট্‌সিনির নাম শুনিয়া থাকিবেন। যে সকল লোকের অধ্যবসায় ও যত্নে ইতালিদেশ অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, ম্যাট্‌সিনি তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ইনি স্বদেশ হইতে, এমন কি সমস্ত ইউরোপ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া লণ্ডন নগরে কিছুকাল বাস

---

* Again it is usual purposely to present samples of cloths, silks, &c. in such order as to disqualify the perceptions. As when tasting different foods or wines, the palate is disabled by something strongly flavoured, from appriciating the more delicate flavour of another thing taken; so with the other organs of sense a temporary disability follows an excessive stimulation.—Essays. Scientific, political and speculative by Herbert Spencer. VOL. II. P. 111.

করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে নিওপোলিটান রাজ্য আক্রমণ করিবার বিষয়ে, ভিনিসনগর নিবাসী বেণ্ডিয়ারা ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তাঁহার পত্রাদি লেখা চলিত। একদিন তাঁহার বোধ হইল যে, তাঁহার পত্র সকল নিয়মিত সময়ে না আসিয়া, কিছু বিলম্বে আসিয়া পৌঁছে। তিনি এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার জন্য কতকগুলি পত্র নিজের নামে আর কতকগুলি পত্র কএকটি কল্পিত নামে শিরোনামা দিয়া আপনার ঠিকানা লিখিয়া ডাক ঘরে নিজে দিয়া আসিলেন। যে পত্র গুলিতে কল্পিত নাম ছিল, সে গুলি যথা সময়ে আসিয়া পৌঁছিল; কিন্তু যে গুলি তাঁহার নিজের নামে সে গুলি কিছু বিলম্বে হস্তগত হইল। তদনন্তর ম্যাট্সিনি আর একটি পরীক্ষা করিলেন, তিনি নিজের নামে কতক্‌গুলি পত্র লিখিয়া উহার অভ্যন্তরে কতক্‌গুলি সূক্ষ্ম কেশ ও পোস্ত রক্ষা করিয়া ডাকে দিলেন, পত্র সকল নিয়মিত সময়ের দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছিল। দেখিলেন তাহার অভ্যন্তরে সেই কেশ ও পোস্ত নাই। এই ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক প্রমাণ করিবার জন্য কএক জন ভদ্র লোককে তিনি সাক্ষী রাখিয়াছিলেন। তিনি এখন নিশ্চয় বুঝিলেন যে, তাঁহার পত্র অবশ্য ডাকঘরে খোলা হয়; এবং তাঁহার বিলক্ষণ সন্দেহ হইল যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই এই গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখন তিনি পার্লেমেণ্ট মহাসভার জনৈক সভ্যকে এই ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। উক্ত সভ্য তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে এক দিবস মহসভায় প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জোসেফ ম্যাট্সিনির পত্র সকল খুলিয়া দেখা হইয়াছিল কি না, এবং তাহার সার মর্ম্ম নিয়াপোলিটান গবর্ণমেণ্টকে অবগত করান হইয়াছিল কি না। পত্র সকল যে খোলা হইত, মন্ত্রী তাহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহার মর্ম্ম যে নিয়াপোলিটান গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করা হইত তাহা তিনি অস্বীকার করিলেন। পরে এই বিষয় লইয়া অতিশয় আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং উহার অনুসন্ধান জন্য কমিসন নিযুক্ত হইল। উক্ত কমিসন দ্বারা পরিশেষে এই ভয়ানক কথা প্রকাশিত হইল যে, কেবল ম্যাট্সিনির পত্র সকল যে উন্মোচন করিয়া দেখা হইত তাহা নহে, তাহার মর্ম্ম নিয়াপালিটান গবর্ণমেণ্টকে নিয়মিত রূপে জানান হইত। প্রধান মন্ত্রী মহাসভায় যে মিথ্যা বলিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল। ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিভিউ এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন আমি তাহা আপনাদের সম্মুখে পাঠ করিতেছি। তদ্দ্বারা আপনারা জানিতে পারিবেন যে, কেবল যে ম্যাট্সিনিরই পত্র সকল ডাকঘরে খোলা হইত এমন নহে, বহুকাল হইতে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান মন্ত্রীগণ এই ঘৃণিত জঘন্য কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন।

"We read with surprise amounting almost to incredulity, in the

report of the committee of the House of Commons, the following list of cabinet ministers, who, within the last forty years, have stooped to the tricks (to some of them at least) of a Fouchi adminstration—

1806—7. Earl spencer.
1807. The Right Hon. C. W. W. Wynn.
1809—12. The Right Hon. R. Ryder.
1812—21. Lord Viscount sidmouth.
1822—30. The Right Hon. Sir R. Peel.
1822—3. The Right Hon. G. Canning.
1823. Earl Bathurst.
1827. Lord Viscount Goderich. The Right Hon. V. sturges Bourne.
1827. The Marquis of Landsowne.
1830—4. Lord Viscount Melbourne.
1833—40. Lord Palmerston.
1834. Lord Viscount Duncamon. The Duke of Wellington.
1834—5. The Right Hon. H. Goulburn.
1835—9. Lord John Russell.
1838. Lord Glenelg.
1839—41. The Marquis of Normandy.
1841—4. The Right Hon. Sir James Graham.
1844. The Earl of Aberdeen"

Westminster Review, IXXXII. Sept. 1844.

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির গুপ্ত ডাকঘর ছিল বলিয়া তাঁহার জীবন চরিত লেখক সর ওয়ালটর স্কট যার পর নাই তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি যদি জানিতেন যে, তাঁহার দেশীয় গবর্ণমেণ্ট ডাকের পত্র লইয়া কি প্রকার ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি কি বলিতেন বলিতে পারি না। বিগত ১৮৭৫ সালের এডিবর্গ রিভিউয়ে ব্যবস্থা সংস্কারের উন্নতি (Progress of law reform) সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। উহাতে ১৮৬০ সালের ইংলণ্ডের চ্যান্সেলর লর্ড ম্যাক্লসফিল্ডের উৎকোচ গ্রহণ ও প্রবঞ্চনার বিষয় বর্ণনা করিয়া লেখক বলিতেছেন।

Excessive greediness apart, Lord Macklesfield was probably no more guilty in principle than many of those who condemned him.

এতদ্দেশীয় বিচারালয়ের আমলারা অনেকে উৎকোচ গ্রহণ করে বলিয়া সাহেবেরা আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিরুদ্ধে কটু কাটব্য বর্ষণ করিতে ত্রুটি করেন না।

আমলাগণ সামান্য অবস্থার লোক ও সামান্য বেতনভোগী হইয়া যে উৎকোচ গ্রহণ করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? বিগত শতাব্দীর সিভিলিয়ান মহাপুরুষেরা অপেক্ষাকৃত অল্প বেতন ভোগী হইয়াও এ দেশে কতিপয় বৎসর অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া কেন ইণ্ডিয়ান নবাব বলিয়া আখ্যাত হইতেন তাহার কারণ অনেকেরই অবিদিত নাই।

ক্লাইবের জালের কথা আপনারা সকলেই জানেন। ইহা বলিলে অসঙ্গত হয় না যে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট এ দেশে জালের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই মহাপাপ বিদেশীয় জাতির আনীত বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত ক্যানিংহাম সাহেব তৎপ্রণীত সিখদিগের ইতিহাস পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, উক্ত জাতির সহিত যুদ্ধের সময় ইংরেজেরা লালসিং ও তেজসিংকে উৎকোচ দিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন। (১)

ক্যানিংহ্যাম সাহেব স্বদেশানুরাগে অন্ধ হইয়া সত্যের অবমাননা করেন নাই। কিন্তু তিনি সে সত্যপ্রিয়তার কি পুরস্কার পাইয়াছিলেন? গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে তাঁহাকে বিদূরিত করা হইয়াছিল। ক্যানিংহাম সাহেব নির্দ্দোষী হইয়াও যখন এ প্রকার অন্যায় দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তখন যে, কোন বাঙ্গালী যুবক সামান্য অপরাধে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে বিদূরিত হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি (২)

---

(1) It was sufficienty certain and notorious at the time that Lall singh was in communication with captain Nickolson, the British agent at Ferozepore, but owing to the untimely death of that officer, the details of the overtures made, and expectations held out, cannot now be satisfactorily known. Cunningham's History of the Shiks.

The object, indeed, of Lall Singh and Teg singh was not to compromise with the English by destroying an isolated division, but get their own troops despersed by the converging forces of their opponents. Their desire was to be upheld as the ministers of a dependent kingdom by greateul conquerors, and they thus deprecated an attack on Ferozepore and assured the local British authorities their secret and efficient good will.

Cunningham's History of the Shiks.

(2) Compare the governor-general's letter to the secret committee of the 19th February 1846; from which however, those only who were mixed up with the

আর একটি কথা। কে সাহেবের আফগান যুদ্ধের ইতিহাস পুস্তকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, উক্ত যুদ্ধ সম্বন্ধে যে ব্লু বুক (blue book) পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা মিথ্যাতে পরিপূর্ণ *

এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন যে, "আমাদিগের জাতীয় চরিত্র যে বহুল পরিমাণে বিদেশীয় জাতি কর্তৃক আরোপিত গুরুতর দোষনিচয়বিবর্জ্জিত ইহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন কি? আমাদের দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছে, এখন কি গৌরব করিবার সময়? দেশের লোকের যে সকল প্রকৃত দোষ,—অভাব আছে তাহা প্রদর্শন করাই যথার্থ দেশহিতৈষিতার কার্য্য। এখন জাতীয় গৌরবের সময় নহে, পিতৃপুরুষদিগের মহত্ত্বের কথা বলিয়া এখন অহঙ্কার করা ভাল দেখায় না।" জাতীয় গৌরব অবশ্য করিব। আত্মমর্য্যাদা না জানিলে নীচ হইয়া যাইতে হয়, এ কথা ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যেমন সত্য, জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। রাজপুত্র যদি না জানেন, যে তিনি রাজপুত্র, তাহা হইলে তিনি হয়তো ইতরের সহিত আপনাকে সমান করিবেন। কিন্তু যখনই তিনি জানিবেন যে তিনি কে, তখনই তিনি আপনার মান আপনি রক্ষা করিতে শিক্ষা করিবেন। পিতৃপুরুষদিগের গুণ কীর্ত্তনে প্রভূত উপকার লাভের সম্ভাবনা। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের বিষয় স্মরণ করিলে মন সহজেই বলে, আমরা এমন মহাপুরুষদিগের সন্তানপরম্পরা হইয়া আর এতাদৃশ হীন ও জঘন্য অবস্থায় থাকিতে

---

negotiation can extract aught indicative of the understanding with Golap Sigh which is alluded to in the text. It was for this note chiefly, if not entirely, that the author was removed from political employment by the East India Company. This was the author's own conviction, from careful enquiries made in India; and has been the result of equally careful inquiries made by me in England. P. C. Vide History of the Sikhs by Cunningham, second edition Page 370.

* The character and carear of Alexander Burnes have both been misrepresented in those collection of State Papers which are supposed to furnish the best materials for history, but which are often only one—sided compilations of garbled documents—counterfeits, which the ministerial stamp forces into curreney, defrauding the present generation and handing down to posterity a cluster of dangerous lies. Ibid.

পারি না। আত্মমর্য্যাদা অনুভব কর, তোমার পক্ষে নীচ ও ইতর হইয়া যাওয়া অসম্ভব হইবে। আমাদের এত যে অধোগতি হইয়াছে, তথাচ যখন স্মরণ করি যে আমরা নবহলণ্ড নিবাসী অসভ্য জাতি নহি, আমরা ভারতবর্ষীয় পূজ্যপাদ আর্য্যদিগের সন্তান পরম্পরা, যখন স্মরণ করি আমাদের বাল্মীকি ব্যাস, আমাদের ভবভূতি কালীদাস, আমাদের আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য, আমাদের শাক্যমুণি ও শঙ্করাচার্য্য, তখন নিরুৎসাহ হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হয়, হতাশ চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, নির্জ্জীব মন সজীব হয় ;—মনে হয়, আর এই হীন অবস্থায় থাকিব না, আমরা জ্ঞান ধর্ম্মে, প্রেম পবিত্রতায় আবার উন্নত হইব ;—আবার ভারতের যশঃপাতাকা সুসভ্য জগতের সম্মুখে উড্ডীন করিব।

কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা আছে,—অপব্যবহার আছে। এক্ষণে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক জাতীয় গৌরবে অন্ধ। তাঁহাদের কথা শুনিলে বোধ হয় তাঁহারা স্বজাতির গুণ ব্যতীত দোষ কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থার প্রশংসাবাদ করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সময়েও সংস্কার যোগ্য কোন কুপ্রথা,—জাতীয় চরিত্রে কোন প্রকার কলঙ্ক দেখিতে পান না। যাহা কিছু জাতীয় তাহাই তাঁহাদের নিকট শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয়। অন্য এক শ্রেণীর লোক ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহারা হিন্দুচরিত্রে,—হিন্দু সমাজে কিছুই ভাল দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিবেচনায় সকলই মন্দ,— হিন্দু সমাজের ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সকলই মন্দ। এদেশীয় লোক জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া সাহেব হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। এই উভয় দলের মধ্যে কোন দলেরই সহিত আমার সহানুভূতি নাই। জাতীয় গৌরবে অন্ধ হইয়া জাতীয় দোষ দর্শনে বিমুখ থাকিতে ইচ্ছা করি না এবং জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণবর্ণ সাহেব হইতেও চাহি না। (১) আমাদিগকে মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান অবনতি বিস্মৃত হইব না ; এবং বর্ত্তমান অবনতি দেখিয়া জাতীয় মর্য্যাদা একবারে ভুলিয়া যাইব না। একটি আর একটিকে স্মরণ করিয়া দিবে।

আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমরা নিশ্চয়ই উন্নতির পর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিব। যতই কেন আমাদের দুর্দ্দশা হউক না, আমরা কখনই চিরপতিত থাকিব না, আমাদের কোন ভয় নাই। চতুর্দ্দিকে অধীনতা, অত্যাচার, নানাবিধ অকল্যাণের স্রোত প্রবাহিত হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াও আমি অদ্য এই হিন্দুমেলায়

(১) এস্থলে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, যে কোন ব্যক্তি বিজাতীয় পরিচ্ছদ ধারণ করেন তিনিই সম্পূর্ণরূপে জাতীয় ভাবপরিশূন্য।

দণ্ডায়মান হইয়া নিঃসংশয়চিত্তে ভবিষ্যদ্বাণী বলিতেছি যে, ভারতবর্ষের এ দুর্গতি চিরকাল থাকিবে না, আমাদের দুঃখ দুর্দিন শীঘ্র বা বিলম্বে নিশ্চয়ই তিরোহিত হইবে। পরাধীনতা এদেশের প্রভূত অনিষ্ট সংসাধন করিয়াছে। আমার দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, সুদূর ভবিষ্যতে ভারত সন্তানগণ স্বাধীনতার উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়া উৎসাহ-প্রফুল্ল হৃদয়ে জয়-ভেরী নিনাদিত করিতেছেন। কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, আমার কথায় রাজ ভক্তির অভাব প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহারা মনে করেন যে, স্বাধীনতার কথা বলিলেই রাজভক্তির অভাব হয়, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। ব্রিটনবাসীগণ যেমন স্বাধীনতার গৌরব জানেন, এমন আর কেহ জানেন না। স্বাধীনতার কথা শুনিলে প্রকৃত হৃদয়বান্ ইংরেজ তাহার যত আদর করিবেন, বাঙ্গালী তত পারিবে না। যে মুহূর্ত্তে ক্রীতদাস ব্রিটিস সাম্রাজ্যে পদক্ষেপ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া পড়িয়া যায়। ইংরেজেরা যদি হতভাগ্য ভারতবাসীগণকে ক্রমশঃ জ্ঞান সভ্যতায় সমুন্নত করিয়া স্বাধীনতার পবিত্র মন্দিরে লইয়া যাইতে পারেন, তবে তাঁহাদের কীর্ত্তি জগতে চিরদিন অক্ষতভাবে বিদ্যমান থাকিবে; ইহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চতর কীর্ত্তি, যশঃ, পুণ্য তাঁহাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। তাঁহারা আমাদের হস্ত ধরিয়া উন্নতি ও স্বাধীনতার দিকে লইয়া চলুন, পরমেশ্বর স্বর্গ হইতে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। যেন পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার সময় পরস্পরে বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতে না হয়। উভয় জাতি পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া যেন পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিধাতা ইহাই করুন, যেন স্বাধীনতা-রত্নের পুনরুদ্ধার জন্য ভারতবর্ষকে তলবার ধারণ করিতে না হয়।

জাতীয় চরিত্র সংশুদ্ধ করিয়া অকুতোভয়ে সুদৃঢ়চিত্তে, উৎসাহিত হৃদয়ে অগ্রসর হও, নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হইবে।

"কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়;
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল,
ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল, করিতে কি ভয়?

জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

মেহের আলি।

সপ্তম অধ্যায়।

শীত কাল অতীত হইয়াছে, তত্রাপি প্রাতঃকাল বলিয়া শীত বোধ হইতেছে। চতুর্দ্দিক্ নির্ব্বাত ও ধূম্রবর্ণ; কারণ কুআশায় পূর্ণ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে কোকিল-রব ও টাকাচোরা পক্ষীর অর্থ-শূন্য রব বিনা আর কিছু শুনা যায় না। রাস্তার লোক নিতান্ত সম্মুখে আসিলেই দেখা যায়, নচেৎ দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। সূর্য্য দৃষ্ট হইতেছে না, সুতরাং বেলা হইয়াছে কি না বুঝা যায় না। এমত সময়ে ঝব্‌ঝব্যা বটতলার দোকানী আপন আপনির সম্মুখীন রাস্তা সম্মার্জ্জনী হস্তে পরিষ্কৃত করিতেছেন। সহসা কিঞ্চিৎ শব্দাকর্ণনে দক্ষিণমুখ হইয়া দেখিলেন কি একটা প্রকাণ্ড আসিতেছে। কুআশায় বুঝা ভার; প্রকাণ্ড দৃষ্টে দোকানী অনুভব করিলেন হস্তী হইবে। যত অগ্রসর হইল ঐ অনুভবই দৃঢ় হইল। দোকানী ক্ষিপ্র হস্তে ঝাট দিয়া রথ্যা পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। চলৎ বস্তু সম্মুখে আসিলে হস্তী অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখা গেল। যখন পার্শ্বে উপনীত হইল উহা দাঁড়াইল; এবং একটী অশ্ব হইতে আরোহী নামিল। অশ্বটী বৃক্ষে বাঁধিয়া আরোহী দোকানীর সম্মুখে আসিল ও কহিল।

"সেলাম বুড়ামিঞা, ইস্ জাগাকে নাম ক্যা?"

দোকানী। ঝব্‌ঝব্যা বটতলা, মসহুর হায়। আপ কাঁহাসে আতা হায়? কিধার জায়ে গা?

অশ্বারোহী। কুলাগাঁও হিয়াঁসে কেত্তা দূর?

দোকানী। নজদিক, কিস্‌কা পাশ জায়ে গা?

অশ্বারোহী। সেখ মিঞাজান কা হাবেলী।

দোকানী। নেহি জানতা হায়, এই আদমী কুলাগাঁওমে হায় নেহি।

অশ্বারোহী। মৌলভি আমীর আলি জানতা হায়?

দোকানী। ওঃ! বড়া আদমী থা, আব তো নীস্ত নাবুদ হুয়া।

অশ্বারোহী। আর্ কুলগাঁওমে বড়া আদমী কোন থা?

দোকানী। আসগর আলি মোক্তার।

বলিতে বলিতে কুআশা ছাড়িল, রৌদ্র প্রকাশ হইল;—কারণ সূর্য্য যথেষ্ট উদয় হইয়াছে। দেশবাসীরা কহে বেলা দুই বাঁশ হইয়াছে অর্থাৎ সূর্য্য ৮ হস্ত পরিমিত বাঁশের দ্বিগুণ উচ্চ দেখা যাইতেছে। দোকানী দেখিলেন যাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন তিনি সম্ভ্রান্ত-বেশধারী। অশ্বটী অতি সুস্থকায় ও সুদৃশ্য। পৃষ্ঠে রক্তবর্ণ-কারু-খচিত আসন। পুচ্ছের

উপরিভাগের কেশ থাক করে কাটা। আরোহীর মস্তকে জরীর আমামা, অঙ্গে সাটিনের জোব্বা, হস্তে দিব্য এক দ্বিরদ-রদ নির্ম্মিত চাবুক। দোকানী সসম্ভ্রমে বসিতে আসন দিলেন। আরোহী ভদ্রোচিত ঈষদ্ধাস্যে অভ্যর্থনা গ্রহণ পূর্ব্বক বসিবার প্রয়োজন নাই বলিলেন, ও কুলগ্রামের পথ অবগত হইলেন। দোকানী আসনে বসাইতে না পারিয়া অনুমতি লইলেন, ধূম পানার্থ কিঞ্চিৎ বিলম্ব করেন। অবিলম্বে একটী ডাবা হুকায় তামাকু দিলেন এবং আগন্তুক ধূমপান করণ অবসরে দোকানী জিজ্ঞাসা করিলেন "ইস্‌মে সরিফ?"

আরোহী। খোদাবক্স খাঁ।

দোকানী। কাঁহাসে তকলিফ ফরমায়ে?

আরোহী। বোসাঙ্গসে আয়েথে—আর চাটগাঁও সে।

দোকানী। দৌলতখান্?

আরোহী। চাটগাঁও।

অশ্বারোহী অশ্বারোহণে কুলগ্রামে গেলেন। আসগর আলির নাম করিয়া এক লোকপূর্ণ বৈটকখানায় উপনীত হইলেন। স্থানটী কাছারীর ন্যায় অর্থী প্রত্যর্থীতে পূর্ণ। প্রধান ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে বসিয়া গ্রাম্য বিচার কার্য্য করিতেছেন। উনিই আসগর আলি মোক্তার। তাঁহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—একটু অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় হইয়াছেন। আসগর এক জনকে শাসন করিয়া সম্মুখস্থ পুষ্করিণী দেখাইতেছে ও ঐখানে যে আমীর আলি মৌলভির বাস ছিল তাঁহার দুর্দ্দশা দেখাইয়া স্বীয় প্রভুত্ব ও প্রতিহিংসার পরিচয় দিয়া কহিলেন "দেখ, আমার কথা না শুনত ঐ দশা হইবে এখনও বুঝ।"

শাসিত ব্যক্তি "বুঝি," বলে কিঞ্চিৎ অন্তরালে গেল ও বাকর আলিকে জিজ্ঞাসা করিল "কি বল ভাই, এর চেয়ে আদালত হলে আমার ক্ষতি কি? আমার লাখেরাজ জমীর যদি খাজনাই দিলাম তবে থাকিলে আর গেলেই বা কি?"

বাকর কহিল "আদালত, আদালত মোক্তারের হাতে যে কি ভয়ানক তুই কি শুনিস্ নাই! আমীর আলি মৌলভি রাজা ছিল—তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখে কে? ঐ পুষ্করিণী তাঁহারই ভিটায় মোক্তার করেছেন। তাঁহার স্ত্রীকে মোক্তার কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং এখনও তাঁহার জাহাজ মোক্তারের হস্তে আছে। মোক্তারকে এক দিন তিরস্কার করে মৌলভির এই দুর্দ্দশা হয়েছে।" মকদ্দমাকারী কিঞ্চিৎ ভয়চকিত হইয়া কহিল "আমি সব শুনেছি—মোক্তারের আদেশ অবহেলন কি আমি করিতে পারি? তবে ভাই তুমি একটু বলে কহে দাও যাহাতে মকররী টা হয়, তোমায় ১০ টাকা দিব।"

আর এক জন ব্যক্তি তথায় ছিল, সে মোক্তারের প্রতিহিংসা শুনে অবাক্ হইল, এবং সৌৎসুক বচনে বাকরকে জিজ্ঞাসা করিল "ও ভাই বাকর, মৌল-

ভিন্ন যে মেহের আলি নামক পুত্র ছিল ও তাহার নামে বিষয়াদি ছিল কি হইল?"

বাকর হাসিয়া কহিল—"দৈবও মোক্তারকে ভয় করে, বাপ মা মরায় মেহের আলি ক্ষেপে কোথায় গেছে,—সে মরিয়া গিয়া থাকিবে নচেৎ এত দিনে কেহ না কেহ দেখিত। আর সে মোক্তারের নিকাহা-পুত্র বলে মোক্তার আদালতের হুকুম লইয়া তাহার বিষয়াদি ও তন্মাতার বিষয়াদি দখল করিতেছেন।"

এই মণ্ডলীর কাছে অশ্বারোহী নামিল ও স্থানের পরিচয় লইল। অশ্বারোহী কহিল "এ গ্রামে সেখ মিঞাজান কেহ আছে?"

বাকর কহিল "কৈ না। কেন?"

আরোহী। তাঁহার কন্যার নামে এক পত্র আছে।

বাকর। নাম?

আরোহী। মেহেরন্নিসা।

বাকর শিহরিল; সতর্ক হইয়া কিঞ্চিৎ উপেক্ষা ভাবে কহিল "শুনেছি তিনি এই আসগর আলি মিঞার প্রতিপালিতা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহিতা। কর্ত্তার কাছে গেলেই সব জানিবেন। বাকর আগন্তুককে মোক্তারের কাছে লইয়া গেল। মোক্তার পত্র দেখিলেন এবং আক্যাব হইতে কে লিখিবে ভাবিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন "কে পত্র দিয়াছে?" আরোহী কহিল "মেহের আলি ওলদে আমীর আলি মৌলভি।"

মোক্তার চকিত হইলেন, দাড়ীটী দন্তে দন্তে ধরিয়া ঘাড় হেঁট করিলেন। মুখটী বিমর্ষ দেখে পাছে আগন্তুক কিছু ভাবে, বলে আগ্রহ প্রকাশে বলিলেন।

"ঈশ্বরের জয়! আমার পলায়িত পুত্র মেহেরের সন্ধান পাইলাম! সে কোথায়, কেমন আছে?"

আগন্তুক। আমি ছয় মাস তাঁহাকে আক্যাব দেখে এসেছি, এখন কোথায় জানি না। মোক্তার বিশ্বস্ত হইবার জন্য কহিল "দুর্দ্দান্ত বালক আমাকে ভয়ে পত্র লিখে নাই তাহার ভগিনীকে লিখেছে। আর কিছু বলেছে?"

আগন্তুক। "আমায় কিছু বলেন নাই, কয়েকটী টাকা দিয়াছেন" বলে ৫০ টাকা দিলেন। আসগরের নাম পুস্তিকায় টুকিয়া লইয়া আগন্তুক চলিয়া গেলেন। মোক্তার ব্যথিত-হৃদয় হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন—এবং ফজর আলিকে লইয়া গোপনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মোক্তার স্বরভঙ্গ ভাবে কহিলেন "ফজর আলি, এত যে পরিশ্রম এত যে কৌশল সব কি বিফল হইবে? মেহের আলি থাকিতে মৌলভির বংশ থাকিতে আমার হৃদয়ে রক্ত আসিতে পায় না। আবার সে সুখের সোপানে উঠিতেছে!"

ফজর। তাই ত, এখন কি করা যায়? যদি এর মধ্যে দেশে আসে কোন উপায় করা যাইবে, এবার তাহাকে ছাড়া হইবে না।

মোক্তার। দেশে আসিলে আমাদের আর নরহত্যা করিতে হইবে না; পত্রে

মেহেরন্নিসার উপর যে প্রণয় দেখিতেছি তোমার ভোগে সে আছে জানিলেই আপনিই মরিবে। একটা বড় পরামর্শ আছে আবজানীকে ডাক ত।

ফজরআলি আবজানিকে ডাকিল, সে মোক্তারের দাসী। নামও যেমন, মনও তেমন, দেখিতেও আবর্জ্জনা বটে। আবজানি আসিলে মোক্তার কহিল "আবজানি, বাছা একটু বিশেষ কাজ কর, শীঘ্র যা, মেহেরন্নিসার দাদীকে ডেকে আনত; ছেড়ে আসিস না।" ফজরআলি খুল্লতাতের সকল অভিপ্রায় বুঝে নাই; মেহেরন্নিসার পিতামহীকে ডাকিতে কথায় বুঝিল পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা মত মেহেরকে তাঁহাকে অর্পণ করিবেন। ফজরআলি মেহেরকে কখন দেখেন নাই। তাহার রূপ গুণের কথা শুনে পূর্ব্বে বড়ই আগ্রহ করিতেন তাহাকে পাইবেন; কিন্তু মেহেরের কাটকুড়ানী অবস্থা দেখে ও শুনে তাঁহার হতশ্রদ্ধা হয়েছিল। এজন্য তাঁহার বড় অভিমত নাই যে তাঁহার পূর্ব্ব প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। তত্রাচ যতক্ষণ না আর একবার দেখেন একেবারে অস্বীকার করিবেন না ভাবিলেন। এমত সময় মেহেরন্নিসার পিতামহী আসিল। ভয়ে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা কহিল: "আমাকে ডাকাইয়াছেন কেন?"

মোক্তার। বৃদ্ধ মাতা, আর কেন আমার সহিত বিবাদ কর, মেহেরআলির আশা করে আছ, জগতে সে আর নাই, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র কি মন্দ? তাহার সহিত তোমার মেহেরের বিবাহ দাও।"

বৃদ্ধা। আমি কি মানুষ, যে আপনার সহিত বিবাদ করিব? শাস্ত্রমতে কাহারও সহিত মেহেরের বিবাহ দাও, দিব।

মোক্তার সহর্ষ হইয়া কহিল "অবশ্য আমি অশাস্ত্র বিবাহ দিতে বলি না। কল্য মোল্লা ডাকিয়া ফজরের সহিত মেহেরের নিকাহা সম্পন্ন করিব।"

বৃদ্ধা নিকাহাতে সম্মত নহেন, এক মাত্র পৌত্রী তাহার বিবাহ (সাদী) দিবেন বড় সাধ। অতএব ভয়ে অর্দ্ধোক্তভাবে বলিলেন "নিকাহা! সাদী না হলে কি হইল! আর কি কেহ নাই?" ফজরআলি এতক্ষণ নীরব ছিল এক্ষণে নিজ অবমাননা বোধে ঈষদ্রুক্ষ ভাবে কহিলেন, "নিকাহা কি বিবাহ নহে?"

মোক্তার কহিলেন "ফজর বুঝাইবার প্রয়োজন কি? বৃদ্ধা, আমার সৎপরামর্শ শুনত যাহা বলি কর। এত দিন যদি করিতে দুঃখের মুখ দেখিতে না। আর ইহা নিশ্চয় জানিও আসগর যাহা মনে করেন করিবেনই; তবে সহমানে করিলে আপনার লাভ নচেৎ অলাভের সীমা নাই।"

বৃদ্ধা জানেন মোক্তারের ভয়ানক প্রতিজ্ঞা, কি হতে কি হয়েছেন ভাবিলেন; আমার কি হতে কি হন ভাবিলেন। অনেকক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন আচ্ছা আমি সম্মত হইতে পারি। দেখ যেন আবার মেহের সপত্নীতে পড়ে ক্লেশ না পায়; এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর ত সম্মত হই।"

মোক্তার হৃষ্ট হইয়া বলিলেন তাহার জন্য চিন্তা নাই, আমার কন্যা বড় ভাল। যাহাহউক এত দিন পরে তোমাদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী উদিত হইল এই জান। কল্য বিবাহের আয়োজন করিব, মেহেরকে এখানে আনিবে।"

পর দিন বিবাহের যাবৎ উদ্যোগ হইল, কিন্তু মেহেরন্নিসা আসিল না; তাহার নিকাহাতে সম্মতি ছিলনা; সুতরাং সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হইল। মোক্তার ব্যর্থ হইবার নহে; যথা পূর্ব্ব ফয়সালা জারি করিয়া আদালত বলে মেহেরকে ফজরের বাটীতে আনাইলেন। মেহেরন্নিসা অসহায়া স্ত্রীলোক, কি করেন অগত্যা পত্নীভাবে ফজর আলির ভবনে রহিলেন। তাঁহার পিতামহী ধর্ম্মভীত, একে পৌত্রী বিচ্ছেদে কাতর, আবার সেই সাধের পৌত্রী বিনা বিবাহে পর পুরুষ সহবাসে গেল দেখে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। শোক দুঃখে বৃদ্ধা কাল গ্রাসে কবলিতা হইলেন এবং মেহের যথার্থ বান্ধব বিহীন হইয়া পৃথিবীতে রহিলেন।

মোক্তার মেহেরন্নিসাকে এই জন্য হস্তগত করেন যে যদি ইতিমধ্যে মেহেরআলি দেশে আসে তাহার প্রণয়িনীকে পরভোগ্যা দেখে জীবনে হতাশ হইবে। কিন্তু অত বিলম্ব সহে না। বিদেশে তাহার অমঙ্গল করা মোক্তারের চেষ্টা হইল। যদি সে উন্নতি-সোপানে একবার উঠে, চাহি কি মেহেরন্নিসাকে ভুলে সুখের উপায় দেখিতে পারে। এজন্য তিনি কিছুকাল পরে ফজরআলিকে আকাবে মেহেরআলির সন্ধানে পাঠাইলেন। রকিমন্নিসার জাহাজ মোক্তারের হস্তে ছিল, সেই জাহাজে ফজরআলি অবিলম্বে আক্যাবে পৌছিল। বন্দরে পৌছিলে চট্টগ্রামী প্রবাসীরা প্রায় সকলে জাহাজে আসে। দেশগামী সঙ্গীগণকে জাহাজে তুলিতে আসে, কেহ দেশে পত্র ও টাকা পাঠাইতে আসে এবং প্রায় সকলেই দেশের কুশল জানিতে আসে।

এই সকল লোক দ্বারা মেহের আলির সন্ধান লওয়া ফজরআলির প্রধান কার্য্য হইল। সাতদিন জাহাজ বন্দরে রহিল এবং ঐ সাত দিনই ফজরআলি আগন্তুক ব্যক্তিগণের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত রহিলেন। যাহারা যাহারা জাহাজে আসিল ফজরআলি মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেককে দেখিলেন এবং ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া প্রত্যেকের বিবরণ ও প্রবাস স্থল অবগত হইলেন। অবসর মত এক এক জনের আবাসে গিয়া তাহার গল্প শুনিতেন। অনুসন্ধানে শুনিলেন নুরআলি নামক এক ব্যক্তির সহিত মেহেরআলি নামক এক জন সহবাসী ছিল। সন্ধান করিয়া জানিলেন নুরআলির বাটী ফটীকছরী, এবং সে কএক দিন হইল দেশে গিয়াছে। তদ্ভিন্ন আর কোন সংবাদ পাইলেন না, অতএব যাত্রা জন্য প্রস্তুত হইলেন।

যে দিন জাহাজ ছাড়িবেন তৎপূর্ব্ব রজনীতে ফজরআলি—খুল্লতাত মোক্তার

হইতে এক খানি পত্র পাইলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে মেহেরআলি গালিবন্দর—হইতে মেহেরন্নিসাকে পত্র লিখিয়াছে যে জলফিকর খাঁ নামক এক ব্যক্তির জাহাজে তিনি রওনা হইলেন, সঙ্গে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা আছে। উহার তথ্য অনুসন্ধান আবশ্যক। ঐ পত্র খানি যথারীতি মোক্তার আবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহার এক অনুলিপিও ফজরআলিকে পাঠাইলেন। পত্রটী ফারসীতে ছিল তাহার মর্ম্ম এই :—

"হৃদয়ানন্দদায়িনি মেহেরজান! আজ দুই বৎসর হইল তোমার প্রেমমুখ-সূর্য্য-কিরণে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি, কি অপরাধে যে তোমার অঙ্গুলিচুম্বিত-লেখনী-নিঃসৃত মধুপানে বঞ্চিত আছি জানি না। আমি প্রায় ছয় খানা পত্র দ্বারা নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছি। প্রিয়ে! শয়নে স্বপনে তোমার মূর্ত্তি আমার হৃদয়পটে বিরাজমান রহিয়াছে। আমার সঙ্গীরা এখানকার মগিনীদের সুন্দরী দেখেও আকৃষ্ট হয়; কিন্তু সত্য বলিতেছি, তোমার দাসীর যোগ্য তাহারা নহে। যে তোমায় দেখেছে সে কি আর অন্য স্ত্রীর মুখ দেখিতে চায়? প্রিয়তমে তুমি রাগ কর ক্ষতি নাই, কিন্তু কি অবস্থায় আছ কেমন আছ একবার জানাইলে এই দুঃখ-ক্লেশ-পূর্ণ হৃদয় শীতল হইত। আমি গালি বন্দরে জলফিকর খাঁর জাহাজে তব্যধিষ্ঠিত স্বর্গধামে চলিলাম, সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থ লইলাম, পঞ্চ সহস্র হইবেক। তোমার জন্য মগী অলঙ্কার ও বস্ত্র লইয়াছি। ইহাতে তোমার রাজরাণী করিতে পারিব না বটে, কিন্তু একবার শ্রীমুখ না দেখে তেজোহীন হইয়াছি তাই একবার যাইতেছি, এখন তোমার অনুগ্রহ যাহা হয়।"

পত্র পাঠে ফজরআলি বিমনা হইলেন। ইচ্ছা দেশে ফিরে যান, কিন্তু মোক্তারের কার্য্য করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ আছেন, কি করেন, গালিবন্দরে জাহাজ চালাইলেন। তথায় যাইবা মাত্র বন্দরের লোক আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল" পথে একটী জাহাজ ডুবিয়াছে দেখিয়াছ? শুনিলেন জলফিকর খাঁর জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে এবং তাহাতে মেহেরআলি রওনা হইলে অবশ্য কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে জানিয়া হৃষ্টমনা হইলেন। সত্বর সংবাদ লইয়া দেশে আসিবেন বলিয়া জাহাজ ছাড়িলেন। সেই জাহাজে বন্দর হইতে একটী লোক উঠিল তাহার নাম নুরআলি। ফজরআলি তাহাকে আপন কক্ষে লইয়া মেহের আলির সংবাদ লাভার্থ তাহার আক্যাব ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতে কহিলেন।

নুরআলি আমুদে লোক, বহুভাষী; সে আদ্যোপান্ত গল্প আরম্ভ করিল। নুরআলি আপন ঘর হইতে রওনা হইয়া যে যে পথ দিয়া যত দিনে যেখানে আসেন আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আরম্ভ করিলে ফজরআলি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন; তাহাতে নুরআলি কহিল "মহাশয় অমন করিলে আমি কিছুই বলিতে পারিব না।" অগত্যা ফজরআলি বাগাড়ম্বর সহ্য করিলেন ও নুরআলি কহিলেন—

"মহাশয়! আপনি দেখিতেছি ব্যস্তা-গ্রগণ্য। যাহাহউক স্বদেশ-বিবরণ-কৌতূহলাক্রান্ত না হইলেও হাড়ভাঙ্গ, ঢাকা, ও সমুদ্র-তটপথ বিবরণ শুনিতে অনিচ্ছুক হইবেন না।" ফজরআলি হতাশ হইয়া কহিলেন "বল তোমার যাহা ইচ্ছা হয়।"

নুরআলি কহিলেন "মহাশয়, আমি একটী খাঁর ডিঙী বাজারে আসিলাম বেলা দ্বিপ্রহরাতীত হইয়াছে, বর্ষাকাল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। খাঁর ডিঙীতে, আপনি জানেন, কিছু পাওয়া যায় না। চূড়াদধি আহার করিলাম। হাড়ভাঙ্গ ঢালার মুখ সেই। ঢালা যাইবার জন্য আমরা ২০ জন একত্র হইলাম। খাঁর দিঘিতে ওজু বানাইয়া মসজিদে নমাজ পড়িলাম, পরে আল্লা আল্লা বলিয়া ঢালায় প্রবেশ করিলাম। দুই ধারে ঘন নিবিড় বন; অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বৃক্ষলতা সমূহের নাম কেহ জানে না। কিয়দ্দুর গিয়া এক দ্বিহস্ত-পরিমিত খাত দেখিলাম। পুরাতন পথিকগণ কহিল এই হাড়ভাঙ্গ নদীর সূত্রপাত। পরে সময়ে সময়ে ঐ নদী ক্রমে বিস্তারিত আকার ধারণ করিল এবং আমরা ঐ নদীকে পাঁচবার পার হইলাম। যাত্রীরা কহিল এই বার বন ছাড়াইলাম। প্রথম প্রথম বনে প্রবেশ করিয়া মনে হইতেছিল দুইধারে লোকের বাগান। আবার বন ছাড়াইয়া গ্রামে আসিলাম। গ্রাম্য বৃক্ষাদিকে চিনা ভার। এইটী বনের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম। এই খানে হাড়ভাঙ্গকে ষষ্ঠবার অতিক্রম করিতে হয়, এখানে সাঁতার জল। আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রবনে প্রবেশ করিলাম, আবার বনকে উপবন ও উপবনকে বন বলিয়া ভ্রম হইল।" ফজরআলি আর ধীর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন "নুরআলি মেহেরআলির কথা বল ত শুনি নচেৎ আপন স্থলে যাও বিশ্রাম করগে।" নুরআলি কহিলেন "মহাশয়! আমি যত সংক্ষেপে বলিতেছি কেহ এমন পারে না, আরও কিছু শুনিলেই মেহেরের কথা পাইবেন। যদি এত অধীর হয়েন নাচার।" ফজরআলি আবার নীরব হইলেন, ও নুরআলি কহিতে লাগিলেন। "মহাশয়, সন্ধ্যাকালে আমরা এক বিস্তীর্ণ নদীতে পড়িলাম, উহা হাড়ভাঙ্গের সপ্তম অতিক্রমণ। কি করি, কষ্টে সন্তরণ দিয়া পার হইলাম। বস্ত্রাদি ভিজিয়া গেল। বাজারে উঠিলাম। দোকানীরা স্থান দিল না। হাটের চালায় আগুণ করে সকলে গল্প স্বল্পে রাত কাটাইলাম। ঝমঝমে বৃষ্টি, ঘোর অন্ধকার; মধ্যে মধ্যে দোকানীরা "ছি ছি" বলিয়া কুকুর তাড়াইতেছে। মহাশয়, এ জাহাজে আশা নয় যে সুখে খেয়ে দেয়ে শুয়ে শুয়ে আসিব, গরিব লোকের বড় কষ্ট।"

ফজর কহিলেন "বটেই ত, এই কষ্ট গেলেই বাঁচ, শীঘ্র বলে ফেল"।

নুরআলি কহিলেন "সকালে আহার করে নৌকায় উঠিলাম। মহাশয়, বলিব কি, হাড়ভাঙ্গ এবার বড় দরিয়া হয়েছে, চেনা ভার! এপার ওপার দেখা ভার। আমার

জলে কুমীর; ডাঙ্গায় বাঘ। দিন রাত্রি নাওয়া হইল না। রজনীতে সমুদ্র গর্জ্জন শুনিলাম। পার্শ্বস্থ সুন্দরবন হইতে হরিণ দল, "টউ টউ" করিতে লাগিল। ঘর ছেড়ে যে বিদেশে এলাম এই বার বুঝিলাম।"

ফজরআলি কহিল "বটেই তো ঘর ছাড়িলেই বিদেশে, পথে বিলম্বের প্রয়োজন কি? একেবারে একাবে এস না।"

নুর আলি কহিল "মহাশয়, আপনি তো বল্লেন, এ তো জাহাজ নহে, যে পাল ছেড়ে দিবে। পথটি কেমন! মাঝিরা ভয়ে বড় নদী ছেড়ে এক খালে ঢুকিল। তাহার পর, এক বিস্তীর্ণ জলে পড়িলাম, তাহার নাম "ওজনটিঙ্গা" উহার পাঁচটি মুখ। এক দিকে হাড় ভাঙ্গা নদী, এক দিকে কুতোবদ্বীপ খাড়ি, এক দিকে বাহির সমুদ্র, এক দিকে সাঁপলাপুর (যথায় জল সাঁপলার ন্যায় ফুটিতেছে) ও এক দিকে মহেশ খাল খাড়ি। কেহ ন্যূন নহে, এবং পাঁচ দিক হইতে জোয়ার এসে এখানে এমন তোড় করেছে যে মাঝি তাঁয়াদের ফিরাইবার যো নাই। নৌকা সামাল সামাল, যাত্রীদের মধ্যে তুল তামাল। আমি বড় শক্ত, বমি করি নাই।"

ফজর আলি। "ধন্য বল তোমার!"

নুর আলি। নয় মহাশয়! ওজনটিঙ্গা সমুদ্রে বলিলে হয়, কুতোবদ্বীপ দেখা যায় যেন সবুজ দুর্ব্বার চটী জলে ভাসিতেছে। সেই রজনী মহেশ খালে আহারাদি করে পর দিন প্রাতে পাড়ী দিলাম। মাঝি বেটা হাল ধরিতে জানে না; সোজা ধরেছে, আর ভাঁটার হড় হড় করে সমুদ্রের মুখে লয়ে গেল। দাঁড়ীরা বাহিতে লাগিল, "কোলা, কোলা, কোলা" বলে, কিছু হয় না। তুল তামাল, নৌকা বড় দরিয়ায় ভেসে যায়!"

ফজর আলি আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া গেলেন। পরদিন অনেক করে বুঝাইয়া নুর আলি হইতে এই সংবাদ পাইলেন যে একাবে আসিলে মেহের আলি তাহার সঙ্গ লয়, ও উভয়ে এক বাসায় থাকে। মেহেরের রোজকার নুর আলির হাতে থাকে, এবং নুর আলি একটি মাগিনী বন্দক রাখায় নিমিত্ত মেহের বিরক্ত হইয়া এক দল রেঙ্গুণ যাত্রীর সহিত, রেঙ্গুণে গিয়াছিল। তাহার পর কোন রকমে গালিবন্দরে আসিয়া জাহাজে দেশে যাইতেছিল; পথে জলমগ্ন হইয়াছে। ফজর আলি দেশে আসিয়া এই সংবাদ মোক্তারকে দিল, এবং মোক্তার তৎ সম্বাদে নিশ্চিন্ত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

মেহেরন্নিসা যে দিবস ফজর আলি ভবনে আদালত-বলে নীতা হয়েন, তাহার পক্ষান্তরে মেহেরন্নিসার পিতামহীর কাল হয়। এই ঘটনার দিন কএক

পরে একদা বেলা তিন প্রহরের সময় মেহেরন্নিসা ও ফজর আলির স্ত্রী আমীরজান খিবি বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। আমীরজান হেঁট হইয়া পান সাজিতেছেন—মেহেরন্নিসা ছল ছল লোচনে কি বলিতেছেন। তাঁহার সেই কৃষ্ণবর্ণ তারকদ্বয় জলে ভাসিতেছে—সেই কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ্ম বিকম্পিত হইতেছে। কেবল তাহাতে যে বালিকার নিশ্চিন্ততা ও নির্ভীকতা ছিল তাহা নাই। কাঠকুড়ানী অবস্থায় যে সরল অপাঙ্গদ্বারা বনবাসী যুবা উপহাসিত হইয়াছেন—অন্যমনস্কে যে নয়নদ্বয় সরলতাময় হইয়া মেহের আলির প্রতি চাহিয়া থাকিত—এখন সে নয়ন ভারি ভারি ঠেকিতেছে। শুদ্ধ দুঃখ চিন্তার ভার নহে—যৌবনের ভারও পড়িয়াছে। মেহেরন্নিসাকে আর রৌদ্রে যাইতে হয় না—অন্নাহার জন্য ক্লেশ করিতে হয় না—এবং অনাহারেও থাকিতে হয় না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে যৌবনও শনৈঃ শনৈঃ দেহকে সম্পূর্ণ করিয়াছে, সে ত জানে না এখন না আসিলে ভাল হইত। মেহের যত কেন না চাহুন, যত কেন না চিন্তামগ্না ও দুঃখিতা হউন—যৌবন বুঝে না। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে যেমন কৃষ্ণাঙ্গ গৌর করিতে অক্ষম হয়—ইহার রূপও লুকায় না। মেহের আর অঙ্গসংস্কার করেন না, তথাপি সে সুবর্ণ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। মেহের চুল বাঁধেন না, তথাপি তদীয় কেশরাশি স্বীয় স্বাভাবিক সুচিক্কণতা লাভ করিয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া অল্প অল্প পরিদৃশ্যমান মুখচন্দ্রকে অতি তেজোময় করিয়াছে। নদী যেরূপ খাল খোল পূর্ণ হইয়া জোয়ারের জলে থম থম করে—মেহেরন্নিসার দেহ যৌবনে থম থম করিতেছে। মেহেরের কি সাধ্য ওজন ঠেলেন,—কি করেন একেবারে কাল-সমুদ্রে ডুব দেওয়া বিনা উপায় নাই—এবং আশা থাকিতে কেহ জলে ঝাঁপ দেয় না। সে আশা কি?

মেহেরন্নিসা কহিতেছেন "ভগিনী, যখন আমাকে জোর করে এখানে আনিল, বুঝিলাম নরককুণ্ডে পড়িলাম, রক্ষা নাই, উপায় নাই। এক আশা ছিল, বিক্ষেপ আঘাতে প্রাণত্যাগ হইবেক;—কঠিন প্রাণ গেল না। যাহাতে যাইত তাহার উপায় করিতাম, কিন্তু এখানে স্বর্গীয় দূত এসে আমায় ডানায় ঢাকিল, আশা দিল, যাঁহার জন্য এই ক্ষুদ্র দেহ হইয়াছে তাঁহাকে সমর্পণ না করে, এ প্রাণ যাবে না। ভগিনী তুমিই সেই দূত। আবার যখন শুনিলাম—দাদী লীলা সম্বরণ করিলেন, পৃথিবীতে যে আত্মীয় আমার কেহ রহিল না বুঝিলাম, কিন্তু সত্য কহিতেছি—আমীরজান তোমার স্নেহ দেখিলে ঐ কথা মিথ্যা বোধ হয়। কিন্তু বন, তুমি অবলা, অসহায়া, কি করিবে?—আর পারিলে না, কেন বিড়ম্বনা দাও, এ কাল রূপ এ কাল যৌবন এ দেহকে ধূলিসাৎ না করে ক্ষান্ত হবে না। তোমার

স্বামী স্বচক্ষে আমায় দেখিতে চাহিয়াছেন, পোড়া শরীর কি তেমনি যে পর পুরুষকে তাড়াইবে? সত্য বলিতেছি ভাই—পোড়া দেহের রঙ্গ দেখে হাসি পায়, এই দুঃখের সময় যেন আহ্লাদে গড়াইয়া পড়িতেছে। বন বিদায় দাও, আজ রাত্রির মধ্যে যেন এ দেহ মন একত্র না থাকে, তা হলে অনর্থ হবে, এত যে তোমার ভালবাসা, যত্ন,—কৌশল,—বিফল হইবে। তুমি কি আমাকে পুরুষের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে,—না আমার জন্য চির-কালের নিমিত্ত স্বামীর বিরাগ-ভাজন হইবে?"

এতক্ষণ আমীরজান অভিনিবেশে পান সাজিতে ছিলেন, কাল আলপাকার ন্যায় সুচিক্কণ পেটে পাড়া চুল চক চক করিতেছিল। আমীরজান মাথা তুলিয়া একটী পান গালে দিলেন, একটী মেহেরকে দিলেন। মেহেরের হাতের পান হাতে রহিল দেখে আমীরজান পানটী পুনঃ নিজ হস্তে লইয়া মেহেরের গালে দিলেন ও বলিলেন "ভয় কি বন—বেটা ছেলে ত গাড়ল, তাহাদের ঠকাইতে কতক্ষণ,—দেখিও দেখি আমি কি করি।" আমীরজান মেহেরের পানে সহাস্যে চাহিলেন,—সে সহাস্য আনন দৃষ্টে মেহেরের সাহস হইল, স্ফূর্ত্তি হইল। আমীরজান মেহের অপেক্ষা সুন্দরী নহেন—কিন্তু কিঞ্চিৎ বয়োধিকা। তাঁহার মুখশ্রী চিত্রকরের কাছে অনেক দোষ-যুক্ত,—মেহেরের মুখ-চ্ছবির কাছে অনেক অংশে হীন, কিন্তু সবটী ধরিলে বড় মন্দ নহে। বিশেষতঃ সরলতা অমিয়ভাব ও স্নেহ সে মুখ-কমল-কে অনির্ব্বচনীয় প্রেমময় করিয়াছে। দেখিলে বিশ্বাস হয়, শ্রদ্ধা হয়, ভাল বাসা হয়। আমীরজানের নয়নের শ্বেতবর্ণ কিঞ্চিৎ অধিক থাকায়—চক্ষুদ্বয় যেন বড় বড় দেখায় এবং না হাসিলেও যেন হাসি হাসি দেখায়। সে মুখ সে শরীর যেন আমোদের জন্য, সুখের জন্য, পরোপকারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সস্নেহ অথচ সহাস্যভাবে রমণী মেহেরন্নিসার দাড়ী ধরিয়া এক হস্তে আলুলায়িত কেশ পাশ অপসারিত ও অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া কহিলেন, "বন! এ চাঁদ মুখ কি আমার স্বামীকে দেখাইতে পারি,—তা হলে যে জন্মের মত আমার অন্ন যাইবে।"

অনিচ্ছা স্বত্বেও মেহেরের হাসি এল—কহিলেন, "ভগিনী আপনার দোষ ঢাকে অনেক লোক, গুণকে আত্মম্ভরিতায় পরিচয় দেয় সে কিরূপ লোক?" বাস্তবিক যে মুহূর্ত্ত মেহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন আমীরজান তাঁহার সতীত্ব রক্ষণে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। শাশুড়ীকে বুঝাইলেন, এ রূপ-রাশি দেখিলে, এ সুন্দরী সপত্নী হইলে, তাঁহার সর্ব্বনাশ। ফজরআলির মাতাও বিচক্ষণ ছিলেন, বিবাহ বিনা স্ত্রী-সহবাসে পুত্রের পরকাল যাইবে ভয় করেন এবং স্নেহময়ী পুত্রবধূ আমীরজানের মনঃপীড়া দিতে কাতরা। এ জন্য তিনি পুত্রকে পরস্ত্রী স্পর্শ করিতে নিষেধ করেন, বধূর সহিত একমত হইয়া

মেহেরকে গোপন রাখিতে ও তাঁহার রূপকে ছাপিয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। আমীর-জানের উপহাসে, কৌশলে, বর্ণনায় ফজরআলি মেহেরন্নিসার যথার্থ পরিচয় পান নাই,—সুতরাং সহসা মাতা ও স্ত্রীর অনুরোধ অতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই। মেহেরন্নিসা আমীরজানের স্নেহে অতি সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন। আমীরজান বলেন তিনি আত্মরক্ষার্থ মেহেরকে রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে ও ভাবে উন্নততর ভাব প্রকাশ পায়।

কএক দিবস পরে ফজরআলি আপন স্ত্রীর কথা অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন, স্বয়ং একবার মেহেরন্নিসাকে না দেখিয়া ক্ষান্ত হইবেন না কহিলেন। আমীরজান বুঝিলেন অধিক পীড়াপীড়ি করিলে অনর্থ ঘটিবে অতএব তাহাতে সম্মতি দেন। এই কারণেই মেহেরন্নিসা কাঁদিতেছিলেন ও অনুযোগ করিতেছিলেন। অল্প কথায়ই আমীরজান মেহেরকে ক্ষান্ত করিলেন। তখন মেহের পরমাহ্লাদিত হইয়া কহিলেন "আমীরজান, তোমার ধার যে আমি কিরূপে শোধিব জানি না,—জগতে আমার যদি কিছু থাকিত সর্ব্বস্ব তোমায় দিয়া এক মুহূর্ত্তও দুঃখিত হইতাম না।" আমীরজান হাসিতে হাসিতে কহিলেন "মেহেরআলি ত আছে,—তাহাকে আমায় দিতে পার।"—মেহেরন্নিসা একটু ভাবিয়া কহিলেন "পারি।" আমীরজান বড় রসিকা অমনি মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন "না ভাই, তা বলে, আমি আমার ভাতারকে দিতে পারিব না।"

এমত সময় ফজরআলির মাতা কতকগুলি চাউল লইয়া আসিলেন, উভয়ে মস্তক আবরণ করিল ও নীরব হইল, বৃদ্ধা তাহাদের নিষ্কর্ম্মা দেখিয়া চাউল বাছিতে দিয়া গেলেন। আমীরজান চাউল বাছিতে বাছিতে বলিলেন "মেহেরজান' (ঐ নাম তিনি মেহেরের কাছে গল্পে শুনেছেন) "মেহেরআলি কেমন পুরুষ? বোধ হয় তাহার গোঁপ সবুজবর্ণ, ভ্রূ হরিদ্রাবর্ণ, চক্ষু নীল, দন্ত পাটল; আর তাহার তিনটী চক্ষু ৪টী নাসিকা ৫টী কান ও আড়াইটি হাত। মেহেরন্নিসা কিঞ্চিৎ হাসিয়া কহিলেন—"ও কি বর্ণনা, অমন কি মানুষ থাকে?" আমীরজান ঠোঁট বাঁকাইয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন "মানুষ তোমার মনের পুরুষ হ'ল—আর আমার ভাতারকে তোমার মনে ধরে না?" মেহেরন্নিসা তখন উপহাস বুঝিলেন; গম্ভীর ভাবে বলিলেন "ঠিক বলেছ ভাই, মেহের আলির মত মানুষত পৃথিবীতে দেখি নাই।" আমীরজান বালিকার ন্যায় চাপল্য ভাবে কহিলেন "আচ্ছা ভাই, বলদেখি তাহার গোঁপটী কেমন?" "মনের মত।" "নাক কাণ কেমন?" "মনের মত।" "মুখ চখ কেমন?" "মনের মত।" হাত পা গুলি?" "মনের মত" "বয়স? রূপ?" "মনের মত।"

"মনের মত ভাবিস ভাল।
ভাবতে ভাবতে দিনটা গেল।"

আমীরজান কহিল "মেহেরআলি যে তোমায় তেমনি ভাবে, তাহার বিশ্বাস কি? পুরুষ মগের মুল্লুকে গেলে কি ঘরের কথা মনে রাখে?" মেহের কহিল 'আমিত বিশ্বাস করি, কেহ যদি বিশ্বাসঘাতক হয় সে কি আমার দোষ? শুনেছি আমায় নাকি সে পত্র ও টাকা পাঠায়, তোমার বাপ আটকে রেখেছে। ভোলে নাই, ভুলিলে কি এমন করে?" "যদি তোমাকে পরপুরুষ ভবনে দেখে অবিশ্বাস করে?" "স্বধর্ম্মে থেকে যাঁহাকে চক্ষু মুদিয়া দিন রাত ভাবি, চক্ষু খুলে একবার তাঁহাকে দেখিব। এই ক্ষুদ্র শরীরটা যাঁহার জন্য এত যত্ন করে রেখেছি একবার তাঁহার হাতে সমর্পণ করিব; নালয়েন সেই খানে প্রস্থান করিব যেখানে মনের খোলা খুলি আছে এবং তাঁহার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকব।"

এত বিশ্বাস, এত গাঢ় প্রণয় দেখে আমীরজান বড়ই প্রীত হইলেন; সহসা উঠিয়া গিয়া এক খানি পত্র আনিয়া মেহেরকে দিলেন, এবং কহিলেন 'মাপ কর ভাই—সকালে এই পত্র বাবার ঘর হইতে এনেছি—তোমার জন্য দিতে ভুলেছিলাম' মেহের আস্তে ব্যস্তে পত্রটী লইলেন, শিরোনামে আপন নাম ও মেহের আলির স্বাক্ষর দেখে অশ্রুতে অন্ধদৃষ্টি হইলেন। হস্ত কাঁপিতে লাগিল এবং সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত হইল। এমত সময় আমীরজান শাশুড়ীর আহ্বানে বাহিরে গেলেন। মেহের অবসর পাইয়া পত্র খানি চুম্বন পূর্ব্বক বক্ষস্থলে রাখিয়া কিঞ্চিৎ ভাবিলেন; কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পাঠ করিলেন, আবার ভাবে মগ্ন হইলেন, আবার পত্রকে চুম্বন করিলেন, কি যে করিবেন বলা যায় না।

এমত সময় আমীরজান আসিলেন ও কহিলেন "ভাই মনচোরার কথাটা একবার আমায় শুনাবে না?" "শুন" বলিয়া মেহের পত্র পাঠ করিলেন,—তাহার মর্ম্ম এই।

"মেহেরজান, মম প্রাণ!

(মেহের) চন্দ্র এখনও তিন সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে নাই—আমি দিক্-চতুষ্টয় হইতে চারি খানা পত্র দূতে চট্টগ্রামের (মেহের) চন্দ্রের সমীপে কিঞ্চিৎ অর্থ ও সংবাদ প্রেরণ করিলাম, কেহ ফিরে এল না। জীবিতেশ্বরি! রাজরাজেশ্বরী না হইলে বুঝি বাঙ্গালের প্রতি মন উঠিবে না? আমিও তেমন করিতে না পারিলে হুজুরে হাজির হইব না। যাহা হউক এবার একটা হাসির কথা বলি।

একদিন আমি বাসায় বসে আছি। একটা মগ স্বীয় সুন্দরী যুবতী স্ত্রী লইয়া বলিল বাঁধা রেখে টাকা দিবে? বাজারে সব জিনিসের খরিদ্দার আছে। আমার বাসার এক জন লোক ইহাতে সম্মত হইল, মগ ১০০ টাকা লইয়া স্ত্রীকে ছয় মাসের জন্য রেখে গেল—তন্মধ্যে গর্ভ হলে সুদ দিবে না বলিল। মগিনী একটু কাঁদিল, পরে

কায়মনোবাক্যে বন্দক-গৃহীতার সেবায় নিযুক্ত হইল! অবিশ্বাসীর দেশে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! বিশ্বাসী লোকে সেই সওদার মন দেয় এই আশ্চর্য্য! অথবা আশ্চর্য্যই বা কি? যে চট্টগ্রামের (মেহের) চন্দ্রকে চক্ষে দেখে নাই, মগের জোনাকী আলোয় মোহিত হবে সন্দেহ কি? আমার অন্তরে যে মধুর রূপ বিরাজিত আছে,—সমগ্র মগের সৌন্দর্য্য একত্র করিলে তাহার কাছে নিষ্প্রভ। দুঃখ, চক্ষু মেলে দুই দণ্ড সেই হৃদয়-চন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম না।"

মেহেরন্নিসা ভাবিতে লাগিলেন—কেনই বা তিনি প্রাণনাথকে এমন দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন,—রাজরাজেশ্বরী হয়ে লাভ কি? কাঠ্‌কুড়ানীর সুখ কি তাহাতে হইবে? আমীরজান কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন।

"যেমন হাবী, তেমনি হাবা,
বর মিলেছে ভাল।
হাবী হাবার বিয়ে হবে, রাজচোটক হল।

সেই রজনীতে দিব্য বেশভূষা করিয়া ফজরআলি আপন গৃহে এলেন। আমীরজান তাঁহার স্ত্রী আজ সদয় হয়ে চিরসাধের মেহেরকে দেখাবেন। নবীন নায়ক চুল আঁচড়ে, আতর কানে দিয়ে, পান মুখে দিয়ে, গোঁপে তা দিতে দিতে সহাস্য বদনে কহিলেন "আমীরজান, কৈ আন।" আমীরজান ঘোমটা টেনে মান করে বসিলেন। নায়ক দায়ে পড়েছেন—মালিনীকে না সাধিলে চলে না—অনেক খোসামোদ করিলেন। শেষে রাগ করে বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা রাখিবে ত রাখ, নয় ত আর খাতির করিব না।" আমীরজান ঘোমটা তুলে বলিলেন "উঃ, আর খাতিরে কাজ নাই,—ভেড়ার খাতির চায় কে?" "আমি কি ভেড়া?" "তা না হলে আর এমন বুদ্ধি! ঘরের এমন পাকা মিষ্টি আম ফেলে পরের গাছের টকো আমে ঢিল মার?" "আমি দেখিব বৈ ত নয়—দেখিলে কি গিলে খাব?" "গেলো গিলিবে—কাঠকুড়ানীর কাঁটা ঝোড় গলায় বেধে যন্ত্রণা পেয়ো না যেন।" ফজর আলি পুনঃ খোসামোদ করে বল্লেন "লও, রঙ্গ রাখ—মেহেরকে দেখাও।" আমীরজান উপহাসচ্ছলে কহিলেন "আমার রঙ্গ কি আর ভাল লাগে? সেই পোড়ার মুখীকে দেখাই রঙ্গ" বলিয়া চলিয়া গেলেন ও বলিলেন—"তাহারে আনাই, কিন্তু দেখ গায়ে হাত দিও না—আমার অপমান করোনা।"

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে ধরিয়া টানিতে টানিতে আনিলেন ও কহিতে লাগিলেন "মর ছুঁড়ি আয় না, মিন্‌সে দেখুক তুই আমার চেয়ে কিসে ভাল।" অবগুণ্ঠনবতী আমীরজানকে ধরিয়া দরোজার ধারে দাঁড়াইলেন। ফজরআলি এতক্ষণ ভাবসাগরে ডুবে ছিলেন। যে মেহেরন্নিসাকে চেয়ে ছিলেন নিজায়ত্তে পেয়েছেন; যে স্ত্রী

প্রতিবন্ধক ছিল আজ সেও কতক সদয় হয়েছে। এক দৃষ্টে অবগুণ্ঠনবতীর পানে চাহিলেন। হস্তপদ মাত্র দেখিতে পাইলেন তাহাতে এক প্রকার মনোভঙ্গ হইল। বুঝিলেন বহুদিবস জঙ্গলে ভ্রমণ জন্য এরূপ কদাকার হইয়াছে। যাহাহউক বলিলেন "ফারসী না কি বেশ জানেন কৈ একটা শুনি।" আমীরজান বলিতে বলিলেন,—অবগুণ্ঠনবতী অতি নীরস স্বরে অশুদ্ধভারে একটী বায়েৎ আবৃত্তি করিল। ফজরআলি বুঝিলেন স্ত্রীলোকের লেখাপড়া নাম ডাক মাত্র। অতএব তিনি যাহা চান তজ্জন্য জিদ করিলেন একবার মুখটী দেখিবেন। অনেক ক্লেশে আমীরজান অবগুণ্ঠন উঠাইলেন, ফজরআলি দেখিলেন এবং অবগুণ্ঠনবতী তৎক্ষণাৎ পলাইল। মুখের চেহারা দেখে ফজরআলির স্বপ্ন ভাঙ্গিল—কহিল এই কি সেই পরমাসুন্দরী মেহেরন্নিসা?" আমীরজান কহিল "পরের মুখে যে টক খায় সেই জানে—কাটকুড়ানীর আবার কি রূপ হবে?" বলিয়া আপনি অবগুণ্ঠনাবৃতা হইলেন। ফজর কহিলেন "আবার মেঘে চাঁদ ঢাকিল কেন?" "যে ভেড়াকান্ত রূপ চিনে না তাহাকে দেখাবার প্রয়োজন কি?" ফজরআলি অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন "আমি কি মন্দ করিলাম, ঘরের আসা মাল যাচাইয়া লইয়ে বুঝিলাম ঠকেছি কি জিতেছি। তোমায় কি আমি ছাড়িতে পারি?" "ও কথায় আমি ঠকি নাই, দিব্য গাল আর সেই পোড়ার মুখীর নাম করিবে না তবে মুখ খুলিব।" "না করিব না।" "ও হবে না তোবা কাট।" "তোবা, তোবা, তোবা।" তখন আমীরজান ফজরআলির পার্শ্বে বসিয়া স্বচ্ছন্দে ক্ষুদ্র হাতটী দিয়া দেখে দিয়ে গেলেন। আমীরজান ডাকিলেন, ফজর কহিলেন বড় গ্রীষ্ম একটু বাহিরে বেড়াইবেন, আমীরও সঙ্গে এলেন, তাঁহারও ঐ জন্য নিদ্রা হয় নাই। উভয়ে অঙ্গনে পরিচারণ করিতে লাগিলেন। ফজর কহিলেন "হিম লাগিবে, ঘরে যাও।" "উঃ—বড় গ্রীষ্ম।" "রাত্রি হইয়াছে ঘুমাইবে না?" "তোমার ঘুম পাইয়াছে কি?" "না।" "আমারও না।" ফজর আলি নিরুপায় ভেবে বলিলেন, "বৈটকখানার কবাট বুঝি খুলে রেখে এসেছি—যাই।" আমীরজান কহিলেন তাঁহার সাধ ছিল একবার বৈটকখানা দেখেন—আজ শ্বাশুড়ী নাই—বাটীতে গুরুলোক নাই—সঙ্গে গিয়া দেখে আসিবেন। অগত্যা ফজর আলি স্ত্রী সঙ্গে বৈটকখানায় গেলেন,—ও কহিলেন "না, কবাট যেমন তেমনি আছে, যাও ঘরে যাও, আমি একবার বাহিরের ফুলবাগানে যাব।" "বাহিরে বাগানে যাইবারও আমার সাধ—জোৎস্না রাত্রি কেহ নাই চল না।" ফজর আলি কি করেন বাগানে গেলেন,—আমীর ফুল তুলিয়া ফজরকে দিলেন—ফজরের কিছুই ভাল লাগে না—কি অসুখ হইতেছে।

আমীর শয়ন করিতে কহিলেন সবে তিনি সেবা করিবেন। ফজর পাইখানায় যাইবেন। আমীর কহিলেন তাঁহার সাধ হইয়াছে—স্বামীর খানসামা হইবেন। স্কন্ধে গামছা—হস্তে বদনা লইয়া স্বামীর অপেক্ষায় রহিলেন। ফজর যথাসাধ্য বিলম্ব করিয়া, অবশেষে গৃহে এলেন। উভয়েই কপট নিদ্রা গেলেন। ফজর উঠিলেন—বাহিরে যাবেন—আমীর কহিলেন "আমিও যাইব।" সঙ্গে গেলেন আর এলেন,—আবার কপট নিদ্রা। যখনি ফজর উঠেন—আমীরও উঠেন। দুষ্টে দুষ্টে,—ফজর নিরুপায় হয়ে রাত্রি কাটাইলেন।

পরদিবস তিনি মাতার কাছে কুটুম্ব বাটী যাইবেন ও রজনীতে আসিবেন না কহিলেন। সহসা অর্দ্ধ রজনীতে গৃহে আসিলেন। বেড়া দিয়া দেখিলেন নিজ গৃহে আলোক জ্বলিতেছে—শয্যায় আমীর জান নিদ্রিতা রহিয়াছেন। আস্তে আস্তে শূন্য পদে ফজর আলি মেহেরের শয়ন গৃহে গেলেন। মেহেরও শয্যায় শয়িত—গৃহে আলোক জ্বলিতেছে। ফজর বড় ঘরে আসিলেন—বহির্ভাগ হইতে ঝাঁপ বাঁধিলেন। বাহিরের দ্বারও আবদ্ধ করিলেন যে গোল করিলে বহির্ব্বাটী কি অন্তঃপুরের পরিচারকগণ না আসিতে পারে। আমীরজানের ঘর বাঁধিয়াছেন সেও আসিতে পারিবে না। আস্তে আস্তে মেহেরের ঘরের ঝাঁপ খুলিলেন মেহের জাগিল না। আনন্দে করিল। লম্পটের অভিসন্ধি ঘটিল—এখন সহজে না হয় বলে ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে, তাহার পর যাহা হয়। ফজরআলির মস্তক ঘুরিতে লাগিল, পা চাপিতে লাগিল সহসা ভূমে বসিয়া পড়িলেন। ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারেন না পাছে মেহের অনায়ত্তে জাগিয়া উঠে।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ফজর শয্যায় উঠিতে চেষ্টা করিলেন। সহসা রমণী উঠিয়া বসিল, বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া বসিল। ফজরআলি থমকে দাঁড়াইলেন। মেহের যে চীৎকার করিল না—পলাইল না, ইহাতে আশান্বিত হইয়া কহিল "সুন্দরী ক্ষমা কর, তোমার জন্য আমি আজ ছয় মাস আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছি। আর বাল্যকাল হইতে তোমার রূপ মাধুরী দর্শনে লোলুপ আছি। স্বয়ং বিচারপতি আমাকে তোমার সমর্পণ করেছেন, তাহাতে দোষ কি? সদয় হও। সুন্দরী আর একটু ঘোমটা টানিলেন ও ফিরিয়া বসিলেন। ফজর অনেক চাটুবাদ ও মধ্যে মধ্যে ভয় প্রদর্শন ও করিলেন। অবশেষে পদধারণ করিতে গেলে রমণী পা গুটাইয়া লইলেন। ফজর শয্যায় বসিবার উপক্রম করিলে—রমণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন ফজর হাত ধরাইয়া বলপূর্ব্বক বসাইল এবং যেমন তাহার প্রতি বল প্রকাশের উদ্যম করিল—সহসা রমণী অবগুণ্ঠন তুলিয়া কহিলেন "ছিছি! ধিক্ তোমায় তোমায় ধিক্।" ফজর-

এ মেহের নহে আমীরজান। আমীরজান তাহার স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়াছিল। এই জন্য আপন শয্যায় বালিকাকে বস্ত্রাবরণ করিয়া শয়ান রাখিয়া ও মেহেরকে এক নিভৃত স্থলে লুকাইয়া মেহেরের শয্যায় কপট নিদ্রায় ছিল। আমীরজান নিজ মুখ খুলিয়া স্বামীর মুখের কাছে ধরিলেন; কহিলেন "দেখ দেখি এমন মুখ কোথা পাবে—স্বর্গে গিয়া পাও কিনা সন্দেহ! ভাগ্যে নাই, তাই এদিক্ ওদিক্ চাও।" সেই বচনের সহিত কটাক্ষ বাণে সেই মুখভঙ্গীর সহিত হাস্যভাবে ফজরআলি মোহিত হইলেন। আমীরের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া এক হস্তে তাঁহার হস্ত ধরিলেন ও অমিয় ভাবে বলিলেন "প্রিয়ে, রাগ করিও না, আমি কি তোমাকে অবহেলন করিতে পারি, না করেছি? এবার হতে যাহা বলিবে করিব।"

আমীরজান জয়ী হইলেন—সখীর বিপদ কৌশলে মোচন করিলেন। এক জন রমণী কাষ্ঠ বেচিতে আসিত—তাহাকে মেহের হইতে কিছু বাএত শিখাইয়া অর্থের বশীভূত করিয়া অবগুণ্ঠনবতী সাজাইয়া দিলেন। ঐ অবধি ফজরআলি আর মেহেরের নামও করিতেন না। পরে মোক্তারের অনুরোধে মেহেরআলির অনুসন্ধানে যান। তথায় মেহেরআলির পত্র দৃষ্টে সন্দেহ হয়, তিনি যাহাকে দেখেছেন সে প্রকৃত মেহেরন্নিসা নহে। গৃহে আসিয়া কেবল অনুসন্ধানে রহিলেন কিসে মেহেরকে গোপনে দেখিতে পান। একদা মেহেরন্নিসার আলুলায়িত কেশ-রাশি আমীরজান বল-পূর্ব্বক ধরিয়া আঁচড়াইতেছেন। ফজরআলি বেড়ার ছিদ্র দিয়া দেখিলেন—কেশরাশির অভ্যন্তরে অপূর্ব্ব রূপ বিকীরিত হইতেছে। সহসা মুখের চুল আমীরজান সরাইল,—ফজরআলি যাহা দেখিলেন স্বপ্নে কখন দেখেন নাই। আর ফজরআলি স্ত্রীর প্রতি আস্থা রাখিলেন না। কিসে মেহেরকে হস্তগত করিবেন—নিজে নিজেই ভাবিতে লাগিলেন। মেহের তাঁহার মাতার শয্যায় শয়ন করে, মাতাকে পৃথক্ করিতে পারিলে হয়। ফজর কৌশল করিয়া মাতাকে কুটুম্ব বাটীতে পাঠাইলেন। মেহের সঙ্গে গেলে কুটুম্ব স্থলে অখ্যাতি হইবে বলে সে সঙ্গে যাইতে পাইল না।

সে রজনীতে সখীর রক্ষার জন্য আমীরজানের নিদ্রা নাই। ফজরালিরও নিদ্রা নাই। তিনি রাত্রি করিয়া ঘরের দিকে এলেন আমীরজান ঘুমাইয়াছে কি না?—দেখিলেন আমীরজান বসিয়া আছে। এই রূপে বার বার পরাভূত হইয়া ফজরআলি আর বল ও কৌশল উপায় ছাড়িয়া স্পষ্টতঃ আপন মাতাকে কহিল বহুদিন স্ত্রী বলিয়া একজন স্ত্রীলোক যে বাটীতে আছে তাহাকে পরের ন্যায় রাখা অনুচিত। তাহার মাতা নিকাহা করিতে অনুমতি দিলেন এবং মোল্লা আনিয়া বিবাহের উদ্যোগ হইল। মেহেরন্নিসা সাবালিকা তিনি অসম্মত, সুতরাং নিকাহা

অশাস্ত্রীয় বলিয়া মোল্লা সম্পন্ন করিল না। তবে মহম্মদীয় শাস্ত্র মতে ক্রীতদাসী সহবাসে বিবাহ আবশ্যক নাই। মেহের-স্নিসার উপর ভিক্রী করিতে শতেক মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে, সেই ডিক্রীতে বল পূর্ব্বক তাহাকে আনা হইয়াছে, সুতরাং মেহের শাস্ত্রমতে ফজরআ-লির দাসী সাব্যস্ত হইল। ফজরের মাতা মেহেরের অসম্মতিতে বিরক্ত হইয়া ঐ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিলেন। তদবধি মেহেরের অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। আমীরজান যত কেন করুন না—দাসীদের সহিত মেহেরকে শয়ন করিতে হইল ও গৃহকার্য্য করিতে হইল। মেহের সম্মার্জ্জনী হস্তে কর্ত্তৃ গৃহ সংস্কার করিতে গিয়া দেখিলেন, আমীরজান সব সম্পন্ন করে রেখেছেন—আমীর তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহি-লেন এ ঘর আমি করে রেখেছি, আমার ঘরে চল। মেহের জানেন আমীরের জন্য তাঁহার কাজ করিতে হয় না। তত্রাপি কি বলিবেন ভাবিতেছেন, এমত সময় আমীরজান তাঁহার হাত ধরিয়া আপন ঘরে লইয়া গেলেন। মেহেরকে ধরিয়া বিছানায় বসাইলেন, মেহের কহিলেন "বন, এখন আমি দাসী, আর কেন আমার সহিত সখ্যভাব?"

আমীর কহিলেন "সে কি বন, ও রূপের গোলাম যিনি, তাঁহার দাসী আমি, কবে যে তুমি বিছানায় শোবে, আর আমি তো-মার পা সেবা করিব,—ভেবে মরিতেছি।"

মেহের। না ভাই তাহার চেয়ে আমি আছি ভাল। এরূপ থাকিতে পারিলেও একরূপ জীবন কাটে। বন্ মনে, হয় দেহটাকে খুব কষ্ট দেই, ভেঙ্গে যাউক, কিন্তু ভাঙ্গে না।

আমীর। না না—এখন ভাঙ্গিবে কেন? যাহার জন্য দেহ রেখেছ সে ত ভুলে নাই। বাপের বাটীতে শুনে এসেছি—মেহেরআলি ২০০০ টাকা তোমায় পাঠাইয়াছে, বাবা তাহা লইয়া-ছেন,—লউন, সে দেশে এলে যে আরও টাকা আনিবে তাহার সন্দেহ নাই।

মেহের শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন "বন তোমার ভাল হউক, বল বল, আবার কল, কিরূপে জানিলে?"

আমীর। আমি মার কাছে শুনি-লাম সেখান হইতে ২০০০ টাকা কল্য এসেছে, আর আবজানি এক খানা পত্রের খাম এনে দেছে, তাহাতে তোমার নাম লেখা দেখিলাম।

মেহের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আর কি বন সে কপাল হবে?"

মেহের এক চালায় শয়ন করে,—তাহার রক্ষার জন্য আমীরজান সতত সজাগ থাকেন। একজন দাসীও মেহে-রের দ্বারে রক্ষক স্বরূপ থাকে, এজন্য ফজরআলি—মাতার শয্যা হইতে তাড়া-ইয়াও—অদ্যাপি মেহেরকে আক্রমণ করিতে পারেন নাই।

একদা রজনীতে মেহেরের সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন গৃহে আলোক আসি-

য়াছে—এবং যাহাকে ভয় করেন, সেই ফজরআলি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মেহের ভয়চকিত স্বরে দাসীর নাম ধরিয়া ডাকিলেন ও শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ফজর কহিলেম "সুন্দরি! ভয় নাই,—ভয় নাই,—আমি চোর নহি, দস্যু নহি, ব্যাঘ্র নহি, রাক্ষস নহি। মনুষ্য—তোমার রূপের দাস। কৃপা কর—অতিথি গৃহে—বিরতা হইও না।" মেহেরের মস্তক ঘুরিল—ঘন ঘন দাসীকে ডাকিলেন। দাসী দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল "কি হইয়াছে?"

ফজরআলিকে গৃহে দেখিয়াও যে দাসী নির্ব্বোধের ন্যায় ঐ প্রশ্ন করিল, তাহাতেই মেহেরের ভয় জন্মিল, তত্রাপি কাতর ভাবে কহিল "আমীরজানকে ডেকে আন,—আমার বড় ভয় হইতেছে।" ফজরআলি তৎসঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল,—মেহের ভাবিলেন নিষ্কৃতি পাইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুষ্ট পুনঃ গৃহে প্রবেশ করিল। মেহের কি করিবেন ভাবিতেছেন এমত সময় দাসী আসিয়া কহিল "বহুঠাকুরানী বলিলেন, তিনি আর রোজ রোজ কি করিবেন, আপনার যাহা হয় করুন।" শুনিয়া মেহেরের মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল, তথাপি দাসীর কথা বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং আমীরজানকে অনেকবার ডাকিলেন, উত্তর নাই। ফজরআলি কহিলেন "প্রেয়সি, কেন ক্লেশ কর,—আমি স্ত্রীর অনুমতি না লয়ে কি এসেছি? তুমিও ত আমার পত্নী, তবে আমাকে প্রত্যাখ্যান কর কেন?"

মেহের। পত্নী কিসে হলাম?

ফজর। কেন আদালতে সাব্যস্ত হইয়াছে—আবার কি?

মেহের। তাহাতে আমার কি? আমি কি সাব্যস্ত করিতে গিয়াছিলাম? আর ফয়সালায় কি কাহারও বিবাহ হয়?

ফজর। না হয়, নাই হইল; এক্ষণে তোমার উপর ত আমার অধিকার আছে?

মেহের। কি অধিকার?

ফজর। তোমাকে টাকা দিয়া বল করে ঘরে এনেছি,—ইহাতে তুমি আমার দাসী হইয়াছ। দাসীর শরীর প্রভুর আয়ত্তাধীন। তোমার ইচ্ছা না থাকুক, তোমার শরীরভোগে আমার কি তোমারও পাপ নাই।

মেহের। এমন শাস্ত্র কে শিখালে? আপনি জ্ঞানী, কেন বিড়ম্বনা করেন? আমাকে ছাড়ুন আপনার পায়ে পড়ি।

বলিয়া মেহের কাঁদিয়া পায়ে পড়িলেন। ফজর "উঠ উঠ" বলে হাত ধরিয়া তুলিতে গেলেন;—কহিলেন "অনুগত হও, যাহা কহিবে দিব, নচেৎ অদ্য রাত্রিতে নিস্তার নাই।"

মেহের নিতান্ত ভীতা হইলেন; বিছানার পার্শ্বে গিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ফজর শয্যার দিকে আসিতে লাগিল দেখে—মেহের উঠিলেন। বদ্ধ। নিরুপায়ভাবে বলিলেন শয়, পরমেশ্বর জানেন আমি

জন্য কত চেষ্টিত ছিলাম; এক মাত্র সহায় আমীরজান,—আজ তিনিও বিমুখ হইলেন। সব আমার কপালে হয়। যাহাহউক—আমার একটী ভিক্ষা, এক দিন সাবকাশ দিন,—কল্য মোল্লা ডাকান, আমি সম্মতি দিব এবং আপনি নিকাহা করিবেন।" লম্পট অনেক সন্তুষ্ট হইল—এবং কহিল "এই ঠিক পরামর্শ,—অনেক দিন ত বলেছিলাম। যাহাহউক তাহাই হইবে,—এখন এ রাত্রি অতিথি সৎকার কর, কল্য বিবাহ করিব।"

মেহের। সে কি? তাহাও কি হয়?

ফজর। কেন? লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দোষ কি? আর দোষ হউক বা না হউক,—আজ ফিরিব না।"

মেহের সঙ্কল্প বুঝিয়াছিলেন, আর বিতণ্ডা করা বৃথা জানিয়া কহিলেন "নিতান্তই ছাড়িবেন না তবে বসুন।" বলে একটী মোড়া বসিতে দিলেন। ফজর যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,—"এইত, অমন রূপ কি নির্দ্দয় হইতে পারে?" মেহের তামাকু সাজিয়া দিলেন,—ফজর হুকা লইয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। মেহের কহিলেন "অধিনীর শয্যা অতি হীন, বেশ মলিন, দেহ অপরিষ্কার—অদ্য ক্ষমা করুন, কল্য পরিষ্কার হয়ে থাকিব।" ফজর ভুলিবার নহে,—গে খুলিয়েন, দাসীকে ডাকিয়া কহি-যে তাঁহার উত্তরীয় শয্যায় পাতিয়া মার পা মেহেরকে কহিলেন "প্রিয়ে, তোমার রূপ ও মধুর বচনে প্রীত হইয়াছি—চাঁদের কি গহনা চাহি? মেঘেও চাঁদের ক্ষতি হয় না।"

মেহের কহিলেন "আপনার না হউক—আমার অসুখ হইবে। আমার ত অদ্য বিবাহ। নিদান গাত্র মার্জ্জন করিয়া এক খানি ভাল কাপড় পরি। আর আমাকে বহির্দ্দেশে যাইতেই হইবে।"

ফজরআলি দ্রবীভূত হইয়াছেন,—আর অবিশ্বাস করেন না,—বিশেষতঃ যে দাসী তাঁহার বশীভূত আছে তাহাকে লইয়া মেহের বহির্দ্দেশে গেলেন। ফজরও খিড়কী পর্য্যন্ত গেলেন। মেহের এক বাঁশ বাগানে গেলেন,—সর্ব্বদা ভয় করিতেছে বলে দাসীর সাড়া লইলেন। ফজর তাহাতে নিশ্চিন্ত হইলেন—মেহের পলাইবেন না। পরে, বহুক্ষণ পরে মেহের ঘাটে এলেন। ফজর নিশ্চিন্ত হইলেন। এমত সময় বৃষ্টি আসিল। ফজর ঘরে এলেন,—দাসী ছায়ায় দাঁড়াইলেন। অনেক ক্ষণ বৃষ্টি হইল,—মেহের আসিল না,—দাসী ডাকিল, উত্তর নাই। বৃষ্টি থামিল,—ঘাটে মেহের নাই। দাসী দৌড়িয়া ফজরকে সংবাদ দিল, ফজর লণ্ঠন হস্তে ঘাটে খুঁজিলেন। মেহের জলমগ্না হইয়াছে দৃঢ় বিশ্বাস হইল। ফজর জলে নাবিলেন, সমস্ত খুঁজিলেন,—মেহের নাই। এমত সময় রাত্রি প্রভাত হইল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

জাতীয় সঙ্গীত—প্রথমভাগ। স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীতমালা। জি পি রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ উনত্রিশটী জাতীয় সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে গুটি কত এত উৎকৃষ্ট যে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—সে গুলির প্রত্যেক অক্ষর, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক বাক্য এবং প্রত্যেক ভাব, আমাদিগের হৃদয়ের সহিত যেন তারে তারে গাঁথা রহিয়াছে। সে গুলি আমরা কতবার পড়িয়াছি, কতবার শুনিয়াছি, এবং কতবার আপন মনে গাইয়াছি, কিন্তু যতবার পড়ি, যতবার শুনি, এবং যতবার গাই, প্রতিবারই যেন নূতন বোধ হয়; প্রতিবারই যেন আমাদিগের হৃদয়ের গূঢ়তম যন্ত্র সকল বাজিয়া উঠে। পাঠক! আমরা সত্য বলিতেছি, কি মিথ্যা বলিতেছি, তাহা আপনারা পাঠ করিয়াই অনুভব করুন্ :—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত সন্তান,
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান॥

২

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোবন
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী,
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন ॥
হোক্ ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৭

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ॥
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী নট-বেহাগ *—তাল ঝাঁপতাল।

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি ॥
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী লগ্নী—তাল জৎ।

(হিন্দুস্থানী ধরণে গান করিতে হয়)

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ! ও ॥ ধ্রু
কত কত সুন্দর, নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নব অম্বর ও ॥
যুগ যুগ বাহি, প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ্বুদ, সহ কত রাজা
পরকাশিল লয় পাইল ও ॥
কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা
ভূত সে ভারত গাথা ও ॥
তব জল কল্লোল, সহ কত সেনা
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি সব নীরব, রে যমুনে সব
গত যত বৈভব, কালে ও ॥
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব কুরুকুল শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ গজ ভারে
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ॥

* রাগিণী তিলক কামোদেও গাওয়া যায়।

তব জল তীরে, পৌরব যাদব
পাতিল রাজসিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি
ভারত স্বাধীন যে দিন ও॥
দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ পতাকা
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম ভাতারে
ভারত স্বাধীন যে দিন ও॥

* * * * *

কভু শত ধারে, এ উভ পারে
পাঠান আভ্‌গান মোগল ও।
ঢালিল সেনা ত্রাসি নিবাসী
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও॥
অহ! কি কুদিবসে গ্রাসিল রাহু
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল উলটী পালটি
লুঠি নিল যা ছিল সার ও॥
সে দিন হইতে শ্মশান ভারত
পর-অসি-ঘাত-নিপাতে ও।
সে দিন হইতে অন্ধ মনোগৃহ
পরবল-অর্গল-পাতে ও॥
সে দিন হইতে তব জল তরলে!
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে ভারত নারী
অবরোধ অবরোধিত ও॥
সে দিন হইতে তব তট গগনে
নূপুর নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে সব প্রতিকূলে
যে দিন ভারত বন্ধন ও॥
গোবিন্দচন্দ্র রায়।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

কত কাল পরে বল ভারতরে,
দুখ সাগর সাঁতরে পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে,
নিজ বাস ভূমে পরবাসী হলে,
পর দাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধন রত্ন সুখে,
বহ লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর দীপ মালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।
(গোবিন্দ চন্দ্র রায়।

আমরা স্থানাভাবে আর অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যে কয়েকটী উদ্ধৃত করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত হইলাম তাহার মধ্যে ভারতে যবনের "দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্র-কন্দরে বসি", ভারত সঙ্গীতের "বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে", সরোজিনীর "দেখ্‌রে জগৎ মেলিয়ে নয়ন", এবং বীরনারীর "না জাগিলে সব ভারত-ললনা" এই কয়েকটী প্রধান। যাহা হউক যাহা তুলিলাম তাহাতেই পাঠকগণ আমাদিগের প্রশংসার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন।

সংগ্রহকার এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত-মালা স্বজাতি গলে অর্পণ করিয়া গভীর সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর গলদেশ এই অপূর্ব্ব দেব-আভরণে ভূষিত দেখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গবাসী স্বজাতি-ভাষায় বীতশ্রদ্ধ। তাহারা যে সকলে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া এই অমূল্য—দেবদুর্ল্লভ—মালা পরিধান করিবে, আশা করা যায় না। যাঁহাদিগের হৃদয় অগ্রেই স্বদেশানুরাগে বিগলিত

হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারাই যত কেন মূল্য হউক না দিয়া অবশ্যই ইহা পরিধান করিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাঁহাদিগের বিগলিত হৃদয়কে পুনর্ব্বার বিগলিত ও উত্তেজিত করাও এ মালা গাঁথার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। যাহাদিগের হৃদয় স্বদেশানুরাগ বিষয়ে এখনও পাষাণবৎ রহিয়াছে, সেই পাষাণ দ্রব করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বিনামূল্যে বা অতিশয় স্বল্প মূল্যে বিক্রীত না হইলে আর সে উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই-জন্য আমরা সংগ্রহকারকে পরামর্শ দিই হয় তিনি চাঁদা দ্বারা ইহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বিনামূল্যে ইহা কুটীরে কুটীরে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বিতরণ করুন, নয় শুদ্ধ ব্যয়মূল্যে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র বিক্রয়ার্থ ইহা প্রেরণ করুন। এই দেবদুর্লভ সঙ্গীতগুলি রমণী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত হইলে হৃদয়কে যে কি পরিমাণে আর্দ্র করে, তাহা গ্রেট্ ন্যাসানেল নাট্যশালার সহৃদয় শ্রোতৃ মাত্রেই অবশ্য অনুভব করিয়াছেন। এই জন্য আমাদের বড় বাসনা যে কতিপয় স্বদেশহিতৈষিণী মনস্বিনী রমণী সন্ন্যাসিনী বেশে এই সকল স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত গাইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। কোন বিষয়ে সহস্র বক্তৃতা কর, অগণ্য গ্রন্থ রচনা কর, জনসাধারণের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে না; কিন্তু সেই বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট গান কর—সকলেরই হৃদয় বিগলিত হইবে—পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। ধর্ম্মযাজক বেদির উপর বসিয়া অসংখ্য বক্তৃতা করিলেন, নরকের ভয় দেখাইলেন, ঈশ্বরকে ভীষণ সংহারমূর্ত্তি প্রদান করিলেন, পাপীর হৃদয় বিগলিত হইল না; কিন্তু বক্তৃতা শেষ হইলে যেই বাদ্য বাজিয়া উঠিল, এবং বাদ্যের সহিত একতানে যেই ভক্তিরসের গান গীত হইতে লাগিল, অমনি পাপীর হৃদয়-কবাট উদ্‌ঘাটিত হইল, চক্ষু বহিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। এইরূপ সকল বিষয়েই বক্তৃতা এবং গ্রন্থ রচনা অপেক্ষা সঙ্গীতের শক্তি অধিকতর বলবতী। সেই সঙ্গীত আবার রমণীকণ্ঠবিনিঃসৃত হইলে সহস্রগুণ অধিকতর শক্তি ধারণ করে। এই জন্যই আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত বাসনা। এরূপ বাসনা আপাততঃ অতি অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতে পারে; কিন্তু সে দিন অতি দূরবর্ত্তি নয়, যে দিনে এরূপ সন্ন্যাসিনী গণের বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে ভারতের চিরনিদ্রিত অধিবাসিগণ জাগরিত হইবে।

সংগ্রহকার এরূপ আশা দিয়াছেন যে তিনি সামাজিক ও বিশুদ্ধ প্রণয় ঘটিত সঙ্গীত সকল সংগ্রহ করিয়া জাতীয় সঙ্গীতের অপর ভাগ প্রকাশ করিবেন। এক্ষণে প্রার্থনা আমাদিগের এই আশা যেন অচিরাৎ ফলবতী হয়!

শরীর ও মন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অনেকে আপত্তি করেন যে মন যদি শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইল, তবে সকলের মন সমান হয় না কেন? তাঁহারা কহেন,—"তোমরা বলিতেছ, মন সামান্য জড় পদার্থ হইতে উৎপাদিত হইতে পারে না। তর্কের কারণ তাহা স্বীকার করিলাম। স্বীকার করিলাম যে চেতন পদার্থ সামান্য জড় পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না; জড় পদার্থ শারীর পদার্থ রূপে পরিণত না হইলে কখন চেতন পদার্থের উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে। মন যখন শারীর পদার্থ হইতে সমুদ্ভূত হইতেছে, তখন একই শারীর-পদার্থ-সমুদ্ভূত বিভিন্ন-শরীরস্থ মনের এত ভেদাভেদ লক্ষিত হয় কেন? এক জন বন্য অসভ্য ব্যক্তির শরীরে যে শারীর পদার্থ, এক জন বিজ্ঞতম সুসভ্য মহাজনের শরীরেও সেই শারীর পদার্থ। কিন্তু ইহাদিগের পরস্পরের মানসিক প্রকৃতি বীর্য, চিন্তা, বিবেচনা, প্রভৃতির বিচার করিয়া দেখিলে অনুমান হইবে, যেন ইহারা দুই জনে স্বতন্ত্র প্রকার জীব; দুই জনেই এক মনুষ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। আবার দেখুন কোন বিষয় আপনি দেখিলেন, দেখিয়া বিচার করিলেন, আমিও দেখিলাম এবং বিচার করিলাম; কিন্তু আমাদিগের পরস্পরের সিদ্ধান্ত ও মত হয়তো সম্পূর্ণ বিভিন্ন অথবা বিপরীত হইয়া উঠিল। অন্যদিকে দেখুন, যাঁহারা বালক বালিকাগণের অধ্যাপনা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সকলে সমভাবে কখন শিক্ষিত হয় না, উহাদিগের পরস্পরের মানসিক শক্তি ও প্রকৃতি এত বিভিন্ন যে এক জন যাহা বুঝিতে পারে অন্য জন তাহা বুঝে না, এক জন যে সময়ের মধ্যে এক বিষয় শিক্ষা করে, অন্য জন সে সময়ের মধ্যে তাহা কখনই শিখিতে সমর্থ হয় না। সমান পরিশ্রম করিলেও সকলের সমান উন্নতি হয় না। আরও বিবেচনা করিতে হইবে, যে মন যদি শরীর-সমুৎপন্ন হইল, তবে সেই শরীরের স্ফূর্ত্তি অনুসারে মনেরও স্ফূর্ত্তি হয় না কেন? যুধিষ্ঠির অপেক্ষা ভীমের বুদ্ধি বিবেচনা ও বিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠতা অবলক্ষিত হয় নাই কেন? প্রত্যুত: দুর্ব্বল অপেক্ষা বলবান্ এবং কৃশ অপেক্ষা স্থূল ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতির উৎকর্ষ কখনই প্রতিপাদিত হইবে না। অতএব এক-শারীর-পদার্থ-সমুৎপন্ন মনের ধর্ম্মাদির যখন এতদূর প্রভেদ প্রমাণিত হইতেছে, তখন বিভিন্ন-শরীরস্থ মনের উৎপত্তি কারণ কিরূপে একই শারীর পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি? ঈশ্বর

ইহাদিগকে বিভিন্ন-প্রকৃতি বিশিষ্ট করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং মনুষ্য মাত্রেই তাহার বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়।" এই আপত্তি কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা বিচার করা যাইতেছে।

আমাদিগের আপত্তিকারীর অর্থ এই, যে, মন যদি দৈহিক উৎপত্তি হইত, তবে একই কারণের ফল সমূহে এত প্রভেদ ঘটিত না এবং শারীরিক স্ফূর্ত্তি অনুসারে মনেরও স্ফূর্ত্তি হইত; কিন্তু যখন এরূপ হয় না, তখন শরীরকে মনের ব্যুৎপত্তি কারণ বলা যাইতে পারে না।

অনুমান তর্ক দ্বারা * দর্শন শাস্ত্রের অনেক অনিষ্ট সাধন হইয়াছে। এই অনুমান প্রণালী অবলম্বন করিয়া মন সহসা প্রমাদে পতিত হয়। আমরা এক বিষয়ে যে প্রকার নিয়ম দেখি, সেই নিয়মের জ্ঞান মনে মনে সর্ব্বদাই এত জাগরূক থাকে, যে সর্ব্বপ্রকার বিচারেই সেই জ্ঞান প্রবিষ্ট হইতে চাহে। আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পিতার নিকট আহার প্রার্থনা করি এবং জনক আমাদিগকে আহার প্রদান করেন। আমরা এই পার্থিব নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের নিকট সুখের জন্য প্রার্থনা করিতে যাই, যেন প্রার্থনা করিলেই ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ প্রদান করিবেন। তদ্রূপ পক্ষিশাবককে ডিম্ব হইতে বিনির্গত হইতে দেখিয়া বিশপ বট্‌লারের সহিত অনুমান করি, মৃত্যুর পর মনও একদা দেহ হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে। এই প্রকার এক বিষয়ের নিয়ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে আরোপ করিয়া, মনে করি সেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ও সেই একই নিয়মাধীন; সুতরাং নানা ভ্রম প্রমাদে নিপতিত হই। এক বিষয়ের নিয়ম যখন অন্যবিধ বিষয়ে প্রয়োগ-যোগ্য বলিয়া অনুমান করি, তখন হয়তো বিচার করি না সেই অপর বিষয়ে তাহা বাস্তবিক প্রযুক্ত হইতে পারে কি না। সাবধান না হইলে এই প্রকার অনুমান দ্বারা মন সহসা প্রতারিত হইয়া যায়।

আমাদিগের আপত্তিকারীও এই প্রকার অনুমান দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন একই বৃক্ষজাত ফল সমূহে যেমন রসের বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না এবং কোন বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ একই-শরীর-পদার্থ-সমুৎপন্ন মনের তারতম্য ঘটিতে পারে না। কিন্তু তিনি কি দেখেন নাই, সকল বৃক্ষই উদ্ভিদ-পদার্থ-সমন্বিত, অথচ বিভিন্ন-বীজ-জাত বৃক্ষ ভেদে ফলের তারতম্য কেন ঘটিয়া থাকে। শরীর ও মন সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। আচার্য্য যে তদীয় শিষ্য-মণ্ডলীর সকলকেই সমান-ধীশক্তি-সম্পন্ন দেখেন না তাহার কারণ এই। কিন্তু ইহাতেও একটি কূট তর্কের নিরাসন হইল না। যদি একই বীজের ফল সমান হওয়া প্রাকৃত নিয়মাধীন, তবে ভ্রাতৃগণের মধ্যে মানসিক শক্তির এত তারতম্য কেন ঘটিয়া থাকে? একই-জনক-জননী-সম্ভূত

* Reasoning from analogy.

শরীর হইতে ভ্রাতৃগণের মানসিক ধর্ম্ম কেন বিভিন্ন হইয়া যায়, তাহার কতিপয় কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ। ভ্রাতৃগণের মানসিক শক্তির বিভিন্নতা থাকিলেও তাহাদিগের বংশ-সম্ভূত কতকগুলি মানসিক লক্ষণ সমান থাকে। এই বিশেষ মানসিক লক্ষণ গুলি কি প্রকার তাহা পূর্ব্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই লক্ষণ গুলিতেই তাহা-দিগের জনক জননীর একত্ব প্রতিপাদন করিয়া দেয়। অতএব এই লক্ষণ সমূহ অবশ্য বীজ-জাত বলিতে হইবে। তবে একই বীজ-জাত-বৃক্ষের ফল সমূহে, অন্য কারণ বশতঃ পরস্পর কথঞ্চিৎ তারতম্য ঘটিলেও তাহাদিগের যে কতিপয় প্রধান ধর্ম্ম সাধারণতঃ সর্ব্ব ফলেই বিদ্যমান থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। যেমন সূর্য্যরশ্মির অভাব এবং বিদ্যমানতা হেতু একই বৃক্ষের ফলে বর্ণাদির বিভিন্নতা ঘটিলেও রসের অল্পই তারতম্য ঘটে। তদ্রূপ অন্যান্য কারণ বশতঃ ভ্রাতৃগণের মানসিক অবস্থার বিভিন্নতা ঘটিলেও তাহাদিগের রাগ, দ্বেষ, ঔদার্য্য, মহত্ত্ব, প্রখর বুদ্ধি প্রভৃতি কোন একটী বিশেষ লক্ষণ দ্বারা যে সর্ব্ব জনকেই এক-কুল-সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেয় তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। পুত্রোৎপাদন সময়ে জনক জননীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভেদ হেতু পুত্রেরও শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে। শারীরতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন জনক-জননীর শারীরিক ধর্ম্মের উপর তাহাদিগের সন্তান সন্ততির শারীরিক অবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে। জনক জননীর শারীরিক অবস্থা আবার তাহাদিগের মানসিক অবস্থার প্রভাবে প্রচলিত হয়। কারণ মনের সহিত শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; মন সুখী হইলে শরীর প্রস্ফুরিত হয়, মন শোক-সন্তপ্ত হইলে শরীরও তৎসঙ্গে শুখাইতে থাকে। সুতরাং জনক জননীর মানসিক অবস্থার উপর তাঁহাদিগের শারীরিক অবস্থাও অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে, এবং তাঁহা-দিগের শারীরিক অবস্থানুসারে পুত্রেরও শারীরিক অবস্থা নিয়মিত হয়। কিন্তু জনক জননীর শারীরিক অবস্থা কখন চিরদিন সমান থাকিবার নহে, সময়ে সময়ে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এবং এই পরিবর্ত্তনানুসারে তাঁহাদিগের পুত্র-গণের মধ্যেও শারীরিক ভেদাভেদ উৎপন্ন হইতেছে। অতএব যখন ভ্রাতৃগণের মধ্যে শারীরিক ভেদাভেদ জন্মিবার এমন সুস্পষ্ট কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন তাহাদিগের মানসিক ধর্ম্মের ভেদাভেদ ঘটিবার অসম্ভাবনা কি?

তৃতীয়তঃ। ভ্রাতৃগণের মানসিক উন্নতি ও অবনতি তাহাদিগের শিক্ষার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। শিক্ষা প্রভাবে মানসিক অবস্থার কত দূর ভেদাভেদ হয় তাহা সকলেরই বিদিত আছে, এ জন্য সে বিষয় বিস্তারিত লিখিবার আবশ্যক নাই। সকলই আ-

পন আপন জীবন বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে বোধ হয় প্রতীত হইতেছে ভ্রাতৃগণের মধ্যে মানসিক বৈলক্ষণ্য জন্মিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। আপত্তিকারীর অন্যান্য তর্ক অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। তিনি কহেন ভীমের শারীরিক স্ফূর্ত্তি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অধিকতর ছিল, তবে যুধিষ্ঠির অপেক্ষা ভীমের মানসিক উন্নতি অধিকতর হয় নাই কেন। এতদুত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই, আপত্তিকারী কি বড় গাছে বড় ফল ধরিতে দেখিয়াছেন? যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র, এবং ভীম পবনপুত্র ছিলেন।

আমরা বোধ হয় অনেক দূর প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, শরীরেরই মনের ব্যুৎপাদক কারণ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। লোকপ্রচলিত সাধারণ মতে কহে যে মন স্বতন্ত্র ভাবে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহা শরীর হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আমরা মনের এই ব্যুৎপত্তিকারণেরই প্রতিবাদ করিয়াছি। মন যে কি পদার্থ তৎ-সম্বন্ধে আমরা সাধারণ মতের প্রতিবাদ করি নাই। সাধারণজনগণের মত এই যে মন জড় পদার্থ নহে, উহা একটি স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ। আমরাও তাহাই বলি। আমরা বলি, শরীর যেরূপ জড়পদার্থ, মন সেরূপ জড় পদার্থ নহে, উহা আর একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, যাহাকে চেতন অথবা আত্ম পদার্থ* বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণ মতের সহিত আমাদিগের অনৈক্য নাই। কারণ মনকে জড়পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে কতক গুলি অখণ্ডনীয় আপত্তি উত্থাপিত হয়।

১। মন যদি জড় পদার্থ হইত, তাহা হইলে মনেতে জড়ের গুণ-সমুদায় বর্ত্তমান থাকিত। কিন্তু আমরা জড়ের কোন গুণই মনোমধ্যে বর্ত্তমান দেখি না। প্রত্যুত মনের যে সমস্ত গুণ আছে, তাহা জড় পদার্থের গুণ-নিচয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গুণাগুণ বিবেচনা করিয়াই পদার্থের নির্ণয় হয়; তদ্ব্যতীত মনুষ্য-হস্তে পদার্থ-নির্ণয়ের অন্যতর উপায় নাই। সুতরাং মনকে জড় পদার্থ বলিয়া স্থির করিতে হইলে, মনের যে সমস্ত গুণ তাহা জড় পদার্থের ধর্ম্ম বলিয়াও স্থির করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তি-সঙ্গত নহে।

২। মন যদি জড় পদার্থ হইত, তাহা হইলে তাহাকে শরীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যাইত। কিন্তু শরীরকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া কেহ কখন মনোরূপ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

৩। জড়বাদীর মধ্যে এক দল কহেন, যে মন স্বতন্ত্র পদার্থ কিছুই নহে; মানবের মস্তিষ্ক দেশই মানসিক-শক্তি-সম্পন্ন এবং মনের কার্য্য করিয়া থাকে। এই প্রকার জড়বাদীরা মানসিক শক্তি সমূহকে মন পদার্থের সহিত এক, বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাহ্য জগতের

* Spirit

জ্ঞান যেন মস্তিষ্ক দেশে উপলব্ধি হইল, মস্তিষ্ক দেশে বাহ্যজগতের জ্ঞানোৎপাদক ইন্দ্রিয়বাহিত যেন কতক গুলি অঙ্কপাত হইল। কিন্তু কে সেই সমস্ত অঙ্কপাতের উপলব্ধি করে? দর্শন-শক্তি দ্বারা মস্তিষ্ক দেশে পুষ্পের যে অঙ্কপাত হয়, সেই অঙ্কপাতই কিছু পুষ্পের জ্ঞান নহে, সেই অঙ্কপাত হইতে পুষ্পের জ্ঞান মনে উপলব্ধি হয়। পুষ্পের জ্ঞান মাত্রে যেন বাহ্যজগতের অঙ্কপাত হয়, কিন্তু সেই পুষ্পকে আমরা যখন গ্রহণ করিবার অভিলাষ করি, তখন কি আর অভিলাষোৎপাদক কোন স্বতন্ত্র অঙ্কপাত সংঘটিত হয়? না যখন সেই পুষ্প গ্রহণ করা উচিত কি না এরূপ বিচার করি, তখন সেই বিচারোৎপাদক কোন স্বতন্ত্র অঙ্কপাত মস্তিষ্কদেশে সমুৎপন্ন হয়? অথবা যখন সেই পুষ্পের একটি পুষ্পময় আধার মনে মনে সৃষ্টি করি, তখন সেই সৃষ্টিসমুৎপাদক অনুমান মূলীয় কি কোন অঙ্কপাত মস্তিষ্কদেশে সমুদিত হয়? জ্ঞানোৎপাদক অঙ্কপাত হইতে কিরূপে বিচারের অসংখ্য তর্ক জড় মস্তিষ্কদেশ হইতে সমুদিত হইতে পারে তাহা অনুভবই হয় না, জড়মস্তিষ্কের ধর্ম্মাদি বিবেচনা করিলে, বিচারের নানাবিধ তর্কজালী, এবং কল্পনার অগণ্য রচনা কিরূপে তাহা হইতে সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা বোধগম্য হয় না। বাস্তবিক জড় মস্তিষ্কদেশ যে বিচার করিবে, অসংখ্য কল্পনার সৃষ্টি করিবে, ভূতপূর্ব্ব বহুদিনের বিষয় স্মরণ করিয়া আনিয়া তদ্বিষয়ে পুনরালোচনা করিবে, বাহ্যজগৎ হইতে চিন্তাকে অপসৃত করিয়া অনুধ্যান-পরায়ণ হইয়া অন্তরে অন্তরে একটি কাল্পনিক চিন্তারাজ্য সৃষ্টি করিবে, এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি নানাবিধ অবাস্তবিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত ও মতামত স্থির করিবে, ইহা জড় মস্তিষ্কদেশের ধর্ম্মাদি বিবেচনা করিলে একেবারে অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ডাক্তার এবেরক্রম্বী * তদীয় মনোবিজ্ঞান গ্রন্থে কতিপয় ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যদ্দ্বারা প্রতীত হয় যে মস্তিষ্কদেশের অধিকাংশ বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট প্রায় হইলেও মানসিক কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে না, সুতরাং অনুমান করিতে হয় যে নিজ মস্তিষ্কদেশ হইতে মানসিক ভাবাদি সমুত্থিত হয় না। তিনি একটি স্ত্রীলোকের বিষয় উল্লেখ করেন যাহার শিরোদেশের অর্দ্ধভাগ একবারে পীড়ায় পরিপূর্ণ ও অভিভূত হইয়াছিল, তথাচ তাহার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত মানসিক শক্তি নিবহ অব্যাহত ছিল, তাহার কেবল দৃষ্টি মাত্রের কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। ডাক্তার ফেরার একটি লোকের বিষয় উল্লেখ করেন, মৃত্যুর পর যাহার মস্তিষ্কের অর্দ্ধদেশ বিনষ্টপ্রায় দৃষ্ট হইয়াছিল অথচ তাহার হঠাৎ মৃত্যুর

* Abercrombie. "On the Intellectual Powers."

পূর্ব্বে তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান ও বিবেচনা ছিল। এক জন শীরঃ-পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সজ্ঞানে কালগ্রাসে পতিত হইলে পর ডাক্তার হিবার্ডিন তাহার শিরোদেশ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলেন, যে তন্মধ্যে অর্দ্ধ পাউণ্ড বারিপূর্ণ রহিয়াছে। মাষ্টার হেলোরান এক জনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি শিরোদেশে এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হন যে তাহার একটি শিরোদেশস্থ অস্থি দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, এবং চিকিৎসার সময় তাহার মস্তিষ্কদেশ হইতে ভূয়ঃ পরিমাণে মস্তিষ্কের গলিত পদার্থ বিনির্গত হইয়াছিল। এই রূপ নিরবচ্ছিন্ন সতের দিন ঘটাতে তাহার মস্তিষ্কের প্রায় অর্দ্ধ ভাগ একেবারে বিনষ্ট ও বিনির্গত হইয়া পড়ে। এই ব্যক্তি তথাচ বরাবর সজ্ঞান এবং তাহার মানসিক শক্তি বরাবর সম্পূর্ণ ছিল। এমন কি তিনি যতদিন তদ্রূপ অবস্থায় বাঁচিয়া ছিলেন তাঁহার মানসিক স্থৈর্য্য কিছুই বিনষ্ট হইতে দৃষ্ট হয় নাই। আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। কিন্তু এই প্রকার ঘটনা শুনিলে কিরূপ অনুমান করিতে হয়? যাঁহার এ বিষয়ে অবিশ্বাস জন্মে তিনি বোধ হয় কোন উপযুক্ত হাঁসপাতালের ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেক সদৃশ দৃষ্টান্তের উল্লেখ শুনিতে পাইবেন।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত নিচয় জড়-বাদীর মতের প্রতিকূল দৃষ্টান্ত। জড়বাদী যদি বলেন আমার মতের অনুকূল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কর দেখিতে পাইবে সে প্রকার দৃষ্টান্তের সংখ্যা থাকিবে না। স্বীকার করিলাম তাঁহার অনুকূল দৃষ্টান্ত অগণ্য। কিন্তু তাহা হইলেই কি তাঁহার প্রতিকূল দৃষ্টান্তের আপত্তি খণ্ডিত হইবে? যত দিন না প্রতিকূল দৃষ্টান্তের আপত্তি খণ্ডিত হইবে, ততদিন জড়বাদীর মত অখণ্ডিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রণালীর গতি এইরূপ।

আমরা এই প্রকার কতিপয় আপত্তির জন্য জড়বাদ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এই আপত্তি নিচয় অভাব-পক্ষীয় * বটে, কিন্তু মত সম্বন্ধীয় তর্কে অভাব-পক্ষীয় আপত্তি ভিন্ন ভাবপক্ষীয় † কিছুই বলা যাইতে পারে না। যেহেতু চিত্তের পদার্থ-সম্বন্ধীয় কোন কথা স্থির নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে মনের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি তৎসমুদায় সম্ভাবনা-মূলক ‡। কারণ এ প্রস্তাবে সম্ভাবনা ব্যতীত, ঔপপত্তিক সাধন-প্রণালী (১) অনুসারে কিছুই বলা যাইতে পারে না। এক্ষণে কথা এই, মনের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় আমাদিগের বিপক্ষীয় মতও কি সম্ভাবনা-মূলক নহে? এই বিষয় বিচার করিতে হইলে দৃষ্ট হইবে যে আমাদিগের বিপক্ষীয়

* Negative. † Positive.

‡ Probable Evidence, see Introducton to Butler's Analogy of Religion.

(1) Demonstrative Reasoning.

মতও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা-মূলীয়। তবে দেখিতে হইবে কোন্ পক্ষীয় সম্ভাবনা অধিকতর প্রবল ও যুক্তির অনুমোদনীয়। এই বিচারে যদি আমরা পরাজিত হই, যদি এমত প্রমাণিত হয় যে, আমাদিগের পক্ষীয় যুক্তি-সমুদায়ের সম্ভাবনা দুর্ব্বলতর, তাহা হইলে মন শরীর হইতে উৎপন্ন নহে, ঈশ্বর তাহাকে স্বতন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, একথা আমরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

মন জড় পদার্থই হউক অথবা স্বতন্ত্র চেতন পদার্থই হউক তাহাতে কিছুই ক্ষতি নাই। কারণ, মনকে স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ বলিয়া স্থির করিলেই তাহা হইতে এমত সিদ্ধান্ত হয় না যে সেই মন অবিনশ্বর ও দেহ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান করিতে পারে। যদি সেই মনের ব্যুৎপত্তি কারণ মনুষ্য-দেহ না হয় তবে একদা সেরূপ সিদ্ধান্তের কথা উত্থাপিত হইতে পারে। নহিলে মন জড় পদার্থই হউক, আর নাই হউক, তাহা হইতে আত্মার পরকালের বিষয় কিছুই মীমাংসা হয় না। কিন্তু অনেক দার্শনিক পণ্ডিতগণ মনকে চেতন পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াই অমনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে যখন ইহা জড় পদার্থ নহে, যখন ইহা স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ তখন অবশ্য মৃত্যুতে ইহার বিনাশ সাধন হয় না, সুতরাং আত্মার পরকাল অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সাধারণ জনগণেরও এই মত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে যে একটী ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তাহা কেহই বিবেচনা করেন না। না করিয়া বলিয়া থাকেন মন কি পদার্থ, তাহার উৎপত্তি কি প্রকার এরূপ প্রস্তাব লইয়া অনর্থক ভাবিবার এবং জল্পনা করিবার ফল কি? কিন্তু এই বিষয়ের উপর আত্মার পরকালের ন্যায় যে একটী প্রধান সিদ্ধান্ত, পৃথিবীর সর্ব্বসাধারণের একটী প্রধান মূল বিশ্বাস, নির্ভর করিতেছে তাহা তাঁহারা একবারও মনে ভাবিয়া দেখেন না। ভাবিয়া দেখিবেন কি সেই মূল বিশ্বাসকে তাঁহারা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য কি না তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত।

তবে মনের উৎপত্তি বিষয়ক প্রস্তাব কখনই নিষ্ফল নহে। মন, দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাহা দেহ-বিনাশের সহিত যে লয় প্রাপ্ত হইবে ইহাও নিশ্চয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কারণ দেহ-রূপ জড়পদার্থের সম্মিলন ও পরিণতিতে যাহার উৎপত্তি সেই সম্মিলন ও পরিণতি ভঙ্গে তাহার বিনাশ অনিবার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যে কারণে মন সম্ভূত হইল সে কারণ বিরহে যে মন বর্ত্তমান থাকিবে ইহা কখন সম্ভবপর নহে।

তথাপি মানবের বড় ইচ্ছা মানব চিরকাল জীবিত থাকেন। তাঁহার কল্পনা ও আশা পরলোকের বৈকুণ্ঠধামকে সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিতেছে। তিনি ইহলোকের শোক

সন্তাপ পরলোকে গিয়া দূরীকরণ করিবেন বলিয়া কতই সহিষ্ণুতার সহিত পৃথিবীর যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা অকাতরে বহন করিতেছেন। কেন বা পরলোকের কাল্পনিক সুখে এত প্রমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন যে ইহ লোকের কোন সুখই তাঁহার নিকট সুখ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সমুদায় পার্থিব সুখকে অবহেলা করিয়া পরকালের কাল্পনিক সুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। পূর্ব্বকালের যোগী ও ঋষিগণ এই জন্য সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সুখ তাঁহাদিগের নিকট কিছুই নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। পরলোকের আশা-রঞ্জিত মনোহর সুখময় দেশ তাঁহাদিগের কল্পনার চক্ষে এত উজ্জ্বলবর্ণে দেদীপ্যমান হইয়াছিল যে তজ্জন্য তাঁহারা সংসারের সকল বাস্তবিক সুখকে হেয় জ্ঞান করিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে কিছু মহত্ব আছে বটে, কিন্তু সেই অলীক মহত্বের জন্য অনেকে লালায়িত হইয়া তাঁহাদিগেরই অনুসারী হইতে প্রবৃত্ত হইতে গিয়াছেন। তাহাতে সংসারের অনেক অনিষ্ট সাধন হইয়াছে। যে দিন হইতে এই সাংসারিক ঔদাসীন্যের ভাব পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই দিন অবধি পৃথিবীর অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে মানব পৃথিবীর অলঙ্কার-স্বরূপ, যে মানব পৃথিবীকে সুখ সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন, যে মানব পৃথিবীকেই বৈকুণ্ঠধাম ও ইন্দ্রালয় করিতে পারেন, সেই মানব সেই পৃথিবীর প্রতি উদাসীন! ভারতে এই ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্যের উপদেশে ইহার কতই না সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! আমরা ধার্ম্মিক ও সাধুজনের সহিষ্ণুতার মহত্ব ভাবিয়া তাহাকে সাধুবাদ দিতে প্রস্তুত আছি বটে, কিন্তু তাহার বৈরাগ্যভাবকে আমরা কিছুমাত্র প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি। তিনি সে বৈরাগ্য লইয়া বনবাসী হউন। তিনি সংসারে থাকিবার উপযুক্ত নহেন। তিনি যেমন সংসার ধামকে হেয় জ্ঞান করিয়াছেন, সংসারও তাহাকে হেয় জ্ঞান করিয়া বনবাসে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার দ্বারা সংসারের কিছুই মঙ্গল সাধিত হইবে না। বরং তাঁহার উপদেশে অনেক অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

তথাপি মানবের বড় ইচ্ছা মানব চিরকাল জীবিত থাকেন। তাঁহার এই ইচ্ছা এত বলবতী, যে তিনি তজ্জন্য সকল যুক্তিপথও পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার এই ইচ্ছা এত বলবতী যে ইহার প্রতিকূলে যত কেন তর্ক উত্থাপিত কর না, সে সমুদায় তিনি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন। তিনি কহিবেন তুমি তোমার তর্ক লইয়া থাক, আমি আমার অন্ধ বিশ্বাস লইয়া স্বর্গে যাইতে চাহি; অতএব আমি তোমার মত গ্রহণ করিব না। তুমি কি আমাকে নীচ পশুপক্ষীর পদবীতে অবনত করিতে

চাহ; তবে আর আমি শ্রেষ্ঠতম জীব বলিয়া কিরূপে পরিচয় দিব? জান না, আমি পৃথিবীর প্রভু, বুদ্ধিশীল জীব, আমার মত বুদ্ধিসম্পন্ন জীবাত্মার কখন পৃথিবীতেই শেষ হইতে পারে না, ইহা পরমাত্মার ছায়া স্বরূপ, পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া ইহা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

মানবের এই রূপ ইচ্ছা, যে মানব চিরকাল জীবিত থাকেন। মানব এত আত্মগৌরবে পরিপূর্ণ, এত আত্মাভিমানী, যে তাহার নিকট সমগ্র জীবমণ্ডলী পরলোকবাসী হইবার উপযুক্ত বোধ হয় না, তিনিই কেবল একাকী সেই অমূল্য অধিকার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত জীব। তিনি এই আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া অপর সকল প্রাণীকে নিকৃষ্ট ও হেয় জ্ঞান করেন। জানেন না, তিনি যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকৌশলের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য সৃষ্ট ও নিযুক্ত আছেন, অপরাপর প্রাণিগণও তদ্রূপ। সৃষ্টির মধ্যে কে উৎকৃষ্ট, কে নিকৃষ্ট কে বলিতে পারে? তিনিই একাকী পরলোকবাসী হইবেন, আর কোন প্রাণীই সে অধিকার লাভের উপযুক্ত নহে, এ বড় আশ্চর্য্য মত, এ বড় আশ্চর্য্য আত্মগৌরব।

তথাপি মানব সাধারণের সহিত, আমাদিগেরও ইচ্ছা, আমরা চিরকাল জীবিত থাকি। কে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কালকবলে পতিত হইয়া বিনষ্ট ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে চাহে? আমাদিগেরও ইচ্ছা হয় আমরা পরলোক হইতে পরলোকে উত্থিত হই, ইহলোকের সুখসম্ভোগ করিয়া আবার পরলোকের সুখসম্ভোগ করি, এবং অনন্তকাল জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াই। কিন্তু হায়! ঐ যে আমাদিগের আত্মঘাতী বুদ্ধি ও তর্কজাল উপস্থিত হইয়া সকল স্বপ্ন বিনষ্ট করিতে চাহে। ঐ যে তর্কজালের কুজ্ঝটিকা উদিত হইয়া আত্মার গগনদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কে এমন বন্ধু আছে, আমাদিগকে এই অন্ধকারময় আবরণ হইতে বিমুক্ত করিয়া দেন, আমরা সুবর্ণময় উজ্জ্বল পরলোক ধামকে একবার আনন্দ নয়নে অবলোকন করি। তিনিই আমাদিগের পরম বন্ধু, যিনি আমাদিগকে পরলোক সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতে পারেন। তাঁহার সহিত সমযাত্রী হইয়া আমরা মৃত্যুর ভয়ঙ্কর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইতে চাহি। হায়, আমরা এমত বন্ধু কি লাভ করিব? যদি লাভ করিতে পারি, তাঁহাকে আমরা নমস্য বন্ধু বলিয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিয়া চিরসুখী হইব।

শ্রীপূ—

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস।

অবতারণিকা।

খ্রীষ্টীয় ১৮৫৭ অব্দে ভারতবক্ষঃ যেরূপ ভয়াবহ শোণিত-স্রোতে প্রক্ষালিত হয়, তাহা অতীত-সাক্ষী ইতিহাস-হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। স্মৃতি সেই লোমহর্ষণ ঘটনা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া অদ্যাপি সহৃদয়গণের সমক্ষে বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে। অনন্তকালের এই শোণিতময়ী ঘটনা শোণিতাক্ষরে ইতিহাস-পটে বিরাজমান থাকিবে এবং স্মৃতিও অনন্তকালে ইহা লইয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিবে। ভারতক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে হিন্দু, পাঠান ও মোগল রাজত্বের অবসান হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ উনবিংশ শতাব্দীর অদম্য ব্রিটীষ সিংহের অসীম প্রতাপের আশ্রয়ে থাকিয়াও যেরূপ ভয়ঙ্কর অভিনয়ের বিলাস-ভূমি হইয়াছিল, সেরূপ ভীষণ অভিনয়ের শোণিত-রঞ্জিত যবনিকা উক্ত ত্রিবিধ রাজত্বে কখনও উত্তোলিত হয় নাই। আমরা অদ্য বঙ্গীয় ভাষায় সেই লোমহর্ষণ ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি। ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে যাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইবে, আমরা তদনুসারেই স্বীয় মত উপন্যস্ত করিতে চেষ্টা করিব, বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কখনও ঘটনা-চিত্রকে অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত করিয়া পাঠকবর্গের বিরাগ উৎপাদন করিব না।

কোন ঘটনা-বিশেষের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে আদৌ তদুদ্ভব-কারণ-নিচয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। আমরা এই চিরাভ্যস্ত রীতির অনুসরণ পূর্ব্বক প্রথমে গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য সামরিক ঘটনার অবতারণিকা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১১৫ খৃঃঅব্দ উষ্ণকোটী বঙ্গের প্রখর মার্ত্তণ্ডের কিরণ তলে আট বৎসর কাল সুবিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের দুর্ব্বহভার বহন করিয়া লর্ড ডেলহৌসী ১৮৫৬ অব্দে ইংলণ্ডের শীতল-সমীর-সেবী হয়েন। এই অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যুগান্তর পরিবর্ত্তিত হয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসনকাল ভিন্ন অন্য কোন সময়েই ভারতবর্ষ ব্যবস্থা-চক্রে এত ঘূর্ণ্যমান হয় নাই। রণক্ষেত্রের করাল সংহারমূর্ত্তি ও শান্তির অমৃত-রস-বর্ষিণী বিমল ছবি উভয়ই এই সময়ে ভারতবর্ষকে শঙ্কা ও আনন্দের আস্পদ করিয়া তুলিয়াছিল। এক দিকে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহকে যেরূপ পরস্পরের ক্রোড়স্থ করিয়া তুলিতেছিল, অপর দিকে সেইরূপ কুটিল রাজনীতি হস্ত প্রসারণ করিয়া

ভারতীয় মানচিত্রে স্বাধীন রাজ্য সমূহের অবস্থান সন্নিবেশ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিতেছিল। লর্ড ডেলহৌসীর সময়ে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্যে ব্রিটীষ-সিংহলাঞ্ছিত পতাকা উড্ডীন হয়। তন্মধ্যে প্রথম বিজিত পঞ্জাব ও অযোধ্যার সহিত বর্ণনীয় বিদ্রোহ ঘটনার কতিপয় কারণ অনুস্যূত করিয়াছে। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া লর্ড ডেলহৌসী এই দুই রাজ্য পররাষ্ট্র-শ্রেণীতে নিবেশিত দেখেন, এবং ভারত পরিত্যাগের সময় উহা স্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়া গমন করেন।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দ মুদকি ও ফিরোজ সা প্রভৃতি সমরক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর লর্ড হার্ডিঞ্জ শিখদিগের পরাজয় সাধন করেন। কিন্তু ইহাতে তাহাদিগের সাম্রাজ্য স্বাধীনতার বহিশ্চর হয় নাই। হার্ডিঞ্জ শিখ-প্রধান দিগকে একটী সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া মহারাজ রণজিৎ-বিজিত রাজ্য স্বাধীন অবস্থায় রাখেন। ৯ই মার্চ্চ মিয়নমির-ক্ষেত্রে এই সন্ধি নির্দ্ধারিত হয়। সন্ধির নিয়মানুসারে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট সৎলজের দক্ষিণবর্ত্তী জলন্দর দোয়াব গ্রহণ করেন। যে সমস্ত খালসা সৈন্য ব্রিটিষ শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও সৈন্য সংখ্যা ন্যূনতর করিয়া ২০,০০০ পদাতিক ও ১২০০০ অশ্বারোহীতে পরিণত করা হয়। এতদ্ব্যতীত হার্ডিঞ্জ যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ দেড়কোটী টাকা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজস্ব-বিচক্ষণতা নিবন্ধন তদীয় কোষাগারে ১২ কোটী টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে অমাত্যদিগের পাপাচার বশতঃ উহা ব্যয়িত হইয়া অর্দ্ধকোটী মাত্র অবশিষ্ট থাকে। হার্ডিঞ্জ এই অর্দ্ধকোটী গ্রহণ করিয়া অপর কোটীর নিমিত্ত কাশ্মীর প্রদেশ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রণজিৎ সিংহের প্রিয়পাত্র রাজা গোলাপ সিংহ এই সময়ে জম্মুর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া কোটী মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক কাশ্মীর প্রদেশ হার্ডিঞ্জের নিকট হইতে ক্রয় করেন। এই সন্ধির সময়ে দলীপ সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই। রাজ্য-শাসনোপযোগী বয়ঃক্রমের অধিকারী হইতে তাঁহার আরও আট বৎসর বাকি ছিল, এই আট বৎসর কাল প্রতিনিধি প্রণালী দ্বারা পঞ্জাব শাসনের ব্যবস্থা করা হয়, এবং উক্ত রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত প্রতিনিধি-সমিতিতে হেন্‌রী লরেন্স, ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের রেসিডেণ্ট নিয়োজিত হয়েন।

রাজনীতি-প্রয়োগ-কুশল অমাত্যব্যূহে সন্ধি-নির্দ্দিষ্ট উক্ত প্রতিনিধি-সমিতি সংগঠিত হয় নাই। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে পঞ্জাবে একজন দ্বিতীয় রণজিৎ সিংহের বর্ত্তমান থাকা উচিত ছিল, কিন্তু জগতের নিয়তি অনুসারে পঞ্জাব-ক্ষেত্রে আর তাদৃশ মহামনস্বী ব্যক্তি

প্রস্তুত হয় নাই। এক্ষণে পঞ্জাবে কেহই রাজনীতি-প্রয়োগ কুশল ছিলেন না, কেহই সুশাসন-ক্ষম বলিয়া অপরের নিকট প্রশংসা লাভ করেন নাই। ভীষণ ঝটিকার প্রাক্কালে প্রকৃতি যেরূপ শান্ত-ভাব ধারণ করে, পঞ্জাবও সেই রূপ বর্ত্তমান সময়ে আপাতরমণীয় শান্তির ক্রোড়ে লালিত হইতেছিল। দলীপ-জননী ঝিন্দন * এই সময়ে রাজ প্রতিনিধি ছিলেন। ভারতবর্ষ নারী-জাতির শাসন-ঘটনার বহিশ্চর নহে। ইতিহাস-পট উদ্ঘাটন করিলে ভারতীয় মহিলাতেও প্রগাঢ় রাজ-নীতিজ্ঞোচিত গুণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু রণজিৎ-রমণী ঝিন্দন এই উপাদানে নির্ম্মিত হয়েন নাই। ঝিন্দন নারী-জাতি-সুলভ স্নেহ কোমলতা প্রভৃতি ধর্ম্মে সমলঙ্কৃত থাকিলেও মানসিক উচ্চতায় নিতান্ত খর্ব্ব ছিলেন। নারী চিরদিনই প্রীতির পুত্তলী, বাল্য হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নারী-হৃদয় নিয়তই প্রীতিরসে পরিপ্লুত থাকে। অরুণ-রাগ-বিভাষিত প্রাভাতিক লক্ষ্মী এবং দিবস-পরিণাম-সম্ভূত সায়ন্তন শ্রী উভয়ই চিরদিন রমণী-প্রকৃতির শোভা বিধান করে, ঈদৃশ প্রীতিময় রমণী-হৃদয় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের বিলাস ভূমি। ঝিন্দনের এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের বিলাস-ভূমিতে নারী-জাতি-সুলভ সহজবশ্যতা-বীজ দিন দিন অঙ্কুরিত হইতেছিল। এতন্নিবন্ধন এক জন সামান্য ব্যক্তি তাহার অসামান্য প্রিয় পাত্র হইয়া উঠে। অধিক কি, ঝিন্দন পরিশেষে এই প্রিয়পাত্র-কেই রাজ্যের প্রধান অমাত্য পদে বরণ করিয়াছিলেন।

রাজা লাল সিংহ কোনও অমাত্যোচিত গুণেরঅধিকারী ছিলেন না। তিনি দরবার গৃহে যেরূপ সকলের বিরাগ-ভাজন ছিলেন, রাজ্যের প্রকৃতি-সমষ্টির মধ্যেও সেইরূপ সকলের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। নীচ এবং অপ্রথিত বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া লাল সিংহ উচ্চতম সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সৌভাগ্য তাঁহাকে মানবস্পৃহণীয় গুণ-সমূহে সমলঙ্কৃত করিতে পারে নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য কেবল দেহ-যষ্টিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, উহা অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে উপগত হইল চিত্তের উদারতা সাধন করিতে পারে নাই, সুশাসন-ক্ষমতা কেবল অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহা বহিঃপ্রদেশে প্রসৃত হইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় নাই। রণনিপুণতা কেবল স্বীয় তোষামোদপ্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ের সমক্ষেই অভিব্যক্ত হইত, উহা সমরক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইয়া সৈন্য-গণের উৎসাহ-পোষিণী হয় নাই। ফলে লাল সিংহ শিখ-সমিতিতে উৎপাত-কেতু স্বরূপ ছিলেন। তিনি কেবল স্বীয় ক্ষণ-বিধ্বংসি দেহ-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া চঞ্চলমতি ঝিন্দনের হৃদয় আকর্ষণ

* পুস্তক বিশেষে ইঁহার নাম চন্দ্রা বলিয়াও লিখিত আছে।

করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতি-হৃদয় আকর্ষণ করিতে তাঁহার কোনও গুণ ছিল না। এই রূপ ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষীণমনা ও ক্ষীণতেজা ব্যক্তির হস্তে প্রথম শিখ যুদ্ধের পর পঞ্জাব রাজ্যের শাসন ভার সমর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্জাব দীর্ঘকাল এই অন্তঃসার-শূন্য ব্যক্তির ক্রীড়ণক হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত সন্ধির নিয়মানুসারে গোলাপ সিংহ কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিতে গমন করেন, এই সময়ে সেখ ইমাম উদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান-শ্রেষ্ঠের হস্তে কাশ্মীরের শাসন-ভার সমর্পিত ছিল। লাল সিংহ ইমাম উদ্দীনের সহিত ইংরেজ বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া কাশ্মীর প্রদেশে গোলাপ সিংহের গতিরোধ করেন। ইমাম উদ্দীন লাল সিংহের কর-ধৃত সূত্রে ক্রীড়া-পুত্তলবৎ চালিত হইয়া গোলাপ সিংহকে কাশ্মীরের শাসন-ভার দিতে অসম্মত হইলেও অধিক কাল উহার সহিত রণজিৎ রাজ্যের সংস্রব রহিল না। হেনরী লরেনস্ কোন কার্য্যই অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিবার লোক ছিলেন না। তিনি ইমাম উদ্দীনের অসম্মতি দেখিয়া দশ সহস্র শিখ ও কতিপয় ব্রিটীশ সৈন্য সমভিব্যাহারে শিশির-সঞ্চিত বরফ-স্তূপ অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন। অবাধ্য ইমাম উদ্দীন ইংরেজ সেনাপতির বিক্রম দর্শনে বিনম্র হইলেন, এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রধান অমাত্য, গোলাপ সিংহের গতি রোধের নিমিত্ত যে অনুজ্ঞা পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা হেনরি লরেন্সের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন। লালসিংহের এই শাত্রব ভাব ব্রিটীষ রেসিডেণ্টের সহনীয় হইল না। অচিরাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতার বিচারার্থ ইউরোপীয় রাজপুরুষ ও শিখ সর্দ্দার হইতে সুদক্ষ লোক নির্ব্বাচিত হইয়া একটী মিশ্র কমিশন সংস্থাপিত হইল। বিচারে লাল সিংহ পেনসনাগ্রাহী হইয়া আগ্রায় নির্ব্বাসিত হইলেন। রাণী ঝিন্দনের অনর্গল অশ্রুধারা কিছুতেই এই নির্ব্বাসন-দগ্ধাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না। লাল সিংহ ডিসেম্বর মাসে আগ্রায় প্রেরিত হইয়া কেবল অস্তিত্ব মাত্রে পর্য্যবসিত হইলেন। আর তাঁহার সহিত পঞ্জাব বা প্রিয় পাত্রী ঝিন্দনের কোনও সংস্রব রহিল না। এইরূপে লাল সিংহের অধঃপতন হইল, এবং এই রূপেই ব্রিটীষ সিংহের প্রতি তাঁহার আশা-বারি-সিঞ্চিত প্রথম ও শেষ বিশ্বাসঘাতকতা-তরু অঙ্কুরাবস্থায় বিলয় পাইল।

রাজা লাল সিংহের অধঃপতন হইলে রাজ্য রক্ষার্থ পুনর্ব্বার অমাত্য-সমিতি সংগঠিত হইল। ব্রিটীষ রেসিডেণ্ট এই শাসন-সম্বন্ধিনী সভার শীর্ষস্থানীয় হইলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের বাহুবল-জিত বিস্তৃত রাজ্যের কোন অমঙ্গল না ঘটে, এই নিমিত্তই হার্ডিঞ্জ বর্ত্তমান নিয়ম ব্যবস্থাপিত করেন। হার্ডিঞ্জ শিখ জাতির অদম্য চঞ্চল হৃদয় অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করিয়াছিলেন, তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, এক জন দৃঢ়-

প্রতিজ্ঞ রাজনীতিকুশল ব্যক্তির হস্তে পঞ্জাবের শাসন ভার অর্পিত না হইলে উত্তর কাল কখনও শুভাবহ হইবে না। এতন্নিবন্ধনই প্রধান অমাত্যের পরিবর্ত্তে এই রূপ শাসন-পদ্ধতি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। সুতরাং এক্ষণে হেনরি লরেন্সই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পঞ্জাবের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা হইলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ অযোগ্য পাত্রে এই গুরুতর ভার সমর্পণ করেন নাই। যোদ্ধৃজনোচিত বীরতা ও রাজনীতি-জ্ঞোচিত দক্ষতা উভয়বিধ গুণই লরেন্সকে সমলঙ্কৃত করিয়াছিল। যে তেজস্বিতা নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে আশ্রয় করিয়া আপনার বিশ্বগ্রাসিনী লোল রসনা বিস্তার পূর্ব্বক জগতের বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিল, সে সর্ব্বসংহারিণী তেজস্বিতা হেন্‌রী লরেন্সে উপগত হয়-নাই, তথাপি তাঁহার তেজ সকলের অনভিভবনীয় ও অসহনীয় ছিল। শক্রগণ রণস্থলে তাঁহার সংহার মূর্ত্তি দেখিয়া যেরূপ বিত্রস্ত হইত, অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে বালস্বভাবসুলভ কোমলতা ও মৃদুতা দেখিয়া সেইরূপ প্রীতি-বিমুগ্ধ হইত। ফলে হেন্‌রি লরেন্স তেজস্বিতা ও কোমলতা উভয়েরই বিলাসভূমি ছিলেন, উভয়েই পটীয়সী নর্ম্মসখীর ন্যায় তাঁহার জীবন-সহচরী হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮৪৭ খৃঃঅব্দ সৌভাগ্য ক্রমে ঈদৃশ অনলস প্রকৃতি কার্য্যপ্রবণ ব্যক্তির হস্তে পঞ্জাবের শাসন-ভার সমর্পিত হয়। হেন্‌রী লরেন্স নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া এই গুরুতর কার্য্য-ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শাসন-শৃঙ্খলায় পঞ্জাব পুনর্ব্বার শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে নবীন-নীরদ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া গগন-তল পরিব্যাপ্ত করিতেছিল, ভীম প্রভঞ্জন বলে তাহা সমূলে বিধ্বংস্ত হইল। বসন্ত সমাগমে বাসন্তী লক্ষ্মীর ন্যায় পঞ্জাবহৃদয় পুনর্ব্বার প্রীতি ও সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া উঠিল। পঞ্জাব এইরূপ সুখ ও শান্তির ক্রোড়ে লালিত হইয়া ১৮৪৭ অব্দের বসন্তকাল অতিবাহন করে। যে সমস্ত চঞ্চল-প্রকৃতি খাল্‌সা সৈন্য এক সময়ে ভীষণ রণোন্মাদে মত্ত হইয়া পঞ্জাব ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। সকলেই ব্রিটীষ সিংহের অদম্য তেজ ও শাসন-শৃঙ্খলায় মুগ্ধ হইয়া জীবনের শান্তিময় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। জুন মাসে রেসিডেণ্ট রিপোর্ট করিলেন, নিরস্ত্র খাল্‌সা সৈন্যের অধিকাংশ ভাগ শান্তভাবে ভূমিকর্ষণে মনোনিবেশ করিয়াছে। যাহারা এক সময়ে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের ভীতি-স্থল ছিল, কৃষাণ-জনোচিত-সরলতা ও নিরীহতা এক্ষণে উত্তরোত্তর তাহাদিগকে বিভূষিত করিতেছে। যদিও রেসিডেণ্ট এইরূপ রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি পঞ্জাবের তথাবিধ আপাতরমণীয়তা দেখিয়া একবারে

বিমুগ্ধ ও কর্তব্যবিমুখ হয়েন নাই। তিনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদিও পঞ্জাব এক্ষণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, তথাপি নির্ব্বাণাবশেষ দুই একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহার ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। সূক্ষ্মদর্শী রেসিডেণ্ট এই ক্ষীণপ্রাণ স্ফুলিঙ্গের পরিণাম-দাহকতা বুঝিতে পারিলেন, এবং কাল বিলম্ব না করিয়া একবারে তাহার নির্ব্বাণে বদ্ধপরিকর হইলেন।

রাণী ঝিন্দন তেজোবত্তা বিষয়ে মহিলাগণের গৌরবস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার রাজ্য পর-পদানত হইয়াছে, পর-জাতি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহনীয় হইল। ঝিন্দন বুঝিতে পারিলেন, ব্রিটীষ সিংহ ইহার মধ্যেই যেরূপ বর্দ্ধিত-বিক্রম হইয়া পঞ্জাবের প্রতি ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাতে সমস্ত পঞ্জাব অচিরাৎ তাহার উদরস্থ হইবার সম্ভাবনা। বুঝিলেন, ব্রিটীষ জাতি ইহার মধ্যেই এই সম্ভাবনা অনেকাংশে কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে. তাঁহার প্রিয় পাত্রকে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপরিচিত, অজ্ঞাত স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়াছে—প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রকে করসূত্র-ধৃত ক্রীড়া পুত্তলবৎ যথেচ্ছ নর্ত্তিত করিতেছে; বিদেশীর এই আস্পর্দ্ধা, এই অনধিকার-প্রবৃত্তি তেজস্বিনীর হৃদয় প্রতিহত করিতে লাগিল। ঝিন্দন আর ধীরতার সীমা অক্ষুণ্ণ করিতে পারিলেন না। দুর্ব্বিার দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া অতঃপর ঝিন্দন ইংরেজদিগকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় এই অপমান-বিষে কালীময় হইতে উঠিল।

রেসিডেণ্ট এই তেজস্বিনী অঙ্গনার মর্ম্মগত তেজ নিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে অগ্নি অস্থিতে অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় প্রসৃত হইয়া হৃদয়কে সুর্ম্মূল দহনে দগ্ধকরে দুই এক বিন্দু বারি প্রক্ষেপে সে অগ্নির গতি রোধ করা সাধ্যায়ত্ত নয়, সুখ দুঃখের সহচর আত্মীয় জন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জ্জন প্রদেশে নির্জ্জন গৃহে সে অগ্নির আধার সংরক্ষণই ভবিষ্য অমঙ্গল নিবারণের অমোঘ উপায়। রেসিডেণ্ট অবশেষে এই উপায় অবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বিনা আইনে বিনা বিচারে কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া ঝিন্দনের প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত হইল। তদীয় ভ্রাতা এই দণ্ডাজ্ঞা বহন করিয়া রাজ-বিলাস-ভবনে উপস্থিত হইলেন। ঝিন্দন অবনত মস্তকে এই গুরুতর দণ্ড গ্রহণ করিলেন, দুঃসহ মনোযাতনা-প্রকাশক কোনও স্বর তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল না। অটলভাবে অটলচিত্তে এই তেজস্বিনী বীরজায়া স্বীয় ভবিষ্য জীবনের অতিবাহন ভূমি কারা-গৃহে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মুসলমান অধিবাসিপরিবেষ্টিত সেখপুর নামক নির্জ্জন স্থানে ঝিন্দনের আবাস-গৃহ নিরূপিত হইয়াছিল। ঝিন্দন

অতঃপর রাজলক্ষ্মীর ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই কদর্য্য স্থানে কদর্য্য গৃহে কারারুদ্ধ হইলেন। বিধাতা যদিও ঝিন্দনকে অঙ্গনা-জনোচিত কোমল উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনোগত স্থিরতা নিরবচ্ছিন্ন কোমলতায় পর্য্যবসিত হয় নাই। ঝিন্দন লাবণ্য-লীলাময়ী ললনা হইয়াও দৃঢ়তা ও অটলতার আস্পদ ছিলেন, কোমলতাময় অঙ্গনা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও ধীরতার অবলম্বন ছিলেন, এবং কমনীয় কান্তির আধার হইয়াও ভীমগুণান্বিত তেজস্বিতার পরিপোষক ছিলেন। যে বিকার ক্লিওপেত্রাতে সংক্রান্ত হইয়া হৃদয়গ্রন্থি-শিথিল করিয়া তুলিয়াছিল, সে বিকার ঝিন্দনে উপগত হইয়া ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হয় নাই। ঝিন্দনের হৃদয় সর্ব্বক্ষণ অটলতায় পূর্ণ ছিল; এই গুরুতর বিপৎপাতে তাঁহার চিরাভ্যস্ত অটলতা স্খলিত হইল না, হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়া ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল না। প্রকৃত বীরজায়া ও বীরনারীর ন্যায় ঝিন্দন অটলভাবে স্বীয় দশাবিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিলেন। বৈদেশিক নেত্রে তাঁহার চরিত্রগতি যতই নিম্নগামিনী বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া তাঁহার চরিত্র চিত্র যতই কালি-ময় পরিণত হউক না কেন, ঝিন্দন এই অটলতার ও স্থির-হৃদয়তার জন্য নারীসমাজে গরীয়সী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

এইরূপে ঝিন্দন রাজপদ ও রাজসম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়া জন্মের মত কারাবাসিনী হইলেন। রাজবনিতা ও রাজমাতার ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম ইতিহাস-হৃদয় কালীময় করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা হেন্‌রী লরেনসের ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার সহিত পরিচিত আছেন, ঝিন্দনের এই নির্ব্বাসন-বিধি তাঁহাদিগকে একান্ত বিস্মিত করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডীয় ইতিহাস-রচয়িতৃগণ লিখিয়াছেন, ঝিন্দন রেসিডেণ্টের জীবন সংহারের ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি এইরূপ নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত হইয়াছিল। কিন্তু যেরূপ মিশ্র কমিশনে রাজা লালসিংহের বিষয় বিচারিত হইয়া দণ্ড প্রয়োজিত হইয়াছিল, ঝিন্দনের অপরাধ সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন বিচার-কার্য্য যথাপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না তাহা পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস-লেখকগণ ভবিষ্য জগৎকে জানাইতে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই তুষ্ণীম্ভাব জগৎকে জানাইতেছে, ব্রিটীষ্ রেসিডেণ্ট্ বিনাবিচারে কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া দলীপ-জননী ঝিন্দনকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এস্থলে সন্দেহই মন্ত্রী ও সন্দেহই শাস্তা হইয়াছিল। যে কল্পনা এইরূপ সন্দেহের ক্রোড়ে লালিত হইয়া গরলময় ফল প্রসব করে, তাহা সন্নীতির অনুমোদিত কি না, সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন। আমরা এস্থলে কেবল ইহাই

বলিয়া নিবৃত্ত হইতেছি, সূক্ষ্ম বিচারে দোষ সপ্রমাণ করিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধানই সভ্য জগতের রীতি। হেন্‌রি লরেন্স সভ্য-দেশ-প্রসূত হইয়া এই সভ্য রীতির বহিশ্চর হওয়াতে যে ন্যায়পরতার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

১৮৪৮ খৃঃঅব্দ রাজ্ঞী ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের সহিত পঞ্জাবের সমুদয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত হইল। এইরূপে বিনা গোলযোগে, বিনা উদ্বেগে শরৎকাল পঞ্জাবে উপস্থিত ও বিগত হয়। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবে শাসন-সমিতির অধিনায়কেরও পরিবর্ত্তন হইয়া উঠে। হেন্‌রি লরেন্স কয়েক বৎসর কাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিবাস করিয়া নিতান্ত অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশে তিনি সিমলা-শৈল-বিহারী হয়েন। স্থান পরিবর্ত্তনে তাঁহার শারীরিক অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু ভিষক্‌গণ তাঁহাকে এদেশে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের শীতল-সমীর-সেবী হইতে পরামর্শ দেন। হেন্‌রি লরেন্স এই পরামর্শানুসারে ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হয়েন। এই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ লর্ড ডেল্‌হৌসীর হস্তে ভারত-সাম্রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া স্বদেশাভিমুখ হয়েন, এদিকে হেন্‌রি লরেন্সও সার্‌ হেন্‌রি কারি নামক এক জন উচ্চতর সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের হস্তে পঞ্জাবের শাসন-ভার অর্পণ করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন। সুতরাং যুগপৎ, ভারত সাম্রাজ্য লর্ড হার্ডিঞ্জের পরিবর্ত্তে লর্ড ডেল্‌হৌসীর এবং পঞ্জাবরাজ্য সার হেন্‌রি লরেন্সের পরিবর্ত্তে সার্‌ হেন্‌রি কারির বশ্যতা স্বীকার করে।

এই রূপে অধিনায়কের পরিবর্ত্ত হওয়াতেও আপাততঃ কোন গোলযোগের চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। নূতন বর্ষ প্রসন্ন ভাবে পঞ্জাবকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট দশা-বিপর্য্যয় উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। পঞ্জাবে কোন গোলযোগ না থাকিলেও সমীরণভরে প্রদেশান্তর হইতে একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া বিষম হুলস্থূল ব্যাপার সংঘটিত করিল।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ মুলতান জয় করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য দৃঢ়তর করেন। তদানীন্তন সময় হইতে এক এক জন দেওয়ান লাহোর দরবারের অধীন হইয়া মুলতানের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৪৪ অব্দে মুলতানের শাসনকর্ত্তা সোয়ানমল্ল এক জন ঘাতকের হস্তে নিহত হয়েন। পিতৃহত্যার পর তদীয় পুত্র মুলরাজ মুলতানের দেওয়ান-পদ অধিকার করেন। লাহোর দরবারের তদানীন্তন মন্ত্রী লাল সিংহ মুলরাজের কোষাগার পূর্ণ মনে ভাবিয়া তাঁহার নিকট দেওয়ানী পদ গ্রহণের নজরানা স্বরূপ এক কোটী টাকা প্রা-

র্থনা করেন। মুলরাজ প্রথমে এই টাকা দিতে অসম্মত হইলেন। পরিশেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ প্রদানের প্রস্তাব হয়। মুলরাজ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে প্রথম শিখ যুদ্ধ নিবন্ধন লাহোর দরবার বিব্রত হইয়া পড়াতে এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হয় নাই।

মিয়নমিয়রের সন্ধির পর শিখরাজ্য শান্তি-প্রবণ হইলে লাহোর দরবার মুলরাজের নিকট পূর্ব্ব প্রাপ্য কয় লক্ষ টাকা ও বকেয়া স্বরূপ অতিরিক্ত কিছু অংশ প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনার পূরণ না হইলে মুলরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইবে ইহাও বলিয়া পাঠান হয়। মুলরাজ লাহোর দরবারের দাবি পূরণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। মুলরাজ শঙ্কান্বিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়গ্রাহী হয়েন, এবং রেসিডেণ্ট দ্বারা প্রস্তাবিত গোলযোগের মীমাংসা করিতে ১৮৪৬ অব্দের শরৎকালে লাহোর গমন করেন। লাহোরের মীমাংসায় মুলরাজ নির্দ্দিষ্ট নজরানা দিতে বাধ্য হয়েন, ইহার নিমিত্ত তাঁহার স্বত্ব-ভুক্ত ভূমির কিয়দংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া অবশেষ নির্দ্দিষ্ট হারে ইজারা দেওয়া হয়। মুলরাজ উপস্থিত সময়ে এই মীমাংসার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন না, প্রত্যুত সন্তোষ সহকারে মুলতান প্রতিগমন করিলেন।

মুলতানে প্রত্যাগত হইয়া মুলরাজ এক বৎসরকাল শান্তভাবে অতিবাহিত করিলেন। দুঃসহ মনোবিকার-সম্ভূত কোন গূঢ় চক্র তাঁহা হইতে উদ্ভাবিত হইল না। এই আপাত শান্তি-প্রিয়তা দর্শনে বোধ হইল, লাহোর ও মুলতানঘটিত অন্তর্নিগূঢ় বিবাদ-বহ্নি একবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, ইহা হইতে আর কোন স্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইয়া ভবিষ্য শান্তির উন্মূলন করিবে না। কিন্তু মুলরাজ যে সন্তোষের ক্রোড়ে লালিত হইতেছিলেন, তাহা স্থায়ী হইল না। একবৎসরকাল মধ্যেই লাহোর দরবারকৃত মীমাংসা তাঁহার নিতান্ত মর্ম্মপীড়ক হইয়া উঠিল। এই অসহনীয় যাতনা হইতে মুক্তি লাভের আশয়ে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগের বাসনা করিয়া ১৮৪৭ অব্দে পুনর্ব্বার লাহোর গমন করিলেন, কিন্তু তথায় অভীষ্ট লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখিলেন না; সুতরাং মুলতানে প্রত্যাগত হইয়া একখানি পদত্যাগ পত্র লাহের দরবারে যথা রীতি প্রেরণ করিলেন, দরবার মুলরাজের পত্র গ্রহণ করিলেন, এবং সর্দ্দার খান সিংহ নামক এক জন সুদক্ষ যুদ্ধবীর ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিকে তৎপরিবর্ত্তে দেওয়ানী পদে নিয়োজিত করিয়া মুলতানে পাঠাইলেন। সর্দ্দার খানকে রাজ্যে যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য ভান্‌স আগ্‌নু নামক জনৈক সিভিল কর্ম্মচারী এবং বোম্বাই সৈন্য দলের লেফ্‌নেণ্ট অণ্ডারসন পাঁচ শত সৈন্য-সহিত

তৎ-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। সর্দ্দার খান এই দলবল লইয়া মুলতানে উপস্থিত হইলে মুলরাজ কোন বিরাগের চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না, প্রত্যুত ধীরভাবে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া দুর্গে প্রবিষ্ট হইলেন, দুইদল গুরুখা সৈন্য ও কিয়ৎসংখ্যক অশ্বারোহী দুর্গের অন্যতম দ্বার রক্ষা করিতেছিল, মুলরাজ যথানিয়মে নবনিয়োজিত দেওয়ানের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। ইহার পর সর্দ্দারখান ও তৎসমভিব্যাহারিগণ যখন দুর্গ হইতে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন হঠাৎ ব্রিটীষ কর্ম্মকারিগণ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন। মুলরাজ এই আক্রমণ নিবারণে যত্নবান্ হইলেন না, প্রত্যুত অশ্বারোহণে দ্রুত গতিতে তাঁহার উদ্যান বিলাস ভবনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এদিকে সর্দ্দার খান ও অধীনস্থ গুরুখা সৈন্যগণ আহত ব্রিটীষ কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদিগের বাসভবনে আনয়ন করিলেন।

পরদিন সমস্ত মুলতান প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইল। মুলরাজ এক্ষণে আর আত্ম-সংগোপন না করিয়া প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ফিরিঙ্গী বিনাশ ও ফিরীঙ্গী রাজ্য ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাত্রির প্রাক্কালে বিদ্রোহিগণ দলবদ্ধ হইয়া আহত আগ্নু ও আণ্ডার্সনের আবাস গৃহ অবরোধ করিল। নিরাশ্রয় নিঃসহায় কর্ম্মচারিদ্বয় অটল ভাবে স্বীয় দশা-বিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিলেন—আহত হইয়া অটল ভাবে প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় জীবনের শেষ সীমা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যে বিদ্রোহিদিগের সংখ্যার আধিক্য নিবন্ধন তাঁহাদিগের বীর্য্য বিলুপ্ত হইল, বিদ্রোহিগণ দলে দলে আসিয়া ক্ষতদেহ আগ্নু ও আণ্ডার্সনকে বিক্ষত করিতে আরম্ভ করিল, ব্রিটীষ-কর্ম্মচারি-যুগল আর আত্ম-রক্ষা অসম্ভব দেখিয়া শান্তভাবে শান্তিময় মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইলেন। এইরূপে ব্রিটীষ শোণিত মুলতান-হৃদয় উক্ষিত করিল, এবং এইরূপে মুলতানবাসী বিদ্রোহিদিগের ক্রোধানল উপশান্ত হইল।

এই ঘটনার পর মুলরাজ স্বীয় পলায়িত ভাব পরিত্যাগ করিলেন। প্রকৃতবীর্য্যবত্তা ও রণোন্মাদ তাঁহাকে এক্ষণে অধীর-প্রকৃতি করিয়া তুলিল। তিনি ব্যূহ-রচনা-কুশল সৈন্যসমষ্টির শৃঙ্খলা বিধানে ব্যাপৃত হইলেন, কিরূপে রণবিশারদ ব্রিটীষ সৈন্যের সম্মুখীন হইবেন—কিরূপে তাহাদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া স্বীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, এই চিন্তাতেই মনোনিবেশ করিলেন। বৈরনির্যাতন-স্পৃহা তাঁহাকে ভীরুতার বিনিময়ে সাহসিকতায়, ধীরতার বিনিময়ে রণদক্ষতায়, এবং নিরীহতার বিনিময়ে যত্নপরতায় সমলঙ্কৃত করিল।

এক্ষণে তিনি স্বীয় অদৃষ্টের নিকট মস্তক নত করিলেন, এবং বৈজয়ন্তী সেনার অধিনায়ক হইয়া প্রকৃত যুদ্ধবীরের পদে সমাসীন হইলেন।

এইরূপে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। আদৌ ইহা স্থানীয় ঘটনা হইতে সমুদ্ভূত হয়। লাহোর-দরবার বা সংস্পৃষ্ট শিখ অধিনায়কদিগের সহিত প্রথমে ইহার কোনও সম্বন্ধ লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু পরিশেষে সংক্রামক রোগের ন্যায় এই বিবাদ-বহ্নি সমস্ত পঞ্জাবে প্রসৃত হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মুলরাজের অভ্যুত্থানই দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের আদি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। এই বিবাদ হইতে কিরূপ ফল প্রসূত হইয়া পঞ্জাব-ক্ষেত্রে রণজিৎ-রাজত্বের অবমান হয়, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

ক্রমশঃ শ্রীর।

কপালকুণ্ডলা।

মালতীমাধবের পাঠকমাত্রেরই নিকট কপালকুণ্ডলার নাম অপরিচিত নাই। কিন্তু মালতীমাধব-পাঠকের কপালকুণ্ডলার স্মৃতি অত্যল্পই হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে। আজি কালি কপালকুণ্ডলা বলিলে আর মালতীমাধবের ভৈরবীকে মনে পড়ে না। সে কপালকুণ্ডলাকে আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে আর এক কপালকুণ্ডলা আমাদিগের মনোমন্দির অধিকার করিয়াছে। তাহা বঙ্কিমবাবুর সৃষ্টি—অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এখন কপালকুণ্ডলার নাম করিবামাত্র এক বনবাসিনী, বন্য, আলুলায়িত-কুণ্ডলা, প্রকৃতি-মধুরা, সরলা ষোড়শীকে মনে পড়ে। অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য উদাত্ত ভাব মনে সঞ্চারিত হয়। প্রকাণ্ড বন, সমুদ্রতট, ভীষণ কাপালিক, স্থির-সংকল্প নবকুমার সকলই একে একে মনে সমুদিত হইতে থাকে। মনে মনে এখন যে সমস্ত উদাত্ত ভাব সঞ্চারিত হইতে থাকে, তাহারই পর্য্যালোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এ প্রস্তাবে আমরা বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থের ঠিক সমালোচনা করিতে চাহি না, কিন্তু সেই গ্রন্থ মধ্যে তিনি যে বিশাল ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত রমণীয় এবং ভীষণ সুন্দর দৃশ্যে তাহা পরিশোভিত করিয়াছেন, তাহারই সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ক্ষেত্রকে এরূপ বিদূর-শোভনীয় প্রকাণ্ড দৃশ্যনিচয়ে শোভিত করিতে গিয়া কবি যেমন তাহাদিগের গাম্ভীর্য্য এবং উদাত্তভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন,

তাহাদিগের প্রকাণ্ডতার গৌরব, দূর শোভনীয় সৌন্দর্য্য, এবং সমুদায়ের সমঞ্জসীভূত বিভীষণ ও ললামভূত সুষমা প্রকটন করিতে গিয়া তাহাদিগের সামান্য অমসৃণতা ও সন্নিকর্ষের পরিস্ফুটতা উপেক্ষা করিয়াছেন আমরা তদ্বিষয়ের কিছুই উল্লেখ করিব না, কারণ তাহা এ প্রকার দৃশ্যের আনুষঙ্গিক, অপরিহার্য্য এবং প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম। যাহা প্রয়োজনীয় তাহা দোষ নহে,তাহা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির উপকরণ। যিনি ইহা না বুঝেন, তিনি কবিত্ব বুঝেন না, তিনি চিত্রবিদ্যার কিছুই বুঝেন না। আমরা এ বিষয় কথঞ্চিৎ বিশদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কবি, গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কাপালিকের বনাশ্রম ও কপালকুণ্ডলার বনবাস বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এ বর্ণনায় কিছুই পরিস্ফুট নাই। বনস্থলীর বিশেষ বিবরণ নাই; কেবল এখানে একটি পর্ণকুটীর, এখানে বৃক্ষলতা, সেখানে বৃক্ষতলে নবকুমারের বন্য ফল ভক্ষণ, চারিদিকে নির্জ্জনতা, নবকুমারের সর্ব্বদাই পথভ্রান্তি, কপালকুণ্ডলার স্বাধীনভাবে বনমধ্যে ভ্রমণ, সহসা তটভূমে উপস্থিতি, সহসা বৃক্ষান্তরালে তিরোধান, সহসা বনপ্রান্তে, সহসা কুটীরে, সহসা শ্মশানে এবং সহসা নবকুমারের পশ্চাৎ ভাগে পরিদৃশ্য এবং অদৃশ্য হওয়াতে বনস্থলীর জটিলতা, বিস্তীর্ণতা, এবং বিশৃঙ্খলতা একদা মনোমধ্যে উদিত হয়। আমাদিগের মনে বনের ভাব বিলক্ষণ অঙ্কিত হয়, আমরাও যেন নবকুমারের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ফিরিতেছি, অথচ কোন দিক্ দিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইতেছি না, বনপথের কিছুই অনুসন্ধান পাইতেছি না, সুতরাং কাপালিকের বীভৎস কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াও অগত্যা বনমধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি। এই রূপ কৌশলে কবি আমাদিগের মনে বনের ভাব অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বনের সম্পূর্ণ বিবরণ কিছুই দেন নাই, অথচ মনে তাহার প্রকৃষ্ট ভাব সমুদিত হয়। নিকটে গিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর, দৃশ্যের অঙ্কপাত অসম্পূর্ণ, অর্দ্ধপ্রসারিত, কিন্তু দূরদেশ হইতে দেখ, কল্পনা মনোমধ্যে বনের ভাব প্রকৃষ্ট রূপে অঙ্কিত করিয়াছে।

যে ভূমির উপরে কপালকুণ্ডলার মহান্ চিত্রসকল অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী অনুরূপ মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। বাত্যান্দোলিত মহানদের তরঙ্গোচ্ছাসে তরণী ভাসিয়া যাইতেছে, সমুদ্রতটে নবকুমার একাকী নির্জ্জনদেশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছেন, সমুদ্রতটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিকতাময় পর্ব্বতমালার পার্শ্বে বনস্থলী, বনপ্রান্তে শ্মশান ভূমে কাপালিকের ভয়ঙ্করী তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ, বনমধ্যে পর্ণকুটীর, ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় অমানুষী সুন্দরীর সহসা আবির্ভাব ও তিরোভাব, যেন মেঘমালার মধ্যে সৌদামিনীর আশ্চর্য্য বিকাশ হইতেছে, এবং বনপ্রান্তে নির্জ্জন দেশে পুরাতন দেবমন্দিরের দর্শন এ সমস্ত

দৃশ্যই মনকে উদাত্ত ও গভীর ভাবে পরিপূর্ণ করে। আবার পথিমধ্যে মতিবিবির ঐশ্বর্য্য, আগ্রার সম্রাটের ঐশ্বর্য্য, নবকুমারের গৃহপ্রান্তে 'বনস্থলী, এবং সেই বনস্থলীর মধ্যে গভীর রজনীতে, কাপালিক, মতিবিবি এবং কপালকুণ্ডলার ভীষণ মন্ত্রণার জন্য একত্রে সম্মিলন—একবার মনে মনে এই সমস্ত আলোচনা করিলে তাহা কি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হয় না? প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু উদাত্ত ও মহান্, পার্থিব মানব ঐশ্বর্য্যের দৃশ্যে যত গৌরব থাকিতে পারে, তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপে যে গাম্ভীর্য্য থাকিতে পারে, তাহা এই পুস্তকের চিত্রাবলির ক্ষেত্রমধ্যে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান দেখা যায়। এ প্রকার গভীর দৃশ্যপূর্ণ গ্রন্থ দর্শন করা সচরাচর পাঠকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

কিন্তু আর এক প্রকার উদাত্ত ভাবের বিষয় আমরা এখনও উল্লেখ করি নাই—যে উদাত্তভাবে 'মানবীয় হৃদয়ের মহত্ত্ব, বীরত্ব অথবা ঔদার্য্যের পরিচয় হয়। যেমন প্রকৃতির দৃশ্য-বিশালতায় হৃদয়-প্রসারিত হয়, তেমনি মানবের এই ঔদার্য্যের এবং মহত্ত্বের পরিচয়েও চিত্ত বিস্ফারিত হইতে থাকে। মানব তখন সেই মহত্ত্বের প্রশংসা ও সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তখন মানবের মন উচ্চ-ভাব-পূর্ণ হয় এবং তাহার নীচ ভাব সমুদায় তিরোহিত হয়। কপালকুণ্ডলার পাঠকেরও মন একেবারে এই প্রকার ভাবে পূর্ণ হইতে থাকে। যখন তিনি পান্থনিবাসে "সুন্দরী-সন্দর্শনে" দেখিলেন মতিবিবি নিজ মহার্ঘ্য অলঙ্কার-রাশি আত্ম-শরীর হইতে উন্মুক্ত করিয়া কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন, তখন কি মতিবিবির ঔদার্য্য গুণে একদা চমকিত হয়েন নাই? যখন কপালকুণ্ডলা শিবিকারোহণে—

——————খুলিয়া সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চি।

অকপট হৃদয়ে ভিক্ষুকের হস্তে সমুদায় সমর্পণ করিলেন, তখন কি ভিক্ষুক আশাতীত ফল লাভ করাতে ক্ষণিক বিহ্বল হইল না। যখন পাঠক দেখেন লুৎফ-উন্নিসা এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য আগ্রার সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে আসিলেন, যখন তিনি দেখেন সেই অনুতাপিতা রমণী নবকুমারের পদতলে বাহুলতায় চরণ-যুগল বদ্ধ করিয়া কহিতেছেন :—

"নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না!"

তখন কি তাঁহার মন একবার মতিবিবির জন্য কাতর হয় নাই? একবার মতিবিবির ত্যাগস্বীকার ভাবিয়া তাঁহার উদারতা গুণে কি তিনি মোহিত হন নাই? আবার যখন নবকুমার বীরের ন্যায় নিজ স্থির সংকল্প রক্ষা করিয়া কহিলেন,

"যবনী! তুমি আবার আগ্রাতে

ফিরিয়া যাও; আমার আশা ত্যাগ কর।" তখন কি পাঠক একবার নবকুমারের মানসিক শক্তির প্রাবল্যের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হয়েন নাই? এরূপস্থলে নবকুমারের ন্যায় মানসিক শক্তির পরিচয় কি সুচরাচর ঘটিয়া থাকে? গ্রন্থকার এই প্রকার মানসিক মহত্ত্বের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিয়া গ্রন্থকে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিয়াছেন। যে গ্রন্থের সর্ব্বত্রই উদাত্তভাবে পরিপূর্ণ, তাহা এই প্রকার ধর্ম্মনৈতিক মহত্ত্বের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্তে পরিসমাপ্ত হওয়াতে গ্রন্থের সমধিক গৌরব পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। সে দৃষ্টান্তে কপালকুণ্ডলার মহত্ত্ব ও হৃদয়ভাব দেখুন :—

"লু। আমার প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর। কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেক ক্ষণের পর কহিলেন, 'স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?'

লু। বিদেশে—বহুদূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব,—ধন দিব—দাস দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না; অন্তঃকরণ-মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন :—

'তুমি যে আমার উপকার করিয়াছ কি না তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন সম্পত্তি, দাস দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্ন-কারিণীর কোন সম্বাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম আবার বনচর হইব?'"

লুৎফ-উন্নিসা চমৎকৃতা হইলেন। এতদূর উদারতায় কে না চমৎকৃত হয়? কপালকুণ্ডলার এই বাক্য কেবল কথাতেই শেষ হয় নাই; তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। কপালকুণ্ডলা পর-সুখের জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন। মানবের উদারতার এই পরাকাষ্ঠা। এই চিত্তোদার্য্যের দৃষ্টান্তে উপন্যাস পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরিসমাপ্তিটি কিরূপ মধুর তাহা কপালকুণ্ডলার পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। কপালকুণ্ডলা পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়া তিনি পাঠক মাত্রকেই সন্তাপিত করিয়া গেলেন। তিনি ত নদীতরঙ্গে মিশিয়া যান নাই, পাঠকের হৃদয়ে নিমজ্জিত হইয়াছেন। পাঠকের মনে চিরকালের জন্য আত্মগুণের একটি সুবর্ণ রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন। সে রেখা কখন অপনীত হইবার নহে। তিনি যেন কোন দেবতার ন্যায় নবকুমারের নিকট তাঁহার জীবন রক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আবার দেবতার ন্যায় পরকে

সুখিনী করিবার জন্য মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার পবিত্রতা তাঁহার রূপরাশিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল, তাঁহার প্রকৃতিকে রমণীয়া করিয়াছিল এবং এক্ষণে তাঁহার স্মৃতিকে পরম মধুরা করিয়াছে। তিনি আজি ও আমাদিগের কল্পনার উচ্চদেশে পরম রমণীয় বেশে জীবিতা আছেন। এরূপ একটি রমণীকে সৃষ্টি করাই প্রকৃত কবির সৃষ্টি। কবির সৃষ্টি কল্পনাধামে স্বুবর্ণ সিংহাসনে চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকে। কপালকুণ্ডলা কবির সৃষ্টি, আমরা তাঁহাকে চিরকাল হৃদয়াসনে প্রত্যক্ষ দেখিব। অথবা এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তিনি সেই বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, নবকুমারের উদ্ধার সাধন করিবার জন্য একবার এদিক্ একবার ওদিক্ করিয়া বনদেবীর ন্যায় ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। পথে শিবিকারোহণে ভিক্ষুকের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য সরলা বালা সমুদায় দেহাভরণ সমর্পণ করিতেছেন। শ্যামাসুন্দরীর উপকারার্থ একাকিনী নির্ভীকমনে নৈশকাননে প্রবেশ করিতেছেন এবং সর্ব্বশেষে পদ্মাবতীর চিরাভিলষিত সিদ্ধ করিবার জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়া নবকুমারকে চিরকালের জন্য কাঁদাইয়া গেলেন।

কপালকুণ্ডলায় যে কএক খানি প্রধান চিত্রের আলেখ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। কপালকুণ্ডলায় আমরা চারিটি মাত্র প্রধান চিত্রের ছায়া প্রাপ্ত হইয়াছি। ভয়ানক তন্ত্রোপাসক কাপালিক, সম্রাড়ীশ্বরী চতুরা লুৎফউন্নিসা, বনবাসিনী সংসারানভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলা, এবং সচ্চরিত্র অমায়িক নবকুমার। এই চিত্রকতিপয়ের পারিপার্শ্বিক দৃশ্য সমুদয়ও অতি গভীর ও মনোহর। ভয়ানক কাপালিক, সমুদ্রতীরস্থ শ্মশানভূমে বনবেষ্টিত এবং শবারোহিত হইয়া যোগ-সিদ্ধি করিতেছেন। রূপরাশি, কুন্তলশোভিতা, সংসার ভূষণ, সরলা, পরহিতার্থিনী কপালকুণ্ডলা,—বনে, পর্ণ কুটীরে, ভয়ানক কঠোর-হৃদয় কাপালিকের আশ্রমে প্রতিপালিতা ও প্রবৃদ্ধা হইতেছেন। বাঙ্গালিনী, হিন্দু, পতিপরায়ণা পদ্মাবতী, আগ্রার বিলাসধামে যবনসম্রাটের এবং ওমারাহগণের চিত্ত বিনোদন করিতেছেন। সংসারী নবকুমার, বনে কাপালিকের আশ্রমে, সংসারে বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে এবং কাপালিকের মন্ত্রণায় নীয়মান হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ নবকুমার, সম্রাড়ীশ্বরী যবনী সুন্দরী লুৎফউন্নিসার পার্শ্বে অভ্যর্থিত ও পদসেবিত হইয়া আছেন। এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে চিত্রগুলিকে বড় চমৎকার শোভায় স্থাপন করিয়াছে। যখন আবার এই চিত্রগুলির পরস্পর-বৈপরীত্য ভাব মনে উদয় হয়, তখন আরও চমৎকৃত হইতে হয়, তখন উপন্যাসের কবিত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন ভাবিতে থাকি, কেমন চৎকার কৌশলে কপালকুণ্ডলার উপা-

খ্যান বিন্যস্ত ও সজ্জিত হইয়াছে! এই কৌশল হেতু কি কপালকুণ্ডলার সরল উপাখ্যান এত বৃহৎ বোধ হয় এবং সমুদায় হৃদয়-ধামকে পরিপূর্ণ করে? ইহার উপাখ্যান সরল বটে, কিন্তু ইহার ব্যক্তি গুলি ক্ষুদ্র নহে। ইহার বৃহৎ চিত্র-গুলি পরস্পর বিপরীত ভাবে সংস্থিত থাকাতে হৃদয়ে দ্বিগুণতর আয়তনে প্রতীত হইতে থাকে। বৈপরীত্যের ফলই এই। বন-বেষ্টিত সমুদ্রতীরস্থ নির্দ্দয় কাপালিক, নগরাশ্রয়ী অমায়িক নবকুমারের বিপরীত দিকে সংস্থাপিত রহিয়াছে, সুতরাং উভয়েরই চিত্র দ্বিগুণতর ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে। ঐশ্বর্য্য-পরিবেষ্টিতা চতুরা লুৎফ-উন্নিসা, নিরলঙ্কৃতা সরলা কপালকুণ্ডলার অপর পার্শ্বে উজ্জ্বলিত রহিয়াছেন। দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য ও চারুতায় মন স্তম্ভিত ও বিমোহিত হয়। কপালকুণ্ডলা অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার চিত্র গুলি ক্ষুদ্র নহে; তজ্জন্যই তাহার চিত্রফলক আমাদিগের হৃদয়ে গভীরতররূপে চিরমুদ্রিত রহিয়াছে।

কিন্তু আমাদিগের দুঃখের বিষয় এই বঙ্কিমবাবু আজি পর্য্যন্ত এ চিত্রগুলি সম্পূর্ণ করিলেন না। এই চিত্রগুলি যে অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা তাহাদিগের কেবল ছায়ামাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ছায়াতেই আমরা তাহাদিগের পূর্ণ অবয়ব ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব বিলক্ষণ অনুমান করিয়া লইতে পারি। কারণ বাল্যাবস্থায় শরীরের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া তাহার যৌবন-গৌরব অনেক দূর অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিমবাবুর চিত্রগুলি সকলই বাল্যাবস্থায় স্থাপিত। তাহার প্রত্যেক চিত্রপুত্তলি বিলক্ষণ বর্দ্ধনশীল। বাল্যাবস্থায় চিত্রগুলিকে নিতান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা এত পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় যে আমরা তাহাদিগের যৌবনের পূর্ণগৌরব না দেখিতে পাইলে কিছুতেই মনের সন্তোষ পাই না। বাল্যাবস্থার পুত্তলিগণ মনের অসন্তোষের কারণ হইতে থাকে। সুতরাং মনে হয় তাহারা অসম্পূর্ণ রহিল। বঙ্কিমবাবু আমাদিগের মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন না করিলেই ভাল করিতেন। এখন কল্পনা দেখিতে চায় কপালকুণ্ডলাকে নবকুমার কিরূপে পুনর্লাভ করিবেন; পুনরায় সংসারবাসিনী হইয়া কপালকুণ্ডলার বন্য প্রকৃতি কিরূপে ক্রমশঃ প্রশমিত হইবে; প্রশমিত হইলে কপালকুণ্ডলা কত সহস্র গুণে অধিকতর রমণীয়তা ধারণ করিবেন। কল্পনা দেখিতে চায় কাপালিকের মন্ত্রণাজাল কতদূর প্রসারিত হইতে পারে এবং সেই মন্ত্রণা মধ্যে কাপালিকের অন্তঃপ্রকৃতি কতদূর উন্মেষিত হইতে পারে। কল্পনা দেখিতে চায় বাঙ্গালিনী পদ্মাবতীর প্রেমবেগ কোথায় প্রশান্তিলাভ করে, তাহার বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার কতদূর প্রসারণ হইতে পারে অথবা আগ্রার রাজপ্রাসাদের চতুরা রমণী সপ্তগ্রামের

বাঙ্গালিনী হইয়া কতদূর প্রকৃতিমধুরা হইতে পারে। আমাদিগের কল্পনার আকাঙ্ক্ষা অনেক। আমাদিগের কল্পনা যেরূপ যাহাকে দেখিতে চাহে বাস্তবিক তিনি বঙ্কিমবাবুর হস্তে সেইরূপ প্রবর্দ্ধিত ও উন্মেষিত হইয়া দাঁড়াইতেন কি না তাহা আমরা জানি না, এবং জানি না বলিয়া আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা আরও বর্দ্ধিত হয়। মনে করি বঙ্কিমবাবু হয়তো তাহাদিগকে অন্যবিধরূপে আরও কত সুন্দরতর, কত মহত্তর করিতে পারিতেন। এইজন্য বঙ্কিমবাবুর এই কল্পনাগুলির সম্পূর্ণতা না দেখিয়া আমাদিগের কিছুতেই ক্ষোভ নিবারণ হইতেছে না, সে যাহা হউক, কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমবাবু এই চিত্রপুত্তলিগণকে কোথায় রাখিয়া গিয়াছেন এক্ষণে তাহারই পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

এ গ্রন্থের প্রধান চিত্র নায়িকা কপালকুণ্ডলা। তাহারই চরিত্র, তাহারই প্রকৃতি বিশেষরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য যাবতীয় ঘটনার আয়োজন ও গ্রন্থায় ব্যাপার কল্পনার সৃষ্টি। আমরা ঋষিকুমারী শকুন্তলাকে দেখিয়াছি—তিনিও জনসমাজ-বিদূরে বনবাসে চিরকাল প্রতিপালিতা। কিন্তু তাঁহার সেই বনবাসেই গৃহস্থের সমস্তই ছিল। অতি উচ্চকুলে শকুন্তলার সমুদ্ভব হয়। পুরসুন্দরী মেনকা তাঁহার জননী; মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহার জন্মদাতা। মহর্ষি কণ্বের পবিত্র আশ্রমে তাঁহার আবাস। তাপসগণ তাঁহার ভ্রাতৃস্থানীয়, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা তাঁহার সহচরী। মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে অপত্য-নির্বিশেষে লালন পালন করিতেন, সদাই সদুপদেশ দিতেন এবং সদনুষ্ঠানে ব্রতী করিয়া রাখিতেন। ঋষি ও তপস্বিগণের পবিত্র চরিত্র, দয়া ধর্ম্ম, স্নেহ মমতা, সকলই শকুন্তলা দর্শন ও শিক্ষা করিতেন। গৌতমী তাঁহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ও স্নেহ করিতেন। সুতরাং শকুন্তলার, বনবাস, বনবাসই নহে। সুতরাং শকুন্তলার প্রকৃতি যে অতি মধুরা হইবে তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বিচিত্র এই, "কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি এত মধুরা হইল কেন? তাঁহারই যথার্থ বনবাস ছিল—নির্জ্জন, নির্ম্মম বনবাস। তিনি শকুন্তলার ন্যায় সৎকুলোদ্ভবা নহেন। তিনি শকুন্তলার ন্যায় পবিত্র-মহর্ষি-হস্তে প্রতিপালিতা নহেন। তিনি একজন নৃশংস তান্ত্রিকের হস্তে প্রতিপালিতা। তান্ত্রিকের নির্দ্দয় ক্রিয়াকলাপই তাঁহার আদর্শ স্থানায়। তথাপি নারীহৃদয় নির্দ্দয়-সহবাসেও নিতান্ত কঠোর হইতে পারে নাই। তথাপি কপালকুণ্ডলার হৃদয় কুসুমসুকুমার ছিল। তাঁহার কোমল দয়াপূর্ণ হৃদয় নবকুমারের জন্য ব্যথিত হইল। তিনি সপত্নীর হিতার্থ পৃথিবীর সকল সুখই পরিত্যাগ করিলেন। তিনি এই দয়ার ব্যবহার কোথায় শিখিলেন? তাঁহার এই হৃদয়-সৌকুমার্য্য তাপসকুমারী শকুন্তলার হৃদয়-

সৌকুমার্য্য অপেক্ষাও গরীয়ান্। কবি, বোধ হয়, স্বীয় নায়িকার এইরূপ প্রকৃতি-গৌরব সম্বর্দ্ধনার্থই তাঁহাকে কাপালিকের হস্তে সমর্পণ করিয়া নির্জ্জন বনবাসে সংরক্ষিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু ঠিক তাহাই নহে। একটি অপূর্ব্ব বনবাসিনী রমণীর সৃষ্টি করিবার জন্যই, কবি তাঁহাকে আশৈশব প্রকৃত বনবাসে সংরক্ষিত করিয়াছেন। আমরা প্রকৃত বনবাসিনী বালিকার মনে মনে কেবল কল্পনা করিতে পারি। বঙ্কিমবাবু সেই কল্পনাকে জীবিত করিয়াছেন—তাহাকে জীবনের বিষম কার্য্যক্ষেত্রে অবতারণ করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা সেই কল্পনার অবয়ব। আমরা কপালকুণ্ডলাতে দেখিতে পাই, সেই অবয়বী কল্পনা সংসারক্ষেত্রে কিরূপ কার্য্যশীল হয়। আমরা অনেক তাপসকুমারী বনবাসিনীর বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রকৃত বনবাসিনী বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি শকুন্তলা বনবাসে কেমন সংসারিণী ছিলেন। তাঁহার বনবাসের সহিত কপালকুণ্ডলার বনবাসের কত প্রভেদ! অপরাপর তাপসকুমারীর বনবাসের সহিত ও কপালকুণ্ডলার বনবাসের বিস্তর প্রভেদ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কপালকুণ্ডলা কখন সংসারাশ্রমিণী হয়েন নাই। চিরকাল নির্জ্জন বনবাসেই প্রতিপালিতা। তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতিকে প্রকৃত বন্য প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার সেই বন্য প্রকৃতি সংসারে প্রবেশ করিয়া কিরূপে ক্রমশঃ প্রশমিত ও পরিণত হইতেছিল, বঙ্কিম বাবু কপালকুণ্ডলার কল্পনায় তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা বনত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বন্য প্রকৃতির প্রশান্তির সর্ব্বপ্রকার অবস্থা কপালকুণ্ডলার ক্ষুদ্র উপাখ্যানে সমুদায় কল্পিত হয় নাই। সেই প্রশান্তির প্রারম্ভ মাত্র কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অবস্থার কল্পনা প্রদর্শন করিতে হইলে কপালকুণ্ডলার দ্বিতীয়ভাগ রচনা করিতে হয়। কপালকুণ্ডলার প্রথমভাগে দেখি তাঁহার হৃদয় আজিও সম্যক্ প্রস্ফুরিত হয় নাই, সেই হৃদয় বহুকালে সংসারাশ্রমে কি প্রকার ভাব ধারণ করিবে তাহা আমরা আজিও সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই নাই। কপালকুণ্ডলায় প্রকাশিত উপাখ্যান ভাগে কেবল দেখিতে পাই, তাঁহার স্বাধীন ও বন্য প্রকৃতি আজিও সম্যক্ প্রদমিত হয় নাই। তাঁহার সংসারানভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। বনত্যাগ করিয়া শিবিকারোহণে নবকুমারের স্বদেশাভিমুখে যাইতেছেন এমত সময়ে কপালকুণ্ডলা "অকপট হৃদয়ে কৌটা সমেত সকল গহনাগুলিন ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কারগুলিনও খুলিয়া দিলেন।" সংসার ধামে প্রবেশ করিবামাত্র এই তাঁহার প্রথম কার্য্য—বনবাসিনী বালিকার প্রথম পরিচয়।

তাহার বন্য প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিচয় সপ্তগ্রামের অবরোধে শ্যামাসুন্দরীর সহিত সম্ভাষণ সময়ে। সেই দৃশ্যটি কি সুন্দর! কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি-পরিচয়ের কি সুস্পষ্ট উদাহরণ! অবরোধে শ্যামাসুন্দরীর পার্শ্বে কপালকুণ্ডলাকে স্থাপিতা করিয়া বঙ্কিমবাবু কপালকুণ্ডলার বন্য-প্রকৃতিকে অধিকতর উজ্জ্বলিত করিয়াছেন। শ্যামাসুন্দরী সংসারাশ্রমবাসিনীর প্রধান আদর্শস্থানীয় ষোড়শী প্রমোদিনী—বঙ্কিমবাবু একটী মাত্র দৃশ্যে তাঁহার সহিত কপালকুণ্ডলার বৈলক্ষণ্য পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রকার বিপরীত চিত্রেই বৈলক্ষণ্যের উজ্জ্বলতা বিলক্ষণ প্রভাসিত হয়। আমরা এই দৃশ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া দেখাইতে পারি না, বঙ্কিমবাবু কেমন নিপুণতম চিত্রকরের ন্যায় তাঁহার ছবি সকল অঙ্কিত করেন; কেমন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য সকল কল্পনা করিয়া এরূপ ভাবে কল্পিত চিত্র সকলকে সংস্থিত করেন, যদ্দ্বারা তাহাদিগের প্রকৃতি ও দ্রষ্টব্য গুণাদি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হয়। এই প্রকার সংস্থান সকল * কল্পনা করিয়া বঙ্কিমবাবু উপন্যাস রচনায় এত গৌরব লাভ করিয়াছেন। এই প্রকার সংস্থান রচনায় তাঁহার উপাখ্যান সকলকে জীবিত করিয়া তুলে। তিনি সংস্থান রচনায় বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় কবি, বাঙ্গালায় কেন, অন্যান্য ভাষায়ও অল্প লেখকেরই এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তুল্য মূল্য হয়। সে যাহা হউক, নিম্নে সপ্তগ্রামের অবরোধের দৃশ্যটি উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠকগণ কপালকুণ্ডলার প্রথম অবরোধ চিত্র অবলোকন করুন।

"শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃণ্ময়ীর কেশতরঙ্গ-মালা তুলিয়া কহিল, 'তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না?'

মৃণ্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, 'ভাল আমার সাধটী পূরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে?'

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না!

শ্যা। কেন? দেখিবি? তোর যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান?

মৃণ্ময়ী কহিলেন "না"।

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোণা হয়।

মৃ। তাতে কি?

শ্যা। মেয়ে মানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি?

* Situations.

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস।

মৃণ্ময়ী কহিলেন 'ভাল বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোণা হলেম। চুল বাধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম; খোপায় ফুল দিলাম; সিঁথিতে চন্দ্রহার পরিলাম; কানে দুল দিলাম; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোণার পুতলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ?'

শ্যা। তবে শুনি দেখি তোমার সুখ কি?

মৃণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন 'বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্র-তীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।'

শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে যে মৃণ্ময়ী উপকৃত হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন; কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন 'এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?'

মৃ। উপায় নাই।

শ্যা। তবে করিবে কি?

মৃ। অধিকারী কহিতেন ''যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।'' শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া কহিলেন 'যে আজ্ঞা ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল?'

মৃণ্ময়ী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'যাহা বিধাতা করাইবেন তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে?'

শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল কেন?

মৃণ্ময়ী কহিলেন 'শুন। যে দিন স্বামির সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলেম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে আশঙ্কা হইতে লাগিল; ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলেম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না—অতএব কপালে কি আছে জানি না।'

মৃণ্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপূ।

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

জাতীয় অভ্যুত্থান ও ইহার পতন।

চতুর্থ প্রস্তাব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে দিন হইতে কার্ব্বোন্যারোগণ ইতালীর উদ্ধার সাধনের জন্য একজন রাজার অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদিগের পতন আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতেই তাঁহারা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইলেন।

রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উপর যে কার্ব্বোন্যারোদিগের বিশেষ আস্থা ছিল এরূপ নহে; কারণ তাঁহারা আপনাপনির মধ্যে রাজতন্ত্র লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেও ত্রুটী করিতেন না। তত্রাপি তাঁহারা যে এত আদরের সহিত ইহাকে গ্রহণ ও এত উৎসাহের সহিত ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব ছিল। প্রথমতঃ তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে ইহা তাঁহাদিগের বল প্রাপ্তির প্রধান কারণ হইবে। দ্বিতীয়তঃ নিম্ন-শ্রেণীস্থ প্রজামণ্ডলীকে তাঁহারা অতিশয় ভয় করিতেন; তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল তাহাদিগকে শৃঙ্খলোন্মুক্ত করিলে—তাহাদিগের হস্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে—বিপ্লবের বিশেষ উপকার না হইয়া বরং রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, নির্ম্মুক্ত বৃষের ন্যায় তাহাদিগকে শেষে আয়ত্ত করা দুরূহ হইবে; তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল রাজতন্ত্রের আশ্রয় লইলে তাঁহাদিগকে এই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িতে হইবে না অথচ তাঁহাদিগের অভীষ্ট কিয়ৎ-পরিমাণে সংসিদ্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে এই অভ্যুত্থানের সহিত কোন রাজনাম সংশ্লিষ্ট করিলে তাঁহারা অষ্ট্রিয়ার ক্রোধানল কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত করিতে পারিবেন এবং—ইংলণ্ড কি ফ্রান্স—কোন না কোন রাজতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই জন্যই তাঁহাদিগের নেত্র পীড্‌মণ্টের চার্লস আল্‌বার্ট এবং নেপল্‌সের প্রিন্স ফ্রান্সেস্‌কোর উপর পতিত হইল। চার্লসের প্রকৃতি স্বভাবতই যথেচ্ছচারপ্রবণ ছিল; এবং তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা বৃত্তি অতিশয় তেজস্বিনী সত্ত্বেও মহত্ত্ব অভাবে তাহা কখনই পরিতৃপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়—ফ্রান্সেস্‌কো—জীবনের প্রারম্ভ হইতেই কপটাচারী ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। কার্ব্বোন্যারোগণ এবম্ভূত দুই অযোগ্য রাজপুরুষের হস্তে ইতালীর ভাবী আশা ন্যস্ত করিলেন—ইতালী উদ্ধারের সমস্ত আয়োজন ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে এই দুই রাজপুরুষের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এবং মতও স্বতন্ত্র।

জানিয়াও তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শীর ন্যায় এরূপ পরস্পর-বিসম্বাদী উদ্দেশ্য ও মতের সামঞ্জস্যের জন্য ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিলেন।

রাজনামে—রাজপ্রতাপে—তাঁহাদিগের দলে লোক-সংখ্যা অধিক হইবে, কার্ব্বোন্যারোগণ এই আশাতেই রাজ-চরণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু উপস্থিত ঘটনাবলী দ্বারা অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হইল যে শুদ্ধ লোকের সংখ্যায় কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি আসক্তি এবং যে কার্য্যে অবতীর্ণ হইবে সেই কার্য্যের প্রতি আসক্তিই কৃতকার্য্যতা লাভের প্রধান মূল। বিপ্লবের অধিনায়কদিগের উচ্চ লক্ষ্যের অসদ্ভাবের অনিবার্য্য পরিণাম কি, উপস্থিত ঘটনাবলী দ্বারা তাহাও বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইল।

কার্ব্বন্যারোদিগের প্রথম উদ্যম কৃতকার্য্য হইল। তাঁহাদিগের পথে কোন গুরুতর বিঘ্নপরম্পরা অবস্থিত ছিল না। কিন্তু এই কৃতকার্য্যতা অনতিবিলম্বেই ঘোরতর অন্তর্ব্বিদ্রোহে পরাভূত হইল। প্রলয়-কার্য্য মাত্র সম্পাদিত হইয়াছে—এমন সময় প্রত্যেক কার্ব্বোন্যারো আপন আপন ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও ব্যক্তিগত মতামত লইয়া পরস্পরের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রলয় কার্য্যে তাঁহাদিগের সকলেরই ঐকমত্য ছিল। কিন্তু সৃষ্টি কার্য্যে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ উপস্থিত হইল। কতকগুলির মত যে,—সমস্ত ইতালী এক রাজতন্ত্রের অধীন হয়, অনেকের ইচ্ছা যে ইতালী ফ্রান্স বা স্পেনের সহিত মিলিত হয়; কাহারও কাহারও ইচ্ছা যে ইতালীতে একমাত্র সাধারণ তন্ত্র সংস্থাপিত হয়; আবার অনেকের ইচ্ছা যে ইহা বহু সাধারণ তন্ত্রে বিভক্ত হয়। কিন্তু কাহারও ইচ্ছা সফল হইল না—সুতরাং সকলেই আপনাদিগকে প্রতারিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তৎকালে ইতালীতে একটী প্রোভিসনল্ বা সাময়িক গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হয়। কার্য্যপ্রারম্ভেই সভ্যদিগের পরস্পর-বিবাদে তাঁহাদিগের কার্য্য-স্রোত ব্যাহত হয়। কেহ কেহ কিছুই করিব না বলিয়া বসিয়া রহিলেন, আবার অনেকে শুদ্ধ কিছু না করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে, অপরে কিছু করিতে উদ্যত হইলেও, তাহার ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এই জন্যই সেই সকল গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ অব্যবস্থিততা ও অনিশ্চিততা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল গবর্ণমেণ্ট যদি দৃঢ়তার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন। যাহাহউক এই সকল কারণে ইতালীর যুবকবৃন্দ ও প্রজা সাধারণ অচিরকাল মধ্যেই নিরুৎসাহ, ছিন্ন ভিন্ন, এবং লক্ষ্য-শূন্য হইয়া পড়িল।

রাজতন্ত্রতা বিপ্লবের অধিনায়ক হওয়ায়, কার্য্যের সাধক মনোনীত করণে কার্ব্বোনারাদিগের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। রাজতন্ত্রতার সহিত অনিবার্য্যরূপে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য কর্ত্তব্যাবলী ও অসংখ্য বিশ্বাস, বিদ্রোহ-জীবনের নির্ভীক পরিণতি হইতে দিল না। কিন্তু ন্যায়ের রাজ্য এক সময়ে না এক সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। বিদ্রোহের অধিনায়কেরা অসন্দিগ্ধরূপে খ্যাপন করিলেন যে প্রজা-সাধারণ আত্মোদ্ধারে বা আত্ম-শাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম, এই জন্য তাঁহারা প্রজাসাধারণকে আত্মোদ্ধার-সাধক অস্ত্র প্রদান দ্বারা বিদ্রোহের অধিনয়ন কার্য্যে কোনও অংশ প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রজারূপ বলের স্থানে অন্য বলের বিনিযোজনা করিতে হইয়াছিল—এই অভাব পূরণের জন্য তাঁহাদিগকে অগত্যা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল কি হইল? তাঁহারা শরণাগত হইলেন—আপনাদিগের অধিকার, আপনাদিগের স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে বিসর্জ্জন দিলেন—আপনাদিদিগের মান সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা কি পাইলেন? মিথ্যা আশা! মিথ্যা প্রতিজ্ঞা! তাঁহারা রাজপুরুষদ্বয়ের হস্তে মন্ত্রী ও সেনাপতি মনোনীত করণের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু তাহারই বা ফল কি হইল? দেশশত্রু বিশ্বাসঘাতক ও অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ইতালীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী অর্পিত হইল—ইতালীর দুর্দ্দশা—যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা—অধিকতর হইল। তাঁহাদিগের পাপের শেষ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অবশেষে তাঁহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিতে হইল যে—তাঁহাদিগের সমস্ত আশা ভরসার স্থল সেই রাজপুরুষদ্বয়ই শত্রুশিবিরে পলায়ন করিলেন এবং পলায়ন করিয়া, যে বিদ্রোহ তাঁহারা আপনারাই উত্তেজিত করেন, তাহারই বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলেন।

প্রিন্‌স্ অ্যালবার্ট ও প্রিন্‌স্ ফান্‌সেস্‌কোর পলায়নের পরেই ইতালীয় জাতীয় অভ্যুত্থানের পতন আরম্ভ হয়। নিয়াপলিটান্ অভ্যুত্থানের সর্ব্ব প্রথমেই পতন হয়। নিয়াপলিসের পতনের প্রথম লক্ষণ বেনেভেণ্টো এবং পণ্টিকর্ভো নামক চির-সংশ্লিষ্ট নগরীদ্বয়ের পরিত্যাগ। দ্বিতীয় লক্ষণ নিয়াপলিটান্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষণা হয় যে আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাঁহারা রণে প্রবৃত্ত হইবেন না। তৃতীয় লক্ষণ যৎকালে অষ্ট্রীয় সৈন্য ইতালীর হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত, তখনও নিয়াপলিটান্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উদ্ঘোষণ হয় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয় সেনা নিয়াপলিটান্ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ইহাতে পদার্পণ না করিতেছে, ততক্ষণ তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না।

পীড্‌মণ্টিস্ অভ্যুত্থান ঠিক সেইরূপ ভ্রমে পতিত হয়। ইহার অধিনায়কেরা নিয়াপলিসের দৃষ্টান্তে "আপনাদিগকে

অনায়াসেই ভ্রম হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন—একইরূপ ভ্রমের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই নিবারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তাঁহারা করিলেন না, সেইরূপ ভ্রমেই তাঁহাদিগেরও পতন হইল। যৎকালে লম্বার্ডীর সমস্ত লোক অভ্যুত্থানোন্মুখ হইয়াছিল, যৎকালে কেবলমাত্র ২৫০০০ পঁচিশ হাজার পীডমণ্টিস্ সৈন্য লম্বার্ডদিগের সহিত মিলিত হইলে লম্বার্ডের বিপ্লব সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিত—কারণ তৎকালে লম্বার্ডীতে যে অষ্ট্রিয় সৈন্য ছিল তাঁহারা সংখ্যায় এত অল্প যে এরূপ জাতীয় অভ্যুত্থান কখনই নিবারণ করিতে পারিত না—তখনও তাহাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য প্রেরণ করা হইল না, এই সাহায্য তাঁহারা অভ্যুত্থানের এক সপ্তাহ মধ্যে অনায়াসে প্রেরণ করিতে পারিতেন। এইরূপে একে একে নিয়াপলিস্ পীড্‌মণ্ট্ ও লম্বার্ডী পতিত হইল। ইহাদিগের পতনে ইতালীর হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইল। ইতালীর উদ্ধার সাধন দূর-বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

চার্লস্ আল্‌বার্ট—যিনি বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের অধিনায়ক ছিলেন—বিজ্ঞাপন জারি করিলেন যে, যে সকল সৈন্য বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, বিদ্রোহিদলের সহিত সম্পূর্ণরূপে সংশ্রব পরিত্যাগ করিলে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। বিদ্রোহী সমাজ রুসীয় দূত মস্‌নিগোর শরণাগত হইলেন। রুসীয় দূত স্বীকার করিলেন যে অষ্ট্রিয় গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা প্রদান করাইবেন এবং এরূপ আশাও দিলেন যে তিনি ইতালীতে কোনপ্রকার নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

এই বিদ্রোহী সমাজের অধিকাংশ সভ্যেরই নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা প্রতিবাদাসাহ। সকলেই দীক্ষিত কার্ব্বোন্যারো। তাঁহারা যে কোন স্বার্থ সাধন মানসে বিপ্লব হইতে নিরস্ত হইলেন তাহা নহে। একদিকে বিপ্লবের আনুষঙ্গিক নৈমিত্তিক বিশৃঙ্খলা তাঁহাদিগের মনে পড়িল, অন্য দিকে রাজ্য-তন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা মনে পড়িল। উভয় পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা অগত্যা শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। যে লোককে তাঁহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; যে ব্যক্তি—তাঁহাদিগের মনে ভয় ছিল—এক দিন তাঁহাদিগকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিলেও করিতে পারে; তাঁহারা অগত্যা তাহার নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

কোন্‌টী ন্যায়-সঙ্গত তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না এরূপ নহে; কিন্তু বুঝিয়াও ব্যক্ত করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা পুরাতন রাজকর্ম্মচারী ও পুরাতন সেনাপতিগণকে পরিবর্ত্তিত না করিয়া রাজ্যের পূর্ণ সংস্কারে—আমূল পরিবর্ত্তনে—কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজ-

দিগের সঙ্কল্প সুতরাং বিফল হইল। তাঁহারা নোভারার গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট লাটুরের হস্তে এবং সেভয়ের গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট ডাণ্ডিজেনির হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে ইহাঁরা দুই জনেই বিপ্লবের প্রখ্যাত শত্রু।

সময়ের অনিবার্য্যতা ও আবশ্যকতা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়াছিলেন ও বলিয়াও ছিলেন। তথাপি রাজতন্ত্রের শৃঙ্খলার পাছে কোন ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে তাঁহারা ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থিত হইয়াও প্রজাসাধারণকে শস্ত্র প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন; ইলেক্‌টরাল সমাজ আহ্বান করিতে অপরিমিত বিলম্ব করিলেন; প্রত্যুতঃ যে কোন কার্য্য দ্বারা বিপ্লব বিষয়ে প্রজাসাধারণের সহানুভূতি সমুদ্ভূত করা যাইতে পারিত, তাঁহারা তৎসমস্তেই অবহেলা প্রদর্শন করিলেন; অধিক কি জেনোয়াৰ লবণের মূল্য কমানোর জন্য যে বিধি ব্যবস্থাপিত হয় তাহা পর্য্যন্তও তাঁহাবা রদ করিলেন।

এইরূপ অসংখ্য ভ্রমে ও অন্তর্দৌর্ব্বল্যেই কার্ব্বোন্যারোদিগের পতন হইল। যদি তাঁহারা প্রবলতর শত্রুসেনা দ্বারা পরাভূত হইতেন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ গৌরব রক্ষা হইত। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিতার দোষে—আপনাদিগের বৈপ্লবিক কার্য্যপ্রণালীর পরস্পর-বিসম্বাদেই—বাহ্য অন্তরায় বিনাও পতিত হইলেন। তাঁহারা ইতালীর উদ্ধার সাধন করিবেন, অথচ প্রজা-সাধারণকে স্বাধীনতা দিবেন না—তাহাদিগকে অস্ত্র প্রদান করিবেন না! তাঁহারা স্বদেশকে অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবেন, অথচ বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যের ভার অষ্ট্রিয়ার দাস কতিপয় রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিবেন! তাঁহারা প্রচলিত শাসনপ্রণালীতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিবেন, অথচ প্রচলিত শাসনপ্রণালীর প্রধান সমর্থক পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত রাখিবেন! কিন্তু অসম্ভব কে সম্ভবপর করিতে পারে?

কার্ব্বোনারোগণ ম্যাট্‌সিনির নিকট এইরূপ চিত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন—মস্তকশূন্য এক প্রকাণ্ড ও সবল দেহ—এক সম্প্রদায়, যাহাতে উদার ইচ্ছার অপ্রতুল নাই বটে, কিন্তু লক্ষ্য ও উপায়ের কোনও সামঞ্জস্য নাই, এবং অন্তর্নিগূহিত জাতীয় ভাবকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য যে পরিমাণ যুক্তি ও যে পরিমাণ বহুদর্শন থাকা আবশ্যক তাহার অস্তিত্বের অভাব আছে।

কার্ব্বোন্যারোদিগের বিশ্বনাগরিকতায় (Cosmopolitanism) তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্যকরী শক্তি অতিশয় ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল। জগতের মঙ্গলসাধন তাঁহাদিগের কার্য্যের লক্ষ্য হওয়ায়, তাঁহারা কার্য্যতঃ কোন দেশেরই

মুঙ্গলসাধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু কার্ব্বোন্যারোগণ একটী গুরুতর বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহারা যে বীরোচিত অবিচলিততার ভাব শিক্ষা দ্বারা লোকের মনে চির-অঙ্কিত করিয়াছিলেন, যে নির্ভীকতার সহিত তাঁহারা স্বদেশের কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিতেন,—সেই অবিচলতা ও নির্ভীকতার সহস্র দৃষ্টান্ত ইতালীয় জাতির অন্তরে এমন একটী জাতীয় একতার ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল যে, তাহা হইতেই ইতালীর ভাবী জাতীয় মিলন ও মহতী ভবিষ্য অবদান-পরম্পরার পথ উন্মুক্ত হয়; তাহা দ্বারাই কি সম্ভ্রান্ত কি অসম্ভ্রান্ত, কি ধর্ম্মব্যবসায়ী কি সাহিত্যোপজীবী, কি সিবিল্‌ কি সৈনিক—ইতালীর সকল শ্রেণীর লোকই এক লক্ষ্যে দীক্ষিত হন।

এই সময় ইতালীতে যে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং যে অমানুষ সহিষ্ণুতা ও নির্ভীকতার সহিত কার্ব্বোনারো দণ্ডিতগণ আপনাদিগের দণ্ড গ্রহণ করেন, তাহা পাঠ করিলে তাদৃশ নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতি মৃত ব্যক্তিরও হৃদয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে, এবং কার্ব্বোন্যারোদিগের প্রতি পাষাণ হৃদয়ও ভক্তিরসে বিগলিত হয়। ইতালীয় অভ্যুত্থান নিবারিত হইলে অসংখ্য কার্ব্বোনারো ষড়যন্ত্রীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। অধিক কি ধর্ম্মোপজীবীরাও এই দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। দক্ষিণ ইতালীতে অসংখ্য, এবং মডেনায় দুই জন মাত্র ধর্ম্মোপজীবী এই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। কার্ব্বোন্যারোগণ কিরূপ নির্ভীকতা ও বীরোচিত ঔদার্য্যের সহিত তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ গ্রহণ করেন, তাহা একটী মাত্র উদাহরণে বিশদীকৃত হইতে পারে। ইঁহাদিগের অন্যতম অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক গুইসেপী আণ্ডিয়োলী যৎকালে শুনিয়াছিলেন যে তিনি ও তৎসহচর কারাবাসিগণের মধ্যে তাঁহারই কেবল প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তৎকালে তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না এবং তিনি এই করুণার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কারাবাসিদিগের নিজ নিজ মুখ হইতে তাহাদিগের বিদ্রোহিতাপরাধ স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য নৃশংস রাজতন্ত্রীয়েরা ভীষণ উপায় সকল উদ্ভাবিত করিয়াছিল। কারাবাসিদিগের পানীয়ের সহিত ইন্‌ ফিউসন অব আট্রোপোস্‌ বেলাডোনা (Infusion of atropos belladonna) নামক ঔষধি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। ইহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বেই মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিত। মস্তিষ্কের এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় কারাবাসিদিগকে যাহাই জিজ্ঞাসা করা হইত, তাঁহারা ভয়ে ও আত্মসংযমাভাবে তাহাই স্বীকার করিতেন। দণ্ড্যেরা স্বমুখে আপনাদিগের অপরাধ

স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইত না, সুতরাং বিনা আয়োজনে তাঁহারা বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হইতেন। এইরূপে অসংখ্য নিরীহ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইল। ক্ষুদ্র মডেনা রাজ্যে ১৪০, পীড্‌মণ্টে শতাধিক এবং লম্বার্ডী নেপল্‌স ও সিসিলিতে অগণ্যসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণ বধ হইল।

বিপদে ধৈর্য্য, অবিচলিত অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং স্বদেশের কার্য্যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে মনুষ্য কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সক্ষম হন, কার্ব্বোনারোদিগের সে সকল গুণের কোনও অভাব ছিল না। তথাপি তাঁহারা এই গুরুতর অনুষ্ঠানে অকৃতকার্য্য হইলেন কেন? এ দুরূহ প্রশ্নের কে মীমাংসা করিবে? আমরা এই অভ্যুত্থান-সমকালিক কার্ব্বোনারোদিগের কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনাকে তাঁহাদিগের পতনের মূল কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি:—প্রথমতঃ কি প্রণালীতে প্রলয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে—এবং প্রলয়কার্য্য সমাপন করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কার্ব্বোন্যারো সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে অথবা প্রজাসাধারণকে তাহার কোনও তালিকা প্রদান করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের বোঝা উচিত ছিল যে কি প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে, এবং কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া শেষেই বা কি কি কার্য্য করিতে হইবে, এ সমস্ত সবিশেষ জানিতে না পারিলে, যাহারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের কার্য্যে সবিশেষ উৎসাহ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ কার্ব্বোন্যারোগণ বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপরই তাঁহাদিগের জয়াশা অধিক পরিমাণে সন্ন্যস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত ছিল যে—আপনারা সক্ষম না হইলে কখনই পরসাহায্যে স্বদেশের উদ্ধার সাধন করা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ যে সকল ইতালীয় অধিবাসী বিদ্রোহের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কার্ব্বোন্যারোগণ তাঁহাদিগেরই হস্তে বিদ্রোহের অধিনীতি ও পরিণতির ভার সমর্পন করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের এ সামান্য জ্ঞান থাকা উচিত ছিল যে বিদ্রোহের সৃষ্টির সহিত যাঁহাদিগের কোনও সংশ্রব ছিল না, বিদ্রোহের ফলাফলের সহিত তাঁহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি থাকিতে পারেনা।

যাহা হউক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে বিদ্রোহিদিগের রাজনৈতিক শিক্ষার উন্নতির একটী স্পষ্ট লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। উচ্চ শ্রেণী ও সৈনিক দলের হস্তক্ষেপ ব্যতীত বিদ্রোহে কৃতকার্য্যতা লাভ অসম্ভব—এই অন্ধ বিশ্বাস এই দ্বিতীয় বিদ্রোহকালে বিদ্রোহিদিগের মন হইতে চলিয়া যায়। ইতালীর বক্ষেই কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি হইতেই এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ সমুত্থিত হয়।

প্যারিসের ত্রৈদিবসিক বিদ্রোহের পর দিন, বলোনার ডাকঘর লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্যারিসের সংবাদ পত্র সকল বলোনার যুবক-বৃন্দের হস্তে আসিয়া পড়িল। যুবকবৃন্দ উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া কাষ্ঠ-মঞ্চকে দণ্ডায়মান হইয়া পরিবেষ্টনকারী শ্রোতৃবৃন্দকে প্যারিসের ঘটনা সকল পড়িয়া শুনাইলেন। উৎসাহ-স্রোত যুবক-হৃদয় হইতে উচ্ছলিত হইয়া প্রবলবেগে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় প্লাবিত করিল। অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে অস্ত্র সংগ্রহ হইতে লাগিল; দলে দলে ইচ্ছা-সৈনিকের* সংখ্যা স্ফীত হইতে লাগিল; এবং অবিলম্বেই সেনানায়ক সকল মনোনীত হইল। এই সংক্রামক উৎসাহ বলোনার রাজসেনাদলের চিত্ত পর্য্যন্তও অধিকার করিল। বলোনার সেনাপতি গবর্ণরকে জানাইলেন যে তাঁহার সৈনিকেরা নগরবাসিদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে অস্বীকৃত। সুতরাং এই বিদ্রোহ-স্রোত অপ্রতিহত বেগে বর্দ্ধিতায়তন হইতে লাগিল।

এই অগ্নি অন্যান্য নগরেও জ্বলিয়া উঠিল। ২রা ফেব্রুয়ারী মডেনার নাগরিকেরা সাইরো মিনোত্তির গৃহের উপর যে কামান-গোলক বর্ষণ করিল, তাহাই জাতীয় অভ্যুত্থানের সঙ্কেত-চিহ্ন স্বরূপ পরিগৃহীত হইল। বলোনা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী বলোনার অধিবাসিগণ তাহাদিগের ডিউক ও তদীয় পারিষদবর্গকে নগরী হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিল। ইমোলা ফেয়েন্‌সা, ফর্লী, কাসেনা এবং রাভেন্না একে একে সকলেই স্বাধীন হইয়া উঠিল। ৭ই তারিখে ফেরারাও তাহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। অষ্ট্রিয় সৈন্য পলায়ন করিল। ৮ই তারিখে পেসারো, ফসোম্‌ব্রোণ, ফেনো এবং অর্বীণো আপনাদিগকে শৃঙ্খলোন্মুক্ত করিল। ১৩ই তারিখে বিদ্রোহাগ্নি প্রথমে পার্ম্মায়, তাহার পরে ক্রমে ক্রমে কামেরিণো, আস্‌কোলি, পেরুজিয়া, তার্ণী, নার্ণী এবং অন্যান্য নগরেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সাধারণ বেগ ও সমবেত উৎসাহোন্মাদের এতদূর শক্তি যে—যে কার্য্য এক যুগে সম্পন্ন হওয়া কঠিন, তাহা কয়েক দিনের মধ্যেই বৈদ্যুতিকবেগে নিষ্পন্ন হইয়া উঠিল। এই উৎসাহ ও বেগ এত বিশ্বজনীন হইয়া পড়িয়াছিল যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণও ইহা দ্বারা উন্মাদিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ বলসাধ্য যুদ্ধ-ব্যাপারে নিযুক্ত হন নাই বটে, কিন্তু গৃহে বসিয়া পতাকা, ককেড্‌স প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যথাসাধ্য বিদ্রোহের সাহায্য করিতে ক্রটী করেন নাই। এদিকে রণবৃদ্ধ বীর পুরুষগণ যুবকবৃন্দের মন বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইতেছে দেখিলে অমনি তাঁহাদিগের দেহ বস্ত্রোন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়া বলিতেন "দেখ, স্বদেশের রক্ষার জন্য আমাদিগের শরীর কত ক্ষত ধারণ করিয়াছে!"

* Volunteers.

এইরূপে ৫এ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশতি লক্ষ ইতালীয় অধিবাসী জাতীয় অভ্যুত্থানের সহিত মিলিত হইল। তাহারা স্বজাতির উদ্ধার সাধনে প্রাণ সঙ্কল্প করিল। তাহারা যে শুদ্ধ আত্মরক্ষণ-পর* সমরের জন্য উদ্যুক্ত হইল এরূপ নহে, পরধর্ষণ† সমরের জন্যও প্রস্তুত হইল।

ক্রমে এই অভ্যুত্থান ইতালীর প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া জাতীয় আকার ধারণ করিল। ইতালীয় ত্রৈবর্ণিক ককেড্ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল। অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে বলোনার যুবকবৃন্দ টস্কানীর আক্রমণে চেষ্টমান হন; মডেনা ও রেজ্জিওর যুবকবৃন্দ মাসানগরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন; এবং অবশেষে জাতীয় সেনা ফর্লোর মধ্য দিয়া নেপাল্স রাজ্য আক্রমণে নীত হইবার জন্য অধিনায়কদিগকে গুরুতর উত্তেজনা করিতে লাগিল। কিন্তু অধিনায়কেরা ঈদৃশ—মূলতঃ লক্ষ্যতঃ ও উপাদানতঃ—জাতীয় বিপ্লবকে প্রাদেশিক অভ্যুত্থানে পরিণত করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বিস্তৃতি ও পরিণতি জীবনের একটী প্রধান ধর্ম্ম, বিপ্লবের অস্তিত্বের মূলসূত্র। বিপ্লবকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে ক্রমেই ইহার পরিধির বিস্তার সাধন করা একান্ত আবশ্যক; কিন্তু বিপ্লবের অধিনায়কেরা ইহার ক্রমিক বিস্তৃতি সাধন না করিয়া ক্রমেই ইহাকে সঙ্কীর্ণতম সীমায় আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিধি দ্বারা নিষেধ করিলেন অতঃপর কেহই বক্তৃতা, রচনা বা কথোপকথন দ্বারা বিদ্রোহ-সূত্রের প্রচার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা পূর্ব্বাগত বিঘ্নরাশি বিদূরিত না করিয়া বরং বিদ্রোহমার্গে নব নব বিঘ্নরাশি সঞ্চিত করিতে লাগিলেন। বিশ্বব্যাপিনী জাতীয়তাই* এই অভ্যুত্থানের প্রকৃত জীবন। ইতালীয় জাতিই এই অভ্যুত্থানের একমাত্র জনক। কিন্তু তাঁহারা সেই ইতালীয়জাতির উপর নির্ভর না করিয়া ইতালীর বহিশ্চর জাতিদিগের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল; যেরূপ উৎসাহ অধ্যবসায় ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য করিলে তাঁহারা অবশ্যম্ভাবী সমরে জয় লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারা তাহার কিছুই দেখাইলেন না; বরং এরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে শান্তির পরিরক্ষণ ও পুনঃসংস্থাপনের উপরেই বিপ্লবের জয় প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে, এবং শান্তি যে শুদ্ধ সম্ভবপর এরূপ নহে—ইহা অনায়াস-রক্ষ্য ও অনায়াস-লভ্য; সুতরাং যে কোন কার্য্য দ্বারা শান্তিভঙ্গ বা শান্তির ব্যাঘাত সম্পাদন হওয়া সম্ভব, তাহা হইতে সর্ব্বথা বিরত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিদ্রোহের উপাদান সামগ্রীর প্রকৃতি এবং বিদ্রোহী প্রদেশ সকলের অবস্থান-বৈষম্য

* Defensive. † Offensive.

* Nationality.

জন্য—এই বিদ্রোহ সুতরাং সাধারণতন্ত্র-প্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল; এরূপ স্থলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সকলের সহানুভূতি লাভ অসম্ভব; এই প্রজা-সাধারণের সহানুভূতি সমাকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত অধিনায়কদিগের প্রাণপণে যত্ন করা উচিত ছিল। প্রজাসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করার প্রধান উপায়, তাহাদিগের নিকট অকপটভাবে আপনাদিগের সমস্ত মনোগত ভাব খুলিয়া বলা; কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া রাজবৃন্দের অনুগ্রহ-ভিখারী হইলেন, এবং সেই জাতীয় অভ্যুত্থানকে রাজসভার জটিল মন্ত্রণাজালে পর্য্যুদস্ত করিলেন।

অপরকে কার্য্যে উত্তেজিত করিতে হইলে, আপনাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে; অপরের কার্য্যকরী শক্তি উদ্দীপিত করিতে হইলে, আপনাদিগের কার্য্যকরী শক্তি দেখাইতে হইবে; অপরের মনে বিশ্বাসের ভাব অঙ্কুরিত করিতে হইলে, আপনাদিগকে বিশ্বাসী হইতে হইবে; কিন্তু তাঁহারা তাহার কিছুই করিলেন না। তাঁহাদিগের সকল কার্য্যেই দুর্ব্বলতা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা-জনিত ভীতি পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। সুতরাং বিদ্রোহী প্রদেশ সকলে তাঁহাদিগের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গভীর হতাশতার ভাব ইতালীর সমস্ত প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের উপর ইতালী উদ্ধারের জন্য নির্ভর করার বিষময় ফল কার্ব্বোনারোগণ ক্রমেই উপভোগ করিতে লাগিলেন। ফ্রান্স অসন্দিগ্ধরূপে ঘোষণা করেন যে তিনি কোন প্রকারেই বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্য-স্রোতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবেন না। এই ঘোষণা সত্বেও ইতালীয় অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইতালীর প্রভাবশালী লোকগণ লাটুর মবুর্গ নামক লেপ্‌লস-স্থিত ইতালীয় দূতের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে—"যদি ইতালীতে একটী জাতীয় বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য ইতালীয়েরা অষ্ট্রিয়ার ভয়ঙ্কর কোপানলে পতিত হন, তাহা হইলে ফ্রান্স ইতালীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন।" দূত স্বহস্তে সেই পত্রেরই পার্শ্বদেশে লিখিয়া দেন, যে "যদি এই নবপ্রতিষ্ঠিত শাসনসমিতি বিশৃঙ্খল আকার ধারণ না করেন, যদি তাঁহারা ইউরোপ-প্রচলিত সাধারণ নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম না করেন, তাহা হইলে ফ্রান্স অবশ্যই এই বিপ্লবের সমর্থন করিবেন।" কিন্তু বিপ্লব উপস্থিত হইলে ফরাশী দূত অম্লানবদনে এই স্বহস্ত-লিখিত প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিলেন।

ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভার সভাপতি লাফিট, সুবিখ্যাত ইতিহাস-লেখক গিজো, পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী, এবং ডিউক্ অব্ ডাল্‌মেসিয়া প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ফ্রান্স বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্য-স্রোতের

অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া প্রজাসাধারণের শান্তি হরণ করিবেন না বটে, কিন্তু বহিশ্চর রাজ্য সকলের প্রজাবৃন্দের স্বাধীনতা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে ফ্রান্স তাহাদিগকে অনুকূল হস্ত প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না; স্বাধীনতার পরিরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন সাধনই ফ্রান্সের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য; উদাসীন থাকিয়াই হউক আর লিপ্ত হইয়াই হউক, ফ্রান্স তৎসাধনে কখনই ভীত বা বিমুখ হইবেন না। কিন্তু এই সকল আশ্বাস বাক্য সময়ে কোনও ফল প্রসব করিল না।

এই সকল আশ্বাস বাক্যে বিপ্লবের অধিনায়কদিগের স্বভাবতঃই এরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে বিপদ্‌কালে ফরাশিরাজ লুই ফিলিপ্ কখনই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত সঙ্গত হইলেও তাঁহাদিগের অন্য কোটি (Extreme) কল্পনা করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।

কার্ব্বোন্যারোগণের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে লুই নিতান্ত ধর্ম্ম-ভীরু ও একান্ত প্রতিজ্ঞাপালন-তৎপর হইলেও আত্ম-রাজবংশের ধ্বংস সম্ভাবনায় কখনই ইতালী উদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন না। মনে কর এই সময় ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল; সমস্ত ইউরোপ এই যুদ্ধে দুই ভাগে বিভক্ত হইল—যাঁহারা উন্নতিশীল তাঁহারা ফ্রান্সের সহিত যোগ দিলেন, যাঁহারা স্থিতি-শীল তাঁহারা অষ্ট্রিয়ার সহিত মিলিত হইলেন। লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট অতিশয় দুর্ব্বল এবং প্রকৃতি-সহানুভূতি-বিরহিত ছিল। এদিকে সাধারণ তন্ত্রের ভাব প্রজাদিগের মনে অদ্যাপি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল; সুতরাং তাহারা সুযোগ পাইলেই—লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকারে শিথিলিত ও পর্য্যুদস্ত হইলেই—ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সতত অভ্যুদ্যত। অষ্ট্রিয়ার সহিত সমরে ফ্রান্স জয় লাভ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সংঘর্ষে লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িত; সুতরাং ফ্রান্সে প্রজাদিগের নবীন উৎসাহে একটী নবীন সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারিত। এরূপ আত্ম-বিধ্বংসকারি কার্য্যে লুই কেন প্রবৃত্ত হইবেন? ইতালীয় উদ্ধার সাধন তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে, কিন্তু আত্ম-বিনাশে তিনি তাহা করিবেন কেন? কার্ব্বোনারোদিগের এই বিষয় একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

কিন্তু ফরাশি গবর্ণমেণ্টকে প্রতিজ্ঞাপালনে বাধ্য করিবার দুইটী সহজ উপায় ছিল—প্রথমতঃ যদি কার্ব্বোনারোগণ ইতালীয় বিদ্রোহ দীর্ঘকালস্থায়ী করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ক্রমে ফ্রান্সের প্রজাসাধারণের মনে ইহার প্রতি নিশ্চয়ই গভীর সহানুভূতি সমুদ্ভূত হইত; সুতরাং সাধারণ মত ইতালীয় পক্ষ সমর্থন করিলে, ফরাশী গবর্ণমেণ্ট আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা পালন না

করিয়া থাকিতে পারিলাম না ;—দ্বিতীয়তঃ প্রসিয়ার সসৈন্য বেলজিয়মে আসার ন্যায়, অষ্ট্রিয়ার সসৈন্য পীড্‌মণ্টে আসা ফ্রান্সের চিরকালই অরুন্তুদ; বিদ্রোহ ইতালীর সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ পীড্‌মণ্টে—পরিব্যাপ্ত হইলে অষ্ট্রিয়া নিশ্চয়ই সসৈন্য পীড্‌মেণ্টে আসিয়া উপস্থিত হইত; ফ্রান্স ইহা কখনই সহ্য করিত না ; অগত্যা ফ্রান্সকে ইতালীয় বিদ্রোহের সাহায্য করিতে হইত।

অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করিয়া লুই ফিলিপের দয়া ও সমানুভূতি আকর্ষণ করাব চেষ্টা উন্মত্ততা প্রকাশ বই আর কিছুই নহে। শান্তিভঙ্গনিবারণী সন্ধির অনুরোধে অষ্ট্রিয়া বিদ্রোহী ইতালীর আক্রমণ হইতে বিরত থাকিবে, এরূপ আশা অধিকতর উন্মত্ততার কার্য্য সন্দেহ নাই। অষ্ট্রিয়া বরং আপনাকে সমবসাগরে প্রক্ষিপ্ত করিবে, তথাপি স্বসন্নিকৃষ্ট লম্বার্ডো-ভিনিসীয় প্রদেশে স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হইতে দিবে না।

তথাপি বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের কোন ও আয়োজন করিলেন না। এদিকে অষ্ট্রিয়া সময় পাইয়া ফ্রান্সের সহিত মনোরাগের যে সকল কারণ ছিল, তাহা মিটাইয়া লইল, এবং ইতালী আক্রমণের জন্য সসজ্জিত হইতে লাগিল। তখনও বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট এই অমূলক বিশ্বাস ধরিয়া বসিয়া রহিলেন যে অষ্ট্রিয়া ইতালী আক্রমণ করিবে না এবং বিদ্রোহকে নির্ব্বিবাদে ইতালীর বক্ষঃস্থলে বদ্ধমূল হইতে দিবে ; এই জন্য বিদ্রোহিদিগের বিদ্রোহ-প্রণালীর এইটী প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল যে অষ্ট্রিয়া যেন ইতালী আক্রমণের কোনও ন্যায়-সঙ্গত কারণ না পায়।

এই জন্য জাতি-সাধারণ যে—রাজ্যের প্রকৃত ঈশ্বর এবং জাতি-সাধারণ যে—রাজ্যের অধিকার সকলের এক মাত্র অধিকারী তাহা তাঁহারা কোন প্রকাশ্য বিধি দ্বারা থ্যাপন করিলেন না ; প্রজা-সাধারণকে যুদ্ধার্থে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইবার নিমিত্ত কোন ঘোষণা করা হইল না ; প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি গ্রহণের জন্য কোন প্রকাব উপায় অবলম্বিত হইল না ; ইতালীর সন্নিকৃষ্ট প্রদেশ সকলকে ইতালীর সাহায্যার্থে অভ্যুদ্যত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রকার অনুরোধ পত্র প্রচারিত হইল না।

কার্ব্বোনারোদিগের প্রত্যেক বিধিতে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। স্পষ্ট বোধ হইল যে বিদ্রোহ সকলেই অন্তরে অনুমোদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই প্রকাশ্য রূপে ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে বা ঘোষণা করিতে প্রস্তুত নহেন। পার্ম্মা ও মডেনার বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহাদিগের রাজবংশ দেশ পরিত্যাগ করায় এবং তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে কোনও প্রকার গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাপিত না করায় তাঁহারা অগত্যা এই নূতন শাসন-সমিতি সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বলোনাও ইহাঁদিগের অনুকরণে এই মর্ম্মে এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন, যে তাঁহাদিগের গবর্ণর মসো ক্লারেলী রাজ্যের শাসনভার পরিত্যাগ করায় তাঁহারা অরাজকতা নিবারণের জন্য অগত্যা এই নূতন শাসন-সমিতি সংগঠিত করিয়াছেন। যখন কৃতকার্য্যতা ও অন্তঃসারবত্তা নির্ভীকতর ভাষা অবলম্বন করিতে বলিল তখনও বলোনার গবর্ণমেণ্ট কাপুরুষোচিত ভাষা অবলম্বন করিলেন এবং প্রজা সাধারণের অনন্ত অধিকার সকলের কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না। তাহা না করিয়া ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম নিকলাসের সহিত বলোনার যে সন্ধি হয়, তাহাই তাঁহারা বলোনার স্বাধীনতার মূল বলিয়া খ্যাপন করিলেন।

পার্ম্মার জাতীয় সেনার অধিনায়কত্ব ফেডিলি নামক এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করার প্রস্তাব হয়। ফেডিলি রাণীর * নিকট অনুমতি না লইয়া এই ভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অনুমোদন করিলেন; এবং তাঁহাদিগের মূর্খতার প্রতিফল স্বরূপ ফেডিলি কর্ত্তৃক প্রতারিত হইলেন। ফেডিলি রাণীর সহযোগে বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে এক প্রতিকূল ষড়যন্ত্র সংস্থাপিত করিলেন। বিদ্রোহের চরম সীমায় যখন তাঁহাদিগের কোষ শূন্য-প্রায় হইয়া পড়িল, তখনও হুকুম জারি হইল যে নির্ব্বাসিত রাজ-পরিবারের কর্ম্মচারিগণের যেন রীতিমত বেতন প্রদান করা হয়।

যৎকালে নেপল্স, এবং পীড্‌মণ্ট প্রভৃতি ইতালীর সর্ব্বত্র বিদ্রোহ-শিখা প্রজ্বলিত হইতেছিল, বিদ্রোহকেন্দ্র বলিয়া যৎকালে বলোনার দিকে সকলেরই নেত্র নিপতিত ছিল, সেই সময়েই ১১ই ফেব্রুয়ারী—বলোনা লজ্জা ও গৌরবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আইন জারি করিল যে "বলোনা অন্যান্য রাজ্যের সহিত সখ্যভাব নষ্ট করিতে চায় না—বলোনা বহিশ্চর রাজ্য সকলের কোন প্রকারেই শান্তি ভঙ্গ করিবে না; এবং ইহার পরিবর্ত্তে বলোনা আশা করে যে অন্যান্য রাজ্যও বলোনার বিরুদ্ধে স্বতঃ পরতঃ কোন প্রকারে শত্রুতাচরণ করিবে না; এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কারণেই বলোনা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে না।" এই কার্য্যে বিদ্রোহের কেন্দ্রীভূত বলোনা তাহার মৌলিকতা † পরিত্যাগ করিল; এবং ইতালীর জাতীয় লক্ষ্য হইতে তাহার লক্ষ্য স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিল। যাহারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহের অনুকূল ছিল না, যাহারা বিদ্রোহের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সতত সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল, তাহারা বলোনার ব্যবহারে বিদ্রোহ-ব্যাপার হইতে বিরত হওয়ার বিশেষ কারণ পাইল; এবং স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিল যে বিদ্রোহ কোনমতেই কৃতকার্য্য হইবে না।

* Duchess of Parma.

† Initiative.

প্রাচীন ষড়যন্ত্রীরা রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল—যখন বলোনা বিদ্রোহ হইতে পরাবৃত্ত হইয়াছে, তখন অবশ্যই ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ়তম কারণ নিগূহিত আছে। এই কাপুরুষদিগের সন্দেহ-উদ্দীপনায় বিদ্রোহিদিগের মন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল—তাঁহাদিগের হৃদয় অর্দ্ধভগ্ন হইল। উৎসাহ, অধ্যবসায়, ও যুগপৎ কার্য্যানুষ্ঠান বিপ্লব সাধনের নিদানীভূত; এই তিনের সমবায়ের উপর তাঁহাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস টলিয়া গেল। তাঁহারা এখন হইতে ঘটনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন; ঘটনাস্রোত যে দিকে যাইতে লাগিল, তাঁহারা সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন—তাহার গতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য, তাহাকে করায়ত্ত রাখিবার জন্য, তাঁহারা কোনও চেষ্টা করিলেন না। ইহার অনিবার্য্য পরিণাম বিদ্রোহের পতন।

লম্বার্ডীর প্রতিনিধিগণ বলোনায় অতি হতাদরে গৃহীত হইলেন; লম্বার্ডেরা ইহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন; এবং কার্য্যানুষ্ঠানের আশা তাঁহারা মন হইতে একেবারেই বিদূরিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যদি অবিচলিত অধ্যবসায় ও বীরোচিত সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন।

বলোনার গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় রাজ্যের সাহায্য প্রত্যাশায় আত্মরক্ষণ ও পরধর্ষণ উভয়প্রকার যুদ্ধের আয়োজনে বিরত রহিলেন। মিলিসিয়া সংগঠন করার প্রস্তাব হইল—গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাখান করিলেন। আঙ্কোনার দুর্গের পুনঃসংস্কার করা হইল না। সেনাপতি ঝুচি যে ছয় রেজিমেণ্ট পদাতিক ও দুই রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সংগ্রহ করার জন্য আদেশ করেন তাহা অনুমোদিত হইল না। সার্কগ্‌নেনী রোমের বিদ্রোহোন্মুখতা দর্শন করিয়া রোম আক্রমণ করার যে প্রস্তাব করেন তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। রোমের ক্যাপিটল্‌ হইতে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন হইলে ইতালীয় জাতির অন্তরে যে কি অনিবার্য্য বল প্রদীপ্ত হইত, বলোনার মন্ত্রিসভা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন নাই।

পুনঃ পুনরাবৃত্ত প্রতিজ্ঞা দ্বারা ইতালীয় যুবকবৃন্দের হৃদয়ে অঙ্কুরিত অসন্তোষের ভাব প্রশমিত করা হইল বটে; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কোনবারই কার্য্যে পরিণত করা হইল না। ১২ই ফেব্রুয়ারীর কঠোর বিধি দ্বারা প্রতিকূল সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করা হইল। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে বিধি বদ্ধ হয়, তাহার মর্ম্ম এই—যে কোন লেখা দ্বারা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের সহিত বলোনার বর্ত্তমান সখ্যভাব বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, কোন বিক্রেতা তাদৃশ সংবাদপত্র পত্রিকা বা পুস্তকাদি বিক্রয় করিতে

পারিবে না; এই বিধি সত্বেও বিক্রয় করিলে তাহাদিগকে হয় অর্থদণ্ড নয় কারাবাস সহ্য করিতে হইবে।

ঈদৃশ কাপুরুষতার অনিবার্য্য প্রতিফল স্বরূপ বলোনার বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট সকল বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যক্ত হইল। ফরাশী গবর্ণমেণ্ট বলোনার পত্রের উত্তর পর্য্যন্তও দিল না। ফরাশী দূত রোম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় বলোনার পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ দিয়া গমন করিলেন; বলোনার গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার সংস্রবে না আসাই তাঁহার এরূপ বক্র গতির প্রধান উদ্দেশ্য।

ইত্যবসরে রুসিয়া—পার্ম্মা, মডেনা এবং রীজিয়ো আক্রমণ করিল। কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা করিল যে বলোনা যদি অষ্ট্রীয়ার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন তাহা হইলে অষ্ট্রীয়া বলোনার উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবে না। বলোনা এই লুব্ধ আশ্বাসে বিশ্বস্ত হইয়া এরূপ ঘোষণা করিলেন যে "মডেনা প্রভৃতির কার্য্যের সহিত বলোনার কোনও সংস্রব নাই; সন্নিকৃষ্ট প্রদেশ সকল ও পররাষ্ট্র সকলের কার্য্যস্রোতের প্রতিঘাত না করা বলোনার অব্যভিচারী নিয়ম; আমাদিগের একান্ত অনুরোধ যেন কোন বলোনীজ্ পার্শ্বচর বা বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্য প্রণালীর সহিত কোনও সংস্রবে না আইসেন"। তাঁহারা আরও আদেশ করিলেন যে "বিদেশীয়েরা সশস্ত্র বলোনার অন্তসীমায় পদার্পণ করিলেই তাঁহাদিগকে অস্ত্রচ্যুত করিয়া স্বদেশে প্রেরিত করা হইবে"। এই আদেশানুসারে সেনাপতি ঝুচি কর্ত্তৃক অধিনীত সপ্তশত মডেনীস্ সৈন্যকে ধৃত করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করা হয়।

পার্ম্মা, মডেনা ও রীজীয়ো আক্রমণের পর অষ্ট্রিয়া ফেরারা আক্রমণ করিল? ফেরারায় পোপের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া অবশেষে ২০এ তারিখে বলোনার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্ট জাতীয় সেনার হস্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া আঙ্কোনায় পলায়ন করিলেন। তথায় পঞ্চদিবস অবস্থিতির পর ২৫এ মার্চ্চ বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্ট কার্ডিন্যাল্ বেনভেনুটির হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। আত্মসমর্পণের বিনিময় স্বরূপ তাঁহার নিকট কেবল ক্ষমা দান প্রার্থনা করিলেন। এই লজ্জাকর আবেদন পত্রে বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্টের প্রায় সকল সভ্যই স্বাক্ষরিত করেন।

যে নিয়মে বলোনা আত্মসমর্পণ করেন, অষ্ট্রিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা ভঙ্গ করিল এবং ৫ই এপ্রিল পোপও ইহার অনুমোদন করিলেন। ১৪ই ও ৩০এ তারিখের আদেশ অনুসারে—বিদ্রোহের কি অধিনায়ক, কি সাহায্যকারী, কি অনুমোদনকারী সকলেরই প্রাণদণ্ড বিহিত হইল। ইহার সহিত বলোনার বিদ্রোহের অবসান হইল এবং বলোনার পতনে ইতালীয় অভ্যুত্থানেরও পতন হইল।

সেনাপতি ঝুচি ৭০ জন বিদ্রোহী সমভিব্যাহারে জলযানে দেশান্তরে পলা-

য়ন করিতেছেন, এমন সময় দুর্দ্দান্ত অষ্ট্রিয় রণতরি তাঁহার জাহাজ ধৃত করিল এবং বন্দীভাবে তাঁহাদিগকে বিনিসে আনয়ন করিল। অনন্তর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল অষ্ট্রিয়ার আদেশানুসারে মডেনার ডিউক এই ভীষণ আইন জারি করিলেন যে "যখনই কোনও গুপ্ত প্রমাণ দ্বারা (প্রমাণাহরণকারীর সহিত বাদীর মোকাবিলা হইবার আশা নাই) নৈতিক নিশ্চয়তার সহিত জানা যাইবে যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখনই প্রমাণদাতার কোনও উল্লেখ না করিয়া অপরাধীকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা যাইবে; প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্য যতই কেন গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করা যাউক না, তাহার সহিত সতত‌ই নির্ব্বাসন দণ্ড সংযোজিত হইবে"।

এই কঠোর বিধি ইতালীর কণামাত্রা-বিশিষ্ট স্বাধীনতাও হরণ করিল—ইতালীর ভাবী অভ্যুত্থানের আশা সুদূরপরাহত করিয়া ফেলিল।

ক্রমশঃ।

সজল প্রতীমা।

(১)

নিরখিনু প্রভাতের তরল কিরণে,
ঝরিত নীহার-বিন্দু গোলাপের দলে,
উষার অনিলে ফুল্ল পঙ্কজ বদনে,
দেখিনু চঞ্চল চারু মুকুতা বিমলে।

(২)

যেই প্রবেশিনু মম শয়ন-মন্দিরে,
আবরি বদন-পদ্ম সুনীল বসনে—
দেখিনু, বিষাদে মরি নয়নের নীরে,
ভাসিছে নয়ন-তারা, নিরানন্দ মনে।

(৩)

পাগলিনী বেশে বসি পর্য্যঙ্ক উপরে,
নীরবে কাঁদিছে বালা—চপলা হরিণী—
নিন্দিয়া নয়ন-পদ্ম নীল সরোবরে
মলিন সন্ধ্যায় যথা সরঃসোহাগিনী।

(৪)

নাহি সে মোহিনী মূর্ত্তি নয়ন-নন্দন,
পূর্ণিমা-রজত বিধু যথা নীলাম্বরে!
বিশ্ব-বিলাসিনী বেশ খুলিয়া এখন,
ভাসিছে বিরাগে আহা দুঃখের সাগরে!

(৫)

কুঞ্চিত চিকুরজাল বঙ্কিম খোঁপায়,
নহেক রঞ্জিত মরি! চুম্বিছে মেদিনী,
বেষ্টিয়া বদন খানি, যেন বরিষায়
চারু শশধরে ঘেরি নীল কাদম্বিনী।

(৬)

নিরখিয়া সেই মূর্ত্তি—বিষণ্ণ সজল!
অনন্ত সোহাগে মাখা সজল বদনে,
শিশির-সম্পাতে সিক্ত সুনীল উৎপল!
কহিনু আদর করে, ব্যথিত মরমে।

(৭)

"বদন সরোজ ফুল্ল আবরি বসনে,
কেন আজি ম্লানমুখী মানিনী আমার!
তোল দেখি ইন্দুমুখ, ইন্দুনিভাননে,
যুড়াও জীবন বর্ষি অমৃত আসার" ?

(৮)

শুনিল নীরবে বালা, মুহূর্ত্ত ভিতরে,
দূরে গেল ম্লান মুখ শুকাল নয়নে
ঝরিত সলিল, যথা শিশির নিকরে
নব পঙ্কজিনী পত্রে দিনেশ কিরণে।

(৯)

পুনঃ বিকাশিল হাসি গোলাপী অধরে,
ফুটিল মল্লিকা কলি অমল ধবল!
সেই হাসি সুধাময় পশিল অন্তরে,
মোহিল নয়ন, যেন বিজলী চঞ্চল!

(১০)

চঞ্চল হইল মন, চঞ্চল যেমতি
তরল পারদ রেখা স্থির বায়ুমানে—
যবে দেব প্রভঞ্জন ভীষণ মুরতি
ধরি মাতে রুদ্রতেজে প্রচণ্ড সংগ্রামে।

(১১)

প্রশান্ত নীলাম্বুনাথ অনন্ত তুফানে
উচ্ছাসিয়া তরঙ্গিত হইল সত্বরে!
যেন অন্ধকারময়ী নিশি অবসানে
দেখা দিল ঊষা স্নানি সুবর্ণ নির্ঝরে।

(১২)

উন্মত্ত হইল প্রেম উচ্ছাসিত প্রাণ,
চুম্বিনু আবেশ-মত্তা-রমণী-অধরে!
অপার্থিব স্বর্গ-সুখ হল মূর্ত্তিমান্,
নিশ্চল নিষ্পন্দ তনু মুহূর্ত্তেক তরে।

(১৩)

রমণীর সুকোমল হৃদয়-আসন,
বিরচিত নন্দনের পারিজাত দলে!
রমণীর সুমধুর প্রণয়-মিলন,
ভ্রমর-চুম্বন চারু বসন্ত-কমলে!

(১৪)

সেই সম্মিলন-সুখে মোহিত হৃদয়,
পলকে ধমনীচয় বহিছে চঞ্চল,
বদনে বাক্যের স্রোত আর নাহি বয়,
মুদিত স্বর্গীয় সুখে নয়ন-যুগল।

(১৫)

পরিপূর্ণ প্রেম-সুখে হৃদয় যখন,
কে করে তখন আর বাক্যের কামনা,
হৃদয়ে হৃদয় স্পর্শে ঘুচে অনুক্ষণ—
প্রণয়-বিদ্যুৎ-বলে সেই বিড়ম্বনা।

(১৬)

অধর অমৃত পানে, সুখের ভাণ্ডার
রমণীর বক্ষঃস্থলে তনু অচেতন!
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ চেতনা সঞ্চার,
পোহাল সুখের নিশি ভাঙিল স্বপন।

(১৭)

ভাঙিল সুখের স্বপ্ন দেখিনু আবার,
দরিদ্র-কুটীরে মরি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী!
বিচরে নয়ন-পথে, প্রেয়সী আমার,
ধরিয়া সুরম্য কান্তি বিশ্ব-বিনোদিনী।

শ্রীহঃ—

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অপূর্ব্ব স্বপ্ন কাব্য।—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র। এখানি কবিতাগ্রন্থ। গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলাম না। ইহাতে অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির বা অলৌকিক সৃষ্টির কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না বটে, তথাপি গভীর হৃদয়-ভাব ও সুললিত ছন্দোবন্ধের কোনও অভাব দৃষ্ট হইল না। গ্রন্থকার সংসার-বৈরাগ্য জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা সংসারে জ্বালাতন তাহাদের ইহা ভাল লাগিতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই পথের অনুসরণ করা সকলেরই প্রার্থনীয় হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। সংসারীর এক সুখ—সন্ন্যাসীর আর এক সুখ। সংসারীর সুখ ভাবাত্মক, সন্ন্যাসীর সুখ অভাবাত্মক। সন্ন্যাসীর সুখকে প্রকৃত পক্ষে সুখ বলা যাইতে পারে না। ইহা দুঃখাভাবজনিত মানসিক শান্তি মাত্র। লোকে যতক্ষণ সংসার-সুখে সুখী থাকে, ততক্ষণ কখনই বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে চায় না। যে হতভাগ্যের সংসার-সুখের পথে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সেই বিরাগী হইতে চায়; সুখে হতাশ হইয়া শান্তি মাত্রের অনুসরণ করে; কিন্তু সুখের বিন্দুমাত্র আশা থাকিলেও সে কখনই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে চায় না। বিশেষতঃ ভারতে বৈরাগ্যের ভাব এত প্রবল হইয়া আসিয়াছে, আর বৈরাগ্যে ভারতের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, যে যাঁহারা এখনও ভারতে বৈরাগ্য-সঙ্গীত গাইতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে আমরা ঘোর ভারতশত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। যাঁহারা মানব-জাতিকে ইহলোকের কর্ত্তব্যসাধনে বিরত করিয়া পারলৌকিক কর্ত্তব্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা পরলোক-বন্ধু হইলেও, ইহলোকের পরমশত্রু বলিয়া অভিহিত হইবেন।

নিসর্গসুন্দরী। শ্রীশারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র। এখানিও এক খানি কবিতাগ্রন্থ। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "এখন উৎসাহ, লজ্জা, ক্ষোভ, তিরস্কার—কি যে আমার ভাগ্যের উপরি অলক্ষিত ভাবে বিরাজ করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" আমরা গ্রন্থকারের এতদূর হতাশ হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। "নিসর্গসুন্দরী" অতিশয় সমাদরে গৃহীত না হউক, নিতান্ত অশ্রদ্ধার পাত্রী হইবে না। তাঁহার এই প্রথম উদ্যম নিতান্ত বিফল হয় নাই। উদ্যম ভগ্ন না হইলে ভবিষ্যতে তিনি আরও ভাল কবিতা লিখিতে পারিবেন।

কুসুম-হার—নগেন্দ্র নাথ, মিত্র কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা ওয়েলিংটন প্রেসে মুদ্রিত। এখানি যুবরাজ সাহিত্যের অন্তর্গত। যুবরাজের আগমনে যখন পলিতকেশ ব্যক্তিরাও খেপিয়া উঠিয়াছিলেন তখন নগেন্দ্রের ন্যায় বালক যে খেপিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বালকের লেখনী হইতে 'করুণা করিয়া পদধূলি দাও' ইত্যাদি বাক্য নিঃসৃত হইলে আমরা ততদূর বিস্ময়ান্বিত হইতে পারি না।

ভারতে যুবরাজ কাব্য।—শ্রীমধুসূদন সরকার প্রণীত। বরিশাল সত্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।/০ আনা। এ খানিও যুবরাজ-সাহিত্যের অন্তর্গত। লেখক ইহাতে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির অনেক পরিচয় দিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার শ্রম বিফল হইয়াছে। যুবরাজের নিকট তাঁহার ক্রন্দন অরণ্যে রোদন তুল্য হইয়াছে। তাঁহার জানা উচিত ছিল "চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী।"

তারকবধ কাব্য।—শ্রীশ্রীনাথ কুণ্ডী প্রণীত। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহোদয়ের দ্বারা পরিশোধিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ইহার রচনা মন্দ নহে। ইহার বিষয়টী আরও হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য অতি জঘন্য রূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

হোমিওপেথিক সচিত্র পুস্তকাবলী।—শ্রীবসন্তকুমার দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ছয় আনা মাত্র। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপেথিক চিকিৎসক বাবু রাজেন্দ্র দত্তের উৎসাহে ও পরামর্শে প্রকাশক এই পুস্তকাবলীর প্রকটনে সাহসী হইয়াছেন। উক্ত চিকিৎসক মহাশয় ইহার পাণ্ডুলিপির সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং আবশ্যক মতে তাহাতে নূতন বিষয়েরও সংযোজন করিয়া দিয়া থাকেন। আর অমৃতবাবুও অনেক দিন হইতে হোমিওপেথিক চিকিৎসায় ব্রতী আছেন। সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি যে এই পুস্তকাবলী ক্রয় করিয়া পাঠ করিলে পাঠকদিগের অর্থ ও সময় বৃথা ব্যয়িত হইবে না।

জাতিমিত্র।—প্রথমভাগ। শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণ আহরণ পূর্ব্বক কোন কবিরঞ্জন কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। সংপ্রতি কলিকাতা অঞ্চলের কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়-জাতি ও বল্লালবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং তাহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কায়স্থকৌস্তুভ, কায়স্থকৌমুদী, কায়স্থদর্পণ, কায়স্থনৃপ প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থেরও প্রচার করিয়াছেন। জাতিমিত্র সেই সকল গ্রন্থের প্রতিবাদ। ইহা পাণ্ডিত্যে ও গবেষণায় পরিপূর্ণ। ইহা সম্পূর্ণ হইলে আমরা ইহার স্বতন্ত্র সমালোচনা করিব এবং এ বিষয়ে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিব।

কপালকুণ্ডলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বঙ্কিমবাবু এক বৎসর কাল কপালকুণ্ডলাকে গৃহিণী করিয়া রাখিলেন। এই এক বৎসরে কপালকুণ্ডলার বন্য প্রকৃতির কিরূপ প্রশমন হইয়াছিল তাহারই চিত্র উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্যামাসুন্দরী সখী—বয়সের সমতা ও প্রকৃতির মধুরতা থাকাতে শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলার সহিত একপ্রাণ, একমন। মনুষ্য সামাজিক জীব। কপালকুণ্ডলা আশৈশব বনবাসিনী থাকিলেও গৃহধামে দুই দিন পদার্পণ করিয়াই শ্যামাসুন্দরীর সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্যামাসুন্দরীর সহিত মিশিয়া এখন আর সে কপালকুণ্ডলা নাই। শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়াছে; "স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে; এইক্ষণে সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল, ভুজঙ্গের বৃহত্তুল্য, আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ হইয়াছে। বেণীরচনারও শিল্প-পারিপাট্য লক্ষিত হইতেছে, কেশবিন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শ্যামাসুন্দরীর বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। কেশের যে ভাগ বেণী মধ্যে ন্যস্ত হয় নাই, তাহা যে শিরোপরি সর্ব্বত্র সমানোচ্চ হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে। আকুঞ্চন প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তরঙ্গলেখায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্দ্ধ-লুক্কায়িত নহে; জ্যোতির্ম্ময় হইয়া শোভা পাইতেছে। দুই কর্ণে হেম-কর্ণভূষা দুলিতেছে; কণ্ঠে হিরণ্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে।" এখন আর সমুদ্রতীরস্থ আলুলায়িতকুন্তলা ভূষণহীনা কপালকুণ্ডলা নাই। গৃহধামে তাঁহার এই সমস্ত পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে শ্যামাসুন্দরী কেশ বাঁধিতে চাহিলে কপালকুণ্ডলা তাঁহার হাত হইতে কেশ গুলিন টানিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ব্বে সকল কথায় 'ইহাতে কি সুখ' 'উহাতে কি হইবে' এইরূপ উত্তর করিয়া সংসারের অনভিজ্ঞতার কেমন স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। এখন আর ততদূর অনভিজ্ঞতা নাই, ততদূর বন্য ভাব নাই। কিন্তু যে কপালকুণ্ডলা চিরকাল বনবাসিনী থাকিয়া স্বাধীনভাবে বনে বনে নির্ভীকমনে বিহার করিয়া বেড়াইয়াছেন তাঁহার সেই বন্য প্রকৃতি কি এক বৎসরের অল্প কাল মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইতে পারে? আজিও সম্মুখস্থ নিবিড় কানন দেখিলে তাঁহার সেই সমুদ্রতীরস্থ বনাশ্রম সমুদয় মনে পড়িতে থাকে। আর এক একবার ইচ্ছা হয় সেইরূপ স্বাধীনভাবে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কাপালিকের নিকট স্বাধীন ও নিঃশঙ্কভাবে

থাকিয়া তাঁহার প্রকৃতিতে কেমন এক প্রকার নিরঙ্কুশ সাহসিকতা জন্মিয়াছিল, যাহা তাঁহার গর্ব্বিত বচনে ও নির্ভীক ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রকাশিত হইত। তিনি শ্যামাসুন্দরীর নিকট বলিতেন :—

"যদি আমি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" নবকুমার যখন কপালকুণ্ডলার সহিত রজনীতে বনে অনুগামী হইতে চাহিলেন কপালকুণ্ডলা অমনি গর্ব্বিত বচনে বলিলেন "আইস আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও" নবকুমার তাঁহার এই গর্ব্বে পরাজিত হইয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। আর একবার তাঁহার বন্য প্রকৃতি প্রবলা হইয়া উঠিল। তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে একাকিনী বনদেবীর ন্যায় নির্ভয়ে রজনীযোগে নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবা মাত্র জ্যোৎস্নালোকে বনমধ্যে পূর্ব্বকার স্মৃতি সমুদায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তিনি আর একবার সেই সমুদ্রতীরস্থ স্বাধীন বনবাসিনী কপালকুণ্ডলা বলিয়া আপনাকে ভাবিতে লাগিলেন। বনমধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিলেন। সংসার সমুদায় ভুলিয়া গেলেন, শ্যামাসুন্দরীকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার ঔষধি উন্মূলিত হইল না। সম্মুখে অগ্নিবিভা দেখিয়া পূর্ব্বকার বনাশ্রম মনে পড়িল। কৌতূহল-পরায়ণা কপালকুণ্ডলা সেই আলোকের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। দেখিলেন বনমধ্যে কুটীর। তন্মধ্যে কাপালিকের ন্যায় কে যেন কাহার সহিত গম্ভীর ভাবে কথা কহিতেছে। কপালকুণ্ডলা আর একবার প্রকৃষ্টরূপে বনবাসিনী হইয়া গেলেন। তিনি নবকুমারের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু প্রবেশ করিয়াও আর সংসারিণী হইতে পারিলেন না। শ্যামাসুন্দরীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়াও শ্যামাসুন্দরীকে ভুলিলেন, নবকুমারকে ভুলিলেন। তিনি সমুদ্র, কানন, কাপালিক, ও কালীমূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, "যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগর-হৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত; তাহাতে বসন্ত-রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে; নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধা শ্যামের অনন্ত প্রণয় গীত গাইতেছে। পশ্চিম গগণ হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে। আকাশমণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণ বৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণ মেঘ-সকল কোথায় গেল। নিবিড় নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক্ নিরূপণ হয় না। নাবিকেরা তরি ফিরাইল। কোন্ দিকে বাহিবে স্থিরতা পায় না। বাতাস উঠিল; বৃক্ষ-প্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তরঙ্গ মধ্য হইতে এক জন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডাকার পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বামহস্তে

তুলিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল।" কপালকুণ্ডলা এই স্বপ্ন মধ্যে ভক্তবৎসলা ভবানীর আবির্ভাব দেখিলেন। গৃহে আছেন, বনেরই কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছেন। রজনী হইলেই বনে যান, আবার আসেন। এখন কে তাঁহাকে গৃহস্থ-কন্যা বলিবে? এক বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়াছি এক বৎসর পরেও আবার সেই কপালকুণ্ডলাকে দেখিলাম। গৃহধামে এক বৎসরে তাঁহার অল্পই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে! বঙ্কিম বাবু এই কপালকুণ্ডলাকে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি এই বনদেবীর চিত্র এই থানে রাথিয়া গিয়াছেন। তিনি আর এ চিত্র ধরেন নাই, বোধ হয় ধরিতে পারিবেন না।

ধরিতে পারিবেন না, না, ধরিলে ভাল দেখায় না। ইহার পর কপালকুণ্ডলার জীবনে আর অধিক ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত নহে। কপালকুণ্ডলার জীবনে যতদিন ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত ছিল, ততদিন বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে ঔপন্যাসিক পাত্রী রূপে চিত্রিত করিয়াগিয়াছেন। ইহার পর কপালকুণ্ডলা ক্রমশঃ গৃহিণী হইতে থাকিবেন। ঔপন্যাসিক ঘটনায় তাঁহার জীবন-স্রোত আর অধিক তরঙ্গিত হইতে পারিবে না। ইহার পর কপালকুণ্ডলার জীবনে যে অত্যল্প ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত হইতে পারে, সে ভাবের সহিত তদীয় পূর্ব্বকার জীবনের গাম্ভীর্য্য সমতুল্য হইবে না। এজন্য বঙ্কিম বাবু আর এ চিত্র ধরিতে সাহসী হন নাই। বঙ্কিম বাবুর সে কার্য্য নহে। স্থির বাস্তবিক ভাব চিত্রিত করা বঙ্কিম বাবুর কার্য্য নহে। ঔপন্যাসিক-ভাব-বিরহিত হইলে, জীবনস্রোত যেরূপ স্থিরভাবে প্রবাহিত ও মন্দ মন্দ হিল্লোলিত হইতে থাকে সে জীবন-স্রোত চিত্রিত করা বঙ্কিম বাবুর কার্য্য নহে। বঙ্কিম বাবু কখন স্থির জীবনের চিত্র ধরিতে যাইবেন না, যাইলে তাঁহাকে তরঙ্গ-মালায় বিক্ষোভিত করিয়া ঔপন্যাসিকভাবে পূর্ণ করিয়া লইবেন। কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ জীবন প্রবাহে ভীষণ তরঙ্গ লীলা আর সম্ভাবিত নহে বলিয়া, পরের কার্য্য পরের জন্য রাথিয়া দিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলা ঠিক উপন্যাসযোগ্যা পাত্রী। তাঁহার কল্পনায় যতদূর ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত হইয়াছে কোন গৃহস্থ নারীর কল্পনায় ততদূর সম্ভাবিত নহে। তাঁহার বন্য প্রকৃতি সংসারানভিজ্ঞতার উপযোগিনী এবং তাঁহার স্বাধীনতা বন্য-প্রকৃতির উপযোগিনী। এই স্বাধীনতা, বন্যভাব ও একান্ত সংসারানভিজ্ঞতা হেতু তাঁহার প্রকৃতিকে উপন্যাসের প্রকৃত উপযোগিনী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কোন বনবাসিনী ঋষিকুমারীর প্রকৃতিতেও এসমস্ত ভাবের একদা একাধারে সম্মিলন দেখিনা। কারণ ঋষিকুমারীর প্রকৃতি আশ্রমনিবাসে

কথঞ্চিৎ প্রদমিত, প্রশান্ত, ও সুবিনিয়মিত হইয়া আইসে। ঋষির আশ্রমনিবাসেও সংসারের অনেক ভাব বিদ্যমান থাকে। সেখানে স্বাধীন প্রকৃতি উদ্দমিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না; ক্রমশঃ অধীনতায় ক্ষীয়মান ও বিনম্র হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদিগের কপালকুণ্ডলার আশ্রমে সেরূপ শিক্ষা ও বিনিয়ম কিছুই বিদ্যমান ছিল না। কাপালিকের আশ্রম ঋষির আশ্রম নহে। তাহা একজন তান্ত্রিকের যোগসাধনের ও বীভৎস ব্যাপার সম্পন্ন করিবার নিভৃত বনালয় মাত্র। কাপালিক ঋষি ছিলেন না. তিনি কপালকুণ্ডলাকে কন্যানির্ব্বিশেষে ঋষির মত প্রতিপালন করেন নাই। তাঁহার যে প্রকার ভয়ানক উদ্দেশ্য ছিল তাহাতে কপালকুণ্ডলা কেবল বনমধ্যে আবদ্ধা থাকিয়া ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধা হইতে থাকিবেন এই পর্য্যন্তই আবশ্যক ছিল। সেই প্রয়োজনমত কপালকুণ্ডলাও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বনমধ্যে প্রবৃদ্ধ হইতে ছিলেন। কোন শিক্ষা ও উপদেশ তাঁহার প্রকৃতিকে নিয়মিত করে নাই, কোন সাধু এবং সদনুষ্ঠানের দৃষ্টান্তে তাঁহার প্রকৃতি উন্নত হয় নাই, সংসার ধামের কোন স্নেহময় ব্যবহারে তাঁহার প্রকৃতি বিনম্র হয় নাই। তিনি প্রকৃতির হস্তে প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে স্বভাবতঃই যে কোমলতা ও সরলতা ছিল তাহাই ক্রমশঃ স্বতঃই প্রস্ফুরিত হইতে ছিল। সেই কোমলতা হেতু তিনি নবকুমারের উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। নহিলে তাঁহার প্রকৃতির স্বাধীনতা ও বনভাব দমন করিবার কিছুই ছিলনা। তিনি সংসারধামের কোন আদর্শই কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই প্রকার রমণীর কল্পনা নিশ্চয় উপন্যাসউপযোগী। এ প্রকার রমণীকে উপন্যাস যে প্রকার ইচ্ছা কাল্পনিক কার্য্যক্ষেত্রে আনীত করিতে পারেন ও বিচলিত হইলে কল্পনার অসামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই কপালকুণ্ডলা এক বৎসর কাল সংসারিণী হইয়াও যে প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়াই উপলব্ধি হয়। অথচ তাহাতে উপন্যাস-সুলভ যেরূপ স্বাধীন ও সবলভাব বিদ্যমান আছে তাহা সংসারিণী কোন নারীরই উপযোগী হইত না। শ্যামাসুন্দরী সেরূপ স্বাধীন ও সবলভাবে কার্য্য করিতে কেন সাহসিনী হন নাই? শ্যামাসুন্দরীরই স্বার্থ, তাঁহারই ইষ্টসিদ্ধির জন্য কপালকুণ্ডলা নিতান্ত বিব্রত হইয়া বনে গেলেন। অথচ শ্যামাসুন্দরী গৃহে বসিয়া রহিলেন। এই জন্য বলি কপালকুণ্ডলা সম্পূর্ণ উপন্যাসযোগ্যা পাত্রী।

আর এক কারণে কপালকুণ্ডলা আমাদিগের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছেন। কপালকুণ্ডলার দুঃখ ও দুর্ভাগ্য। শৈশবেই তিনি অনাথিনী রূপে বনালয়ে পরিত্যক্তা হয়েন। আমরা তাঁহাকে প্রথমে কাপালিকের আশ্রমে দর্শন করি। দর্শন করিয়া

যখন তাঁহাকে বনদেবীর ন্যায় নবকুমারের উদ্ধার সাধনে সচেষ্টিতা দেখি তখন বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদিগের সে আনন্দ পরক্ষণেই নিরানন্দে পরিণত হইল। যখন শুনিলাম তিনি কাপালিকের কি দুরভিলষিত সিদ্ধির জন্য বনবাসে আবদ্ধা আছেন তখন আমাদিগের হৃদয় অমনি কপালকুণ্ডলার দুরদৃষ্টের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। শুদ্ধ নবকুমারের উদ্ধার সাধন নয়, কপালকুণ্ডলার উদ্ধার সাধন জন্যও আমরা ব্যাকুল হইলাম। অধিকারীকে শতবার ধন্যবাদ দিলাম তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতা ঋণে বিক্রীত হইলাম। নবকুমার আমাদিগের সাধন হইলেন। কপালকুণ্ডলাকে লইয়া নবকুমারের সহিত পলায়ন করিতেছি, আর শতবার পশ্চাদ্ভাগে চাহিতেছি পাছে কাপালিক অনুগামী হইয়া থাকে। আশঙ্কায় ও আনন্দে হৃদয় যুগপৎ উদ্বেলিত হইতেছিল। একবার কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের গৃহে আনিতে পারিলে হয়। আনিয়া সুখী হইলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে সুখ তিরোহিত হইল। কপালকুণ্ডলা ম্রিয়মাণা, কপালকুণ্ডলা সুখিনী নহেন, কাহার জন্য তবে সুখী হইব? ভক্তবৎসলা ভবানী কপালকুণ্ডলার ত্রিপত্র ধারণ করেন নাই। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিয়া সেই জন্য কপালকুণ্ডলা নিতান্ত শঙ্কিত থাকেন। আমরাও ভাবি কপালকুণ্ডলার ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না। কাপালিক কি কুচক্র করিয়া কখন তাঁহার কি অনিষ্ট সাধন করে এই ভাবনায় অনুদিন চিন্তাকুল থাকি। সেই কাপালিক দেখি সপ্তগ্রামে উপস্থিত। আমরা অমনি ভয়ে অস্থির হইলাম। তাঁহার কুচক্রে নবকুমার পতিত হইলেন, নবকুমারের প্রতি রাগান্ধ হইলাম। কপালকুণ্ডলা প্রেতভূমে আনীত হইলেন। আমরা কপালকুণ্ডলার দুঃখে একবারে বিহ্বল হইলাম। জলোচ্ছাসে কপালকুণ্ডলা কোথায় অদৃশ্যা হইলেন। অমনি ইচ্ছা হইল জলে ঝম্প দিয়া পড়ি। কপালকুণ্ডলার উদ্ধার সাধন করিয়া আনন্দে কূলে উঠি।

মানবের জন্য মানবের হৃদয় এইরূপ কাঁদিয়া উঠে। যাহার জন্য হৃদয় কাঁদে, তাহাকে যেন আপনার বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে। কপালকুণ্ডলাকে এই জন্য আপনার বলিয়া জ্ঞান হয়। তাঁহার দুঃখে আমাদিগের নয়ন অশ্রুধারায় পূর্ণ হইয়াছে। অজ্ঞাতসারে নয়নাম্বু বিগলিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে নিতান্ত আপনার ও প্রিয় জ্ঞান করিয়াছি। দুঃখ-রাশির যতই বৃদ্ধি হইয়াছে ততই তাঁহাকে অধিকতর আপনার জ্ঞান হইয়াছে। তাঁহার দুঃখরাশি মোচন করিবার জন্য আমাদিগের যে কোন উপায় ছিল না, এই আমাদিগের দুঃখ, এই আমাদিগের একান্ত ক্ষোভের বিষয়।

দুঃখপূর্ণ উপন্যাস পাঠের এই কুফল।

নায়িকার ইতিহাস দুঃখপূর্ণ না করিলে সে নায়িকা কখন পাঠকের হৃদয়গ্রাহিণী হয় না; পাঠকের অনুকম্পার ভাজন না হইলে, কেহ তাঁহার হৃদয় হরণ করিতে পারে না, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু যখন এক জনকে আপনার বলিয়া জ্ঞান হইল, তাহার সুখ দুঃখ আপন ভাগ্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল, এবং তাহার সুখ দুঃখে নিতান্ত অধীর হইতে লাগিলাম, তখন তাহাকে দুঃখে ও বিপদে নিপতিত দেখিলে কি স্থির থাকিতে পারা যায়? বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে আপনার প্রিয়জনের অকল্যাণ বিমোচনের জন্য যেরূপ উদ্যোগী ও উন্মত্ত হইতে হয়, কাল্পনিক প্রিয়জনের অমঙ্গল দেখিলে কি তদ্রূপ হইতে ইচ্ছা হয় না? কল্পনা ও হৃদয় উভয় পক্ষেই সমভাবে ব্যথিত ও উদ্বোধিত হইয়া উঠে। তবে প্রভেদ এই উপন্যাসে আমাদিগের চেষ্টা অগত্যা অবরুদ্ধ হইয়া যায়, আমাদিগের কার্য্যশক্তি উত্তেজিত হইয়া আপনাপনি নিবৃত্ত হইয়া পড়ে। উভয় পক্ষেই শোণিত সমভাবে উষ্ণ হইয়া উঠে। বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে সেই শোণিতের তেজ কার্য্যে পরিণত হয়—মানবজীবন সার্থক হয়। কিন্তু উপন্যাসের কাল্পনিক ক্ষেত্রের দোষ এই, সেখানে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, সেখানে পরের উপকারার্থ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিলেও কার্য্য করিবার কিছুই ক্ষমতা নাই। শতবার এইরূপ কার্য্যশক্তি অগত্যা নিবৃত্ত হইলে, তাহা আর উত্তেজিত হইতে চাহে না। হৃদয় ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে। শোণিত উত্তপ্ত হইতে চাহে না; উত্তপ্ত হইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ শীতল হইয়া পড়ে। কার্য্যশক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আইসে। উদ্যোগ একেবারে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়। বৃথায় কল্পনাকে শতবার ব্যথিত করিবার এই দোষ। সর্ব্বদা দুঃখ-পূর্ণ উপন্যাস পাঠের এই বিষময় ফল। যিনি সর্ব্বদা এই প্রকার উপন্যাস পাঠ করেন তাঁহার হৃদয় ক্রমশঃ শীতল হইয়া আইসে; তিনি ক্রমশঃ উদ্যোগ-বিরহিত হইয়া পড়েন। প্রয়োজন কালে সংসারের বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাকে অনেক সময় নিরুদ্যোগী দেখা যায়।

কপালকুণ্ডলার দুঃখের জন্যই কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকট এত প্রিয়তম হইয়াছেন। তিনি আমাদিগের হৃদয়ের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার দুঃখ ভাবিয়া আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্য ভুলিয়া যাই, তাঁহার রূপ যৌবন সকলই ভুলিয়া যাই। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দুঃখের ছায়ায় পবিত্র জ্ঞান হয়। তাঁহার প্রতি চাহিলেই আমরা বিষণ্ণ হই। কোন অপবিত্র ভাব আমাদিগের হৃদয় স্পর্শ করে না। হৃদয়ের বিষাদ-মন্দিরে তাঁহার দেবমূর্ত্তি স্থাপিত দেখি। তাঁহার বিমলিন মুখচন্দ্রমা যেন রাহুগ্রস্ত, ছায়া-বিবর্ণিত, বিকম্পিত শশধরের ন্যায় প্রতীত হইতে থাকে। তাঁহার শান্ত

মুখচ্ছবি, যেন কুজ্ঝটিকা অবগুণ্ঠনাবৃত প্রভাবিরহিত রক্তিম সূর্য্যমূর্ত্তির ন্যায় জ্ঞান হইতে থাকে। তাঁহার দুঃখরাশি তাঁহার মুখমণ্ডলে ছায়া প্রদান করিয়াছে। সেই দুঃখ-রাশির মধ্য হইতে তিনি অতি পবিত্র শান্ত মূর্ত্তিতে আমাদিগের মনে গভীরভাবে সমুদিত হন। তাঁহাকে দেখিলে শান্তির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি মনে উদয় হয়। দেখিলে মনে অতি পবিত্র শান্ত ভাবের উদয় হয়। অনেকক্ষণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখা যায় না। নয়ন পৃথিবীর দিকে নীয়মান হয়। মনে কি যেন ভাবনার উদয় হইতে থাকে। যেন দেবমূর্ত্তির সমক্ষে দণ্ডায়মান আছি। আবার সেই স্নিগ্ধমূর্ত্তির প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করি, নয়ন শীতল হয়। কারণ সে মূর্ত্তিতে উজ্জ্বল বিভা কিছুই নাই। ঐ দেখ আলুলায়িত-কেশমণ্ডল-সমাবৃত বিমলিন মুখচন্দ্রমা অতি স্নিগ্ধভাবে একদা আমাদিগের প্রতি, একদা উর্দ্ধদিকে ভক্তবৎসলা ভবানীর প্রতি ছল্ ছল্ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। উহার মুখমণ্ডলে যেন ভাবনা মূর্ত্তিমতী হইয়া আছে। কপালকুণ্ডলার এই শান্ত মূর্ত্তি দেখিলে কি মনে গভীর রসের সঞ্চার হয় না? তাঁহার মুখচ্ছবি কি উদাত্তভাবে পূর্ণ নহে? বঙ্কিম বাবু কপালকুণ্ডলাকে এইরূপ দুঃখ-সমাবৃতা করিয়া তাঁহার মূর্ত্তিকে আরও বিমোহিনী করিয়াছেন; কপালকুণ্ডলার ন্যায় গভীর-রস-সঞ্চারিত উপন্যাস-ক্ষেত্রে উপযোগী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এইরূপ দুঃখ-সমাবৃতা থাকাতেই কপালকুণ্ডলাকে অতি উচ্চ ও উদাত্তভাবে পরিপূর্ণ দেখায়।

অনেক বয়সে কপালকুণ্ডলা সংসারে প্রবেশ করিলেন। অনেক বয়সপর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবহস্তে নবীন ও হরিৎ রহিয়াছে। সংসারের সুখদুঃখ ও প্রমোদ কিছুই জানেন না। কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা কিছুই জানেন না। পতি, ভার্য্যার কি অমূল্য পদার্থ তাহাও কিছুই জানেন না। কি রূপ ব্যবহারে লোকের সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎপাদিত হয় তাহাও কিছুই জানেন না। কোন বিষয়ের জ্ঞান তাঁহার কিছুই নাই। অরণ্যকুমারীর এপ্রকার জ্ঞান থাকিবার কথাও নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয় আছে, সরল হৃদয়—যাহা রমণীগণের প্রধান সম্পত্তি। সেই হৃদয় লইয়া তিনি সংসারে প্রবেশ করিলেন। সেই হৃদয় লইয়া তিনি অপরিচিত নবকুমারের সহিত বিদেশে আসিলেন। প্রণয় কিরূপ তাহা তিনি জানিতেন না। হৃদয়ে অনুরাগ মাত্রের সঞ্চার হইতেছিল। নবকুমার সেই নবমুকুলিত অনুরাগের পাত্র হইলেন। তাঁহার প্রতি প্রণয় জন্মিল,—সরল প্রণয়। এই প্রণয়ই কপালকুণ্ডলার একমাত্র ধন ও বন্ধনী। সে প্রণয়বেগ কখন কোন প্রতিরোধ পায় নাই। সরলতা বশতঃ তাহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে শ্যামাসুন্দরীর প্রতি, কিয়ৎ পরিমাণে নবকুমা-

রের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রণয়বেগ আজিও এত প্রবল হয় নাই, যে তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারের আবেগ সকল প্রদমিত করিতে পারে। সে প্রণয় কেবল মাত্র স্ফুরিত হইতে ছিল। আজিও ভক্তিবৎসলা ভবানীব প্রতি কপাল-কুণ্ডলার শৈশব-ভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। আজিও সাংসারিকতা এত প্রবল হয় নাই, যে পরদুঃখকাতরা কপালকুণ্ডলা পরহিতে নিরত হইবেন না। আজিও প্রণয় এত প্রবল হয় নাই, যে লুৎফ-উন্নিসার সুখের জন্য সে প্রণয় বিসর্জ্জন দিতে অসঙ্কুচিত হইবেন না। কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে আশৈশব যে সমস্ত ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল সে সমস্ত ভাব এত দুর্ব্বল নহে, যে বৎসরেক সংসার বাসে তাহা নবোদিত প্রণয়ের আবেগে পরাভূত হইবে। কারণ সেই সমস্ত ভাবই কপালকুণ্ডলার একমাত্র সম্পত্তি ছিল। সেই কতিপয় ভাবেই কপালকুণ্ডলা জীবিত। কপালকুণ্ডলা পৃথিবীর আর কিছুই জানিতেন না, কেবল বালস্বভাবসুলভ ভক্তি, ভয়, ও পরদুঃখে কাতরতা জানিতেন। তিনি পূর্ব্বে যাহা কিছু কবিতেন, ইহাদিগেরই অন্যতম ভাবে প্রণোদিত হইয়া করিতেন। এই ভাবত্রয় তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব ছিল। পৃথিবীর জ্ঞান-বিরহিত হওয়াতে অন্যভাবে তিনি কখন বিচলিত হয়েন নাই। সুতরাং এই ভাবত্রয়ই শনৈঃ শনৈঃ প্রবল হইয়াছিল। প্রণয় কি তাহা দিগকে সহসা বিদূরিত করিতে পারে?

এই সংসারানভিজ্ঞা সরলা নব-প্রণয়িণী কপালকুণ্ডাব সহিত, ঘোর-বিষয়িণী চতুরা প্রেমবৃদ্ধা লুৎফ উন্নিসার কেমন সম্পূর্ণ বৈপরীত্য-ভাব। কপালকুণ্ডলা সরলতায় গৌরবান্বিতা, লুৎফ উন্নিসা গৌরবের ভগ্নাবশেষ। কপালকুণ্ডলা নবোদিত পূর্ণ-চন্দ্রমা, লুৎফ-উন্নিসা হ্রস্বতেজ অস্তগামী সূর্য্য। এক জন জীবন পথে হৃদয়ালোক সহ স্নিগ্ধমূর্ত্তিতে উদিত হইতেছেন, অন্য জন হৃদয়তেজ সঙ্কীর্ণ করিয়া এক প্রকার জীবন পথে অস্তগামী হইতেছেন। অস্তাচলে অধোগামী হইয়া মনে করিতেছেন আবার উদয়াচলে নববিভায় সমুজ্জ্বলিত হইবেন, চন্দ্রমাকে শীঘ্র বিদূরিত করিয়া দিবেন। কাপালিক এমত সময়ে সন্ধ্যাগগণে ঘটনাজালের মেঘ আনিয়া দিল; ঝড় উঠিল। মেঘমণ্ডলী গগণ দেশে ব্যাপ্ত হইল। চন্দ্র উঠিল সূর্য্যও অদৃশ্য হইল। সকলই মেঘময়, কিছুই দৃষ্ট হয় না; নবকুমার কেবল চন্দ্র সন্নিকট ঐ তারকা মাত্র রূপে একাকী মেঘপার্শ্বে অস্পষ্ট ঝল্ ঝল্ করিতেছেন। ইহাই কপালকুণ্ডলার সমাপ্তি—মহান্ সমাপ্তি। এই গগণদেশে দৃষ্টিপাত করিলে কাহার মন না গভীর ভাবে পূর্ণ হয়? বাহ্য-মেঘাড়ম্বর ও অন্ধকার কাহার মনে না প্রবেশ করে? কেনা চন্দ্রমালোকের অভাব জ্ঞান করেন? এই গম্ভীর সমাপ্তি—এই গম্ভীর দৃশ্য কপালকুণ্ডলার ন্যায় গম্ভীর উপন্যাসের উপযুক্ত বটে। আমরা এ দৃশ্য কখনই ভুলিব না। "আমাদিগের

মন এ দৃশ্যে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কে আবার মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে! চন্দ্রমা কবে মেঘোন্মুক্ত হইয়া স্নিগ্ধ কিরণে অমৃত বর্ষণ করিবেন! বোধ হয় সে চন্দ্রমাকে দেখা আর আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। সেই জন্যই আমরা চন্দ্রমার অভাবে এত বিহ্বল হইয়াছি। কেবল কল্পনাতে তাহার পূর্ণ মূর্ত্তি এখনও প্রভাসিত রহিয়াছে।

ক্রমশঃ। শ্রীপূঃ——

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যে সমস্ত ইংলণ্ডীয় লেখক সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের লেখনী অনেক স্থলেই অমৃতের বিনিময়ে গরল ধারা বর্ষণ করিয়াছে। তাঁহারা জাতীয় গৌরব ও জাতীয় মহত্ত্ব-বিস্তার-প্রয়াসী হইয়া প্রকৃত ঘটনা-চিত্রকে অতিরঞ্জিত বা স্থলবিশেষে অরঞ্জিত করতঃ পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। দুটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন মতের সম্প্রদায় ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে ভারত-বক্ষে শোণিতময়ী ঘটনার অভিনয়ে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। এক দিকে ভারতভূমির কৃষ্ণবর্ণ সিপাহি, অপরদিকে বারিধি-হৃদয়-বিলসিত ইংলণ্ডের গৌরবর্ণ ইংরেজ, এই বিভিন্ন সম্প্রদায় দ্বয়ের সংঘর্ষে ৫৭ অব্দের সমর সমুপস্থিত হয়। এক্ষণে ইংলণ্ডের গৌরবর্ণ সম্প্রদায়ই সেই অতীত সাময়িক চিত্র চিত্রিত করিয়া সাধারণ্যে প্রদর্শন করিতেছেন। সুতরাং এই চিত্রকরগণ যে স্বজাতীয় কার্য্য-পদ্ধতির চিত্রকেই অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে না। অনুচিত জাতীয়গৌরব-প্রিয়তা যাঁহাদিগের হৃদয়ে সঙ্কুক্ষিত হইয়া ঘটনার যাথার্থ্য এইরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাঁহাদিগের নিকট স্থলবিশেষে প্রকৃত সহৃদয়ভাব আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই সহৃদয়তার অসদ্ভাবই অনেক স্থলের ঐতিহাসিক পট কালীময় করিয়া রাখিয়াছে। যে পঞ্জাবের ঘটনা লক্ষ্য করিয়া আমরা সিপাহি যুদ্ধের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতেও এই অসহৃদয়তা এবং অনুচিত জাতীয়গৌরব ও অনুচিত ক্ষমতা-প্রিয়তা পরিস্ফুট হইবে।

অদম্য ব্রিটীষ্ সিংহ শনৈঃ শনৈঃ পঞ্জাব-ক্ষেত্রে স্বীয় একাধিপত্য বিস্তার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, সপ্তসিন্ধুর প্রসন্নসলিল-বিধৌত রণজিৎ-রাজ্যের সহিত তাহার ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি ক্রমেই রজ্জুবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। যে সমস্ত তেজস্বী ব্যক্তি অদ্যাপি শিখ্-সমিতির গৌরব বর্দ্ধন করিতেছিলেন, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য বিষধরের

ন্যায় নিস্তেজ করিতে সমুদ্যত হইলেন। লোক-ললামভূত কমনীয় কামিনীজনও এই কঠোর শাসন দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট স্বীয় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ও তেজস্বিতা অপ্রতিহত রাখিবার আশয়ে পুরুষ ও নারী উভয় জাতির উপরই সমভাবে কঠোর দণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাণী ঝিন্দন প্রকৃত-পুরুষ-জনোচিত অটলতা ও তেজস্বিতার আধার হওয়াতে ইতঃপূর্ব্বেই ব্রিটীষ্ সিংহের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। এই কোপবহ্নির আশু নির্ব্বাণ জন্য তাঁহাকে বিধর্ম্মী-মুসলমান-জাতি-পরিবেষ্টিত সেখপুর নামক নির্জ্জন স্থানে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ঝিন্দনের এই শোচনীয় পরিণামেও ব্রিটীষ্ কেশরীর কোপাগ্নি একবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। এই বহ্নি কিয়ৎকালের জন্য প্রধূমিতাবস্থায় ছিল, এক্ষণে ঘোরতর বিদ্বেষ-পবনে বিধূনিত হইয়া তাহা পুনর্ব্বার প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। ঝিন্দন আবার অপবাধিনী হইয়া ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে বিচারার্থ সমানীত হইলেন।

ব্রিটীষ্ জাতির বিরুদ্ধে মুল্তানবাসিদিগের অভ্যুত্থান ও তন্নিবন্ধন অভিযান-নিয়োজিত ব্রিটীস্ সেনাপতির সাহায্য প্রার্থনার সম্বাদ জুলাই মাসের প্রারম্ভে লাহোর রেসিডেন্সীতে সমুপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মে মাসে মহারাণী ঝিন্দনের অদৃষ্ট-নেমি পুনর্ব্বার নিম্নগামী হইবার সূত্রপাত হইতে থাকে। আমরা ইংলণ্ড-প্রসূত ইতিহাস-রচয়িতৃগণের নিকট অবগত হই, মুলতানঘটিত গোলযোগের পূর্ব্বে লাহোর দরবারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অন্য একটী রহস্য-চক্র আবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। মহারাণীর কতিপয় প্রিয় পাত্র এই চক্রের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সিপাহিদিগকে তদ্বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাই এই চক্রান্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল নিঃশব্দেই চক্রের গতি সমাহিত হয় নাই। সপ্ত-গণিত সেনাদলের কতিপয় ব্যক্তি তাহাদিগের অধিনায়ক দিগকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করে। অন্যতম শিখ-সেনাপতি খান সিংহ ও মহারাণীর জনৈক বিশ্বস্ত পাত্র গঙ্গারাম এবিষয়ের প্রধান ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। অবিলম্বে প্রকাশ্যভাবে ফাঁসিকাষ্টে এই প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। ব্রিটীষ্ জাতির সমুদ্যত বজ্র কেবল খানসিংহ ও গঙ্গারামের জীবন হরণ করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, ঘটনাসংস্পৃষ্ট অন্যান্য ক্ষুদ্র দোষার্হ ব্যক্তিগণের প্রতিও এইসূত্রে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ড বিহিত হয়। এইরূপে মুখ্য ও গৌণ বিপ্লবকারিদিগের দণ্ড বিধান করিয়া ব্রিটীষ্ রেসিডেণ্ট্ অতঃপর মহারাণী ঝিন্দনের প্রতি স্বীয় রোষকষায়িত দৃষ্টি নিপাতিত করেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যাবৎ এই তেজস্বিনী নারী লাহোর দরবারের

নিকটস্থ থাকিবেন, তাবৎ ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের ভদ্রস্থতা নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাকে একবারে পঞ্জাব ক্ষেত্র হইতে নিষ্কাশিত করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল; কিন্তু কারণ অভাবে এতদিন এই অভীপ্সিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। এক্ষণে খান সিংহ ও গঙ্গারামের ষড়যন্ত্র-ব্যপদেশে রেসিডেণ্টের চিরসঞ্চিত মনোগত বাসনা সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল। সেখপুরের নির্জ্জন গৃহ আর ঝিন্দনের লাবণ্য-লীলাতরঙ্গের বিলাস-ভূমি রহিল না, রেসিডেণ্টের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রণজিৎ-শাসিত পঞ্চনদ রণজিৎ-রমণীকে জন্মের মত হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে সমুদ্যত হইল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ দলীপসিংহ রেসিডেণ্টের হস্তে ক্রীড়নক ছিলেন, সুতরাং সারফ্রেড্রিক্ কারির* অভীষ্ট সিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইলনা। অবিলম্বে ঝিন্দনের নিষ্কাশন দণ্ড-লিপি দলীপ সিংহের নামাঙ্কিত মোহরে সুশোভিত হইল। দরবারের কতিপয় কর্ম্মচারী দুইজন ব্রিটীষ সৈনিক পুরুষের সমভিব্যাহারে এই লিপি বহন করিয়া সেখপুরের ঝিন্দনাধিষ্টিত গৃহে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাণী ঝিন্দন অটল ভাবে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্রের নামাঙ্কিত মোহর-সুশোভিত নির্ব্বাসন-দণ্ড-লিপির নিকট মস্তক অবনত করিলেন। অটলভাবে স্বীয় অদৃষ্ট-বিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিয়া চির জীবনের মত পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ এক সময়ে যে লাহোর দরবারের সিংহাসনভাগিনী করিয়া ঝিন্দনের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, যে লোক-ললামভূত-কোহিনূর-রত্নসমুজ্জ্বল লাহোরের অমাত্য-সমিতি এক সময়ে ঝিন্দনের অপ্রতিহত প্রভু-শক্তির নিকট অবনত মস্তক ছিলেন, সেই সৌভাগ্য-লীলা-তরঙ্গায়িত সুখ-বল্লীর বিলাসভূমি লাহোর পরিত্যাগ কালে ঝিন্দনের যেরূপ অটলতা ও বিকারশূন্যতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সেখপুব পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবের সীমা অতিবাহন সময়েও সেই অটলতা ও বিকারশূন্যতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইল না। প্রকৃত ধীরতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া মহারাণী ঝিন্দন স্বীয় দশাবিপর্য্যয়ের সাক্ষীভূত সেখপুরের আবাস-গৃহের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন। যে পঞ্জাব তাঁহাকে হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া আসিতেছিল, এতদিনের পর সেই পঞ্জাব তাঁহার নেত্র-বিনোদনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল। ঝিন্দন দুঃখ-সঙ্গিনী সহচরীগণ-পরিবৃতা হইয়া ইহ জন্মের মত সেখপুর হইতে বহির্গত হইলেন। প্রথমে ফিরোজপুরে আনয়ন করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে বারাণসীতে উপস্থিত করা হয়। মহারাণী ঝিন্দন হিন্দুর আরাধ্য ক্ষেত্রে,

* গতবারে প্রমাদবশত সারহেন্‌রি কারি মুদ্রিত হইয়াছে।

হিন্দুত্বের নিদর্শনভূমি এই কাশীধামে উপস্থিত হইয়া মেজর জর্জ্জ ম্যাক্-গ্রেগার নামা জনৈক ব্রিটীষ্ সৈনিক পুরুষের গ্রহয়িতায় (custody) পরিরক্ষিত হইলেন।

এইরূপে রণজিৎ-মহিষী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন-ব্যাপার সমাহিত হইল। পঞ্জাব অবাতবিক্ষোভিত জলধীর ন্যায় ধীরভাবে স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই শোচনীয় নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিল, একটী মাত্রও বারি-বিন্দু তাহার নেত্র-বিগলিত হইয়া দেহ অভিষিক্ত করিল না, যে বহ্নি পুটপাকের ন্যায় শরীর বিদগ্ধ করিতেছিল, এসময়ে তাহার একটী স্ফুলিঙ্গও হৃদয়-চুল্লি হইতে উদ্গত হইয়া অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিল না, পঞ্জাব যোগ-নিদ্রাভিভূত বিরাট পুরুষের ন্যায় জাড্য দোষে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। দলীপসিংহ সুখময় বাল্যলীলা-তরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিলেন, জননীর ঈদৃশ দশা-বিপর্য্যয় তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ সংক্ষুব্ধ করিতে পারিল না। ভবিষ্য-জীবন ভবিষ্য-সংসার-তত্ত্ব অনভিজ্ঞ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক রেসিডেণ্টের বাল-বশীকরণসূত্রে পরিচালিত হইয়া অম্লানবদনে অতল অনন্ত সাগরে স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর বিসর্জ্জন দেখিলেন। মহারাণী ঝিন্দন প্রিয়তম স্বামীর অতুল রাজত্ব সম্পৎ— প্রাণাধিক তনয়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময় সহবাস সুখ হইতে জন্মের মত বিচ্যুত হইয়া কারাবন্দিনী হইলেন, ব্রিটীষ্ সিংহ স্বীয় দুর্নিবার ভোগ-লালসার পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য অবিচলিত হৃদয়ে অম্লানভাবে বিশ্বসংসারে এই শোচনীয় ঘটনার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। যাঁহারা প্রকৃত সহৃদয়তার ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিনতি সহকারে একবার এই সকরুণ দৃশ্য স্মৃতি-পটে চিত্রিত করিতে অনুরোধ করি। একবার এই ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের দুরবগাহ রাজনীতির পর্য্যালোচনা করিয়া ন্যায়ের পক্ষপাত-বিবর্জ্জিত সদ্ বিচারের সহিত তাহার তারতম্য করিতে অনুরোধ করি। নির্জ্জনে গম্ভীর ভাবে অতীত কার্য্যকারণ আলোচনা করিলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, ব্রিটীষ জাতির মধ্যেও ভারতবর্ষের কনিক ও চাণক্যাচার্য্য অথবা ইউরোপের মেকিয়াভেলীর মন্ত্রশিষ্য আছেন। ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টও স্বার্থসাধন উদ্দেশে কূট রাজনীতির ব্যপদেশ অবলম্বন করিয়া অপরের সর্ব্বনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়া থাকেন। আমরা ব্রিটীষ সিংহের অদম্য তেজের নিকট মস্তক অবনত করিতেছি, সভ্যতা ও উদারতার নিকট মস্তক অবনত করিতেছি, কিন্তু স্বার্থসাধিনী কূট রাজনীতির নিকট কখনও নতশির হই না। ঈদৃশী নীতি স্বয়ং নিষ্কামত্ব প্রদর্শন করিয়াও পরস্বাপহরণে রত, অনাসক্ত ভাবে পরিচিত হইয়াও ভোগ-লালসার আয়ত্ত এবং ন্যায়ের অনুচারিণী রূপে প্রতিভাত

হইয়াও অপরের সর্ব্বনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়া থাকে। ভবিষ্যবংশীয় মনীষিগণ এই গরলময়-ফল-প্রসবিত্রী নীতির মন্ত্র-শিষ্যদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু পঞ্জাব এই নীতির মন্ত্রনীতি-মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল জড়ত্বাবস্থায় কালাতিপাত করে নাই, যে অগ্নি তাহার হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়াছিল, তাহা চির কাল তুষানলের ন্যায় অন্তর্নিগূঢ় ভাবে আপনার গতি প্রসারিত করে নাই। গুরুগোবিন্দ সিংহ পঞ্জাবের শিরায় শিরায় যে তেজ প্রসারিত করিয়াছিলেন তাহার অলৌকিক শক্তি বলে অচিরাৎ এই জড়ত্ব সজীবতায় এবং অন্তর্নিগূঢ় তুষানল উদ্গত, লোলশিখ প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের অব্যবহিত পরেই সমস্ত পঞ্জাব অদৃষ্টচর মন্ত্রশক্তিবলে অপূর্ব্ব জাতীয় জীবনের মহিমা-প্রসাদে পুনর্ব্বার এই সর্ব্বসংহারিণী নীতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া বিষম অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি করিল।

যখন ভ্যান্স আগ্নু ও আণ্ডারসন মুলতানে সঙ্কটাপন্নাবস্থায় পতিত হয়েন, সেই সময়ে লেফ্টেনেণ্ট এডওয়ার্ডিস্ নামক জনৈক তেজস্বী যুদ্ধবীর বন্নুর বন্দোবস্ত কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ভ্যান্স্ আগ্নু মুলতান দুর্গে আহত হইয়াই দ্রুতগামী অশ্বারোহী ফসিদ দ্বারা সাহায্য প্রাপ্তির আশয়ে তাঁহার ও তদধীনস্থ জেনারেল কর্টলাণ্টের নামে এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র জেনারেল কর্টন্যাণ্টের শিরোনামাঙ্কিত পত্রাধারে সংরক্ষিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছিল। ২২এ এপ্রেলের অপরাহ্ণকালে এড্ওয়ার্ডিস দেরা ফতে খাঁর শিবিরে বসিয়া চৌর্য্যাপরাধের বিচার করিতেছিলেন এমন সময়ে ফসিদ দ্রুতগতিতে কর্টলাণ্টের শিরোনামাঙ্কিত পত্রাধার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। এড্ওয়ার্ডিস্ পত্রের প্রয়োজনীয়তা অবগত হইয়া উহা স্বয়ং উন্মোচন পূর্ব্বক ভ্যান্স আগ্নুর স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ করিলেন। আগ্নুর এই পত্রে তাঁহাদিগের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া এড্ওয়ার্ডিস্ একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, কিরূপে বিশিষ্ট সত্বরতা সহকারে মুলতানে উপস্থিত হইবেন, কিরূপে তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে শত্রুসমষ্টির ভীষণ করালগ্রাস হইতে বিমুক্ত করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিল। তিনি যে কার্য্য সম্পাদন উদ্দেশে বন্নুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাতে আর তদীয় মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। এড্ওয়ার্ডিস্ অবিলম্বে রেসিডেণ্ট স্যর ফ্রেড্রিক কারির নিকট একখানি পত্র লিখিয়া স্বল্পমাত্র সৈন্য ও কামান—যাহা পাইলেন, তৎ সমভিব্যাহারে সিন্ধু নদী উত্তরণ পূর্ব্বক মুলতানের নিকটবর্ত্তী লিয়ানগরে সমুপস্থিত হয়েন। এই অভিযানের প্রাক্কালে এড্ওয়ার্ডিস আগ্নুর নিকট এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু

এই পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বিপ্লব-কারিদিগের অস্ত্রাঘাতে আগ্নু ও আগুর্শ-নেন প্রাণবায়ুর অবসান হয়। এড্ওয়া-র্ডিস পথিমধ্যে স্বদেশীয়দিগের এই শোচনীয় পরিণামের সম্বাদ অবগত হয়েন। তিনি যাহাদিগকে রক্ষা করিতে স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া মুলতানে গমন করিতেছিলেন, তাহারা যখন বিদেশে বিপাকে মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইলেম তখন 'এড্ওয়ার্ডিসের প্রতিহিংসা বৃত্তি নিতান্ত বলবতী হইয়া উঠিল, মুলতান জয় ও মুল-রাজের সর্ব্বনাশ সাধনই তিনি বীজ মন্ত্র স্বরূপ গণনা করিতে লাগিলেন। মুলতানের ৫০ মাইল দক্ষিণে ভাওয়ালপুর নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, এই রাজ্যের অধিনায়ক বিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের সহিত বিশিষ্ট ঘনিষ্টতা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এড্ওয়ার্ডিস এতন্নিবন্ধন আশা-সন্ধুক্ষিত হৃদয়ে ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের নামে ভাওয়ালপুরের নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, নবাব সম্মত হইলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য এড্ওয়ার্ডিসের সহিত সম্মিলিত হইল। এতদ্ব্যতীত জেনারেল কর্টন্যাণ্ট ও লেফ্টেনেণ্ট লেক প্রভৃতি ব্রিটীষ্ যুদ্ধ বীরগণও এড্ওয়ার্ডিসের পৃষ্ঠ-পূরক হইলেন। তদীয় সৈন্য-বল কেবল এই বিভিন্ন দলের সংযোগেই পরিপুষ্ট হয় নাই। লাহোর দরবারের রাজা সের সিংহের অধীনে এক দল যুদ্ধ-কুশল শিখ সৈন্য মুলতানে প্রেরিত হইল। এড্ওয়ার্ডিস এই সমস্ত পৃষ্ঠ-পূরক সৈন্য দল লইয়া মুল-রাজের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে সার্ ফ্রেডরিক কারি তাঁহার সাহায্যার্থ এক দল ব্রিটীষ্ সৈন্য পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অনুজ্ঞা লাভের নিমিত্ত ২৭এ এপ্রেল প্রধান সেনাপতির নিকট এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। উষ্ণ কোটিবন্ধের এই উষ্ণ-প্রধান নিদাঘ সময়ে সারহিউ লক্ সিমলার শীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন, তিনি বর্ত্তমান সময় যুদ্ধের অনুপযোগী বলিয়া সৈন্য প্রেরণ আপাততঃ স্থগিত রাখিতে আদেশ করিলেন। গবর্ণর জেনরেলও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রধানতম কর্তৃপক্ষের এই মীমাংসা রেসিডেণ্টের মনঃপূত হইল না। গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির সহিত সারফ্রেডরিককারির এইরূপ মত-বৈষম্য সঙ্ঘটিত হওয়াতে হারবার্ট এড্ওয়ার্ডিসের হৃদয়ও সংক্ষুব্ধ হইল। মে ও জুন এইরূপে অতিবাহিত হয়। জুলাই মাসের প্রারম্ভে মুলতান দুর্গের দৃঢ়তা ও বল-বহুলতা দেখিয়া এড্ওয়ার্ডিস্ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রেসিডেণ্টের সাহায্য প্রার্থী হয়েন। সার ফ্রেডরিক্ পুনর্ব্বার এই বিষয় প্রধান সেনাপতিকে বিজ্ঞাপিত করেন। এবারেও লর্ড লক্ পূর্ব্ব সঙ্কল্প হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া মস্তক সঞ্চালন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ডেলহৌসী ও সার জন্ লিটলার্ নামা জনৈক সেনাপতি শ্রেষ্ঠেরও মস্তক সঞ্চালিত হইল। কিন্তু এবারে

সার কৈডরিক কারি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্রিটীষ্ শাসন-সমিতির প্রধানতম অধিনায়ক ত্রয়ের যুগপৎ মস্তক সঞ্চালনে তাঁহার দৃঢ়তর সঙ্কল্প পর্য্যদস্ত হইল না। তিনি কিনেরি ও সুদসাং সমরক্ষেত্রে বিজয়শ্রীকে এড্‌ওয়ার্ডিসের অঙ্কশায়িনী দেখিয়া সোৎসাহচিত্তে নিজের স্কন্ধে সমুদয় দায়িত্ব নিক্ষেপ পূর্ব্বক সাম্প্‌সন্ লুইস নামক জনৈক সেনাপতিকে ব্রিটীষ্ সৈন্যদল ও কামান লইয়া মুলতানে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। সুতরাং অবিলম্বে ব্রিটীষ্ তেজ মুলতান বিধ্বস্ত করিতে অভ্যুদিত হইল।

ক্রমশঃ

প্রণয় ও শ্রীকৃষ্ণ।

Devotion wafts the mind above,
But heaven itself descends in love.

"ভক্তিতে মনকে স্বর্গে তুলিয়া দেয়, কিন্তু প্রণয়ে স্বর্গই স্বয়ং নামিয়া আসে।" বাইরণের এই কথার অর্থ কি? সংসারে অতি অল্প লোকই ইহার অর্থ বুঝিয়াছেন; অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ইহ সংসারে স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছে; অতি অল্প লোকেরই স্বর্গ দর্শন বা স্বর্গউপভোগ হইয়াছে। সাধারণ লোকের পক্ষে এই বাক্য আকাশ কুসুমবৎ; তাহাদিগকে ইহা বুঝাইবার উপায় কি? সংসারকে সাধারণতঃ স্বর্গ সৃজনের উপায় কি? নশ্বর মানব জীবনের কয়েক দিনকে অমর করিবার উপায় কি?——স্বর্গ এবং অমরত্বের কথা আসিল, আমরা স্বর্গের এবং অমরত্বের তাৎপর্য্য কি ব্যাখ্যা করিব।

স্বর্গ আর কিছুই নয়, উহার যতই কেন আড়ম্বর বর্ণনা আমরা শুনি না, উহা ইহলৌকিক সুখের মনসিজ (Ideal) রচনা মাত্র; এই নিমিত্ত বিভিন্ন দেশীয় লোকের বিভিন্ন প্রকার সুখাভিলাষ ও সৌন্দর্য্যের জ্ঞান হইতে তাহাদের স্বর্গের রচনা বিভিন্ন প্রকার। সৌন্দর্য্যের তারতম্য তাহার দুইটি গুণের দ্বারায় বিচার হইতে পারে, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য যে পরিমাণ অন্তর-আকর্ষণ-কারী, এবং যে পরিমাণে অন্তর-অবরোধ-কারী সেই পরিমাণে উহার তারতম্য বিচার হইয়া থাকে। কোন সৌন্দর্য্য অন্তঃকরণকে ঈষৎ আকর্ষণ করিল এবং এক মুহূর্ত্তমাত্র অবরোধ করিয়া রাখিল; কিন্তু যে সৌন্দর্য্য অন্তঃকরণকে সকল বন্ধন কাটাইয়া উহার প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ করিতে পারে, এবং আজীবনকাল উহাতেই অবরোধ করিয়া রাখিতে পারে সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্যের

পরাকাষ্ঠা। উপভোগের তারতম্য বিচার, শরীর এবং অন্তর্বৃত্তি সকলের শিথিলতার তারতম্য অনুসারে হইয়া থাকে। একটি সুমিষ্ট ফল ভোজনে জিহ্বার সূক্ষ্মশির সকল এবং উহা সুঘ্রাণযুক্ত হইলে নাসার সূক্ষ্ম শিরা সকল মাত্র শিথিল হইবে, এবং তদনুসারেঅন্তর্বৃত্তিরও কিয়ৎপরিমাণ শিথিলতা সম্পাদন করিবে। কিন্তু যে উপভোগ সামগ্রী একবারে সমস্ত শরীর ও অন্তঃবৃর্ত্তি সকলকে শিথিল, বিগলিত ও অবশ করিয়া ফেলিতে পারে সেই উপভোগ সামগ্রীই উপভোগের পরাকাষ্ঠা। এবং উক্তরূপ পূর্ণ-সৌন্দর্য্য এবং উপভোগ ক্ষেত্রই স্বর্গের সারাৎসার স্বর্গ। অমরত্ব অর্থে জড়তা-শূন্য, সদা-চেতন, অস্বপন ভাব। স্বর্গীয় পূর্ণসৌন্দর্য্য উপভোগ মাঝে মন কখন মৃতবৎ জড় হইয়া থাকিতে পারেনা; মন নিত্য জীবন্ত সদা চেতন অর্থাৎ অস্বপন ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে, এই নিমিত্তই স্বর্গবাসীদিগের অস্বপন একটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

এক্ষণে এইরূপ অন্তঃকরণের পূর্ণ-আকর্ষণকারী সুখময় সৌন্দর্য্য ও উপভোগবস্তু যাহাদ্বারা মৃতবৎজড় মানবজীবন অস্বপন, অমরভাব ধারণ করিতে পারে তাহার বীজ ইহ সংসারে আছে কিনা? যদি থাকে, তবে তাহারি একাধিপত্য বিস্তার দ্বারা সংসারকে স্বর্গধাম করা হইতেছেনা কেন? তাহার প্রতিবন্ধক কি, এবং সেই বস্তুই বা কি?

সেই বস্তুর নাম প্রণয়, এবং তাহার প্রতিবন্ধক স্বার্থ। মানবহৃদয়ের সদসৎ অভিধেয় যাবতীয় বৃত্তি নিচয় এই দুই মূল হইতেই সমুৎপন্ন; তন্মধ্যে সৎগুলি প্রণয় এবং অসৎগুলি স্বার্থের অন্তর্গত। স্বার্থ প্রণয়ের প্রকৃতি-বিচ্ছেদক শত্রু প্রণয়ে স্বার্থের সংস্পর্শও সহ্য হয়না। বর্ত্তমান অবস্থার মানব সমাজের কার্য্যসাগরের তরঙ্গাবলি এই দুয়ের দ্বন্দোত্থিত মাত্র। যাবদীয় মঙ্গল ইহাদিগের স্বাতন্ত্রী প্রসাবিত ফল, এবং যাবদীয় অমঙ্গল ইহাদিগের সংপর্শের দ্বন্দোত্থিত ফল। আমরা বর্ত্তমান সমাজের সহিত—প্রণয় ও স্বার্থের উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা ভাব কিরূপ তাহা দেখাইতেছি।

আজ্ কাল আমরা দেখিতে পাই স্বার্থের দ্বারাই প্রায় সংসারের অধিকতর মঙ্গল সাধিত হইতেছে। যে অন্ন বস্ত্র আমরা নিত্য উপভোগ দ্বারা জীবন ও লজ্জা রক্ষা করিতেছি, যে অর্ণবযান, রেলওয়ে দেশ হইতে দেশান্তরে বিবিধ সুখ স্বচ্ছন্দের দ্রব্য বিনিময় করিয়া ফিরিতেছে, স্বার্থই ইহাদিগের নেতা, এমন কি সংসারে স্বার্থ-বিরহিত সমুৎপন্ন ফল অতি বিরল। স্বার্থেই মানুষের আজ্ কাল যাহা কিছু অস্বপন জীবন্ত ভাব দেখিতে পাই; স্বার্থ সাধনেই মানুষ দিবারাত্রি খাটিতেছে, স্বার্থ রক্ষার্থে অপরের সহিত দ্বন্দ করিতেছে, স্বার্থ উদ্ধারের নিমিত্ত বল বিক্রমে দুঃসাহসিক কার্য্যে নিমগ্ন হইতেছে, স্বার্থের জন্য প্রাণ

হারাইতেছে, অতএব স্বার্থই মানুষের জীবনের জাগ্রত্ ভাব; স্বার্থই মানুষের এখন মনুষ্যত্ব। স্বার্থের গন্ধ-মাত্র-বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল মাত্র প্রণয়ের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষের যে কাজ তাহা অতি বিরল; এবং যাহা কিছু আছে তাহারও জীবন্ত জাগ্রত ভাব নাই, সুতবাং তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্বও অতি অল্প। মনুষ্যত্ব অর্থে আমরা মানবীয় বৃত্তি নিচয়ের পরিস্ফুট ভাবকে কহিতেছি; হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি স্বার্থ-মূলক ভাব সকল যে হৃদয়ের বৃত্তি,—দয়া, মায়া, স্নেহ প্রভৃতি প্রণয়-মূলক ভাব সকলও সেই হৃদয়ের বৃত্তি; অতএব তাহার যে গুলিই কেন বিস্তারিত হইয়া হৃদয়কে পরিস্ফুট করে আমরা ভাল মন্দ নৈতিক বিচার আগে রাখিয়া তাহাকেই মনুষ্যত্ব কহিব। ভাল মন্দ নৈতিক জ্ঞান কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কেনই বা স্বার্থ-মূলক জীবন্ত বৃত্তি সকলকে হেয়, ও প্রণয়-মূলক বৃত্তি সকলকে আরাধ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আমরা ইহার কারণ দেখাইতেছি।——

যুগ যুগান্তরে মানুষের অবস্থা অনুসারে নীতির পরিবর্ত্তন হইতেছে; মানুষের এক অবস্থায় যে সকল বিধান প্রয়োজনীয় বা উপযোগী হয় সেই অবস্থায় ঐ সকল বিধান সুনীতি, এবং তাহার পরিবর্ত্তনে ঐ সকল নিষ্প্রয়োজন ও অনুপযোগী হইলে, উহা দুর্নীতি রূপ ধারণ করে; এবং পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী নূতন বিধান সকল তখন আবার সুনীতি রূপ ধারণ করিয়া থাকে। মানুষ অতি আদিম অসামাজিক অবস্থায় যখন পৃথক্ পৃথক্ বাস করিত তখন তাহার শুভাশুভ অপরের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল নিজের উপরই নির্ভর করিত; সুতরাং তৎকালে মানুষ পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-বিরহিত হেতুক নিজের ইষ্ট সাধন জন্য অপরের ইষ্ট ধ্বংস করা অন্যায় ভাবিতে পারিতনা; তৎকালে যে কোন উপায়ে নিজার্থ-পোষণ-দ্বারা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা আয়ত্ত করিতে পারা যায় তাহাই সুনীতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আমরা এখানে দেখিতে পাই, কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি যত চৌর্য্যবৃত্তি-নিপুণ বা জীবনে যত বেসী নরহত্যা করিয়া নর-শিরে আপন ভবন সুসজ্জিত করিতে পারে, সেই তত যশস্বী হইয়া থাকে। ঐ সকল অসভ্য জাতিরা যে সামাজিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও অদ্যাপি অসামাজিক নীতির অনুসরণ করিতেছে, উহা কেবল তাহাদের সামাজিক নীতি-বিষয়ক অজ্ঞতা ও অসামাজিক জীবনের প্রকৃতি সামাজিক জীবনের উপযোগী করিতে না পারাতেই বলিতে হইবে। হারবার্ট স্পেন্সর ঠিক্ এই কথা বলিয়াছেন; তিনি কহেন, "মানব-কুল ক্রমে বহু-পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় তাহাদিগকে একরূপ বাধ্য হইয়াই সমাজ-বদ্ধ হইতে হইয়াছে। এবং এক্ষণে মানব সমাজে যে সমস্ত অনিষ্ট বিদ্যমান, তাহা কেবল মানব জীবন উক্ত সামাজিক জীবনের উপযোগী না হওয়াতেই

সমুদ্ভূত”। কিন্তু মানব জীবন সামাজিক জীবনের উপযোগী না হওয়ারি বা কারণ কি? ইহার কারণ তিনি এই কহেন, “মানব এখনো পূর্ব্বাবস্থার প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, আদিম অবস্থায় যে জীবন তাহার উপযোগী ছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা উপযোগী হইতেছে না। আদিম অবস্থায় অন্যের স্বার্থ ধ্বংস পূর্ব্বক নিজের স্বার্থ রক্ষা করাই প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় তাহা করিতে গেলে অনিষ্টোৎপত্তি হয়। মানুষের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি এই বলা যাইতে পারে, মানুষের পূর্ব্বজীবন-নীতি তাহার পূর্ব্ব অবস্থার উপযোগী হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান জীবন-নীতি বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী কিছু হওয়াই উচিত।”*

স্পেন্সর কহেন, মানুষের সেই রূপ ইচ্ছা সকলই পূর্ণ পরিতৃপ্ত হউক, যে রূপ ইচ্ছা সকলের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তিনি অপরের ক্ষমতাকে দমন না করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন।” †* তাঁহার মতে ইহারি উপযোগী বিধান সকলই বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের উপযোগী করিতে হইলে ইহাই কি সমযোগ্য হইবে? কোন ইচ্ছা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত, অপরের উক্তরূপ ইচ্ছা পরিতৃপ্তির ক্ষমতাকে দমন না করিয়াই ভাল আমি

* “By the increase of population the state of existence we call social has been necessitated. Men living in this state suffer under numerous evils. By the hypothesis it follows that their characters are not completely adapted to such a state.—

But why is not man adapted to the social state? Simply because he yet partially retains the characteristics that adapted him for an antecedent state. The respects in which he is not fitted to society are the respects in which he is fitted for his original predatory life. His primitive circumstances required that he should sacrifice the welfare of other beings to his own; his present circumstances require that he should not do so; and in as far as his old attribute still cling to him, in so far is he unfit for the social state.”

See Social Statics, chap, II Page 77, by Herbert Spencer.

* † It requires that each individual shall have such desires only, as may be fully satisfied without trenching upon the ability of other individuals to obtain like satisfaction.—Social Statics Page 77, by Herbert Spencer.

উহা পরিতৃপ্ত করিলাম, কিন্তু তাহাতেই কি হইল? মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ-ভাব ঘুচিল কৈ? মানুষের সহিত মানুষের যে পার্থক্য তাহাই রহিল, মানুষ আপন আপন চিন্তাতেই নিরত রহিল; কেবল একের ইচ্ছার বিরোধী অপরে হইল না মাত্র; কিন্তু একের সহিত অপরের সংযোগ হইল কৈ? সমস্ত মানব-মণ্ডলী এক শরীর হইল কৈ? স্পেন্সরের উপরোক্ত অনুমান মানবকে সম্পূর্ণরূপে সামাজিক জীবনের উপযোগী করিবার ভাবে আসিয়াছে। ইংরাজ প্রকৃতির বলবৎ ভাব স্বার্থ ও স্বাধীনতা; ইংরাজ নীতি-জ্ঞানও স্বার্থ ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্যেরই প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষীয় ও ফরাসী সমাজ-নীতিজ্ঞান ইহার বিপরীত। ইহাদিগের মতে মানুষের স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় স্বার্থজ্ঞানই তাহাদিগের সকল কার্য্যের নেতা হইয়া থাকে; স্বার্থজ্ঞান স্বাতন্ত্র্য অবস্থার প্রকৃতি-সম্বদ্ধ ভাব, অতএব মানুষের স্বাতন্ত্র্য অবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামাজিক জীবনে প্রবেশ করিতে হইলে, স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতি স্বার্থকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইবে, নচেৎ সামাজিক জীবন সংসাধিত হইতে পারে না। স্বার্থের সহিত মানুষ যে কোন অবস্থাতেই অপরের সহিত পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবে তাহার আশা নাই। সমাজের অর্থ একতা; অতএব একতা সম্পাদন করিতে হইলে তাহার বন্ধন মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ সংস্থাপন। বংশবৃদ্ধিতে মানুষের যেমন বাধ্য হইয়াই সামাজিক জীবনের প্রয়োজন হইয়াছে, তেমনি সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে, সর্ব্ববিষয়ে একতাই তাহার মূল প্রয়োজন; এবং এই একতা আবার পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ সংস্থাপন বিনা কিরূপে হইতে পারে? এখন সম্বন্ধ স্থাপন করিবার নিমিত্ত মানব-হৃদয়ে কোন্ বৃত্তি আছে? উত্তর প্রণয়। স্বার্থ যেমন স্বাতন্ত্র্য জীবনের মূল বৃত্তি, প্রণয়ও তেমনি সামাজিক জীবনের মূল বৃত্তি হওয়া চাই। প্রণয়-অভ্যাস ভিন্ন মানুষের সামাজিক জীবন পাইবার আর কোন উপায় নাই। প্রণয় বৃদ্ধির দ্বারাই মানব সমস্ত মানব-মণ্ডলীর উপর আপন অধিকার বিস্তৃত দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক মানুষ সমস্বাধীন হইবে, নীতি বা নিয়ম সকল তীরোহিত হইয়া যাইবে, এক পরিবারের ভিতর নিয়মের প্রয়োজন কি? সকলের কার্য্যেই সকলে সন্তুষ্ট। এই সকল সুমহৎ মনসিজ (Ideal) সামাজিক ভাব সুবিখ্যাত ফরাসিস পণ্ডিত কোমতের শত শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ঋষিগণের অন্তরে বিকসিত হয়, এবং উহা অনেক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত লোভ-পরবশ জাতিদিগের আক্রমণে ভারতের এই সুমঙ্গলময় গতি রোধ হইয়া যায়; অদ্যাপি ভারতে পূর্ব্বাবশিষ্ট সামাজিক ভাবের যাহা কিছু বর্ত্তমান রহিয়াছে সভ্যতাভিমানী ইউরোপ ও আমেরিকার

সেই পদবী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে শতাব্দীর উপর শতাব্দী লাগিবে। ভারতে এই সামাজিক উন্নতি কতদূর এখনো কার্য্যে পরিণত রহিয়াছে তাহার আলোচনা আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, ভারতবর্ষে এই সামাজিকতা কত অন্তরে পরিস্ফুট হইয়া আসিয়াছে, তাহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য। আমরা শ্রীকৃষ্টের চরিত্র অবলম্বন করিয়া সেই ভাবটি দেখাইব। প্রণয়ভাব ভারতবাসীদিগের অন্তরে কতদূর ব্যাপ্ত ও উন্নত তাহা তাঁহাদিগের এই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই বিদ্যমান আছে। এই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের সৃষ্টিদ্বারা ভারতবাসীরা তাঁহাকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করিয়া উপাসনা করিতেছেন, তাহার অভিপ্রায় মুক্তি। বাস্তবিক যদি মানুষ ঈশ্বরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তবে শ্রীকৃষ্ণের গুণ সাধনে সিদ্ধ হউক, তাহা হইলে মুক্তি লাভ হইবে। আমরা হয়ত এই শঙ্কট কথা বলিয়া বহুতর ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকের বিরক্তি-ভাজন হইলাম, আগামি প্রস্তাবে আমরা তাহার অপনোদনের চেষ্টা পাইব।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মেহের আলি।

নবম অধ্যায়।

রেঙ্গুন প্রদেশকে চট্টগ্রামীয়েরা রোসাঙ্গ কহে। ইংরাজেরা রেঙ্গুন অধিকার করিবার পূর্ব্বে. বাণিজ্য পোতে অথবা কখন ২ পদব্রজে কতিপয় চট্টগ্রামীয়েরা এই দেশে আসিত। রোসাঙ্গবাসী মগেরা চাষ করিতে অপটু, এজন্য এই সকল বিদেশীয়দের প্রতি তাহাদের বিলক্ষণ আস্থা ছিল। যাহারা ক্লেশ করিয়া এত দূর আসিত, প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিত। কিন্তু দেশের যথেচ্ছাচার বিচার ভয়ে ও দূর বলিয়া অতি অল্প লোকেই তথায় যাইত।

যিনি একবার মগের মুল্লুকে পদার্পণ করেছেন, গৃহাদি ও লোকজনের আকার দেখিবামাত্র ভারত-সীমাতীতে আসিয়াছেন, জানিতে পারেন। ভারতের সে হর্ম্ম্য বা পর্ণকুটীর নাই। কাষ্ঠফলকময় দুই তিন হস্ত উচ্চ মেজের উপর কাষ্ঠ-ভিত্তি-পরিবৃত গৃহ-নিচয় বহুতর দোচালায় আচ্ছাদিত হইয়া গৃহ গুলির রমণীয় শোভা বিধান করিয়াছে। যাহার স্তরে স্তরে চাল সন্নিবেশিত হইয়া আকাশ মার্গে উঠিয়াছে, সেই অত্যুচ্চ গৃহ গুলিকে উপাসনা-মন্দির বলা যায়; মগেরা

তাহাকে "ক্যাং" ঘর কহে। অপেক্ষাকৃত নীচু অথচ সুন্দর পরিপাটী গৃহ পথিকের আবাস জন্য পথে পথে সন্নিবেশিত আছে, তাহাকে "চেরাং" অতিথিশালা কহে। পন্থা-পার্শ্বে যে সকল ছোট ছোট কুটীরে জলপূর্ণ কলস পথিকদিগের সৌকর্য্যার্থ থাকে সে সকল গৃহকে "রেফুংজা" কহে। অবশিষ্ট তাবৎ সাধারণ গৃহ অতি নিকট নিকট নিবেশিত। সাধারণ বস বাসের ঘরও ঐরূপ মাচাও দোচালাময়, কেবল তাহাতে বহুতর প্রকোষ্ঠ থাকে। ইহাদিগকে "ইং" কহে। অধিকারী বুঝিয়া "ইং" গৃহের আয়তন, উচ্চতা সৌন্দর্য্য ও শোভার তারতম্য হয়। একটী অতি বিস্তীর্ণ সুশোভিত "ইং" ভবনের এক নিভৃততম প্রকোষ্ঠে এক বহুমূল্য আস্তাবলে বসিয়া এক নব দম্পতি যুবক যুবতী কথোপকথন করিতেছেন।

যুবতীর বর্ণ অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণ অথবা হংসডিম্বের ন্যায় ঈষদারক্ত শ্বেতবর্ণ বলিলেও বলা যায়। রমণীর রূপে সমগ্র গৃহ সমুজ্জ্বল হইয়াছে, এবং সেই রূপের ছটায় মুখ-কমল সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইয়াছে। এখন দেখিবা মাত্র চক্ষু ধাঁধিয়া যায়; একটু সুস্থির হইলে কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি মস্তকে এবং রক্তবর্ণ "খাম্মি" অর্থাৎ অঙ্গাবরণ বক্ষঃস্থলে অতি শোভমান দেখা যায়। সুগোল মুখ-কমল, সুগোল গ্রীবাদেশ, ও বাহুদ্বয় অনাবৃত আছে, বক্ষঃস্থলের উচ্চ অর্দ্ধভাগও অনাবৃত। বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও অঙ্গের পুষ্টতা ও কোমলতা দৃষ্টে সহসা মোমের পুত্তলিকার ন্যায় বোধ হয়। বিশেষ নিরীক্ষণ করিলে নাসিকা কিঞ্চিৎ নিম্ন, চক্ষু কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র দেখা যায়। কিন্তু গণ্ডস্থল বদন ও চিবুক নির্দ্দোষ। সর্ব্বাঙ্গ সমগ্র ধরিলে উক্ত দোষ সকল বুঝা যায় না এবং রমণীকে পরমাসুন্দরী বলিয়া বোধ হয়। বয়স অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণযৌবনা।

যুবার বয়স দ্বাবিংশ হইবে, বর্ণ মলিন বোধ হইতেছে। কিন্তু সুন্দরীর সমক্ষে ঐরূপ দেখা যায় নচেৎ তিনিও সম্পূর্ণ গৌরবর্ণ। যুবার লোচনদ্বয় বিস্তারিত—ঢল ঢল, নাসিকা সুপরিমিত, অঙ্গ সুদীর্ঘ ও বলবান্। যুবক যুবতীর দেহ তুলনা করিলে পরস্পর বিসদৃশ, কিন্তু উভয়ের জাতি-বৈশেষ্য মতে ঐ প্রভেদ রমণীয় হইয়াছে। যুবা সুন্দর পুরুষ, যুবতী সুন্দরী নারী; উভয়ের অতি উত্তম সম্মিলন হইয়াছে। উভয়ে নব বিবাহিত দম্পতি। দেশ-রীত্যনুসারে আজ কয়েক দিন একত্র এক গৃহে বাস করিতেছেন। উভয়ে যেরূপ সুখী থাকা উচিত মুখের ভঙ্গীতে তাহার বিপরীত দেখা যায়। সুন্দরী যুবার মুখ পানে চাহিয়া অতি অমিয় ভাবে মৃদুস্বরে কহিলেন "প্রিয়তম! এ অধীনী এইরূপ অনাস্থার যোগ্যা হইবার জন্য কি অপরাধ করিয়াছে, জানিতে না পারিয়া বড়ই ব্যথিত-হৃদয় হইয়াছি। যদি মনে না ধরে থাকে, যখন

বিবাহ হইয়াছে তখন এরূপ হতশ্রদ্ধা করা কি ভাল দেখায়? ভাল আমিই যেন উপযাচিকা হইয়া তোমায় বরণ করেছি, কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ বিনা অলাভ কি হইয়াছে? আমি তোমার প্রভু-কন্যা, তোমা অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন নহি, কেবল অপরাধের মধ্যে প্রণয় আমাকে তোমার দাসী করিয়াছে। সেই অকৃত্রিম অযাচিত প্রণয়ের প্রতিফল কি এই অনাস্থা, এই ঘৃণা? প্রথম রাত্রিতে মনে করেছিলাম অবস্থার বৈপরীত্যে সহসা মিলনে সঙ্কুচিত ও সলজ্জিত ছিলে। দ্বিতীয় রজনীতে মনে করিলাম অসম্মতিতে বিবাহ হইয়াছে বলে বিরক্ত হইয়াছ; সাধ্য সাধনায় জানিলাম তাহা নহে। জানিলাম তোমার এক প্রণয়িনী স্বদেশে আছেন, তদনুরোধে আমার সহবাসে কুণ্ঠিত, পিতাকে বলিয়া তোমার দেশ-গমনের অনুমতি লইলাম, তোমার সেই রমণীকে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা পাঠাইলাম তাহাতেও তোমার মন উঠে না। সুন্দর পুরুষ! আমি কি এতই হীনা এতই ঘৃণিতা, যে এক মুহূর্ত্ত জন্য আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত হইবে না? এই দেহ—যাহাকে পরিপোষণ করিতে শত শত দাসীর হস্ত ক্ষয় হইয়াছে—শত শত মুদ্রা পর্য্যবসিত হইয়াছে; এই রূপ—যাহার জন্য শত শত রসিক পুরুষ ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে; এই ধন ঐশ্বর্য্য,—যাহার গৌরব দেশ দেশান্তরে প্রকাশিত আছে;—এবং এই বিমল প্রেমিক হৃদয়—যাহা লাভ করিলে উদাসীনেরও মনে স্নেহ-রস জন্মে; প্রিয়তম! এ সকলি বিধাতা তোমার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছেন। অনায়াস-লব্ধ ব'লে কি এত অনাস্থা করিতে হয়? রমণীর কপোল অভিমানে আরক্ত হইল—অধোবদনে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইলেন। তাঁহার হস্ত যুবার হস্তে আবদ্ধ আছে।

যুবা বিস্ফারিত নয়নে সুন্দরীর অভিমান-গম্ভীর বদনের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার আননে, লোচনে—ঘৃণা দেখা যায় না, তবে সাধুর ন্যায় অরঞ্জিত হৃদয়ে তিনি সকল কথা শুনিলেন। সান্ত্বনাচ্ছলে কহিলেন, "সুন্দরী, যাহা বলিলে সকলি সত্য। তোমার রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য এবং প্রণয় যে সমাদর না করে সে পশু। কিন্তু আমি নিতান্ত অপাত্র ও হতভাগ্য। আমি অকপটভাবে তোমাকে বলিয়াছি, ভাগ্য সর্ব্বদাই আমার প্রতি বিমুখ। এক পরম শত্রুর হস্তে আমার পিতা মাতার জীবন, ধন, ঐশ্বর্য্য সকলি নিপাত হইয়াছে। এই পৃথিবীতে আমার এক মাত্র হৃদয়ের বস্তু আছে, তাহারই জন্য এত দূর দেশে এসেছি। নরকেও আমার স্থান হইবে না যদি আমি সেই বস্তুকে উৎখাত করি। প্রণয় কি তুমি জানিয়াছ, অতএব আর কেন আমাকে লাঞ্ছনা কর? আমাকে পরিত্যাগ কর। আমা হইতে তোমার সুখ হইবে না।"

সুন্দরী বদন উত্তোলন করিয়া কহি-

লেন, "নির্দ্দয় পুরুষ! পুরুষ-হৃদয় কি এত সঙ্কীর্ণ যে দুইটীকে স্থান দিতে পারে না? তুমি মধ্যে মধ্যে দেশে গিয়া প্রণয়িনী-সহবাস-সুখ লাভ করিবে তাহার উপায় করিয়া দিলাম। তুমি যে আপত্তি করিতেছ মিটাইতেছি, তাহাতেও তোমার আত্ম-গৌরব পর্য্যাপ্ত হয় না? আমি যদি তোমায় ছাড়িতে পারিতাম, এত অনুনয় করিতাম না। যখন তুমি হীন দাসভাবে এই ভবনে ছিলে তোমার রূপ গুণ দৃষ্টে আমি মনে মনে তোমার দাসী ছিলাম। যখন তুমি আমাকে পারস্য ভাষা শিখাইতে ও আমি তোমাকে মগ ভাষা শিখাইতাম, পরস্পর হৃদয়ের সম্মিলনই আমার অভিপ্রায় ছিল। তোমারই জন্য আমি তাবৎ নাগর-মণ্ডলীকে প্রত্যাখ্যান করেছি;—তোমারই জন্য এতদিন অনূঢ়া ছিলাম। বিধাতা জানেন—আমি কত কষ্টে হৃদয়কে চেপে রেখেছি; কত কৌশলে তোমার পদোন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধি পোষণ করিয়াছি। আহা! সেই সময়ই সুখের ছিল! যদি তুমি অধীনীর নয়নান্তরালে না যাইতে, যদি পিতার জাহাজ লইয়া গালি বন্দরে না যাইতে, কদাপি আমি ভিতরের কথা প্রকাশ করিতাম না। মনে মনে সেই সুখ পাইতাম, যাহা হইতে মন প্রকাশে বঞ্চিত হইতেছে।

সুন্দরীর চক্ষে জল আসিল,—সমস্ত আনন আরক্ত হইল এবং ক্রন্দন সম্বরণ করিতে না পারিয়া রুমাল মুখে দিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। যুবা সহানুভূতিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না,—আপন বস্ত্রে সুন্দরীর অশ্রুমোচন জন্য এক হস্তে তাঁহার গ্রীবা ধরিলেন ও এক হস্তে অশ্রুমোচন করিতে করিতে কহিলেন; "মানিনি! তোমার সরল প্রেমিক হৃদয় কি আমি অশ্রদ্ধা করিতে পারি, না কখন করিয়াছি? তবে কি না——।" রমণী বিগলিত হইয়াছেন, নায়ক-স্পর্শে আরও কাতরা হইয়া যুবার ক্রোড়ে মস্তক দিয়া তাঁহার হস্তে বদন স্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। যুবা কি বলিতেছিলেন মনোযোগ দেন নাই; পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া কহিলেন." নির্দ্দয়! আমি তখন লজ্জা ভয় নিন্দা উপেক্ষা করিয়া প্রথমে মাতাকে, পরে পিতাকে মনের কথা বলিলাম। তাঁহারা তোমায় আস্থা করিতেন, অতএব পত্র লিখিয়া তোমাকে আনাইলেন; এবং যথারীতি আমাদের বিবাহ হইল। তোমার সমগ্র আপত্তি আমি খণ্ডন করিলাম, নির্দ্দয় পুরুষ! তথাপি তোমার দয়া হইল না। না হউক আমি তোমায় বড় ভাল বাসি, এজন্য তোমাকে বলিতে চাহি তুমি এই নির্দ্দয়তায় আপনার প্রতিও নিষ্ঠুর হইতেছ। পিতা কহিয়াছেন অদ্য রজনীতে আমায় পূর্ব্ববৎ অনাস্থা করিলে তোমার প্রাণ নাশ করিবেন, আর আমার অনুরোধ মানিবেন না, তাঁহার বড়ই অপমান হইয়াছে।"

যুবার বদন পাংশুবর্ণ হইল। যে প্রণয়িনী-অনুরোধে এমন সুখ, ঐশ্বর্য্য,

প্রণয়ে পদাঘাত করিতেছেন, তাহাকে না দেখিয়া যে মর্ত্ত লীলা সম্বরণ করিবেন এ চিন্তা ধারণ করিতে অক্ষম। কোন্ কৌশলে পলায়ন করিতে পারেন ভাবিতে লাগিলেন। পরে সুন্দরীর হস্তদ্বয় নিজ হস্তদ্বয়ে ধরিয়া অনুনয় পূর্ব্বক বলিলেন "প্রেমময়ী! দাসের প্রতি যদি এত কৃপা, আর কয়েক ঘণ্টা ক্ষমা কর আমি মনের উদ্বেগ ফিরাই। এই অল্প বয়সে জীবন দিতে আমার ইচ্ছা হয় না।" সুন্দরী বুঝিলেন এই বারে সুফল হইয়াছে, অতএব স্নেহ বচনে বলিলেন "প্রিয়তম! আমার জীবন-দানে যদি তোমার হৃদয় স্রোত প্রত্যাবৃত্ত কি পরিবর্ত্তিত হইত, অকাতরে করিতাম। যদি আমি আত্মহত্যা করি নিশ্চয় তোমার মরণ; আর যদি কয়েক দিন তুমি এইরূপ অবহেলা কর নিশ্চয় আমার মরণ। এজন্য উভয় শঙ্কটে পড়িয়া তোমায় অনুরোধ করিতেছি ইচ্ছা হউক বা না হউক, আমাকে গ্রহণ কর। ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে এবং যদি আমি রমণী হই, আর তুমি পুরুষ হও, আমার মঙ্গল আমি করিয়া লইব।"

রজনীতে দম্পতি পুনর্ব্বার সেই কথোপকথনে পড়িলেন; কামিনী স্বামীর অঙ্কপার্শ্বে আসিয়া বাম হস্তে তাঁহার সম্মুখ চুল গুলি বিন্যস্ত করিতে করিতে কহিলেন, "প্রিয়তম! কি স্থির করিলে? মনের বেগ কি বাগ মানিয়াছে?" প্রিয়তম শঙ্কটে পড়িলেন; তাঁহার তাবৎ কৌশল ও উত্তর ফুরাইয়াছে। একটী মাত্র কৌশল বাকি আছে, তাহাই সমস্ত দিন ঠিক করে রেখেছেন নিষ্কৃতির শেষ উপায়। যুবা কহিলেন, "প্রিয়ে! ভাবিয়া দেখিলাম যে তোমার ন্যায় প্রেমিকা পবিত্যাগে আমার কোন লাভই নাই। তোমার প্রতি যে আমার মন যায় না তাহা নহে; আমিওত রক্তমাংসময় নর বটি। আমার দেশস্থ প্রণয়িনীর অনুরোধ যে এত দুর্দ্দান্ত হইতেছে তাহাও সব ঠিক নহে। অযাচিত প্রেম বলিয়া অনাস্থা করিতেছি, তাহাও নহে; আর আমি যত আপত্তি করিয়াছি সকল ঠিক নহে। অনেক আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, আমার মস্তিষ্কের কিছু গোলোযোগ হইয়াছে। মন ও শরীর এমত জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে যে রমণী-রমণেচ্ছা দূরে যাক, আহারেচ্ছা, জীবনেচ্ছাও নাই। ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের কখন অভ্যাস নাই—একটী গৃহে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকি। আর তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত অবিচ্ছেদে এই গৃহে আছি। অনাবৃত আকাশ দর্শন, স্বাধীন বায়ুস্পর্শ ও অনাবদ্ধ ভূমি পরিচারণে বিমুখ হইয়াই বুঝি এমন দশা হইয়াছে। কতবার ইচ্ছা হয় তোমার তোষণ করি, কিন্তু শরীর ও মন বয় না। তাই বলি এক বার আমাকে মুক্তি দাও, আমি কারাগারলব্ধ জড়-বুদ্ধি মোচন করি; এবং তাহা হইতে নিশ্চয়ই তোমার সেবায় অনুরাগী হইব।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে যুবা রমণীর গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতেছিলেন; অবস্থা ও ভাবে রমণীর বিশ্বাস হইল ঐ কথা প্রকৃত প্রস্তাবিত। অতএব তিনি সদয় হইয়া কহিলেন "স্বামিন্! আমাদেব বিবাহের নিয়ম ৭ দিন ৭ রাত্রি একত্র বাস; যদি তাহাই তোমার বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে আমি নিয়ম ভঙ্গ করিতে সম্মত আছি। কল্য প্রাতে তুমি যথা ইচ্ছা ভ্রমণ ক'র, কিন্তু আহারকাল মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে; আমি পুরবাসিদিগকে তোমার কথা বুঝাইয়া দিব, কেহ তোমায় নিবারণ করিতে পারিবে না। আর তোমার যাহাকে সঙ্গে লইতে হয় লইয়া যাইবে।"

যুবা হৃষ্ট হইয়া কহিলেন "এই কথাতেই আমার যেন স্ফূর্ত্তি হইতেছে, নিশ্চয়ই আমার বিকারের ঔষধ স্বাধীনতা। তবে লোক সঙ্গে শুনে, আবার কএদী কএদী বোধ হইতেছে, কি যেন কষ্ট হইতেছে।" রমণী অমনি প্রশস্ত হৃদয়ে কহিলেন, "প্রিয়তম! যথা ইচ্ছা একাকী যাও,—বিশ্বাস-ঘাতক হইয়া পলাইয়া যাইও না। আর এরূপ বলেও প্রণয় হয় না; আমি জানি তোমাকে ধরে রেখে আমার কিছুই লাভ নাই। যদি প্রণয় জন্মে, পলাইতে পারিবে না; নচেৎ পলাইবে জানি। আর যদি আমার প্রণয় সত্য হয়, গভীর হয়,—পৃথিবীর যেখানে থাক আমি সন্ধান করিয়া লইব, নিশ্চয় জানিও।" যুবা মুখস্থভাবে বলিলেন "আমি একটু বেড়াইব মাত্র, পলাইবার কথা বলিতেছি না।"

পর দিবস প্রত্যূষে যুবা বহির্গত হইলেন, পৌর জন কেহ নিষেধ করিল না। যুবা সমুদ্র-তটাভিমুখে গেলেন; এবং দূর হইতে এক জাহাজ দেখিয়া উল্লসিত হইলেন—কোন মতে পলায়ন দ্বারা বিপদোত্তীর্ণ হইবেন। কিয়ৎদূর তট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন এক নৌকা লোক তীরস্থ পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া জাহাজে উঠিল। আর এক খানি নৌকা কিনারায় সংলগ্ন আছে; তাহাতে আশান্বিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। পথে দেখিলেন এক জন মগ এক ছুরিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক পুষ্করিণী-জলে অবগাহনকারী এক জনকে উদ্দেশ করিয়া গালি দিতেছে ও হত্যা করিবে বলিয়া শাসাইতেছে। মগেরা যে হত্যা-কাণ্ডে বড় পটু যুবা তাহা জানেন। আস্তে আস্তে পশ্চাৎভাগ হইতে মগের ছুরিকা লইয়া জলে নিঃক্ষেপ করিলেন। মগ বিরক্ত হইয়া যুবার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুবার শরীরে অল্প বল ছিল না: মগ পরাস্ত হইয়া গ্রামে লোক ডাকিতে গেল। তখন যুবা অবগাহনকারী এক ভদ্রাকার প্রাচীন মুসলমানকে গাত্রোত্থান করিতে সঙ্কেত করিয়া তীরাভিমুখে গেলেন। যুবারও মগী বেশ কিন্তু তাঁহার কথায় বৃদ্ধ জানিলেন তিনি হিন্দুস্থানবাসী মুসলমান। যুবা ও বৃদ্ধ নৌকায় উঠিলেন; মগের দলও তখন

তীরে আসিল এবং নৌকা-বাহিয়া জাহাজে উঠিল। মগেরা এদিক ওদিক দৌড়িল এবং আপন ভাষায় নৌকা আনিতে কহিল, যুবা তাহা জানিয়া শীঘ্র জাহাজ ছাড়িতে কহিল এবং নঙ্গর তোলা হইতে না হইতে প্রায় বিংশতি খানি নৌকা জাহাজাভিমুখে দৌড়িল। সুবাতাস পাইয়া পালভরে জাহাজ সমুদ্রে চলিয়া গেল।

একটু দূরে গিয়া যুবা জানিলেন এই জাহাজ চট্টগ্রামীয়। সওদাগর একজন শ্রীহট্টবাসী ভদ্র মুসলমান। রোসাঙ্গে বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিলেন, পথে জলাহরণ জন্য ঐ খানে তাঁহার জাহাজ দাঁড়াইয়াছিল এবং তিনিই পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিলেন। ঐ মগ ছুরী লইয়া তাড়া করিলে—তাঁহার দুই রক্ষক খালাসী নৌকায় পলাইয়া আইসে। এক্ষণে যুবা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সওদাগর যুবার বড়ই সমাদর ও স্নেহ করিলেন। সওদাগর ভয়ে আর রোসাঙ্গে না গিয়া গালিবন্দরাভিমুখে চলিলেন।

যুবাকে আপন কক্ষে লইয়া বৃদ্ধ তদ্বিবরণ এবং সহসা মগী দেশ পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবা কহিলেন—"মহাশয়! আমার কাহিনী অতি বিস্তীর্ণ এবং শোকোদ্দীপক, ক্ষমা করুন।" বৃদ্ধ ছাড়িলেন না এবং যুবা বৃদ্ধকর্ত্তৃক বিপদোত্তীর্ণ জানিয়া আপনাকে বাধ্য বোধ করিলেন ও কহিলেন।—

"মহাশয়! আমার বাস চট্টগ্রাম, আমার পিতা অতি সম্ভ্রান্ত জমীদার ছিলেন। তিনি একদা পথ হইতে একটী রাখাল বালককে আনিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষা দিলেন। কার্য্যক্ষম হইলে সেই ব্যক্তির উপর আপন মোকদ্দমার ভার দিয়া রাখিলেন। পরে সেই ব্যক্তি স্বাক্ষীগণের প্রতি অত্যাচার করায় আমার পিতা তাহাকে তিরস্কার করেন। সেই তিরস্কারে বিরক্ত হইয়া পাষণ্ড পিতার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইল এবং জানিতে পারিয়া পিতা তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। তখন সে মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া পিতার যথা সর্ব্বস্ব লইল এবং বাসভবনে দীর্ঘিকা খনন করিয়া পিতার কীর্ত্তি লোপ করিল। আমি সেই হতভাগ্য পিতার একমাত্র হতভাগ্য সন্তান। আমি তখন পঞ্চদশ-বর্ষ-বয়স্ক। পিতা মাতা ও আমি মসজিদে থাকিতাম। একদা মাতুলের উৎকট পীড়া হইয়াছে শুনিয়া মাতা পিত্রালয়ে গেলেন। তাঁহাকে তথায় আবদ্ধ করিয়া সেই দুষ্ট শত্রু আদালতে অভিযোগ করিল যে আমার মাতাকে পিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। মাতা সেই দুষ্টকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন। আদালতে তাহাই সাব্যস্ত হইল এবং পিতা রোগগ্রস্ত হইলেন। মাতাও ডিক্রীজারি ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন, ও তৎসংবাদ শ্রবণে পিতা পরলোক গমন করিলেন।" যুবার চক্ষে জল আসিল এবং বৃদ্ধ তৎসঙ্গে কাঁদিলেন।

পরে পুনঃআগ্রহে যুবা বলিতে লাগিলেন। "মহাশয়! আমিও আত্মহত্যা করিতাম, কিন্তু পিতা আজ্ঞা দ্বারা তাহা নিষেধ করিয়াছিলেন। সংসারে বিরক্ত হইয়া বনে বাস করিলাম। একদা একটী কাঠুরিয়া রমণী পথভ্রমে আমার আশ্রমে আসিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম সেই রমণীকে পিতা আমার পত্নী করিবার জন্য স্থির করে রেখেছিলেন। তাহাকে দেখে প্রণয় জন্মিল, সংসারে আস্থা হইল এবং পরে তাহার সহিত প্রণয় করিলাম। রমণী কহিল রাজ-রাজেশ্বরী হই ত তোমায় বিবাহ করিব। তথাস্তু বলিয়া অর্জ্জনার্থ বিদেশে আসিলাম। আক্যাবে এক ব্যক্তির সহবাসে কিছু দিন থাকিয়া দেখিলাম তাহার চরিত্র মন্দ ও তথাকার অর্জ্জনও অল্প। জন কএক বোসাঙ্গ যাইতেছিল তৎসঙ্গ লইয়া বোসাঙ্গ গেলাম। আমরা চাকরি পাইলাম। ইদ্‌পর্ব্বে সঙ্গীরা সকলে বাসায় আমোদার্থ রহিল, আমি নূতন মনিবের নিকট হইতে ছুটী পাইলাম না। আমার প্রভু রেয়ানজা মগ অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সন্ধ্যার পর বাসায় আসিয়া দেখিলাম সঙ্গীরা মগী বাই লইয়া নৃত্য গীতে ব্যস্ত। আমি বিরক্ত হইয়া প্রভুর বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম ও তথায় রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন শুনিলাম সঙ্গীরা মগী বাইদের আপন ইচ্ছামত না পাইয়া প্রতিবাসী এক দরিদ্র মগিনীর প্রতি অত্যাচার করে, তাহাতে সমগ্র মগপল্লী উত্ত্যক্ত হইয়া সকলকে বিনাশ করিয়াছে। পরমেশ্বরের কৃপায় রক্ষা পাইলাম; কিন্তু সঙ্গী-বিহীন হইলাম।"

বৃদ্ধ অতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত অনুরোধ করাতে যুবা তাবৎ কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন। "কহিলেন তাহার পর আমার প্রভুর বাটীতেই আমি বাস করিলাম। প্রভুর হিন্দুস্থানে বাণিজ্যার্থ জাহাজ ছিল, পারস্য লেখা পড়া আমা দ্বারা হইত। প্রভু আমাকে বড় স্নেহ করিতেন এবং ক্রমে আমাকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী করলেন ও তাবৎ ভারই আমাকে দিলেন। আমি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহও করিলাম। একদা গালিবন্দরে আমি প্রভুর জাহাজ লইয়া গেলাম। তথায় দেশীয় লোক দেখিয়া বাটী গমন জন্য অত্যন্ত অভিলাষ হইল। নিজার্জ্জিত পঞ্চ সহস্র মুদ্রা লইয়া দেশ গমনার্থ জলফিকর খাঁ নামক এক ব্যক্তির জাহাজে যাইবার স্থির করিলাম। প্রভুকে পত্র লিখিলাম—কিন্তু সে পত্র পাইবা মাত্র প্রভু জাহাজ লইয়া অবিলম্বে তাঁহার কাছে যাইতে আদেশ করিলেন, তাঁহার এক মাত্র কন্যা লংথংজার বিবাহ উপস্থিত। আমি প্রভু ও প্রভু-কন্যাকে ভাল বাসিতাম। তাহার বিবাহ দেখিয়া অনুমতি লইয়া দেশে যাইব সংকল্প করিলাম। নিশ্চয় বাটী যাইব মনে হইল এবং প্রভুর জাহাজ লইয়া গেলে আরও কিছু অর্থ পাইব জানিলাম। বিশেষতঃ প্রভু-কন্যার বিবাহে আমি উত্তম পারিতোষিক পাইব আশা ছিল।"

"মহাশয়! ঘটনার ভবিতব্যতা অনমুমেয়। আমি রোসাঙ্গ গিয়া দেখিলাম—গৃহ আদি সংস্কৃত ও সুশোভিত হইয়াছে,—মহাসমারোহের আয়োজন হইতেছে এবং দুই তিন দিবসের মধ্যে কুমারী লংথংজার বিবাহ হইবে। লংথংজা অতি চপলা,—দুই বৎসর কাল তাঁহার কাহাকেও অভিরুচি হয় নাই যে বরণ করেন। এখন কাহার ঐ সৌভাগ্য হইল—জিজ্ঞাসা করায় বাটীর লোক সকলে বলিল জানি না। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, লংথংজাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া কহিলেন বিবাহ দিনে দেখিবে। পরে বিবাহ দিনে কএকজন দাস দাসী আমার শয়নকক্ষে অতি প্রত্যূষে আসিল। তাহারা আমাকে জাগ্রত করিয়া বলপূর্ব্বক স্নান করাইয়া সুগন্ধ ও অঙ্গরাগে বিভূষিত মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইল, আমি জিজ্ঞাসা করায় সকলে পরিহাস করিয়া কহিল—আমাদের রীতি, দাওয়ানকে এই দিনে সাজান। পরে রোয়ানজা স্বয়ং আসিলেন,—তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! অধীনের প্রতি এ কি ব্যবহার?" প্রভু হাসিয়া কহিলেন "তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমি আপন কন্যা ও যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি,—সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যক নাই।" শুনিয়া আমার মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল। যে প্রণয়িনীর প্রতিবিম্ব হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত আছে,—জীবন থাকিতে অন্য কাহাকেও তথায় কিরূপে স্থান দেই! আর কি করেই বা তাহা বলি। কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে থাকিয়া কহিলাম, "মহাশয়! বলিতে সাহস হয় না,—কিন্তু আমি ভিন্ন জাতি,—এ বিবাহ কি সংলগ্ন?" প্রভু কহিলেন—"আমাদের শাস্ত্রে প্রণয় হইলেই বিবাহ হইতে পারে, জাতিভেদে দোষ নাই।" আমি আস্তে আস্তে কহিলাম "প্রণয় হইয়াছে কিরূপে জানিলেন?" প্রভু কহিলেন, "লংথংজার অভিপ্রায় না জেনে কি বিবাহ দিতেছি, আর এমন সুন্দরী কন্যা ও ঐশ্বর্য্যে কি তোমার অপ্রণয় হইতে পারে? আমি উত্তর দিতে অক্ষম হইলাম।"

কিঞ্চিৎ পরে কহিলাম "মহাশয়! আপনাদের শাস্ত্রে না হউক আমাদের শাস্ত্রে এরূপ ভিন্নজাতি-বিবাহ নিষিদ্ধ।' প্রভু কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া কহিলেন 'তোমার শাস্ত্র মানে কে? তোমার এদেশে কে আছে? বিবাহ কর, যখন দেশে যাইবে প্রায়শ্চিত্ত করিও, যত টাকা লাগে দিব।' আমি কহিলাম 'মহাশয়! আমার বিবাহ হইয়াছে, স্ত্রী বর্ত্তমান' তাহাতে প্রভু বিরক্ত হইয়া কহিলেন 'ক্ষতি কি? বৃথা আপত্তিতে সময় হরণ অনাবশ্যক। শাস্ত্র হউক বা না হউক, ইচ্ছা হউক বা না হউক, লংথংজার ইচ্ছা নিবারণ করে কাহার সাধ্য?' বলিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে লংথংজার গৃহদ্বারে লইয়া গেলেন। লংথংজা

আমার হস্ত ধরিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই যে দ্বার বদ্ধ হইল আর উদ্ঘাটিত হইল না—এই পলায়ন পর্য্যন্ত তথায় আবদ্ধ ছিলাম।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "যুবা! তোমারত ভাল হইয়াছিল, পলাইলে কেন?" যুবা কহিলেন "মহাশয়! লংথংজা হয়ত আমার প্রণয়িনী অপেক্ষা অনেকের লোভনীয়া; কিন্তু আমার হৃদয় আর কাহাকেও চায়না। তাহার সহিত দুই রাত্রি আলাপ না করাতে সে আপন পিতাকে জানাইল ও এক রাত্রির মধ্যে মিলন না হইলে আমার দেহ ও জীবন মিলিত থাকিবেক না শুনিলাম। রমণীকে আমার প্রণয়িনীর কথা বলিলাম, তাহাতে সে বিরক্ত না হইয়া বরং আমার প্রণয়িনীকে প্রভূত অর্থ পাঠাইয়াছিল এবং কহিল সর্ব্বদাই আমি দেশে যাইতে পাইব। শেষে নিরুপায় হয়ে আমি স্বাধীনতা চাহিলাম যে আমোদ জন্য প্রস্তুত হইব। সরলা আমাকে বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিল এবং আমি আপনার সমভিব্যাহারে জাহাজে উঠিলাম।"

বৃদ্ধ এই শেষ বিবরণ শুনিয়া কহিলেন, "বাবা! তোমার এই বিশ্বাস-ঘাতকতা কার্য্য ভাল হয় নাই। এতদূর করা আবশ্যক ছিলনা। এক হৃদয়ে কি দুইজন অবলা থাকে না—? বিশেষ পুরুষ-হৃদয়ে! না হইলেও শারীর বিবাহে দোষ কি? আমাদের শাস্ত্রে ৪ বিবাহ সিদ্ধ।" যুবা কহিল "মহাশয়! সেকি বলেন—হৃদয়ে একজনের অধিক স্থান পায় না এবং যদি হৃদয়ে না রহিল তবে বিবাহে সুখ কি?"

বৃদ্ধ। বালক! এখনও সংসারের পরিচয় পাও নাই, কত লোককে স্থান দিতে হইবে, আবার হৃদয় হইতে তাড়িত করিতে হইবে! বাবা, তুমি যাহার জন্য ভাব সে হয়ত এত দিনে কত হৃদয় পরিবর্ত্তন করেছে!

যুবা। মহাশয়! তাহা হইলে আর সংসারে, জীবনে কাজ কি?

যুবা বিরক্ত হইয়া বলিলেন। বৃদ্ধ মিষ্ট করিয়া বলিল, "বাবা, রক্ত গরম তাই বলিতেছ, কাজ থাক আর না থাক সংসারে থাকিতেই হইবে ও থাকিলে অমন কল্পনা-রাজ্যে বাস অসম্ভব।" এই কথার পর কথোপকথন স্থগিত হইল। যুবা যে মেহের আলি তাহার পরিচয় অনাবশ্যক। বৃদ্ধের নাম সেখ মোবারক।

যে সময় গালি বন্দরে পৌঁছিবার কথা, গালি পাওয়া গেলনা। তৎকালে এক প্রবল বাতাস আসিয়া জাহাজকে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া গেল। নাবিকগণ পথ ভুলিয়া বিপথে চলিল। ৩ ঘণ্টার পথে ৩ দিন গেল, বন্দর দৃষ্ট হইলনা। চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ উঠিল—আর কয়েকদিন গেলে অনাহারে সকলে মরিবে। মেহের আলি গালিবন্দরে-রোয়ান্জার জাহাজ আনিবার সময় দিগ্-দর্শন যন্ত্র বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়াছিলেন। তিনি নাবিকদের সর্ব্বদাই বলিতেছিলেন, একটু বায়ুকোণ হইয়া

চল, এপথে মহা সমুদ্র পাইবে। তাঁহাকে অপটু জানিয়া সকলে তাঁহার কথা উপেক্ষা করে; পরে বৃদ্ধের অনুরোধে মেহেরের কথানুযায়ী বায়ু কোণে যাওয়া হইল। এক দিনে তীর দৃষ্ট হইল। মেহের আলির প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট হইল। তীরে আসিয়া জানিল তাহারা গালির দক্ষিণ ১ দিনের পথে আসিয়াছে। তথা হইতে গালিতে উপনীত হইল।

বৃদ্ধ পূর্ব্ব হইতে যুবাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেছিলেন, যুবার বিদ্যাবুদ্ধি দৃষ্টে আরও সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "মেহের, তোমার মা বাপ নাই আমারও পুত্র নাই। আমার প্রভূত সম্পত্তি কে ভোগ করিবে? আমি স্থির করিয়াছি তুমি আমার পুত্রের ন্যায় থাক এবং আমি তোমাকে বিষয়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হই।" মেহের অসম্মত নহেন তবে জন্মভূমি ত্যাগে সম্মত নহেন। বৃদ্ধ কহিলেন মন্মরণে মেহের বিষয়াদি লইয়া চট্টগ্রামে বাস করিতে পারেন। তদবধি তাবৎ বিষয়াদি মেহের আলির নামে চলিল। জাহাজ বাণিজ্যার্থ সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি নানা স্থানে লইয়া জাওয়ায় প্রভূত অর্থ লাভ হইল। বৃদ্ধ তখন মেহেরকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে আসিলেন। এবার শ্রীহট্টে নিজ ভবনে মেহেরকে লইয়া যাইবেন পরে চট্টগ্রামে আসিবেন স্থির হইল। তদনুসারে মেহের বৃদ্ধের সঙ্গে শ্রীহট্টে গেলেন।

বৃদ্ধ ভয়ে বলেন নাই তাঁহার এক কন্যা আছে, তাহারই সহিত মেহেরের বিবাহ দিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন। মেহের তাঁহার সঙ্কল্প বুঝিয়া আপনাকে ক্লীব বলিয়া পরিচয় দিলেন। সুতরাং বিবাহ ভঙ্গ হইল। তত্রাপি বৃদ্ধ স্নেহ বশতঃ মেহেরকে অর্দ্ধাংশ-ভাগী করিয়া স্বীয় পুত্রের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে রাখিলেন।

মেহের আলি চট্টগ্রাম যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। সেখ মোবারক অনেক বাধা দিয়া অবশেষে মাস কএকের জন্য অনুমতি দিলেন। অর্ণবপোত লক্ষমুদ্রার দ্রব্যাদি দ্বারা সাজাইয়া মেহেরকে পাঠাইলেন ও বলিলেন ঐ অর্থ সমুদায় তাঁহার হইল, তিনি ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন। অথবা বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করিতে পারেন। মেহেরআলি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিলেন। মনে মনে যুবার কতই উল্লাস। কতই আনন্দ! মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, লক্ষপতি হইয়া সাধের মেহেরজানকে বিবাহ করিতে চলিলেন। কল্পনার পথিক যুবা, ভাবিতে লাগিলেন জাহাজ বন্দরে রাখিয়া চট্টগ্রাম সহরে নামিবেন, অত্যুত্তম কএক অশ্ব লইয়া ও সুবেশী দাস দাসী লইয়া ঐ নগরে একটী সুরম্য বাস ভবন করিবেন। পরে ছদ্মবেশে একেবারে মেহেরজানের কুটীরে প্রবেশ করিবেন। তিনি যে ধনী হইয়াছেন বলিবেন না, দেখিবেন মেহের জান দরিদ্র প্রত্যাবৃত্ত দেখে অনাস্থা করেন কি না। পরে

এক দিন সহসা ভদ্রবেশে যাইয়া পড়িবেন, মেহেরজানকে আশ্চর্য্য ও আহ্লাদিত করিবেন এবং মহাসমারোহে বিবাহ করিয়া চট্টগ্রামে আনিবেন। অর্থ ও লোক বলে নিজ বিষয়াদি মোক্তার হইতে কাড়িয়া লইবেন, বাধা হইলে তাহাকে গোপনে প্রাণনাশ আশঙ্কা দিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিবেন। মোক্তার হীনবল ও শাসিত হইলে তাহাকে কৃপা পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন এবং যৎকিঞ্চিৎ বিষয় দান করিয়া সাধুতা প্রদর্শন করিবেন। মেহেরন্নিসাকে চট্টগ্রামে সংস্থাপিত করিয়া একবার বাণিজ্যার্থ যাইবেন। যে অর্থ নিজার্থে ব্যয় করিবেন তাহা পূরণ হইলেই জাহাজ সহ সমগ্র অর্থ সেথ মোবারককে পুনঃ প্রেরণ করিবেন। ইত্যাদি কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। কখনও বা মনে মনে বিদেশ-সংগৃহীত অলঙ্কারের পরিচয় দিতেছেন—কখনও বা মহামূল্য পরিচ্ছদ স্বহস্তে মেহেরকে পরাইতেছেন—কখনও বা জঙ্গলের পুরাতন গল্প করিতেছেন। আহা! নবীনবয়স্কদিগের সুকোমল মনে, সরল হৃদয়ে কত আশা! কত আনন্দ! নিষ্ঠুর সংসার কিন্তু সকল সময়ে তাহার পোষণ করা দূরে থাকুক প্রায় বাধাই দেয়।

নোয়াখালি আসিয়া যুবা পুনঃ সমুদ্র দর্শনে উৎসুক হইলেন। অর্ণবপোতে আরোহী হইয়া ক্রমে সীতাকুণ্ড পাহাড় দেখিলেন। স্বদেশের চূড়া দেখে কত যে আনন্দ-হিল্লোল মেহেরের মনে উঠিল বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ভাবিতেছেন, মেহেরজানকে লয়ে একবার ঐ পাহাড়ে আসিবেন? একবার রমণীয় ঢালা পথে উভয়ে পদ চারণ করিবেন এবং নিভৃত বৃক্ষমূলে বসে বনবাসের কথা কহিবেন। স্বর্গীয় অপ্সরীর নৃত্যের ন্যায় শব্দকারী পাহাড়ে কীট তাঁহাদের কর্ণ রঞ্জন করিবে, হরিৎবর্ণ ঘন নিবিড় কানন তাঁহাদের চক্ষু রঞ্জন করিবে, বন-পুষ্পের সৌরভ নাসিকা রঞ্জন করিবে, এবং উভয়ে পার্শ্বাপার্শ্বি বসে দেহরঞ্জন এবং প্রণয় কথা কহে মনোরঞ্জন করিবেন। মেহেরের দেহ লোমাঞ্চিত, মন উল্লাসিত, হৃদয় আনন্দ-পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। কএক ঘটিকা পরেই স্বদেশে,—সেই হৃদয়-চন্দ্র যে দেশে আছে—পদার্পণ করিবেন। সহসা বায়ু হ্রাস হইল—জাহাজে পাল খাটে না, গতি অতি মন্দ হইল। মেহেরের মনে হইতেছে ফুৎকার দিয়া পাল চালান, অথবা নৌকা ধরিয়া অগ্রসর হয়েন।

এমত সময় তীরাভিমুখে দেখিলেন একটী ক্ষুদ্র তরি প্রাণপণ চেষ্টায় জাহাজাভিমুখে আসিতেছে। তাহাতে এক ভদ্র আরোহী দাঁড়াইয়া আছে। মেহের জাহাজ-গতি রোধের আদেশ দিলেন, ইচ্ছা, আগন্তুক ব্যক্তির অভিপ্রায় জানেন এবং সুবিধা হইলে ঐ নৌকায় চট্টগ্রাম যাত্রা করেন। নাবিকেরা নৌকা আসিলেই তাহার আরোহী-দিগকে জাহাজে লইল। প্রধান ব্যক্তি জাহা-

অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া, মেহের আলির চরণে কাঁদিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দনের পর অলস ভাবে বসিয়া বলিল "মহাশয়! দেখিতেছি আপনি অতি সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রলোক মুসলমান, কিন্তু আপনাব বদনে দয়ার চিহ্ন প্রভৃত আছে। এ অধীন যে বিপদে পড়িয়াছে কাহারও ঘটে না। পরমেশ্বর আপনাকে আমারই সাহায্যার্থে নিশ্চয় পাঠাইয়াছেন।"

মেহের অনেক সান্ত্বনা করিয়া বুঝাইলে ও আশ্বাস প্রদান করিলে আগন্তুক কহিল "মহাশয়! আমি ব্যবসায়ী ভদ্রলোক। ঢাকা হইতে চট্টগ্রামে পরিবার লইয়া যাইতেছিলাম। সহসা একটী ক্ষুদ্র তরী আমাদের নৌকার কাছে এল, কএক মুসলমান খালাসী চড়াও হইয়া আমার দ্রব্যাদি ও—" আগন্তুক কাঁদিতে লাগিল। "কি হইয়াছে বল বল, ভয় নাই" আশ্বাস পাইয়া কহিল "আমার পরম সুন্দরী নবযৌবনা প্রণয়িনী পত্নীকে পাষণ্ডেরা লইয়া এক জাহাজে উঠিল।"

মেহের। জাহাজ কোন্ দিকে গেল—কোথায় যাইবে জান?

আগন্তুক অশ্রু মুছিতে মুছিতে কহিল "জাহাজ দক্ষিণাভিমুখে চলিল। যখন বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়ে আমি জানিয়াছিলাম উহা মান্দ্রাজে কি তৎপ্রদেশে যাইবে।"

মেহের। কবে ঘটনা হইয়াছে ও জাহাজ কতদূর গিয়াছে?

আগন্তুক। এই ঘণ্টাত্রয় মাত্র—একটু অনুগমন করিলে জাহাজ ধরা যাইবে।

মেহের। জাহাজ কোন্ জাতির ও লোকবল কত?

আগন্তুক। চট্টগ্রামীয়; ১০ জন মাত্র লোক তাহাতে আছে—এ জাহাজের লোক অনায়াসে তাহাদের আয়ত্ত করিতে পারিবে। সে জাহাজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; কিন্তু দ্রুতগামী।

মেহের ভাবিতে লাগিলেন—এমন সুখের সময় কি বিপদ। তাঁহার হৃদয়ে সুকুমার ভাব সকলি প্রবল। যেমন প্রেমে উল্লসিত ছিলেন, তেমনি দয়ায় আর্দ্র হইলেন। প্রিয় মেহেরজানকে যদি কেহ কাড়িয়া লয়—মেহের ভাবিলেন। এইরূপ কল্পনাই সহানুভূতির মূল। মেহের আত্মবিপদবৎ—আগন্তুকের ঘটনা গ্রহণ করিলেন। যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে ভাবিলেন। অতএব বলিলেন "মহাশয়! চিন্তিত হইবেন না. আমি এক দিন মাত্র চট্টগ্রামে অবতরণ করিয়া পরে দস্যু অনুসরণে যাইব। যথায় যাউক আমা হইতে তাহার নিস্তার নাই।"

আগন্তুক। মহোদয়! এ প্রস্তাব কিরূপ হইল? এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে দস্যুরা অদৃশ্য হইবে। আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি হিন্দু, আমার স্ত্রীকে যদি তাহারা আহার করাইয়া কি সম্ভোগ করে, আর আমি তাহাকে

লইতে পারিব না—তাহার জাতি নাশ হইবে। মহাশয়! আপনার এ প্রস্তাব অপেক্ষা এক সহজ উপায় বলি, আমাকে এই জলে নিঃক্ষেপ করুন; তাহা হইলেই আপদ যায়।”

মেহের অপ্রস্তুত হইলেন, আত্ম-সুখ জন্য নির্দ্দয় হইতেছেন বুঝিলেন এবং লজ্জিত হইলেন। চট্টগ্রামের আশা ছাড়িয়া দস্যু-অনুগমনের আদেশ দিলেন। বায়ু অনুকূল হইল এবং সপ্তাহের মধ্যে শ্রীরঙ্গপট্টন বন্দরে উপনীত হইলেন। আগন্তুক এক দিবস অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া বলিল, দস্যু-জাহাজ এখান হইতে গত কল্য প্রস্থান করিয়াছে। তাহারা কয়েকটী হিন্দু রমণীকে এখান হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণের সমুদ্রকূল-নিবাসী চারিলু-পরিবারকে বিক্রয় করিয়াছে এবং সেইটাই তাহার স্ত্রী। মেহের তৎপরামর্শে জাহাজ লইয়া কূলে কূলে দক্ষিণাভিমুখে গেলেন। সমুদ্রতট-সন্নিকটে একটী সুরম্য হর্ম্ম্য দেবালয়—তাহার চতুর্দ্দিকে মনোহর উদ্যান। আগন্তুক তাঁহার নাম শঙ্কর সিং বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। শঙ্কর সিং কূলে নামিয়া বাগানের ভিতর গিয়া সমস্ত দিন পরে সংবাদ দিল, তাহার স্ত্রী ঐখানে আছে। তাহার সহিত দেখা হইয়াছে ও রজনীতে বলপূর্ব্বক, মোচন করিতে পরামর্শ দিয়াছে। এখনও তাহার সতীত্ব নষ্ট হয় নাই।

মেহের এরূপ গোপনীয় কার্য্যে সম্মত ছিলেন না—তাঁহার ইচ্ছা যে প্রকাশ্যে ঐ কামিনীকে প্রার্থনা করেন—নচেৎ রাজস্থানে অভিযোগ করেন। কিন্তু উহাতে তাহার স্ত্রীকে সরাইবে আর পাওয়া যাইবে না বলে শঙ্কর সিং অনেক অনুরোধে মেহেরকে সম্মত করিল যে, সে রাত্রী পর্য্যন্ত জাহাজ এখানে থাকে এবং জন কয়েক মাল্লার সাহায্যে শঙ্কর সিং স্বীয় সহধর্ম্মিণীর উদ্ধার করে। পরোপকারার্থ মেহের আলি অগত্যা সম্মত হইল। রজনীতে সহসা দস্যুর ন্যায় শঙ্কর সিং ও কএক নাবিক চারিলু-ভবনে প্রবেশ করিল। পুরুষগণকে বন্ধন করিয়া অন্তঃপুরে রমণীগণকে ধরিল। সর্ব্বাপেক্ষা যৌবন-সম্পন্না ও সুন্দরী এক রমণীর মুখ দৃষ্টে শঙ্কর কহিল “এই এই, শীঘ্র লও।” সেই রমণীকে লইয়া নাবিকেরা জাহাজে উঠিল এবং গ্রামের গোলযোগ শুনিয়া উৎপাত আশঙ্কায় অমনি জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

পরদিন প্রাতে জাহাজ কৃষ্ণ জলে পড়িয়াছে, তীর হইতে বহুদূরে আসিয়াছে। অনুসন্ধানে শঙ্কর সিংহকে পাওয়া গেল না। কোথায় কেহ সন্ধান জানে না। নাবিকেরা ব্যস্ত হইয়া রমণী লইয়া জাহাজে আসিয়াছে, শঙ্কর কোথায় গেল কি সঙ্গে এল ঠাওর নাই। রমণী ডেকে এক স্থানে পড়িয়া সমস্ত রজনী কাঁদিয়াছে, ভয়ে কি অন্য কারণে কেহ জানে

না। মেহের ভাবিলেন হয়ত শঙ্কর তাড়াতাড়ি জলমগ্ন হইয়াছে এবং তাহাকে না দেখিয়া রমণী ক্রন্দন করিতেছে। নাবিকের মধ্যে বিচক্ষণ এক ব্যক্তি কহিল "মহাশয়! আমার সন্দেহ হইতেছে শঙ্কর সিং প্রবঞ্চক, এ তাহার স্ত্রী নহে এবং সে তজ্জন্য পলাইয়াছে।"

মেহের কহিল "কি জন্য এরূপ ভাবিতেছ?"

১ম নাবিক। মহাশয়! গত রজনীতে নাবিকেরা তাহার কাছে পুরস্কার চাহে। সে বলে "আমার কাছে কিছু নাই—যে যে স্ত্রীকে উদ্ধার করিবে আমি এক একবার তাহাদিগকে স্ত্রী ভোগ করিতে দিতে পারি, তোমাদের কৃপায় আমি পাইব, নয় একটু ভাগ দিব।" মহাশয়! আপন সহধর্ম্মিণী হইলে কদাপি এ কথা বলিতে পারিত না।

২য় নাবিক কহিল "মহাশয়! এই ঠিক, শঙ্কর সিং হিন্দুস্থানী, রমণী মাদ্রাজী কথা কহিতেছে, উহার স্ত্রী সে নহে।" মেহের অবাক হইয়া কহিলেন "রমণীকে এখানে আন।" রমণী আসিয়া কাঁদিয়া মেহেরের পদানত হইল। মেহের সান্ত্বনা ও নির্ভয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার স্বামী কোথায়? ও শঙ্কর সিং তোমার স্বামী কি না?"

রমণী। আমার স্বামীর নাম বেন্সাচীচারিলু, তিনি গৃহে ছিলেন, আপনার লোক তাঁহাকে স্নাবদ্ধ করে রেখে এসেছে। শঙ্কর কে আমি জানি না।

মেহের। পরমেশ্বর জানেন, আমি সেই দুষ্টের দুরভিসন্ধি বুঝি নাই। তাহার কথায় আমি এমন ভুক্তিয়া করিলাম যে বিচার দিনে উত্তর দেওয়া শঙ্কট হইবে। যাহা হউক এক্ষণে অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনাকে স্বভবনে রাখিয়া আসিতেছি।

রমণী। মহাশয়! তাহাতে লাভ কি? দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা ব'লে আমার জাতি নষ্ট হইয়াছে পুরলোকে বুঝিয়াছে। দিব্য করিলেও তাহারা আর বিশ্বাস করিবে না এবং আমাকে গ্রহণ করিবে না।

মেহের। আমরা গিয়া সব অবস্থা প্রকাশ করিব ও আপনার কোন অত্যাহিত হয় নাই প্রমাণ করিব।

রমণী। গম্ভীর স্বরে কহিল, "বিশ্বাস করিলে ত বাঁচি। কিন্তু আমার নিশ্চয় আশঙ্কা হইতেছে, আমাকে পাইলে তাহারা লজ্জা নিবারণ জন্য হত্যা করিবে। মেহের কহিলেন "তবেইত! এখন কি করা যায়?" মেহের শঙ্করের প্রতি এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন যে তাহাকে পেলে দ্বিখণ্ড করেন। রমণীকে কহিলেন "এখন আপনার অভিপ্রায় কি?"

রমণী। আমার মাথা আর মুণ্ড। কপাল আমার ভেঙ্গেছে, এবং আপনারই কর্ত্তৃক—আপনি জ্ঞাতসারে আর অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া থাকুন।

মেহের অধোবদন হইলেন কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন "যাহা হইবার হইয়াছে, এখন উপায় কি? আপনি যাহা

বলিবেন আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি।”

রমণী। উপায় যাহা হউক, আমি ঘরে ফিরিব না, এ কালামুখ কোন্ লজ্জায় দেখাইব? আপনি আমাকে সঙ্গে লয়ে যান ও যাহা বিবেচনা হয় করিবেন।

মেহের অগত্যা চট্টগ্রামাভিমুখে চলিলেন। চারিলু-পত্নীর প্রতি পাছে কেহ অত্যাচার করে বলে মেহের তাহাকে আপন কক্ষের পার্শ্ব কক্ষে রাখিলেন। তাহার যে সাহায্য করিতে হইত নিজে করিতেন—অন্যের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। রমণীর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়াছিলেন। রমণীও সমুদ্র-তরঙ্গ বা বায়ু-প্রাবল্য জন্য ভীতা হইলে কখন মেহেরকে নিজ কক্ষে ডাকিতেন—কখনও বা মেহেরের কক্ষে আসিতেন। একদা মেহের কক্ষ মধ্যে নিদ্রিত আছেন, সহসা জাগরিত হইয়া দেখিলেন—চারিলু-পত্নী তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মস্তক সেবা করিতেছেন। উঠিয়া কহিলেন—“এখানে কেন? কোন ভয় পাইয়াছেন?”

রমণী। না, আমি আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

মেহের। কি?

রমণী। আমাকে কি করিবেন ভাবিয়াছেন?

মেহের। ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই—আপনার যাহাতে মঙ্গল হয় বলুন।

রমণী। আপনি অতি সাধু সদাশয়! আপনার আশ্রয়ে নিরাপদে আছি। কিন্তু আমি সমর্থা স্ত্রীলোক, একজনের আশ্রয় বিনা আমার থাকা সমূহ বিপদ্। আমার ইচ্ছা আপনি আমাকে বিবাহ করুন।

মেহের ঐ প্রস্তাবের ভয় সর্ব্বদাই করিতেন, কহিলেন “চারিলু-পত্নী, আপনি হিন্দু—আমি মুসলমান; আমি ইচ্ছা করি না আপনি জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট করেন। আমার কল্পনা হইতেছিল—আপনাকে এক স্থানে কিছুদিন রাখাইয়া দিব এবং অর্থ লোভ দিয়া আপনার স্বজাতি কাহারও সহিত বিবাহ দেওয়াইব।”

রমণী। আমি আর সে আশা করি না। অর্থলোভী সামান্য লোকের সহবাস প্রার্থনীয় নহে। আমি মুসলমান হইব, আমাকে বিবাহ করুন। মেহের “দেখা যাইবে” বলিয়া তখন বিরত হইলেন। এমত সময় সহসা এক বৃহৎ অর্ণবপোত নিকটে আসিল। অনবরত রাজকর্ম্মচারী আসিয়া মেহেরের জাহাজ আক্রমণ করিল। এবং মেহেরকে, চারিলু-পত্নীকে ও নাবিকদের বাঁধিয়া লইল। জাহাজের পশ্চাতে জাহাজ বাঁধা রহিল। তৎসঙ্গে শঙ্করসিংহও দেখা দিল। সে যে ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল তা অতঃপর প্রকাশ হইল।

ক্রমশঃ।

সন্ধ্যা।

সমাগত সন্ধ্যা, রবি বিলীন আকাশে,
ম্লান মনে ধরণী ধূষর বাস পরে,
পুরনারী শঙ্খধ্বনি করিয়া উল্লাসে,
দীপ জ্বালি, মঙ্গল আরতি করে ঘরে।

ধীরে ধীরে সুখ-স্পর্শ সঞ্চরে সমীর,
কভু তরঙ্গিনী বক্ষে তরঙ্গে নাচায়,
কভু বিভূষিত বধূ গন্ধে মালতীর
প্রমদা-অলকগুচ্ছ ঈষদ্ দোলায়।

আধো ফোটো ফোটো যূথি মল্লিকা মালতী,
যতনে যুবতী হার গাঁথিয়াছে তায়,
কৌতুকে পরেছে কণ্ঠে কোন রসবতী,
কেহবা কবরী বেড়ে রেখেছে মাথায়।

মনঃক্ষোভে খাদ্য লোভ সম্বরি বায়স,
নীড় লক্ষ্যে দ্রুত পক্ষে উড়িছে সত্বর;
আঁধারে মুদিত চক্ষে বঞ্চিয়া দিবস,
পেচক কর্কশকণ্ঠ ত্যজিল কোটর।

কুঞ্জবন-গায়ক বিহঙ্গ কলাবৎ *
বিরত সঙ্গীতে; সুর রাখিতে বজায়,
প্রভাতি-সঙ্গীত, পাখী না ধরে যাবৎ,
সাধ পূরে তানপূরা ঝিঁঝিতে † বাজায়।

কত অনুনয় অলি করে নলিনীরে,
তথাপি মানিনী মানে ঝাঁপিল বদন,
মধুলোভে শঠ সেই কত ফুলে ফিরে,
কেন সে রাখিবে ধনী কৈতব-বচন?

নিশা-সখী কুমুদিনী মেলিল নয়ন,
রহস্য সংবাদ তারা কহিবে দুজনে
কহিবে প্রণয়-রসে অভিষিক্ত মন
কামিনী কি কথা কহে পতিরে নির্জ্জনে।

কর্ম্ম স্থল হতে নর আগত আলয়,
শ্রমখিন্ন দেহভার করিয়া বহন;
দেখিবে সে পূর্ণশশী গৃহেতে উদয়,
বনিতা নিকটে আসি দাঁড়াবে যখন।

অভিনব-অরবিন্দ-প্রফুল্ল আনন
ধাইয়া সোহাগে শিশু বাহু পসারিয়া
কোলেতে উঠিবে তার লভিতে চুম্বন,
অভাগা যতেক ক্লেশ যাইবে ভুলিয়া।

নীরব অবনী, স্তব্ধ জীব সমুদয়,
চঞ্চল হৃদয়, স্থির হইল এখন,
ধীরে ধীরে স্মৃতিপথে আসিয়ে উদয়,
পাশরি সকল স্নেহ গিয়াছে যে জন।

প্রতিবাসী, দাস দাসী, বন্ধু, পরিচিত,
সকলে অনেক দিন ভুলে তারে গেছে।
রয়েছে মুরতি হৃদি-পাষাণে অঙ্কিত
শুধু তার, মর্ম্মে যার শেল বিঁধিয়াছে।

স্মরি পুত্র-কমনীয়-বদন-মণ্ডল,
জননী-হৃদয়ে, শোক-তরঙ্গ উথলে,
বিরলে বিধবা বসি ফেলে নেত্রজল,
যে তারে বাসিত ভাল, সে গিয়াছে চলে!

---

* কালোয়াত। † ঝিঁ ঝিঁ—ঝিল্লী।

শ্যামাঙ্গিনী শর্ব্বরীর সীমন্ত-ভূষণ
উঠেছে সন্ধ্যার তারা নীলনভস্থলে,
বিমলচাঁদের রেখা যুড়াল নয়ন,
খদ্যোতের ক্ষুদ্র মন ঈর্ষ্যানলে জ্বলে।

বণিকের বিত্তরাশি করিয়া বহন
নদীজল বিলোড়িয়া তরি চলে যায়,
ঝুপ ঝুপ শব্দে দাঁড় পড়িছে কেমন!
সমস্বরে কর্ণধার-সারি গীত গায়।

তটস্থিত কুটীরের হরিয়া আঁধার,
মৃদু প্রদীপের আলো পড়িয়াছে জলে,
বহুদূরে প্রভা তার হতেছে বিস্তার;
সুকাজের দীপ্তি হেন হয় ধরাতলে।

দেবালয়ে নিনাদিত হতেছে কাঁসর,
যে বলে বলুক অই কাঁসরে কর্কশ,
আমার নিকটে উহা শ্রুতি-সুখকর
হৃদয়েতে আবির্ভাব করে শান্তরস।

জ্ঞানী নই, মজি নাই সেই দিব্য জ্ঞানে,
পর-ধর্ম্মে ঘৃণাবোধ যাহাতে ঘটায়,
সত্যধর্ম্মজ্যোতি মম উড়েনা নিশানে,
ব্যগ্র নই স্বর্গ-রাজ্য আনিতে ধরায়।

জানি এই, যোগী যাঁরে ধিয়ায় হৃদয়ে,
সরলা বালিকা পূজে পুষ্প অর্ঘ্য দিয়া,
সেই বিশ্বপতি দেব, সায়াহ্ন সময়ে,
সুখী হই, ভক্তিভাবে হৃদি আরাধিয়া।

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

[পঞ্চম প্রবন্ধ।]

ম্যাট্‌সিনি কর্ত্তৃক লা জিয়োবিনি ইতালীয়া বা নব্য ইতালী নামক সমাজ সংস্থাপন।

১৮২০-২১ এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জাতীয় অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনে ম্যাট্‌সিনির হৃদয় ভীত বা হতাশ হইল না। কোন্ কোন্ ভ্রম প্রমাদবশতঃ পূর্ব্বোক্ত অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতন হইল, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন; এবং তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল যে সেই সকল ভ্রম প্রমাদের দূরীকরণ হইলে ভাবী অভ্যুত্থান অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে। ম্যাট্‌সিনির হৃদয় ভীত বা হতাশ হইল না বটে, কিন্তু ইতালীয়গণের অধিকাংশেরই হৃদয় এই জাতীয় অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনে গভীর হতাশতার ভাবে ম্লান ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল।

ম্যাট্‌সিনি স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাইলেন যে অধিনয়ন কার্য্যের পটুতার উপরই জাতীয় অভ্যুত্থানের কৃতকার্য্যতা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে। এই অধিনয়ন কার্য্যের দোষই জাতীয় অতীত অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনের একমাত্র কারণ।

যাঁহারা বিপ্লবের স্রষ্টা, বৈপ্লবিক শাসন কার্য্য তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পিত না হইয়া সচরাচর বিপ্লববিরোধী বা উদাসীন ব্যক্তিদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়া থাকে। এই ভ্রমের সহস্র সহস্র জীবন্ত উদাহরণ ইতালীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যাঁহারা কখন উচ্চ-পদাভিষিক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগেরই হস্তে বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যের ভার সমর্পণ করা ইতালীয় লোক-সাধারণের—বিশেষতঃ যুবকমণ্ডলীর—একটী রোগ হইয়া উঠিয়াছিল। অরাজকতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষতা অপবাদ ভয়েব প্রাবল্যই ইহার মূল। জাতীয় স্বাস্থ্যের সময় পলিতকেশ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করা শুভপ্রদ বটে, কিন্তু তাঁহারা বিপ্লবসময়ের কে? বিপ্লবের প্রকৃতি, গতি ও পরিণতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পলিত-কেশই হউন আর পূর্ণপ্রভাবশালীই হউন, তাঁহাদিগদ্বারা বিপ্লবের অনিষ্ট বই ইষ্ট সাধন হইতে পারে না। পীড্‌মণ্ট ও বলোনার বৈপ্লবিক শাসন-সমিতি এইরূপ লোকদ্বারাই সংগঠিত হয়। ইহাঁরা পর্য্যুদস্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত, গলিতবয়া, পুরা-প্রচলিত সঙ্কীর্ণ মতাবলীতে দীক্ষিত, যুবক-মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাসরহিত, ফরাশিবিপ্লবের অত্যাচার-জনিত ভয়ে অদ্যাপি জড়ীভূত; এরূপ লোকদিগের বিপ্লব-সাধনোপযোগী উৎসাহ, অধ্যবসায়, শক্তি ও বুদ্ধি থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এরূপ লোকদিগের হস্তে যখন বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যভার অর্পিত হয়, তখন বিপ্লব পরাস্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি।

এই সকল কারণে ম্যাট্‌সিনি নূতন প্রণালীতে বিপ্লবসাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে তিনি নব্য ইতালী নামক একটি সমাজ সংস্থাপন করিলেন।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যদিগের জন্য ম্যাট্‌সিনি যে উপদেশাবলী ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

নব্য ইতালী।

সাম্য—স্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতা—
একতা—পরপোকারব্রততা—
নব্য ইতালীর মূলমন্ত্রস্বরূপ।

প্রথম শাখা।

ইতালীর উন্নতি ও উদ্ধার সাধন যাঁহারা জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন; যাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইতালী একদিন এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে, এবং তৎসাধনার্থে ইতালীকে বহিশ্চর রাজ্যসকলের শরণাপন্ন হইতে হইবে না; যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে ইতালীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতীয় অভ্যুত্থানসকলের পতনের কারণ অধিনয়ন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা, অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য নহে; এবং যাঁহাদিগের বিশ্বাস, যে চেষ্টার

অবিচ্ছিন্নতা ও একতাই বলের মূল; নব্য ইতালী সেই সকল ইতালীয়গণকে এক ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ করিতেছে। ইহাঁরা ইতালী উদ্ধারসাধন জন্য চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন, অষ্ট্রিয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ ইতালীয়দিগকে এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত করিবেন, এবং স্বাধীন ইতালীয় জাতির অন্তরে সাম্য ও ঐক্যের ভাব প্রবলতররূপে অঙ্কিত করিবেন।

দ্বিতীয় শাখা।

একশাসনের অধীন, এক ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ, বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশস্থ ইতালীর অধিবাসি-সমষ্টিই ইতালীয় জাতি শব্দের প্রতিবাদ্য।

তৃতীয় শাখা।

সমাজের ভিত্তিমূল।

লক্ষ্যের অবিচলিতত্তা, পরিস্ফুটতা ও সুনিশ্চিততা,—সমাজের স্থায়িতা, কার্য্যকারিতা এবং দ্রুত উন্নতির মূল।

সভ্যসংখ্যা সমাজের বলের প্রকৃত পরিচায়ক নহে; সভ্যদিগের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অবিচলিতত্তা এবং লক্ষ্যের ও মনোভাবের একতাই সমাজবলের প্রকৃত পরিচায়ক।

যাঁহাদিগের লক্ষ্যের ও কার্য্যপ্রণালীর কোন নিশ্চিততা নাই, যাঁহাদিগের মতের কোন একতা নাই, এরূপ নির্লক্ষ্য বা অনিশ্চিতলক্ষ্য বিভিন্নধর্ম্মা সভ্যগণ দ্বারা যে সকল বৈপ্লবিক সমাজ সংগঠিত, সংহার-কার্য্যের সময় তাঁহাদিগের একচিত্ততা পরিদৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু নির্ম্মাণ-কার্য্য আরব্ধ হইলেই তাঁহাদিগের কার্য্য-স্রোত অন্তর্ব্বিচ্ছেদে ব্যাহত হইবে; এবং যে সময় কার্য্য ও লক্ষ্যের একতার নিতান্ত প্রয়োজন, সেই সময়েই ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদে বিপ্লবের উদ্দেশ্য পর্য্যুদস্ত হইবে।

বিপ্লব সাধন করিতে হইলে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে; নিয়ম শব্দের অর্থ প্রণালী; লক্ষ্যের অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন করাই উক্ত প্রণালীর কার্য্য।

যত দিন বিপ্লবের লক্ষ্য অনিশ্চিত থাকিবে, ততদিন বিপ্লবের সাধন-সামগ্রীরও কোন নিশ্চিততা হইবে না; এবং সাধন-সামগ্রীর নিশ্চয়াভাবে বিপ্লবের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা অল্প। কারণ লক্ষ্যের নিশ্চয়াভাবে, অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন হইতে পারে না; এবং অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন বিনা ও বিপ্লবের কৃতকার্য্যতা বিষয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। বিশ্বাস না জন্মিলেও লোকে বিপ্লব সংসাধন জন্য প্রাণপণ করিতে পারে না; প্রাণপণ চেষ্টা ব্যতীতও কখন বিপ্লব সংসাধিত হইতে পারে না। অতীত ঘটনায় ইহার ভূরী ভূরী প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাঁহারাই বিপ্লবের অধিনায়ক হইবেন, বিপ্লবের পরিণাম কি তাঁহাদিগকে স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে। যাঁহারাই লোক সাধারণকে অস্ত্র ধারণ করিতে আহ্বান

করিবেন, তাঁহাদিগকেই বলিয়া দিতে হইবে কি ফলের আশায় তাহারা অস্ত্র ধারণ করিবে; কারণ জয় লাভ করিয়া কি ফল হইবে তাঁহা জানিতে না পারিলে কখন সমস্ত জাতি যুদ্ধার্থ অভ্যুত্থিত হইতে পারে না। যাঁহারাই দেশের পুনঃসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে তাঁহারা তৎসাধনে সমর্থ; এরূপ বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহারা কখনই তাদৃশ গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবেন না; এবং তাঁহারা সংহার কার্য্য মাত্র সম্পন্ন করিয়া এরূপ অরাজকতা সংঘটিত করিবেন, যাহার প্রতিবিধান বা নিরাকরণ তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত।

এই সকল কারণে নব্য ইতালীর সভাগণ জাতীয় ভ্রাতৃগণকে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও কার্য্য-প্রণালী অবগত করাইতেছেন।

এই সমাজের প্রথম লক্ষ্য **বিপ্লব সাধন** দ্বিতীয় লক্ষ্য **নব নির্ম্মাণ**; কিন্তু তাঁহাদিগের লক্ষ্য সাধনের প্রধান অস্ত্র **শিক্ষা**। শিক্ষা যেরূপ বিপ্লব সাধনের মহাস্ত্র, তেমনই বিপ্লবের পর নির্ম্মাণ-কার্য্যেরও অদ্বিতীয় সাধক; এই জন্য বিপ্লবের পূর্ব্বে ও পরে শিক্ষাই এই সমাজের প্রধান অবলম্বনীয় হইবে।

নব্য ইতালী সমাজ সাধারণ-তন্ত্র-বাদী।

১ কারণ—সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সকল জাতিই সময়ে সাম্য ও স্বাধীনতা ভোগ করিবে, সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীই এই ভবিষ্য সুখ-সাধনের একমাত্র উপযোগিনী।

২য় কারণ—জাতি সাধারণই দেশের প্রকৃত রাজা এবং সর্ব্বোচ্চ নৈতিক বিধির একমাত্র ব্যাখ্যাতা।

৩য় কারণ—সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী এখন যতই কেন অধিকার ভোগ করুন না, সমাজের স্বাভাবিকী প্রবণতা সাম্যের দিকেই; সাম্যই স্বাধীনতার মূল; সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার শাসনপ্রণালীই সাম্যের প্রতিকূলে; সুতরাং সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার শাসনপ্রণালীই স্বাধীনতার বিরোধী।

৪র্থ কারণ—জাতিসাধারণের রাজত্ব স্বীকার না করিয়া যদি ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের রাজত্ব স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে পরস্পর বিবাদের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। যেখানে সখ্যভাব একান্ত প্রয়োজন, সেখানে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও পরস্পরের সহিত কলহ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সখ্যভাবের অভাবে সামাজিক জীবনের চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা অল্প।

৫ম করণ—রাজা প্রজাসাধারণের সহিত পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া কখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারেন না; রাজকীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মধ্যবর্ত্তী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অস্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন—যাঁহারা রাজার ন্যায় অদ্বিতীয় বিভবশালীও

হইবেন না এবং প্রজা-সাধারণের ন্যায় অতি দীনও হইবেন না;—কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীই সমাজের যাবতীয় দূষণ ও বৈষম্যের নিদান।

৬ষ্ঠ কারণ—ইতিহাস পাঠে ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে সিংহাসন শূন্য হইলে, প্রজামণ্ডলীর মধ্য হইতে প্রতিবার নূতন নূতন রাজা মনোনীত করিতে গেলে, রাজ্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়; আবার এদিকে পুরুষ-পরম্পরায় এক বংশেই রাজসিংহাসন আবদ্ধ রাখিলে যথেচ্ছচারিতার নিরতিশয় আধিক্য হইয়া উঠে।

৭ম কারণ—রাজত্বাধিকার পুরাকালের ন্যায় এখন আর ঈশ্বরদত্ত স্বত্ব বলিয়া বিবেচিত হয় না; এই জন্য লোক-সাধারণের নিকট ইহার মোহিনী শক্তি অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় ইহা রাজ্যের প্রভুতা ও একতার কেন্দ্র-স্বরূপ হইতে পারে না।

৮ম কারণ—ইউরোপে যে সকল ক্রমিক উন্নতিমূলক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, সে সমস্তেরই অনিবার্য্য প্রবণতা সাধারণতন্ত্র সংস্থাপনের দিকে।

৯ম কারণ—ইতালীতে আপাতত রাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইলে অচিরকাল মধ্যেই সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন জন্য দ্বিতীয় বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

১০ম কারণ—কার্য্যতঃ ইতালীতে রাজতান্ত্রিক উপাদান-সামগ্রী নাই। রাজা, জমিদার ও প্রজাসাধারণ—এই তিনটীই রাজতন্ত্রের অপরিহার্য্য উপাদান। ইহার কোনটীরও অভাবে রাজতন্ত্র পরিরক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু ইতালীতে প্রথম দুইটীরই একপ্রকার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইতালীতে এমন কোন প্রাচীন রাজবংশ নাই যাহা ইতালীর সমস্ত প্রদেশের স্নেহ ও সহানুভূতি আয়ত্ত করিতে পারে; এবং এরূপ সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী জমিদারশ্রেণীও নাই যাঁহারা রাজা ও প্রজাসাধারণের মধ্যবর্ত্তী গহ্বর পরিপূরিত করিতে পারেন।

১১শ কারণ—ইতালীয় প্রবাদ প্রধানতঃ সাধারণতান্ত্রিক; ইতালীর অতীত অবদান-পরম্পরার স্মৃতিও সাধারণ-তান্ত্রিক; ইতালীর জাতীয় উন্নতির ইতিবৃত্ত সাধারণতান্ত্রিক; রাজতন্ত্র ইতালীর অবনতির সমসাময়িক মাত্র। বিজাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনতা, প্রজাবর্গের প্রতি বিরোধিতা, এবং জাতীয় একতার প্রতিকূলতা দ্বারা, রাজতন্ত্রই অচিরকাল মধ্যে ইতালীর পূর্ণ ধ্বংশ বিধান করিয়াছে।

১২শ কারণ—যে প্রণালী প্রাদেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহে, ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ সকল প্রফুল্ল মনে তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যক্তিবিশেষের প্রভুতাধীনে আসিবে না।

১৩শ কারণ—যদি রাজতন্ত্র ইতালীয় বিপ্লবের একবার লক্ষ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে রাজতন্ত্রের অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক

কর্ত্তব্যনিচয়ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে; বহিশ্চর রাজবৃন্দের চরণে আত্মবিসর্জ্জন,—দূতমণ্ডলীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন,—দেশের একমাত্র উদ্ধার-সাধক লৌকিক বলের নিয়ন্ত্রণ,—বিপ্লববিরোধী রাজতন্ত্র-পক্ষপাতীদিগের হস্তে বৈপ্লবিক গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপরিভাবী ক্ষমতা প্রদান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লবেরই মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

১৪শ কারণ—অতীত ইতালীয় বিপ্লবদ্বয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে ইতালীয় জাতি-সাধারণের বলবতী প্রবণতা সাধারণতন্ত্রেরই দিকে।

১৫শ কারণ—সমস্ত জাতিকে যখন যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে হইবে, তখন তাহাদিগের নিকট এমন একটী লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যাহার সহিত তাহাদিগের স্বার্থের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

১৬শ কারণ—ইতালীর বর্ত্তমান সকল গবর্ণমেণ্টই—হয় ভয়ে নয় মতে—সঞ্জীবন (Regeneration) কার্য্যের প্রতিকূল।

এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ বিপ্লবসাধনার্থ রাজতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক; ইহার সভ্যেরা ইতালীয় রণক্ষেত্রে জাতীয় ধ্বজা উড্ডীন করিয়া লোক-সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিবেন; এবং যে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী আধুনিক ইউরোপীয় বৈপ্লবিক বিস্ফুরণের অভিনেত্রী, সেই সার্ব্বজনীন প্রণালীর নামে সভ্যেরা লোক-সাধারণের সাহায্য ভিক্ষা করিবেন।

নব্য ইতালী একতাবাদী (Unitarian) অর্থাৎ ইতালীর বিচ্ছিন্ন রাজ্যসকলকে এক সাধারণ সূত্রে সম্বদ্ধ করা ইহার অন্যতম লক্ষ্য।

১ম কারণ—একতা ব্যতীত প্রকৃত জাতীয় অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।

২য় কারণ—একতা ব্যতীত প্রকৃত বলপ্রাপ্তির আশা নাই; কিন্তু যখন ইতালী চতুর্দ্দিকে প্রবল, একীভূত ও ঈর্ষা-পরবশ জাতিনিচয়ে পরিবেষ্টিত,—তখন ইতালীর পক্ষে বল প্রাপ্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

৩য় কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার রাজনৈতিক অবস্থা ঠিক সুইজরলণ্ডের ন্যায় হইয়া পড়িবে; সুতরাং অগত্যা তাহাকে কোন সন্নিকৃষ্ট প্রবলতর জাতির অধীনে থাকিতে হইবে।

৪র্থ কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকলের পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আবার প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে; সুতরাং মধ্যযুগের ভীষণ অন্ধকার আবার ইতালীকে আচ্ছন্ন করিবে।

৫ম কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে ইতালীর প্রশস্ত জাতীয় কার্য্যক্ষেত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র কার্য্যক্ষেত্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবে; এইরূপে অসংখ্য ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির অযোগ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধনের পথ পরিষ্কৃত হইবে; সুতরাং সাম্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে।

৬ ষ্ট কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে মানবজাতি-সাধারণের প্রতি ইতালী যে গুরুতর কর্ত্তব্য-সাধন-ব্রতে ব্রতী, তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।

৭ ম কারণ—যখন ইউরোপীয় সমাজ এক বৃহৎ রাজনৈতিক সূত্রে পরস্পর সম্বদ্ধ হইতে যাইতেছেন, তখন ইতালীকে অন্তর্বিচ্ছিন্ন করিতে যাওয়া উন্মাদবিজৃম্ভিত মাত্র।

৮ ম কারণ—সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে দৃষ্ট হয় যে বহুদিন হইতে ইতালীর আভ্যন্তরীণ সভ্যতার বেগ একতা প্রতিষ্ঠাপনের দিকেই ধাবিত হইতেছে।

নব্য ইতালী সমাজ যে জাতীয় একতার উপাসক, তাহার অর্থ ইতালীর সমস্ত প্রদেশের এক রাজনীতি ও একসমাজ সূত্রে গ্রন্থন। প্রত্যেক প্রদেশের আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। নব্য ইতালী সমাজ রাজ্যের কার্য্যনির্ব্বাহক (Administrative) বিভাগের এরূপ সুন্দর শৃঙ্খলা করিবেন যে প্রত্যেক প্রদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় একতা এই দুইই সংরক্ষিত হইবে; কিন্তু রাজনৈতিক বিভাগ—যাহা অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্য সকলের নিকট ইতালীর প্রতিভূ স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইবে—এক এবং কেন্দ্রীভূত থাকিবে।

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিষয়ে একতা ভিন্ন প্রকৃত জাতীয় জীবন সম্ভবপর নহে। নব্য ইতালী সমাজের মূলভিত্তি স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত মত সকল এবং তাহাদিগের সম্ভাবিত ভাবী পরিণাম—যাহা যাহা সমাজের পত্রিকাদিতে পরিব্যক্ত হইবে—সমাজের মূলধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে; এবং যাঁহারা এই মূল ধর্ম্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং যাঁহাদিগের এই মূল ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে, তাঁহারাই নব্য ইতালী সমাজের সভাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন।

নব্য ইতালী সমাজ হইতে সময়ে সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক প্রত্যেক মতের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাব বাহির হইবে। উন্নতি মানবজাতির জীবন; সুতরাং সেই উন্নতির নিয়মানুসারে এই সকল মতেরও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করা হইবে।

যাঁহারা দীক্ষাগুরু তাঁহারা এই সকল মত দীক্ষিতদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিবেন; এবং দীক্ষিতেরা আবার সেই সকল মত যতদূর সম্ভব ইতালীর জাতিসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। দীক্ষাগুরু ও দীক্ষিত উভয়কেই সতত মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল মতের নীতিমার্গানুসারী প্রয়োগই বিশেষ প্রয়োজনীয়; নৈতিক উৎকর্ষ ব্যতিরেকে প্রকৃত নাগরিকত্ব (Citizenship) সম্ভবপর নহে;—কোন গুরুতর কার্য্যের কৃতকার্য্যতার প্রথম সোপান নৈতিক উৎকর্ষ;—যাঁহারা এই সকল মতের প্রচারক, এই সকল মতের সহিত তাঁহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের অবিসম্বাদিতা থাকা চাই, অন্যথা তাঁহারা জগতের নিকট অতি ভয়ঙ্কর কপটাচারী ও স্বধর্ম্মবিদ্বেষী বলিয়া পরিচিত হইবেন;—নৈতিক উৎ-

কর্ম্মের দ্বারাই নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা অপরকে তাঁহাদিগের মতে আনিতে সক্ষম;—যাঁহারা তাঁহাদিগের মতের সত্যতা অস্বীকার করেন, যদি নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা আপনাদিগের অধিকতর উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত-মতাবলম্বী সাম্প্রদায়িক, (Sectarian) বলিয়া ঘৃণা করিবে;—কিন্তু নব্য ইতালীসমাজ সম্প্রদায়বিশেষে বা দলবিশেষে পরিণত হইতে চাহেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিতের ন্যায় তাঁহাদিগের জীবন্ত বিশ্বাস, জীবন্ত ধর্ম্ম দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতে হইবে।

যে উপায় দ্বারা নব্য ইতালী সমাজ তাঁহাদিগের লক্ষ্য সংসাধন করিবার প্রস্তাব করিতেছেন তাহা শিক্ষা এবং বিপ্লব। দুইই এক সময়ে আরম্ভ করিতে হইবে; এবং একটী অপরটীর সহিত যাহাতে সমঞ্জসীভূত হয় তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত বাক্য এবং রচনা দ্বারা বিপ্লবের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য হইবে। আবার বিপ্লব এরূপ প্রণালীতে সংসাধন করিতে হইবে যে তাহা হইতেই জাতীয় শিক্ষা সংসাধিত হইতে পারিবে।

এই বিপ্লবোদ্দীপক শিক্ষা ইতালীতে কাজে কাজেই গুপ্তভাবে সম্পাদন করিতে হইবে; কিন্তু ইতালীর বাহিরে ইহা প্রকাশ্যভাব ধারণ করিবে।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা সমাজের মত প্রচার ও মুদ্রাঙ্কনাদি ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেকেই কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিবেন।

ইতালীর নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ এই সকল মতের প্রচারকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী উপদেশাদি ও সংবাদ ইতালীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে উভয় স্থলেই অতি গুপ্তভাবে প্রদত্ত হইবে। এই বিপ্লবের কার্য্যপ্রণালী ভাবী ইতালীর জাতীয় কার্য্য-প্রণালীর বীজস্বরূপ হইবে। যেখানেই বিপ্লবের নবাভ্যুত্থান হইবে, যেখানেই বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন হইবে, যেখানেই বিপ্লবের লক্ষ্য নির্ব্বাচিত হইবে, ইতালীর নাম সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইবে, ইতালীর জাতীয়ভাব সর্ব্বত্র পরিব্যক্ত হইবে।

এই বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ইতালীকে একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত করা; সুতরাং ইহার কার্য্যপ্রণালী জাতীয় নামেই সম্পাদিত হইবে; এবং যে ইতালীর লোক-সাধারণ এতদিন অনাদৃত ও পদদলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকেই এই বিপ্লবের একমাত্র অবলম্বন ও একমাত্র অধিনায়ক করিতে হইবে।

নব্য ইতালী সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে —ইতালী বাহিরের সাহায্য ব্যতীতও অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিতে সক্ষম; একটী জাতি প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইলে, অগ্রে লোকের মনে জাতীয়

ভাব ও জাতীয়তার জ্ঞান দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে হইবে; কিন্তু বৈদেশিক শক্তি দ্বারা বিপ্লব সংসাধিত হইলে এরূপ জাতীয় ভাব ও জাতীয়তার জ্ঞান সম্ভবপর নহে। "নব্য ইতালী" সমাজ অসন্দিগ্ধরূপে প্রতীত হইয়াছেন যে, যে বিপ্লব বহিশ্চর সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তাহাকে বহিশ্চর ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়; সুতরাং তাহার জয়লাভ অনিশ্চিত।

যে বিংশতি লক্ষ ইতালীয় এক্ষণে অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের যে জিনিসের অভাব আছে তাহা শক্তি নহে, আত্মশক্তির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস।

উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বিশ্বাসের উৎপাদন করাই নব্য ইতালী সমাজের প্রধান চেষ্টা হইবে।

ইতালীর পূর্ণ বিপ্লব সাধন করিতে হইলে অগ্রে ইতালীর চতুর্দ্দিকে লোকসাধারণকে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও অভ্যুত্থিত করিতে হইবে; যখন এই অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইবে, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লব আরম্ভ হইবে।

প্রথম অভ্যুত্থান ও ইতালীর পূর্ণ দাসত্ব মোচনের মধ্যবর্ত্তী সাময়িক কার্য্যভার অল্পসংখ্যক লোকেরই হস্তে সমর্পিত থাকিবে।

ইতালীতে পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত হইলে, একটী জাতীয় সভা সংগঠিত হইবে; তখন সেই জাতীয় সভার নিকট সকলেরই মস্তক অবনত করিতে হইবে; যিনি যে কোন ক্ষমতাপ্রার্থী হইবেন তাহা এই সভার নিকট হইতেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

যে জাতি আপনাদিগকে বিদেশীয় শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী (Guerilla warfare) অবলম্বন করিতে হইবে। অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে অধীন জাতির নিয়মিত ও সুসম্বদ্ধ সেনা থাকার সম্ভাবনা নাই; গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী এই অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ করিবে। ইহা অধীন জাতিকে যুদ্ধকুশল করিয়া তুলিবে এবং জন্মভূমির প্রত্যেক স্থানকেই যুদ্ধ-ব্যাপারের পবিত্র স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী স্থানীয় শক্তির অনুরূপ কার্য্যদক্ষতা উৎপাদন করে, শত্রুদিগকে অনভ্যস্ত যুদ্ধপ্রণালীতে বলপূর্ব্বক অবতারিত করে; অতিবিস্তৃত সমরে ভীষণ পরাজয়ের ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে দেশবাসীদিগকে সংরক্ষিত করে; এবং জাতীয় সমরকে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ করেনা। এই সকল কারণে ইহা অজেয় ও অবিনাশ্য।

গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী দ্বারা যখন শত্রুসৈন্য ক্লান্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে, তখন অতি সাবধানে নির্ব্বাচিত ও অতিযত্নে শিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মিত

সেনাদ্বারা বিপ্লবকার্য্য সাধন করিতে হইবে।

"নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যগণ প্রত্যেকেই এই সকল মত প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। এই সমাজ হইতে মধ্যে মধ্যে যে সকল পুস্তক ও পত্রিকাদি বাহির হইবে, তাহাতে সেই সকল মত অতিশয় পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট-রূপে পরিব্যক্ত হইবে এবং যে সকল নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা অভ্যুত্থানকাল (Period of Insurrection) নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

৫ম শাখা।

"নব্য ইতালী" সভার প্রত্যেক সভ্যকে সভার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রতিমাসে অন্যূন অর্দ্ধ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতে হইবে। যাঁহাদিগের অবস্থা ভাল, তাঁহাদিগকে অবস্থার ক্রমানুসারে অধিকতর চাঁদা দিতে হইবে।

৬ষ্ঠ শাখা।

"নব্য ইতালীর" পরিচায়ক বর্ণ—শ্বেত, লোহিত এবং হরিৎ হইবে। "নব্য ইতালীর" ধ্বজপতাকা এই তিন বর্ণই ধারণ করিবে এবং পতাকার এক দিকে—**স্বাধীনতা, সাম্য ও পরোপকার-ব্রতিতা** ও অন্যদিকে—**একতা ও স্বাতন্ত্র্য** এই বাক্য গুলি লিখিত থাকিবে।

৭ম শাখা।

প্রত্যেক সভ্যকে "নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যপদে দীক্ষিত হওয়ার সময় দীক্ষাগুরুর সমীপে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করিতে হইবে:—

ঈশ্বর ও ইতালীর নামে—এবং সেই মহাত্মাদিগের নামে যাঁহারা ইতালী উদ্ধাররূপ পবিত্র যজ্ঞে স্বদেশীয় যথেচ্ছচারিণী শক্তির হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন—

যে দেশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে দেশে আমার ভ্রাতৃগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের প্রতি আমি যে কর্ত্তব্য-ঋণে আবদ্ধ, তাহার নামে—

যে দেশ আমার জননীকে জন্ম প্রদান করিয়াছে, যে দেশ আমার পুত্রকন্যাদিগের ভাবী ক্রীড়াস্থল হইবে, সেই দেশের প্রতি আমার হৃদয়ে যে প্রকৃতিসিদ্ধ প্রণয় বিরাজমান রহিয়াছে, সেই প্রণয়ের নামে—

অন্যায়, অবিচার, অশুভ, পরাধিকার গ্রহণ ও যথেচ্ছচারিণী শাসনপ্রণালীর প্রতিকূলে আমার হৃদয়ে যে বলবতী ঘৃণা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নামে:—

যখন আমি অন্যান্য দেশের স্বাধীন নাগরিকের নিকট দণ্ডায়মান হই এবং জানিতে পারি যে তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার নাই, যাহাকে নিজের দেশ বলিতে পারি এমন দেশ নাই, এবং নিজের জাতীয় পতাকা নাই, তখন যে প্রবল

লজ্জার বেগে আমার ললাটদেশ আলোড়িত হয়, তাহার নামে :—

আমার যখন মনে হয় যে আমার আত্মা স্বাধীনতাসুখ ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াও সে সুখে বঞ্চিত রহিয়াছে, যখন আমার মনে হয় যে আমার আত্মা জগতের অনন্ত শুভ সাধনে সক্ষম হইয়াও দাসত্বের ভীষণ নিগড়ে আবদ্ধ থাকায় জগতের কিছুই করিতে পারিতেছে না, তখন আমার হৃদয়ের যে বলবতী ইচ্ছা স্বাধীনতার দিকে অপ্রতিহত বেগে ধাবিত হয়, তাহার নামে :—

ইতালীর অতীত মহত্ত্বের যে স্মৃতি ও বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থার যে জ্ঞান আমার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহার নামে :—

সংক্ষেপতঃ ইতালীর অসংখ্য অধিবাসী অহরহ যে দারুণ দাসত্ব-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার নামে :—

আমি অমুক,——যাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে যে জগদীশ্বর ইতালীকে জগতের মঙ্গল সাধন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক ইতালীয়েরই কর্ত্তব্য তদুদ্দেশে প্রাণপণ চেষ্টা করা—

—যাহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস, যে ইতালী একটী স্বাধীন জাতিরূপে পরিণত হয় ইহা যখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন তিনি তৎসাধনোপযোগী শক্তি অবশ্যই ইতালীর অভ্যন্তরেই রাখিয়া দিয়াছেন; সেই শক্তির আধার ইতালীর লোকসাধারণ; এবং সেই শক্তি লোকসাধারণের উপকারার্থ লোকসাধারণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই জয় লাভ হইবে—

—যাহার বিশ্বাস যে আত্মত্যাগে ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেই প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং একতা ও লক্ষ্যের অবিচলিততাতেই প্রকৃত বল—

সেই আমি, "নব্য ইতালী" সমাজের—যে নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা আমার সহিত এক মতে, এক বিশ্বাসে ও এক ধর্ম্মে দীক্ষিত ও সম্বদ্ধ—সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া শপথ করিতেছি—

যে ইতালীকে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে—

ইতালীকে একটী সাধারণতান্ত্রিক জাতিতে পরিণত করিতে জন্মের মত এ প্রাণ উৎসর্গ করিলাম। সেই আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে বাক্য, রচনা ও কার্য্যদ্বারা যতদূর সাধ্য, আমার ইতালীয় ভ্রাতৃগণকে "নব্য ইতালীর" লক্ষ্যোপযোগী শিক্ষা প্রদান করিব; যে সমাজবন্ধন "নব্য ইতালীর" অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান উপায় তাহার অনুষ্ঠানে রত থাকিব এবং যে নৈতিক উৎকর্ষ জয় চিরস্থায়ী করিবার একমাত্র নিদান তাহার অনুসরণে কখনই বিরত হইব না।

কখনই অন্য কোন সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইব না। যাঁহারা "নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যদিগের প্রতিভূ, তাঁহারা যখন যাহা আদেশ করি-

বেন, সমাজের লক্ষ্যের সহিত বিসম্বাদী না হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিব; এবং প্রাণ দিয়াও সেই সকল আদেশের গূঢ়তা রক্ষা করিব।

কার্য্য ও পরামর্শ দ্বারা সমাজস্থ ভ্রাতৃগণের সতত সাহায্য করিব।

এই সকল প্রতিজ্ঞাপালনে—এক্ষণে ও অনন্তকালের জন্য—আমার এই জীবন উৎসর্গীকৃত করিলাম।

যদি কখন আমি আমার এই প্রতিজ্ঞাসকলের সমস্ত বা অংশমাত্র ভঙ্গ করি, তাহা হইলে ইন্দ্রের বজ্র যেন আমার মস্তককে চূর্ণীকৃত করে, মানবী ঘৃণা যেন আমাকে পদদলিত করে, এবং মিথ্যাশপথকারীর অক্ষালনীয় কলঙ্ক যেন আমার স্মৃতিকে অনন্তকালের জন্য কলুষিত করে।

ম্যাট্‌সিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই শপথ গ্রহণ করিলেন। ক্রমে অসংখ্য লোক ম্যাট্‌সিনির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। নব্য ইত্যালী সমাজ ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল।

নব্য ইতালী সমাজ ম্যাট্‌সিনির মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা। সুতরাং ইহার কৃতকার্য্যতা সাধনে ম্যাট্‌সিনির যতদূর আগ্রহ ও যত্ন হইবার সম্ভাবনা ততদূর আর কাহারও সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ইহার কৃতকার্য্যতা সাধনের জন্য যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা তৎকালে ম্যাট্‌সিনি ভিন্ন অতি অল্প লোকেরই ছিল। আরও বিপ্লবের সময় অধিনয়ন কার্য্যভার অধিক লোকের হস্তে সমর্পিত থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর শৃঙ্খলা থাকা দুরূহ। এই সকল কারণে ম্যাট্‌সিনি স্বয়ংই ইহার অভিনেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিলেন।

অভিনেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু আপন অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছামত তাঁহার কায করিবার যো ছিল না। কারণ নব্য ইতালী সমাজের মূলভিত্তিস্বরূপ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী দ্বারা তাঁহাকে সতত আবদ্ধ থাকিতে হইত। তিনি সে গুলি হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইলে তাঁহার সহশ্রমীগণ তাহা জানিতে পারিতেন এবং তাঁহার প্রতি অনুযোগ করিতেন; সুতরাং ম্যাট্‌সিনিকে তৎক্ষণাৎ আত্মসংযম ও ভ্রমসংশোধন করিতে হইত।

বস্তুতঃ অভিনেতৃপদে অভিষিক্ত হওয়ায় ম্যাট্‌সিনিকে কষ্টের বোঝাই অধিক বহিতে হইয়াছিল। অপযশ, বাধা, নির্য্যাতন প্রভৃতি তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

তাঁহারা সকলেই প্রায় রিক্তহস্ত ছিলেন। ম্যাট্‌সিনি চারি মাস অন্তর বাটী হইতে জীবনধারণোপযোগী কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইতেন। তিনি তাহা হইতেই যতদূর সাধ্য কিছু বাঁচাইয়া সভার চাঁদা দিতেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগের অবস্থা তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় ছিল। তথাপি তাঁহারা এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া অনন্ত সাগরে ঝাঁপ দিলেন! যদি তাঁহাদিগের মতে কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই অনেকে তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিবেন এবং অর্থ সাহায্য করিবে—এই অনিশ্চিত ভাবী আশার উপর নির্ভর করিয়াই কপর্দ্দক-শূন্য কতিপয় ইতালীয় নির্ব্বাসিত বিপ্লবতরঙ্গে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভারতবাসি! পূর্ব্বপুরুষগৌরবদৃপ্ত! স্বদেশানুরাগাভিমানিন্! যদি দেশের প্রকৃত হিত ইচ্ছা কর, যদি দেশের বিনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চাও, তবে ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের নিকট বিপদে ধৈর্য্য, কার্য্যে অধ্যবসায়, ভবিষ্যতে বিশ্বাস, ও দারিদ্র্যে ত্যাগস্বীকার শিক্ষা কর।

তড়িৎবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

গ্রে সাহেব কর্ত্তৃক শেষোক্ত পরীক্ষিত সত্যটী প্রচারিত হইলে পদার্থবিদ্‌গণ আগ্রহ সহকারে তদনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন। এবং বিবিধ প্রকারে পরীক্ষিত হইয়া সত্যটী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইক্ষণে পরিচালক এবং অপরিচালক বস্তু সমূহের তালিকা প্রস্তুত হইল। আরও নির্দ্দিষ্ট হইল যে, যে সমস্ত পদার্থ তড়িদুত্তেজক (electrics) তাহারাই মন্দ তড়িৎ-পরিচালক; এবং তড়িদনুত্তেজক (non electrics) পদার্থ মাত্রেই উত্তম পরিচা-লক। উত্তরোত্তর আরও পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ হইল যে পদার্থ মাত্রেই ন্যুনাধিক তড়িৎ-সঞ্চালক এবং ধাতু সমস্ত, অম্ল, জল, জীব, উদ্ভিদ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে উত্তম সঞ্চা-লক, এবং কাচ, রেশম, বায়ু, গন্ধক, রঞ্জন, গালা প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে অধম সঞ্চালক।

উক্ত আবিষ্ক্রিয়ার সমকালে ফরাসি রাজ্যের উদ্যানতত্ত্বাবধারক ডুফে (Dufay) দৈব ঘটনা যোগে প্রথম লক্ষ করেন যে তাড়িত তরল দুই বিভিন্ন প্রকার। এক দিবস পরীক্ষা কালীন তিনি এক খানি স্বর্ণ ফলক (gold leaf) ঘর্ষিত কাচ দণ্ড হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একটী লাক্ষা দণ্ড ঘর্ষণ করিয়া, ঐ প্রতিক্ষিপ্ত ফলকের নিকট ধারণ করিলেন। তাহাতে ফলক উত্তেজিত লাক্ষা দণ্ড হইতেও প্রতি-ক্ষিপ্ত না হইয়া তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং উপর্য্যুপরি কয়েকবার ঐ পরীক্ষাটী করিয়া দেখিলেন যে স্বর্ণ ফলক ঘর্ষিত কাচ দণ্ড দ্বারা প্রতিক্ষিপ্ত হইলে পরে ঘর্ষিত লাক্ষাদণ্ড কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইল এবং তদবিপরীত, লাক্ষা কর্ত্তৃক প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া কাচ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইল। সুতরাং তদ্দর্শনে ডুফে অনুমান করিলেন যে উভয়—কাচজ এবং লাক্ষাজ তড়িৎ কখন এক প্রকার হইতে পারে না। তজ্জন্য কাচোদ্ভূত তড়িৎকে তিনি (Vitreous) কাচজ, এবং লাক্ষাস্থিত তড়িৎকে (Resinous) লাক্ষাজ নাম প্রদান করিলেন। তৎকালীন পদার্থবিদ্‌ মাত্রেই উক্ত বিভিন্নতা এবং অভিনব নামদ্বয় স্বীকার করেন।

ঐ সময়ে মানব দেহ হইতে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ উদ্ভাবন দ্বারা কতিপয় তত্ত্ববিৎ জন সাধারণের কৌতুক বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হন। এতদ্দ্বারা তড়িৎ বিদ্যার চর্চ্চাও অনেক বৃদ্ধি হয়। গ্রে সাহেব একটী ছোট বালককে আসন সহিত চুলের দড়ি দ্বারা ঝুলাইয়া একটী কাচ দণ্ড ঘর্ষণ করিয়া বালকের শরীর মধ্যে তড়িৎ প্রদান করেন। তৎপরে তাহার গাত্রের যে

কোন অংশের নিকট গ্রে তাঁহার অঙ্গুলি ধারণ করিলেন, তথা হইতে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ প্রকাশমান হইতে লাগিল। এরূপ প্রত্যক্ষের সামান্য কারণ এই যে জীব দেহ মাত্রই আভ্যন্তরিক রসাধিক্য বশতঃ উত্তম তড়িৎ-পরিচালক; সুতরাং মানব দেহ কোন প্রকারে বিচ্ছিন্নাবস্থায় (insulated) স্থাপিত হইলে তড়িৎ ধারণ-ক্ষম হয়, এবং শরীর-মধ্যগত অতিরিক্ত তড়িৎ ব্যাপ্তভাবে অবস্থিতি করে। তজ্জন্য তড়িৎ-পূর্ণ শরীরের যে কোন স্থানে কোন তড়িদনাক্রান্ত বস্তু ধৃত হয়, তথা হইতে আলোক রূপে তড়িৎ বহির্গত হইয়া ধৃত পদার্থে প্রবেশ করে।

গ্রে সাহেবের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার পর ডুফে স্বয়ং উক্ত প্রকারে আপনার শরীরকে তড়িৎ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এবং তৎকর্ত্তৃক এই সময়ে চুলের দড়ির পরিবর্ত্তে গালার আসন এবং কাচের টুল বিচ্ছেদক রূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে সুবিধা জনক বিচ্ছেদকের আবিস্কার হওয়ায় অনেক কৃতবিদ্য এবং পদার্থবিদ্ ঐ পরীক্ষা দ্বারা আমোদ করিতে লাগিলেন।

আঠার শ শতাব্দিতে জার্মান দেশে কতিপয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববেত্তা পূর্ব্বোক্ত ঘটনা গুলির বিশেষ পর্য্যালোচনা এবং পরীক্ষা আরম্ভ করেন। উইডেন-বর্গের অধ্যাপক বোজ (Boz) সাহেব তড়িৎউদ্ভাবনের সুবিধা হেতু পূর্ব্ব আবিষ্কৃত তড়িৎযন্ত্রের বিশেষ সংস্কার করেন। তিনি গন্ধক বর্ত্তুল যন্ত্রের গন্ধক বর্ত্তুলের পরিবর্ত্তে কাচের বর্ত্তুলের ব্যবহার করিলেন। এবং উৎপন্ন তড়িৎকে পাত্রান্তরে একত্রিত করণাভিপ্রায়ে বর্ত্তুলের সম্মুখে তিনি অপর এক ব্যক্তিকে একটী বিচ্ছেদক টুলের উপর দণ্ডায়মান রাখিতেন। সেই ব্যক্তি একটী ধাতব দণ্ড হস্তে লইয়া বর্ত্তুলের নিকট ধারণ করিত। তাহাতে বর্ত্তুলোৎপন্ন তড়িৎ ঐ দণ্ডে গিয়া জমিত। কিয়ৎকাল এই রূপ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া ক্রমে ঐ ধাতব দণ্ড, যাহা তড়িৎ-যন্ত্রের মূল-পরিচালক (prime conductor of the Electrical machine) নামে অভিহিত হয়, রেশমের সূতা দ্বারা বর্ত্তুলের সম্মুখে দোদুল্যমান রাখিতেন। পূর্ব্ব মত অন্য এক ব্যক্তিকে আর ধরিয়া থাকিতে হইত না। প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ সংগ্রহ করণাভিপ্রায়ে বোজ সাহেব ঐরূপ ৪, ৫টী বর্ত্তুল এককালে ঘূর্ণিত করিয়া তদুৎপন্ন তড়িৎ সমষ্টি একটী মাত্র ধাতব পরিচালকে সঞ্চিত করেন। কথিত আছে এই প্রকারে এত অধিক পরিমাণে তড়িৎ সঞ্চিত হইত যে তাঁহার আঘাতে হস্তাঙ্গুলি হইতে রক্ত পর্য্যন্ত বহির্গত হইত। এবং আপাদ মস্তক সমস্ত শরীরে তাহার সংক্ষোভ-shock-বিলক্ষণ রূপে অনুভূত হইত। অধিকন্তু তাহার আঘাতে ক্ষুদ্র পক্ষির প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইত। যদি ও এরূপ বাহুল্য বর্ণনা বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না, ফলতঃ ঐ যন্ত্রের সাহায্যে যে অধিক পরিমাণে তড়িৎ একত্রিত হইত

এবং তাঁহার কার্য্যও যে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কালের অত্যুৎকৃষ্ট তড়িৎ যন্ত্রের সাহায্যেও উক্ত রূপ বর্ণিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এই সময়ে ইউরোপীয় পদার্থ বিজ্ঞানবিৎগণ দ্বারা তড়িৎ সম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আরব্ধ হয় তন্মধ্যে তড়িৎস্ফুলিঙ্গের দ্বারা দাহ্য পদার্থের প্রজ্বলন সর্ব্বাপেক্ষা জনসাধারণের কৌতুক বর্দ্ধন করিয়াছিল। বার্লিন নগর নিবাসী ডাক্তার লিউডল্‌ফ্‌ (Dr. Ludolph of Berlin) সর্ব্বপ্রথমে এই পরীক্ষা সংসাধন করেন। তৎপরে উহা ইউরোপের অন্যান্য স্থানে অতি অল্পকাল মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তীব্র সুরা (Spirits of wine) এবং ফস্‌ফরাস (Phosphorus), তড়িৎস্ফুলিঙ্গ সংযোগ মাত্রেই প্রজ্বলিত হয় দেখিয়া অপরসাধারণ কি, তত্ত্ববেত্তারাও এরূপ আশ্চর্য্য হইলেন যে তাঁহারা অধিকতর আগ্রহের সহিত পদার্থ বিদ্যার এই শাখার বিশেষ পর্য্যালোচনা এবং পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন। এমন কি এই পরীক্ষাটি এবং তড়িতের অপরাপর আবিষ্কৃত অদ্ভুত কার্য্য সমূহ সমগ্রে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করিয়া কতিপয় তত্ত্ববিদ পণ্ডিত প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন।

তাড়িত তরলের দাহিকা শক্তির আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই লিডেন বোতলের (Leyden phial or jar) আবিষ্কার হয়। ইতিপূর্ব্বাবিষ্কৃত তাবৎ তড়িৎ কার্য্যাপেক্ষা এইটী পরমাশ্চর্য্য। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লিডেন নগর নিবাসী এম্‌ কিউনিয়স (M Cuneus) ইহার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। অধিকাংশ আবিষ্ক্রিয়ার ন্যায় এইটীও আকস্মিক ঘটনা দ্বারা প্রথম সূত্রপাতিত হয়। যন্ত্রযোগে প্রচুর পরিমাণে তড়িদুদ্ভাবন করিয়া, তাহাকে কি উপায়ে পাত্রবিশেষে কিয়ৎক্ষণের জন্য আবদ্ধ রাখা যায়, তদুদ্দেশে অধ্যাপক মসেন্‌ব্রেক (Professor Muschenbrœk) কর্ত্তৃক একটী সুনিপুণ পরীক্ষা কল্পিত হয়। তিনি কল্পনা করেন যে কোন অপরিচালক বস্তুদ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত একটী পরিচালক পদার্থে বহুল পরিমাণে তড়িৎ প্রদান করিলে, তড়িৎ শীঘ্র ইতস্ততঃ বিসৃত (dissipated) হইবে না, এবং তাহার ক্ষমতা ও স্থায়িত্ব যথেষ্ট হইবে। তদভিপ্রেত প্রতিপাদনোদ্দেশে তিনি এই উপায় অবলম্বন করেন। একটী কাচের বোতলকে অর্দ্ধজলপূর্ণ করিয়া ছিপিদ্বারা উত্তম রূপে বদ্ধ করেন। তৎপরে এক লৌহশলাকা লইয়া তাহাকে ছিপি ভেদ করত বোতলস্থ জলসংলগ্ন করিয়া রাখেন। শলাকার কিয়দংশ ছিপির উপরিভাগে বাহিরে রহিল। বোতলসহিত ঐ অংশকে তড়িৎ-যন্ত্রের মূল-পরিচালকের সমীপে স্থাপিত করিয়া বোতলকে তড়িৎপূর্ণ করেন। এই রূপে উক্ত অধ্যাপকের কল্পিত পরীক্ষা প্রণালীটি কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল বটে, এবং বোতল মধ্যে প্রভূত

তড়িৎ সঞ্চিতও হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বোতলের বহির্গাত্র কোন পরিচালক বস্তুদ্বারা বেষ্টিত না করাতে, তিনি তন্মধ্যস্থ তড়িতের সত্ত্বা কিছুমাত্র উপলব্ধি করেন নাই, অর্থাৎ তড়িৎ কোন রূপে প্রকাশমান বা কার্য্যকর হয় নাই। কিউনিয়স উক্ত অধ্যাপকের অনুকরণে ঐ পরীক্ষা সাধন করিতে গিয়া, দৈব ক্রমে এক হাতে বোতলটি ধরিয়া অপর হাতদ্বারা যেমন লৌহশলাকা তড়িৎ যন্ত্র-পরিচালক হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন, অমনি বাহুদ্বয়ে গুরুতর সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়েন। ইহার পর অধ্যাপক স্বয়ং এই পরীক্ষা উক্তরূপে করিয়াছিলেন। তাহাতে অন্যতর কোনও ফল প্রাপ্ত হন নাই। এই সময় হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত তত্ত্ববেত্তাগণ লিডেন বোতলকে একহস্তে ধারণ করিয়া তাহার পরীক্ষা সমস্ত করিতে থাকেন। কিন্তু এপ্রকারে ধৃত হইলেই যে বোতল কার্য্যকর হইবে নচেৎ হইবে না তাহার প্রকৃত কারণানুসন্ধানে তৎকালীক কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই। কেহ কেহ বলেন যে কিউনিয়সের পূর্ব্বে ভন ক্লিষ্ট—Von Kleist—নামক জনৈক জার্মান ধর্ম্ম-প্রচারক লিডেন বোতলের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। অধিকন্তু তিনি তদ্দ্বারা সুরা প্রজ্বলন প্রভৃতি তড়িতের অপরাপর অদ্ভুত কার্য্য গুলির পরীক্ষাও করেন। কিন্তু তিনিও লিডেন বোতলের প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণে সক্ষম হন নাই।

লিডেন বোতলের কার্য্য দর্শনে অপর সাধারণে স্বভাবতই প্রথমতঃ অত্যাশ্চর্য্যা হইয়াছিল। অনেকানেক সুবিজ্ঞ তড়িৎবেত্তাগণের ও মন এরূপ আকৃষ্ট হয় যে তাঁহারা বোতলের সংক্ষোভণী শক্তির এবম্প্রকার বাহুল্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যে সেরূপ ফল তৎকালীন সামান্য এবং অসম্পূর্ণ বোতল হইতে কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। অধ্যাপক মাসেনব্রেক বলেন, যে লিডেন বোতল হইতে তিনি বাহুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, এবং স্কন্ধ দেশে এরূপ কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হন যে তদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষণেক শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, ও দুই দিবস তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। সমস্ত ফরাসী রাজ্য পাইলে ও তিনি দ্বিতীয় বার বোতলের সংক্ষোভ লইবেন না। এলামণ্ড (Allamond) নামক উক্ত অধ্যাপকের জনৈক সহকারী পরীক্ষক কহেন, যে তিনি বোতলের সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং দক্ষিণ হস্তে বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন। লিপজিক নিবাসী অধ্যাপক উইঙ্কলার (Professor Winckler of Leipsic) বলেন, যে প্রথমবার লিডেন বোতলের সংক্ষোভ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সমস্ত শরীর ও শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, মস্তকে এক বৃহৎ প্রস্তরের ভার অনুভূত হয়, এবং নাসারন্ধ্র দিয়া শোণিত মোক্ষণ হয়।

উক্ত ভয়াবহ বর্ণনা সমূহ প্রচারিত হইলেও অনেকে কৌতূহল পরবশ হইয়া

লিডেন বোতলের কার্য্য দর্শনে এবং তাহার সংক্ষোভ অনুভব করণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ক্রমে বোতলটী অর্থ উপার্জ্জনের এক সুন্দর উপায় হইয়া দাঁড়াইল। ইউরোপের প্রায় সর্ব্বস্থানে অর্দ্ধ শিক্ষিত মধ্যবিৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে লিডেন বোতল, তড়িৎযন্ত্র, এবং তাহার উপকরণসামগ্রী সমস্ত সঙ্গে লইয়া পথে পথে এবং বাটী বাটী ভ্রমণ করিয়া তড়িতের বিস্ময়কর পরীক্ষা গুলি প্রদর্শন দ্বারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। তত্ত্ববিশারদগণ ও ঐ সময়ে লিডেন বোতলের গুণ সমূহের সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করেন। বোতলের কার্য্যকারিতার উপযোগী অবস্থা সমস্ত আরও স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইল। অনেক অভিনব তত্ত্বও নির্ণীত হইল। কিন্তু তত্তাবতের যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হয় তৎসমুদয় ভ্রমসঙ্কুল। যন্ত্রটির গঠনের ও অনেকাংশে উন্নতি হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্তায়তন বোতল ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এবং তাহার অন্তর ও বহির্গাত্র ধাতবফলক দ্বারা মণ্ডিত (coated) হয়। অন্তরফলক (inside coating) জলের এবং বহিফলক হস্তের পরিবর্ত্তে প্রবর্ত্তিত হইল।

এই সময়ে তড়িতের প্রচণ্ড বল এবং অসামান্য বেগশালীতা প্রকাশক নানাবিধ পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ফরাসীরাজসমক্ষে তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে ১৮০ জন প্রত্যেকে অপরের হস্ত ধারণ করত অবিচ্ছিন্ন ভাবে দাঁড়াইয়া ও এক প্রান্তস্থ ব্যক্তি বোতলের বহির্দেশ এবং অপর প্রান্তস্থ ব্যক্তি বোতলস্থ ধাতব ফলকসংলগ্ন লৌহতার স্পর্শ করিয়া, তাৎক্ষণিক—instantaneous—সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়।

অনেকে কতিপয় লিডেন বোতল একত্রে সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে তাড়িৎ বল সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং দেখিলেন যে, এবম্প্রকারোদ্ভূত তড়িৎ দ্বারা সর্ব্ব প্রকার দাহ্য পদার্থ প্রজ্বলিত, স্বর্ণতার ও ফলক বিগলিত এবং ক্ষুদ্র জীবের প্রাণনাশ হয়। ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন উক্ত প্রকার কতিপয় লিডেন বোতলের যোগে ৬ জন ব্যক্তিকে এককালে ভূতলশায়ী করেন। তিনি স্বয়ংও অনেক বার তাহার সংক্ষোভ প্রাপ্ত হন। এবং তদ্দ্বারা তিনি লৌহদণ্ডে চৌম্বকীয় গুণ-প্রদান করেন।

ইহার পর ডাক্তার ওয়াটসন্—Dr Watson—; লর্ড, সি, ক্যাভেনডিস্—Lord C. Cavendish—প্রভৃতি কতিপয় তত্ত্বজ্ঞ তড়িৎ-প্রবাহের বেগ নির্দ্ধারণোদ্দেশে বিবিধ পরীক্ষা সংসাধন করেন। তন্মধ্যে একটী পরীক্ষায় টেম্‌স্—Tames—নদীর পারাপারে তড়িৎ স্রোত সঞ্চালিত হয়। এবং অপর একটীতে ক্রোশ পরিমাণ লম্বিত তারের ও ক্রোশ বিস্তৃত শুষ্ক ভূমির মধ্য দিয়া তাৎক্ষণিক তড়িতোদ্গম লক্ষিত হয়। এই রূপে পৃথিবীর তড়িৎ সঞ্চালকত্ব শক্তির আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা তড়িৎ

বার্ত্তাবহ সম্বন্ধে আমাদিগের একটী মহোপকার সংসাধিত হইয়াছে।

লিডেন বোতলের প্রক্রিয়ার গুঢ় কারণ সম্বন্ধে বিবিধ ভ্রান্তমত প্রকটিত হয়। অবশেষে ফ্রাঙ্কলিন বহুয়াসে যন্ত্র যোগে পরীক্ষা দ্বারা লিডেন বোতলের প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্য সমূহের নিয়মাবলীর বাস্তবিকতা সপ্রমাণ করেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেন যে বোতল পৃথিবীর সহিত সংস্পৃষ্ট ভাবে রক্ষিত না হইলে তাহাকে কখনও তড়িৎ-পূর্ণ করা যায় না। এবং বোতলমধ্যস্থ ও তৎবহির্গাত্রস্থ তড়িৎ দুইটী বিভিন্ন প্রকার। বোতল মধ্যে যে পরিমাণে ও যে বর্ণের তড়িৎ প্রদত্ত হইবে, তাহার বহির্দ্দেশ হইতে সেই পরিমাণে অপর বর্ণ তড়িৎ বোতল সংস্পৃষ্ট কোন পরিচালক দ্বারা পৃথিবীতে তাড়িত হইবে। বোতল পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্নাবস্থায় স্থাপিত হইলে তাহাকে কখনও তড়িদাক্রান্ত করা যায় না। সেই জন্য তাহার বাহ্যদেশ হইতে কোন পরিচালক পদার্থ পৃথিবী সংলগ্ন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

তড়িদাক্রান্ত লিডেন বোতলের অবস্থা সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিনের মত এই যে বোতলের অভ্যন্তর ঘর্ষিত কাচ দ্বারা অর্থাৎ কাচজ তড়িৎপূর্ণ করিলে বোতলের বহির্ভাগ ও সেই পরিমাণে তদ্বিপরীত অর্থাৎ লাক্ষাজ তড়িৎপূর্ণ হইবে। এই দ্বিবিধ তড়িৎ পরস্পর আকর্ষণ শীল। কিন্তু উভয়ের মধ্যস্থিত অপরিচালক কাচ ও চতুর্দ্দিগস্থ বায়ু ব্যবধান থাকায় উভয়ে মিলিত হইতে না পারিয়া পৃথক অবস্থায় অবস্থান করে। এবং বোতলের অন্তর ও বহির্দ্দেশ কোন পরিচালক বস্তু দ্বারা পরস্পরের যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী করিয়া দিলে উক্ত তড়িৎদ্বয় বেগে অগ্রসর হইয়া পরস্পর মিলিত হয় এবং উভয়েই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই রূপে লিডেন বোতলের কার্য্য সমস্ত সংঘটিত হয়।

ফ্রাঙ্কলিন আরও নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ করেন যে লিডেন বোতলাভ্যন্তরস্থ তড়িৎ বোতলের কাচের উপরিভাগে অবস্থিতি করে; ধাতব ফলকে নহে। যে ধাতব ফলক দ্বারা বোতলের ভিতর দিকের কাচ মণ্ডিত থাকে তন্মধ্যে তড়িৎ সঞ্চিত হয় না। তদ্দ্বারা কেবল কাচোপরি বিস্তৃত তড়িৎ রাশী সঞ্চালিত হইয়া একটী বিন্দুতে একত্রীভূত হয়। ইহার বাস্তবিকতা তিনি একটী সুন্দর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করেন। একটী ধাতব পাত লইয়া তাহাকে আটা দ্বারা বোতলাভ্যন্তর মণ্ডিত না করিয়া পৃথক এবং আল্‌গা ভাবে তন্মধ্যে স্থাপিত করেন। তৎপরে বোতলকে তড়িদাক্রান্ত করিয়া উক্ত পাত বাহির করিয়া লইয়া তদপরিবর্ত্তে অন্য একটী পাত সেই স্থানে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে বোতলস্থ তড়িতের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

লিডেন বোতল সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিন যে

সহজ ও সুন্দর মতটী প্রকাশ করেন তদ্দারা তড়িৎতত্ত্বের একটী মহৎ সত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি অনুমান করেন যে কাচ প্রভৃতি তাড়িত পদার্থের (Electrics) ঘর্ষণ দ্বারা অতিরিক্ত তড়িৎ উদ্ভূত হয় না। ঘর্ষণ দ্বারা তদ্বস্তুগত সহজাবস্থ তড়িতের সাম্যাবস্থা (Equilibrum) নষ্ট হয়। তাহা হইলে পদার্থ বিশেষে কেহ সহজাবস্থাপেক্ষা কম কেহ বা অধিক তড়িদাক্রান্ত হয়। এই ন্যূনতা এবং অধিকতর অবস্থাদ্বয় বিয়োগিক ও যৌগিক সংজ্ঞাদ্বয় দ্বারা আখ্যাত। সুতরাং এ মতানুসারে এক প্রকার তাড়িত তরলের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়া থাকে। তিনি আরও প্রতিপন্ন করেন যে তাড়িত তরলের পরমাণু সমস্ত পরস্পর বিয়োজনশীল(repulsive) তজ্জন্য সমান বর্ণ তড়িদাক্রান্ত দুইটী পদার্থ পরস্পরকে প্রতিক্ষেপণ করে। অসমান বর্ণ তড়িদাক্রান্ত দুই বস্তু অর্থাৎ একটী সহজাবস্থাপেক্ষা অধিক ও অপরটি কম তড়িৎ যুক্ত পরস্পরের সমীপবর্ত্তী হইলে যৌগিক তড়িৎ অপরটীতে গিয়া মিশিয়া উভয়ের সাম্যাবস্থায় সংস্থাপন করণের একটি আসক্তি প্রাপ্ত হয়। ঐ আসক্তির বেগকে আকর্ষণ কহে। তন্নিমিত্ত দুইটি অসমান বর্ণ তড়িদাক্রান্ত বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

ফ্রাঙ্কলিনের উক্ত মতানুসারে যদিও অধিকাংশ তড়িৎ প্রত্যক্ষ (phenomena) সহজে বোধগম্য হয় বটে, কিন্তু অন্যতর সংস্কৃত মত তৎপরে প্রচারিত হওয়ায় উহা অধুনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই মতের বিষয় যথা স্থানে উল্লেখ করা যাইবে। [ক্রমশঃ—

শ্রীঅঃ—

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মুলতানে যুদ্ধ উপস্থিত করিবার জন্য কে দায়ী? কাহার দোষে অনন্তপ্রবাহ নরশোণিতে মুলতান প্লাবিত হইল? কে যুদ্ধ-মাদকতায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া দিনের জন্য নয়, মাসের জন্য নয়, জীবনের তরে হতভাগ্য মুলরাজকে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাসিত করিল? আমরা অতীত সাক্ষী ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিয়া এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিব। মুলতানঘটিত গোলযোগের আদ্যোপান্ত বিবরণ আলোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, মুলরাজ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় পদোচিত বীরতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ধীরভাবে লাহোর দরবারে স্বীয় অবস্থা জানাইলেন, ধীরভাবে ব্রিটীষ রেসিডেন্টের নিকট সুবিচারের প্রার্থনা করিলেন, এবং পরিশেষে তাহার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া ধীর-

ভাবে স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন শাসন কর্ত্তার হস্তে মুলতানের শাসন ভার সমর্পণ করিলেন। এরূপ ধীরতা কখন বিশ্বাসঘাতকতার জননী হইতে পারে না, এরূপ সরলতা হইতেও কখনও দুরভিসন্ধি বাহির হয় না। মুলরাজ দুর্গের সহিত সর্দ্দার খান সিংহ মানের হস্তে যুদ্ধোপযোগী কামান ইত্যাদিও সমর্পণ করিয়াছিলেন, * যদি মুলরাজ রণমদে মাতিয়া উঠিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনও ধীরভাবে কামান ইত্যাদি প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে সমর্পণ করিতেন না। যে দুইজন ব্রিটীষ্ কর্ম্মচারী দুর্গ মধ্যে সাংঘাতিক রূপে আহত হয়েন, মুলরাজ তাঁহাদিগের প্রতি বরাবর ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। ভ্যানস্ আগ্ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, মুলরাজের কোন দুষ্টাভিসন্ধিতে তাঁহারা আহত হয়েন নাই †। মুলরাজের সদাশয়তার এরূপ বলবৎ প্রমাণ থাকাতেও কেবল সার্ ফ্রেডরিক কারির অব্যবস্থিততায় মুলতানে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সার ফ্রেডরিক মুলরাজের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার নিকট দশ বৎসরের হিসাব চাহিলেন; মুলরাজ উত্তর দিলেন, "আমি কি প্রকারে পিতৃঠাকুরের কাগজাত দাখিল করিব। তৎসমুদয় কীট-দষ্ট অথবা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।" এই কথা শেষ হইবার পরক্ষণেই মুলরাজের হৃদয় ঘোর নৈরাশ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, ধমনী মধ্যে রক্তের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল, রেসিডেণ্টকে স্বীয় অবশ্যম্ভাবি পতনের অধিনায়ক ভাবিয়া মনঃক্ষুণ্ণ শাসনকর্ত্তা পুনর্ব্বার নম্রভাবে কহিলেন "আমি আপনার মুষ্টি মধ্যেই আছি-*"। মুলরাজের এই শেষোক্ত উক্তি শ্রবণে কে তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ধিক্কার দিবে? কে তাঁহাকে বিপ্লবকারী বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান অপলাপ করিবে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ উদারতা, এইরূপ নম্রতা দর্শনেও সার ফ্রেডরিক কারির হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়া রহিল, তিনি মুলরাজের সর্ব্বনাশ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না; ভ্যান্স্ আগ্ ও আণ্ডার্সন মুলতানবাসিগণের রণমত্ততায় নিহত হইলেন। ভ্যান্স্ আগ্

* Herbert Edwardes—A year on the Panjab Frontier. Vol II.

† ভ্যান্স্ আগ্ আহত হইয়াই লাহোরে সার্ ফ্রেডরিক কারির নিকট একখানি পত্র লিখেন; তাহাতে এই উদার বাক্যটী ছিল:—"আমার বোধ হয় না মুলরাজ ইহার মধ্যে আছেন।" Herbert Edwardes—A year on the Punjab Frontier. Vol II.

* Torrens—Empire in Asia P. 338.

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মুলরাজকে নির্দ্দোষী বলিয়া সার ফেড্রিকের নিকট পত্র লিখিলেন, তথাপি সার ফেড্রিক কারি মুলরাজের স্কন্ধে সমুদয় দোষ ভার চাপাইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে এক দল বৃটীষ সৈন্য পাঠাইলেন। প্রধান সেনাপতি ও গবর্ণর জেনরলের পুনঃ পুনঃ নিষেধবাক্যেও তিনি নিরস্ত হইলেন না। সার ফেড্রিক কারি কে? দেওয়ানী কার্য্যের এক জন রণমূর্খ কর্ম্মচারী মাত্র। আর লর্ড গফ্ কে? সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের সুবিস্তীর্ণ সৈন্যসমষ্টির সর্ব্ব প্রধান অধিনায়ক। (৪) এক জন যুদ্ধানভিজ্ঞ দেওয়ানি কর্ম্মচারী অনায়াসে এই রণপণ্ডিত অধিনায়কের বাক্য পদদলিত করিয়া মুলরাজকে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া আহ্বান করিলেন!! বৃটীষ কার্য্য এই রূপ অনন্ত বিষয়ের অনন্ত স্বেচ্ছাচারিতায় পরিপূর্ণ। বৃটিষ ইণ্ডিয়া এইরূপ অনন্ত লোভ, অনন্ত দৌরাত্ম্য ও অনন্ত কৌশলে অর্জ্জিত।

বৃটিষ সৈন্য দলবদ্ধ হইয়া মুলতানে আসিলে মুলরাজ যখন বীর বেশ ধারণ করিলেন, তখনও আমরা তাঁহাকে দূষিতে পারি না। ব্রিটীষ রেসিডেন্টের রণকণ্ডূয়ন যখন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল, তখনই মুলরাজ আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; ইহা প্রকৃত বীর পুরুষের লক্ষণ। যিনি কুক্কুরবৎ বারম্বার প্রহৃত ও অপমানিত হইয়াও প্রহার ও অপমানকর্ত্তার পদলেহনে প্রবৃত্ত হয়েন, আমরা তাঁহাকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া শত হস্ত দূর হইতে ধিক্কার দিই। ইতিহাসে এরূপ কুক্কুরের সংখ্যা যত কমে, ততই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সংস্থাপিত হয়।

মুলতানে যুদ্ধ উপস্থিত হইবার প্রাক্কালে লাহোর-দরবার ব্রিটীষ রাজনীতি অথবা চাতুরীর কয়েকটী তরঙ্গে পুনর্ব্বার দোলায়িত হইতে আরম্ভ হয়। আমরা পূর্ব্বে মুলরাজের হাঙ্গামাকে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু এই রাজনীতিতেই উহার প্রধান কারণ নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই কয়েকটী ধরিতে হয়:— পঞ্জাব হইতে মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন, মহারাজ দলীপ সিংহের বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিতে ব্রিটীষ রেসিডেণ্টের অমত এবং সর্দ্দার ছত্র সিংহের প্রতি কাপ্তেন আবট্ ও রেসিডেণ্টের দুর্ব্ব্যবহার (৫)।

মহারাণী ঝিন্দনকে যেরূপ নিষ্ঠুরতার

(৪) Sir charles James Napier—Defects in the Indian government, p. 222.

(৫) Major Evans Bell—Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 102. Comp: Torrens—Empire in Asia.

সহিত পঞ্জাব হইতে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত করা হয়, তাহা পূর্ব্বে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। খালসা সৈন্যগণ যাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিত, তাঁহার এইরূপ শোচনীয় নির্ব্বাসনে তাহাদিগের হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। শিখ সেনাপতি সের সিংহ রাজ্ঞী ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে ইংরেজচরিত্রের প্রতি নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শন করিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করেন, "ইহা সকলেই ভাল রূপে জানিতে পারিয়াছেন, সমস্ত পঞ্জাববাসী, সমস্ত শিখ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত পৃথিবীর বিদিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গিগণ কিরূপ দৌরাত্ম্য, অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে পরলোক-সুখ-ভোগী রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষীর সহিত ব্যবহার করিয়াছে। তাঁহারা সমস্ত প্রজার মাতা স্বরূপ মহারাণীকে কারারুদ্ধ ও হিন্দুস্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিতেও ত্রুটী করে নাই (৬)।"

কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁও মহারাণী ঝিন্দনের প্রতি ইংরেজদিগের দুর্ব্ব্যবহার শিখদিগের অসন্তুষ্টির একটী প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি কাপ্তেন আবট্কে যে পত্র লিখেন, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, "মহারাজ দলীপ সিংহের মাতা ঝিন্দনকে কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত করাতে সমস্ত শিখ জাতি দিন্ন দিন অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে" (৭)। অধিক কি, স্বয়ং সার ফ্রেডরিক কারিও ১৮৪৮ অব্দের ২৫এ মে তারিখে এই বিষয় প্রসঙ্গে গবর্ণর জেনারেলকে লিখিয়াছিলেনঃ—"সেনাপতি সের সিংহের শিবির হইতে সম্বাদ আসিয়াছে, মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন শুনিয়া খালসা সৈন্য নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ঝিন্দন খালসাদিগের মাতৃ-স্থানীয় ছিলেন, তিনি যখন নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, এবং মহারাজ দলীপসিংহ যখন ইংরেজদিগের হাতে আছেন, তখন তাহারা কখনই মূলরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না" (৮)। এই সর্ব্বজনীন বিরাগের মূল কারণ কে? কাহার দোষে সমস্ত পঞ্জাব এই রূপ সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে সার ফ্রেডরিক কারিকেই নির্দ্দেশ করিতেছি। সার ফ্রেডরিক প্রতিনিধি সভার সম্পূর্ণ অমতে কেবল গবর্ণর জেনরলের লিখিত অনুমতি লইয়া মহারাণী ঝিন্দনকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন (৯)!! যিনি চিরদিন ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের সহিত

(৬) Retrospects and prospects of Indian policy. P. 108 comp: Panjab Papers, 1849, p. 392.

(৭) Panjab Papers, 1849, p. 512 comp: Restrospects. p. 108.

(৮) Panjab Papers. 1849, p. 179. Retrospects 108.

(৯) Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 103.

বন্ধুতা-সূত্রে নিবদ্ধ ছিলেন, চিরদিন যাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার দেখাইয়া আসিয়াছিলেন, অদ্য ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট সেই প্রিয়বন্ধু রণজিৎ সিংহের বিধবা পত্নীকে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপরিচিত অজ্ঞাত স্থানে নির্ব্বাসিত করিলেন!! সৌহার্দ্দের কি বিড়ম্বনা!! বন্ধুতার কি শোচনীয় পরিণাম (১০)!!

কে প্রভৃতি বিলাতীয় ইতিহাস-লেখকগণ বলিয়াছেন, মহারাণী ঝিন্দন গোপনে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি এই রূপ নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত হইয়াছিল (১১)। সার ফ্রেডরিক কারি এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতেও ঝিন্দনের প্রতি এই দোষ আরোপিত হয় (১২)। কিন্তু টরেন্স প্রভৃতি অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকগণ বলেন, যখন রেসিডেণ্টের আদেশে মহারাণীর কাগজাত ও অন্যান্য জিনিষ পত্রের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, তখন তাহার মধ্যে ষড়যন্ত্র অথবা দুরভিসন্ধি-জ্ঞাপক কিছুই পাওয়া গেল না (১৩)। এবিষয়ে সার ফ্রেডরিক কারিও স্বয়ং বলিয়াছেন, "যদিও ঝিন্দনের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে না, তথাপি যেরূপ বোধ হইতেছে, তাহাতে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের সম্মান ও মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য এ বিষয়ে আর আমাদিগের সন্দেহ-দোলায়মান হইবার অবকাশ নাই"। (১৪)। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় সার্ ফ্রেডরিক কারি মহারাণী ঝিন্দনকে নির্ব্বাসিত করিয়া নাবালক মহারাজ দলীপ সিংহকে হাতে রাখিয়া সুবিস্তীর্ণ পঞ্জাব রাজ্য উদরসাৎ করিতেই কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ন্যায় ও সন্নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া এরূপ অত্যাচার করা পঞ্জাবের ইতিহাসে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের একটী দুরপনেয় কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে।

ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট, মহারাণী ঝিন্দনকে কেবল নির্ব্বাসিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বার্ষিক বৃত্তিও ন্যূনতর করিয়া দিয়াছিলেন। বাইরাওল সন্ধির নিয়মানুসারে ঝিন্দনের বার্ষিক বৃত্তি ১,৫০,০০০ টাকা নিরূপিত হইয়াছিল। সেখপুরে কারারোধের সময় উহা কমাইয়া ৪৮০০০ টাকা করা হয়। পরিশেষে বারাণসীতে নির্ব্বাসন সময়ে লেখনীর আর এক আঘাতে ৪৮ সহস্রের অঙ্ক দ্বাদশ সহস্রে পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত কারাবন্দিনী বলিয়া ব্রিটীষ রেসিডেণ্ট ঝিন্দনের সমুদয় অলঙ্কার

(১০) Ibid. p. 106.

(১১) History of the Sepoy War, Vol I. p. 30.

(১২) Retrospects p. 104. Panjab Papers, 1849, p. 168.

(১৩) Empire in Asia, p. 343 Retrospects. p. 107—108.

(১৪) Empire in Asia, p. 342.

সম্পত্তি ও রাজ্যেয়াপ্ত করেন (১৫)। এইরূপে রাজবনিতা ও রাজমাতার প্রতি অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখান হইল, এইরূপে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের প্রথম কারণ ইতিহাস-হৃদয়ে স্থান পরিগ্রহ করিল। রণজিৎ-রাজ্যের সকলেই মহারাণীর এই নির্ব্বাসন আপনাদিগের জাতীয় অবমাননা এবং মহারাজ দলীপ সিংহের সিংহাসন-চ্যুতি ও পঞ্জাবরাজ্য-বিধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করিল (১৬)। যে রণজিৎসিংহের জীবিত সময়ে ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্ট মিত্রভাবে হৃদয়ের সারল্য দেখাইয়া আসিতেছিলেন, সেই রণজিৎ সিংহের অবর্ত্তমানে তদীয় পত্নী ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে নির্ব্বাসিত ও কারারুদ্ধ হইলেন। অদ্য রণজিৎমহিষী ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের কারাবন্দিনী, অদ্য রণজিৎ তনয় ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের ক্রীড়া-পুত্তল। জগৎ এরূপ মিত্রদ্রোহিতা কখনও মার্জ্জনা করিবে না, ঐতিহাসিকগণও ন্যায়ের অনুরোধে, সত্যের অনুরোধে কখনও এরূপ অত্যাচারের প্রশ্রয় দিবেন না।

(১৫) Empire in Asia, p. 343 Comp: Retrospects and prospects of Indian Policy p.p. 106-107, 107, 108. Comp: Panjab Papers, 1849, p p 235, 236.

(১৬) Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 109.

শিখ যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ দলীপসিংহের বিবাহের দিন ঠিক করিতে ব্রিটীষ্ রেসিডেণ্টের অমত। সর্দ্দার ছত্রসিংহ হাজরার শাসন কর্ত্তা ছিলেন। বয়োবৃদ্ধ ও গুণ-বৃদ্ধ বলিয়া শিখ-সমিতিতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র শিখসেনাপতি সেরসিংহও উদার-প্রকৃতি ও রণবিশারদ ছিলেন। মহারাজ দলীপসিংহের সহিত এই সর্দ্দার ছত্রসিংহের দুহিতা অথবা সেরসিংহের ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। সম্বন্ধকর্ত্তা বিবাহের দিন ঠিক করিতে লাহোর দরবারে রেসিডেণ্টের নিকট যথাবিধি আবেদন করেন। সেনাপতি সেরসিংহ মেজর এড্-ওয়ার্ডিসের সাহায্যার্থ মুলতানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, ভগিনীর বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার সহিত এড্ওয়ার্ডিসের অনেক কথাবার্ত্তা হয়। এড্ওয়ার্ডিস্ রণদক্ষতার সহিত প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতায় অলংকৃত ছিলেন। তিনি ২৮এ জুলাই প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আবেদনের সমর্থন ও সর্দ্দার সের সিংহের অভিপ্রায় বিবৃত করিয়া রেসিডেণ্টের নিকট এক খানি পত্র লিখেন (১৭)। পত্রে উল্লেখ থাকিল, "এক্ষণে সকলেই প্রকাশ করিতেছে, ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট" শীঘ্রই বর্ত্তমান গোলযোগ ও সৈন্যগণের অসদ্ব্যবহারের কারণ দর্শাইয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করিবেন, এই সময়ে যদি মহা-

(১৭) Empire in Asia, p. 343—344.

রাজকে একটী মহারাণীর সহিত সংযোজিত করা হয়, তাহা হইলে সন্ধি রক্ষা করিতে বৃটীষ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্ন আছে বলিয়া সাধারণের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিতে পারে। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ লোকের মন আশ্বস্ত হইবে।” (১৮) সার ফেডরিক কারি এই পত্র পাইয়া বিলক্ষণ মৌখিক শিষ্টাচার দেখাইলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, দরবারের সদস্যবর্গের সহিত এ বিষযে পরমার্শ কবিবেন; স্বীকার করিলেন, বৃটীষ গবর্ণমেণ্ট মহারাজ, তাঁহার বিবাহ-পাত্রী এবং পরিবারবর্গের সম্মান ও সুখ বর্দ্ধন করিতে বিলক্ষণ সমুৎসুক আছেন (১৯)। কিন্তু তিনি মেকিয়াভেলির যে কূট মন্ত্রণায় দীক্ষিত ছিলেন, এরূপ শিষ্টাচারেও তাহা গোপনে রহিল না। মেকিয়া ভেলির মন্ত্রশিষ্য পুনর্ব্বার অনুন্নেয় বাজনীতির চাতুরী খেলাইয়া লিখিলেন, “দলীপ সিংহের বিবাহ দিলেই যে, পঞ্জাবে আমাদিগের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইবে, তাহা আমার বোধ হইতেছে না। কন্যা পক্ষ ও দরবারের সুবিধা অনুসারে যে সময়েই হউক, মহারাজের বিবাহ হইতে পারে; এ বিষয়ে আমার কোনআপত্তি নাই (২০)।” যাঁহারা সরল-প্রকৃতি, হৃদয়ের স্তরে স্তরে যাঁহাদিগের সারল্য লীলা করিয়া বেড়াইতেছে; তাঁহারা আপনাদিগের ন্যায় রেসিডেণ্টের এই লিখন-ভঙ্গীতেও সরলতা দেখিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বোধ্য রাজনীতির রহস্যোদ্ভেদে সক্ষম, যাঁহাদিগের মস্তিষ্কের সজীবতায় মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সংসার-বিরাগী উদাসীন, বেশে বনে বনে বেড়াইছেন; পক্ষান্তরে সংসার বিবাগী উদাসীন ব্যক্তি মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীর পদে সমাসীন হইয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে শাসন দণ্ড চালনা করিতেছেন; “তন্তুবায় কর-সঞ্চালিত তুরীর ন্যায় একবার এক রাজ্য একের করতলস্থ হইতেছে, পুনর্ব্বার তাহা অপরের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে;” তাঁহারা অনায়াসেই উক্ত লিখন-ভঙ্গীতে রেসিডেণ্টের হৃদয়ের তরঙ্গাবর্ত্ত দেখিয়া ঈষদ্ধাস্য করিবেন। বুঝিতে পারিবেন, রেসিডেণ্ট প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দিয়া তেজস্বী সের সিংহকে দলীপ সিংহের ঘনিষ্ঠ হইতেও ঘনিষ্ঠ করিতে সম্মত নহেন; বুঝিতে পারিবেন, দলীপ সিংহের বিবাহ সমাধা করিতে এখনও লাহোর দরবারের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। সুতরাং শিখ-হস্ত হইতে পঞ্জাবের পতন অবশ্যম্ভাবি। অদ্য যাহা রণজিৎ-রাজ্য

(১৮) Ibid. p. 344

(১৯) Retrospects, p. 111. Comp: Empire in Asia, p. 366.

(২০) Retrospescts and prospects of Indian Policy p. 111—112. Panjab papers. 1849 p p 272. 273. Comp: Empire in Asia, p. 344.

বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছে, কল্য তাহা ব্রিটীষ্ ইণ্ডিয়ার লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ব্রিটীষ্ ভাব, ব্রিটীষ্ আচার ও ব্রিটীষ্ নীতিতে পরিণত হইবে।

কঠোর-প্রকৃতি রেসিডেণ্টের এই কঠোর উত্তর মুলতানে পৌঁছিল। হাববার্ট এড্‌ওয়ার্ডিস্ উত্তর পাইয়া সর্দ্দার সের সিংহকে জানাইলেন, সের সিংহ উহা আবার হাজরাতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার নিকট লিখিলেন। সর্দ্দার চত্র সিংহ ইহার পূর্ব্বেই মহারাণী ঝিন্দনের কারারোধ দেখিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে রেসিডেণ্টের দুর্ম্মতি বশতঃ তনয়ার বিবাহের গোলযোগ দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, রেসিডেণ্ট গোপনে গোপনে যেরূপ আট ঘাট বান্ধিতেছেন; তাহাতে শীঘ্রই পঞ্জাব কোম্পানীর মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইবে। তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাতে স্বদেশবৎসল বৃদ্ধ শিখ সর্দ্দারের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি প্রিয়তম জন্ম ভূমিকে এই আশঙ্কিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন গুরুগোবিন্দ-সিংহের মন্ত্রপূত শেষ রক্ত-বিন্দু তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত থাকিবে, ততদিন তিনি পঞ্জাবের স্বাধীনতা বজায় রাখিবেন। এইরূপ ক্ষুব্ধ-হৃদয়, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও সর্দ্দার ছত্র সিংহ ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। তিনি সন্ধির নিয়ম যথাবৎ রক্ষা করিতে বরাবর প্রয়াস পাইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ব্রিটীষ্ সিংহের অব্যবস্থিততা ও অবিচারে এই প্রয়াস সফল হইল না। প্রত্যুত ছত্র সিংহ উহার চাতুরী-জালে জড়িত হইয়া ঘোরতর অপদস্থ ও অপমানিত হইলেন; এই অপদস্থতা ও অপমানই দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের তৃতীয় ও সর্ব্বশেষ কারণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সর্দ্দার ছত্র সিংহ হাজরার শাসন কর্ত্তা ছিলেন। কাপ্তেন আবট্ নামক জনৈক ব্রিটীষ্ সৈনিক, রেসিডেণ্টের সহকারী রূপে তথায় তাঁহার ব্যবস্থা ও মন্ত্রণা দাতা হয়েন। কাপ্তেন আবট্ নিতান্ত সন্দিগ্ধ ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। অনুচিত বিদ্বেষ-ভাব তাঁহার হৃদয় এরূপ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি এদেশীয় সকলকেই বিষ নয়নে চাহিয়া দেখিতেন। বর্ত্তমান বর্ণনীয় ঘটনার এক বৎসর পূর্ব্বে আবট্ দেওয়ান জোয়ালাসাহি নামক এক জন শিখশ্রেষ্ঠের প্রতি সন্দেহ করিয়া নিতান্ত অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করেন। তাৎকালিক রেসিডেণ্ট সার হেন্‌রি লরেন্স আবটের এই কার্য্যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণর জেনারেলকে লিখেন:—"কাপ্তেন আবট্ একজন উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী, কিন্তু তিনি সমুদয় বিষয়ই "বিরুদ্ধভাবে" দেখেন। আমি বোধ করি, তিনি না বুঝিয়া দেওয়ান জোয়ালাসাহির প্রতি অন্যায় করিয়াছেন।" এই দেওয়ান জোয়ালাসা-

ছির সম্বন্ধে হেন্‌রি লরেন্‌স্‌ লিখিয়াছেন, "আমি কেবল একজন এতদ্দেশীয়কে ভাল বলিয়া জানি। শিক্ষা অভিজ্ঞতা, ও সময় অনুসারে তিনি প্রকৃত পক্ষে একজন সম্মানার্হ ও সক্ষম ব্যক্তি(২১)" কেবল জোয়ালাসাহিব বিষয়েই কাপ্তেন আবটের অত্যাচার তিরোহিত হয় নাই। সার ফেড্‌রিক কারিব সময়ে অন্যতম শিখসেনাপতি ঝণ্ডাসিংহও আবটের বিষনয়নে পতিত হয়েন। সার ফেড্‌রিক এতন্নিবন্ধন আবটকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তাঁহার (আবটের) সন্দেহ নিতান্ত অমূলক। যে সর্দ্দারের প্রতি সন্দেহ করা হইয়াছে, তিনি একান্ত মনে ও সাবধানতাসহকারে আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন (২২)"। এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত পরদ্বেষী ব্যক্তি ব্রিটীষ্‌ রেসিডেণ্টের সহকারী হইয়াছিলেন, এইরূপ হঠ-প্রকৃতি অধীর-স্বভাব ব্যক্তিব হস্তে গুরুতর রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত মন্ত্রণার ভার সমর্পিত হইয়াছিল !!

নীতিশাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন, স্বভাব সমুদয় গুণ অতিক্রম করিয়া মাথায় উঠিয়া থাকে। কাপ্তেন আবট ইহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ স্থল। সার হেন্‌রি লরেন্‌স্‌ ও সার ফেড্‌রিক কারির নিকট তিরস্কার পাইয়াও আবটের চরিত্রদোষ অপগত হয় নাই। মূলতান-হাঙ্গামার অব্যবহিত পরে কাপ্তেন আবটের সন্দিগ্ধহৃদয়ে আবার গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি বিশ্বাস করিলেন, সর্দ্দার ছত্র সিংহ মূলরাজের সহিত যোগ দিয়া ইংরেজদিগকে পঞ্জাব হইতে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। এই সন্দেহ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল। তিনি ছত্রসিংহকে ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বাসস্থান ছত্র সিংহের আবাসবাটীর ৩৫ মাইল দূরে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমুদয় আলাপ বন্ধ করিয়া দিলেন (২৩)।

সর্দ্দার ছত্রসিংহ প্রকৃত পক্ষে নিতান্ত সাধু-প্রকৃতি ছিলেন। সার জন লরেন্‌স (এক্ষণে লর্ড লরেন্‌স্‌) একদা বলিয়াছিলেন, "ছত্রসিংহ নিতান্ত নিরীহ-স্বভাব প্রাচীন ভাল মানুষ (২৪)।" কিন্তু কাপ্তেন আবট্‌ যাহার প্রতি সন্দেহ করেন,

(২১) Retrospects and Prospects of Indian Policy p. 113 Comp: Empire in Asia, p. 344.

(২২) Ibid, 114. Empire in Asia, p. 345. Panjab Papers, 1849, p. 328.

(২৩) Retrospects and Prospects of Policy, p. 113. Empire in Asia, p. 345. Panjab Papers, 1849, p.p. 279, 285.

(২৪) Retrospects. p. 114. Empire in Asia p. 345. Panjab Papers, p. 334.

তাঁহার সচ্চরিত্রতাসম্বন্ধে সহস্র নজীর থাকিলেও তিনি তাহাতে আস্থাবান্ হয়েন না। সুতরাং ছত্রসিংহের প্রতি আবটের যে বিদ্বেষভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, লরেন স্ প্রভৃতির নজীরে তাহা বিনষ্ট হইল না।

এক দল সৈন্য মুলতান-যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ছত্র সিংহের বাস স্থানের নিকটবর্ত্তী পক্লি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কাপ্তেন আবট্ অতর্কিত রূপে, শাসন কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে, হাজরার সশস্ত্র মুসলমান চাষাদিগকে দলবদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়া উক্ত সৈন্যদলের গতি-রোধ করেন। ৬ই আগষ্ট এই রণ-দুর্ম্মদ মুসলমান সৈন্য ছত্র সিংহের বাসস্থান হরিপুর অবরোধ করে (২৫)। ছত্র সিংহের অধীনে কাপ্তেন কানোরা নামক একজন মার্কিনদেশী হাজরার সেনাপতি ছিল। ছত্র সিংহ আক্রমণকারিদিগকে শাসন করিতে তাহাকে আদেশ করেন। কানোরা বলিল, কাপ্তেন আবটের অনুমতি ব্যতীত সে উহাদিগের বিরুদ্ধে যাইতে পারিবে না। দ্বিতীয়বার আদেশ হইল, বলা হইল "কাপ্তেন আবট অবগত নহেন, কামান সকল বিদ্রোহিগণের করতলস্থ হইয়া কিরূপ অনর্থ ঘটাইবে।" এবারেও অবাধ্য সেনাপতি শাসন কর্ত্তার বাক্যে তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করিল। কানোরার অসম্মতিতে দুই দল শিখ পদাতিক সর্দ্দারের আদেশ প্রতিপালনার্থ প্রেরিত হইল। কানোরা আপনার কামান সকল গোলা রাশিতে পরিপূর্ণ করিয়া, হাবিলদারদিগকে উহা ছুড়িতে অনুমতি দিল। হাবিলদারগণ অসম্মত হইল। কানোরা তাহাদিগের একজনকে স্বীয় তলবারের আঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া স্বয়ং গোলা-পূর্ণ কামানে আগুণ দিল, সৌভাগ্য ক্রমে কামানের সন্ধান ব্যর্থ হইল। কানোরা পুনর্ব্বার দুই জন শিখ সৈনিকের প্রতি পিস্তল ছুড়িল। ইতিমধ্যে সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া গুলি করিয়া কানোরাকে নিহত করিল (২৬)। অপক্ষপাতী বিচারক মাত্রেই কানোরার এই শাস্তি ন্যায়-সঙ্গত বলিবেন। কিন্তু কাপ্তেন আবট্ ইহা পেশোরা সিংহের হত্যার ন্যায় নিতান্ত নৃশংস গুপ্ত হত্যা বলিয়া ঘোষণা করিলেন (২৭) এবং হত্যাকারী বলিয়া ছত্র-সিংহের স্কন্ধে সমুদয় দোষ চাপাইয়া রেসিডেণ্টের নিকট পত্র লিখিলেন।

---

(২৫) Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 115.—116. Comp: Empire in Asia, p. 345.

(২৬) Retrospects and Prospects of Indian Policy, P. 116. Empire in Asia, 345. Panjab Papers, 1847, PP. 280, 301, 303.

(২৭) Ibid, P. 116, Panjab Papers, P. 304. যে কএক ব্যক্তি রণজিৎ সিংহের দায়াদ বলিয়া পঞ্জাবের সিংহাসন প্রার্থনা করেন, পেশোরা সিংহ তাঁহা-

সার ফ্রেডরিক কারি উপস্থিত বিষয়ে আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিশিষ্ট ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য সহকারে কাপ্তেন অ্যাবটের অভিযোগ অসঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করিলেন। তিনি অ্যাবটকে স্পষ্ট লিখিলেন "উপস্থিত বিষয় আপনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সহিত আমি একমত হইতে পারি না। সর্দ্দার ছত্রসিংহ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। সমস্ত ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্য তাঁহার অধীনে আছে। শিখ সৈন্যদলের সমুদয় কর্ম্মচারীই তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে বাধ্য। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি কি প্রকারে কানোরার হত্যা পেশোরা সিংহের ন্যায় ঘোর নৃশংসকর গুপ্ত হত্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন" (২৮)। যখন হাজরার গোলযোগের সম্বাদ মুলতানে পেঁাছিল, তখন পিতার প্রতি কাপ্তেন আবটের দুর্ব্ব্যহারের সম্বাদে "সের সিংহ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। মেজর এডওয়ার্ডস্ স্পষ্টই বলিয়াছেন, সের সিংহ তাঁহার পিতার পত্র দেখাইয়া এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ ধীরতা সহকারে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহেন, এবং তাহার পিতা এ বিষয়ে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাধুতার প্রমাণ পাওয়া যায় কি না, তদ্বিষয়ে বিচার করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন" (২৯)। রেসিডেণ্টের এই প্রাথমিক ধীরত্ব ও অপক্ষপাতিতায় বোধ হইয়াছিল, তিনি বরাবর এইরূপ ধীরতা ও অপক্ষপাতিতা বজায় রাখিয়া সর্দ্দার ছত্রসিংহকে উপস্থিত গোলযোগ হইতে অব্যাহতি দিবেন, এবং সর্দ্দার ছত্রসিংহ আত্মরক্ষার্থ বিদ্রোহীদিগের দমন জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, ইহা বুঝিয়া ন্যায়ের সুবর্ণ দণ্ড চালনা করিবেন। কিন্তু বিটীষ রাজনীতির অলৌকিক মাহাত্ম্যে ঈদৃশ কোন অব্যাহতি ছত্রসিংহকে দেওয়া হইল না ঈদৃশ কোন বিচার রেসিডেণ্ট হইতে নিষ্পন্ন হইল না। ছত্রসিংহ ধীরতার পরিবর্ত্তে অধীরতা, অপক্ষপাতির পরিবর্ত্তে পক্ষপাতিতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া নিতান্ত অপদস্থ ও অপমানিত হইয়া উঠিলেন।

দিগের অন্যতম। ইনি ১৮৪৫ অব্দের মার্চ্চ মাসে লাহোর দরবারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এতন্নিবন্ধন ছত্র সিংহের অধীনস্থ সৈন্যগণ ইহাঁকে অবরুদ্ধ করে। মহারাণী ঝিন্দনের ভ্রাতা জহোর সিংহের আদেশে ইহাঁকে কারাগারে বধ করা হয়। এই হত্যা সম্বন্ধে সর্দ্দার ছত্র সিংহ কোনরূপে দোষী নহেন। Trotter's History of India, Vol. I. P. 42.

(২৮) Retrospects and propects of Indian policy, p. 117. Panjab Papers 1849. p. 313.

(২৯) Ibid 123—124. Panjab Papers 1849. p. 294. Enpire in India p. 349.

সার ফ্রেডরিক কারির নিয়োগ অনুসারে কাপ্তেন নিকলসন উপস্থিত ব্যাপারের শৃঙ্খলা বিধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি কাপ্তেন আবটের পুচ্ছধারী হইয়া ২০ এ আগষ্ট রেসিডেণ্টকে লিখিলেন, "সর্দ্দার ছত্রসিংহের ব্যবহার নিতান্ত ভয়ঙ্কর ও শঙ্কা-জনক। আমার বিবেচনায়, নিজামতি হইতে খারিজ ও জায়গীর বাজেয়াপ্ত করাই তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি। আমি বোধ করি আপনি এ বিষয়ে আমার সহিত এক মত হই বেন।"

রেসিডেণ্ট বিনা আইনে বিনা বিচারে এই কঠোর শাস্তির অনুমোদন করিয়া ২৩এ আগষ্ট কাপ্তেন নিকলসনের নিকট পত্র লিখিলেন, সুতরাং দণ্ডানুসারে ছত্রসিংহকে নিজামতি হইতে খারিজ ও তাঁহার জাইগীর বাজেয়াপ্ত করা হইল (৩০)!!

এইরূপে বৃদ্ধ সর্দ্দার ছত্রসিংহ ব্রিটীষ রাজনীতির দুরবগাহ কৌশলে জড়িত হইয়া কর্ম্মচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত হইলেন। যে দিন রেসিডেণ্ট কাপ্তেন নিকলসনের প্রস্তাবিত দণ্ডের অনুমোদন করেন, সেই দিনই তিনি মেজর এড্ওয়ার্ডিস্‌কে লিখিয়াছিলেন, "সর্দ্দার ছত্রসিংহ যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কেবল কাপ্তেন আবটের অবিশ্বাস ও ভয়ে করা হইয়াছে। অন্য কোন কারণে নহে। লেফ্‌টেনেণ্ট নিকলসন ও মেজর লরেন্‌স্‌ ও এবিষয়ে আমার সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছেন" (৩১)। তিনি ইহার পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতিকে ও লিখেন—"লেফ্‌টেনেণ্ট নিকলসন কানোরার মৃত্যু, হত্যার মধ্যে পরিগণিত করিতেছেন। তাঁহার মতে ছত্র সিংহই এই হত্যাকারিগণের অধিনায়ক। ইহাতে আমার বোধ হয়, তিনি কানোরার মৃত্যুর যথাবৎ বৃত্তান্ত অবগত নহেন" (৩২)। এতদ্ব্যতীত যে দিন রেসিডেণ্ট ছত্র সিংহের কর্ম্মচ্যুতির অনুমোদন করিয়া নিকলসনের নিকট পত্র প্রেরণ করেন, তাহার পর দিন (২৪এ আগষ্ট) আবার কাপ্তেন আবট্‌কে এক খানি পত্র লিখেন। এ পত্রেও তিনি কাপ্তেন আবটের কার্য্যের অনুমোদন ও কানোরার মৃত্যু গুপ্ত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত করেন নাই (৩৩)। রেসিডেণ্ট এক দিকে সর্দ্দার ছত্রসিংহকে নির্দ্দোষী বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন, অপরদিকে নিকলসনের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করিলেন। এরূপ চাতুরী কখন ও মার্জ্জনীয় নহে।

(৩০) Retrospects and Prospects of Indian policy p. 126. Panjab papers 1849. p. 295, 299.

(৩১) Ibid. p. 126 Ibid p. 297.

(৩২) Ibid, 126. Ibid p. 286.

(৩৩) Retrospects and Prospects of Indian policy p. 126. Panjab Papers, p. 316.

৫ই সেপ্টেম্বর রেসিডেণ্ট-প্রস্তাবিত বিষয় প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টে লিখেন—"আমি ছত্রসিংহকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে ও সম্মান রক্ষা করিয়া তদীয় কার্য্য পদ্ধতির যথাবৎ বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম" (৩৪)। যাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রধান সেনাপতি ও কাপ্তেন আবট্ প্রভৃতির নিকট পত্র লেখা হইল, তিনি আবার কিরূপে প্রাণদণ্ডার্হ হইলেন যে, রেসিডেণ্ট তাঁহাকে উক্ত দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন? যাঁহার প্রতি হঠাৎ এরূপ গুরুতর দণ্ড প্রয়োজিত হইল, সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহার কার্য্যের অনুসন্ধানই বা কিরূপে হইল? অধিক কি, ছত্রসিংহকে এরূপ কথাও বলা হইল না যে, যদি তিনি আত্মদোষ ক্ষালন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে (৩৫)। প্রস্তাবিত বিষয়ে সার ফ্রেডরিক, কারির প্রত্যেক কার্য্যই এইরূপ পূর্ব্বাপর সঙ্গতিবিরুদ্ধ, প্রত্যেক কার্য্যই তিনি এইরূপ চাতুরী খেলাইয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীর :—

(৩৪) Ibid p. 127. Panjab Papers 1849. 329

(৩৫) Retrospects. p. 127.

কপালকুণ্ডলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কপালকুণ্ডলার বিমোহিনী দেবমূর্ত্তি বঙ্কিমবাবু এরূপ কৌশলে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যদ্দ্বারা সেই রূপের গাম্ভীর্য্য ও গৌরব বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। নবকুমার একাকী সমুদ্রকূলে অন্য মনে নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন এমত সময় প্রদোষ-তিমির আসিয়া সাগরের কাল জলের উপর ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাঁহারও মন সহস্র ভাবনার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। পৃথিবী তমোময়, মনও তমোময়, এমত সময়ে সেই গম্ভীর-নাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। অমনি সহসা তাঁহার তমসাচ্ছন্ন মনে যেন সৌদামিনীরেখা প্রভাসিত হইল। "নব কুমার, অকস্মাৎ সেই দুর্গম মধ্যে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দ-শরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক শক্তি রহিত হইল; স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।" যিনি নবকুমারের অবস্থায় সমুদ্রের

জনহীন সতীরে প্রদোষ সমাগমে কখন এরূপ দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই সে মূর্ত্তির মোহিনী শক্তি অনুভূত করিতে পারেন না। তখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারের নিকট আশার প্রদীপ রূপে উদিত হইলেন। তাঁহার দেবমূর্ত্তিতে যে সৌন্দর্য্য ছিল তাহা পাঠক সহানুভূতি হেতু নবকুমারের অবস্থায় পতিত হইয়া অবলোকন করেন, সুতরাং তাঁহার দেবমূর্ত্তি দ্বিগুণ শোভায় প্রতীত হইতে থাকে। কিন্তু আর এক স্থলে বঙ্কিম বাবু অধিকতর কৌশলে কপালকুণ্ডলার রূপের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি প্রথমে মতি বিবির রূপ পাঠকের নিকট বর্ণনা করিলেন; মতি বিবিকে সুন্দরী সাজাইলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রভা অলঙ্কার-রাশিতে বর্দ্ধিত করিলেন। যে বিমোহিনী রূপে মতিবিবি সম্রাটেরও মনোহরণ করিয়াছিলেন, বঙ্কিম বাবু মতিবিবিকে একবার সেইরূপে লোকলোচনের সমক্ষে প্রদর্শন করিলেন। এই সম্রাড়ীশ্বরী সুন্দরীর রূপে পাঠকের মন মোহিত হইল। বঙ্কিম বাবু তখন সেই সুন্দরীকে কপালকুণ্ডলার নিকট লইয়া গেলেন। কপালকুণ্ডলা বন্য বেশে পান্থনিবাসের আর্দ্রমৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। তিনি কেবল মাত্র বন হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার রূপ স্বভাবহস্তে এখনও নবীন অথচ সরল ও অপরিষ্কৃত রহিয়াছে। সেই বন্য প্রকৃতি-সুন্দরীর নিকট পৃথিবীর অলোকসামান্যা সুন্দরী উপস্থিতা হইলেন। সম্রাড়ীশ্বরী আত্মরূপের গরিমময় পরিপূর্ণ। তিনি জানিতেন আমি অসামান্য সুন্দরী বঙ্কিমবাবু সেই রাজ প্রাসাদের গর্ব্বিতা সুন্দরীকে আনিয়া সরলা বনবাসিনী বালিকাকে দেখাইলেন। রাজেশ্বরী বনবাসিনীকে দেখিবা মাত্র চমৎকৃতা হইলেন। কৌতুহল উদ্রিক্ত হইল। "ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন মতিবিবির পূর্ব্বকার হাসি হাসি ভাব দূর হইল; অনিমিক্ লোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহেন নাঃ—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।" মতিবিবি নীরবে পরাজিতা হইলেন, কপালকুণ্ডলা নীরবে অলোকসামান্যা সুন্দরীর উপর জয়ী হইলেন। রাজোদ্যানের পারিজাত সুন্দরী বনশোভিনীর নিকট পরাজিতা হইলেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা সে জয় বুঝিতে পারিলেন না। মতিবিবি বুঝিলেন আর পাঠক বুঝিলেন। পাঠক নীরবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলা রাজরাজেশ্বরী অপেক্ষাও রূপবতী। নহিলে ক্ষণেক পরে মতি কেন "আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন।" তখন নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করিতেছ?' মতি কহিলেন 'দেখুন না।' মতি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন।

কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন 'ও কি হইতেছে?' মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।

"অলঙ্কার-সমাবেশ সমাপ্ত হইলে, মতি নবকুমারকে কহিলেন, 'আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন, এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না। পরিতাপ এই যে, রাজধানীতে এ রূপরাশি দেখাইতে পারিলাম না। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম। আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন।"

রমণী সহজে অন্য রমণীর রূপের প্রশংসা করে না। মতিবিবি আবার সুন্দরী—আগ্রার রাজেশ্বরী, আত্মরূপগর্ব্বে গর্ব্বিতা। সেই মতিবিবি কপালকুণ্ডলার সরল রূপলাবণ্য দেখিয়া চমৎকৃতা হইতেছেন এবং পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্ম-অলঙ্কার রাশি সেই বরাঙ্গেরই উপযুক্ত বলিয়া পরাইতেছেন। এই দৃশ্যটি কি সুন্দর, কেমন নীরব, সরস, অর্থপূর্ণ ভাবোদ্দীপক চিত্র! এই নীরব চিত্রে কপালকুণ্ডলার রূপ যেমন উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইল, সহস্র বর্ণনায় তাহা হইতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু এই নীরব চিত্রের আর একটি গুরুতর অর্থ আছে। সে অর্থ মতিবিবির বর্ত্তমান হৃদয়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে প্রকাশিত হইবে। এই হৃদয়ভাব পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব বঙ্কিম বাবু মতিবিবিকে উপন্যাস মধ্যে কি সাজে সাজাইয়াছেন।

লুৎফ উন্নিসা আপনি বুদ্ধি ও রূপবলে একদা আগ্রার রাজেশ্বরী হইয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বেগমের সখী বটে, কিন্তু পরোক্ষে যুবরাজ সেলিমের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন। ওমরাহ এবং রাজ্ঞী প্রভৃতি সম্রাটের অন্যান্য পারিপার্শ্বিকগণের ষড়যন্ত্রের তিনি মর্ম্ম ভেদ করিয়া কৌশল পূর্ব্বক সেলিমের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। "সেলিমের চিত্তে তাঁহার প্রভুত্ব এরূপ প্রতিযোগশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল যে লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী হইবেন ইহা তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল।" তিনি অনেক সাধে সেই আশা মনে মনে পোষিত করিতেছিলেন। লুৎফউন্নিসার পরম উন্নতি—ইহাই তাঁহার বহুকালের উচ্চ অভিলাষ। তিনি একদা পৃথিবীর অতি নীচতম প্রদেশে অবস্থিত ছিলেন। রূপ ও গুণবলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও পদের ক্রমশ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি সেই পৃথিবীর অতি উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবেন বলিয়া মনে মনে কত আশা ও কত কল্পনাই পোষণ করিয়াছিলেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইলেই তিনি সকল সাধ পূর্ণ করিবেন। তাঁহার হৃদয়াকাশে আশার শত চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। তিনি আনন্দের জ্যোৎস্নায় ভাসিতেছিলেন এমত সময়ে সহসা তাঁহার হৃদয়াকাশের এক কোণ

হইতে এক খানি ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র মেঘ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে কাদম্বিনীজালে প্রসারিত হইল। জ্যোৎস্না ডুবিল! সেলিম একদা মেহেরউন্নিসাকে দেখিলেন। সেলিমের মনে আর এক চন্দ্রের উদয় হইল। একই গগণে দুই চন্দ্রের উদয় কখনই সম্ভব নহে, লুৎফউন্নিসা তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। মহতী আশার বিস্তারিত স্বপ্ন হইতে সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অলোকসুন্দরী কমলিনীর প্রস্ফুটিত হইবার উপক্রম হইতেছে, তাহা দেখিয়া যামিনী সুন্দরী কুমুদিনী কাজেই মুদিতা হইতে লাগিলেন। ভ্রমর কমলিনীর আশায় কুমুদিনীকে ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল। যে পর্য্যন্ত আকবরসাহ বর্ত্তমান, লুৎফউন্নিসা বুঝিলেন সেই পর্য্যন্ত ভ্রমর কমলিনীতে বসিতে পারিবে না। একবার সেলিম সিংহাসনে আরূঢ় হইলেই মেহেরউন্নিসা তাঁহারই হইবে। সম্রাটের ইচ্ছার কে প্রতিরোধ করিবে? লুৎফউন্নিসা, সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিলেন। আশার উচ্চ শৃঙ্গ হইতে তাঁহার হৃদয় ভূপতিত হইল। হৃদয়দর্পণ ভাঙ্গিয়া গেল, ভাঙ্গিয়া শতধা হইল। নৈরাশ্য শত গুণ বাড়াইবার জন্যই যেন, শতধা দর্পণ হইতে পূর্ব্বকার উচ্চাভিলাষের পুঁত্তলি শতরূপী হইয়া একবার দেখা দিল। লুৎফউন্নিসা, আর একবার বহুকাল-পোষিত উচ্চাশাকে আণুবীক্ষণিক চক্ষে দর্শন করিলেন। নৈরাশ্য দ্বিগুণিত হইয়া হৃদয়বেদনার বৃদ্ধি করিল। ক্রমশঃ নৈরাশ্য চিত্তময় হইল। হৃদয় কালীময় হইল। আবার নৈরাশ্যের বেদনা ক্রমে কমিতে লাগিল। মানবের মন কখন চিরকাল নৈরাশ্যকে পোষণ করে না। আবার আশাদেশে চাহিতে থাকে। ঘোর নৈরাশ্য হইতেও আশা সমুদ্ভূত হয়। লুৎফউন্নিসা আবার আশাকে মনে স্থান দিলেন। তাঁহার মনে অন্য আকাঙ্ক্ষা উদিত হইল। পূর্ব্বকার পাপাচরণে ঘৃণা জন্মিল, রাজভোগে ঘৃণা জন্মিল। ভাবিলেন "যদি রাজপুরী মধ্যে সামান্য পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে হইল, তবে প্রতিপুষ্প-বিহারিণী মধুকরীর পক্ষচ্ছেদ করিয়া কি সুখ হইল? যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইল, তবে বাল্যসখী মেহেরউন্নিসার দাসীত্বে কি সুখ? তাহার অপেক্ষা কোন প্রধান রাজপুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়।"

লুৎফউন্নিসার মনে এই প্রতিঘাত হইল। বিলাস, পাপাচরণ ও রাজভোগ হইতে তাঁহার মন একেবারে প্রতিনিবৃত্ত হইল। লুৎফউন্নিসা পঙ্কিল বিলাসিতা হইতে, গৃহস্থের বিশুদ্ধ সুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার মনে একটি নূতনভাব উদিত হইল। তিনি এই নূতনভাবে অধিকতর সুখ জ্ঞান করিলেন। পূর্ব্বজীবনের সকল সুখ নিতান্ত অসার ও বিস্বাদ বোধ হইল। ধর্ম্মের বিমল সুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে সুখের নির্ম্মল স্রোত ধীরে ধীরে বহিতেছে। চারিদিকে

উর্ব্বর তীরভূমি হরিৎ শোভায় হাসিতেছে। স্রোতস্তীরে বৃক্ষ সকল মুঞ্জরিত ও ফলভরে অবনত হইয়া ছায়া প্রদান করিতেছে। পক্ষি সকল মধুরস্বরে গান গাহিতেছে। আহা কি সুরম্য দেশ! কি মধুময় নিকেতন! তিনি এতকাল কোথায় কণ্টকীবনে এবং উত্তপ্ত মরুভূমে ভ্রমণ করিয়াছেন! এই সুখময় দেশ দেখিয়াও দেখেন নাই! আর তিনি সে দেশে যাইবেন না! তিনি এই নূতন সুখময় দেশেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন!

লুৎফউন্নিসার মনে এই প্রতিঘাত হইল। তিনি গৃহস্থের স্থির সুখের প্রত্যাশিনী হইলেন। এইরূপ প্রতিঘাত স্বাভাবিক। আকাঙ্ক্ষার অত্যুচ্চ শিখর হইতে পতিত হইলে প্রবৃত্তির স্বাভাবিকই এইরূপ প্রতিঘাত জন্মে। এই প্রকার প্রতিঘাত বশতঃ অনেকে সংসারে বিরাগী হইয়া একেবারে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের লুৎফউন্নিসা কখন সংসারিণী হন নাই। তিনি চিরকাল দুশ্চারিণী হইয়াছিলেন। এই জন্য পাপাচারে ঘৃণা জন্মিয়া একবার সংসারিণী হইতে তাঁহার নিতান্ত বাসনা হইল।

এই বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য তিনি উপায় দেখিতে লাগিলেন। কৌশলময়ী লুৎফউন্নিসা কখন উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থা নহেন। তিনি একটি কল্পনা স্থির করিলেন। বেগমকে কল্পনায় প্রবৃত্ত করিলেন। প্রবৃত্ত করাইয়া দেখুন কৌশলপূর্ব্বক কেমন প্ররোচন বাক্যে আপনারই কথা বেগমের মুখ দিয়া ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লইতেছেন!

“ ।—“আপনার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইব, কিন্তু এক আশঙ্কা, পাছে সিংহাসন আরোহণ করিয়া খস্রু এ দুশ্চারিণীকে পুরবহিষ্কৃত করিয়া দেন।”

“বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন ‘তুমি আগ্রার যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। তোমার স্বামী পঞ্চহাজারি মন্সবদার হইবেন।”

“লুৎফউন্নিসা সন্তুষ্টা হইলেন। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল” এই উদ্দেশ্য সাধনজন্য তিনি যে উপায়াবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহেরউন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহারও প্রতিশোধ সাধিত হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে নবকুমারের সহিত ঘটনাক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি নবকুমারের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। পরিচয়ে জানিলেন নবকুমার তাঁহার স্বামী। জানিলেন কপালকুণ্ডলা নবকুমারের নববিবাহিতা পত্নী। জানিলেন নবকুমার এত কালের পর আবার পাণিগ্রহণ করিলেন।

সহসা তিনি এই সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তাঁহার হৃদয় মন তখন অন্য ভাবে বিচলিত ছিল। একটি

প্রকাণ্ড ব্যাপারের ঘোর ঘটনাজাল ও পরিণাম তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তিনি তাহারই জন্য বিব্রত হইয়া আগ্রার রাজভোগ ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথিমধ্যে অনতিকাল পূর্ব্বের দুর্ঘটনাও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তিনি এই দুর্ঘটনাকেও সেই বৃহৎ কাণ্ডের আনুষঙ্গিক ঘটনা বলিয়া সহিষ্ণুতার সহিত তাহা বহন করিয়া যাইতেছিলেন। এমত সময় অকস্মাৎ তাঁহার স্বামীকে ও কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হৃদয়কে অধিক বিচলিত করিতে পারিল না। লুৎফউন্নিসা কি করিলেন? কেবল কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে চাহিলেন। স্বাভাবিক কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, তিনি আত্মস্থানীয় নবকুমার-পত্নীকে কেবল দেখিতে চাহিলেন। সুন্দরীকে দেখিব—সে কেবল ব্যপদেশ মাত্র। সেই ব্যপদেশে তিনি স্বীয় সপত্নীকে দেখিতে চাহিলেন। গিয়া কপালকুণ্ডলার রূপ দেখিয়া একেবারে চমৎকৃতা হইলেন। তখন তাঁহার মনে সপত্নীর ভাব কিছুই উদয় হয় নাই। তিনি নবকুমারকে সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে সময় পান নাই। তখন তাঁহার হৃদয়ে অস্পষ্ট জ্ঞান ছিল, ইহাঁরা সকলেই পর হইয়া গিয়াছেন। তিনি যবনী হইয়া ওমরাহগণের বিলাসিনী হইয়াছেন, নবকুমারের সহিত তাঁহার দূরতা বিলক্ষণ অনুভব হইতেছিল। তিনি নবকুমারকে গ্রহণ করিতে যাইবেন—সে ভাব এপর্যন্তও মনে উদয় হয় নাই। সুতরাং তিনি কপালকুণ্ডলাকে সপত্নী বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। সুতরাং কপালকুণ্ডলার সম্মুখীন হইয়া তিনি তাঁহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে থাকে। সে ব্যবহারে যে কবিত্ব আছে তাহা কেবল স্বভাবজ্ঞ ব্যক্তিরই উপলব্ধি হইবে।

বঙ্কিম বাবু অপেক্ষা ন্যূনতর স্বভাবজ্ঞ কবির হস্তে, লুৎফউন্নিসা এই স্থানে হয় ত অন্যবিধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু জানিতেন লুৎফউন্নিসার হৃদয় উচ্চাশয়ে ক্রমশঃ এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে কোন ক্ষুদ্র পদার্থ সে হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক করিতে পারে না। ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিলে সে হৃদয়ে বরং অনুকম্পার সঞ্চার হইতে পারে। ক্ষুদ্র পদার্থ দ্বারা তাহা কখন অধিকৃত হইতে পারে না। লুৎফউন্নিসার হৃদয় এখন এই রূপ ছিল। সুতরাং নবকুমারের ব্রাহ্মণী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। তিনি তজ্জন্য অবিচলিত চিত্তে কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে যাইলেন। ক্ষণিক দেখিয়া মন কিছু বিচলিত হইল। দেখিলেন কপালকুণ্ডলা সুন্দরী—নবকুমার যেরূপ পত্নী হারাইয়াছেন, তদপেক্ষাও বরাঙ্গিনীকে লাভ করিয়াছেন। দেখিয়া মনে মনে একবার কথঞ্চিৎ

আত্মীয়তা ও অঙ্গাঙ্গী ভাবের সঞ্চার হইল। কপালকুণ্ডলাকে সপত্নীভাবে না দেখিয়া ভগিনী ভাবে দেখিলেন। সপত্নী ভাবে দেখিবেন,—ততদূর সাহসিনী হন নাই, ততদূর আত্মীয়তা ভাব এখনও মনে স্থান পায় নাই। তাঁহার মনে,—কেউ যেন আপনার আপনার—এই পর্য্যন্তই অস্পষ্ট জ্ঞান হইতেছিল। এই জ্ঞানে ভগিনীর সুন্দর অঙ্গে, অনায়াসলব্ধ অলঙ্কার রাশি পরাইতে তাঁহার মনে মনে বড় সাধ হইল। পরাইয়া সে সাধ মিটাইলেন। হৃদয়ের আত্মীয়তা ভাবের পরিতৃপ্তি সাধন করিলেন। কারণ লুৎফউন্নিসা কখন হৃদয়ভাব দমন করিতে শিখেন নাই। নবকুমারের কাছে থাকিলে তিনি নিজে যে সাজে সাজিতেন, কপালকুণ্ডলাকে একবার সেই সাজে সাজাইয়া দেখিলেন। নবকুমারের কাছে ব্রাহ্মণী হইয়া থাকিলেও তাঁহার হৃদয়ে উচ্চাশা যে বহুমূল্য অলঙ্কারদামে শোভিতা হইয়া থাকিত, কপালকুণ্ডলাকে একবার সেই অলঙ্কারে শোভিতা করিয়া কল্পনায় তৎস্থানীয় হইয়া দাড়াইলেন। ভাবিলেন আমিও এইরূপ সাজিতাম। অপর্য্যাপ্ত অলঙ্কার আছে বলিয়া আপনার ভগিনীর অঙ্গ হইতে সে অলঙ্কার রাশি মোচন করিতে আর ইচ্ছা হইল না। প্রকাশ্যে নবকুমারকে কহিলেন, "এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম।" নবকুমার তাহাই বুঝিলেন।

লুৎফউন্নিসা একেবারে সকল আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বহুকাল ধরিয়া যে আশা হৃদয়ে পোষিত থাকে তাহা শীঘ্র হৃদয়মন্দির পরিত্যাগ করিতে চাহে না। থাকিয়া থাকিয়া আবার সেই আশা মনে উদিত হয়, উদিত হইয়া আবার মনকে উত্তেজিত করিতে থাকে। লুৎফউন্নিসা ভাবিয়াছিলেন যদি জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসাকে না পান, তবে আমাকেই গ্রহণ করিবেন। জাহাঙ্গীর তখন মেহেরউন্নিসাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু মেহেরউন্নিসার মন কি জাহাঙ্গীরের প্রতি প্রলুব্ধ আছে? তিনি মেহের-উন্নিসার প্রকৃতি বিলক্ষণ জানিতেন; জানিতেন যদি মেহের-উন্নিসা জাহাঙ্গীরের প্রতি অনুরাগিনী না থাকেন তবে জাহাঙ্গীর কিছুতেই মেহের-উন্নিসাকে লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব একবার মেহের-উন্নিসার মন পরীক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই রূপ কৃতসংকল্প হইয়া তিনি বর্দ্ধমানাভিমুখে মেহের-উন্নিসার নিকট যাইতেছিলেন। নবকুমারের সহিত পরিচয়ের পর, তিনি আবার সেই বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বানুরাগ কিছু শিথিল হইতেছিল। আর একটি প্রিয়তর ভাব মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। প্রণয়ভাজনের সহিত তাঁহার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তখনকার প্রণয়সঞ্চারের বিষয় বিশেষ জানিতে পারেন নাই, কিন্তু তখনই বীজ রোপিত হইয়া রহিল। অসাক্ষাতে নব-

কুমারের মুখমণ্ডল তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। "স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কৃতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে অঙ্কুর জন্মিল।" তিনি পথিমধ্যে নির্জ্জনে সন্ধ্যার সময় চটীতে বসিয়া আছেন আর নবকুমারকে ভাবিতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে অন্য মনে সহসা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"পেষমন! আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে? সুন্দর পুরুষ বটে কি না?"

সমগ্র ওমরাহমণ্ডলী মধ্যে যাঁহার কাহাকেও সুন্দর পুরুষ বলিয়া মনে ধরে নাই, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তাঁহার আজি সুন্দর পুরুষ বলিয়া মনে ধরিয়াছিল। প্রণয় ও আত্মীয়তা এইরূপ প্রণয়-ভাজন ও স্বজনের মুখচ্ছবিকে অনুরঞ্জিত করিয়া দেখায়। লুৎফউন্নিসা নবকুমারকে সুন্দর দেখিলেন। হৃদয়ভঙ্গ-জনিত নৈরাশ্যের পর প্রেমের প্রতিঘাত জন্মিল। কিন্তু এখনও এ প্রতিঘাত অতি মৃদু ও দুর্ব্বল। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে এতকালের পর প্রেম প্রবেশ করিবার উপক্রম হইতেছে। তিনি যে পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন কোন ভদ্র ব্যক্তির সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়, এক্ষণে সেই ভদ্র ব্যক্তিকে স্থির করিলেন। ভাবিলেন যদি আমার স্বামীই সেই ব্যক্তি হন তবে বড় সৌভাগ্যের বিষয় বটে। কিন্তু সে পথে অনেক অন্তরায় আছে, এখন স্বামীকে লাভ করা বড় সুসাধ্য নহে।' একবার বর্দ্ধমান দেখিয়া আসা উচিত, পরে নবকুমারের কথা। এই জন্য তিনি বর্দ্ধমানে আসিলেন। যাইয়া মেহেরউন্নিসার হৃদয়কবাট কৌশল পূর্ব্বক উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন তথায় জাহাঙ্গীরের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। মেহেরউন্নিসা কহিল:—জাহাঙ্গীর সিংহাসনে—আমি কোথায়? লুৎফউন্নিসা মনে মনে উত্তর করিলেন, তুমিও সিংহাসনে যাইবে। লুৎফউন্নিসা বুঝিলেন, যতদিনে হউক স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হইবে। যতদিনে হউক হীরক, গলকন্দার তিমিরময় খনি হইতে উন্মুক্ত হইয়া রাজমুকুটের শিরোভূষণ হইবে। যতদিনে হউক মেহেরউন্নিসার উজ্জ্বল রূপ দিল্লীর সিংহাসনে প্রভাসিত হইবে। আর কেন সে সিংহাসনের জন্য আশা? লুৎফউন্নিসার হৃদয় কথঞ্চিৎ উঠিয়াছিল, এক্ষণে প্রবল বেগে আর একবার নিপতিত হইল। তিনি এই বারে মনে মনে সকল আশা বিসর্জ্জন দিলেন। "কিন্তু তাহাতে কি মতিবিবি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্ত-প্রসাদ জন্মিল তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।"

বুঝিলেন তাঁহার হৃদয়ে নবকুমারের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তিনি সিংহাসন লইয়া কি করিবেন? "দিল্লীর সিংহাসন-

লালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল।" তিনি নবকুমারের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন। "দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল।" তিনি রাজা, রাজধানী, রাজসিংহাসন সকলই বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইলেন। রাজসিংহাসন অপেক্ষাও হৃদয়ের প্রেম প্রতিমাকে অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যে হৃদয় পূর্ব্বে পাষাণবৎ ছিল, যে হৃদয় সেলিমের "রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখন মুগ্ধ" করিতে পারে নাই, এখন সেই পাষাণ মধ্যে কীট প্রবেশ করিল। কীট প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে নবকুমারের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিল। লুৎফ-উন্নিসা সেই প্রতিমূর্ত্তির চরণতলে রাজসিংহাসন বিক্ষেপ করিয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

আগ্রায় উপনীত হইয়া লুৎফউন্নিসা দেখিলেন এখন আর সে আগ্রা নাই। সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই। সকলই পরিবর্ত্তন, সকলই বিরূপ। এখন রাজপ্রসাদে ক্ষণিক অবস্থান করিতেও তাঁহার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি ত্বরায় জাহাঙ্গীরের নিকট বিদায় লইলেন। জাহাঙ্গীর ও কণ্টক কাটিলেন। তখন লুৎফউন্নিসা, যেখানে হৃদয় গিয়াছে, সেই খানে যাইতে লাগিলেন। লুৎফউন্নিসার হৃদয়ে এখন ঘোর প্রতিঘাত জন্মিয়াছে—প্রেমের দিকে। নৈরাশ্যের পর প্রেম-প্রতিঘাত জন্মিলে হৃদয়ের ভাব কিরূপ হয়, লুৎফউন্নিসায় বঙ্কিম বাবু তাহারই চিত্র প্রক্ষেপণ করিয়াছেন। এই প্রেম-প্রতিঘাত যিনি বুঝিতে পারিবেন তিনিই লুৎফউন্নিসার হৃদয় কবাটের চাবি পাইয়াছেন। আমরা এত বড় হৃদয়-প্রতিঘাতের চিত্র কুত্রাপি দেখি নাই। এই হৃদয় প্রতিঘাত জন্য লুৎফউন্নিসাকে এত পবিত্র জ্ঞান হয়। হৃদয়প্রতিঘাত বারবিলাসিনীকেও পবিত্র করে; কারণ ইহা মানব-প্রকৃতির গৌরব; ইহাতে মানব প্রকৃতিকে দেবতুল্য করিয়া তুলে। মানবপ্রকৃতি ইহাতে পবিত্র হয়। ত্রিবেণীর জল ইহারই জন্য পবিত্র হইয়াছে। গঙ্গা ভগীরথের সহিত সাগরাভিমুখে যাইতে যাইতে একবার ত্রিশূলীকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ হইবামাত্র একবার হিমালয়ের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। শুদ্ধ ফিরিয়া চাহিলেন না দুই পদ অগ্রসরও হইলেন। ত্রিবেণী পবিত্র হইয়া গেল। গঙ্গার হৃদয়-স্রোত প্রতিঘাত পাইয়া ত্রিধারায় প্রবাহিত হইল। সেই ত্রিধারাধারিণী ত্রিবেণী তীর্থস্থান হইলেন। এই খানেই গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইল। যাহাতে ত্রিবেণী পবিত্র হইয়াছে, তাহা লুৎফ-উন্নিসাকেও পবিত্র করিয়াছে। পবিত্র হইয়া পাপময় সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা এক্ষণে কুটীরে যাইতেছেন। সম্রাটের প্রতি পাদবিক্ষেপ করিয়া তিনি একজন সামান্য ব্যক্তির পদরেণুর প্রত্যাশিনী হইয়াছেন। পৃথিবীর প্রলোভন

পূর্ণ রত্ন ভূষিত পাপময় বিলাসধামকে হেয় জ্ঞান করিয়া তিনি এক্ষণে সংসারীর নির্ম্মল সুখ-পূর্ণ ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। তিনি এখন হিন্দু পতি-পরায়ণা পদ্মাবতী হইয়াছেন। হিন্দু রমণীর পতিপরায়ণতা তাঁহার মনে জাগরিত হইয়াছে। এখন নবকুমারকে তিনি আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। সেই আপনার স্বামীর জন্য তাঁহার হৃদয় প্রবল বেগে আকৃষ্ট হইয়াছে। ভাবিতেছেন পৃথিবীর সকলই পর; একবার আপনার স্বামীর নিকটে গিয়া হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইবেন। আপনার স্বামী পরভোগ্য হইয়া রহিয়াছেন, তাহা এখন তাঁহার অসহ্য বোধ হইতেছে। যে প্রকারে হউক আপনার ধনকে আপনার করিয়া লইবেন এই আশয়ে লুৎফ-উন্নিসা এখন প্রবল হৃদয়বেগে নবকুমারের পানে ধাবিতা হইতেছেন। তিনি বিলাসিনীর সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, বড় সাধ, একবার সাংসারিক সুখে সুখিনী হইবেন।

কপালকুণ্ডলাও সংসারে নূতন প্রবেশ করিতেছেন। একজন বনবাস হইতে সংসারে প্রবেশ করিতেছেন, অন্য জন সংসারের বহির্দ্দেশে বহুকাল উদ্ভ্রান্ত হইয়া এক্ষণে তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছেন। দুই জনেই জানেন না সংসারে কি সুখ। বনবাসিনী সে সুখের কখন আস্বাদ পান নাই, বারবিলাসিনীও সাংসারিক সুখে কখন সুখিনী হন নাই। এইখানেই দুই জনে সমান. কিন্তু আর কিছুতেই সমান নহেন। তাঁহাদিগের এ সাদৃশ্য কেবল প্রতারণা মাত্র। কপালকুণ্ডলা ঠিক সংসারে প্রবেশ করিতেছেন না, সংসার নিজে তাঁহার নিকট উপস্থিত, সংসারে তাঁহাকে পবিত্রা জ্ঞানে সংসারিণী করিতে চাহেন। লুৎফ-উন্নিসার ভাব সেরূপ নহে। লুৎফ উন্নিসা যেন কোন মরুদেশ হইতে মৃগতৃষ্ণিকায় তৃষ্ণাতুরা হইয়া কুরঙ্গিনীর ন্যায় সংসারের দিকে ধাবিতা হইতেছেন। তিনি সংসারকে চাহেন, কিন্তু সংসার তাঁহাকে চাহেন না। তিনি নিজ ইচ্ছায় সংসারে প্রবেশ করিতেছেন, কপালকুণ্ডলা ঘটনাক্রমে সংসারে প্রবিষ্টা হইয়া পড়িলেন। সংসার কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু চিরবনবাসিনী কখন সংসারপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিবার নহে। তিনি ত্বরায় সে পিঞ্জর ভঙ্গ করিলেন। লুৎফউন্নিসা পতিপ্রেমে দৃঢ়-অনুরাগিণী ও পবিত্রা হইয়া সংসার প্রবেশ করিলেন, সংসার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাহেন না, কারণ সংসার এখনও তত পরিশুদ্ধ ও উন্নত হন নাই। এই খানে আমরা একদা সংসারের নীচতা এবং লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ভাবের উচ্চতা সুস্পষ্ট উপলব্ধ করি। লুৎফ-উন্নিসার পবিত্র হৃদয়-ভাব ও প্রগাঢ় অনুরাগকে অশ্রদ্ধা করিতে আমাদিগের অণুমাত্র ইচ্ছা হয় না। তন্মধ্যে মানব-প্রকৃতির যে উচ্চতা ও গৌরব উপলব্ধ হয় তাহা সংসারে বড় দুর্ল্লভ। সেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগিণী রমণী মণ্ডলীর রত্ন-স্বরূপ। বিশে-

যতঃ যে রমণী পাপপথ হইতে ঘৃণায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া এইরূপ পরিশুদ্ধ প্রেমপথে পদার্পণ করিতেছেন—এই রূপ দৃঢ় অনুরাগের সহিত একান্ত মনে পতির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে যাইতেছেন, সে রমণীতে যে স্বেচ্ছাকৃত দৃঢ় পতিপরায়ণতা ও পবিত্রতা আছে, তাহা সংসারের জড়ভাবাপন্ন পতিব্রততা ও সঙ্কীর্ণ পবিত্রতা হইতে নিশ্চয় গরীয়ান্। সংসারের অন্যূন এতদূর উন্নত হওয়া চাই, যেন সে প্রকার পবিত্রতার গৌরব বুঝিতে পারেন। লুৎফ-উন্নিসাকে যখন সংসার গ্রহণ করিলেন না, তখন আমরা লুৎফ উন্নিসার জন্য নিতান্ত ব্যথিতহৃদয় হইয়া ক্রন্দন করিলাম; সংসারকে ধিক্কার দিলাম। সংসার লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ভাবের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন না। শুদ্ধ লুৎফ-উন্নিসার জন্য ক্রন্দন করিলাম না—একবার সমগ্র রমণী জাতির দুরবস্থা ভাবিয়া ক্রন্দন করিলাম। ভাবিলাম লুৎফ-উন্নিসা যদি পুরুষজাতীয় হইতেন আজি সংসার কি তাঁহাকে সহজে পরিত্যাগ করিতেন? লুৎফ-উন্নিসার সমবস্থ রমণীরত্নকে পরিত্যাগ করিতে কেমন হৃদয়বেদনা উপস্থিত হয় তাহাই দেখাইবার জন্যই যেন কবি, লুৎফ-উন্নিসাকে প্রেমের পূত বারিতে পবিত্র করিয়া সংসারের নিকট আনিয়া দিলেন, আনিয়া দিয়া যেন কহিলেন দেখ সংসার! তুমি এত নীচ হইও না, যে আমার অনুতাপিনী লুৎফ-উন্নিসাকে পরিত্যাগ কর। নীচ সংসার তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরিত্যাগ করাতে কি হইল?—লুৎফউন্নিসারই গৌরব-বৃদ্ধি হইল। যিনি একান্ত মনে সংসারের শরণাপন্ন হইলেন, সেই সংসারের এমন সহৃদয়তা নাই, যে শরণাপন্নকে গ্রহণ করিয়া লন। সেই নীচ সংসার মানবের ন্যায় পাপ-পুণ্যময় প্রাণীর বাসযোগ্য নয়। অথবা রমণীজাতি কোন উচ্চতর সংসারের উপযোগিনী। লুৎফউন্নিসার দৃষ্টান্তে আমরা কি শিক্ষা পাই? আমরা শিক্ষা পাই, সংসারের পবিত্রতাভাব, মানবপ্রকৃতির পবিত্রতার অনুসারী হওয়া চাই। সংসারের পবিত্রতাভাব যেন অস্বাভাবিক না হয়। সে পবিত্রতা অস্বাভাবিক হইলে অনেক লুৎফউন্নিসার স্বাভাবিক ভাব বিধ্বংশ হইবে। অনেক অনুপাতিনী, অস্বাভাবিক পাপপথে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জিতা হইবেন। তাঁহাদিগের আর উদ্ধারের পথ নাই। পৃথিবীতে পাপিনীর পুণ্যবতী হইবার উপায় নাই। অতএব সংসারের ধর্ম্ম-নিয়ম অস্বাভাবিক। তাহা মানবের স্বভাব অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যাহা অস্বাভাবিক, তাহা ধর্ম্ম-নিয়ম নহে। যে ধর্ম্ম-নিয়ম পাপীকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ, তাহা মানব সমাজে, ধর্ম্ম-নিয়ম বলিয়া প্রচলিত থাকা নিতান্ত অনুচিত। ধর্ম্ম-নিয়ম যদি মানব-প্রকৃতির গৌরবের অনুসারী না হয়, সে ধর্ম্ম-নিয়ম পরিত্যাজ্য। সে ধর্ম্ম-নিয়ম পরিত্যাজ্য, তথাপি

লুৎফউন্নিসা পরিত্যজ্যা নহে। নবকুমার যখন লুৎফউন্নিসাকে গ্রহণ করিলেন না, তখন লুৎফউন্নিসা যেন এই সমস্ত উদ্বোধন বাক্যে সংসারকে উপদেশ দিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীপূ—

ভারতের ভাবী পরিণাম।

হতভাগা ভারতবাসীর অদৃষ্টে এ দুঃখ কতকাল থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে? আজ প্রায় সহস্র বর্ষ হইতে চলিল দিল্লী-সমরে পৃথুরাজের পরাজয় ও মৃত্যুর সহিত ভারতের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে! মহম্মদ ঘোরী হইতে লর্ড ক্লাইব পর্য্যন্ত অসংখ্য আক্রান্তা যে ভারত-ক্ষেত্রে আপনাদিগের রণনৈপুন্য ও বুদ্ধি-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন—বীরত্ব ও ধূর্ত্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন;—সে ভারত যে এখনও জীবিত আছে, সে ভারতের অধিবাসীরা যে এখনও আত্মস্বত্ব পুনঃ সংস্থাপনের জন্য ব্রিটিশ জাতির সহিত বাক্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন ইহাই আশ্চর্য্য! যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা একদিন বীরদর্পে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন; যাঁহাদিগের দর্শন, যাঁহাদিগের বিজ্ঞান, যাঁহাদিগের সাহিত্য—এখনও জগতের বিস্ময়োদ্দীপক রহিয়াছে;—সেই আর্য্যজাতির সন্ততিগণ এক্ষণে ব্রিটিশসিংহের প্রতাপে কম্পিত-কলেবর! তাঁহাদিগের তেজ, বীরত্ব, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণগুলি একে একে সমস্তই অস্তমিত হইতেছে। জগল্ললামভূতা যে আর্য্যললনা একদিন অসিহস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই আর্য্যললনা এক্ষণে পুত্রকন্যাদিগেরও শৌর্য্য বীর্য্যের প্রকাশের প্রতিকূল। অস্ত্রধারণ, যুদ্ধে গমন ও অন্যান্য দুঃসাহসিক কার্য্যে অবতরণ এক্ষণে তাঁহাদিগের গভীর ভীতির কারণ। পুত্র কন্যাগণ কোনও দুঃসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হন ইহা তাঁহাদিগের একান্ত অনিচ্ছা। যাহা অল্পায়াসসাধ্য, যাহা বিপদ্‌সঙ্কুল নহে, এরূপ নিরীহ কার্য্যে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁহাদিগের ইচ্ছা, তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ ফলেও পরিণত হইয়াছে। নিরন্তর মসীমর্দ্দনে, গ্রন্থভারবহনে, জিহ্বাসঞ্চালনে, ও শ্বেতাঙ্গ-চর্ম্ম-পাদুকা-প্রহার সহনে ভারত-সন্ততিগণের এক্ষণে সুখে দিনাতিপাত হইতেছে। অভ্যাস ক্রমে প্রকৃতিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে আর্য্যজাতি এক সময়ে পরের ভ্রূকুটী মাত্রও সহিতে পারিতেন না, এক্ষণে পরের চরণরেণু সেই আর্য্যজাতির শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। দাসত্ব, অপমান এক্ষণে তাঁহাদিগের

অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে যে প্রবলপরাক্রম মুষলমাণেরা একসময় হস্তিনাপতি পৃথু-রাজের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া গভীর নিনাদে ভারত প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন, বীরদর্পে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতকে কম্পমান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন,—মোগল, পাঠান প্রভৃতি বিভিন্নজাতীয় সেই মুষলমাণেরা একে একে দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া বিজিত আর্য্যদিগের সহিত সমদশাপন্ন হইলেন। ব্রিটিশ সিংহের প্রবলপ্রতাপে জেতা ও বিজিত এক সমান হইয়া গেল। বিশ্বব্যাপী প্রলয়কালে যেমন গোব্যাঘ্র ও ভেকসর্প একত্র বাস করে, সেইরূপ জেতা বিজিত এক্ষণে আত্মরক্ষায় ব্যাকুল হইয়া এক ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে রাজনৈতিক সম্বন্ধে হিন্দু ও মুষলমাণ এক সহানুভূতি-সূত্রে সম্বদ্ধ।

ভারতবাসীগণ মুষলমাণদিগের অধীনে নানা কষ্ট, নানা যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা সে সমস্ত কষ্ট, সমস্ত যন্ত্রণা এই বলিয়া সহ্য করিয়াছিলেন, যে তাঁহাদিগের পরিশ্রমের ধন দেশের বাহিরে যাইতেছে না। তাঁহাদিগের মনে এই সান্ত্বনা ছিল, যে সিংহাসন ব্যতীত ভারতের আর সমস্ত পদই তাঁহাদিগের অধিগম্য। তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদিগের বীরবল, তাঁহাদিগের তোদরমল্ল, তাঁহাদিগের মানসিংহ—দিল্লীশ্বরের সচিবত্ব, মন্ত্রিত্ব ও সৈনাপতিত্ব পদ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। রাজ-সিংহাসনের নিম্নে ঐ গুলিই সর্ব্বোচ্চ পদ। তাঁহারা জানিতেন উপযুক্ত হইলে তাঁহারা যখন সেই সর্ব্বোচ্চ পদেও অধিরোহণ করিতে সক্ষম, তখন অন্যান্য পদ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের করতলস্থ। তাঁহারা জানিতেন যে মুষলমাণেরা যতই কেন যথেচ্ছাচারী হউন না, যতই কেন প্রজাশোষক হউন না, তাঁহারা এক্ষণে ভারতের অধিবাসী, সহবসতিতে ভারতবাসী আর্য্যদিগের ভ্রাতা; তাঁহাদিগের দেহ ভারতের পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে—তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণের দেহ ভারতের পঞ্চভূতে গঠিত হইবে—তাঁহাদিগের অতুল সম্পত্তি ভারতক্ষেত্রেই ব্যয়িত হইবে। এই আশা—এই সান্ত্বনা—ভারতবাসী আর্য্যদিগের নয়নজল মুছাইয়া দেয়, তাঁহাদিগের হৃদয়ের বেদনা কথঞ্চিৎ অপনীত করে, এবং অধীনতাশৃঙ্খল কিঞ্চিৎ মসৃণিত করে। তাঁহারা জানিতেন যে ভারতকে দরিদ্র করা, ভারতের অধিবাসীদিগকে হীনাবস্থায় রাখা, মুষলমাণদিগের স্বার্থবিরোধী। তাঁহারা জানিতেন যে মুষলমাণদিগের ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ ছিল না, যে দেশকে অলঙ্কৃত করা, যে দেশকে অর্থভারে সমুদ্র-জলে নিমগ্ন করা, মুষলমাণদিগের প্রাণপণ চেষ্টার বিষয়ীভূত হইতে পারে। মুষলমাণেরা ভারতের ধনে ধনী—ভারতের মানে মানী—ভারতের সুখে সুখী। সুতরাং যে ভারতের ধনে তাঁহারা ধনী, যে ভারতের মানে তাঁহারা মানী,

এবং যে ভারতের সুখে তাঁহারা সুখী, সে ভারতকে সর্ব্বস্বান্ত অপমানিত ও অসুখিত করায় মুষলমাণদিগের কোন প্রলোভন হইতে পারে না—এই জ্ঞান তদানীন্তন ভারতবাসীদিগকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিল। এই জন্য ভারতবাসী মুষলমাণেরা ভারতের অধিবাসীদিগের ততদূর বিদ্বেষের ভাজন হন নাই। তাঁহাদিগের রাজনীতি, তাঁহাদিগের শাসনপ্রণালী, তাঁহাদিগের বিধি, তাঁহাদিগের ব্যবহারবিজ্ঞান দূষিত হইলেও, তাঁহাদিগের সর্ব্বদোষনাশী এক গুণ ছিল—তাঁহারা ভারতবাসী ছিলেন! তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব এই দেশেই ছিল; তাঁহাদিগের লুণ্ঠন-সংগৃহীত ধন এই দেশেই ব্যয়িত হইত। তাঁহারাও প্রজাশোণিতশোষী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই শোণিতে ভারতক্ষেত্রকেই উর্ব্বরা করিতেন; এই জন্য প্রজারা বক্ষ চিরিয়া রক্ত দিতেও ততদূর কাতর হইত না।

কিন্তু এক্ষণে সুসভ্য ইংরাজজাতির অধীনে আমাদিগের কি সান্ত্বনা, কি প্রবোধ? সত্য, তাঁহাদিগের লৌহবর্ত্ম শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতকে ক্রমে পরস্পর-সন্নিকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছে; সত্য, তাঁহাদিগের তড়িৎবার্ত্তাবহ সংবাদদানে দূরবিক্ষিপ্ত বন্ধু বান্ধবদিগের বিচ্ছেদ-দুঃখ কথঞ্চিৎ অপনীত করিতেছে; সত্য, তাঁহাদিগের বাষ্পীয়পোত দেশ দেশান্তরের ও দ্বীপ দ্বীপান্তরের অধিবাসীদিগের সহিত ভারতের অধিবাসীদিগের সখ্যভাব সংস্থাপিত করিতেছে, নানা স্থানের নানা দ্রব্য আনিয়া ভারতের ভোগ-সীমা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে; সত্য—তাঁহাদিগের সাহিত্য, তাঁহাদিগের দর্শন, তাঁহাদিগের বিজ্ঞান, তাঁহাদিগের ইতিহাস, তাঁহাদিগের রাজনীতি, তাঁহাদিগের সমাজনীতি আমাদিগকে অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা দিয়াছে; সত্য, তাঁহাদিগের প্রচণ্ড গোলক ভারতকে বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে; সত্য, তাঁহাদিগের কঠিন দণ্ডনীতি তস্করতা প্রভৃতিকে প্রায় শ্রুতিমাত্র-পর্য্যবসায়িনী করিয়াছে; সত্য, তাঁহাদিগের শাসনপ্রণালী ভারতে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছে; সত্য, তাঁহাদিগের শিল্প ভারতের বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিয়াছে; কিন্তু সে সহস্র গুণ এক দোষে নষ্ট হইয়াছে—ইংরাজেরা বিদেশী! বিদেশী বিজেতার প্রতি বিদেশী বিজিতের কখনই সহানুভূতি হইতে পারে না। ধর্ম্ম ভিন্ন, জাতি ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, দেশ ভিন্ন, বর্ণ ভিন্ন, অশন বসন ভিন্ন; রীতি নীতি ভিন্ন, বল বুদ্ধি ভিন্ন—এরূপ জাতির সহিত ভারতবাসীর সহানুভূতি কত-দূর সম্ভব জানি না। এরূপ বিভিন্ন-প্রকৃতিক জাতিদ্বয়কে পরস্পর সখ্যসূত্রে সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও কতদূর সফল হইবে বলিতে পারি না।

শ্বেতদ্বীপের প্রতিপরিবার ভারত দ্বারা কোন না কোন প্রকারে উপকৃত হইতেছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতের

প্রত্যেক নগর হইতে প্রতিমাসে অসংখ্য মুদ্রা শ্বেতদ্বীপে প্রেরিত হইতেছে! ভারতের সমস্ত উচ্চ পদই প্রায় শ্বেতপুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত রহিয়াছে! ভারতের সবিশেষ লাভকর বহির্বাণিজ্য প্রায়ই শ্বেত পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে! ক্ষুদ্র সূচিকা ও সামান্য দেসলাই হইতে পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত আমাদিগের সমস্ত গৃহসামগ্রীর জন্য আমাদিগকে শ্বেতপুরুষদিগের শ্বেত চরণে প্রতিদিন কোটী কোটী মুদ্রা অঞ্জলি প্রদান করিতে হইতেছে! কত কোটী টাকা ভারত হইতে প্রতিমাসে শ্বেতদ্বীপে যাইতেছে তাহার সংখ্যা করিতে আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ভারতের ভাবী পরিণাম কি হইবে ভাবিতে গেলে আমাদিগের বক্ষঃস্থল নয়নজলে ভাসিয়া যায়! ভারত দিন দিন কঙ্কালাবশিষ্ট হইতেছে! ভারতের শিল্পীরা অন্নাভাবে তনুত্যাগ করিতেছে! ভারতের কৃষকেরা আপনাদিগের পরিশ্রমের ধনে বঞ্চিত হইতেছে! ভারতের মধ্য শ্রেণীর লোকেরা দারিদ্র্যভরে ক্রমে রসাতলে যাইতেছে! ভারতের উচ্চশ্রেণী ইংরাজ-তুষ্টিবিধানে সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রমে কৌপীনধারী হইতেছে! বোধ হইতেছে যেন ভারতে প্রলয়কাল উপস্থিত! বোধ হইতেছে যেন বিধাতা ভারতের ধ্বংশবিধানের নিমিত্ত শ্বেতপুরুষদিগকে এ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন! যে জাতি দ্বারা ভারতের এতাদৃশী দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, সে জাতির সহিত ভারতের সখ্যভাব প্রার্থনীয় হইলেও কখন বদ্ধমূল হইবে কি না জানি না!

মুষলমানদিগের সময়ে ভারত অনেক পরিমাণে স্বাধীন ছিল। প্রত্যেক জমিদার এক এক স্বাধীন রাজা স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদিগকে বৎসরে বৎসরে মুষলমাণ রাজাদিগকে কিছু কিছু কর দিতে হইত বটে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন। তাঁহাদিগের নিজের সৈন্য ছিল, তাঁহাদিগের নিজের বিচারালয় ছিল, তাঁহাদিগের নিজের দণ্ডবিধি ছিল, তাঁহাদিগের নিজের বিধি ব্যবস্থাপনের শক্তি ছিল, প্রজাদিগের দেহ প্রাণের উপর তাঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। প্রজারা স্বজাতীয় রাজার অধীনে সহস্র গুণে অধিকতর সুখী ছিল। এক্ষণে ব্রিটনের প্রচণ্ড শাসনে রাজা প্রজা সকলই থরহরি কম্পমান। স্বাধীনতার ভাব সকলেরই অন্তর হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমরা যে দিকে তাকাই সেই দিকেই ব্রিটনের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে পাই! বোধ হয় যেন ভীষণ ব্রিটিশ কামান আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে! বোধ হয় যেন শাণিত ব্রিটিশ বেয়নেট আমাদিগের প্রতি ভ্রূকুটী করিতেছে! বোধ হয় যেন আমরা চতুর্দ্দিকে এক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি! যেন শ্বেতপুরুষেরা আমাদিগের সেই প্রকাণ্ড কারার প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছেন! আমরা তাঁহাদিগের সেই ভীষণ মূর্ত্তিই সতত দেখিতে পাই।

তাঁহাদিগের হৃদয়ে দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি মানবোচিত গুণ গুলি আছে কি না তাহা জানিবার আমাদের বিশেষ উপায় নাই। এরূপ জাতির সহিত ভারতের সখ্যভাব সংস্থাপনের চেষ্টায় কিছু ফলোদয় হইবে কি না বলিতে পারি না।

ব্রিটিশ দণ্ডবিধির ন্যায়পরতা, ব্রিটিশ বিধিসকলের লক্ষ্যের উদারতার নিকট আমরা মস্তক অবনত করি। আমরা জানি ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা বিজিত শূদ্রদিগের প্রতি এবং ভারতবর্ষীয় মুষলমাণেরা বিজিত হিন্দুদিগের প্রতি এরূপ অপক্ষপাতিতা ও এরূপ উদারতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সেই নিমিত্ত অনন্তকালের জন্য ভারতের ভবিষ্য পুরুষের নিকট ব্রিটনের গৌরব পরিরক্ষিত হইবে। কিন্তু যে প্রণালীতে ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তাগণ সেই দণ্ডবিধির পরিচালন করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে নরাকার রাক্ষস বলিয়া বোধ হয়, নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র ভল্লুকের সমশ্রেণীক বলিয়া প্রতীতি হয়। চট্টগ্রামের কার্কুড্, এলাহাবাদের লীড্স, মালদহের মোস্লী, রাজসাহীর ডয়লী ও ক্লেপ্রভৃতি তাহাদিগের আদর্শ। এই নরমাংসলোলুপ রাক্ষসেরা দুর্ব্বল ভারতবাসীদিগকে মানবকুলের অনুপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই পাষণ্ডেরাই ইংলণ্ডের বিপুল যশে কলঙ্কারোপ করিতেছে। আমাদিগের দেহ প্রাণ, ধন মান এই কুলাঙ্গারদিগেরই হস্তে নিহিত রহিয়াছে। ইহারাই আমাদিগের প্রকৃত রাজা—প্রজাবন্ধু ভক্তিভাজন মহারাণী সাক্ষী-গোপাল মাত্র। ইহাদিগেরই দোষে তাঁহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কারোপ হইতেছে। তাঁহার প্রতি আমাদিগের ভক্তি অচলা; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ইংলণ্ডের বিশ্বপ্রেমিক মনীষিগণের সহিতও আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। আমরা মিল্, ফসেট্, ব্রাইট্ প্রভৃতিকে দেখিতে পাইনা; তাঁহাদিগের মানবপ্রেম, তাঁহাদিগের স্বদেশানুরাগ, তাঁহাদের ভারত-হিতৈষিতা আমরা সংবাদপত্রে ও পুস্তকাদিতে পাঠ করি মাত্র। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? প্রতিদিন অসংখ্য ভারতবাসী যে এই সকল যথেচ্ছাচারী পাষাণ-হৃদয় শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের তাঁহারা কি করিবেন? রাজচন্দ্রের দুর্বিষহ কারাযন্ত্রণার তাঁহারা কি করিবেন? লালচাঁদের অবমান তাঁহারা কেমন করিয়া নিবারণ করিবেন? নয়ন-তারার নয়নের জল তাঁহারা কেমন করিয়া মুছাইবেন? কত সহস্র রাজচন্দ্র, কত সহস্র সইস, কত সহস্র লালচাঁদ, কত সহস্র নয়নতারা যে ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রতিদিন ঐরূপ অদৃষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাদের জন্য তাঁহারা কি করিতে পারেন? লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে না পারিলে আর তাহাদের ক্রন্দন, তাহাদিগের মৃত্যুশয্যায় রোদন—সেই মনীষীদিগের কর্ণগোচর

হইবে না। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কই? আর কর্ণগোচর হইলেই বা তাঁহারা কি করিতে পারেন? পালির্য়ামেণ্টে তাঁহারা সততই হীনবল! পালির্য়ামেণ্টের অধিকাংশ সভ্যই ভারত বিষয়ে হয় উদাসীন নয় বিদ্বেষপরিপূর্ণ। সুতরাং ভারতবাসীদিগের অশ্রুমোচনে তাঁহাদিগের কয়েক জনের সামর্থ্য কি? তাঁহাদিগের কয়েক জনের গুণাগুণে ভারতবাসীদিগের সুখ দুঃখের সম্ভাবনা কি? ভারবাসীর সুখ দুঃখ প্রধানতঃ ভারতবাসী ইংরাজদিগের গুণাগুণের উপরই নির্ভর করিতেছে। বিশেষতঃ নূতন কার্য্যবিধির বলে আজকাল ম্যাজিষ্ট্রেট্রাই ভারতের প্রকৃত রাজা! সুতরাং ভারতবাসীর সুখ দুঃখ সেই ম্যাজিষ্ট্রেট্দিগের গুণাগুণেরই উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে। সেই মহাপ্রভুরা কিরূপ গুণশালী তাহা আমরা প্রতিদিন স্বচক্ষে দেখিতেছি। প্রতিদিন সংবাদপত্রযোগে তাঁহাদিগের অতুল গুণের বিপুল পরিচয় পাইতেছি। যে ইংরাজজাতি সভ্যতা বিষয়ে জগতের আদর্শস্থল, স্বাধীনতার অদ্বিতীয় সমর্থক; সেই ইংরাজজাতির প্রতি আমাদের বিদ্বেষবুদ্ধি, সেই ইংরাজজাতির প্রতি আমাদের ঘৃণা—এই মহাত্মাদিগের জন্যই দিন দিন অধিকতর বলবতী হইতেছে। এই বিদ্বেষ এবং এই ঘৃণার পরিণাম কি হইবে ভাবিতে গেলে আমাদিগের হৃদয় বিকম্পিত হয়। যত দিন এই ঘৃণা ও বিদ্বেষানল ভারতবাসীদিগের অন্তরে প্রধূমিত থাকিবে, ততদিন ইংরাজজাতির প্রতি ভারতবাসীর মনকে প্রীতিপ্রবণ করার চেষ্টা স্রোতের মুখে তৃণনিক্ষেপের ন্যায় হইবে সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইংলণ্ডের বিজ্ঞান, ইংলণ্ডের দর্শন এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষীয় শিক্ষপ্রণালী স্বার্থপরতা, অনুদারতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দোষে দূষিত না হইলে এতদিন আমরা আরও অনেক শিক্ষা করিতে পারিতাম। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দিন দিন উচ্চ শিক্ষার বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সার চার্ল্স উড্ ভারতবর্ষের শিক্ষা বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট ডেস্প্যাচ্ প্রেরণ করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুসরণ করিতেছেন না। তাঁহারা লোকসাধারণের শিক্ষাবিধানচ্ছলে উচ্চ শিক্ষার পথে অনেক কণ্টক রোপণ করিতেছেন। লোকসাধারণের শিক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন তাহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। যে ইতিহাস পাঠে লৌকিক জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়—স্বাধীনতার ভাব প্রবল হয়; যে বিজ্ঞান পাঠে বহির্জ্জগতের উপর মনুষ্যের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা জন্মে; যে দর্শনপাঠে অন্তর্জ্জগতের উপর মনুষ্যের শক্তি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়; যে উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনায় বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হয়; এবং যে সাহিত্যপাঠে হৃদয়ের

কোমলতর বৃত্তিসকল তেজস্বিনী হয়;—সে ইতিহাস, সে বিজ্ঞান, সে দর্শন, সে সাহিত্য ও সে উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা হইতে জনসাধারণ একবারে বঞ্চিত। সাহিত্যের মধ্যে বর্ণপরিচয়, অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে গণিতের মূলসূত্র—তাহাদিগের পাঠনার আদি ও অন্ত। ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর মধ্যে এক কোটীরও অল্প লোক এইরূপ জঘন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। অবশিষ্ট উনবিংশ কোটীর মধ্যে এক লক্ষ লোকও উচ্চশিক্ষা পাইতেছে কিনা সন্দেহস্থল। সেই উচ্চ শিক্ষা আবাব এরূপ জঘন্য প্রণালীতে সম্পাদিত হয় যে তাহাকে উচ্চশিক্ষা বলিতেও লজ্জা বোধহয়। যে সকল গ্রন্থ ইংলণ্ডীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও অঙ্কশাস্ত্রের ভূষণ বলিয়া পরিগণিত, তাহার মধ্যে দুই এক খানি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রবেশিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষায় অসার পুস্তকের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষিত যুবকেরা এক্ষণে আপনাদিগের দুরবস্থা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগের অবস্থায় উৎকর্ষ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজদিগের কার্য্যের দোষ দেখাইতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজ-পূজারূপ পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সংক্ষেপতঃ তাঁহারা এক্ষণে মানুষ হইতে শিখিয়াছেন। এ সুখসমাচার শ্বেতপুরুষদিগের অসহনীয়। শ্বেতপুরুষেরা ষড়যন্ত্র করিলেন যে এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহাদিগকে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতে হইবে, তাঁহাদিগের চক্ষু ফুটিতে দেওয়া হইবে না! শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদবীস্থিত কতিপয় শ্বেতপুরুষ অপার জলধিপারে আসিয়া অতি ক্লেশে বিপুল অর্থব্যয়ে কতিপয় অসার গ্রন্থ প্রসব করিলেন, অমনি সিন্‌ডিকেটের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল! স্বজাতিপক্ষপাতিতায় ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান তিরোহিত হইল! সেই অসার গ্রন্থ গুলি আপনারা ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, স্বজাতিপক্ষপাতিতানলে আহুতি প্রদান করেন, এরূপ সাধ্য নাই! এই জন্য হতভাগ্য ভারত-যুবকের উপর সেই গুলির ক্রয় ভার অর্পিত হইল! শুদ্ধ ইহাতেই নিস্তার নাই—হতভাগ্য ভারতযুবক সেই অসার তুষরাশি উদরস্থ করিতে আদিষ্ট হইলেন! ভারতবর্ষীয় যুবকের ক্ষীণ মস্তিষ্ক এই গুরুভারে প্রপীড়িত হইল, অর্দ্ধাশনে জীর্ণ দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল! বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটী অসার কঙ্কাল বাহির হইল! শিরোবেদনায় অস্থির—গৃহিণী পীড়ায় প্রপীড়িত একটী অকালবৃদ্ধ বিদ্যালয় হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতারিত হইল! চিররুগ্ন, জীর্ণকলেবর, অন্নচিন্তায় সমাকুল, নিরুৎসাহ ও দয়ার পাত্র এই

ভারত-যুবক হইতে ভারতের কি মঙ্গলের আশা ?

ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর মধ্যে দশ কোটীর অধিক স্ত্রীজাতি। সেই দশাধিক কোটীর প্রায় সমস্তই অনক্ষর। যে দুই চারি জন লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, তাহাদিগেরও কেহই উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীকুল যে ভারতের কলঙ্ক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানবকুলের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী স্ত্রীজাতির পূর্ণ শিক্ষা বিনা জগতের কোনও গুরুতর মঙ্গল সংসাধিত হইবার যে সম্ভাবনা নাই তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ভারতের ললনাকুল অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা থাকিতে ভারতের যে কোনও শুভ নাই তাহা বলা দ্বিরুক্তি মাত্র। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য পাঠশালা, অসংখ্য স্কুল ও অনেক কালেজ সংস্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু সে রমণীকুলের জন্য নহে—মানবকুলের প্রবলতর শাখার জন্য। আজ শতাধিক বৎসর ভারতে সভ্যম্মানী ইংরাজরাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তথাপি—লজ্জার কথা—ভারতে আজ পর্য্যন্ত রমণীকুলের জন্য একটীও উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হইল না! যে কয়েকটী পাঠশালা ও যে কয়েকটী সামান্য স্কুল তাহাদিগের জন্য এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা অঙ্গুলি মাত্রে গণনীয়! যাঁহারা ভারতের ভাবী বংশধরগণের জননী, যাঁহারা বর্ত্তমান ভারত-সংস্কারকদিগের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাঁহারা ভারতের গৃহের লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, যাঁহারা দুঃখভার-প্রপীড়িত ভারতবাসীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের একমাত্র জ্যোৎস্না—সেই ভারত-ললনার অন্তর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতে ভারতের কি মঙ্গলের আশা ?

ভারত! আর্য্যজাতির প্রদীপ্ত প্রতিভার বিলসনভূমি! রামভার্গব, কর্ণার্জ্জুন, ভীমকৃষ্ণের বিচিত্রবীর্য্য প্রদর্শনাঙ্গন! ব্যাস বাল্মীকি ও কালিদাস ভবভূতির কবিত্বসরোজ-সরোবর! শঙ্কর ভাস্করের ক্রীড়াস্থল! মনু পরাশর ও বুদ্ধ চৈতন্যের জন্মভূমি! লীলাবতীর লীলাস্থল! দুর্গাবতী ঝান্সীর বীরত্ব-রঙ্গভূমি! বেদের জননী! জগতের আরাধ্য! মানবকুলের উপদেশক! তোমার অদৃষ্টে শেষে কি এই ছিল? তোমার ভাবী পরিণাম কি হইবে এই ভাবিয়া আমাদিগের হৃদয় আকুল! যে ঘোর দুর্দ্দশাপঙ্কে তুমি এক্ষণে পতিত, তাহা হইতে তোমায় উদ্ধার করে এমন লোক কই?

জননী! আমরা তোমার অন্নে প্রতিপালিত, তোমার শোণিতে পরিপুষ্ট, তোমার মৃত্তিকায় গঠিত, তোমার মলয়পবনে অনুপ্রাণিত, তোমার নির্ম্মল জলে অভিসিঞ্চিত, তোমার বিশ্বব্যাপী ধবলযশে উজ্জ্বলিত—কিন্তু আমরা অক্ষম। সেই অনন্ত উপকারের একটীরও প্রতিশোধ করিতে অক্ষম! অক্ষম—কিন্তু অকৃতজ্ঞ নহি! সেই অসংখ্য উপকারের প্রতিশোধ করিতে না পারি তাহার জন্য

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত নহি। জননী! সহস্র বৎসরের দাসত্বে আমাদিগের শোণিত শুষ্কপ্রায়, দেহ মৃতপ্রায়, মন ভগ্নপ্রায়। জননী! সহস্র বৎসরের দাসত্বে তোমার বিপুল দেহ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ তোমার অবগণ্ড সন্তানদিগের ক্রন্দনে আকুলিত! চতুর্দ্দিকে শকুনি গৃধিণী, শৃগাল কুক্কুরগণ বিকট শব্দ করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই ঘোর বিপৎকালে তাহারা কাহার শরণাপন্ন হইবে? যাহারই আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই রক্ষক হইয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়ন করা বলবানের স্বধর্ম্ম। বলবানের প্রতি উৎপীড়ন করে কাহার সাধ্য? জননী! তোমার দুর্ব্বল সন্ততিগণের বলাগমের উপায় কি? জননী! বহুকালব্যাপী দাসত্বে জীর্ণ কলেবরে প্রকৃত বলাগমের অনেক বিলম্ব। সে বিলম্ব অসহনীয়। এক্ষণে দাসত্বের অবস্থায় বলাগমের উপায় কি? জননী! তবে আমাদিগের কি কোন আশা নাই? যেন কোন দেবতা গম্ভীরস্বরে আমাদিগের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "আছে"। কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে আবার বলিলেন **"একতা ও আত্মত্যাগ।"** —ভারতের উদ্ধার সাধনের একমাত্র উপায় একতা ও আত্মত্যাগ—ভারতের জীর্ণদেহে বলসঞ্চারের একমাত্র উপায় একতা ও আত্মত্যাগ। "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" তৃণেরও সমষ্টি দ্বারা মত্ত হস্তী বন্ধন করা যায়। বিংশতি কোটী ভারতবাসী একতা-বন্ধনে বদ্ধ হইলে কাহাকে ভয়? বিংশতি কোটী ভারতবাসী স্বদেশের মঙ্গলসাধন-ব্রতে আত্মবিসর্জ্জন করিলে ভারতের কি অভাব? বিংশতি কোটী ভারতবাসীর নয়নের জলেও শ্বেতদ্বীপ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইতে পারে। বিংশতি কোটী ভারতবাসীর দীর্ঘ নিশ্বাসেও ভারতের শ্বেত পুরুষ কয়েকটী উড়িয়া যাইতে পারে। সমস্ত ভারত সমবেত হইলে অস্ত্রধারণের প্রয়োজন কি? দুর্ব্বলের আবার অস্ত্রধারণ কি? দুর্ব্বলের মহাস্ত্র ক্রন্দন! আমরা বিংশতি কোটী দুর্ব্বল ভারতবাসী কাঁদিয়া ইংলণ্ডের উপর জয়লাভ করিব! আমরা বিংশতি কোটী ভারতবাসী কাঁদিয়া ইংলণ্ডের নিকট স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব! হিন্দু, মুষলমাণ,—পারসী, য়িহুদী—ফিরিঙ্গী, সাঁওতাল—সীক, বৌদ্ধ—আমরা সমস্ত ভারতবাসী এক তানে কাঁদিয়া ইংলণ্ডের নিকট আমাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বত্ব ভিক্ষা করিব! আমাদিগের ঐকতানিক ক্রন্দনে ইংলণ্ডের ভারত-সিংহাসন টলিবে! যে জাতি স্বাধীনতার নামে উন্মত্ত; যে জাতি আত্ম-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেহ প্রাণ, ধন মান সমস্ত বিসর্জ্জন দিতেও উদ্যত; যে জাতির রণতরি অসভ্য আফ্রিক, তাতারদিগেরও দাসত্বমোচনে সতত সুসজ্জিত,—সেই জাতি যে—সভ্যতার শৈশবদোলা সরস্বতীর জন্মভূমি—ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর ক্রন্দনে বধির থাকি-

বেন বিশ্বাস হয় না! ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী যদি প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন; যদি প্রত্যেকে স্বদেশের মঙ্গলসাধনব্রতে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে শিখেন; যদি প্রত্যেকে ভারতের একোন বিংশতি কোটী অধিবাসীকে সোদরোচিত স্নেহ করিতে শিখেন; যদি সকলে জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ভুলিয়া এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে শিখেন; তাহা হইলে আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ইংলণ্ড পুত্রবৎসল পিতার ন্যায় উপযুক্ত সন্তানদিগেব হস্তে তাহাদিগের আত্মশাসন ও আত্মপালন কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া এই গুরুতর পালনকার্য্য হইতে অবসৃত হইবেন! যে দিন ইংলণ্ড ভারতের প্রতি এই উদার ও নিরভিসন্ধি ব্যবহার করিবেন, সেই দিনই ইংলণ্ড ভারতবাসীদিগের প্রকৃত ভক্তি ও প্রকৃত কৃতজ্ঞতার আধার হইবেন! সেই দিনই ইংলণ্ড ও ভারত এক সহানুভূতি-সূত্রে সম্বদ্ধ হইবে! পরস্পরের দুঃখে পরস্পর দুঃখী হইবে! পরস্পরের সুখে পরস্পর সুখী হইবে! পরস্পরের বিপদে পরস্পরে প্রাণ দিবে! স্বাধীনতা ও সমতা ব্যতীত সে সহানুভূতি ঘটে না। বর্ত্তমান অবস্থায় এক পক্ষে সমতা ও স্বাধীনতার অভাব রহিয়াছে, সুতরাং এ অবস্থায় সে সহানুভূতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বদেশের মঙ্গলসাধনব্রতে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে শিখেন; যাহাতে ভাবতের বিংশতিকোটী অধিবাসী পরস্পরের প্রতি পরস্পর সোদরোচিত স্নেহ করিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ভুলিয়া এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী একবাক্যে স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রিটনের নিকট আত্মদুঃখ ব্যক্ত করিতে শিখেন; সেই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত—জননী ভারতভূমির প্রতি অসংখ্য উপকারের কৃতজ্ঞতাচিহ্ন স্বরূপ—১২ই শ্রাবণ বুধবার কলিকাতা মহানগরীস্থিত আল্‌বার্ট হলে "ভারত-সভা" নামক এক নূতন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিন ভারতের পুনর্জন্ম দিন! এইদিনে সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব্ব রাজনৈতিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইল! পারলৌকিক ধর্ম্ম পৃথক্ হউক, জাতি পৃথক্ হউক, সমাজ পৃথক্ হউক, তথাপি এ ধর্ম্মের একতা পরিরক্ষিত হইবে। এ ধর্ম্মে হিন্দু, মুষলমাণ; বৌদ্ধ, জৈন; সেশ্বর, নিরীশ্বর; সাকার, নিরাকার; খ্রীষ্টান্, য়িহুদেন—সকলই সমান। সকলেই নির্ব্বিরোধে এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার কেবল একটী মাত্র নিয়ম আছে—দীক্ষিতদিগের প্রত্যে-

কেই ভারতবাসী হওয়া চাই। ইহাতে রাজা, জমিদার, প্রজা প্রভৃতি বিষাক্ত শ্রেণীবিভাগ নাই। ইহা সাম্যবাদী। এই ধর্ম্মই ভারতসভার মূলভিত্তি। এই জন্য ভারতসভা সকলকেই ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। ভারত-বাসী! হিন্দু, মুষলমান, খ্রীষ্টান্, বৌদ্ধ, জৈন, সীক! আপনারা সকলেই আসিয়া এই সভায় যোগ দিউন। দেখিবেন ভারতের সুখ সূর্য্য অচিরাৎ সমুদিত হইবে। বৎসরে বৎসরে ভারতের প্রতি গৃহে যেন এই দিন উপলক্ষে মহান্ উৎসব হয়। যেন এই দিনে হিমালয় হইতে সিংহল, এবং সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ ভারতের যশোগান করে! ভারত এক দিন জগতের সভ্যতামার্গের নেতা ছিলেন, একদিন সমস্ত জগতের শিক্ষক ছিলেন, এক দিন ইহাঁর বীরত্বে মেদিনী বিকম্পিত হইয়াছিল, আবার এমন দিন আসিবে—সে দিন বহুদূরবর্ত্তী নয়—যে দিনে ভারত আবার জগতের সভ্যতামার্গের নেতা হইবেন, যে দিনে ভারত আবার সমস্ত জগতের শিক্ষক হইবেন, যে দিনে ভারতের বীরত্ব জগতে পুনর্ব্বার উদ্ঘোষিত হইবে!!! ভারতসভা! এই গভীর লক্ষ্যসাধনের ভার তোমার অনতিপ্রৌঢ় মস্তকে অর্পিত রহিল! দেখিও যেন এই গুরুভার—ও এই গভীর বিশ্বাসের অপব্যবহার না কর।

মেহের আলি।

দশম অধ্যায়।

বঙ্গ-উপসাগরে আন্দামন নামক কতিপয় দ্বীপ বিখ্যাত আছে। বৃহৎ আন্দামন ক্ষুদ্র আন্দামন প্রভৃতি বড় বড় দুই একটীর নামকরণ হইয়াছে; তদ্ভিন্ন কএকটী ছোট ছোট দ্বীপ আছে অদ্যাপি তাহার নামকরণ হয় নাই। বৃহৎ আন্দামনের দক্ষিণভাগে আজকাল দ্বীপান্তরবাসীদের আবাস হইয়াছে; তৎকালে পোলোপিনাঙ্গ বন্দীদের উপনিবাস ছিল এবং আন্দামন জঙ্গলময় ছিল। বৃহৎ আন্দামনের নিভৃততম প্রদেশে অরণ্যবাসী কতিপয় জাতি আছে তাহারা সময়ে সময়ে নরমাংসও ভোজন করিয়া থাকে।

বৃহৎ আন্দামনের পূর্ব্বভাগে ৮।১০ ক্রোশ ব্যবধানে দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, উহা জনশূন্য এবং বিরল। উত্তরাংশের ক্ষুদ্র দ্বীপটী সমুদ্র হইতে অতি সামান্য এক খানি দুর্ব্বার চটীর ন্যায় দেখা যায়। নিকটে আসিলে বালির চড়া, বেতস বন ও কণ্টকারণ্য মধ্যে অগণ্য ঝাঁড়ি দেখা যায়। দূর হইতে সুনীল আকাশ ও সুশ্যাম সাগর জলের দৃশ্য-মধ্যে নারিকেলবৃক্ষশীর্ষ অতি শোভমান হই-

য়াছে। কে যে বৃক্ষগুলি রোপণ করিল বলা যায় না। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে বড় বড় গাছ ও ঝোঁপ আছে।

তালতরু-তুল্য তরঙ্গ চারি দিক্ হইতে যেন দ্বীপকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। চড়া ও কূলের নিকটে আসিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। যেন শীকার গ্রাসগত হইল না ব'লে তরঙ্গ-নিচয় মহা আক্রোশে গর্জ্জন করিতেছে। অনবরত হুহুঙ্কার শব্দে কর্ণ বধির হয়। আবার যখন প্রবল প্রবাহ কূলে নিপতিত হয়—বোধ হয় যেন শত শত হর্ম্ম্য ভূপতিত হইল, এমনি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে। জলসীমা মুহুর্ম্মুহু চড়ার উপর উঠিতেছে ও নামিতেছে—উপকূল তোলপাড়। একটু কি বিশ্রাম নাই? আবার মধ্যে মধ্যে ফেণরাশি তুলার গাদার ন্যায় বালির উপর স্তূপাকার হইতেছে। সমুদ্র হইতে এই আমোদ দেখা অসম্ভব। পাঁচগড়ে অর্থাৎ সারি সারি পাঁচটি তরঙ্গ যে কূল হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে নৌকা গেলে আছাড়িয়া মারে, এবং জাহাজ যাইবার জল থাকে না। আর সমুদ্র-গর্ভ থেকে তাহার গর্জ্জন শুনা যায় না। কূলে চড়ে দাঁড়াইলে শিকতাময় সুদৃঢ় উপকূলে সাগর-তরঙ্গনিপাত দেখিতে ও সমুদ্র-গর্জ্জন শুনিতে অতি ভয়ঙ্কর অথচ রমণীয়। যিনি একবার দেখেছেন আর জন্মে ভুলেন না।

দ্বীপের উপকূলে এক ব্যক্তি শুভ্রবেশধারী দাঁড়াইয়া আছেন, নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সমুদ্র দেখিতেছেন—কি তটস্থ লহরীলীলা দেখিতেছেন, তিনিই জানেন। এক একবার ক্ষুদ্র শ্মশ্রু বাম মুষ্টিতে ধরিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিতেছেন, এক এক বার ঐ শ্মশ্রু দন্তে আবদ্ধ করিয়া অধোমুখ হইতেছেন। প্রাতঃকাল। সূর্য্য সুবর্ণ কলসরূপ ধারণ করিয়া সম্মুখে কৃষ্ণজলে অবগাহন করিয়া উঠিতেছেন। বালার্ক ঢল ঢল তরল তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় রঞ্জিত হইয়াছে। চক্রটী জল হইতে প্রায় সমুদায় উঠিয়াছে। দুই চারি অঙ্গুলি মাত্র জলমধ্যে আছে। সেই অংশ অদৃশ্য এবং তৎপরিবর্ত্তে উত্থিত চক্রের কিয়দংশ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া সুবর্ণকলসস্কন্ধের ন্যায় দেখা যাইতেছে। কবি কালিদাস সমুদ্র হইতে সদ্যোত্থিত সূর্য্যকে "সুবর্ণ কলস" বর্ণন করিয়াছেন। উহা সুবর্ণ কলসই বটে, যিনি একবার সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দেখেছেন অনায়াসে সাক্ষ্য দিতে পারেন। তীরস্থ শুভ্রবেশী ব্যক্তি কিন্তু সে দিকে আকর্ষিত না হইয়া ক্ষুদ্র এক তরণী যে কূলে কূলে আসিতেছে এবং এক খাঁড়ির মুখে প্রবেশ করিল, তাহাই দেখিতেছেন। নৌকা বেতস বনে অদৃশ্য হইলে, তটস্থ ব্যক্তি জঙ্গলের মধ্যে গেলেন।

খাঁড়ির কূলে একটী বড় গাছের তলে এক ফকীরের আস্তানা আছে। তটস্থ ব্যক্তি ঐ আস্তানার ফকীর হইয়া বসিলেন এবং তরি হইতে উত্থিত দুই জন যুবা পুরুষ ফকীরকে সেলাম করিয়া

সম্মুখে দাঁড়াইল। ফকীর এক জনকে আলিঙ্গন ও স্নেহ-সূচক সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "কহ রেঙ্গুণের বার্ত্তা কি ?" সেই ব্যক্তি কহিল "চাচা আপনি যাহা যাহা শুনিয়াছেন সত্যই বটে, কারণ মেহের-আলি রেঙ্গুণে রোয়ান্‌জা মগের বাটীতে কর্ম্ম করিত এবং অবশেষে তাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। রোয়ান্‌জা তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছেন, এ অঞ্চলে আসিলে তাঁহার গুপ্ত চর অবশ্যই তাহাকে ধরিবে ও রোয়ান্‌জা স্বহস্তে তাহার প্রাণবধ করিবেন। আমার প্রতি তিনি বড়ই সদয় হইলেন। আমার সাহায্যে জাহাজ দিতে চাহিলেন যদি মেহেরকে ধরে দিতে পারি। তিনি এদিকে আমাদের সহায় রহিলেন।"

ফকীর কহিলেন, "খোদা! আর বেশী ক্লেশ করিতে হইবে না, এই দ্বীপের নিকটেই মেহেরআলি এক জাহাজে আছে, শীঘ্র এই দ্বীপে তাহাকে আনাইতেছি; তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" ফকীর, আসগরআলি মোক্তার; ও যুবা পুরুষ ফজরআলি, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র। ফজরআলি সহর্ষভাবে আপন খুল্লতাতের বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা করিয়া কহিল, "মহাশয়, আপনি এখানে কিরূপে আসিলেন, এবং মেহেরকেই বা কিরূপে পাইলেন বলুন, আমার বড়ই ঔৎসুক্য হইতেছে।" আসগরআলি কহিলেন, "বৎস! যে দিন 'রমজা' ঝবঝব্যা বটতলা হইতে এক নাবিককে আনিল ও নাবিক বলিল সে মেহেরআলির জাহাজ হইতে আসিতেছে, মেহের আলি শ্রীহট্টের সেখ মোবারকের পোষ্য পুত্র, হইয়াছে এবং সে রেঙ্গুণ কূল হইতে পলায়ন করে এসেছে, আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইল সেই মেহেরআলির কথা বলিতেছে। সন্দেহ ভঞ্জন জন্য তোমাকে রেঙ্গুণে রোয়ান্‌জা মগের বাটীতে পাঠাইলাম—দেখিতে যে, যে মেহেরআলি তাঁহার বাটীতে কর্ম্ম করিত ও তথা হইতে পত্র পাঠাইত সে সেআশ্রয় ছেড়েছে কি না? তাহা হইলে নিশ্চয় সেই মেহের আলি, সেখ মোবারকের পোষ্য হইয়াছে।

ফজর। হাঁ নিশ্চয় তাই বটে।

আসগর। সেই দিনের সপ্তাহ পরে আমি রকিমমিসার জাহাজ লইয়া নোয়াখালি রওনা হইলাম। জাহাজ তথায় রেখে শ্রীহট্টে গেলাম এবং মেহের আলির সন্ধান পাইলাম। মেহেরআলি সেখ মোবারকের জাহাজ লইয়া অবিলম্বে চট্টগ্রামে আসিবে এবং সঙ্গে প্রভূত ঐশ্বর্য্য যাইবে শুনিলাম। খোদা! তখন যে কত আশঙ্কা হইতে লাগিল কি বলিব? যদি এই ক্ষুদ্র মস্তকে কৌশল ভরা না থাকিত এতদিনে সব বিফল হইত!"

ফজর কহিলেন, "বল বল চাচা কেমন করে সে বেগ ফিরাইলেন?"

আসগর শ্মশ্রু দস্তে ধরিয়া কহিলেন "কেমন করে? শুন। আমি জানি মেহের দয়ার বশ। জোর করিয়া এখন তাহাকে আটকান যাইবে না, তাই

তাহার দয়ার উপর কৌশল খেলা গেল। নোয়াখালি হইতে একটী হিন্দুস্থানীকে অর্থ দিয়া বশ করিলাম, তাহাকে শিখাইলাম যে সে নৌকা করে মেহেরের জাহাজের পথে থাকে। জাহাজ দেখিলেই, তাহাকে ধরে এবং মেহেরের পায়ে ধরে কেঁদে বলে তাহার স্ত্রীকে এক জাহাজের লোক কেড়ে লয়ে মান্দ্রাজে গেছে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহার নাম শঙ্কর সিং। শঙ্কর পটু বটে, সেই কৌশলে মেহেরকে জাহাজ শুদ্ধ মসুলী পাটনে* আনিল। আমিও জাহাজ সহ ঐ বন্দরে এসেছিলাম। এখন মেহেরকে বিপদে ফেলাইবার জন্য, শঙ্করকে শিক্ষা দিলাম যে কোন এক ভদ্র পরিবারের মধ্যে তাহার স্ত্রী ব'লে এক স্ত্রীলোককে দেখায় ও ধরায় এবং আপনি গোএন্দা হয়ে আবার মেহেরকে ধরাইয়া দেয়।"

ফজর। তার পর তার পর!

আসগর। তার পর, শঙ্কর সিং তাহাই করিল। বিখ্যাত চারিলু নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবন হইতে এক কুলবধূকে বাহির করা হইল, এবং রাজকর্ম্মচারী মেহেরকে জাহাজ শুদ্ধ বন্দী করিল। শঙ্কর সিংহ দ্বারা প্রমাণ করাইলাম—মেহেরের উক্তি সকল মিথ্যা, সে এইরূপ পরস্ত্রী হরণ ক'রে বেড়ায়। কিন্তু চারিলু-বধূ মেহেরের পক্ষে স্বাক্ষ্য দিল, তাহার সরলতা ও ক্রন্দন দেখে রাজকর্ম্মচারী বিশ্বাস করিল এবং মেহের মুক্তি পাইল।

ফজর। আবার ত বিপদ—তার পর তার পর।

আসগর। পলাইবে কত বার? মেহের শঙ্কর সিংকে দণ্ড দিবার জন্য মাসেক তথায় রহিল। শঙ্করকে গোপন করে রেখে, গুপ্তচর দ্বারা মেহেরকে শঙ্কর প্রাপ্তির লালসা দেখাইয়া কিয়ৎকাল মসুলীপট্টনে আটকাইলাম। তদবসরে ঐ অপহৃতা স্ত্রীর স্বামী চারিলুকে মেহেরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলাম এবং সে রাজী হইয়া ছদ্মবেশে মেহেরের জাহাজে উঠিল। কৌশলে সে জাহাজ এই দ্বীপে এসেছে; আমিও এখানে এসেছি। পরে তোমার সংবাদ পাইয়া তোমাকে আনাইলাম; এখন সমবেত হইয়া মেহেরকে এবার নাশ করিতে হইবে।

ফজর। আর ভাবনা কি? যাহা বলিবে ফজর প্রস্তুত আছে,—বল ত রজনীতে ছোরা লইয়া মেহেরের গলায় বসাইয়া আসি।

আসগর। উঁহুঁ! সে বড় সতর্ক ও বলবান্, আর জাহাজের লোক সব তাহার অনুগত।

ফজর। তবে কি হইবে?

আসগর। "চিন্তা কি? চারিলুর সঙ্গে আমার এক চর আছে; শঙ্কর সিংও

* বিগত বারের উপাখ্যানাংশে শ্রীরঙ্গপট্টন স্থলে মসুলীপট্টন পড়িতে হইবে।

আমার সঙ্গে আছে। ঐ চর চারিলুকে উত্তেজিত করিতেছে এবং অবিলম্বে চারিলু মেহেরকে লইয়া আমার কাছে আসিবে। আমরা ৪। ৫ জন হইব, ধরে মেহেরকে নাশ করিব।" হা হা করিয়া আসগর হাস্য করিল।

পর দিবস প্রাতে খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র তীরে থেকে সমুদ্র দেখিতে লাগিল। একটী জাহাজের বোটে তিন ব্যক্তি আরোহী মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল এবং অবিলম্বে তরীটী বেতসবনাবৃত খাঁড়িতে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ আসগর আলি আস্তানায় ফকীর হইয়া বসিলেন এবং ফজর পার্শ্বস্থ এক ঝোপে লুকাইল। নৌকা হইতে একজন আসিয়া প্রথমে ফকীরকে সংবাদ দিল— অভিলষিত ব্যক্তিদ্বয় আসিতেছে তৎপরে দুই যুবা পুরুষ উপনীত হইল। উভয়েই ভদ্রবেশধারী, সবলকায়, ও সুরূপ। একজন মুসলমান, একজন মান্দ্রাজী হিন্দু। মুখশ্রীতে তেজ, সাহস, সরলতা ও ঔদার্য্য বিলক্ষণ প্রতীয়মান। উভয়ে নতশীরে ফকীরকে সেলাম করিয়া বসিল।

ফকীরও মন্দ দেখিতে নহেন। পরিচ্ছদ বহুবর্ণ সাততালি আলখাল্লা ও টুপি। গলে স্ফটিকমালা। হস্তে তস্‌বী। দাড়ীটি ছোট কিন্তু সুপক্ক বটে। ফকীর একখানি ছেঁড়া কাপড় পেতে বসে আছেন। পার্শ্বে আসবাবের মধ্যে এক কাঁথা, মাটীর বদনা এক, কুর্ত্তি এক ও মালা ক'রে কএকটী চাউল মাত্র। যুবাদ্বয় চমকিত হইয়া ফকীর ও তাঁহার স্থান ও আসবাব দেখিতে লাগিলেন। ফকীর আরবীর মত কএক কথা বীজবীজ করে বকিয়া কহিল—"আল্লা তুম্‌কো সেলামৎ রাখে! কাঁহাসে আতা হায়?"

১ম যুবা। মহাশয়! আমরা মান্দ্রাজ হইতে মগের মুল্লুক যাইতে ছিলাম, বাণিজ্যার্থ ও কোন ব্যক্তিকে অনুসন্ধানার্থ; এই জনহীন দ্বীপে জন-শব্দ প্রাপ্তে আশ্চর্য্য হইয়া এবং রাহী লোকের কাছে মহাশয়ের স্থান এইখানে শুনিয়া সেলাম দিতে আসিয়াছি।

ফকীর। "খয়ের! বাবা তু কাঁহাসে ক্যাওয়াস্তে আয়া?" দ্বিতীয় যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।

২য় যুবা। মহাশয়! শুনেছি আপনি ভবিষ্যৎ বক্তা আপনি কি জানেন না?

ফকীর ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল— "হাম্‌কো বঢ়াও মৎ, হজরৎশাকো পুছ্‌নেসে সব মালুম হোতা হায়! তোম্‌ক্যা মাঙতা হায় কহো—হজরৎশাকো আরজ করুঙ্গা, জবাব মিলেগা।"

১ম যুবা। প্রথম প্রশ্ন এই যে এই নির্জ্জন দ্বীপে অরণ্যে আপনি কিরূপে কাল যাপন করেন ও আহারাদি প্রাপ্ত হয়েন?

ফকীর। "লেড়কা কা তরে পুছা। ইসজাগহা মে খোদা হায় নেহি? খোদা রহনেসে খানা মিলনা ক্যা মুস্কিল হায়? যো জাহাজ হিয়াঁসে যাতা হায়, মুসলমান ইয়ানে হিন্দু সব আদমী দুয়া মাঙ্গনে

আতা হায়—আওর বন্দায়ে—খোদাকো খানা দেয়াতা হায়!”

২য় যুবা। মহাশয়, কত কাল এখানে আছেন?

ফকীর। “দেড়শোয়া বরষ সে জেয়াদা হোগা—হজরত শা ইস্ জাগ্ হামে হামকো বৈট্লায়া।” যুবারা চখোচখি করিলেন।

২য় যুবা। এখন আমাদের জন্য “দুয়া মাগ” ও আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির কি হইবে?

ফকীর। “থোড়া সবুর করো বাবা। হজরৎকো পুছ্লে।” ফকীর মহা আড়ম্বর করিয়া নমাজ পড়িলেন ও বৃক্ষের উপর চাহিয়া রহিলেন। উপর হইতে বৃক্ষশীর্ষ ভয়ঙ্কর নড়িয়া উঠিল—পাতা পড়িয়া সম্মুখে স্তূপ হইল। যুবারা বিশেষতঃ হিন্দু যুবা কিছু ভয়চকিত হইলেন। পরে ফকীর কহিলেন—“ডরো মৎ বাবা, হজরত্ খফা করেগা নেহিঁ—হাম্‌কো মালুম হুয়া তোম লোক ক্যা ওয়াস্তে আয়া হ্যায়।” ১ম যুবাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, “তু এক আদমীকো পানে মাঙ্গতা, সজাকে ওয়াস্তে, এক আদমীকো মাঙ্গতা হায় পেয়ারকে ওয়াস্তে। হজরত্ ফরমাতা হায়, পহেলা আদমী ইস্ চড়মেঁ হায়,—লেকেন্ তুমকো হাত লগেগা নেহিঁ—হজরত্ উস্ বাত্ মেঁ খফা হুয়া; আউর দুসরা চাটগাঁউমেঁ হায়,—উও তুমকো নেহিঁ মাঙ্গতা।” দ্বিতীয় যুবাকে সম্বোধিয়া কহিলেন—“তোমারা ইরাদা জলদী পুরা হোগা—তুম দুনোঁ ইস্ জাগহামেঁ তিন রোজ রহেনেসে হোগা।”

প্রথম যুবাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া ফকীর কহিলেন—“কুছ্ খতর হায় নেই, বাবা, হজরৎকো দুয়া মাঙ্গনেসে ঠাণ্ডা কর্ শক্তা হায়। হজরত্ ফরমানে সে এভি হাত লগেগা ওসকা ভি দিল্ ফিরেগা।”

যুবা আশান্বিত হইয়া কহিলেন—“কি করিতে হইবে?” “তিন রোজ ইহাঁ সেরেফ্ পানি পীকে পড়া রহনা হোগা—হামকো ভি উসি সুরতসে দুয়া মাঙ্গনে হোগা।” যুবা সহসা এমত দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিবেন কি না ভাবিয়া কহিলেন—“অদ্য যাই কল্য আসিব।” যুবাদ্বয় নৌকা বাহিয়া সমুদ্রে গেলেন। তথায় গিয়া জাহাজ দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জাহাজ নাই কেন এবং তাঁহাদের সঙ্গী কোথা গেল? ফকীর কহিলেন—“হজরৎ খফা হুয়া—তুম্ চলা গিয়া; জাহাজ ও আদমী ইধার আন্দামন তরফ্ চলা গিয়া—অভি যাও, নেহিঁ ত জাহাজ মিলেগা নেহিঁ।” ফকীরের নির্দ্দেশ মতে যুবারা আন্দামানের দিকে গেলেন।

বেলা অপরাহ্ণ হইল, পশ্চিমাকাশে ছিন্ন ছিন্ন মেঘমালা সুবর্ণ পাটীর ন্যায় শোভমান হইয়া নীলজলে লাল আভা প্রদান করিল; ক্রমে অস্তগামী রবিথাল

জলে প্রবেশ করিল এবং একবার দেখা গেল যেন সোণার মালসাটি, পরে দেখা গেল যেন সরাটী ভাসিল। যুবাদ্বয় অনাহার। নৌবাহনে কাতর হইয়া প্রকৃতি-শোভা দেখিবার অনাস্থাপন্ন হইয়াছেন। সমস্ত দিবস সুবায়ু ছিল, এজন্য সন্ধ্যাকালে একটী কূল দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া যাইতেছেন। রজনী উপস্থিত, সহসা কূল অদৃশ্য হইল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে দূরে একটী আলোক দেখা গেল। আলোক দৃষ্টে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গের ন্যায় উল্লাসে যুবাদ্বয় তদুদ্দেশে চলিলেন। রজনী প্রহর গত হয় নাই এমত সময়ে কূল প্রাপ্ত হইলেন এবং আলোকটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া কৃষকাবাস জ্ঞানে তাহার দিকে ধাবমান হইলেন। দেখিলেন দুইজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বসিয়া আছে। সম্মুখে গিয়া যেমন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহারা কে, দুই জন কাল পুরুষ কোন উত্তর না দিয়া সহসা এক এক লগুড় দ্বারা যুবা দ্বয়ের মস্তকে এমনি আঘাত করিল যে তাঁহারা অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন কৃষ্ণ পুরুষেরা উহাদিগকে বনলতা দিয়া দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ভূমে ফেলিয়া রাখিল। কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলে, হতভাগ্য যুবারা দেখিলেন তাঁহারা আবদ্ধ হইয়াছেন এবং অগ্নিকুণ্ড হইতে একটী অর্দ্ধ-দগ্ধ নর-দেহ লইয়া আততায়ীরা উল্লাসে ভোজন করিতে লাগিল। যে চেতনা জন্মিল পুনঃ পুনঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। নিশ্চয় মৃত্যু-গ্রাসে পড়িয়া উভয়ে মনে মনে সংসার হইতে বিদায় লইলেন। এক রকম প্রস্তুত হইয়া দেখিতে লাগিলেন রাক্ষসেরা কিরূপে এই ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতেছে। দেখিব না মনে করিলেও এক এক বার দেখিতে হইল। এবং যাহা দেখেন তাহাতে তাঁহাদের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। চক্ষু মুদিলেও কখন হড্‌ডিকা ভঞ্জন ও চর্ব্বণ শ্রবণে নিজ নিজ অস্থি ভঙ্গ কল্পনায় যন্ত্রণা বোধ করেন। যখন রাক্ষসেরা অঙ্গুলি চিবাইতেছে, যুবারা বোধ করিতেছেন যেন তাঁহাদের অঙ্গুলি খাইতেছে এবং তদ্রূপ যন্ত্রণার সহিত এক এক বার আপন আপন অঙ্গ দেখিতেছেন আছে কি না। এইরূপ রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রাক্ষসেরা দগ্ধ নর-দেহের ত্রিচতুর্থাংশ ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। অবোধ্য কএকটী কথা কহিয়া এবং বধ্যগণের প্রতি তাকাইয়া ঐস্থান হইতে প্রস্থান করিল। বোধ হইল কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিয়া তাহাদেরও ভোজন করিবে, অথবা অন্য কোন স্থলে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।

যে দ্বীপে যুবারা পড়িয়াছেন উহা আন্দামন দ্বীপ। ঐ স্থলের অরণ্যবাসীরা তৎকালে নরদেহ ভোজন করিত; এবং যুবারা তাহাদেরই হস্তে আপনাদিগকে ফেলিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন—বিগত চৈত্রমাসের বঙ্গদর্শনে সম্পাদকের বিজ্ঞাপনীতে এই মর্ম্মভেদী সংবাদ দৃষ্ট হইল—"চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল"। "জলবুদ্বুদ বঙ্গদর্শন জলে মিশাইল"—জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু সংবাদে যে যাতনা, এই সংবাদে আজ আমাদিগের সেই যাতনা উপস্থিত হইল! আজ সার্দ্ধ দ্বিবৎসর কাল আর্য্যদর্শন বঙ্গদর্শনের সহযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের প্রতিযোগিতা করা আর্য্যদর্শনের কখনই লক্ষ্য ছিল না। বিশেষতঃ আর্য্যদর্শনের সম্পাদকের ও লেখকগণের অনেকেরই বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অন্যান্য লেখকগণের সহিত আত্মীয়তা থাকায়, আর্য্যদর্শন—বঙ্গদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা প্রদর্শন করিতে কখনই ত্রুটী করে নাই। বঙ্গদর্শনও আর্য্যদর্শনের প্রতি সোদরোচিত স্নেহ প্রদর্শন করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। উভয়ের প্রতি উভয়ের স্নেহ, উভয়ের প্রতি উভয়ের মমতা, দিন দিন পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিতই হইতেছিল। এমন সময় কাল আসিয়া সেই স্নেহের অন্যতর আধারকে ছিন্ন করিল! হায়! জগতের কোন সুখই চিরস্থায়ী নহে!

আজ চারিবৎসর বঙ্গদর্শন বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। আজ চারিবৎসর বঙ্গের প্রতিগৃহে, প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, প্রতি বিদ্যালয়ে, প্রতি কার্য্যালয়ে—বঙ্গদর্শনের নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ধনী ও নির্ধন, উচ্চ ও নীচ, অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ, স্ত্রী ও পুরুষ এবং বালক ও বৃদ্ধ—সকলেই বঙ্গদর্শনের পাঠকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাঁহার মনোবৃত্তির যেরূপ পরিণতি তিনি ইহাতে তদুপযোগী পাঠনার বিষয় পাইতেন। কাহাকেও ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া প্রত্যাহত হইতে হইত না। কল্পবৃক্ষের ন্যায় ইহা সকলকেই পূর্ণকাম করিতেন। বঙ্গীয় সাহিত্যেতিহাসে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব একটী নূতন যুগের প্রারম্ভ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আজি চারিবৎসর বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে এক নব জীবন সংক্রামিত হইয়াছে। যখন বঙ্গদর্শনের প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। সেই অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শনই সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই গুরুভার একজনের মস্তকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে ভাবিয়া আর্য্যদর্শন, বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি বঙ্গদর্শনের সহযোগিতায় অগ্রসর হইলেন। বঙ্গদর্শন কিছুদিন একত্র সেই ভার বহন

করিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি সেই গুরুভার সহযোগিত্রয়ের মস্তকে অর্পণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইতেছেন। চতুর্ব্বাহনবাহ্য বঙ্গীয় সাহিত্যদোলা ত্রিবাহনে কিরূপে সংবাহিত হইবে জানি না। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুতে কনিষ্ঠভ্রাতৃত্রয় দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য কিরূপে সুসম্পন্ন হইবে জানি না। তবে এই এক আশা ও এই এক সান্ত্বনা—যে বঙ্কিম বাবু ঐই গুরুভার হইতে অবসৃত হইয়া এক্ষণে একাগ্রচিত্তে আখ্যায়িকা রচনায় নিমগ্ন হইতে পারিবেন। আখ্যায়িকারচনায় তাঁহার পারদর্শিতা ভাবতে অতুলনা। তাঁহার বিষবৃক্ষ, তাঁহার দুর্গেশনন্দিনী, তাঁহার কপালকুণ্ডলা অদ্ভুত সৃষ্টি বলিয়া খ্যাত। যদি এই অবসরে তাঁহার অমৃতনিঃস্যান্দিনী লেখনী হইতে বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় দুই চারি খানি আখ্যায়িকা প্রসূত হয়, তাহা হইলে সহস্র বঙ্গদর্শনের বিরহ আমরা আহ্লাদসহকারে সহ্য করিব! এক্ষণে আমরা অন্তরের সহিত বঙ্কিম বাবুর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। আমাদিগের আশা আমাদিগের বিশ্বাস—বুদ্ধির পরিপুষ্টি ও বয়সের পরিণতির সহিত তাঁহার তেজস্বিনী লেখনী হইতে এক্ষণে বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী, ও কপালকুণ্ডলা অপেক্ষাও অধিকতর পরিপুষ্ট ও পরিণত আখ্যায়িকা প্রসূত হইবে!

পরিমিতি—বর্গপরিমাণ ও জরিপ। নর্ম্যাল, বর্ণাকুলার, ও মাইনর স্কুলসমূহের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল প্রণীত। নিউ স্কুল বুক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ॥৶০ আনা মাত্র। পরিমিতি বা ক্ষেত্রব্যবহার বিষয়ে অদ্যাপি এক খানির অধিক পুস্তক ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। নৃসিংহ বাবুর পরিমিতি ক্ষেত্রব্যবহার বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তক। প্রথমোক্ত পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ বিধায় নৃসিংহ বাবু হটর, টড্‌হণ্টর প্রভৃতি নানাবিধ ইংরাজী ও ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে সমুদয় নিয়ম সরল ভাষায় সুচারুরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণও বহুসংখ্যক প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার প্রণয়ন বিষয়ে নৃসিংহ বাবু পরিশ্রম ও যত্নের ক্রটী করেন নাই। এক্ষণে আমাদিগের একান্ত কামনা যে তিনি যে উদ্দেশ্যে ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য যেন অচিরাৎ সফল হয়।

ইউক্লিডের জ্যামিতি—প্রথম অধ্যায়। টীকা ও বহুসংখ্যক অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞাসমেত বর্ণাকুলার, মাইনর ও লোয়ার বর্ণাকুলার স্কুলসমূহের ব্যবহারার্থ, শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা নিউ স্কুল বুক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৶০ আনা মাত্র। এখানি বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক অনুবাদিত জ্যামিতিব সংস্কার বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। যে যে স্থলে ব্রহ্মমোহন বাবুর অনুবাদের দোষ ছিল, যে যে স্থলে তাঁহার পারিভাষিক শব্দগুলি অস্ফুটার্থ ছিল, সেই সেই স্থলে নৃসিংহ বাবু ইহার সংস্কার সাধন করিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতির বাঙ্গালা অনুবাদকে অনেক পরিমাণে নির্দ্দোষ করিয়া তুলিয়াছেন। নৃসিংহ বাবুর ব্যাখ্যাগুলি অতিশয় বিশদ হইয়াছে। এক্ষণে বিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষগণকে অনুরোধ যে তাঁহারা এই পুস্তকখানি নর্ম্যাল, বর্ণাকুলার ও মাইনর স্কুল সমূহের পাঠ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া যেন নৃসিংহ বাবুর পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদান করেন।

মহাপুরুষের নাম।

আমরা অদ্য সুপ্রসিদ্ধ কুলতিলক মহোদয়গণের একটী তালিকা দিব, তাহা দর্শন করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে কোন্ কুলে কত জন মহামতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে কোন্ কোন্ মহাত্মার বংশ কোথায় আছে। এবং কোন্ কোন্ মহাত্মা এককালে নির্ব্বাণমুক্তি পাইয়াছেন (অর্থাৎ তাঁহাদিগের বংশাবলী নাই)।

	গোত্র।	বংশ।	নিবাসস্থান।	জিলা বা প্রদেশ।	বংশের ধারা আছে কি না।
১।	ভরদ্বাজ গোত্র	শ্রীহর্ষের বংশ	কঙ্কগ্রাম *	রাঢ়দেশ	আছে।
২।	ঐ	শূলপাণি	সাহড়ীগ্রাম *	ঐ	ঐ

শূলপাণির স্মৃতি সর্ব্বত্র আদৃত আছে। ইনি রঘুনন্দনের অনেক অগ্রবর্ত্তী কালের লোক। সাহড়ীগ্রাম আদিশূর দত্ত ষট্পঞ্চাশত্ গ্রামের একতম।

৩।	ঐ গোত্র	রায় পরমানন্দ	ডিংসাই *	ঐ দেশ	বংশ আছে।

ইনি হোসেন সা বাদসাহের সময় উজীর (প্রধান মন্ত্রী) পদে অভিষিক্ত ছিলেন। প্রথমে ডিংসাই, গৌণকুলের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তৎকালে ডিংসাই কন্যা গ্রহণে কুলীনগণের কুলচ্যুতি ঘটিত। রায় পরমানন্দের যত্নে ইহাঁরা কষ্ট শ্রোত্রিয় হইতে মার্জ্জিত শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তদবধি ইহাঁরা দুই ভাগে বিভক্ত। শত ডিংসাই ও জন ডিংসাই। শত ডিংসাই-কন্যা গ্রহণে এক্ষণে কুলীনগণের এককালে কুল ধ্বংস হয় না। কিন্তু কুলমর্য্যাদার ত্রুটি হয়। ৫৬ গ্রামের একতম। ডিংসাই শত প্রসিদ্ধ; কুলের নবগ্রহ স্বরূপ। রায় পরমানন্দ ঐ গোষ্ঠি-সম্ভূত ছিলেন।

৪।	ভরদ্বাজ	গন্ধর্ব্ব	রাই গাঁই *	রাঢ়দেশ	বংশ আছে।

রাই গাঁই নিতান্ত অচল ছিল। পরে গন্ধর্ব্বরাই কুলক্রিয়া করিয়া কষ্ট শ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হয়েন। তদবধি ইনি কুলীনগণের নিকট প্রসিদ্ধ। রাই গাঁই ৫৬ গ্রামের একতম।

* এ সকল গ্রামগুলি এক্ষণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদিগের পরিবর্ত্তে অন্য গ্রাম হইয়াছে।

৫। ভরদ্বাজ গোত্রে মুখবংশে কৃত্তিবাসের জন্ম। কৃত্তিবাস পণ্ডিত লক্ষ্মীধর হালদারের সমসাময়িক লোক। এবং জ্ঞাতি খুড়ততঃ ভাই। লক্ষ্মীধর হালদারের সময় সর্ব্বদ্বারি বিবাহ লোপ হয়। এই কালকে মেলসন্ধি বলে। কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী, পিতামহের নাম মুরারি ওঝা। মুরারি অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। মুরারি শ্রীহর্ষ হইতে ২০ বিংশ পুরুষ অধস্তন। মুরারির পৌত্র লক্ষ্মীধর হালদারের সহিত কৃত্তিবাসের সমান-পর্য্যায়। অর্থাৎ শ্রীহর্ষ হইতে দ্বাবিংশ পুরুষ অধস্তন। কৃত্তিবাসেরা ছয় সহোদর। যথা—মৃত্যুঞ্জয়, কৃত্তিবাস, মাধব, শান্তি, শ্রীকণ্ঠ, (চাকা) চক্রপাণি ও বলভদ্র। মৃত্যুঞ্জয়ের পৌত্র মালাধর, মালাধরের সময় মেল বদ্ধ হয়। মালাধর স্বনাম-প্রসিদ্ধ, মালাধর খাঁনী মেল প্রাপ্ত হয়েন। কৃত্তিবাস মেল বন্ধনের পূর্ব্বের লোক, সুতরাং কৃত্তিবাস নিজ-রচিত কাব্যে মেলের উল্লেখ করিতে পারেন নাই যথা——

বাঙ্গালা সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।	স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস। রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥	অরণ্যকাণ্ড।
	কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥	কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

৬। কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের আদ্যোপান্ত বংশাবলীর মধ্যাংশ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার ঊর্দ্ধতন কয়েক পুরুষের উপরে মদনমোহন নাম দেখা যায়, কিন্তু পুরুষ-সংখ্যায় স্থিরতা নাই। তিনি ভুরুসিটে গ্রামে ভঙ্গ হয়েন। মদনমোহন, রামনৃসিংহ ও রত্নাকর। কাঁচানার মুখুটী এই নৃসিংহের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্র বংশজ মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া নিজের বংশাবলীর বিশেষ উল্লেখ করিতে পারেন নাই। কুলীনের কুলধ্বংস হইলে ঘটকেরা আর বংশাবলী লেখেন না। সুতরাং মদনমোহন অবধিই কুল-পুস্তকে দেখা যায়। সেই হেতু বশতঃ মহামহোপাধ্যায় ভারতচন্দ্র রায় নিজবংশের বিশেষ পরিচয় দিতে পারেন নাই। যথা—

ভরদ্বাজ অবতংশ ভূপতি রায়ের বংশ
সদা ভাবে হত কংস ভুরুষুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখটী খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥ অন্নদামঙ্গল।

ভারতচন্দ্র রায়ের বংশধরগণ মূলাজোড়ে অবস্থান করিতেছেন। বংশাবলী যথা—

ভূপতি রায়—জীয়ন্তের পিতামহ } ভুরুস্থটে বাস।
নরেন্দ্র রায়—ঐ পিতা

ভারতচন্দ্র রায় মূল * } * ভারতচন্দ্র হইতে মূলাজোড়ে বাস।

(১) ভগবতীচরণ (২) [illegible] (নিঃসন্তান) (৩) রামতনু (পুত্রগণ।)

তারক (পৌত্র।)

অমরনাথ (প্রপৌত্র।)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র (বৃদ্ধ প্রপৌত্র।)

৭। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইহাঁর কৃত গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিশেষ প্রসিদ্ধ॥ ইহাঁরা ফুলিয়া খড়দহ উভয় মেলে মিশ্রিত। ইহাঁর বংশাবলী অদ্যাপি উলা গ্রামে বিরাজ করিতেছে। যথা—

নবদ্বীপ নিবসতি নরেন্দ্র ভূপতি পতি গোষ্ঠীপতি পতি যারে বলে।
তাঁহার অধিকারে ধাম দেবীপুত্র আত্মারাম মুখুটী বিখ্যাত মহীতলে॥
খড়দহ ফুলে সার বশিষ্ঠ তুলনা যার জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী।
কি দিব উপমা তার শিব শিবা অবতার ব্যবহারে হেন অনুমানি॥
তাহার তনয় দীন দুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ দয়া দারা হরিপ্রিয়া সতী।
প্রত্যাদেশ হয় তারে ভাষা গান রচিবারে স্বপনে কহিলা ভগবতী॥
নিবাস উলায় যার শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তার কথাগুলি রচিতে লাগিলা।

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

৮। পাশ্চাত্য বৈদিককুলে ভরদ্বাজগোত্রে নিমাই বিশ্বম্ভর পরে গৌরাঙ্গ বা চৈতন্য নামে প্রসিদ্ধ। ইনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। ইহাঁর বিষয় সকলেই অবগত আছেন। ইনি সামবেদী বৈদিক-কুল-সম্ভূত শ্রীহট্টনিবাসী। নবদ্বীপে এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, রঘুনন্দনের স্মৃতি রচিত হইবার সময় বিশ্বম্ভর এক খানি স্মৃতি রচনা করেন। তাহার রচনা এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে উহা প্রচারিত হইলে রঘুনন্দনের স্মৃতি কদাচ লোকসমাজে আদৃত হইত না। রঘুনন্দন অবসর বুঝিয়া চৈতন্য দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন অদ্য তোমার গৃহে ভোজন করিব। ভোজনকালে কহিলেন তুমি বল যে আমার স্মৃতি প্রচার বিষয়ে তুমি কোন ব্যাঘাত জন্মাইবে না। এবং ইহার

বিরুদ্ধে, যদি তোমার কোন বিশেষ মত থাকে তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে ভোজন করিব নচেৎ ভোজন করিব না। চৈতন্য তাঁহাতেই সম্মত হইলেন এবং নিজ-রচিত স্মৃতির প্রচার বিষয়ে হতাদর হইলেন। কেহ কেহ রঘুনাথ শিরোমণির বিরুদ্ধেও এই কথা কহেন যে তাঁহার দীধীতি গ্রন্থ অপেক্ষা চৈতন্যের ন্যায়শাস্ত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল শুনিয়া কাণাভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) চৈতন্যকে তাঁহার কৃত ন্যায়শাস্ত্র প্রচারে বিমুখ করেন! যাহাই হউক উভয় কথাতেই চৈতন্যের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ইনি নির্ব্বাণমুক্তি পাইয়াছেন।

৯। ভরদ্বাজ গোত্রে অদ্বৈত। ইনি শান্তিপুর-নিবাসী কুবের আচার্য্যের পুত্র। পঞ্চাননের পৌত্র। নৃসিংহ লাড়ুলীর অধস্তন সপ্তম * নৃসিংহ লাড়ুলী শ্রীহট্টের পাহাড়ে বাস করিতেন। তিনি বরেন্দ্র বংশের মধ্যে কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। নৃসিংহ লাড়ুলী নিজেও তাম্বুল বিক্রয় করিতেন। তদনুসারে তাঁহাকে দীনভাবে ও হীন মর্য্যাদায় কালক্ষয় করিতে হইত। তাঁহার কন্যা মধু মৈত্রে দানাবধি নৃসিংহ লাড়ুলীর বংশীয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় হয়েন। অদ্বৈত পরম পণ্ডিত ও কবি ছিলেন তাঁহার কৃত রচনা অনেক আছে। ইহাঁর বংশাবলী অতি বিস্তৃত। ইনিও রাঢ়ীয় নিত্যানন্দ উভয়ে মিলিয়া ছত্রিশ জাতি শিষ্য করেন। তদবধি এই দুই গোস্বামীরা কুলীনদিগের করে সম্প্রদান করিয়া সমাজে চলিতেছেন। কুলীন-পুত্রেরা গোস্বামীর দৌহিত্র সুতরাং কুলীনগণকে মাতামহের পাদুকা বহন করিতে হয়, তদপেক্ষা গোস্বামীর পক্ষে আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? অদ্বৈত ইত্যাদিরূপে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হয়েন।

অদ্বৈত প্রভুর বংশ যেখানে যেখানে আছে তাহা দেখ——

---

* শান্তিপুর নিবাসী গোস্বামী মহাশয়েরা কহেন অদ্বৈতমঙ্গলের শিব নৃসিংহ লাড়ুলীকে কহিতেছেন যে আমি তোমার অধস্তন সপ্তম পুরুষে অদ্বৈতনামে জন্ম গ্রহণ করিব। রাজসাহী-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত কলীতিহাস নামক লঘু ভারতে নৃসিংহ লাড়ুলীকে যে তিনি অদ্বৈত প্রভুর পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাঁরা তাহা ভুল বলিয়া থাকেন। কলীতিহাস কাপোপাখ্যান দেখ। সম্বন্ধনির্ণয়ের অদ্বৈত প্রকরণ কলীতিহাসের অনুসারে লিখিত।

স্থান।	জেলা।
১ শান্তিপুর—	জিলানবদ্বীপ
২ কুমারখালী	ঐ
গোবরঙ্গাট	ফরিদপুর
৪ গোপালপুর	ঐ
৫ নারায়ণপুর	ঐ
৬ দামুদে	ঐ পদ্মানদীর ধার
৭ চণ্ডীপুর	ঐ
৮ সলিমারী	ঐ
৯ মিলেপাড়া	ঐ
১০ মৈষেডাবা	ঐ
১১ বাহাদুরপুর	ঐ
১২ সালবাড়ী	ঐ
১৩ ছাওয়াল ভাটী	ঐ
১৪ খোসর পাড়া	মুর্সিদাবাদ
১৫ মৃজাপুর	ঐ
১৬ জিলাবাড়ী	মালদা
১৭ জিগাবাড়ী	ঐ
১৮ সেনপাড়া	ঐ
১৯ বাবলা	ঐ
২০ সেরপুর	বগুড়া
২১ গোঁসাইরামপুর	পাবনা
২২ গয়াসপুর	ঐ
২৩ ফুলবাড়ী	ঐ
২৪ জাইপাই	পাবনা
২৫ হাড়িয়া	ঐ
২৬ স্থল	ঐ
২৭ হানাকুড়	ঐ
২৮ উথলী	ঢাকা
২৯ ঢাকা	ঐ
৩০ নাটাখোলা	ঐ
৩১ মালুমপাড়া	বর্দ্ধমান

এই সকল স্থানের অদ্বৈত সন্তান গণকে শান্তিপুরের গোস্বামীরা অদ্বৈত সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন। অন্যত্রের লোক অদ্বৈত বংশের পরিচয় দিলে সহসা বিশ্বাস করেন না। আদোপান্ত পরিচয় দিতে হয়।

অদ্বৈতের বংশাবলী দেখ। অদ্বৈতের জননীর নাম লাভাদেবী।—অদ্বৈতের ছয় পুত্র যথা অচ্যুত, রূপ, জগদীশ, বলরাম মিশ্র, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল দাস। অচ্যুত অকৃতদার, পিতার সঙ্গী—যথা "অচ্যুতের যেইমত সেই মোর সার। আর সব পুত মোর হৌক ছার খার॥"

অদ্বৈতবাক্য।

রূপ ও জগদীশ পিতৃপরিত্যক্ত। বলরাম পাল দাস ও কৃষ্ণমিশ্র স্বস্থানে ছিলেন।

কৃষ্ণমিশ্রের বংশাবলী শান্তিপুরে আছে। শান্তিপুরে অদ্বৈতের যত পুরুষ হইয়াছে তাহারই একাদেশ দেখান গেল। যথা

(১) অদ্বৈত

(২) কৃষ্ণমিশ্র

(৩) রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী — দোলগোবিন্দ

(৪) যাদবেন্দু — মাধবেন্দু (রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র)

(৪) চাঁদ — কন্দর্প — গোপীনাথ (দোলগোবিন্দের পুত্র)

(৫) রামদেব — জয়দেব — মদনগোপাল

(৬) নন্দকিশোর — আন্দীরাম — শ্যামচাঁদ — রসিকানন্দ

(৭) কুঞ্জবিহারী — রামশরণ

(৮) মোহনচন্দ্র (ইনি ষষ্ঠ) মোহনেরা সাত ভাই।

(৯) নবকান্ত (ইনি জ্যেষ্ঠ) অন্য তিনজন নিঃসন্তান।

(১০) রাধাকিশোর

(১১ যদুনাথ — মদনগোপাল

(১২) চিদানন্দ।

কোন কোন বংশে অদ্বৈত হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়াছে ইহাও শ্রবণ করা যায়।

ক্রমশঃ।

মেহের আলি।

একাদশ অধ্যায়।

যে দ্বীপে ফকীর ছিল উহার অন্য নাম না থাকায় তাহাকে ফকীর-দ্বীপ বলিতে পারা যায়। সেই ফকীর-দ্বীপ মধ্যে অত্যুচ্চ এক স্থল আছে, তাহা দ্বীপের পশ্চিম কূলে। জাহাজ হইতেই ঐ স্থল দেখা যাইত, কেবল কএকটী বৃক্ষের অন্তরাল বশতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। কূল হইতে এই স্থল অতি সন্নিকট। একদা অতি প্রত্যুষে

এই স্থলে দুই যুবা ক্ষুদ্র এক নৌকা বাহিয়া উপনীত হইলেন। উভয়ের হস্তে এক এক ছুরিকা। উভয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া কি যেন সন্ধান করিতেছেন, জন্তু হউক মনুষ্য হউক কোন শীকার সন্ধান করিতেছেন। উভয়ে সেই উচ্চ বালু প্রান্তরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর এক জন বীর অপরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "সম্মুখ হইয়া দাঁড়াও আমাকে যুদ্ধ দাও।"

অপর যুবা হাসিয়া কহিলেন "কাজে কাজেই যাহাকে চাহ পাইলে না ত আর কি করিবে? যাহা হউক এখানে না থাকে চল সেই বটতলায় দেখিগে, বিলম্ব সহে না; পাষণ্ড আমাদের প্রাণনাশের পন্থা করিয়াছিল এবং ফকীর বেশে দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে; তাহাকে কিছু দণ্ড দেওয়া আবশ্যক।"

১ম যুবা। তুমি আমার হস্ত হইতে ত্রাণ পাইলে যথা ইচ্ছা যাইও ও যাহাকে ইচ্ছা দমন করিও, এখন আমাকে যুদ্ধ দাও।

২য় যুবা। কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন "সে কি! তুমি ক্ষিপ্ত হইয়াছ না কি? যুদ্ধ আবার কেন? আমি এমন যুদ্ধ দেই না।"

১ম যুবা এই কথায় সহসা দ্বিতীয় যুবার উরুদেশে পদাঘাত পূর্ব্বক কহিল "ভীরু, দে, নয় আপন প্রাণ দে; জানিস না তুই আমার পরম শত্রু; তোরই প্রাণনাশ জন্য আমি এতদূর এসেছি, আজ কথনই ছাড়িব না। কাপুরুষের ন্যায় স্বার্থ সাধন করিলে এত দিন করিতাম; কিন্তু যদিও তুই অতি হীন ও অন্ত্যজের কার্য্য করিয়াছিস্, আমি অত নীচ হইতে চাহি না। তোরও হস্তে যেরূপ অস্ত্র আমারও তদ্রূপ, আয় দেখি কাহার শোণিতের কত তেজ? কাহার শোণিতের কত পবিত্রতা?" বলিয়া মস্তকোদ্দেশে ছুরিকা প্রহার করিল।

অপর যুবা পদাঘাতে ক্ষুব্ধ সিংহের ন্যায় আস্ফালন পূর্ব্বক ছুরিকা হস্তে দাঁড়াইয়া কহিল, "নিতান্তই যদি তোর কুবুদ্ধি হইয়াছে, আয় তোর বীরত্ব দেখি।" যুবা আত্ম-রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আততায়ী যে প্রহার করিল তাহা অনায়াসে বিক্ষেপ করিলেন। পরে উভয়ে ঘোরতর নিঃশব্দ যুদ্ধ হইতে লাগিল; কেবল মধ্যে মধ্যে অস্ত্রে অস্ত্রের আঘাত শব্দ ও যোদ্ধাদের পদ চারণ শব্দ উত্থিত হইল। কখন কখন যোদ্ধাদের উভয় অঙ্গে ও কখন বা পার্শ্বস্থ তরুশাখায় অস্ত্রাঘাত হইতে লাগিল। উভয় অস্ত্র রক্তাক্ত এবং উভয় দেহও ক্ষত বিক্ষত হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে প্রথম যুবা বলিলেন, "আমি বেন কাটী চারিনু, আমার সহধর্ম্মিণীর তুই ধর্ম্মনাশ করেছিস্, তোর জীবন থাকিতে আমার ক্ষোভ যাইবে না। যে রমণীর সতীত্ব দস্যুভাবে হরণ করে, সে কি ঘৃণ্য কাপুরুষ!"

এই কথায় সহসা স্তম্ভিত হইয়া অপর যুবা কহিলেন, "যুদ্ধে ক্ষান্ত হও, আর

নহে—আমার কথা শুন, আমি তোমার শত্রু নহি। চারিলু! তোমার পত্নীর সতীত্ব কেহ নাশ করে নাই; এবং আমি যথার্থই শঙ্কর সিংহের স্ত্রী ব'লে তাহাকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলাম; কিন্তু আমার্য্য প্রকাশে নিতান্তই লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি।"

চারিলু কহিলেন "আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আর যদিচ তাহা সত্য হয় এতদিন অসহায়া যুবতী রমণী তোমার কাছে আছে তাহাকে কি অক্ষত রেখেছে?"

অপর যুবা আর কেহ নহে, মেহের আলি। মেহের কহিলেন, "হাঁ তিনি অক্ষত আছেন।" চারিলু কহিলেন "কাপুরুষ! একথা প্রাণ-ভয়ে বলিতেছিস,—কখনই তাহা সম্ভব নহে। আয় যুদ্ধ করি।"

মেহের নিজ অস্ত্র ভূমে ফেলিয়া দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইলেন ও কহিলেন "আমি অজ্ঞাতে হউক—অনিচ্ছায় হউক—দুষ্ট শঙ্কর সিংহের দুরভিসন্ধিতে হউক—তোমার পত্নীকে অপহরণ করাইয়াছি; তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে ও তোমার কাছে অপরাধী হইয়াছি, এবং এই অপরাধ জন্য যদি আমাকে নাশ করিয়া তোমার ক্ষোভ যায় আমি বাধা দিতে চাহি না। আমি কখনই যুদ্ধ করিব না। চারিলু অস্ত্র [illegible] [illegible] করিয়া নিক্ষেপ [illegible] [illegible] "নিতান্তই পালের [illegible] [illegible] যদি প্রাণ দিবে, এস—আমার অপরাধ নাই।" বলিয়া [illegible] বারম্বার আঘাত করিল। [illegible] বুঝিয়া শোণিতপাত হইতে লাগিল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেহের এবং হাসিয়া স্থির রহিলেন।

চারিলু [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] সমকক্ষের উপেক্ষাদৃষ্টিতে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "মেহেরআলি! শপথ করিয়া বলিতে পার আমার পত্নীর সতীত্ব নষ্ট হয় নাই"। মেহের কহিলেন "পারি, এবং তুমি এতদিন যে আহাজে ছিলে তাহার কি কোন চিহ্ন দেখ নাই? একভ্রমে আমি তাঁহার সর্ব্বনাশ করেছি, আর তাঁহার ক্ষতি করিতে কি আমার মন চায়? তিনি নিজে কতবার নিষেধ করেছেন—তথাপি কতক্লেশে তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু পৃথক্ আহার পৃথক্ পাক ও পৃথক্ বাস সংরক্ষণ করেছি—দেখনাই?"

চারিলু বিশ্বস্ত হইয়া অপ্রস্তুত হইলেন এবং আপনিও নিরস্ত্র হইয়া মেহেরকে কহিলেন "মেহের! ভাই! অপরাধ করেছি ক্ষমা কর। আমি মনে করেছিলাম যে তুমি যথার্থ দস্যু এবং শঙ্কর সিংহ নিরপরাধী, এখন বুঝিতেছি তোমার দোষ নাই—শঙ্কর সিংহ সকল অপরাধের মূল।" মেহের কহিলেন "শঙ্করসিংহকে পাইলে, আমি আপন প্রতিশোধ [illegible] [illegible] জন্য আমি এতদূর এসেছি, সে আমাদের উভয়েরই শত্রু। [illegible] [illegible] [illegible] বন্ধন করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া আনাইয়া [illegible]।"

পরক্ষণেই ঐ যুদ্ধস্থলে আসগর আলি, ফজর আলি, শঙ্কর সিংহ ও চারিলুর সঙ্গী ব্যক্তি আসিয়া রক্ত-চিহ্ন ও ছুরিকা দৃষ্টে ইতস্তত অনুসন্ধান করিল, কেহ আছে কিনা। চারিলুর সঙ্গীর নাম দুর্গাপতি। দুর্গাপতি কহিল "উহারা এত প্রত্যূষে আসিবে জানিতে পারি নাই,—হয়ত এক-জন বিনষ্ট ও একজন জাহাজে গিয়াছে—কিম্বা উভয়েই বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। জাহাজে গেলেই জানা যাইতে পারিবে।"

আসগর। দুর্গাপতি! মেহের চারিলু ত আন্দামানে গিয়াছিল, জাহাজেই বা কিরূপে আসিল এবং এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কি পরামর্শ হইল বল দেখি, ভবিষ্যৎ উপায় স্থির করি।

দুর্গাপতি। চারিলু আমাকে বিলক্ষণ বিশ্বাস করেন ও তাবৎকথা বলিয়াছেন। আপনার আদেশে আমি চারিলু ও মেহের আলিকে সেদিন এখানে আনি এবং আপনারই সঙ্কেতে জাহাজে গিয়া বলি, উহাঁরা পশ্চিম দিক্ দিয়া উঠিবেন। জাহাজ তথায় গেল, সহজে কি যায়? আমি বলিলাম ঐ দিক্ দিয়া যাতায়াতের সুবিধা হইবেক। আন্দামানের দিকে যাইতে বলেছিলাম উহারা গেলনা,—কিন্তু এই জন্যই যখন উহাঁরা ফিরে এলেন—আমার প্রতি সন্দেহ না করে বুঝিলেন আমি তাঁহাদের অনুসন্ধান জন্য জাহাজকে আন্দামান যাইতে বলিয়াছিলাম।

শঙ্কর সিংহ। আন্দামান হইতে উহারা কবে কিরূপে আসিলেন? তথায় রাক্ষসের ভয় জানিয়াই ফকীরজী তাঁহাদের পাঠান।

দুর্গা। হাঁ রাক্ষসে উঁহাদের এক অগ্নি কুণ্ডের নিকট বাঁধিয়াছিল; উঁহারা কিন্তু গড়াইয়া গড়াইয়া অগ্নি দ্বারা হস্তের বন্ধনচ্ছেদ করত পরস্পর বন্ধনমুক্ত হয়েন এবং রজনীতেই রাক্ষসেরা পুনরাগমন করিতে না করিতে নৌকা চালাইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে জাহাজ দেখিয়া জাহাজে উঠিলেন।

আসগর। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পরামর্শ কি হইল?

দুর্গা। চারিলু বলিলেন "মেহেরকে এত কৌশল করে ধরা আবশ্যক নাই, আমি নিজেই তাহার প্রাণবধ করিব; কাপুরুষের ন্যায় নহে, যুদ্ধে।" আমি কহিলাম যদি আপনার অত্যাহিত হয়। তিনি হাসিলেন ও কহিলেন "এই ভুজ-দ্বয়ে কি বল নাই? আর সত্যের, ধর্ম্মের কি পরাজয় আছে?" আমি কহিলাম সাবাস সাবাস!

ফজর। অদ্য এখানে কিরূপে আসিল?

দুর্গা। চারিলু আমাকে কহিলেন "বন্ধু একটী পরামর্শ দিতে পারি কিসে মেহেরকে অসন্দিগ্ধচিত্তে দ্বীপে লইয়া যাইতে পারি?" আমি কহিলাম "সহজ সহজ! মেহেরকে বুঝাও যে ফকীর দুরভিসন্ধি করিয়া আপনাদিগকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়াছে—তাহার প্রতিফল দেওয়া আবশ্যক, সে অবশ্য দস্যু হইবে। এবং তাহার শাসন জন্য উভয়ে অস্ত্র লইয়া দ্বীপে যাইবেন।"

ফজর। বেশ পরামর্শ দিয়াছিলে। যদি দুই জনে চাচাকে পাইত সর্ব্বনাশত করিত?

দুর্গা। সেই জন্যত গত রজনী শেষ হইতে না হইতে বিশেষ প্রয়োজন ব'লে দ্বীপে আসিলাম ও ফকীর জীকে সতর্ক করিলাম। মনে করেছিলাম আমরা সকলে অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া যুদ্ধ দেখিব এবং যদি মেহেরের জয়ী হইবার উপক্রম দেখি সকলে পড়ে তাহাকে বধ করিব।

আসগর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল "আল্লা! এমন দিন কি হইবে? আঃ আর কতকাল এই বৃদ্ধ বয়সে দুস্‌মন্ সঙ্গে বেড়াইব? দুর্গাপতি যদি একটু অগ্রে সংবাদ দিতে। বিসমুল্লা!—আসগর দাড়ী ধরিয়া ঘাড় কাঁপাইলেন।

শঙ্কর সিংহ। এখনও বাবে কোথা, দেখ দেখি উহারা জীবিত আছে কি নাই।

সকলে সন্ধান করিয়া না পাওয়াতে আসগর দুর্গাপতিকে কহিল—জাহাজে সন্ধান লও। দুর্গাপতি জাহাজে গেল এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ জঙ্গলে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল যদি যোদ্ধাদের কাহারও শরীর প্রাপ্ত হয়। বেলা এক প্রহর হইলে দুর্গাপতি ফিরিয়া আসিল। তাহার বদনে মলিনতা চিহ্ন দেখিয়া সকলেই নিরাশ হইল। দুর্গাপতি কহিল "পলাও পলাও, নিস্তার নাই।"

সকলে কিছু না কহিয়া এক দূরস্থ নিভৃততম জঙ্গল উদ্দেশে পলাইল এবং তথায় দুর্গাপতি বলিল, "আমি জাহাজে গিয়া জানিলাম চারিলু ও মেহেরআলি উভয়ে রক্তারক্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন, বন্য জন্তুতে তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত করেছে—জাহাজে জনরব। দেখিলাম উভয়ে এক কক্ষে শয্যায় শায়িত। আমি দেখিয়া দুঃখ ও অনুভূতি প্রকাশ করিলাম ও কারণ জিজ্ঞাসু হইলাম। মেহের নিদ্রিত ছিলেন। চারিলু কহিলেন "বন্ধু ইহার কারণ আমাদের ভ্রম। মেহের আমার শত্রু নহেন যথার্থ শত্রু শঙ্কর সিংহ। যদি তাহাকে দেখাইতে পার পরম উপকার লাভ হইবেক।" আমি কহিলাম "তাহারই বা আশ্চর্য্য কি? আপনার মনে নাই ফকীর কহিয়াছিল মেহের আলি যাহাকে সন্ধান করেন, সে ঐ চড়ে আছে? শঙ্কর সিংহ সেই ত উনি সন্ধান করিতেছিলেন।"

এ কথায় চারিলু বিরক্ত হইয়া কহিলেন "দুর্গাপতি তুমি নিতান্ত ভুলিয়াছ, সেই ফকীর প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী ও দস্যু; তাহার কথাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছিল।" আমি কহিলাম "হ'তে পারে কিন্তু বোধ হয় শঙ্কর সিংহকে এই চড়ে আমি দেখেছিলাম। ঐ ফকীরের সঙ্গে সেও থাকিতে পারে।"

শঙ্কর। বিলক্ষণ তুমিত মজার লোক!

ফজর। কি আশ্চর্য্য! তুমি কেবলই আমাদের দলের সর্ব্বনাশ করিতে আছ।

দুর্গা। না ভাই! আমি তা হলে তোমাদের বলিতে আসিব কেন?

ফক্করা। এমন তোমার বলেই বা লাভ কি? তুমি কেন একথা বলিলে?

দুর্গা। আমার অভিপ্রায় শুন তার পর রাগ করিও?

আসগর। কি অভিপ্রায়?

দুর্গা। আমি মনে করিলাম এই লোভে উহারা আমার সঙ্গে দ্বীপে আসিবে এবং তোমাদের পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করে রেখে উহাদের প্রাণ বিনাশ চেষ্টা করিব। এজন্য আমি বলিলাম "চারিলু! মহাশয় যদি আপনারা একদিন আমার সঙ্গে আসেন শঙ্কর সিংহকে দেখাইয়া দিতে পারি।" এই কথায় চারিলু মেহেরকে ডাকিয়া কহিলেন—"মহাশয়! শঙ্কর সিংহের সন্ধান পাওয়া গেল—এই চড়ে আছে।" মেহের সুপ্তোত্থিত হইয়া শুনিয়া কোন উত্তর দিলেন না। পরে ভৃত্যকে ডাকিয়া সারেঙ্গকে ডাকাইলেন ও সারেঙ্গ আসিলে কহিলেন—"সারেঙ্গ! আমাদের অমঙ্গলের হেতু একমাত্র শঙ্কর সিংহ—সে এই চড়ে আছে,—এক্ষণে লোক লইয়া তাহাকে ধরিয়া আন এবং ফকীর ও তাহার দল আমার শত্রু, তাহাদিগকেও ধরিয়া আনিবে, দুর্গাপতি তোমাদের পথ দেখাইবে।" মাল্লারা সসজ্জ হইয়া চড়ে আসিল—আমাকে অগ্রে পাঠাইল, আমি সংবাদ দিতে অগ্রসর এসেছি।

ফক্কর। বেশ! এখনও একথা বল নাই আমরা ৪। ৫ জন বৈত নয়—আক্রমণ করিলে উপায় কি?

দুর্গা। তাঁহাদের জোট হইতে দেরী আছে—আপনারা আপনাদের জাহাজে উঠুন, বলে এদিকে জাহাজ আনাইলাম?

সকলে তীরাভিমুখে ধাবমান হইল এবং যাইতেছে এমত সময়ে শব্দ শুনাগেল। স্থির হইয়া শুনাগেল,

"দুর্গাপতি হই হো ও ও ও। কি ধ'র গিয়া হো ও ও ও।"

সকলে দুর্গাপতিকে নীরব থাকিতে বলিল ও ঊর্দ্ধশ্বাসে তটাভিমুখে চলিল। পরে দ্বীপের উচ্চভাগ হইতে শব্দ হইল।

"দুর্গাপতি হই, উল্লুক, কাঁহা তেরী শঙ্কর সিং আউর ফকীর।" পুনঃ দুর্গাপতি নীরব রহিল এবং দলবল নৌকায় উঠিল। দুর্গাপতি, তখন ফিরিয়া শুনিল, "ভালা! কিস্‌কো নেঞি মিলে তোম্‌কো লেআউঙ্গা, জুয়াচোর!" ঐ কথা শুনে দুর্গাপতির ভয় হইল—নৌকাবাহীদের ডাকিল তাহাকে লয়ে যায়—তাহারা এল না। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

দুর্গাপতি অনেক কৌশল করিল যে তিনি শঙ্কর সিং ও ফকীরকে এই দিকে আসিতে দেখিয়া নিঃশব্দে অনুসরণ করিতেছিলেন পরে তাহারা নৌকা বাহিয়া গেল। মাল্লারা তাহা বুঝিল না তাহাকে জুয়াচোর বলিয়া বিলক্ষণ প্রহার করিল। একে দ্বিপ্রহর রৌদ্র তাহাতে অনাহার ও নিষ্ফল যাত্রা, মাল্লাদের আক্রোশ দেখে কে? দুর্গাপতি যথোচিত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বন্দীবেশে মেহেরআলির কাছে নীত হইলেন।

দুর্গাপতি কাপুরুষ, কাপুরুষ না হইলে কি কেহ গুপ্তচর হইতে পারে? প্রাণ নাশ আশঙ্কায় মেহেরআলির পদানত হইল এবং কহিল "আমাকে ক্ষমা করেন ত আমি সকল কথা জ্ঞাপন করি। সকল ষড়যন্ত্র প্রকাশ করি।"

মেহের। তথাস্তু, ভয় নাই, কি বল্! তোর ক্ষুদ্র প্রাণ মেরে আমার কি হইবে? দুর্গাপতি কহিল "মহাশয়! আপনি বড়ই সদাশয়! আমি নিতান্ত অর্থগৃধ্নু তাই একর্ম্মে প্রবেশ করেছিলাম—এক্ষণে বিলক্ষণ জ্ঞান পাইলাম। জন্মে ভুলিব না।" মেহের ও চারিলু পরস্পর চাহিলেন ও মেহের কহিলেন "কি হইয়াছে সব বল ত ক্ষমা করিব নচেৎ নহে।"

দুর্গা। "মহাশয় আর গোপন করিয়া কি হইবে?" দুর্গাপতি আদ্যোপান্ত ইতিহাস কহিতে লাগিল।

"মহাশয় আমার বাটী মসুলীপট্টনের কিঞ্চিৎ উত্তরে। আমাকে এক দিন এক জন অর্থাগমের উপায় বলিয়া এক মোসলমানের কাছে লইয়া যায়। মোসলমান মসুলীপট্টনের বন্দরের এক জাহাজে ছিল, তাহার নাম পরে শুনিলাম রকিমুন্নিসার জাহাজ।"

মেহের শিহরিলেন ও কহিলেন "অধিপতি কে?"

দুর্গা। শুনিলাম—আসগর আলি নামক এক মুসলমান।

মেহের, অধোমুখে ভাবিতে লাগিলেন।

দুর্গা। আসগর আলি আমাকে অনেক অর্থ দিয়া ক্রমে বশ করিয়া কহিলেন "সে দিন যে মকদ্দমা হইল—বেন্ কাটী চারিলু, জান?" আমি কহিলাম "জানি।" "তাঁহাকে বল যে মুসলমান যুবা তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছে ও সতীত্ব নাশ করিতেছে—তাহার যদি দণ্ডাকাঙ্ক্ষা থাকে এই পরামর্শ করে।" "কি?" "যে তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ছদ্মবেশে সদাগর হইয়া মেহের আলির জাহাজে উঠে এবং তাহাকে বলিয়া কহিয়া আন্দামানের এই দ্বীপের নিকট আসে। তথায় এক ফকীর আছে সেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ করিবেন।"

চারিলু। হাঁ সত্য বটে আমাকে এই রূপে এই পাষণ্ড লওয়াইয়াছিল।

দুর্গা। শঙ্কর সিংহ ঐখানে গিয়াছে, মেহেরকেও অন্য লোক দ্বারা জ্ঞাপন করিয়া আসগর আমাকে চারিলুর সঙ্গী করেন। আমি আন্দামনে আসিয়া দ্বীপে আসগরকে ফকীর-বেশী ও শঙ্কর সিংহকে দেখিলাম। মেহের আপন হৃদয়ে হস্ত দিয়া আকাশ পানে চাহিলেন ও চারিলুকে কহিলেন "পরে জানিবেন ঐ আসগর আমার বিষম শত্রু।"

দুর্গা। আসগরের পরামর্শে আমি আপনাদের ফকীরের কাছে লইয়া যাই। ফকীর উভয়কে বিপদে ফেলিবার জন্য জাহাজ অন্য স্থলে রাখাইতে আমাকে সঙ্কেত করেন এবং স্বয়ং উভয় যুবাকে নির্জ্জীব করিতে চেষ্টা করেন। চারিলু মহৎ লোক, নীচ ভাবে আমাদের সহিত

যোগ দিবেন না জেনে আমরা উভয়কে দুর্ব্বল করিতে সচেষ্ট ছিলাম।"

চার্লিলু ও মেহের পরস্পর তাকাইলেন।

দুর্গা। পরে যখন আপনারা আন্দামান হইতে নিরাপদ আসিলেন, আমিই চারিলুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে উৎসাহ দেই; এবং লওয়াই।

চারিলু। এখন দুরভিসন্ধি বুঝিতেছি কিন্তু আমার নিজেরও ঐ অভিপ্রায় ছিল।

দুর্গা। "পরে আপনারা যুদ্ধে যাইবার অগ্রে আমি আসগর কে সংবাদ দেই ও আমরা সকলে ৫ জনে যুদ্ধস্থলে আসি, যে কোন মতে মেহেরকে বধ করিতে পারি।"—মেহেরকে দেখিয়া কহিলেন "গোলাম পদানত ক্ষমা করুন।" মেহের রোষ দমন করিয়া কহিলেন "বল বল।"

চারিলু। ৫ জন কে কে ছিলে?

দুর্গা। আসগর আলি ফকীর, আমি, শঙ্কর সিং, ফজর আলিও আর একটী নাম জানি না।

মেহের হাঁসিয়া কহিলেন "এত লোকেও আমাদের মারিতে সাহস হইল না?"

দুর্গা। মহাশয়! আপনাদের তেজ দেখে ভয় হয়। যাহা হউক আমরা আপনাদের না দেখে ও রক্তাক্ত ছুরিকা দেখে ভাবিলাম, আপনাদের কেহ মরিয়াছেন। পরে আমি জাহাজে প্রকৃত সংবাদ পাইয়া চেষ্টা করিলাম যাহাতে পুনশ্চ আপনারা ঐ দ্বীপে যান, যে আমাদের ষড়যন্ত্র সিদ্ধ হয়। তাহার ফল এই হইল—এখন আমাকে মারুন আর কাটুন।

মেহের। তাহারা কোথা গেল?

দুর্গা। আপন জাহাজে উঠিল—আমি ডাকিলাম তথাপি আমাকে লইল না।

চারিলু। "খুব হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

মেহের। জাহাজ কোন্ দিকে গেল জান?

দুর্গা। জাহাজ গঞ্জাম যাইবে কহিল—কারণ আমাকে বলিয়াদিল যে শঙ্কর সিং গঞ্জাম গেল বলিবে ও আপনাদের সেই খানে লইয়া যাইতে বলিল।

মেহের কহিলেন "দুর্গাপতি, তোমার অপরাধ কঠিন, কিন্তু অভয় দিয়াছি ভয় নাই।" পরে সারেঙ্গকে ডাকিয়া কহিলেন মাস্তলে লোক উঠাইয়া দেখ আর একটী জাহাজ দেখা যায় কি না ও কোন্ দিকে যাইতেছে। ঘরে এই দুষ্টকে কএদ রাখ কষ্ট দিও না তবে ছাড়িয়াও দিও না। দুর্গাপতি ভয়-কম্পিত হইয়া আপন ভাগ্য জিজ্ঞাসা করায় মেহের কহিলেন "ভয় নাই তোমাকে গৃহপ্রাপ্ত কালসর্পের ন্যায় জঙ্গলে ছাড়িয়া দিব।" "তাহা হইলেও ত মরিব।" "আচ্ছা নয় হিন্দুস্থানের কোন গ্রামে ছাড়িয়া দিব।"

চারিলু-পত্নী উভয় আহত ব্যক্তিরই রোগের সেবা করিতেন—চারিলু উঁহি সেবা লইতেন না। চারিলু একটু সুস্থ হইলে এক দিন মেহের আলি তৎপত্নীকে কহিলেন "চারিলু-পত্নী, এই আমার বন্ধু কে এবং আমারা উভয়ে কেন আহত হইলাম জানেন?" চারিলু-পত্নী আশ্চর্য্য হইয়া

কহিলেন "কেন, উনি এক সদাগর এবং আপনারা উভয়ে চড়ে বন্যজন্তুর আঘাতে আহত হইয়াছেন।" মেহের হাসিয়া কহিলেন "না।"

চারিলুপত্নী। তবে কি?

মেহের। আমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে আহত হয়েছি।

রমণী শিহরিয়া উঠিলেন।

মেহের।—আর উনিই আপনার স্বামী বেন্‌কাটী চারিল্‌।

রমণী একবার চারিলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন ও পরক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভৃত্য আসিয়া জল সেচন ও বীজন করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া রমণী আপন স্বামীর চরণে মস্তক দিয়া অজস্র কাঁদিতে লাগিলেন। চারিল্‌ কহিলেন "যাহা হইবার হয়েছে তোমার কপাল ও আমার কপাল।" মেহের উঠিয়া অন্যত্র গেলেন এবং চারিল্‌কে কহিলেন "মহাশয়! আমার এক অনুরোধ—প্রতিজ্ঞা করুন আপনি রমণীর প্রতি কোন অহিতাচার করিবেন না।" চারিল্‌ কহিলেন "না এখন না।" "কখন?" "শঙ্কর সিংহকে দমন করে, বৈর-নির্যাতন করে, তার পর।" "তাহাও হইবে না আপনি জানুন আমার কি আপনার স্ত্রীর কণামাত্র দোষ নাই।" চারিল্‌ কহিলেন "পরের কথা।"

এতক্ষণ রমণী ক্রন্দন-স্রোতে ভাসিতেছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিলেন "প্রভু কপাল ভাঙ্গিয়াছে ত আমার একা ভাঙ্গুক আপনি কেন আর এ হতভাগিনীর নিমিত্ত দুঃখভাগী হয়েন? কেনই বা আপন প্রাণ সংশয় করেন এবং নিরপরাধী ব্যক্তির আততায়ী হয়েন।"

চারিল্‌। নিরপরাধী কে?

পত্নী। মেহেরআলি?

চারিল্‌। কিসে?

পত্নী। শঙ্কর সিং দুষ্টামী করে আমাকে ধরায়, এবং তাহার প্রবঞ্চনা জানিয়াই মেহেরআলি যৎপরোনাস্তি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত আমাকে সংরক্ষণ করিয়াছেন।

চারিল্‌। সত্য বল—তোমার সতীত্ব—

পত্নী। আপনি গুরু আপনার অঙ্গ স্পর্শে দিব্য করিতেছি কোন পর পুরুষ আমাকে স্পর্শও করিতে সাহস পায় নাই।

চারিল্‌। সত্য?

পত্নী। চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষাও সত্য?

চারিল্‌। আচ্ছা তোমার মনে সতীত্ব ছিল কি না আছে কি না?

রমণী পুনঃ পদানত হইয়া কহিলেন অপরাধ মার্জ্জনা করেন ত বলি; আপনার কাছে কিছুই অগোচর রাখিব না। আর ভয়ই বা কি? আপনি আমাকে বিনাশ করিলেত আমি বাঁচি।

চারিল্‌। কি হইয়াছে বল? কেহ যদি অত্যাচারকরিয়া থাকে তাহার দণ্ড না দিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।

পত্নী। আমার শরীর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ; কিন্তু মন তত নহে।

চারিল্। সে কি?

পত্নী। বলিতে কি, আমি মনে করিলাম যে আর আমাকে তুমি লইবে না, আমাকে হয় মরিতে হইবে নয় কষ্টে জীবন-যাত্রা করিতে হইবে। পাছে কেহ আমার সতীত্ব নাশ করে এবং আমি সাধারণ লোকের ক্রীড়ার বস্তু হই এই ভয়ে মেহেরকে বিবাহ করিতে চাহি।

চারিল্ কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইলেন।

পত্নী। কিন্তু তিনি বিবাহ করিবেন না—আমাকে চিরকাল আপন ধর্ম্মে ও ইচ্ছায় সংরক্ষিত রাখা তাঁহার সঙ্কল্প জানিয়াছ।

চারিল্। এখন তোমার ইচ্ছা কি?

পত্নী। ইচ্ছা অতি উচ্চ কিন্তু সাহস হয় না।

চারিল্। কি?

পত্নী। যদি আপনি গ্রহণ করেন।—

চারিল্ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তদবধি উহাঁদের আর কথা হয় নাই, কিন্তু চারিল্-বধূর শেষ শুশ্রূষা ও সুনীতি দেখিয়া বেন্কাটীর হৃদয় অনেক নম্র হইল। গঞ্জাম যাইতে না যাইতে তাঁহার অনেকবার ইচ্ছা হইল—জাতি যাউক আর থাকুক—আপন পত্নীকে পুনঃ গ্রহণ করেন। অবশেষে তাহাই হইল—এবং গঞ্জামে চারিল্ ও তৎপত্নী মেহের আলির নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং মেহেরও এই গুরু ভার হইতে মুক্ত হইলেন।

ক্রমশঃ।

কপালকুণ্ডলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

লুৎফউন্নিসার এই হৃদয়-প্রতিঘাতে আর একটি ধর্ম্মোপদেশ নিহিত আছে। সে ধর্ম্মোপদেশ যদিও সামান্য, কিন্তু বঙ্কিমবাবু তাহা এরূপ উদ্দীপক বাক্য-পরম্পরায় এবং উপযুক্ত অবসরে সেই রমণীরত্নের মুখ দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন যে তাহা নিতান্ত পুরাতন হইলেও আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করে। আমরা আর একবার লুৎফউন্নিসার দৃষ্টান্তে শিক্ষিত হই। তাঁহার হৃদয়ের অনুতাপে আর একবার গলিয়া যাই। আর একবার পাপ-পথে ঘৃণা জন্মে। ঘৃণা জন্মে কেন?—লুৎফ-উন্নিসার জীবিত ও দগ্ধীভূত হৃদয়ের অনুতাপ দেখিয়া। বোধ হয় তাঁহার হৃদয় যেন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, সুবর্ণপ্রায়

উজ্জলিত বিভায় ধর্ম্ম-জীবনে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়-প্রতিঘাত তদীয় হৃদয়ে এই অনুতাপ আনিয়াছে। এই দেখুন সেই অনুতাপ-পাবকে তাঁহার হৃদয় কেমন বিগলিত হইয়া পবিত্র হইতেছে!

"অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফল লাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তি জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশে এতদূর করিলাম তাহার কোন টাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, সকলই তো পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করিলাম। যে ইন্দ্রিয়ের জন্য আর সকল ভোগই বিসর্জ্জন করিতে পারি, সে ইন্দ্রিয়ও অবাধে পরিতুষ্ট করিয়াছি। এত করিয়াও কি হইল? আজি এই খানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, একদিনের তরেও সুখী হই নাই; এক মুহূর্ত্ত জন্যও কখন সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্যে? এসকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন একদিনের তরেও সুখী হইতাম।

* * * * * * * *

তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছি আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম; বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষণে আগুণের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখন আগুণ স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি যদি পাষাণ মধ্যে খুজিয়া একটা রক্তশিরা-ধমণী-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই?"

এই অনুতাপ-বাক্য-পরম্পরায় মতিবিবির হৃদয়-ভাব কেমন স্ফটিকবৎ প্রতীত হইতেছে! তাঁহার এই অনুতাপ দেখিয়া আমাদিগেরও ইন্দ্রিয়সুখে বিতৃষ্ণা জন্মে। আমরা ভাবি যিনি লুৎফউন্নিসার ন্যায় বিলাসপথে আশার উচ্চ শৃঙ্গে উঠিতে যাইবেন, তাঁহাকে এক দিন লুৎফউন্নিসার ন্যায় অবশ্য কাঁদিতে হইবে। তিনি সম্পদ ও গৌরবের আস্পদ হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত সুখ-সম্ভোগে তিনি বঞ্চিত থাকিবেন। পাপপথে যে কিছুই সুখ নাই, লুৎফউন্নিসা তাহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

লুৎফ-উন্নিসা এই পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যপথে যাইলেন। সে কার্য্যের পরিণাম পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা একবার যে পথে পদার্পণ করিয়াছেন তিনি সে পথ সহজে পরিত্যাগ করিবার পাত্রী নহেন। নবকুমার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তিনি সহজে নবকুমারকে ছাড়িবার নহেন। তিনি

নবকুমারের জন্য আগ্রার সমুদায় ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছেন। বিসর্জ্জন দিয়া যে সংকল্পে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার তিনি একশেষ.না করিয়া কথনই ছাড়িবেন না। তাঁহার চরিত্রে এই অটল অধ্যবসায়, ও উদ্যোগ সর্ব্বস্থানে বর্ত্তমান। তিনি আগ্রার সিংহাসনও সহজে ছাড়েন নাই। সেই সিংহাসনের আকাঙ্ক্ষিনী হইয়া তাহা লাভার্থ তিনি কথন যত্নের ক্রটি করেন নাই। যাহা তিনি ধরিতেন তাহাতে সিদ্ধ হইবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেন—এই তাঁহার চরিত্রের একটি অমূল্য গুণ। বুদ্ধিমতী ও কৌশলময়ী লুৎফ-উন্নিসা সম্পূর্ণ উদ্যোগিনীও ছিলেন।

কপালকুণ্ডলার উপাখ্যানে এই মতিবিবির চিত্র যেমন উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে, এমত কাহারই নহে। মতিবিবির চিত্র বর্ণে উদ্ভাসিত, কপালকুণ্ডলার চিত্র বর্ণে মৃদুরঞ্জিত। মতিবিবির চিত্র সুস্পষ্ট উজ্জ্বল, কপালকুণ্ডলার চিত্র অস্পষ্ট মলিন। একের চিত্রে উজ্জ্বলতা আছে, অন্যের চিত্রে মৃদু মাধুরী আছে। একের চিত্রে সরলতা আছে, অন্যের চিত্রে বৈচিত্র্য আছে। মতিবিবি প্রভাময়ী, কপালকুণ্ডলা মুগ্ধকরী। মতিবিবির চিত্রে তুলিকারেখা বর্ণ-গৌরবে অলক্ষিত, কপালকুণ্ডলার চিত্র কতিপয় সরল রেখায় অঙ্কিত। মতি বিবি আমাদিগের মনে পূর্ণ বিভায় অঙ্কিত হয়েন, কপালকুণ্ডলা আমাদিগের মনে ছায়ারূপে বিচলিত হইয়া বেড়ান। মতিবিবি কল্পনায় স্থির থাকেন, কপালকুণ্ডলা চঞ্চলভাবে এক একবার কল্পনাকে যেন বিক্ষুব্ধ করিয়া উদিত হয়েন। মতিবিবিকে কল্পনা স্থিরনয়নে দেখিতে পারে, তাঁহার চিত্র সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারে, তাঁহাকে আঁকিতে সাহসী হয়; কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে গিয়া ভ্রান্ত হয়, তাঁহার চিত্র সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারে না, লিখিতে সাহস হয় না। একজন পার্থিব, অন্য জন কাল্পনিক। একজন মূর্ত্তিময়ী, অন্য জন ভাবময়ী। মতিবিবিকে এই জন্য অনেক সম্পূর্ণ দেখায়, কপালকুণ্ডলাকে এই জন্য অনেক অসম্পূর্ণ দেখায়। মতিবিবি সুনিপুণ চিত্রকরের মূর্ত্তি, কপালকুণ্ডলা কবির কল্পনাময়ী মূর্ত্তি মতিবিবিকে কবি চিত্র করিয়াছেন, কপালকুণ্ডলাকে কবি কল্পনা করিয়াছেন। মতি বিবি কল্পনাকে পূর্ণ করেন, কপালকুণ্ডলা কল্পনায় ধারণা হয় না। এই জন্য মতিবিবিকে প্রকাণ্ড দেখায়, কপালকুণ্ডলাকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখায়। মতিবিবি পার্থিব সুন্দরী, পৃথিবীকে গুণ-গৌরবে ও রূপ-প্রভায় আলোকিত করিয়াছেন; কপালকুণ্ডলা সুরসুন্দরীরূপে মেঘাবলীর মধ্য হইতে যেন দেখা দিলেন, ক্ষণিক পৃথিবীকে মোহিত করিয়া আবার মেঘাবলী মধ্যে যেন অদৃশ্যা হইলেন। মতিবিবির পার্থিব রূপ-রাজ্য পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিয়াছে, কপালকুণ্ডলা ক্ষণিক উদিত হইয়া পৃথিবীতে তাঁহার রূপ-গরিমার যেন ক্ষণপ্রভা রাখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমবাবু মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলার চরিত্রে যে চিত্র প্রক্ষেপণ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় অনেকদূর আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এই দুই ললনারত্নের আপেক্ষিক ভাব ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতেও ত্রুটি করি নাই। মতিবিবিকে গ্রন্থকার যে স্থলে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা মতিবিবির জীবন-কাব্যের এক নূতন সর্গের প্রারম্ভ মাত্র। কল্পনা এই সর্গকে প্রবৃদ্ধ করিতে চাহে। প্রবৃদ্ধ করিতে গিয়া তাহাকে কতপ্রকার নূতন ভাবে ও প্রেমময় সঙ্কল্পে পরিপূর্ণ করে! মতি বিবিকে আমরা বাঙ্গালিনী পদ্মাবতী রূপে পুনর্জ্জীবিতা দেখি। তথাপি মতিবিবিকে লাভ করিতে ভয় হয়, কপালকুণ্ডলাকে লাভ করিতে ইচ্ছা জন্মে; কিন্তু মনে হয় কপালকুণ্ডলা সংসারাশ্রমের সুযোগ্যা পাত্রী নহেন। মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলা উভয়েই অদমনীয়া ও সাহসিনী। মতিবিবি স্বীয়-তেজস্বিতায় সাহসিনী, কপালকুণ্ডলা অজ্ঞানতায় সাহসিনী। ইহাঁরা কেহই যেন গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিবার নহেন, যেন স্বাধীন ও দুর্দ্দান্তভাবে বেড়াইতে চান। কিন্তু ইহাঁদিগের এই চরিত্র-সাদৃশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থার পরিণাম। দুই-জনে বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়া এক স্রোতে মিশিয়াছেন। মিশিয়াই, ইহাঁদিগের উভয়েরই এমন স্বাধীন ভাব আছে, যে একত্রে কিছুকাল থাকিবার নহে। দুই স্রোত দুই দিকে প্রবাহিনী রূপে চলিয়া গেল।

কপাকুণ্ডলার উপন্যাস-চিত্রে এই দুই দুর্দ্দমনীয়া রমণীর অপর পার্শ্বে কাপালিক গম্ভীর মূর্ত্তিতে বসিয়া রোষদৃষ্টে যেন কটাক্ষপাত করিতেছেন। তাঁহার নিকট যেন ইহাঁদিগের শাসনদণ্ড রহিয়াছে। তাঁহার নিকটস্থ হইতে ভয় হয়, তাঁহার মূর্ত্তি কি ভীষণ, তন্ত্রপ্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপ কি ভয়ঙ্কর; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের কঠোরতা ও মন্ত্রণা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর! সে মন্ত্রণার দারুণ নিষ্ঠুরতা হেতু, তাহা মতিবিবির মন্ত্রণার সহিত মিশিতে পারিল না। মতিবিবি তত নির্ম্মম হইতে পারিলেন না। এই কাপালিকের ভয়ঙ্কর চিত্র বঙ্কিম বাবু কেমন গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ করিয়াছেন! এই কাপালিকের সম্মুখে সাগর, চারিদিকে বনস্থলী, নিকটে শ্মশান ভূমি; সকলই ভয়ঙ্কর! তিনি সেই বনমধ্যে যেন দুর্জ্জয় শার্দ্দূলের ন্যায় বসিয়া থাকেন। মনুষ্য দেখিলেই তাহাকে বলিদান দেন। তাঁহার গম্ভীর বাক্য ধ্বনি সাগর গর্জ্জনের ন্যায় বনমধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি যখন নবকুমারকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছেন, এবং কপালকুণ্ডলা নবকুমারের কর্ণে যখন বলিয়া গেল, "এখনও পলাও, এবং সেই কথা কাপালিক আকর্ণন করিয়া গম্ভীর ভাবে যেমন কহিলেন "কপাল-কুণ্ডলে!" তখন তাঁহার সেই স্বর মেঘগর্জ্জনবৎ নবকুমারের কর্ণে এবং বনমধ্যে ধ্বনিত হইল। আবার দেখুন কি ভয়ঙ্কর চিত্র! "নবকুমার জিজ্ঞাসা

করিলেন 'আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন?'

কাপালিক কহিল 'পূজার স্থানে।'

নবকুমার কহিলেন 'কেন?'

কাপালিক কহিল 'বধার্থ।'

অতি তীব্র বেগে নবকুমার নিজ হস্ত টানিলেন। যে বলে তিনি হস্ত আকর্ষিত করিয়াছেন, তাহাতে সচরাচর লোকে হস্ত রক্ষা করা দূরে থাকুক—বেগে ভূপতিত হইত। কিন্তু কাপালিকের অঙ্গ মাত্রও হেলিল না—নবকুমারের প্রকোষ্ঠ তাঁহার হস্তমধ্যেই রহিল। নবকুমারের অস্থিগ্রন্থি সকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল। মুমূর্ষুর ন্যায় কাপালিকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।"

আবার বলি কি ভয়ঙ্কর চিত্র! যম যেন নিজে নবকুমারকে মৃত্যুপার্শ্বে লইয়া যাইতেছেন।

বঙ্কিম বাবু উপন্যাসকারের যথারীতি অনুসারে এই কাপালিকের ইষ্টসিদ্ধি হইতে দেন নাই। কপালকুণ্ডলার দয়ার ব্যবহারে নবকুমার মুক্ত হওয়াতে কাপালিকের কার্য্যকে অধিকতর ঘৃণার্হ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি ভঙ্গে পাঠক সন্তোষ লাভ করিলেন। কাপালিক তখন রোষ-প্রজ্জ্বলিত হইলেন। রোষ প্রজ্জ্বলিত হইয়া একবার সাগরকূলে বৃহৎ বালিয়াড়ি স্তূপের শিরোদেশে দাড়াইয়া ভীম কালপাহাড়ের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, কোথা দিয়া শিকার ও কপালকুণ্ডলা পলাইয়াছে। কল্পনা এ চিত্রকে অনুমান করিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়!

বঙ্কিম বাবু যখনই এই কাপালিককে দেখাইয়াছেন, তখনই তাঁহাকে হয়তো এক ভয়ঙ্কর স্থানে, এবং এক এক ভয়ঙ্কর সময়ে উপস্থাপিত করিয়া আমাদিগের কল্পনাকে সহসা একেবারে আশঙ্কিত করিয়াছেন। এই কাপালিক যখন বনস্থলী পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত, তখন দেখুন বঙ্কিম বাবু সহসা তাঁহাকে কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় পাঠকের সম্মুখে আনিয়া ছিলেন।

"কপালকুণ্ডলা দ্রুত পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। দ্রুত পদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার সময়ে যেন পশ্চাদ্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছেন। বনত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র বনপথে আসিয়া বাহির হইলেন। তথায় তাদৃশ অন্ধকার নহে; দৃষ্টিপথে মনুষ্য থাকিলে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন তাঁহার চিত্তভ্রান্তি জন্মিয়াছে। অতএব দ্রুত পদে চলিলেন। কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্যগতিশব্দ শুনিতে পাইলেন। আকাশ নীল কাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল। কপালকুণ্ডলা আরও দ্রুত চলি-

লেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহ প্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি ভীষণরবে প্রঘোষিত হইল। কপালকুণ্ডলা দৌড়াইলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল সেও যেন দৌড়াইল, এমত শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ, এবং অশনিসম্পাত শব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গনভূমি পার হইয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গনের দিকে সম্মুখ করিলেন। বোধ হইল যেন প্রাঙ্গন-ভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবার বিদ্যুতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগরতীরপ্রবাসী সেই কাপালিক!”

আর আমরা পাঠকের সম্মুখে এই বিভীষণ চিত্র ধরিতে চাহি না। তাঁহার নাম করিলেই আমাদিগের ত্রাস হয়; আমাদিগের কল্পনা ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। এই কাপালিককে অধিকতর ঘৃণার্হ করিবার জন্য কবি তাঁহাকে—নির্দ্দোষিণী, সরলা, দয়াশীলা কপালকুণ্ডলার যথার্থ সপ্তগ্রামে আনিয়াছেন। কাপালিক যখন সেই নির্দ্দোষিণী ললনারত্নের নিধন সাধনার্থ ফিরিতে লাগিলেন, তখন কাহার না রক্ত শিরায় শিরায় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে? কে না কল্পনায় কাপালিকের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন?

কাপালিক, কপালকুণ্ডলা, ও মতি বিবি, বঙ্কিমবাবুর এই তিনটি বৃহৎ চরিত্র কার্য্যশীল। নবকুমার লক্ষ্য। এই তিন জনের মধ্যে যিনি যখন কার্য্য করিতেছেন, একাকী কি সমবেত হইয়া, সে কেবল নবকুমারের হৃদয় ব্যথিত করিবার জন্য। নবকুমারের হৃদয় বৃহৎ ক্ষেত্রময়; সকল প্রহরণ, সকল আঘাত সেই ক্ষেত্রে আসিয়া লাগিতেছে। যে প্রহরণে তিনি যেরূপ ব্যথিত হইয়াছেন, বঙ্কিম বাবু তাহা দেখাইয়াছেন। নবকুমারের হৃদয় যদি উগ্রভাবাপন্ন হইত, তাহা হইলে উক্ত চরিত্রত্রয়ের কার্য্য সকলের সহিত সেই হৃদয় বিঘর্ষিত হইত। একবার উগ্রভাব ধারণ করিয়া চরণতলস্থ লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিল। লুৎফউন্নিসা যবনী না হইলে বোধ হয় এস্থলেও নবকুমার উগ্রভাব ধারণ করিতেন কি না, সন্দেহ। কিন্তু সে আঘাত লুৎফউন্নিসার হৃদয়স্রোতকে ফিরাইতে পারিল না। তাহাতে লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়স্রোত দ্বিগুণ বেগে বহিল। নহিলে নবকুমারের হৃদয় অতি কোমল ও দুর্ব্বল। তিনি প্রতি বায়ু-ফুৎকারে বিচলিত হন। তাঁহার হৃদয় মৃৎপিণ্ডবৎ। সে হৃদয়ে সকল প্রহরণের অঙ্কপাত হয়। তাঁহার হৃদয়ের সুকুমার ভাব এত প্রবল, যে তাহাতে

তাঁহার বিমৃশ্যকারিতাও দুর্ব্বল হইয়াছে। তিনি অবস্থার দাস; ঘটনাস্রোতের তৃণ। ঘটনার প্রতিরোধে দাঁড়ান তাঁহার সাধ্য নহে। তিনি ঘটনায় নীয়মান না হইলে কপালকুণ্ডলার উপন্যাসজাল বিনাস্ত ও বিজড়িত হইত না। বঙ্কিমবাবু নবকুমারকে এই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ না করিলে অপর চরিত্রত্রয় কার্য্য করিতে পারিত না।

কপালকুণ্ডলার পুরুষ পাত্রগণ যে অতি যৎসামান্য তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না। তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবিই প্রধানা। বঙ্কিমবাবুর প্রায় সকল উপন্যাসই স্ত্রীপ্রধান। তিনি স্ত্রীজাতির প্রকৃতি ও চরিত্র, অন্ত ও বাহ্য সৌন্দর্য্য, এবং মাধুর্য্য ও কমনীয়তা যেমন চিত্রিত করিতে পারেন যদি অপর জাতির পৌরুষ ভাব তদ্রূপ অঙ্কিত করিয়া স্বদেশীয়গণের সম্মুখে তাহার চিত্র ধরিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার উপন্যাসাবলি দ্বারা দেশের আর একটী উপকার সাধিত হইত। লোকে পুরুষত্বের গৌরব জানিতে পারিতেন। এক একটী উপন্যাসের চিত্র তাঁহাদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত। তাঁহারা সেই উপন্যাসের পাত্রগণকে অনেক সময়ে হয়তো অনুকরণ করিতে যাইতেন। বাঙ্গালীর জড় জীবনে তাহা হইলে কথঞ্চিৎ ঔপন্যাসিক পুরুষকার প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিত। বঙ্কিম বাবু তাহা হইলে শুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি নয়, দেশায় লোকের চরিত্রেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিতেন। বাঙ্গালী চিরকাল স্ত্রৈণ; তাঁহার নিকট স্ত্রীজাতিই সর্ব্বেসর্ব্বা। বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্ত্রীজাতীয় সুকুমার ভাব সমূহ বিশেষ প্রবল। তাঁহার নিকট আর স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য-বিকাশের প্রয়োজন নাই; কারণ বাঙ্গালী জাতি সমুদায়ই স্ত্রীজাতি। হৃদয়ের সুকুমার ভাব সকলের সৌন্দর্য্য-প্রকাশক চিত্রে তাঁহাদিগের আবশ্যক নাই। এই প্রকার চিত্র তাঁহাদিগের নিশ্চয় মনোহরণ করিবে সন্দেহ নাই; কারণ তাঁহারা চিরকাল হৃদয়ের সুকুমার ভাব সকলেরই গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন। এই প্রকার চিত্র-বিশিষ্ট উপন্যাস তাঁহাদিগের সুপ্রিয় হইবে তাহার আর সংশয় নাই। কিন্তু ইহাতে কি স্বদেশীয়গণের প্রয়োজনীয় গুণ সকলের উন্মেষ হইবে? তাঁহাদিগের রুচির কি শ্রীবৃদ্ধি হইবে? তাঁহাদিগের প্রবৃত্তিস্রোত কি কার্য্যক্ষেত্রের দিকে প্রবাহিত হইবে? যাহাতে এরূপ ঘটে আমরা এখন তাহাই চাই। সাধারণ লোকে না চাউক, যে মনীষিগণ সাধারণজনগণের হৃদয়-রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহারা সাধারণ লোকের প্রবৃত্তি-স্রোতকে তাড়িত অথবা প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের উচিত সেই হৃদয়কে বিহিত মত শাসিত ও চালিত করেন এবং সেই স্রোতকে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত প্রণা-

লীতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া দেন।” সেই প্রণালী ধরিয়া স্রোত বহিতে থাকে।

বঙ্কিম বাবু রমণী-হৃদয়ের সুকুমার ভাব সকল অতি নিপুণতার সহিত বর্ণন করিতে পারেন। রমণী-হৃদয় সুকুমার ভাবে বিগলিত হইলে সেই ভাব কার্য্যে কিরূপে ঈষৎ প্রকাশিত, ঈষৎ অন্তর্নিহিত হইয়া থাকে, তাহা তিনি চিত্রকরের ন্যায় প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি রমণী-হৃদয়কে বিবিধ কাল্পনিক অবস্থায় পরিস্থাপিত করিয়া তাহার সৌকুমার্য্যের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব সকল বিকশিত করেন। তাঁহার ঔপন্যাসিক রমণীগণ এই জন্য হৃদয়ভাবে সুন্দরী। তাঁহার বিমলা ও মতি বিবি, কপালকুণ্ডলা ও কুন্দনন্দিনী, আয়েসা ও সূর্য্যমুখী সকলেই এক এক ধরণের সুন্দরী। তাঁহাদিগের শারীরিক লাবণ্য অপেক্ষা হৃদয়ের লাবণ্য অধিকতর রমণীয়। তাঁহাদিগের হৃদয়-সৌকুমার্য্য এক এক বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়াছে। সেই এক এক বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়া প্রত্যেকের প্রকৃতিকে নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। নাহিলে ইহাঁরা সকলেই এক এক ভাবময়ী রমণী। সকলেই ভাবে পরিপূর্ণ। ইহাঁদিগের ভাবের উচ্চতায় উপন্যাসকে উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস মধ্যে এই জন্য আমরা কেবল ভাবের রাজ্য দেখিতে পাই। কোথাও ভাবের প্রাচুর্য্য অতি গুরু ও প্রবল তরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা ভাবের বন্দ অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গে ফল্গুনদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। কোথাও ভাব সকল এত উচ্চতায় উঠিতেছে, যে তাহাদিগের সম্পাত অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উপন্যাসকে গম্ভীর করিয়া তুলিতেছে। হৃদয়ের কোমলতাকে গৌরবে পূর্ণ করিতেছে। হৃদয়ের সুষমা গাম্ভীর্য্যে উত্তোলিত হইতেছে। হৃদয়ধারিণীকে সুন্দরী করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার প্রকৃতি দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ হই। দোষীকে নির্দ্দোষী ভাবি। সে ভাবাধিক্যে যে দোষ থাকে তাহাও ভুলিয়া যাই। তাহা কতদূর বিবেচনা-সঙ্গত তাহা বিচার করিতে ভুলিয়া যাই।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলী এই প্রকার ভাবাধিক্যে * পরিপূর্ণ। আমরা বাঙ্গালী; আমরা কোমল ভাবের আধিক্যেরও পক্ষপাতী। এই জন্য তাঁহার উপন্যাসাবলী আমাদিগের যথেষ্ট সমাদরের সম্পত্তি। এই ভাবাধিক্যে যে দোষ আছে তাহা আমরা জানি † কিন্তু সে দোষ ও আপাততঃ গুণে পরিণত হইতে পারে। তিনি যদি রমণী-হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, পুরুষ-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, উন্মত্ততা, ও ভাবাধিক্যের গৌরব উপন্যাস মধ্যে চিত্রিত করেন তাহা হইলে তাঁহার উপন্যাস-শ্রেণী দ্বারা কিরূপে দেশের একটি প্রয়োজনীয় মঙ্গল সাধিত হইতে পারে তাহা আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালী স্বাভাবিকই কবি, প্রেমিক, দয়াশীল, এবং যাবতীয় কোমল ভাবের একান্ত পক্ষপাতী। ইহারই জন্য

* Sentimentalism † vide The Lounger Paper No 20.

তাঁহার প্রকৃতি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। তিনি কোন কঠোর ধর্ম্মে কখন ভূষিত হয়েন নাই। যে বীরত্বে ও সাহসিকতায়, যে ত্যাগস্বীকারে ও ন্যায়পরতায়, এবং যে পুরুষত্বে ও উন্মত্ততায় অপরাপর জাতি পৃথিবী মধ্যে আপনাপন গৌরব ও প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়াছেন সে সমস্ত মহার্ঘ গুণে বাঙ্গালী ভূষিত হয়েন নাই। এই দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলী আরও দুর্ব্বলভাবে অবনীত করিতেছে। আমরা বাঙ্গালীকে আর কেবল কবি, প্রেমিক, দয়াশীল ও যাবতীয় কোমল ভাবের আধার দেখিতে চাহি না। যাহাতে তাঁহার প্রকৃতিকে ইহার বিপরীত ধর্ম্মে ভূষিত ও উত্তেজিত করিতে থাকে, আমরা এমত সকল গ্রন্থের অধিকতর সমাদর করিতে শিখিতেছি। দেশ, কাল, পাত্র ধরিয়া বিবেচনা করিতে গেলে এখন এই প্রকার গ্রন্থাবলি বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যে নিতান্ত হিতকর ও পুষ্টিকর বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলী কি এই প্রয়োজন সিদ্ধ করে?

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলী যে প্রকার কোমল ভাবে পরিপূর্ণ, তাঁহার ভাষার রচনা-প্রণালীও সেই প্রকার ভাব-বিকাশের উপযোগী। তিনি যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, আমরা সন্দেহ করি, তাহাতে উচ্চ ও বিপরীত ভাবাদির ওজস্বিতা, বীর্য্য ও তেজস্বিতা, সম্যক্ স্ফুরিত এবং প্রকাশিত হইতে পারে কি না। তাঁহার ভাষা তাঁহার ভাবাদির ন্যায় সুন্দর, মধুর, নৃত্যশীল, ও কোমল। সে প্রণালীতে বাসন্তিক নদীর প্রসন্ন হিল্লোল নৃত্য করিতে করিতে বহিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বর্ষাকালের প্রবল তরঙ্গবেগ ধারণে সমর্থ হইতে পারে না। তাহাতে মধুর সঙ্গীত-নিক্কণ ধ্বনিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে গম্ভীর মেঘ গর্জ্জন নিনাদিত হইতে পারে না। তাহা লঘুভাবের উপযোগী, গুরুভাবের উপযোগী নহে।

বঙ্কিম বাবু গ্রীক সাহিত্যের বিয়োগান্ত নাটকের রীতি অবলম্বন করিয়া কপালকুণ্ডলার ঘটনাবলীকে অদৃষ্টের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি এতদূর গিয়াছেন, যে গ্রন্থের একটি সমুদায় অধ্যায় অদৃষ্টবাদের প্রসঙ্গে পূর্ণ করিয়াছেন। উপন্যাসকে এই প্রকার মতামতের প্রবাহক করা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত তাহা অনেক কাল পূর্ব্বে ইউরোপীয় বুধগণ একপ্রকার স্থির করিয়া গিয়াছেন। স্থির করিয়া গ্রীক নাটকের দূষণীয় রীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে রীতিকে পুনরুদ্ধার করা বিবেচনা-সিদ্ধ বোধ হয় না। তাহা করিলে উপন্যাসে একটি দোষ এই ঘটে, যে তাহাতে এই মতামত সকল মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। উপন্যাস এই মতামতের দৃষ্টান্ত-সাধক হইয়া উঠে। ঘটনা-সকল দৈবের অনুসারী করিলে বিয়োগান্ত নাটকের গাম্ভীর্য্য অধিকতর প্রবর্দ্ধিত হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু

তাহাতে যে কুফল উৎপন্ন হয় তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। পৃথিবীতে ঘটনা সকল কখন কখন দৈববাণীর অনুসারী হইয়া পড়ে তাহাও আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সেই সমস্ত ঘটনা যে ঠিক দৈবের অনুসারী হইয়া ঘটিতেছে তাহা কে বলিতে পারে? সে প্রকার বিশ্বাস করা কেবল নিতান্ত বিশ্বাস-প্রবণ হৃদয়ের ধর্ম্ম। এবং তাহাই লক্ষ্য করিয়া উপন্যাস মধ্যে দেখাইয়া দেওয়া কতদূর বিচার-সঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না।

এই প্রস্তাব অনেক দূর প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহাকে আর বর্দ্ধিত করা বিধেয় নহে। বিষয়ের দোষ গুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া সমালোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। সেপ্রকার সমালোচনার সময় এখনও ঠিক উপস্থিত হয় নাই। আমাদিগের সমালোচনা এই জন্য ভিন্ন রীতিতে সঞ্চালিত হইয়াছে। আমরা কপালকুণ্ডলার নিগূঢ় ও সুন্দর ভাব সকল প্রস্ফুটন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যদি কথঞ্চিৎও কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, এবং পাঠকগণ যদি এপ্রকার সমালোচনার প্রয়াসী হন,—, আমরা সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের ইচ্ছা ফলবতী করিতে উদ্যোগী হইব। বঙ্কিম বাবুর অন্যান্য উপন্যাসাবলি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যাবলি এই প্রকার সমালোচনার বিষয় হইতে পারে। আমাদিগের এক্ষণকার সাহিত্যমধ্যে এই দুই জনই সুপ্রধান কবি। ইঁহাদিগের কাব্যের গুণ সকল প্রকাশ করিলে আমাদিগের সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। অতএব আমাদিগের সমালোচনা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় ও নিষ্ফল হইবে না। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলির সৌন্দর্য্য দেখিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারা বোধ হয় সুন্দর চিত্র দেখিতে ইচ্ছুক নহেন, নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত হীরকমণ্ডিত আকাশ দেখিতে ইচ্ছুক নহেন, এবং বিচিত্র-পুষ্প-সুশোভিত উদ্যানের সুন্দর শোভা দেখিতেও ইচ্ছুক নহেন। তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিব? তাঁহারা দূষিত-দৃষ্টিশক্তি লইয়া বনবাসী হউন। সংসারের অপূর্ব্ব শোভা তাঁহাদিগের মনোমুগ্ধকর হইবে না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি।

সুবিখ্যাত শালিবাহন নৃপতি মগধে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইঁহার দ্বারা খৃষ্ট জন্মের ৭৮ বৎসর পরে শকের সৃষ্টি হয়। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতার টীকাকার “ভট্ট উৎপল” বিক্রমাদিত্যকে শকের সৃষ্টিকর্ত্তা স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার

শালিবাহনের [illegible] শকাদি-বিক্রমাদিত্যের [illegible] ক্রম [illegible] হইয়াছিল। [illegible] [illegible] ১৪ বিক্রমাদিত্য [illegible] শক (এই পর্য্যন্ত) [illegible] হইয়াছিলেন [illegible]

[illegible] বিক্রমাদিত্যের ও শালিবাহনের [illegible] নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম [illegible] দিগের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। আমরা [illegible] মহারাষ্ট্রাধিপতি শালিবাহনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। উনি মগধেশ্বর শালিবাহন হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

শালিবাহন বা সাতবাহন মহারাষ্ট্র প্রদেশের প্রতিষ্ঠান পুরীর অধীশ্বর। তাঁহার রাজধানী গোদাবরী তটে স্থাপিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম পাটন। শালিবাহন শক এক্ষণে মহারাষ্ট্র প্রদেশের নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে এবং বিক্রমাব্দ ঐ নদীর উত্তরাংশে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, কলিযুগের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির, বিক্রম এবং শালিবাহন তৎপরে বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন নৃপতি এবং বঠকল্কী; এই ছয় ব্যক্তির শক প্রচলিত হইবে। যথা

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ।
ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ॥
ততস্তু নাগার্জ্জুনভূপতিঃ কলৌ।
কল্কী ষড়েতে শককারকাঃ স্মৃতাঃ॥"

এতৎসম্বন্ধে [illegible] প্রদেশস্থ [illegible] [illegible] করেন; যুধিষ্ঠিরের শক ০ ৩০৪৪ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তৎপরে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের শক ১৩৫ বৎসর মাত্র প্রচলিত হইয়া প্রতিষ্ঠানাধিপতি শালিবাহনের শক আরম্ভ হয়। তাহা ১৮০০০ বৎসর প্রচলিত থাকিবে এবং এই শকের পরে বিজয়াভিনন্দন নৃপতির শক দশ সহস্র বৎসর ও তৎপরে গৌড়দেশের ধারাতীর্থ নগরের অধীশ্বর নাগার্জ্জুনের শক ৪০০০০০ বৎসর এবং অবশেষে ষষ্ঠনৃপতি কর্ণাটদেশের করবীর পত্তনাধিপতি (কোলাপুর) কল্কীর শক ৮২১ বৎসর প্রচলিত হইবে। আমাদিগের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর বিশ্বাস নাই সুতরাং তদ্বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ মাত্র করিলাম।

জিনপ্রভাসূরি প্রণীত কল্পপ্রদীপ নামক জৈনগ্রন্থে সাতবাহন নৃপতির একটী গল্প লিখিত আছে। প্রস্তাবের প্রারম্ভে গ্রন্থকার মহারাষ্ট্র প্রদেশস্থ প্রতিষ্ঠান পুরীর বিবিধ বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন, যে, তথায় এক কুম্ভকার-গৃহে কতিপয় ব্রাহ্মণ

[illegible]

"আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ। ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥"

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যখন রাজ্য করেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল তখন মঘা নক্ষত্রে। সেই রাজার শককাল ২৫২৬ বৎসর অবস্থিত ছিল। সপ্তর্ষির প্রত্যেক নক্ষত্রে শত বৎসর থাকেন। এখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে আছেন।

একটি ভগিনী সহ বাস করিতেন। একদা তাঁহাদিগের ভগিনী গোদাবরী হইতে বারি আনয়ন মানসে গমন করিয়াছিলেন। তথায় শেষ নাগ তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া, মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করত, তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করিলেন। এবং তাঁহারই গর্ভে সাতবাহন জন্মগ্রহণ করিলেন। জিনপ্রভাসূরি কহেন, লোক তাঁহাকে এই কারণ সাতবাহন বলিত। যথা—

"সনোতের্দানার্থত্বাৎ লোকৈঃ সাতবাহন ইতিব্যপদেশং লম্ভিতঃ" অর্থাৎ পাণিনীয়-ধাতুপাঠে "সনু দানে" উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে 'সন' ধাতু-নিষ্পন্ন 'সাত' শব্দে শব্দের অর্থ দান। ঐ মহাত্মার দান বিষয়ে অত্যন্ত অভিরুচি থাকাতে তিনি লোকের নিকট "সাতবাহন" খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথিত আছে, এই রাজার সময়েই "দানমেকং কলৌ যুগে" এই আর্য্যবাক্যের সাফল্য হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্র ভাষায় শালিবাহন-চরিতেও এইরূপ আখ্যায়িকা লিখিত আছে। তাহার শেষে লিখিত আছে যে, বিক্রম,সাতবাহন দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উজ্জয়িনীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠান সাতবাহনের রাজধানী। তাহা তিনি সুরম্য-হর্ম্ম্য পরিখা বেষ্টিত দুর্গ দ্বারা পরিশোভিত করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপাঠের সকল লোককে ঋণমুক্ত ও অধীন করিয়া তাপী পর্য্যন্ত জয় করিয়া স্বীয় শক প্রচলিত করেন। জিনপ্রভাসূরি কহেন, তিনি জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুরম্য চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে ৫০ ব্যক্তি জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। জৈন ধর্ম্ম সাতবাহনের প্রযত্নে উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছিল। রাজশেখর-কৃত প্রবন্ধকোষে ও শতবাহনকে মহারাষ্ট্রপ্রদেশস্থ প্রতিষ্ঠান পুরীর অধীশ্বর বলা হইয়াছে। জিনপ্রভাসূরি ১৪ শত সম্বৎ মধ্যে ও তিলকসূরির শিষ্য রাজশেখর ১৪০৫ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজশেখর চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধ মধ্যে অন্যান্য কবি প্রভৃতির মধ্যে সাতবাহন, বঙ্কাচ্ছুল; বিক্রমাদিত্য, নাগার্জ্জুন, উদয়ন, লক্ষণসেন, এবং মদনবর্ম্মণ এই সপ্ত নৃপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জিনপ্রভাসূরি এইরূপে প্রতিষ্ঠান রাজধানীর বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

জীয়াজ্জৈত্রং পত্তনং পূতমেত-
দ্গোদাবর্য্যা শ্রীপ্রতিষ্ঠানসঞ্জ্ঞম্।
যন্ত্রাপীড়ং শ্রীমহারাষ্ট্রলক্ষ্ম্যা-
রম্যাং হর্ম্ম্যৈর্নৈকশৈত্যৈশ্চ চৈত্যৈঃ ॥১॥
অষ্টাষষ্টি লৌকিকা অত্র তীর্থা
দ্বাপঞ্চাশজ্জজ্ঞিরে চাত্র বীরাঃ।
পৃথ্বীশানাং ন প্রবেশোত্র বীর-
ক্ষেত্রত্বেন প্রৌঢ়তেজোরবীণাম্ ॥ ২ ॥
নাম্নাতীতি পুটভদেনতোস্মাৎ
ষষ্টিযোজনমিতং কিল বর্ষ্ম।
বোধনায় ভৃগুকচ্ছমগচ্ছ-
দ্বাজিতো জিনপতিঃ কমঠাঙ্কঃ ॥ ৩ ॥

অধিষ্ঠিত্রিনবতের্বৎসরাণাং
অত্যাবেত্র শরদাং জিনমোক্ষাৎ।
(কালকোব্যথিত)বার্ষিকপর্ব্ব
ভাদ্র শুক্ল চতুর্থ্যাম্ ॥ ৪ ॥
তত্রদায়তন পংক্তি বীক্ষণা
দত্র মুঞ্চতি জনো বিচক্ষণঃ।
তৎক্ষণাৎ সুরবিমানধোরণী
শ্রীবিলোকবিষয়ং কুতূহলং ॥ ৫ ॥
সাতবাহনপুরঃপুরানৃপা-
শ্চিত্রকারিচরিতা ইহাভবন্।
দৈবতৈর্বহুবিধৈরধিষ্ঠিতং
চাত্র সত্রসদনান্যনেকশঃ ॥ ৬ ॥
কপিলাত্রেয়বৃহস্পতিপঞ্চালা
ইহ মহীভৃদুপরোধাৎ।
ন্যস্তস্বচতুর্লক্ষগ্রন্থার্থং
শ্লোকমেকমপ্রথয়ন্ ॥ ৭ ॥
(সচায়ং শ্লোকঃ) জীর্ণে ভোজনমাত্রেয়ঃ
কপিলঃ প্রাণিনো দয়া।
বৃহস্পতিরবিশ্বাসঃ
পঞ্চালস্ত্রীষু মার্দবং ॥৮॥

অর্থাৎ গোদাবরী সংসর্গে পবিত্র, মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত বা শিরোভূষণীকৃত এই প্রতিষ্ঠান নামক পত্তন (নগর) উৎকর্ষে থাকুন। ইহা নেত্র-স্নিগ্ধকর হর্ম্ম্য ও চৈত্য-মণ্ডল দ্বারা অতীব রমনীয়। এখানে ৬৮ জন শাস্ত্রকার ও ৫২ জন বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে শত্রু রাজার প্রবেশ দুঃসাধ্য। বীরকুলের উৎপত্তি স্থান বলিয়া মার্ত্তণ্ডদেবও এখানে নিজ তীক্ষ্ণ রশ্মি বিস্তার করেন না। ভগবান্ জিনপতি (কমঠাঙ্কনামা) এই নগর হইতে অশ্বারোহণে ৬০ যোজন পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া ভৃগুকচ্ছ * পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

ভগবান্ জিনদেব (শাক্যসিংহ বা অন্য কোন বুদ্ধ) মোক্ষ অর্থাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে ৯৯৩ বৎসর পরে এই স্থান হইতেই তাহাঁর বার্ষিক মহাপর্ব্ব (উৎসব) প্রারম্ভ হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী সেই বার্ষিক পর্ব্বের কাল। (এই তিথিতে জিন দেব শরীর ত্যাগ করেন)। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই নগরের আয়তন শ্রেণীর শোভা দেখিলে আর স্বর্গীয় আয়তন শ্রেণী দেখিবার নিমিত্ত কুতকী হন না। পূর্ব্বকালে সাতবাহন প্রভৃতি ভূপাল এই স্থানেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলকারই চরিত্র অদ্ভুত। এখানে বহুদেবতার অধিষ্ঠান ও অনেক যজ্ঞায়তন আছে। রাজার অনুরোধে কপিলাত্রেয় বৃহস্পতি পাঞ্চালেরা তৎকৃত চতুর্লক্ষাত্মক গ্রন্থের সার এক শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছিল। সে শ্লোক এই—আত্রেয় জীর্ণ হইলে পর ভোজন, কপিল প্রাণির প্রতি দয়া, বৃহস্পতি অবিশ্বাস এবং পাঞ্চালেরা স্ত্রীজনের প্রতি মৃদুব্যবহার অর্থাৎ এই কএকটি বিষয়ই তাহার গ্রন্থের প্রতি-

* প্রতিষ্ঠান বা পাটন হইতে এক রাজপথ ভৃগুকচ্ছ (পশ্চিম সমুদ্রের তীরস্থ দেশ বিশেষ) পর্য্যন্ত তৎকালে বর্ত্তমান ছিল।

পাদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এই চারিটি বিষয় লইয়া চারিলক্ষ শ্লোক রচিত হইয়া ছিল।

শালিবাহন একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অনেক নৃপতি উৎকৃষ্ট ২ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব রত্নাবলী, নাগানন্দ, ও প্রিয়দর্শিকা নাটীকা,—বিক্রমাদিত্য কোষ গ্রন্থ—,মুঞ্জ, মুঞ্জপ্রতিদেশ ব্যবস্থা—ভোজদেব * অশ্বায়ুর্ব্বেদ, যোগ-সূত্র-টীকা, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ও তত্ত্বপ্রকাশ,—শূদ্রক মৃচ্ছকটিক,—কান্যকুব্জাধিপতি মদনপাল মদন-বিনোদ, ও নিঘণ্ট রচনা করেন। হেমাচার্য্য বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, মুঞ্জ, ও ভোজ, এই চারি বিখ্যাত নৃপতি গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারি ব্যক্তিই প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ নৃপতি। তাহাঁদিগের সম্বন্ধে যাচক দলের একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন—

ধাতর্ধাতরশেষযাচকজনে
বৈরায়সে সর্ব্বথা।
যস্মাদ্বিক্রমশালিবাহন
মহীভৃন্মুঞ্জভোজাদয়ঃ॥
অত্যন্তংচিরজীবিনো ন বিহিতা-
স্ত্বেবিশ্বজীবান্তবো।
মার্কণ্ডধ্রুবলোমশ প্রভৃতয়ঃ
সৃষ্টাহি দীর্ঘায়ুষঃ॥

অর্থাৎ "হে বিধাতঃ! তুমি অশেষ, অর্থাৎ বর্ত্তমান ও উৎপদ্যমান যাচক দলের শত্রু; যেহেতু তুমি বিক্রম, শালিবাহন, মুঞ্জ ও ভোজ প্রভৃতি রাজাদিগকে চিরজীবী কর নাই। সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ও বসুসম্পন্ন রাজাগণকে চিরজীবী না করিয়া কিনা, মার্কণ্ড, লোমশ ও ধ্রুব প্রভৃতি কতক গুলি নির্ধন ত্যাগী পুরুষ-কে দীর্ঘজীবী করিয়াছ!!

প্রবন্ধ চিন্তামণি ও চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধে লিখিত আছে, শালিবাহন বুধগণের সাহায্যে ৪০০০০০ গাথা বা প্রাকৃত কবিতা রচনা করেন। তাহা গাথাকোষ নামে প্রসিদ্ধ। বাণভট্ট, হর্ষচরিতে এই কোষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। যথা।

"অবিনাশি নমগ্রাম্য
মকরোত্ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং
রত্নৈরিব সুভাষিতম্॥" ১।

অর্থাৎ সাতবাহন, গ্রাম্য-দোষ-বিবর্জ্জিত চিরস্থায়িযোগ্য এককোষ শুদ্ধ জাতি (ছন্দোবিশেষ) দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহা রত্ন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কবিবাক্যে সুভাষিত অর্থাৎ সুশোভিত আছে।

বোম্বাই প্রদেশের রাও সাহেব বিশ্ব-

---

* ভোজদেবের একখানি ব্যাকরণ আছে, তাহা সুপ্রাপ্য নহে। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে, যথা "অত্র ভোজঃ দলিবলিস্খলিরণিধ্বনিত্রপি-ক্ষপয়শ্চেতি পপাঠ" ইহা ভিন্ন বৈদিক নিরুক্ত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নাথ নারায়ণ মান্দলিক মহোদয় কহেন, যে তিনি বাসীন-নিবাসী কোন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে, শালিবাহন সপ্তশতী নামধেয় এই গাথা কোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা আদ্যোপান্ত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত। উক্ত রাও সাহেব আধুনিক মহারাষ্ট্রী ভাষার সহিত উহার ভাষার এইরূপ ভিন্নতা দেখাইয়াছেন। যথা

মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত	মরাঠী	অর্থ
অত্তা	আতে	পিতার ভগিনী
ঝুরই	ঝুরত্যে	দুঃখ
পাব	পাব	পাওয়া
ওট্ঠো	ওঠ	ওষ্ঠ
তুইঝ	তুঝে	তোমার
মটুঝ	মাঝেং	আমার
সিপ্পি	শিম্পি	ঝিনুক
পিক্কং	পিকলেলেং	পক্ব
পাঙী	পাণ্ডি	গাভী
চিখিখল্লো	চিখল	কর্দ্দম
ফলই	ফাড়িতো	চক্ষের জল
স্থিল্লী	সাল	বৃক্ষেরত্বক্
পোট্ট	পোট	উদর
শোণার	শোনার	স্বর্ণকার
রুন্দো	রুন্দ	প্রশস্ত
তুপ্পং	তুপ	ঘৃত
মঞ্জরম্	মাঞ্জর	মার্জ্জার
রুপ্পাং	রুলেং	বৃক্ষ
ওল্লং	ওলেং	আর্দ্র
চুক্কং	চুকী	ভুল
বে	মুলগড়া	বালক

মুকুন্দরাজ সর্ব্ব প্রথম মরাঠী কবি। তিনি ১৩০০ খৃঃ অঃ প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর দ্যানেশ্বর ভগবদ্গীতার টীকা মরাঠী ভাষায় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। তাঁহাদিগের ভাষার সহিত শালিবাহন সপ্তশতী মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষার অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হইবেক। ইহাতে বোধ হয় শালিবাহন-সপ্তসতী প্রাচীন গ্রন্থ, সেরূপ ভাষায় অপর এক খানি গ্রন্থ মহারাষ্ট্রদেশে প্রচলিত নাই।

শালিবাহন-সপ্তসতী সপ্ত অধ্যায়ে বা শতকে বিভক্ত। প্রত্যেক শতকের শেষে এই রূপ একটী করিয়া কবিতা আছে। যথা—

রসিঅ জণাহি অঅ দইএ
কইবচ্ছল পমুহ সুকই ণিম্মবিত্র॥
সত্ত সতম্মি সমত্তং পঢ়মং
গাহা সত্যং এ অম্ ॥ ১॥

অর্থাত্ সুরসিকগণের আনন্দ বর্দ্ধক কবিকুল-চূড়ামণি কবিবৎসলকৃত প্রথম শত গাথা (৭০০ শতমধ্যে) শেষ হইল।

এই গ্রন্থ সাতবাহন বা শালিবাহন কৃত তাহার সন্দেহ নাই। কেন না ইহাতে অনেক স্থলে গোদাবরী ও বিন্ধ্যাচলের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে বৌদ্ধ, ভিক্ষু, সঙ্ঘ, প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে ইহার প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতে পারে। গ্রন্থখানি সমুদায় শালিবাহনের লেখনী-প্রসূত নহে। তাহার মধ্যে দুই স্থলে বিক্রম ও শালিবাহনের প্রশংসা-সূচক কবিতা আছে। তাহা

অপর কোন কবি প্রণীত বলিয়া বোধ হয়। শালিবাহন সপ্তশতী টীকাকার কহেন, তাহাতে নিম্ন-লিখিত কবির রচিত কবিতাও আছে।

বোদিশ, চুলুহ, সমররাজ,
কুমারিল, মকরন্দ সেন ও শ্রীরাজ।

জৈন-লেখকগণ কহেন, শালিবাহন জৈন ধর্ম্মাবলম্বীছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে পশুপতিকে বন্দনা করা হইয়াছে।

শালিবাহন সংস্কৃত ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। লক্ষণ সেনের সভাসদ্ শ্রীধর দাস সদুক্তি-কর্ণামৃত গ্রন্থে ৪৪৬ জন কবির কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে শালিবাহনের নাম নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি কোন্ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন নাই।

কাশ্মীর-নিবাসী সোমদেব ভট্ট-সঙ্কলিত কথা-সরিৎ-সাগর গ্রন্থের প্রথম লম্বকে যে সাতবাহনের বিবরণ আছে, তিনি আমাদিগের আলোচ্য নৃপতি হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বৃহৎ-কথার সাতবাহন, মহারাজ নন্দের সমসাময়িক। আমাদিগের প্রস্তাবের আলোচ্য শালিবাহন বা সাতবাহন, শালিবাহন-সপ্তশতীর গ্রন্থকার ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের নৃপতি। তিনি ১৭৯৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার শক একাল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচলিত আছে।

শ্রীরামদাস সেন।

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস।*

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যখন ছত্রসিংহ রেসিডেন্টের নিকট আপিল করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না, যখন তাঁহার কার্য্যের যথাপদ্ধতি বিচার করা হইলনা, তখন তিনি ইংরেজদিগকে ঘোর দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। মহারাণী ঝিন্দনের শোচনীয় নির্ব্বাসন ও মহারাজ দলীপ সিংহের বিবাহে রেসিডেন্টের অসম্মতিতে

* গত মাসের আর্য্যদর্শনের ১৫২ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে ও ১৫৩ পৃষ্ঠার মূলে লিখিত আছে ভ্যান্স্ আগ্নু মুলরাজকে নির্দ্দোষী বলিয়া সার ফ্রেডরিক কারির নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, সদাশয় পাঠকগণ সার ফ্রেডরিক কারির পরিবর্ত্তে জেনারেল কর্টল্যাণ্ড ও হারবার্ট এডওয়ার্ডিস পড়িবেন। এই পত্র বন্নুতে প্রেরিত হইয়াছিল।

তিনি ইহার পূর্ব্বেই ব্রিটীষ কার্য্য প্রণালীর প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে নিজের এইরূপ অপমান ও অপদস্থতায় তাঁহার সেই বিরক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, পঞ্জাব শীঘ্রই ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের উদরসাৎ হইবে, শীঘ্রই তাঁহাদিগের ধর্ম্মলোপ ও ইজ্জৎ নষ্ট হইবে। ছত্র সিংহ আর স্থির করিতে পারিলেন না। নিজের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলেন, গুরুগোবিন্দসিংহের মন্ত্রপূত শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম এবং স্বীয় জন্মভূমির উদ্ধারার্থ শরীর ও মন উৎসর্গ করিলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর সের সিংহ পিতার নিকট হইতে তাঁহার দুর্গতির সংবাদ পাইলেন। এই শোচনীয় সংবাদে তাঁহার মন নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। তিনি আর ইংরেজদিগকে বন্ধুভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন না। ১৪ই সেপ্টেম্বর লাহোরে তাঁহার ভ্রাতার নিকট লিখিলেন, তিনি আপনাদিগের ধর্ম্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য ব্রিটীষ সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে মনস্থ করিয়াছেন (২৯)। বীরতনয় বীর পুরুষের এই প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। ৫ই সেপ্টেম্বর ব্রিটীষ সৈন্য মুলতান-দুর্গ আক্রমণ করিল, ১৪ ই সেপ্টেম্বর সেরসিংহ দলবল সমভিব্যাহারে মুলরাজের সহিত মিলিত হইয়া আপনার পত্রের যাথার্থ্য রক্ষা করিলেন।

সেরসিংহ পূর্ব্বাবধি ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। মেজর এড্ওয়ার্ডিস্ স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত সেরসিংহ বিলক্ষণ প্রভুপরায়ণ ছিলেন, এবং তিনি স্বীয় অধীনস্থ লোকদিগকে রাজানুরক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন (৩০)। সের সিংহের সদ্ব্যবহারের ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু কেবল সার ফেড্রিক কারি ও কাপ্তেন আবটের অব্যবস্থিততায় এই তেজস্বী বীরপুরুষ ব্রিটীষ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। কে জন্মদাতা প্রতিপালক কর্ত্তার অপমান ধীরভাবে চাহিয়া দেখিতে সমর্থ হয়? কোন্ তেজস্বী ব্যক্তি আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া পর পদ লেহন করিয়া থাকে? যাঁহারা প্রস্তাবিত বিষয়ে সেরসিংহকে দোষী বিবেচনা করেন, আমরা তাঁহাদিগকে ভীরু, কাপুরুষ ও পিতার কুসন্তান বলিয়া শতবার ধিক্কার দিই।

সেরসিংহ ব্রিটীষ্ সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন, মুলরাজ ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এক্ষণে এই অতর্কিত ঘটনা দেখিয়া

* ২৯ সেরসিংহ ১২ই কি ১৩ই এই রূপ মনস্থ করেন। Edwardis:— A year on the Panjab Frontier, Vol. II p. 503. Empire in Asia, p. 347-348.

* ৩০ A year on the Panjab Frontier, Vol II p. 438.

তিনি সের সিংহের প্রতি যথোচিত বিশ্বাস করিলেন না, প্রত্যুত আপনার সৈন্যদিগকে নগরের প্রাচীরের ভিতরে লইয়া গিয়া সেরসিংহের সৈন্যদিগকে শত্রুর সম্মুখীন ও প্রাচীরের উপরি ভাগে দণ্ডায়মান করিয়াদিলেন, (৩১) সুতরাং সেরসিংহ কিছুদিনের মধ্যেই মুলরাজের সন্দেহে বিরক্ত হইয়া পিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য আপনার সৈন্য সহিত মুলতান হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে সাহায্যকারী সৈন্য আসিয়া মুলতানে পৌঁছিলে, ২৬ এ তারিখ ব্রিটীষ সৈন্য পুনর্ব্বার নগর আক্রমণ করে। ১৮৪৯ অব্দের ২ রা জানুয়ারি ইহাদিগের গোলায় নগর বিধ্বস্ত হয়। মুলরাজ দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশিষ্ট বীরত্ব ও দক্ষতা সহকারে আত্মরক্ষা করেন, কিন্তু পরিশেষে সৈন্য সমষ্টির বিশৃঙ্খলা দোষে তাঁহার পরাজয় হয়। সুতরাং তিনি ২২ এ জানুয়ারি বিজেতার হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

এইরূপে মুলতান বিধ্বস্ত হইল, এইরূপে মুলরাজ পরাজিত ও নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু ছত্রসিংহ ও সের সিংহের হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইল না। মুলতান পতনের পূর্ব্বে ১৮৪৮ অব্দে রামনগর ও সুদুলপুরে যে দুটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রিটীষ সৈন্য যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করে। সের সিংহ এক্ষণে ৬০টি কামান ও ৩০ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। এই সৈন্য দল লইয়া তিনি চিলিয়ানওয়ালার নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করেন।

মুলতান ঘটিত গোলযোগের সম্বাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে সার হেনরি লরেন্স পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিয়া ১০ই জানুয়ারি লর্ড গফের শিবিরে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু সে সময়ে সার ফেডরিক কারির কার্য্য কাল শেষ না হওয়াতে হেনরি লরেন্সকে প্রধান সেনাপতির অবৈতনিক এডিকং হইয়া ব্রিটীষ শিবিরে থাকিতে হয়। এদিকে ব্রিটীষ সৈন্য ১৩ ই জানুয়ারি চিলিয়ানওয়ালায় সমুপস্থিত হয়। শিখ সেনাপতি সের সিংহ অপূর্ব্ব সামরিক কৌশল সহকারে সেনা সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। ব্রিটীষ সৈন্য উপস্থিত হইলে এই সন্নিবিষ্ট সৈন্যদল অসাধারণ বিক্রম সহকারে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জেনারেল কাম্পবেল (লর্ড ক্লাইড) ও জেনারেল পেনিকুইক দুইল পদাতিক সৈন্যের অধিনায়কতা করিতেছিলেন, সের সিংহের সৈন্যের পরাক্রমে এই অধিনায়ক দ্বয়ের সৈন্যদল পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। প্রধান সেনাপতি লর্ড গফ দুইদল অশ্বারোহী সৈন্য সম্মুখ ভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, স্বল্পসংখ্যক রণমত্ত শিখ অশ্বারোহীর অমিত পরাক্রমে এই সৈন্যশ্রেণীও বিচ্ছিন্ন হইয়া

৩১ A year on the Panjab Frontier Vol. II. p. 515.

ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। বিজয়শ্রী সের সিংহের পক্ষ অবলম্বন করেন। ব্রিটীষ পতাকা শত্রুর করগত, ব্রিটীষ কামান অধিকৃত, ব্রিটীষ অশ্বারোহী পলায়িত ও ব্রিটীষ পদাতিক বিধ্বস্ত হয়। সেনাপতি সের সিংহ বীরত্বাভিমানে উদ্দীপ্ত হইয়া তোপ ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত করেন।

এইরূপে চিলিয়ানওয়ালার সমরের অবসান হয়। যাঁহারা ওয়াটালু ক্ষেত্রে অতাঙ্কুত অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া অলোকসামান্য যুদ্ধবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে হতসর্ব্বস্ব ও হতগৌরব করিয়াছিলেন, তাঁহারা অদ্য চিলিয়ানওয়ালায় আর্য্য তেজ, আর্য্য সাহস, ও আর্য্য বীর্য্যবত্তার নিকট মস্তক অবনত করিলেন। ইতিহাসের আদরের ধন ভারতবর্ষ এই লোকাতীত বীরত্বের জন্য চির প্রসিদ্ধ। যদি কেহ রণতরঙ্গায়িত গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিতে চাহেন, যদি কেহ বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় গ্রীক্ সেনাপতিদিগের বিবরণ পাঠ করিয়া ভারতের দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অসঙ্কচিত হৃদয়ে বলিব, হলদিঘাট ভারতবর্ষের থর্ম্মাপলী, আর এই চিলিয়ানওয়ালা ভারতবর্ষের মারাথন। মেওয়ারের প্রতাপ সিংহ, ভারতের লিওনিদাস্ আর পঞ্জাবের এই সের সিংহ ভারতের মিলতাইদিস্। ইতিহাসে থর্ম্মাপলী ও মারাথন্ কিছু সামান্য যুদ্ধ ক্ষেত্র নহে, লিওনিদাস্ ও মিলতাইদিস্ কিছু সামান্য যুদ্ধবীর নহেন। যদি পৃথিবীতে কোন পুণ্য-পুঞ্জময় মহাতীর্থ বর্ত্তমান থাকে, যদি পবিত্র স্বাধীনতার পবিত্র ধ্বজার কোন বিলাস-ক্ষেত্র থাকে, তাহা হইলে তাহা সেই থর্ম্মাপলী ও মারাথন্, যদি কোন বীরপুরুষ বীরেন্দ্র সমাজের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন, যদি কোন অদীন-পরাক্রম মহাপুরুষ অলোকসামান্য দেশানুরাগ জন্য স্বর্গস্থ দেব-সমিতিতে অপ্সরোদিগের বীণানিন্দিত মধুরস্বরে স্তুত হইয়া থাকেন, তবে তিনি সেই লিওনিদাস্ ও মিলতাইদিস্। এই থর্ম্মাপলী ও মারাথনের সহিত হলদিঘাট ও চিলিয়ানওয়ালা এবং এই লিওনিদস্ ও মিলতাইদিসের সহিত প্রতাপ সিংহ ও সের সিংহের নাম গ্রথিত করা ভারতবর্ষের কিছু অল্প গৌরব ও অল্প বীরত্বের বিষয় নহে। ফলে চিলিয়ালওয়ালা ঊনবিংশ শতাব্দীর একটী পবিত্র যুদ্ধ ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্তকাল লীলা করিবে,—ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। সের-সিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্র সমাজে প্রাণগত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতর হইয়া অনন্তকাল অমর-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যদি লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে শিখ সেনানায়ক উৎকোচ-গ্রাহিতা পাপে কলুষিত না হইতেন, তাহা হইলে আমরা প্রথম শিখ যুদ্ধেও এইরূপ চিলি-

য়ানওয়ালা দেখিয়া সুখী হইতে পারিতাম। (৩২)।

কিন্তু সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চিরদিন এক জনের পক্ষাশ্রয়িনী থাকে না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অদৃষ্ট চক্রনেমির ন্যায় একবার উর্দ্ধ পুনর্ব্বার অধোগামী হইয়া ইহলোকে সংসারের চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেছে। সের সিংহ চিলিয়ানওয়ালায় যে বিজয়-বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হয়েন, গুজরাটে তাহা বিচ্যুত হয়। তিনি ব্রিটীষ সৈন্যের দৃষ্টি পরিহার করিয়া চিলিয়ানওয়ালা হইতে গুজরাটে যাইয়া তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হয়েন। এদিকে জেনারেল হুইসও মুলতান হইতে প্রত্যাগত হইয়া লর্ড গফের দল পরিপুষ্ট করেন। ২১ এ ফেব্রুয়ারি গুজরাটে পুনর্ব্বার উভয় পক্ষের সংগ্রাম হয়। এবার বিজয়লক্ষ্মী ব্রিটীষ সেনাপতির করতাল গত হয়েন। ছত্রসিংহ ও সের সিংহ আর যুদ্ধ না করিয়া ১৪ ই মার্চ্চ বশ্যতা স্বীকার করেন। ৩৫ জন সর্দ্দার ও ১৫০০০ শত সৈন্যের অস্ত্র বিজেতার হস্তে সমর্পিত হয়। (৩৩)

এইরূপে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শেষ হইল। লর্ড ডেলহৌসী এই অবসরে সর্ব্বগ্রাসক মুখ ব্যাদান করিলেন। ইলিয়াট সাহেব গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি হইয়া লাহোর দরবারে প্রেরিত হইলেন। সার ফ্রেডরিক কারির কার্য্যকাল শেষ হওয়াতে সার হেনরি লরেন্স পুনর্ব্বার রেসিডেণ্টের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইলিয়ট তাঁহাকে লইয়া ২৮ এ মার্চ্চ মহারাজ দলীপ সিংহকে স্বীয় রাজ্য কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিতে আহ্বান করিলেন। তৎপরদিন (২৯ এ মার্চ্চ) শেষ দরবার হইল। দলীপ সিংহ এইশেষ বার পিতার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অদূরে শ্রেণীবদ্ধ ব্রিটীষ সৈন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিল। দেওয়ান দীন নাথ এই অত্যাচার নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, সন্ধির নিয়ম দেখাইয়া শিখ রাজ্য বজায় রাখিতে অনেক কথা কহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডেলহৌসীর ঘোষণা পত্র পঠিত হইলে দরবার শেষ হইল। অমনি রণজিৎ দুর্গে ব্রিটীষ সিংহ-লাঞ্ছিত পতাকা উড়িল। দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। পঞ্জাবরাজ্য অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্রিটীষ চাতুরীতে ভারত-মানচিত্রে

---

(৩২) শিখ ইতিহাসপ্রণেতা কাপ্তেন কানিংহাম লিখিয়াছেন, ইংরেজগণ রাজা লাল সিংহ, গোলাপ সিংহ ও সর্দ্দার তেজ সিংহকে ঘুস দিয়া প্রথম শিখ যুদ্ধে জয়ী হয়েন। Vide Cunninghum's History of the Shikhs, Second Edition, p p. 299, 317.

(৩৩) India under Dalhousie and Canning, p. 8.

লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। (৩৪)।

৩০ এ মার্চ্চ ডেলহৌসীর এই ঘোষণা-পত্র ফিরোজপুর হইতে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রিটীষাধিকৃত স্থান সমূহে প্রচারিত হয়। ৫ই এপ্রেল গবর্ণনরজেনারল মহারাজ দলীপ সিংহকে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা দিবার অনুমোদন করেন। যে লোকপ্রসিদ্ধ কোহিনুর হীরক অঙ্গাধিপতি মহারাজ কর্ণ হইতে বিপ্লবের পর বিপ্লবে রণজিৎ সিংহের হস্তগত হইয়াছিল, রণজিৎ যাহা অতি গৌরবে বাহুতে ধারণ করিতেন। ইংরেজ অদ্য "পাঁচ জুতি" মূল্য দিয়া তাহা তদীয় পুত্র দলীপ সিংহ হইতে গ্রহণ করিলেন (৩৫)।

কে সাহেব স্বপ্রণীত সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন লর্ড ডেলহৌসী যে, মহারাজ দলীপ সিংহকে রাজ্য-শাসনের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিয়া তাঁহাকে একটী বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সুখময় পরিবর্ত্তন হইল (৩৬)!! কি উদারতা!!! ব্রিটীষ অভিধানে, বলে ও কৌশলে অপরের রাজ্য হরণের অর্থ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা, আর এক জন নিরীহ সরলপ্রকৃতি বালককে তাঁহার পৈত্রিক সিংহাসন হইতে তাড়াইয়া সাধারণ লোকের অবস্থায় পাতিত করার অর্থ সুখময় পরিবর্ত্তন!!

কালের কি অচিন্ত্য প্রভাব। নিয়তি নেমির কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন?! যে পঞ্জাবে আর্য্য মহর্ষিগণ "প্রশস্ত হৃদয়া তটিনীর মনোহর পুলিনে যোগাসনে সমাসীন হইয়া সৃষ্টির প্রাণরূপিণী পরমাশক্তির স্বরূপ

(৩৪) Empire in Asia, p, 351.

(৩৫) কোহিনুরের ইতিবৃত্ত নিতান্ত অদ্ভুত। কিম্বদন্তী অনুসারে এই মণি গোলকুণ্ডার আকর হইতে উত্তোলিত হইয়া মহারাজ কর্ণের অধিকারে থাকে। তৎপর ইহা উজ্জয়িনী-রাজের শিরোভূষণ হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালবদেশ অধিকার করিয়া ইহা প্রাপ্ত হয়েন। পাঠান রাজত্বের ধ্বংস হইলে এই মণি মোগলদিগের অধিকারে আইসে। ইহার পর নাদির সাহ মোগল সম্রাট মহম্মদ সাহাকে পরাজিত করিয়া এই মণি গ্রহণ করেন। নাদিরের হত্যার পর কাবুলের আহাম্মদ সাহ ইহা প্রাপ্ত হয়েন। আহাম্মদ সাহেব পরলোক প্রাপ্তির পর ইহা তদীয় উত্তরাধিকারী সা সুজারহস্তগত হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সা সুজাকে পরাজিত করিয়া এই মণি গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহা ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটে শোভমান রহিয়াছে। প্রথিত আছে, একদা ব্রিটীষ রাজ-প্রতিনিধি কোহিনুরের মূল্য জিজ্ঞাসা করাতে রণজিৎ সিংহ হাসিয়া বলিয়াছিলেন" "এস্ কো কিম্মৎ পাঁচ জুতি।" অর্থাৎ সকলেই ইহা পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে।

(৩৬) Kaye's History of the Sepoy war, Vol I. p. 47.

চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, অথবা তদীয় আরাধনা জন্য জলদ গম্ভীর মধুর স্বরে সাম করিতেন," যে পঞ্জাবে রাজাধিরাজ রণজিৎসিংহ যুদ্ধ দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে বশীভূত করিয়া পরম সুখে রাজ্য শাসন করিতেন, অদ্য সেই পঞ্জাব ব্রিটিনিয়ার করায়ত্ত, অদ্য সেই পঞ্জাব ব্রিটীষ্ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত। "প্রলয় পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে" সে পূর্ব্ব গৌরব, সে পূর্ব্ব মহত্ব সমস্তই বিধৌত হইয়া গিয়াছে। অদ্য যাহা দেখিতেছ, তাহা ব্রিটীষ্ ইণ্ডিয়ার নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ, সম্পাদ পত্রে অদ্য যাহার বিবরণ পাঠ করিতেছ তাহা এই, সুনিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের সুবিচার অথবা অবিচারের কাহিনী। 'নূতন সৃষ্টি, নূতন রাজ্য এবং সর্ব্বত্রই নূতন শক্তির সঞ্চার চিহ্ন।"

যদি ন্যায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাইবে, লর্ড ডেলহাউসী ব্রিটীষ্ জাতির চিরন্তন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাব রাজ্য হরণ করিয়াছেন। এরূপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা কখনও মার্জ্জনীয় নহে। সেরসিংহ যে ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তাহা কেবল পিতার অপমান জন্য। লাহোর দরবারের প্ররোচনায়, তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। ডিউক অব আর্গাইলের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তিও স্বীকার করিয়াছেন, "খাল্সা সৈন্যই শিখ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিল, লাহোর গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে ছিলেন না।" (৩৭) প্রতিনিধি সভার যে আট জন মেম্বর দ্বারা রাজ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে ছয় জন বরাবর সন্ধির নিয়ম ও ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, অবশিষ্ট দুইজনের মধ্যে একজনের প্রতি সন্দেহ করা হয়। কেবল একমাত্র সের সিংহ প্রকাশ্যভাবে ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন (৩৮)। তাহাও স্বীয় জনকের ঘোরতর অপমান দেখিয়া। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মেজর এড্ওয়ার্ডিস্ স্বীকার করিয়াছেন, সেরসিংহ আগষ্ট্ মাসের শেষ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ সদ্ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন। পরন্তু প্রতিনিধি সভার যে ছয় জন মেম্বর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, লর্ড ডেলহৌসী তাঁহাদিগকে বলেন, যদি তাঁহারা ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের সহিত একমত না হয়েন, যদি তাঁহারা পঞ্জাব অধিকারের নিয়ম পত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এইরূপে জোর করিয়া তাঁহাদিগকে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করান হইয়াছিল (৩৯)। এদিকে ব্রিটীষ্ রেসিডেণ্ট্

(৩৭) India under Dalhousie and Canning, p. 55.

(৩৮) Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 159.

(৩৯) Ibid. p. 154—155.

লাহোর দরবারের শিরঃস্থানীয় ছিলেন। দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক। ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক। মহারাণী ঝিন্দন-অরণ্যানীতে নির্ব্বাসিত। সুতরাং দরবারের সমস্ত বিষয়েই ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বেসর্ব্বা। তথাপি কোন্ দোষে দলীপসিংহকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট করা হইল? কোন্ দোষে তাঁহার পৈত্রিক রাজ্যে ব্রিটীষ্ বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল? পক্ষপাত-শূন্য উদার ব্যক্তি কি ইহাতে জুলুম বলিবেন না? ইহাতে কি ব্রিটীষ্ গৌরব বিলুপ্ত হয় নাই? সহস্র বৎসরের ও অধিক হইল, যখন দিগ্বিজয়ী সেকন্দর সাহ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া মহারাজ পোরসকে সমরে পরাজিত করেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? পোরশের লোকাতীত বিক্রম, লোকাতীত সাহস দেখিয়া সেকন্দর সাহ তাঁহাকে স্বপদে স্থাপিত ও তাঁহার সহিত মৈত্রী বন্ধন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্পর্দ্ধী অভিভাবক ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্ট সেই পঞ্জাবের একটী নির্দ্দোষ নিরীহ স্বভাব বালককে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া অভিভাবকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। সময়ের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন!! জ্ঞান ও ধর্ম্মের কি বিচিত্র উন্নতি!!

পঞ্জাবে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লর্ড ডেলহৌসী একদা বারাকপুরের ভোজে বলিয়াছিলেন:—"আমি শান্তির ইচ্ছা করি, আমি ইহার জন্য বিশেষ লালায়িত। কিন্তু ভারতবর্ষের শত্রুগণ যদি যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করে, যুদ্ধই তাহারা পাইবে, এবং আমার কথানুসারে তাহারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিশোধের সহিত লাভ করিবে।" ডেলহৌসী কি ভাবে শান্তির আশা করিয়াছিলেন, মহারাণী ঝিন্দনকে নির্ব্বাসিত করিয়া? না সর্দ্দার ছত্রসিংহকে অপমানিত করিয়া? একদিকে ঘোরতর অত্যাচার করিব, সকলের সম্মান নষ্ট, ইজ্জৎ নষ্ট ও সম্পত্তি নষ্ট করিব। অথচ অপর দিকে শান্তি শান্তি বলিয়া চীৎকার করিয়া গগন প্রতিধ্বনিত করিব, এরূপ ব্যবহার কি ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্টের দুরপনেয় কলঙ্কের বিষয় নহে?

কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে লর্ড ডেলহৌসীর এই উক্তি অপেক্ষা জনৈক ঐতিহাসিকের উক্তি আরও অধিক ভয়ঙ্কর। অতীত সাক্ষী পবিত্র ইতিহাস লিখিতে যাইয়া এই ঐতিহাসিক এক স্থলে লিখিয়াছেন—"শিখগণ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, তাহাদিগের সমুদয় বিষয়ই শঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ন্যায় যুদ্ধে তাহারা এই সব বিষয় হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। আমরা সহিষ্ণুতা ও ধীরতা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা ও ঠককারিতা দ্বারা এই সহিষ্ণুতা ও ধীরতার বিলক্ষণ প্রতিশোধ তুলিয়াছে" (৩৯)। এই ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত লেখনী হইতে পুনর্ব্বার অন্যস্থলে এই বাক্য

(৪০) Kaye's History of the Sepoy war. Vol. I. p. 46.

বহির্গত হইয়াছে— "আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে একটী সাহসী জাতির এইরূপ লুব্ধ অবশ্যই মানবজাতির মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ দৃশ্য, এবং ইহার অধিনায়কগণ ন্যায়তঃ সহানুভূতি ও সম্মান লাভের অধিকারী। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি মুখে আমাদিগকে বন্ধু বলিয়া গোপনে আমাদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল। ইহারা আপনাদিগের ইতৈষণা এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কলঙ্কিত করে, এবং মিথ্যাবাদিতা ও প্রতারণা দ্বারা আপনাদিগের সম্মান হইতে বিচ্যুত হয়" (৪১)। এই ঐতিহাস-লেখক কেবল স্বজাতির গৌরব-প্রিয়তায় অন্ধ হইয়া এইরূপ অসঙ্গত বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক পবিত্র ইতিহাসের সম্মান অপলাপ করিয়াছেন। অপক্ষপাতী বিচারক কখনও ইহা মার্জ্জনা করিবেন না। যে ব্রিটেনবাসী মদ গর্ব্বে অন্ধ, তিনি অসঙ্কুচিত হৃদয়ে শিখ্‌দিগের এই অভ্যুত্থানে বিশ্বাসঘাতকতার পরাকাষ্ঠা দেখিবেন, তাহার মতে "চন্দ্রে ও কলঙ্ক রেখা সম্ভবে তথাপি এই ভারতরাজ্যে ব্রিটীষ্ চরিত্রে কখনও কলঙ্ক সম্ভবে না। যদি ব্রিটেনবাসী পরস্ব লুণ্ঠন করে এখানে তাহার নাম প্রমোদ ক্রীড়া, যদি ক্লাইবের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কপট লক্ষ্য প্রস্তুত করে এখানে তাহার নাম অকরিত পূর্ব্ব প্রতিভা। আপনারা অন্যায় করিয়া মহারাণী ঝিন্দনকে হঠাৎ নির্ব্বাসিত করিলেন, হঠাৎ তাঁহার বৃত্তি কমাইলেন এবং অন্যায় করিয়া হঠাৎ বৃদ্ধ সর্দ্দার ছত্রসিংহের সম্মানচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করিলেন, তাহার নাম, সহিষ্ণুতা ও নম্রতা, সের সিংহ আপনার সম্মান রক্ষার জন্য, স্বদেশের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার নাম হইল, বিশ্বাসঘাতকতা ও হঠকারিতা। "নিয়মই তাঁহার অধীন তিনি নিয়মের অধীন নহেন, যে তাঁহার প্রহার সহিতে না পারে সে অশিষ্ট সে উদ্ধত, যে তাহাকে ভোজ্য বস্তু আহরণ করিয়া দিতে না পারে, সে শঠ সে ধূর্ত্ত; এবং যে পঞ্চমুখে তাহার স্তুতি গীত গাইতে না পারে, সে অজ্ঞ সে মিথ্যাবাদি, তাহার ইচ্ছায় বিধি, তাহার অভিসম্পাতে বিপদ এবং তাহার সন্দেহে, ঘোরতর সর্ব্বনাশ ও ঘোরতর বিপ্লব (৪২)।" এই প্রকার ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া অলোক সামান্য যুদ্ধবীর সের সিংহ এইরূপ কলঙ্কিত হইয়াছেন, এবং এই প্রকার ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া পরাক্রান্ত খালশা সৈন্য বিশ্বাস ঘাতক ও মিথ্যাবাদী বলিয়া ইতিহাসে ধিকৃত হইয়াছে। অহো বিড়ম্বনা!! অহো লাঞ্ছনা!! যদি মেকলের ন্যায় কঠোর প্রকৃতি সমালোচকের কঠোর লেখনী

(৪১) *Ibid*, p. 58.

(৪২) বান্ধবের তৃতীয় খণ্ড, ১ম সংখ্যার ব্রিটীষ্ ইণ্ডিয়া-শীর্ষক প্রস্তাব হইতে উদ্ধৃত।

হইতে এই ইতিহাস লেখকের উক্ত বাক্যের সমালোচন বাহির হইত তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ বলিতেন, "শৃঙ্গ যেরূপ মহিষের, নখর যেরূপ ব্যাঘ্রের, হুল যেরূপ মধুমক্ষিকার, এবং প্রাচীন গ্রীক্ সঙ্গীতানুসারে সৌন্দর্য্য যেরূপ নারী জাতির সেইরূপ, প্রতারণা, চাতুরী ও সত্যের অপলাপই ব্রিটীষ জাতির স্বার্থ সিদ্ধির অদ্বিতীয় সাধন। ইহারা স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রকৃত বীরবত্তাকে বিশ্বাস ঘাতকতা, প্রকৃত দেশহিতৈষিতাকে চপলতা ও প্রকৃত মনস্বিতাকে নীচতার পরাকাষ্ঠা বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কে সাহেবের সৌভাগ্য বলে এরূপ সমালোচক অদ্যাপি পঞ্জাবে জন্মিয়া তাঁহার লিখন-ভঙ্গীর এইরূপ কঠোর শ্লেষোক্তি করেন নাই।

এ বিষয়ে আর আমরা অধিক বাগাড়ম্বর করিতে চাহি না, অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া পল্লবিতত্ব দোষের প্রবর্ত্তয়িতা হইতে ইচ্ছা করি না। দুইজন পক্ষপাত শূন্য সুবিচারকের হস্তে এ বিষয়ের বিচার ভার দিয়া আমরা অপসৃত হইতেছি। তাঁহারা ইহার বিচার করিয়া কি বলিয়াছেন, পাঠক মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। মেজর ইভানস্ বেল্ লিখিয়াছেনঃ—" লর্ড ডেলহৌসী বলিয়াছেন "আমরা আমাদিগের নাবালক রাজার অধীনস্থ রাজ্য জয় করিয়াছি।" কিন্তু ইহা জয় নহে—ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। দেওয়ানি ও ফৌজদারী কার্য্যের নিরস্তা বলিয়া পঞ্জাবে আমাদিগের সম্ভ্রম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আমরা ইহার দুর্গ সকল করায়ত্ত করিয়াছিলাম, ইহার বিদ্রোহী অধিবাসিদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছিলাম, আমাদিগকে দলীপ সিংহের রাজ্য বজায় রাখিতে এই সমস্ত কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমরা সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাবের অধীশ্বর হইবার প্রত্যাশায় উক্ত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। * * * প্রাচ্য ধারণা অনুসারে, যিনি অধিক সংখ্য রাজাকে আপনার শাসন ও পালনের আয়ত্ত করিতে পারেন তিনিই রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী। লর্ড ডেল্‌হৌসী স্বীয় হৃদয়ের সারল্য দেখিয়া অনায়াসে ভারতীয় রাজাদিগের হৃদয়ে আকর্ষণ করিতে পারিতেন, তিনি ইহা না করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন, পবিত্র ইতিহাসের অবমাননা করিয়াছেন, উত্তর ভারতের সংস্কার সম্বন্ধে উপযুক্ত সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন, এবং অন্যায় ও অবিচার দ্বারা ভারত সাম্রাজ্য ভারাক্রান্ত করিয়াছেন" (৪২)। টরেন্‌স্ বলিয়াছেন, "সাধারণ নিয়ম অনুসারে, দলীপ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ও পঞ্জাব অধিকার অবশ্য ন্যায়ের বহির্ভূত বলিতে হইবে। দলীপ সিংহ নাবালক সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজনীতির কোন বিষয়েরই দায়ী নহেন। রাজ-প্রতিনিধি

(৪২) Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 178—179.

সভার শিরঃ স্থানে ব্রিটীষ্ রেসিডেণ্ট অবস্থিত ছিলেন, রাজধানীতে কোন গোলযোগই উপস্থিত হয় নাই এবং সাধারণ্যে সমস্ত অধিবাসিদিগের মধ্যে কোনও প্রকার বিদ্রোহ-ভাব লক্ষিত হয় নাই, রাণী সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, পরাক্রান্ত গোলাপ সিংহ বিশিষ্ট সম্ভাব সহকারে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। কেবল মুলতান ব্রিটীষ্ সৈন্যের প্রবেশ পথ রোধ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ইহাও বিধ্বস্ত করিয়া নিষ্ঠুর-প্রতি বিদ্রোহিদিগের অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়া হয়। যদি সামরিক আইন প্রচার করিয়া অবাধ্য খালসাদিগকে সম্পত্তি চ্যুত করা হইত, তাহা হইলেই সমগ্র ক্ষতির পূরণ ও প্রকৃত পক্ষে ন্যায়পরতা রক্ষিত হইত। ইহা না করাতে পক্ষপাত শূন্য ইতিহাস অবশ্যই বলিবে যে, পঞ্জাব অধিকার কেবল ডাকাতি মাত্র" (৪১)।

রাজ্যচ্যুতির সময়ে মহারাজ দলীপ সিংহের বয়স দ্বাদশবর্ষ ছিল। তিনি সেই সময়ে বঙ্গদেশস্থ সৈন্যের জনৈক সহকারী সার্জ্জনের (Sir John loging) শিক্ষাধীন হয়েন। শিক্ষক স্বীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুশাসন অনুসারে তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মহারাজ দলীপ সিংহ এক্ষণে ইংলণ্ডীয় সামাজিক ও স্কটলণ্ডীয় ভূম্যধিকারী হইয়া ইংলণ্ডে ব্রিটীষ্ সিংহের জাজ্জ্বল্যমান কলঙ্ক স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছেন; এবং মহারাণী ভারত সাম্রাজ্যেশ্বরী এক্ষণে ভুবন বিখ্যাত কহিনুর পঞ্জাব অধিকারের কলঙ্ক স্বরূপ স্বীয় মুকুটে ধারণ করিতেছেন। আর মহারাণী ঝিন্দন? যাঁহার জন্য প্রভুরক্ত খালসা উন্মত্ত হইয়া ভীষণ অনল-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাঁহার কি দশা হইল? স্বীয় অবস্থার বহুবিধ পরিবর্ত্তন পরে তিনি বৃদ্ধ, ভগ্নচিত্ত ও প্রায় অন্ধ হইয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তনয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১৮৬৩ অব্দে বারিধি-বেষ্টিত অপরিচিত অজ্ঞাত ও নির্জ্জন স্থানে প্রাণাধিক তনয়ের পার্শ্বে রাজাধিরাজ রণজিৎ সিংহের এই রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীভ্রষ্ট মহিষীর জীবন-স্রোতঃ অনন্ত কাল-সাগরে মিশাইয়া গেল।

ক্রমশঃ—

শ্রীরঃ—

(৪১) Empire in Asia, p. 352—353.

চিকিৎসা কল্পদ্রুম।*

এই গ্রন্থখানির পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। "ইহাতে যাবতীয় ব্যাধি (পুরুষ, স্ত্রী, এবং শিশু ও বালকদিগের সর্ব্ব প্রকারের পীড়া—চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ,

* চিকিৎসা কল্পদ্রুম, অর্থাৎ রোগ নির্ণয় এবং তচ্চিকিৎসা। সচিত্র।—শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়, এল, এম, এস, কর্ত্তৃক সংগৃহীত। চুঁচুড়া, ১৮৭৬।

গর্ভাবস্থার পীড়া, এবং সূতিকা পীড়া সমেত)—অ, আ, ই, ঈ, ক, খ, গ, বর্ণ ক্রমে শব্দ কোষাকারের সহিত, এবং প্রত্যেক ব্যাধির আবশ্যক স্থলে

নির্ব্বাচন	Definition.
উপশব্দ	Synonyms.
প্রকার	Varieties.
লক্ষণ	Symptoms.
উপসর্গ	Complications.
পরিণাম	Termination.
নিদান	Pathology.
কারণ	Causes.
স্থিতিকাল	Duration.
মৃত্যুসংখ্যা	Mortality.
নির্ণয়তত্ত্ব	Diagnosis.
ভাবীফলার্থকতত্ত্ব	Prognosis.
চিকিৎসা	Treatment.
অভিনব চিকিৎসা	Recent mode of Treatment.
লেখকের মত	Compiler's opinion.
প্রতিষেধ	Prophylaxis.

এই গুলি ক্রমান্বয়ে লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মাসে মাসে ইহার এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে। বলিতে কি যদুবাবু অত্যন্ত দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন। মনুষ্য-শরীরের রোগ প্রায় অসংখ্য। গৃহে গৃহে, ইহার প্রমাণ। প্রতি মনুষ্যের শরীর রোগের আগার। এক্ষণে ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন বহুবিধ উন্নতি হওয়াতে রোগ মাত্রেরই অনেক প্রকার তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে। একেত রোগের সংখ্যা করাই দুরূহ, তাহাতে রোগ মাত্র সম্বন্ধেই অসংখ্য তত্ত্ব জ্ঞেয়, ও সমালোচনীয় হইয়াছে। তাহাতে আবার যদু বাবু যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই সকলের পর্য্যালোচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থ অতি বৃহদ্ব্যাপার এবং যদু বাবুর স্বীকৃত ব্রত অতি কঠিন ব্রত বলিতে হয়।

কিন্তু ব্রত যেমন কঠিন, এবং ব্যাপার যেমন বৃহৎ, সুসম্পন্ন হইলে কার্য্যটি তেমনি মহাশুভ-ফল-দায়ক হইবে। একেত কোন একটি শাস্ত্র বা বিদ্যা সম্বন্ধীয় এক খানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ যে ভাষায় থাকে, সেই ভাষার সৌভাগ্য। সেই ভাষা যাহাদিগের একমাত্র অথবা প্রধান অবলম্বন, তাহাদিগের পক্ষে এরূপ গ্রন্থ দুস্তর জ্ঞান সাগরে ভেলা স্বরূপ। তাহাতে আমাদিগের ভাষায় এরূপ এক খানি কোষ গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয়। কেন না, আমাদিগের ভাষায় বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, অথবা কোন প্রকার সম্পূর্ণ, সর্ব্বতত্ত্ববাদী গ্রন্থ একবারে নাই। যাহার অদৃষ্টে মালা ঘুনসী যোটে না, তাহার পক্ষে রত্নহার বিশেষ আদরণীয়। ইহার পর, যখন মনে করা যায়, এই কোষ দুর্জ্ঞেয় চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয়, তখন ইহার সূচনা অস্মদ্দেশের বিশেষ গৌরব ও সুখের বিষয় বলিয়া বোধ হয়।

কেননা, বঙ্গদেশ রোগে আকুল। সুশিক্ষিত চিকিৎসকের ভাগ অতি অল্প।

বড় বড় নগরেই তাঁহাদিগকে দেখা যায়। গ্রামবাসীদিগের ভাগ্যে অধিকাংশস্থলে—কেহই নহে—কেবল যম, অথবা তাঁহার অনুচরবৎ "কবিরাজ"—চিকিৎসাব্যবসায়ী কবিরাজের কথা বলিতেছি না—হলব্যবসায়ী কবিরাজের কথা বলিতেছি। তাঁহারা চাসও করেন—এবং সময় পাইলে গাছরা ঔষধও বিতরণ করেন। একবেলা ধানের তলার ঘাস মারেন—আর এক বেলা শয্যাতলে মনুষ্য মারেন—কখনও কণ্টক কুল, কখনও রোগীকুল, নির্ম্মূল করেন। আমরা স্বীকার করি যে এ শ্রেণীর চিকিৎসকদিগের সঙ্গে এ গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এরূপ চিকিৎসকগণ কেবল কৃষিদিগের গ্রামেই অবস্থান করেন। গ্রাম্য ভদ্রলোকদিগের সহায় বটিকা-ব্যবসায়ী কবিরাজ এবং কুইনাইনব্যবসায়ী নেটিব ডাক্তার। কবিরাজের বিদ্যা থাকিলে, আদরণীয় বটেন। কিন্তু অধিকাংশ কবিরাজের বিদ্যার শেষ সীমা একটি বচনার্দ্ধ—"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।" তার পর প্রয়োজন হইলে চাণক্য-শ্লোক ও গঙ্গাস্তব আওড়াইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দেন। নেটিব ডাক্তারগণ ছুরি কাঁচি শলা পটি মলম জোলাপ লইয়া রোগীগণকে বিত্রস্ত এবং দক্ষিণাভিমুখে সত্বরগামী করিতে বিলক্ষণ সক্ষম বটে, তাহার অধিক আর কিছু তাঁহাদিগের সাধ্য হয় না। তাহার দুইটি কারণ। এক এই যে তাঁহাদিগের কাছে যে ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা প্রায় পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বকালের খরিদ, ধূলি-কর্দ্দমে কিঞ্চিৎ স্ফীত, কদাচিৎ লবণ ও ময়দার বিমিশ্রণে স্বাদবিশিষ্ট, সচরাচর মৃত কীটগণের দেহ এবং পুরীষে সুগন্ধিত; এবং হীরকচূর্ণের মূল্যে বিক্রীত। এরূপ ঔষধ গৃহস্থলোকে কিনিয়া উঠিতে পারে না; কিনিতে পারিলে গলাধঃকরণ করিতে পারে না, গলাধঃকরণ করিতে পারিলেও কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। দ্বিতীয় কারণ, পুস্তকের অপ্রতুল। বাল্য কালে বিদ্যালয়ে যে কয়টি স্থূল বিষয় ঘটিত উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া কোন ব্যবসায় চলে না। নিত্য নূতন শিখিতে হইবে, যতকালে ব্যবসায় করিতে হইবে, ততকাল শিক্ষা করিতে হইবে। বিশেষতঃ ডাক্তারি। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে নিত্য নূতন তত্ত্ব উদ্ভূত হইতেছে। আজ যাহা সত্য, কালি তাহা মিথ্যা; আজ যাহা গ্রাহ্য, কাল তাহা অগ্রাহ্য। আজ যাহা অসাধ্য, কাল তাহা সুসাধ্য। আর চিকিৎসক ও ব্যবহারাজীবের পুস্তকের উপর বিশেষ নির্ভর। যেমন কেহ সংসার ধর্ম্মের সকল দ্রব্য পকেটে লইয়া ভ্রমণ করিতে পারে না, তেমনি কেহ এতদুভয় শাস্ত্রগত সকল তত্ত্ব স্মৃতি মধ্যে রাখিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না। এইজন্য চিকিৎসকের পক্ষে ছুরি কাঁচি পটি বড়ী সিসি অপেক্ষা সৎপুস্তকের অধিকতর আবশ্যকতা। কিন্তু নেটিব ডাক্তারের ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট পুস্ত-

কের নিতান্ত অভাব। অনেকেই ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি-হীন। তাঁহাদিগের অবলম্বন দুই একখানি ক্ষুদ্র, পুরাতন ইংরেজি গ্রন্থ। হয়ত সে গ্রন্থ প্রপিতামহের আমলের; নয় ত তাহাতে দুই তিনটি ব্যাধির মাত্র তত্ত্ব লিখিত আছে। তাঁহাদিগের প্রয়োজন যদ্দ্বারা সুনির্ব্বাহ হয়, এমত গ্রন্থ প্রায় নাই। যদু বাবুর এই গ্রন্থে তাঁহাদিগের সেই অভাব পরিপূরণ হইবে।

যদুবাবুর এই গ্রন্থ প্রণয়ন যেরূপ কঠিন কার্য্য তাহা সহজে বুঝা যায়। ইহার প্রথম উপকরণ, লেখকের চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা—অর্থাৎ সকল রোগের সকল তত্ত্বে পারদর্শিতা। এরূপ পারদর্শিতা দেশীয় চিকিৎসকের মধ্যে কত লোকের আছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা দুর্লভ, এ কথা বলিতে পারি। কেবল অধীত শাস্ত্র স্মরণ রাখাকে পারদর্শিতা বলি না। তদ্রূপ পারদর্শিতার দ্বারা এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন দুঃসাধ্য। অনেকের বোধ আছে যে ইংরেজিতে যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করণ পক্ষে, কেবল ভাষান্তর করিলেই হইল। সেরূপ ভাষান্তরে কেহ উপকৃত হয় না। কেহ কিছু বুঝিতে পারে না, কেহ কিছু শিখিতে পারে না। লেখকও যে কিছু বুঝিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণীকৃত হয় না। আমি যাহা ইংরেজিতে শিখিয়াছি, তাহা তোমাকে বাঙ্গালায় বুঝাইতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন, যে যাহা ইংরেজিতে আছে তাহা নিজে পরিষ্কার করিয়া বুঝিব; অধীত শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকারী হইব। তাহার পর ইংরেজির অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া আপন চিত্ত হইতে তাহা তোমাকে বুঝাইব।

যদু বাবুর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই এবং তাঁহার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থে সেইরূপ অধিকারের লক্ষণ আছে। তবে, নূতন শব্দ লইয়া বড় গোলে পড়িতে হয়। ইংরেজিতে যে সকল ব্যাধি যে ভাবে শ্রেণীবদ্ধ এবং নামপ্রাপ্ত, সেই সকলের ভাষান্তর দুর্ঘট। ব্যাধির, লক্ষণের, ঔষধের বাঙ্গালা নাম, তাঁহাকে নূতন সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। বিশেষ শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নাম সকল দেশীভাষায় নাই, থাকিলেও তাহার ব্যবহার নাই, সুতরাং তাহার অভিনব ব্যবহারে ভাষা অত্যন্ত কটমটে ও আপাততঃ দুর্গম হইয়া উঠে। সে সকল যদুবাবুর দোষ নহে—বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থার দোষে। যদুবাবু এইরূপ অপ্রচলিত শব্দ সকলের ব্যবহার কালে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ইংরেজি শব্দও লিখিয়া দিয়াছেন।

এই গ্রন্থ প্রণয়নার্থ গ্রন্থকারকে প্রথমতঃ বহুতর সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সকল রোগের সকল কথা লিখিতে হইবে, সুতরাং প্রায় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সকল গ্রন্থ ঘাঁটিতে হইতেছে। এই সংগ্রহ পর্য্যায় ক্রমে সংকলিত এবং যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। তাহার

পর, লেখক নিজ মত সকল তাহাতে সংযোগ করিয়া গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তার পর মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের পারিপাট্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই কার্য্যটি অতি উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। যে গ্রন্থ অপর সাধারণের ব্যবহারের প্রত্যাশা দেখা যায় না, তাহার উপর সাহস করিয়া এত ব্যয় করিতে, আর কাহাকেও দেখা যায় না। বিশেষ ইহাতে যে চিত্রগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণে অসাধারণ ব্যবহার। প্রথম খণ্ড ষোল পৃষ্ঠা মাত্র। তাহাতে তিনটি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে, প্রথম প্রস্থন, দ্বিতীয় জরায়ুজ প্রাচীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রস্থন সংশ্লেষ, তৃতীয় দর্শনচক্র। চিত্রগুলি দেখিয়া, উৎকৃষ্ট বিলাতি চিত্রের অপেক্ষা কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

এরূপ বহুব্যয় ও, বহুশ্রমসাধ্য জাতীয় কীর্ত্তি, সাধারণের কাছে বিশেষ সাহায্য ব্যতীত পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না। এবং সেই সাহায্য দান বাঙ্গালি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থখানি কেবল নেটিব ডাক্তারদিগের প্রয়োজনীয় এমত নহে, তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসকেরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। কেননা, ইহাতে সর্ব্বরোগতত্ত্ব একত্রিত, শ্রেণীবদ্ধ; এবং যথাস্থানসন্নিবেশিত থাকিবে, এবং যদু বাবুর ন্যায় একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিজের মতও লিখিত থাকিবে। আর যদি যদু বাবু, এই সঙ্গেই বৈদ্যগণমধ্যে সুপরিচিত রোগ সকলের দেশী চিকিৎসা সন্নিবিষ্ট করেন তাহা হইলে আরও বিশেষ ফলোপধায়ী হইবে।

আমাদিগের বিবেচনায় কেবল চিকিৎসক কেন, সুশিক্ষিত, বাঙ্গালী মাত্রেরই এরূপ গ্রন্থ খানি গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগে সকলেই নিজ গৃহ মধ্যে, অথবা নিজ পল্লী মধ্যে চিকিৎসা করিতে পারা নিতান্ত স্পৃহণীয়। এইরূপ অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে বাল্যকাল হইতে যাঁহারা চিকিৎসা শিক্ষা এবং ব্যবসায় না করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসায় ব্রতী হওয়া কেবল রোগীর মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে। যেখানে রোগ কঠিন অথবা ঔষধ দুষ্প্রযুজ্য সেই খানে এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সর্ব্বত্র সত্য নহে। সামান্য সবিরাম জ্বরে, একটু কুনাইনের ব্যবস্থা করা, বা বাহ্য প্রদাহে দেখিলে তপ্ত সেকের পরামর্শ দেওয়া, বহুজ্ঞান বা বহুদর্শিতা সাপেক্ষ নহে। অথচ ইহাতে অনেক সময়ে অনেক উপকার হয়। সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ দুই এক খানি সৎপুস্তক অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগে স্বপরিবার এবং দরিদ্র প্রতিবাসীগণের মধ্যে অনেক উপকার করিতে পারেন। আর সকলেরই কখন না কখন এমত অবস্থা ঘটে যে গুরুতর বিপদ্ উপস্থিত—কিন্তু চিকিৎসক পাওয়া যায় না। অনেকেই এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করে। এই সকল সময়েরই জন্য, সক-

লোকেরই কিছু কিছু জ্ঞান এবং কিছু কিছু পুস্তক সংগ্রহ থাকা চাই। যাঁহাদিগের এরূপ ইচ্ছা, যদু বাবুর পুস্তক তাঁহাদিগের বিশেষ সহায় হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞান শিল্পাদির উৎসাহ জন্য যে কিঞ্চিৎ [illegible] স্বীকৃত আছেন, সাহেবদিগের নিকট অপরিচিত কোন বাঙ্গালী কি তাহার কিয়দংশ পাইতে পারে না? যদি পারে, তবে যদু বাবুর এই গ্রন্থ তাহা পাইবার বিশেষ অধিকারী। কেননা এরূপ বৃহৎ এবং ব্যয়সাধ্য গ্রন্থ অস্মদ্দেশে সমাজ-সাহায্য এবং রাজ-সাহায্য উভয়ও ব্যতীত কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

শ্রীবঃ—

পরিত্যক্তা রমণীর প্রতি।

১

কে তুমি বরাঙ্গী! বসি অলিন্দ উপরে,
কহ মোরে সুহাসিনি! কে তুমি রমণী,
বিকচ কুসুম বপু আবরি অম্বরে,
কেন আজি ম্লান-মুখী কুরঙ্গ-নয়নী!
তুমি জানি বরাননে,
কেন বসি এককিনী নিরানন্দ মনে।

২

কি কারণে ম্লান নীল নলিন নয়ন,
অরঞ্জিত কেন শ্যামি নিবিড় কুন্তল,
বিরস মলিন মরি নিথর বদন।
ঊষার হিমাংশু যথা মলিন সজল,
অলিন্দ উপরে বসি ভুবন-সুন্দরী—
অলিন্দে অচল যেন রূপের লহরী।

৩

মলিন বদন চারু মলিন নয়ন,
কেন হেরি কহ অয়ি শশি-নিভাননে,—
এইত তোমার বালা কুসুম যৌবন
বিকসিত জীবনের প্রমোদ কাননে,
এইত ফুটিলে তুমি মধুরা উষায়,
রূপের অপরাজিতা যোমের লতায়।

৪

অতুল ঐশ্বর্য্য, তুমি রাজরাজেশ্বরী—
অনন্ত সম্পদ তব হায় এ ভুবনে,
কি অভাব ত্রিজগতে তোমার সুন্দরী?
তবে কেন ম্লান মুখ নিরখি নয়নে,
তবে কেন হায় তব নয়নের জল,
কোমল বয়ান বহি ঝরে অবিরল?

৫

এখনি কি কীট-রাশি বিকচ কুসুমে
পশিয়া নাশিল তার শোভা নিরমল;
শুকায় কি প্রভাতের তপন-কিরণে—
শারদের তামরস প্রফুল্ল তরল;—
নিরখি তোমার বালা সজল বদন,
অন্তরে অনন্ত শোক হয় উদ্দীপন।

৬

উষার পঙ্কজ জিনি স্ফুট মনোরম
অনঙ্গ-তুলিতে আঁকা নয়ন তোমার;
বল সখি! বিধাতা কি করিল সৃজন,
ঝরিতে কেবল তায় অনন্ত আসার;
আছে কি এ ত্রিভুবনে এমন পাষাণ,
তোমাকে নিরখি যার কাঁদেনা পরাণ?

৭

ডুবিলে পশ্চিমে রবি সন্ধ্যার মিলনে,
মধুর প্রভাতে কিম্বা নিরখি যখন,
ও বদন—পূর্ণ চাঁদ—অলিন্দ সদনে,
তখনি নিরখি তব সজল নয়ন,
তখনি নিরখি পদ্ম করতল-পরে
রক্ষিত বদন-চন্দ্র বিষাদের ভরে।

৮

তখনি নিরখি মেলি নয়ন অমলে,
চেয়ে আছ একদৃষ্টে গগনের পানে;
কিম্বা হেরি সরসীর প্রফুল্ল কমলে,
দেখিতেছ জললীলা সুমন্দ পবনে;
রাজরাণী হ'য়ে তুমি চির-দুঃখিনী;
অনন্ত সংসারে তুমি অনন্ত-দুঃখিনী।

৯

দেখিয়াছি প্রতিদিন ও চন্দ্র-বদন,
বিকশিত বিম্বাধর দেখেছি সুন্দরী;
কিন্তু অয়ি বিনোদিনি! দেখিনি কখন
মধুর অধরে তব হাসির লহরী;
দেখিয়াছি শত বার নয়ন কমলে
নয়নের চিরজল মুছিতে অঞ্চলে।

১০

কুল-বিহঙ্গিনী বসি কুলের পিঞ্জরে
ফেলিতেছ দিবা নিশি নয়নের জল,
বিষাদ-সঙ্গীত দুঃখ তরঙ্গিত স্বরে
মনের অনন্ত দুঃখে গাও অবিরল,—
সেই দুঃখ এজনমে যাবে না কখন,
অনন্ত যাতনা তব ললাট লিখন।

১১

সরল অন্তর তব—প্রেম-পারাবার,
সরল অন্তর তব পূর্ণিত প্রণয়—
সেই সুকুমারতর অন্তরে তোমার
চির-প্রেমময়ী কত তরঙ্গিণী বয়;—
সেই তরঙ্গিণী স্নিগ্ধ সুকোমল
তোমার কপালে আজি পূর্ণ হলাহল।

১২

বিষময় বিবাহের কুসুম-শৃঙ্খলে,
বাঁধিল তোমার যবে পাণি সুকোমল,
হৃদয় ভিতরে প্রেম-সরসীর জলে,
মুকুলিত হল যবে প্রণয় কমল;
ভাবিলে তখন মনে সেই পরিণয়
আনন্দের নিকেতন হইবে নিশ্চয়।

১৩

বিধাতার বিড়ম্বনে, বিশ্ব-বিমোহিনি!
আজি সেই পরিণয়—কুসুমের হার
তোমার কপাল দোষে, অয়ি অভাগিনী;
চির হলাহলময় ভুজঙ্গ-আকার;
ভাগ্য দোষে হায় তব জীবন-সাগরে
মুদিল সুখের পদ্ম চিরদিন তরে।

১৪

প্রতি তব হতভাগ্য, নৃশংস নির্দ্দয়,
ত্যজি'হেন সুবর্ণের চারু পঙ্কজিনী,—
চির মধুমতী স্বর্গ অমিয়-নিলয়,
বিনোদ কুসুম রূপে ভুবনমোহিনী,
প্রফুল্ল মল্লিকা ফুল রূপের কাননে,
স্বর্ণময়ী তারা কিম্বা নিদাঘ গগণে।

১৫

পাষাণের সম তব পতির অন্তর,
তা না হলে ত্যজি হেন কুসুম-কামিনী—
চিরপতি-পরায়ণা, সুমধুরময়,
প্রণয়ের সুশীতল রম্য প্রবাহিনী—
দুঃখের সাগরে কেন হইবে মগন,
করিবে অলস্তানলে জীবন অর্পণ ?

১৬

কি কুক্ষণে পরিণয় হইল তোমার,
পরাইলে ফুলমালা নির্ম্মম পাষাণে ;
সুখের ললামময় মূর্ত্তি সুকুমার,
দেখিল না কোন দিন পুলকিত প্রাণে ;
একাকিনী মনোদুঃখে বসিয়া নির্জ্জনে,
কাঁদিবার তরে শুধু জন্মিলে ভুবনে।

১৭

শোভিলে না কোন দিন তুমি সুহাসিনী,
প্রেমময় প্রাণেশের হৃদয় সদনে ;
বসিলে না পতিপ্রেমে হ'য়ে সোহাগিনী ;
পতির কোমল অঙ্ক—প্রেম-সিংহাসনে ;
প্রণয় মিলনে কিম্বা হইয়া বিহ্বল,
চুম্বিলে না কভু নাথ-বদনকমল।

১৮

এমন পতির কণ্ঠে কমলের দল
জিনিয়া কোমলতম বসন্ত-কামিনী,
সাজে কি কখন মরি মণি সমুজ্জ্বল,
সাজে কি পরিলে কভু চিরভিখারিণী,
উষার মধুর চম্পা প্রচণ্ড অনলে,
মুকুতার মালা কিম্বা বানরের গলে ?

১৯

রাজ-অট্টালিকা-সম প্রাসাদ তোমার ;
অই দেখ সুহাসিনী চির শূন্যময়,
কোথায় প্রাণেশ তব—সকলি আঁধার,
নীরব বিজন অই আমোদ-নিলয়,
অবরোধে তুমি সুধু বসি একাকিনী—
সুবর্ণ পিঞ্জরে যেন বন-বিহঙ্গিনী।

২০

অই দ্বারে দৌবারিক ফিরিছে উল্লাসে,
সহস্র কিঙ্কর অই নিদ্রায় কাতর,
সখের বিহঙ্গকুল, পিঞ্জর সকাশে
ছড়াইছে সেই অই সুমধুর স্বর ;
হায় রে প্রাণেশ তব কোথায় এখন,
বারাঙ্গনা-প্রেম-নীরে রয়েছে মগন !

২১

সেই বার-রমণীর হৃদয় ভিতরে,
থাকিলে থাকিতে পারে মধুর প্রণয় ;—
সেও বটে প্রেম-রত্ন সমুজ্জ্বলতর,
সে প্রেমেও প্রাণ মন সুশীতল হয় ;
কিন্তু বল বিনোদিনী কি দোষ তোমার,
কেন তুমি পতি-চক্ষে বিষের আগার ?

২২

অই পতি-বিরহিণী চির-অভাগীর
দেখিলে বদন খানি প্রেমে বিস্ফারিত,
প্রণয়ের প্রতিকৃতি, নয়ন সনীর,
বিষাদে হৃদয় আহা হয় উচ্ছসিত ;
ইচ্ছা করে সমাজের কঠোর নিয়ম
এখনি অনলস্তানলে করি অরপণ !

* * * *

২৫

কত শ... সিমন্তিনী রূপে বিদ্যাধরী-
শরদিন্দু শশি-কলা, কিম্বা মনোরম,
নিরাশার হুতাশনে দিবস শর্ব্বরী
জ্বলিয়া হয়েছে আহা অঙ্গার বরণ !
কবে অই বামাকুল ... পরিত্রাণ,
বিবাহের কুনিয়ম হবে অবসান ?

* * * *

শ্রীহঃ—

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ঔষধ-সার-সংগ্রহ। কলিকাতা নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। গ্রন্থকর্ত্তার নাম অপ্রকাশিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ব্রিটিশ ফার্ম্মা-কোপিয়া ও বিবিধ অভিনব পুস্তক অবলম্বন করিয়া, ডাক্তার নেলিগ্যান্ প্রদর্শিত নিয়মে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগকে ভৈষজ্য বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে অতি সংক্ষেপে অথচ পরিস্ফুটরূপে এই গুরুতর বিষয় যেরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। এই জন্য আমরা মেডিকেল স্কুলের অধ্যক্ষ ও ছাত্রদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন এই পুস্তকের আদর করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

ভারত-সুহৃৎ—মাসিক পত্র ও সমালোচন। ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। আমরা উপর্য্যুপরি এই পত্র খানির কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার কয়েকটী প্রবন্ধও আমরা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু কোন ২ প্রবন্ধে যে সকল মত পরিব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমাদিগের মতে, নিতান্ত অপরিপক্ক। এরূপ অপরিণত মত চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট আদরণীয় হইবে প্রত্যাশা করা যায় না। এরূপ মত পাঠে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিত্তভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু অপরিণতবুদ্ধি যুবকমণ্ডলীর বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই জন্য আমরা আমাদিগের মফঃস্বলস্থ সহযোগীকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন মত প্রচার বিষয়ে কিঞ্চিৎ সতর্ক হয়েন। মফঃস্বল হইতে এরূপ পত্রিকা প্রচারিত হয় ইহা আমাদিগের নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়। আমরা সম্পাদক ও লেখকগণের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে পরম প্রীত হইয়াছি।

অবকাশ-গাথা—কোষকাব্য বিবিধ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু প্রণীত। ষ্টান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সংস্কৃত হইতে বিবিধ প্রকার ছন্দোবন্ধ আহরণ করিয়া এই কবিতা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার অনেক স্থান অতি সুললিত। ইহার অনেক স্থল আপাততঃ পড়িতে সংস্কৃতের ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বই আর কিছুই নয়। যে সকল কবি এক-ঘেয়ে ছন্দে পাঠকদিগের ধৈর্য্য লোপ করিয়া থাকেন, এই ছন্দোময়ী কবিতা তাঁহাদিগের উপদেশস্থল।

প্রণয় ও শ্রীকৃষ্ণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সমাজের অর্থ একতা, এবং একতার অনিবার্য্য প্রয়োজন স্বার্থের সম্পূর্ণ-মূলোচ্ছেদ ও প্রণয়াদি হৃদ্-বৃত্তি সকলের পূর্ণ-প্রসারণ। যেমন বংশ বৃদ্ধিতে বাধ্য হইয়াই মানুষকে সমাজবদ্ধ হইতে হইয়াছে, তেমনি বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে স্বার্থের মূলোচ্ছেদ ও হৃদ্-বৃত্তি সকলের প্রসারণ করিতে হইবে। কেহ ২ ইহাতে এমন তর্ক করিতে পারেন, যেমন মিল্ তাঁহার কোমৎ দর্শন সমালোচন কালে কোমতের উক্ত-রূপ মতের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন, যে স্বার্থের মূলোচ্ছেদ করিতে গেলে, স্বাতন্ত্র্যের (Individuality) মূলোচ্ছেদ করা হয়; স্বাতন্ত্র্য মানবের সৌন্দর্য্য, অতএব স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইলে, মানুষের সৌন্দর্য্য গেল, সৌন্দর্য্য গেলে মানুষের আর থাকিল কি? কিন্তু আমরা বলি স্বার্থের মূলোচ্ছেদ হইলে স্বাতন্ত্র্যের মূলোচ্ছেদ হয় না, মানবীয় সৌন্দর্য্যের লোপ না হইয়া বৃদ্ধি পায়। সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্দেশ্য (direct end) করিয়াই মিল্, স্পেন্সর প্রভৃতি উক্ত মতের উদ্ভব করিয়াছেন। আমার সুখ আমার উদ্দেশ্য, আমি যাহাতে আমার সুখ পাই, তাঁহাই করিব, আমি আমার আত্ম সুখ উপেক্ষা করিয়া, অপরের সুখের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিব এ কেমন কথা? আমার স্বত্বনাশ করিয়া অপরের সুখের হেতু হইয়া জীবন যাপন করা, জীবনকে শ্রীহীন করিয়া অপরের দাস করা মাত্র। এই নিমিত্তই স্পেন্সর কহিয়াছেন "অন্যের সুখের ব্যাঘাত না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন সুখের অনুসরণ করুক।" ইহাতে স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা হইবে, সুখও সম্ভব-মত আয়ত্ত হইবে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের পথ-নিদর্শন করা হইল কই? আকাঙ্ক্ষিত উপপাদ্যের মন্তব্যের পূরণ হইল না। আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য, পূর্ণ সুখ উপভোগ করা। অন্যের সুখের ব্যাঘাত না করিয়া সুখ উপভোগ করিতে গেলে, সংসারে অতি অল্প সুখই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। ইডন উদ্যানে এক ব্যক্তি নির্জ্জন সুখ উপভোগ করিব বলিয়া বসিয়া আছেন, আমি তথায় গেলে তাঁহার সুখের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং আমার কিম্বা অপর কাহার, স্পেন্সরের মতে তথায় যাওয়া উচিত নহে। পুনশ্চ মানব কখন কোন্ সুখের উপভোগে নিমগ্ন আছে, তাহার ব্যাঘাত নিবারণের জন্য সতর্ক হইতে হইলে সর্ব্বদা উহা জানিয়া উঠাও সহজ নহে। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই অপরের সুখের লঘু গুরু ব্যাঘাত না করিয়া থাকিতে

পারি না। স্বার্থের সহিত সামাজিক জীবনের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। মানিলাম সুখই জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্দেশ্য করিতে গেলে, কেবল স্বার্থেরই পূর্ণ মুক্তি দ্বারা উহা আয়ত্ত হইতে পারে, অন্যথা সুখের আয়তন অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। স্পেন্সর উদ্দেশ্যকে খাটি করিয়া উপায় রক্ষা করিয়াছেন; তিনি সুখের পূর্ণ উদ্দেশ্যকে সংকীর্ণ করিয়া তাহার উপায় সমাজ-নীতি রক্ষা করিয়াছেন। মানুষের অসামাজিক অবস্থায় সুখের পূর্ণ উপভোগই মহৎ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, মানুষ উহার আয়ত্তির নিমিত্ত স্বার্থের পূর্ণ মুক্তি দান করে। এখন যেমন মানুষকে বাধ্য হইয়া সমাজ বদ্ধ হইতে হইয়াছে, এই বাধ্যতার ফল ভোগ স্বরূপ, প্রকৃতির দণ্ড স্বরূপ, তাঁ-হাকে তাঁহার উদ্দেশ্য খাট করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতে হইবে; মানুষের যেন আর পূর্ণ সুখ উপভোগ উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমরা এই সামাজিক অবস্থা-তেও পূর্ণ সুখকে অবশ্য উদ্দেশ্য করিব, এবং সেই উদ্দেশ্য আয়ত্তির উপায় ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ ও ফরাসি পণ্ডিত কোমৎ যাহা দেখাইয়াছেন তাহার তাৎ-পর্য্য দেখাইতেছি। ইহঁাদের মতে সামা-জিক জীবনে সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্দেশ্য না করিয়া পরম্পরা সম্বন্ধে উদ্দেশ্য করিতে হইবে; জীবনে আত্ম-সুখ ভুলিয়া গিয়া অপরের সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিতে হইবে; সুতরাং স্বার্থের একে-বারে মূলোচ্ছেদ করিয়া প্রণয়কেই জীব-নের কার্য্যের বলবৎ সহায় করা চাই। অপরের সহিত আপন জীবনকে একীভূত করিতে হইলে, গাঢ় ও তন্ময় করিতে হইলে, প্রণয় ভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই। কিন্তু এখানে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে, আত্ম-সুখ ভুলিয়া গিয়া অপরের সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য করিব একথার তাৎপর্য্য কি? আমরা এ সম্বন্ধে এস্থলে মিলের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম। মিল্ পূর্ব্ব জীবনে এই মতের বিপরীত-মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু পর জীবনে তাঁহার নিজ জীবন বৃত্তান্ত লিখিবার সময় পূর্ব্বমতের বিপরীত মতাবলম্বনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিল্ ইতিপূর্ব্বে কিছু দিন হইতে মানসিক বিমর্ষতা রোগে ভুগিতে ছিলেন; এই রোগ কোন সাংসারিক দুর্ঘটনা বশতঃ নয়, মানুষের মন সময়ে সময়ে যেরূপ অকারণ দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়, উহা তাহাই মাত্র। এই সময়ে মিলের মনের অবস্থা অতি ভয়-ঙ্কর কষ্টকর হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে এক দিবস (Marmontel's Memoires) পড়িতে পড়িতে, তাহার মধ্যে যে স্থলে মারমন্টেলের পিতার বিয়োগে সেই পরিবারের ঘোর দুর্দ্দশাস্থলে উপনীত হই-লেন, মারমন্টেল্ তখন কেবল বালক মাত্র, সহসা উত্তেজিত হইয়া পরিবার সকলকে ইহা বুঝাইলেন, যে তিনিই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব হইবেন, পরিবারবর্গেরা যাহা হারাইয়াছেন তিনিই তাঁহাদিগের

সকল অভাবই পূরণ করিবেন। এই শোকাবহ জাজ্বল্যমান দৃশ্যটি মিলের মনে পূর্ণ উদয় হওয়াতে, সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ইহা হইতেই মিলের অন্তরের ভার লঘুতর হইয়া আসিল এবং তাঁহার মৃতবৎ হৃদ্‌বৃত্তি সকল জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই ঘটনার পর মিল্ লিখিতেছেন;—"এই সময়ের ভূয়োদর্শনে আমার মতের এবং স্বভাবের উপর দুইটি বিশেষ ফল উৎপন্ন হয়। আমি এক্ষণে এমন একটি জীবন্-মত অবলম্বন করিলাম, যাহা আমি পূর্ব্ব জীবনে যদনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং বোধ হয় আমি এই সময়ে কারলাইলের (Carlyle) আত্ম-ভাববিদ্বেষী মতের বিষয় কিছুই শুনি নাই। সুখই যে জীবনের নীতি, জীবনের কার্য্য এবং জীবনের উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে আমি ইহাই ভাবিলাম যে, এই উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লক্ষ্য না করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। আমার বিবেচনায় যে সকল ব্যক্তিরা আপনার সুখ ছাড়া অপর কোন বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছে; অপর কোন ব্যক্তির সুখের নিমিত্ত মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছে, সমস্ত মানবজাতির উন্নতির বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছে, অথবা যে কোন কলা বা কার্য্যকে উদ্দেশ্যের উপায় বলিয়া অনুসরণ না করিয়া, তাহাকেই মনসিজ উদ্দেশ্য বলিয়া অনুসরণ করিতে পারিয়াছে, তাহারাই সুখী। এইরূপে অপর কোন বিষয়কে উদ্দেশ্য করিয়া মানব তাহার অনুসরণেই সুখ পাইয়া থাকে।—যদি তুমি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর, তুমি সুখী কি না, তুমি তৎক্ষণাৎ দেখিবে তুমি সুখী নহ। সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবনের উদ্দেশ্য না করিয়া, তাহার অতীত কিছু লক্ষ্য করাই সুখ পাইবার একমাত্র উপায়।—এই মত এক্ষণে আমার জীবন-দর্শনের মূল-ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছিল। এবং আমি অদ্যাপি এই মত দৃঢ় ধারণ করিয়া আছি যে, ইহা যে সকল ব্যক্তির কিয়ৎ পরিমাণ অনুভূতি ও উপভোগ শক্তি আছে অর্থাৎ মানব মণ্ডলীর অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই মত অতি উৎকৃষ্ট মত।" আমরা স্বীয় মত পরিপোষণার্থে মিলের ন্যায় গভীর চিন্তাশীল উদারপ্রকৃতি ব্যক্তির মত*

* The experiences of this period had two very marked effects on my opinions and character. In the first place, they led me to adopt a theory of life, very unlike that on which I had before acted, and having much in common with what at that time I certainly had never heard of, the anti-self-consciousness theory of Carlyle. I

উদ্ধৃত করিলাম। মিল্, কারলাইল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি এই মতের অনুমোদন করিলেও, ইংলণ্ডীয় সমাজনীতিতে অদ্যাপি ইহার শক্তি প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু আমরা বিশেষ জানি না, যে রূপ শুনিতে পাই, ফরাসী সমাজনীতিতে হৃদ্‌বৃত্তির প্রসারণ, প্রেমের প্রসারণ, নিস্বার্থপরতা, পৃথিবীর অপরাপর জাতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ইহার কতদূর ব্যাপৃতি হইয়াছিল এবং এখনও কতদূর বর্ত্তমান আছে, আমরা এই কৃষ্ণ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাহা দেখাইব।

আর্য্যজাতির ইতিহাস নাই, কিন্তু ইতিহাস অনুদ্ধার্য্য এ কথা বলিতে পারি না। ইতিহাস গঠনের উপাদান সম্পূর্ণই বর্ত্তমান আছে। শিল্প, সাহিত্য, অর্থাৎ চিত্র, তক্ষণ, হর্ম্ম্য-প্রণালী প্রভৃতি

never indeed, wavered in the conviction that happiness is the test of all rules of conduct, and the end of life. But I now thought that this end was only to be attained by not making it the direct end. Those only are happy (I thought) who have their minds fixed on some object other than their own happiness; on the happiness of others, on the improvement of mankind, even on some art or pursuit, followed not as a means, but as itself an ideal end. Aiming thus at something else, they find happiness by the way. The enjoyments of (such was now my theory) are sufficient to make it a pleasant thing, when they are taken *en passant*, without being made a principal object. Once make them so, and they are immediately felt to be insufficient. They will not bear a scrutinizing examination. Ask yourself whether you are happy, and you cease to be so. The only chance is to treat, not happiness, but some end external to it, as the purpose of life. Let your self-consciousness, your scrutiny, your self-interrogation, exhaust themselves on that; and if otherwise fortunately circumstanced you will inhale happiness with the air you breathe, without dwelling on it or thinking about it, without either forestalling it in imagination, or putting it to flight by fatal questioning. This theory now became the basis of my philosophy of life.

See Mill's Autobiography, From page 139 to 143.

শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্য ও ধর্ম্ম, কিরূপে সূত্রপাত হইয়া কতদূর পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহার আপূর্ব্ব উপাদান, বহুল ধ্বংসের পরেও এখনও একরূপ বজায় আছে, ইহা হইতেই আর্য্যজাতির ক্রমোন্নতির চিত্র এখনও উজ্জ্বলরূপে প্রস্তুত হইতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের গভীর অধ্যয়ন, বিজ্ঞত্ব ও প্রখর ধীষণা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিরই এই কার্য্য সম্ভব। আমরা আমাদিগের ক্ষুদ্র বিদ্যা বুদ্ধিতে কৃষ্ণ চরিত্র উপলক্ষে, এই মহদ্ব্যাপারের আভাস কয়েক স্থল স্পর্শ করিব মাত্র।

আর্য্যজাতির উন্নতির ক্রম অনুশীলন করিতে হইলে, প্রথমতঃ বৈদিক কাল অবলম্বন করিতে হয়। এই বৈদিক কালে আর্য্যজাতির শিল্প সাহিত্যজ্ঞানের অবস্থা কি তাহার অনুশীলন আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়: আমরা কেবল সমাজনীতির আভাস মাত্র উদ্ধৃত করিব। যেহেতু আর্য্যজাতির সমাজনীতির উন্নতিই আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কিন্তু বৈদিক কাল আমাদিগের এ প্রস্তাবের সহিত সম্বন্ধ-বিরহিত হইলেও, উহাকে আমাদিগের এই প্রস্তাবের মূল ভিত্তি করিলে বোধ হয় পাঠকবর্গের তত বিরক্তিকর না হইয়া, আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে। মানব সমাজ সাধারণতঃ প্রয়োজনের দাস। প্রয়োজনের বাধ্য হইয়াই মানুষ তাহার উপায় অন্বেষণ করে, এবং এই অন্বেষিত উপায় সকলই সেই সেই কালের প্রয়োজন-সাধিনী কর্ত্তব্য-নিয়ম বা নীতি বলিয়া পরিগণিত হয়। আর্য্যগণ যখন তাঁহাদিগের আদি বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চনদ উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম ভারতভূমে প্রবেশ করেন, ঠিক সেই সময়ের ও তাহার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার নিদর্শন কিছুই পাওয়া যায় না। বৈদিক কালের অবস্থা যে তাঁহাদের পূর্ব্ব অবস্থার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহার ভূয়সান্ আভাস পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব অবস্থার আভাসও কিয়ৎ পরিমাণে অনুমিত করাইয়া দেয়। বৈদিক কালের পূর্ব্বে তাঁহাদের সমাজের অবস্থা যে উন্নতির দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই।* মানব অতি আদিম অবস্থায় অন্য জ্ঞানের অভাবে এই সকল সৃষ্টিকে তাঁহারই ন্যায় জীবন্ত জ্ঞান করে; পরে ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতে ক্রমে সৃষ্টির জড়ভাবত্বের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু সৃষ্টির গতি ও কার্য্য দেখিয়া মানব তাহার অভ্যন্তরে কোন অতীত প্রকৃতির কল্পনা করিয়া থাকে। মিল্ এই কথা তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ক তিন প্রবন্ধের একস্থানে বিস্তীর্ণরূপে বুঝাইয়াছেন। ঋক্‌বেদ এবং

---

* আমরা এই বৈদিক কালকে কেবল ঋক্‌বেদের কালই কহিতেছি; যেহেতু সামবেদ বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদের কাল ঋক্‌বেদের কাল হইতে অনেক পরে বোধ হয়।

তাহার পূর্ব্বকালের আর্য্য অবস্থা কেবল ঋক্‌স্তোত্র গুলির অর্থ মাত্র বুঝিয়া ক্ষান্ত হইলে, এই সময়ের অবস্থা বলিয়াই বেশী উপলব্ধি করাইবে। কিন্তু ঋক্ সকলের যে বিচিত্র ও ব্যাপ্ত কবিত্ব শক্তি, তৎকালীন মনের ভাব-প্রকাশক, বহু বিশেষণ সম্পন্ন উহার ভাষার যে প্রশস্ত সম্বল (আধুনিক সংস্কৃত ভাষার প্রশস্ততা আমরা উল্লেখ করিতেছি না) সমাজ-নীতিজ্ঞান ও ঐশিক জ্ঞানের উৎকর্ষ্য যত টুকু প্রকাশ করে, তাহাতে তৎকালীন আর্য্যগণকে সমাজোন্নতির দ্বিতীয় সোপানান্তর্ভূত বলিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহারা উক্ত সোপানের শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আমরা উদাহরণ স্বরূপ মক্ষমূলর কৃত ঋকবেদের ইংরাজী অনুবাদ হইতে কয়েকটি ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথমতঃ কবিত্ব ও বর্ণনা-চাতুর্য্য স্বরূপ—

"Those who stand around while he moves on, harness the bright red steed, the lights in heaven shine forth."

"যাহারা তাঁহার গমন সময়ে তাঁহার চতুস্পার্শ বেষ্টন করিয়া চলে, যাহারা তাঁহার লোহিতাশ্বের বল্‌গা স্বরূপ, সেই স্বর্গীয় আলোক সকল প্রদীপ্ত হও।" (প্রথম মণ্ডল, ছয় সূক্ত, প্রথম স্তোত্র) পুনশ্চ;—

"The pious singers (the Maruts) have, after their own mind, shouted towards the giver of wealth, the great, the glorious (Indra.)"

"সেই পবিত্র-সঙ্গীতকারী মরুদগণ, আপন ইচ্ছায় ধনদাতা, মহান্, গৌরবান্বিত ইন্দ্রের যশোগান করিতেছে।" (প্রথম মণ্ডল, ছয় সূক্ত, ছয় স্তোত্র)।

দ্বিতীয়তঃ ঐশিক জ্ঞানের একটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি;—

"when you thus from afar cast forwards your measure like a blast of fire, through whose wisdom is it, through whose design? To whom do you go, to whom, ye shakers (of the earth)?"

"যখন তুমি দূর হইতে অগ্নির ঝঞ্ঝার ন্যায় তোমার শক্তিকে নিঃক্ষেপ কর, কাহার জ্ঞানে এবং কাহার কল্পনায় উহা করিতে সমর্থ হও? কাহার নিকটে তোমরা গমন কর, কাহার নিকটে, হে পৃথিবী-আলোড়নকারী মরুদগণ?"

(ঐ গ্রন্থ ৮১ পৃষ্ঠা, প্রথম স্তোত্র।)

এই স্তোত্রে দেখা যাইতেছে এই কালের আর্য্যগণের ঐশিক জ্ঞান, জড়াধার প্রকৃতির কল্পনা ছাড়াইয়া জগৎকারণ তাহারও অতীত কোন বস্তুর অনুমান করিতেছে; জড়াধার মরুতাদি প্রকৃতিরাও সেই অনুমেয় বস্তুর দাস।

তৃতীয়তঃ সমাজনীতি বিষয়ক একটি স্তোত্র;—

"Let not one sin after another

difficult to be conquered, overcome us; may it depart together with lust."

"একটি পাপের পর আর একটি দুর্জ্জয় পাপ আমাদিগকে যেন অভিভূত না করে; দুরাকাঙ্ক্ষার সহিত তাহারা যেন চলিয়া যায়।" (ঐ গ্রন্থ, ৬৫ পৃষ্ঠা, ৬ স্তোত্র)।

এই স্তোত্রে পাপ অর্থে তাঁহারা কি বুঝিতেন তাহার কিছুই পরিব্যক্ত নাই; কিন্তু অপরাপর স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে তাহার কিছু কিছু প্রকাশ আছে। প্রবঞ্চনা, মিথ্যাব্যবহার, অনপরাধির প্রতি অভিসম্পাত, পরস্ত্রীতে অভিলাষ প্রভৃতি সমাজনীতিগুলি সেই কালে সমাজে সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমাজনীতিগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে, যে এইগুলির ঠিক সমাজের দ্বিতীয় অবস্থায় উৎপত্তি হইয়া থাকে। মানুষ স্বাতন্ত্র্য-জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামাজিক জীবনে প্রবেশ করিলেই এইগুলি আশু প্রয়োজন হইয়া উঠে। স্বাতন্ত্র্যজীবনে ছলে বলে অন্যের অধিকার হরণ পূর্ব্বক আপনার সুখ বৃদ্ধি করার কোন বাধা ছিল না; কিন্তু সামাজিক জীবনে উক্ত ব্যবহার ঘোর অনিষ্টোৎপাদনের এবং মানবকুল-নির্ম্মূলের কারণ হইয়া উঠে। এই অত্যয় নিবারণের নিমিত্ত আশু মানুষের সহিত মানুষের সংঘর্ষ নিবারণের প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া আমার অধিকার লইবে না; আমি মিথ্যা বাক্যে বা মিথ্যা ব্যবহারে তোমাকে কোন অনিষ্টপাতে নিক্ষেপ করিব না; নিরপরাধে তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশে অভিসম্পাত করিব না; একজনের উপভুক্ত স্ত্রী অপরজনে ইচ্ছা করিবে না। যেহেতু ইহা করিতে হইলে (এক জন অপর জন হইতে দূরে নয়) একজনকেই অবশ্যই অপর জনের প্রতিহিংসা ভোগ করিতে হইবে; তাহাতে ক্রমে সমাজে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া সমাজ নষ্ট হইবার সম্ভব; এই নিমিত্ত স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে, স্বার্থ সংঘর্ষের বিরুদ্ধে আশু অনিষ্ট নিবারণ মাত্র কতকগুলি সমাজ নিয়ম বা নীতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই নিয়ম বা নীতি সকল প্রবর্ত্তিত হইবার পরেই আমরা স্বীকার করিব, মানুষের স্বাতন্ত্র্য কালের অবস্থা হইতে এই কালের অবস্থা অনেক অবনত হইল; যেহেতু স্বেচ্ছাচার বা স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা সুখে কখন পূর্ণ উদ্দেশ্য করিতে পারি না, কিন্তু এই অবস্থায় মানুষের স্বেচ্ছাচার বা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কতকগুলি নিয়ম সৃষ্ট হইয়া তাহার পথ অবরোধ করিল, সুতরাং সুখ এক্ষণে আর 'আমাদের পূর্ণ উদ্দেশ্য হইতে পারে না। স্বাতন্ত্র্য জীবনে সুখোদ্দেশ্য পূর্ণ ছিল, এক্ষণে সুখোদ্দেশ্য আংশিক হইল। কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার করিব, এককালে সামাজিক জীবন হইতে যে প্রভূত

সুখের উৎপত্তি হইবে এই তাহার পত্তন-ভূমি। স্বাতন্ত্র্য-জীবন একটি ক্ষুদ্র সরোবরে একটি মাত্র প্রস্ফুটিত পদ্ম ছিল, কিন্তু এই অবস্থার সামাজিক জীবন অগণ্য কুট্মলপরিবৃত বিশাল সরোবর; এই সকল কুট্মল যে এক দিন সহস্র দল বিস্তার করিয়া সমস্ত সরোবর জুড়িয়া গিয়া একীভূত হইবে, ও জগতে অতুল্য সুষমা ও সৌরভ বিস্তার করিবে আমরা সেই দিনের আশা করিতেছি। নিয়ম-দল পরিবৃত কুট্মল প্রয়োজনোৎপন্ন ফল, আমরা তাহাকে ঘৃণা করি না। মানুষ কিন্তু এই সকল নিয়মের হাত সহজে এড়াইতে পারে না; ইহার যন্ত্রণা অনুভব করিলেও এড়াইতে পারে না; ইহার অবধারিত কাল আছে, সেই কালে তবে মানুষ ইহার হাত এড়াইবে। যন্ত্রণা বোধ হইলে তবে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা উপস্থিত হয়; চিন্তা উপস্থিত হইলে সুদূরদর্শী, গভীর অনুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ দ্বারা তাহার উপায় স্থিরীকৃত হয়। উপায় স্থিরীকৃত হইলেও সাধারণ লোকে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে এবং উহা অভ্যাস করিতে যুগ যুগান্তর অপেক্ষা করে; সুতরাং মানুষ নিয়ম হাত সহজে এড়াইতে পারে না।

আর্য্যগণের এই কালের অবস্থা নীতি-সকল প্রবর্ত্তিত করিতেছে, আশু উচ্ছৃঙ্খলার উপায় স্থির করিতেছে, কিন্তু নিয়ম শৃঙ্খল তখনও গাঢ় হয় নাই, নিয়ম-জনিত কষ্টও তখনও অনুভূত হয় নাই, সুতরাং সে নিয়মের হাত এড়াইবার উপায়ও চিন্তায় তখনও প্রয়োজন হয় নাই। তখন ও "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" "তে তে সৎ পুরুষাঃ, পরার্থ ঘটকাঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য যে—"এই সকল মনসিজ নীতি দূরে রহিয়াছে। নিয়ম হইতে এড়াইয়া সমাজের একতা সম্পাদন পূর্ব্বক পূর্ণ সুখোদ্দেশ্য রক্ষার এই সকল নীতি যুগান্তর পরবর্ত্তী কালের মুনীষিগণের শিরে নিমজ্জিত রহিয়াছে। আর্য্যগণের বৈদিক কালের নীতি সকল যে তখনও সমাজে দৃঢ় স্থান পায় নাই আমরা তাহার একটি উদাহরণ দেখাইতেছি।——

"ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের অভিষুত (কণ্ডিত) সোমের নিকটে আগমন কর; এবং যেমন যুবযানি ব্যক্তি মহতের ন্যায় কার্য্য করেন, অর্থাৎ অন্য স্ত্রীর দ্বারা অপহৃত চিত্ত না হইয়া আপন যুবতীতেই অভিরমিয়া থাকেন, তদ্রূপ অন্যান্য হরি-রূপ অন্ন সমূহ দ্বারা অপহৃত না হইয়া ইহাতেই (এই সোমেতেই) অভিরমিবে।"*

এই স্তোত্রের উদাহরণে দেখা যাইতেছে, যে যদি কোন যুবতীভার্য্যাসম্পন্ন পুরুষ অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত না হইয়া আপন স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার মহতের ন্যায় কার্য্য দেখান হয়। কিন্তু ইহা দুরূহ পাপ, ঘৃণ্য, সাধারণে ইহা অবশ্য করিবে না, উহার এরূপ দৃঢ়তা জন্মায় নাই; যদি কেহ উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সেইটি গৌরবের কথা মাত্র।

আমরা অতি ক্ষুদ্র উদাহরণ সকল উদ্ধৃত করিয়া বেদের ভাব বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি, কিন্তু বেদের পূর্ণ ভাব ইহাতে কিছুতেই বুঝান যায় না; বেদের একরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বেদ সকলের কিছু কিছু অংশ পাঠ করা আবশ্যক।

আমরা বেদ হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ দ্বারা আর্য্যগণের বৈদিক কালের পূর্ব্বাবস্থায় নৈতিক জ্ঞানের আভাস দেখাইলাম। তাঁহারা এই সকল নৈতিক জ্ঞান লইয়াই ভারতভূমে প্রবেশ করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয়; যেহেতু বৈদিক স্তোত্র সকলে এই সকল নীতির রক্ষার নিমিত্তই তাঁহাদিগকে ব্যাকুল দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্তই কহিয়াছি, আর্য্যগণের বৈদিক কালের অবস্থা, তাহার পূর্ব্বাবস্থার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনার্য্য জাতিগণ তখন কেবল বর্ব্বর মাত্র, তাহাদের মধ্যে এ সকল নীতির প্রাদুর্ভাব দাঁড়ায় নাই, সুতরাং তাহাদের সংঘর্ষে তাঁহাদের এই সকল নীতি রক্ষা করা কঠিন হইয়াছিল।

আর্য্যগণ পঞ্চনদ উত্তীর্ণ হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের কিয়দংশ মাত্র তখন অধিকার করিয়াছেন, এই স্থানে তাঁহারা একরূপ স্থিত; কিন্তু এই সংস্থান সৈন্যগণের সমর ক্ষেত্রে শিবির সংস্থাপনের সংস্থিতির ন্যায়। চতুর্দ্দিকে আমমাংসভোজী ভীষণ অনার্য্য রাক্ষসগণের প্রবল আক্রমণ, তাহা হইতে আত্ম-রক্ষা, তাহার উপর আবার দারিদ্র্য দশা, স্বচ্ছন্দ আবাস নাই; কৃষি অতি সামান্য, পশুপালই একমাত্র অবলম্বন। এই ভীষণ অবস্থায় তাঁহাদিগের কার্য্য, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের নীতি, একই দিকে ধাবিত হইয়াছে। কঠোর প্রয়োজন, তাঁহাদিগের কার্য্য তাঁহাদিগের চিন্তাকে তাহারই দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। এই নিমিত্ত ঋক্ সকল আর কিছুই নয়, কেবল ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণের নিকট আত্মরক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রার্থনা মাত্র। পূর্ব্ববাস স্থলে আর্য্যগণ যে সম্পদশালী ছিলেন তাহা সম্ভাবিত নহে; উক্ত স্থলের অনুর্ব্বরত্বে বোধ হয় তাঁহাদিগের কষ্ট নিবারণ না হওয়াই উর্ব্বরক্ষেত্র ভারত ভূমে তাঁহাদিগের আগমনের কারণ। কিন্তু তথায় তাঁহাদিগের অপেক্ষাকৃত শান্তিসুখ ছিল এমন বোধ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি তাঁহাদের আর শান্তি ছিল না। তাঁহাদিগের স্তোত্র সকল হইতে দুই একটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিলে তাঁহাদের তাৎকালিক অবস্থার একরূপ আভাস পাওয়া যাইবে। শত্রু ভয়ে তাঁহারা কেমন অস্থির ও ভীত এই দুইটি স্তোত্রে তাহা বুঝা যাইবে।—

"ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত চারিদিক্ হইতে অস্ত্র সকল সৃষ্টি করিয়াছ, অতএব প্রার্থনা—শূর রাক্ষস যেন আমাদিগের নিকটে রাত্রি গুলিতে না আইসে; যদি আইসে, তবে যেন আমরা, তোমার সাহায্যে

তাহাকে নষ্ট করি।" ৪। ১৪। ১২৮॥ সামসংহিতা। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ির অনুবাদ।

"ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের রক্ষার জন্য সম্যক্ উপাস্য, সমান-শত্রু-জয়শীল, সর্ব্বদাই-শত্রুগণ-পরাভব-হেতু ও অতিবীর্য্যবান্ যে ধন তাহা আমাদিগকে আহরণ করিয়া দাও।" ৫। ১৫। ১২৯। সামসংহিতা। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ির অনুবাদ।

দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণে তাঁহারা কেমন ব্যাকুল, তাহা দুইটি স্তোত্রে উপলব্ধি হইবে।

"Will you then, Maruts, grant on to us wealth, durable, rich in men, defying all onslaughts? Wealth a hundred and a thousand-fold, always increasing?"

"হে মরুদ্গণ! তোমরা কি আমাদিগকে সর্ব্ব বিপদ্-অতিক্রমশীল, মানব-পরিপূর্ণ স্থায়ী সম্পদ্ দিবে? সর্ব্বদা পরিবর্দ্ধনশীল, শত এবং সহস্রগুণ ধন দিবে?"

(মক্ষ মূলর অনুবাদ ঋক্‌বেদ, ৯৩ পৃষ্ঠা; ১৫ স্তোত্র)

"May this praise, O Maruts, this song of Mandarya, the son of Mana, the poet approach you (asking) for offspring to our body together with food: May we find food and a Camp with running water!

(ঋক্‌বেদ; মক্ষমূলর অনুবাদ, ২০১ পৃষ্ঠা)

"হে মরুদ্গণ! মান্দার্য্যের পুত্র মান কবির এই স্তোত্র, এই গীত তোমার নিকটে উত্তীর্ণ হইয়া, আমাদিগের শরীর হইতে সন্ততি এবং খাদ্যের প্রার্থনা করিতে কি সমর্থ হইবে? আমরা কি খাদ্য, এবং জল-প্রবাহ-সংযুক্ত শিবির প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইব?"

এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনে আর্য্যগণের সমাজনীতিও তদনুরূপ হওয়ার প্রয়োজন হইল। অনার্য্যগণের সহিত ঘোর বিদ্বেষ সংস্থাপন, বলবৃদ্ধির নিমিত্ত অপত্যোৎপাদন, এবং দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতিই তাঁহাদের এই সময়ে অপরিহার্য্য প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং যে কোন উপায় দ্বারা এই সকল আয়ত্ত হয় তাহাই সমাজ-নীতি, তাহাই সাধারণ-গ্রাহ্য, তাহাই প্রশংসনীয় হইল।

বৈদিক কালের এতদনুরূপ সমাজ-নীতি সমাজে একরূপ প্রচলিত হইলে, তৎপরে মহর্ষি মনু তাহাদিগকে সঙ্কলন করিলেন। মনুসংহিতার সূত্র সকল হইতে আমরা এই বিষয়ের নিদর্শন দেখাইব।

"প্রণয় ও শ্রীকৃষ্ণ" শিরস্ক দিয়া আমরা আর্য্যজাতির সমাজোন্নতি লইয়া দীর্ঘ ভূমিকা করিতেছি দেখিয়া হয়ত কেহ কেহ আমাদিগের উপর অনাস্থা করিতে পারেন; কিন্তু প্রণয় ও শ্রীকৃষ্ণে আমাদিগের কেবল ব্রজলীলা বর্ণনা করা

উদ্দেশ্য নয়; মানুষের সামাজিক জীবনে পূর্ণ-সুখ উপভোগ বা আয়ত্ত করিতে হইলে প্রণয়ই তাহার প্রধান সহায় বা উপায়, আর্য্যগণের সামাজিক নীতি-জ্ঞানোন্নতির পর্য্যায়ে এই জ্ঞান উদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে আসিয়া তাহার কতদূর পরিস্ফুটতা দেখাইয়াছে, এবং সমাজেই বা তাহা কতদূর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য; সুতরাং আর্য্যগণের সমাজনীতিই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য।

(ক্রমশঃ)।

শ্রী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ব্যবহার-বিজ্ঞান।

অর্থাৎ

পুরাকালের রাজকার্য্যের প্রণালী।

পৃথিবী যখন নবতরা,—ভারত ভূমি যখন মায়া-দম্ভ-বিবর্জ্জিত সরল-স্বভাব সন্তানগণে শোভমানা,—আহার্য্য-শোভা-বিরহিত অব্যাজ-সভ্যতায় অধিরোহণ করিতেছিলেন, একবার তখনকার বিধান-[illegible] কীদৃশ, অনুসন্ধান করা যাউক।

ভারতভূমি যখন এক্ষণকার মত প্রাণি-সঙ্কুলে ব্যাপ্তা ছিলেন না,—ভারাক্রান্তা ছিলেন না,—দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ সারবান্ দেহ ধারী জীবনিবহের সেবনীয়া ছিলেন,—এখনকার ন্যায় ব্যাধিত-ক্ষুধিত-তৃষিত-জীবিকার্থ-প্রধাবিত উদ্ভ্রান্ত সন্তানগণে পরিপূর্ণা হন নাই, তখনকার রাজাদিগের বিচার নিষ্পত্তি কিরূপ, অনুসন্ধান করা যাউক।

ভারতমাতা যখন অত্যল্প সন্তান প্রসব করিয়াও তাহাদের সারবান্ দেহ এবং দীর্ঘজীবন হেতু সমধিক সন্তানবতী অপেক্ষাও সুখিনী ছিলেন, সেই সকল সন্তানেরা কেহ ধীর, কেহ বীর, কেহ জ্ঞানী, কেহ ধ্যানবন্ত, কেহ যোগী, কেহ মুনি, কেহ ঋষি ছিলেন,—কেহ ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে, কেহ যোগ-সামর্থ্যে, কেহ অন্যবিধ উপায়ে শৈলশিখরে, নির্ঝরিণী-তীরে, বিজন অরণ্যে, গিরি-গহ্বরে উপবিষ্ট হইয়া মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধি, আপনাদের সমুন্নতি, দেশের যশোবৃদ্ধি এবং অন্যের উপকার সাধনের উদ্দেশে সর্ব্বদাই নিমগ্ন থাকিতেন, তখনকার বিধানচিন্তকেরা কিরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন, বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমরা অদ্য প্রভৃতি সেই পৌর্ব্বকালিক রাজ-বিচারের চিত্র প্রদর্শনের নিমিত্ত সঙ্কল্প ধারণ করিলাম। প্রস্তাবরবদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

যে যে বিষয় প্রস্তাবের উপাদান হইবে তাহা অগ্রেই প্রকাশ করিতেছি। যথা—

বিচার স্থান	১
সভাসদ	২
ব্যবহার	৩
বিচারপতি	৪
বিচার নিষ্পত্তির রীতি পদ্ধতি	৫
সাক্ষী ও লেখ্যাদি প্রমাণ	৬
বাদী ও প্রতিবাদী	৭
বাদে নিযুক্ত অর্থাৎ উকীল	৮
তাহাদের কার্য্য	৯
বাদী প্রতিবাদীর প্রশ্ন ও উত্তর গ্রহণ প্রকার	১০
বিবাদ নিষ্পত্তি ও দণ্ডাদির নিয়ম	১১
ঋণ-ঘটিত বিবাদ	১২
নিক্ষেপ অর্থাৎ আমানৎঘটিত	১৩
ক্রয়-বিক্রয়-ঘটিত	১৪
বাণিজ্য	১৫
দানকর্ম্ম	১৬
বেতন-ঘটিত	১৭
কূটকরণ	১৮
প্রতিজ্ঞা বা স্বীকারের অন্যথাকরণ	১৯
স্বামি-ভৃত্য-ঘটিত	২০
সীমা-ঘটিত	২১
রাজস্ব-সংক্রান্ত	২২
বাক্‌পারুষ্য	২৩
দণ্ডপারুষ্য	২৪
সাধারণ পরুষ ব্যবহার	২৫
চৌর্য্যঘটিত	২৬
স্ত্রী-হরণ	২৭
দাম্পত্য-নিয়ম-সংক্রান্ত	২৮
দূত অর্থাৎ ক্রীড়া ঘটিত	২৯
আহ্বান-ঘটিত	৩০
সঙ্কীর্ণ	৩১

১। **বিচার স্থান**— এই সকলের মধ্যে প্রথম বক্তব্য বিচার-স্থান। অতীত কালের হিন্দু রাজারা কিরূপ স্থানে বিচার করিতেন, প্রথমতঃ তাহারই নির্দ্দেশ করা যাউক।

রাজাদিগের সাধারণ বিচার স্থানের নাম সভা। পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে অধিপতিদিগকে ভ্রমণ করিতে হইত, এ নিমিত্ত বিচার স্থানের সামান্য বিশেষ ঘটনা হওয়াতে যখন যে স্থানে সভ্যেরা উপস্থিত হইতেন, তখন সেই সেই স্থানই সভা বলিয়া পরিচিত হইত। যথা,—

"যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রাবেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞঃ প্রতিকৃতো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণাস্তাং সভাং বিদুঃ॥"

"নির্দ্দিষ্ট মণ্ডপাদৌ তু বিশেষো বর্ত্ততে"
ইতি বাচস্পতিঃ।

ভিন্ন ভিন্ন বিচারের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তাহা তৃণকাষ্ঠ, কাষ্ঠেষ্টক, ও প্রস্তরেষ্টক বিনির্ম্মিত ছিল। নির্ম্মিত নির্দ্দিষ্ট বিচার স্থানের নাম সভামণ্ডপ, সদোগৃহ, অধিকরণ মণ্ডপ, অধিকরণ গৃহ ইত্যাদি।

মনে করিবেন না যে অধিকরণ মণ্ডপ কেবল রাজধানীতেই স্থাপিত থাকিত, অন্যত্র থাকিত না। রাজধানীর নিকটস্থ স্থানেই রাজার দৃষ্টি, বিচারের প্রচার, নিয়মের শৃঙ্খলা ছিল, দূরে ছিল না। হিন্দু

দিগের ব্যবহার শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, অতি সুদূরস্থ গ্রামগুলীও রাজ-নিয়মে শাসিত হইত। দূরস্থ প্রজার শাসন-নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল। যথা,—

"গ্রামাধ্যক্ষঃ কুটুম্বিকেভ্যঃ করমাদায় দশ-গ্রামিণে প্রযচ্ছতি। এবং দশগ্রামিণোপি বিংশতীশায়। সোঽপি শতগ্রামিণে। সচ সহস্রাধিপতয়ে। সোপি নগরাধিপতয়ে। সচ বিষয়াধ্যক্ষায়। বিষয়াধ্যক্ষস্তু রাজ্ঞে নিবেদয়ত্যেবং পারম্পরিকো ব্যবহারঃ।"[১]

(নীতিচিন্তামণি)।

শাসন কার্য্যের ও কর গ্রহণের সুবিধার নিমিত্ত এইরূপ বিভাগ ছিল। প্রত্যেক গ্রামে এক একটি সামান্য অধিকরণ স্থান থাকিত। তাহার অধ্যক্ষ তদনুরূপ ব্যক্তি। তিনি সেই গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই পদের নাম মণ্ডল।

দশখানি গ্রাম ও মণ্ডলেশ্বরের উপর অপর এক অধিকরণ। তাহার অধিপতি তদুপযুক্ত ব্যক্তি। ইঁহার নাম দশগ্রামী। ইনি মণ্ডলগণের কর্ত্তা। মণ্ডলগণের কিছু জানাইতে হইলে অথবা মণ্ডলগণের নামে অভিযোগ করিতে হইলে, ঐ দশাধীশ ব্যক্তির নিকটই উপস্থিত হইতে হইত।

এই দশাধীশের উপর বিংশতীশ। বিংশতীশের উপর শতাধ্যক্ষ, শতাধ্যক্ষের উপর সহস্রাধ্যক্ষ, ইহার উপর নগরাধ্যক্ষ অর্থাৎ রাজধানী স্থিত অধিকরণ। ইহার উপর রাজা স্বয়ং।

এইরূপে, মফঃস্বলের মণ্ডল হইতে নগরাধ্যক্ষ পর্য্যন্তের শাসন কর্ত্তা রাজা। এইরূপ শাসন-পদ্ধতির সহিত আধুনিক শাসন-পদ্ধতির বড় প্রভেদ নাই। কেন না, আউট্ পোষ্ট, ষ্টেসন, বা থানা, মহকমা, জেলা, হাইকোর্ট, প্রভৃতি উপর্য্যুপরি অধিকরণ সত্তা দৃষ্ট হইতেছে।

২। সভাসদ—একব্যক্তির উপর বিচার কার্য্যের নির্ভর থাকিলে ভ্রম-প্রমাদাদি বহুবিধ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা; এই ভাবিয়া পৌর্ব্বকালিক বিধান শাস্ত্র-বেত্তারা সভাসদ্ নিযুক্ত করিবার বিধি দিতেন। রাজারাও সেই বিধি অনুসারে সভাসদ্ নিযুক্ত করিতেন। সভাসদেরা নিপুণ হইয়া বিচারপতির বিচার পরিদর্শন করিতেন। প্রাড্বিবাক অথবা রাজা স্বয়ং সম্পূর্ণ বিধানজ্ঞ হইলেও সভ্যদিগের মতামত শ্রবণ করিতেন। সভ্য বা উপপ্রণিধি, বাদী প্রতিবাদীর উত্তর প্রত্যুত্তর ও প্রমাণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া নিষ্কর্ষ অংশ বিচারপতির গোচর করিতেন। প্রাড্বিবাক তত্তাবৎ পর্য্যালোচনা করিয়া জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করিতেন। জয় পরাজয়ের নির্দ্ধারণ করা বা তাহা বাদী অথবা প্রতিবাদীর নিকট প্রকাশ করার অধিকার সভ্যদিগের ছিল না, তাহা কেবল বিচারকেরই ছিল। সভ্যদিগের তাদৃশ অধিকার না থাকিলেও তাহা তাঁহাদিগের বিচার-পতিকে বলিতে হইত। যথা,—

"সভ্যেনাবশ্যবক্তব্যং ধর্ম্মার্থং সহিতং বচঃ।
শৃণোতি যদি নো রাজা স্যাত্তু সভ্যস্তদাহনৃণঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

অর্থ এই যে, সভ্যকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটিত বাক্যের নিষ্কর্ষ অংশ অবশ্য বলিতে হইবে। বিচার পতি তাহা না শুনেন, সভ্যেরা অঋণী হইবেন।

পূর্ব্বকালে এইরূপ সভাসদ বা অমাত্য যে সে ব্যক্তি হইতে পারিত না।

"শ্রুত্যধ্যয়ন-সম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। রাজ্ঞঃ সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রেচ যে সমাঃ॥" (কাত্যায়নঃ)।

যাঁহারা বিধানশাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শী, সৎকুল-জাত, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র ও পক্ষপাত-বুদ্ধি-পরিবর্জ্জিত, এমন সকল ব্যক্তিরাই পূর্ব্বকালে বিচার-পতির বিচার দর্শনের সভাসদ হইতেন। বিচার নিষ্পন্ন অর্থাৎ জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ হইলে তাহা লিখিত হইয়া প্রচার হইত কি না বলা যায় না; বোধ হয় পূর্ব্বকালে তাহা মৌখিক প্রকাশ করাই প্রথা ছিল। ইহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে।

৩। ব্যবহার—যেরূপ পদার্থ লক্ষ্য করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রে 'ব্যবহার' শব্দ ব্যবহৃত হয়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় তাহা এক্ষণে 'মোকদ্দামা নামে ব্যবহৃত হইতেছে। যথা,—

"বিনানার্থেহব-সন্দেহে হরণং হার উচ্যতে।
নানা সন্দেহহরণাৎ ব্যবহার ইতিস্থিতিঃ॥" (কাত্যায়নঃ)

"নানা-বিবাদ-বিষয়ক-সংশয়োহপহ্রীয়তে অনেন—"
(ইতি ব্যবহার-মাতৃকা)

মর্ম্মার্থ এই যে, প্রজাদিগের বিবাদ ঘটনা হইলে যে ব্যাপারের দ্বারা তদগত সংশয়াদি নিরাকরণ পূর্ব্বক দোষাদোষ বা জয় পরাজয় নির্ণীত হয়, সেই সমস্ত ব্যাপারের নাম ব্যবহার।

৪। বিচারপতি বা প্রাড়্বিবাক—বিচার করা প্রধানতঃ রাজারই কর্ত্তব্য। পরন্তু একমাত্র রাজার দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই; এ জন্য বিধান শাস্ত্র কর্ত্তারা তৎকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রতিনিধির বিধান করিয়াছেন। তাদৃশ বিচারকের নাম প্রাড়্বিবাক। যথা,—

"রাজা কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ
প্রাড়্বিবাকোহথবা দ্বিজঃ॥"
(বৃহস্পতিঃ)

রাজা স্বয়ং ব্যবহার দর্শন করিবেন অথবা প্রাড়্বিবাক নিযুক্ত করিবেন।

পূর্ব্বকালে এই পদ যে সে ব্যক্তি পাইত না। প্রায় ব্রাহ্মণেরাই এই পদ গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের অভাবে বৈশ্যেরা ঐ পদ পাইতেন। তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য; ব্রাহ্মণেরাই ব্যবস্থাকারক; রাজারাও ব্রাহ্মণদিগের অনুগত; পরন্তু শূদ্রেরা ইহাঁদের দাস ছিলেন। বোধ হয় শূদ্রজাতির প্রতি ব্রাহ্মণদিগের কোন প্রকার বিদ্বেষের কারণ ঘটনা হইয়াছিল। কারণ শূদ্রদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ

কঠিন শাসন দৃষ্ট হয়, তাহাতে বিদ্বেষ ব্যতীত অন্য কিছুই অনুমিত হয় না। কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগকে নীচ মনে করিয়া ঘৃণা করিতেন, কেন না, তৎকালের শূদ্রেরা অত্যন্তনীচ ও অজ্ঞ ছিল। তৎকালের শূদ্রেরা তথা-বিধ অবস্থাপন্ন হইলেও তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের যে রূপ পরুষ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তাহাতে শত্রুতা না থাকিলে কদাচ তাদৃশ ভাব উদ্ভব হইতে পারে না। বিবেচনা করুন, এক্ষণে যে ব্যক্তি আমাদের অপেক্ষা নীচ ও অজ্ঞ; তাহাদের প্রতি আমাদের ত তাদৃশ পরুষ ব্যবহারের ইচ্ছা উদিত হয় না! তাহাদিগকে আমরা নীচ মনে করিয়া স্পর্শ না করি, একত্র শয়ন ভোজন উপবেশন না করি, কিন্তু জিহ্বাচ্ছেদ করিতে বলিনা; বরং তাহাদিগের প্রতি দয়া ভাব উদ্রিক্ত করিয়া কি কারণে জগদীশ্বর তাহাদিগকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন করিয়াছেন, তাহারই চিন্তা করি। অতএব, শূদ্রদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের কোন নিগূঢ় বৈর-কারণ ছিল সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়দিগের সহিত পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণদের এক একবার সুমহৎ বৈরভাব উপস্থিত হইয়া এক সুদীর্ঘকাল অতীত করিয়া ছিল, ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু শূদ্রদিগের সহিত সেরূপ বৈরভাব ঘটনার কিছুমাত্র আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যৌবন কাল পর্য্যালোচনা করিলে একটু অঙ্কুর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। সম্প্রতি ক্ষত্রিয়দি-গের সহিত যে ব্রাহ্মণদিগের কিছুকাল ব্যা-পিয়া শত্রুভাব চলিয়াছিল, তাহা আমরা এই উপলক্ষ্যে প্রকাশ করিব।

ব্রাহ্মণদিগের অযথা আধিপত্য এবং ক্ষত্রিয়দিগের উৎকট বল বীর্য্যের মাদ-কতা প্রবৃদ্ধ হইয়া তদুভয় যখন যখন সম্মিলিত হইয়াছে, তখন তখনই এক এক সর্ব্বান্তকর তুমুল বিরোধ ঘটনা হই-য়াছে। ভৃগুনন্দন পরশুরাম পৃথিবীকে এক বিংশতিবার ক্ষত্র-শূন্যা করেন ইহা প্রথিত আছে। মুনিপ্রবর পরাশর ও একবার সর্ব্ব-ক্ষত্র বিনাশে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতৃলোকের অনুরোধে তাহা করেন নাই। এইরূপ ক্ষত্রিয়েরাও একবার পৃথিবীকে ব্রাহ্মণ-শূন্যা করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরাই বিস্তীর্ণ-গোষ্ঠী সম্পন্ন এবং মান্য গণ্য ছিলেন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজগণ ইহঁাদের যজমান ছিলেন, সেই কারণে ইহঁারা অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ধনশালীও ছিলেন। কোন এক সময়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয়-দিগের কোন এক আদি পুরুষ (কৃতবীর্য্য) তাৎকালিক সমস্ত ক্ষত্রকে নিঃস্ব করিয়া ধনাহরণ করত তাহা যজ্ঞ কার্য্যে ব্যয়িত করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্ষত্রিয়েরা নিঃস্ব, আর ব্রাহ্মণেরা ধনশালী হন। কৃতবীর্য্যের পরলোক লাভ হইলে পর তাঁহার জ্ঞাতি-দিগের ধনের অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহারা ভৃগুবংশীয় পুরোহিতদিগের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধন যাচ্ঞা করিলেন।

ঠাকুর মহাশয়েরা চিরকালই সমান দাতা!!—ক্ষত্রিয়েরা বার বার প্রার্থনা করিলেও তাঁহারা কিছুমাত্র দিলেন না; প্রত্যুত 'নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহারা মনে মনে জানিতেন যে আমরা ক্ষত্রিয়দিগকে আঁটিতে পারিব না, সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয়দেব ভয়ে সমস্ত ধন মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন, কেহ বা জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে বিতরণ করিলেন। তথাপি ধন-শূন্য আপদ্দশাগ্রস্ত যজমানদিগকে দিলেন না। পরন্তু ক্ষত্রিয়েরা তাঁহাদের 'নাই' বলাতে বিশ্বাস নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদের গৃহ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—অবশেষে মৃত্তিকার মধ্য হইতে সেই সমস্ত প্রোথিত ধন নিষ্কাসিত করিলেম এবং ব্রাহ্মণদিগের তাদৃশ কার্য্যে তাঁহারা অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধ-পরায়ণ ক্ষত্রিয়েরা তখন ব্রাহ্মণ-বংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল।

"নিজঘ্নুঃ পরমেষ্বাসাঃ সর্ব্বাংস্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আগর্ভাদব কৃন্বন্তশ্চেরুঃ সর্ব্বাং বসুন্ধরাম্॥
ততউচ্ছিদ্যমানেষু ভৃগুষ্বেবং ভয়াত্তদা।
ভৃগুপত্ন্যো গিরিং দুর্গং হিমবন্তং প্রপেদিরে॥
তাসামন্যতমা গর্ভং ভয়াদ্দধ্রে মহৌজসম্।
উরুণৈকেন বামোরুর্ভর্ত্তুঃ কুলবিবৃদ্ধয়ে॥"

[মহাভারত]

তাঁহারা এক বাক্যে ব্রাহ্মণ বধের প্রতিজ্ঞা করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা, এমন কি গর্ভ পর্য্যন্ত বিনাশ করতঃ সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ভৃগু বংশের ঘোরতর ধ্বংস উপস্থিত দেখিয়া ভয়ার্ত্ত ভৃগু-পত্নীরা গিরি দুর্গ ও নিবিড় অরণ্য লক্ষ্য করিয়া পলায়ন আরম্ভ করিলেন। সেই সকল ঋষি-পত্নীদিগের মধ্যে এক জন গর্ভবতী ছিলেন, তিনিই কেবল যত্ন পূর্ব্বক ভর্ত্তৃ-বংশ রক্ষার নিমিত্ত উরু দ্বারা গর্ভ রক্ষা করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা অনুসন্ধান করিয়া সেই গর্ভ বিনাশ করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু তাহা পারেন নাই। সেই গর্ভ-প্রসূত সন্তান পরিশেষে 'ঔর্ব্ব' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; এবং তিনি মাত্র ভৃগুবংশের বংশধর হইয়া প্রসূত হইয়াছিলেন। এই যেমন অশীতি সহস্র ভার্গব ব্রাহ্মণের বিনাশ ঘটনা হইয়াছিল, এই রূপ মধ্যে মধ্যে প্রায় হইত। রামায়ণ মহাভারতাদি পর্য্যালোচনা করিলে এই রূপ ঘটনার সংবাদ অনেক পাওয়া যায়। পরন্তু শূদ্রেরা কি জন্য যে ব্রাহ্মণদিগের অত পদানত, তাহার অবশ্য কিছু নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

কার্য্যের সোপান।

সরোবরে পদ্মিনী ভাসিতেছে অগ্রে দেখিলাম। দেখিবা মাত্র লালসা জন্মিল পদ্মিনীকে তুলিয়া আনি। লালসার পর সন্তরণ দিয়া পদ্মিনীকে তুলিয়া আনিলাম। এখানে দেখা যাইতেছে অগ্রে দর্শনশক্তি দ্বারা মনে জ্ঞানের উদয় হইল, জ্ঞানের পর লালসা, এবং লালসার পর কার্য্য। এইটি কার্য্যের স্বাভাবিক নিয়ম। কার্য্যের পূর্ব্বে আকাঙ্ক্ষা, এবং আকাঙ্ক্ষার পূর্ব্বে জ্ঞান। জ্ঞান ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা নাই, আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কার্য্য নাই। একেবারে কার্য্যের কেহ প্রত্যাশা করে না। কোন কার্য্যের প্রত্যাশা করিতে হইলে অগ্রে তাহার আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করা আবশ্যক, এবং আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিতে হইলে, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ক জ্ঞানোৎপাদন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এরূপ না করিয়া যিনি অগ্রেই কার্য্য চান তিনি নিশ্চয় নির্ব্বোধ ও নিতান্ত অধীর।

অনেকে নির্জ্জীব বাঙ্গালীজাতিকে একেবারে কার্য্যশীল দেখিতে চান। যে জাতি যুগযুগান্তর ধরিয়া নিস্পন্দ, অচেতন, মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, সে জাতি কি সহসা সঞ্জীবিত হইয়া বীর কার্য্যক্ষেত্রে একদিনে মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে? কিন্তু অনেকে এমনি অধীর যেন তাঁহাদিগের ইচ্ছা আজিই বাঙ্গালী জাতি কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া মহতী কার্য-পরম্পরা দ্বারা পৃথিবীকে যশোগৌরবে পূর্ণ করুক। এরূপ ইচ্ছা কি কখন ফলবতী হয়? এবং ফলবতী হইল না বলিয়া যাঁহারা আবার ভগ্নোদ্যম ও নিরাশ হন, তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিব খুঁজিয়া পাই না। তাঁহারা যদি একেবার মানবপ্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, এবং মনুষ্য-সমাজের ক্রমোন্নতির তত্ত্ব ও কারণ ভাবিয়া দেখেন, অবশ্য বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদিগের নৈরাশ্য অকারণ এবং অধীরতা বাতুলতা মাত্র।

দশাধিক বৎসর গত হইল, কোথায় কিছু নাই একদা বিধবাবিবাহের রীতি প্রচলিত করিবার উদ্যোগ হইল। বঙ্গ সমাজ তখন বিধবা-বিবাহের নাম শুনিবা মাত্র একেবারে স্তম্ভীভূত। কে যেন তাহাদিগের জাতি মারিতে আসিতেছে, তাহারা যেন এই ভয়ে জড় সড়। সাধারণ জনগণ মূর্খতায় সমাচ্ছন্ন। চিরকাল তাহারা যে অভ্যস্ত পথে চলিয়া আসিতেছে তাহারা সেই পথেই চলিতে জানে। চিরকাল যে পবিত্রতা ও পাপপুণ্যের ভাব তাহাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়া আছে, তদ্ব্যতীত অন্যভাব সহসা তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? তাহারা কখন

কোন নূতন ভাবের সঙ্গতাসঙ্গততা বিবেচনা করিয়া দেখে নাই; বিবেচনা করিয়া কখন কোন নূতন কার্য্যে অগ্রসর হয় নাই; সামাজিক শাসন, ও পারিবারিক শাসন, কখন লঙ্ঘন করে নাই। জীবন, নদীর ন্যায় এক স্রোতেই চিরন্তন প্রথার প্রণালী দিয়া বহিয়াছে। কখন সে প্রণালী উল্লঙ্ঘন করিতে সাহস হয় নাই। রাজনৈতিক দাসত্ব, সামাজিক দাসত্ব ও পারিবারিক দাসত্বে তাহাদিগের জীবন ঘোর অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই অধীনতায় তাহাদিগকে নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, নিঃসাহস ও জড়প্রায় করিয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতা কি, এবং স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য্য করায় কত সুখ, তাহা তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। কখন চিরন্তন প্রথার বিন্দু বিসর্গ অতিক্রম করিয়া, স্বাধীন পথে দাঁড়ায় নাই। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বনের ভাব তাহাদিগের মনেও কখন উদয় হয় নাই। দিবা-স্বাপী বাঙ্গালি দিনে নিদ্রা যায়; যে অল্পক্ষণ জাগরিত থাকে, আহার বিহার, পরের নিন্দা, গ্রামের গোল যোগ, সামান্য সম্ভাষণ, চাষ বাসের কথা, মকর্দ্দমার কথা, প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকিয়া দিন কাটায়। যাহা নিত্য করে, যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চিন্তা ও জ্ঞানের পরিসীমা। এই সীমার অতীত তাঁহাদিগের পক্ষে আর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চিন্তা, ও জ্ঞান নাই। অন্য কথা তাহারা বুঝে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না, বুঝিবার সামর্থ্যও নাই। যে দুই এক জন খৃষ্টান হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মের জন্য নহে, বাড়ীতে ঝগড়ার জন্য, বালসুলভ চঞ্চলতার জন্য, অথবা অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন জন্য।

এই নিদ্রাতুর জড়প্রায় জাতির নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্র ধরিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতেন না যে শাস্ত্রানুযায়ী আমাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রচলিত হয় না। শাস্ত্র আমাদিগের ধর্ম্ম নহে, চিরন্তন প্রথা আমাদিগের ধর্ম্ম। চিরন্তন প্রথার বশবর্ত্তিতাই আমাদিগের নিষ্ঠা, যাগ যজ্ঞ ও তপস্যা। হাজার শাস্ত্র দেখাইলেও বাঙ্গালী এ প্রথার বহির্দ্দেশে তিলার্দ্ধও বিচরণ করিতে পারে না। চির-অভ্যাসের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া আজিও বাঙ্গালীর কার্য্য নহে।

এই দেখুন এই নিশ্চেষ্ট বাঙ্গালীজাতির বিষয় একজন সুলেখক কি বলিয়াছেন। "গঙ্গার শত মুখের তীর-বাসী খর্ব্বকায় বঙ্গদিগের মানস স্বদেশের ভূমির ন্যায় হিমার্দ্র ও নিস্তেজ। তাহাদিগের আন্তরিক তেজের স্ফুলিঙ্গ, দেশের সজলতা দ্বারা নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া থাকে। এই তেজের ইন্ধন নাই, ইহার উদ্দীপন কিছুতেই হয় না। যত পদাঘাত কর, যত ঘর্ষণ কর, ইহার উষ্ণতা কখন অনুভূত হয় না।" এজাতির নিকট শাস্ত্রই কি, ধর্ম্মই কি, আর অধর্ম্মই কি? অগ্রে জিজ্ঞাস্য, সেই শাস্ত্র ও ধর্ম্মাধর্ম্ম দেশের

রীত্যনুযায়ী কি না? তাহা যদি না হয়, তাহা অবলম্বনীয় নহে, তদ্বিপরীত প্রথায় কেন মহাপাতক থাকুক না, কিন্তু যখন তাহা দেশে প্রচলিত আছে, তাহা সহস্রবার অবলম্বনীয় ও পরিসেব্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি নিশ্চেষ্ঠ, জড়প্রায়, চির-অভ্যাস-প্রিয়, অজ্ঞ বঙ্গজাতির নিকট শাস্ত্র ধরিলেন। যত টুলো পণ্ডিত, গ্রামের বর্দ্ধিষ্ট ও মণ্ডলগণ হাসিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল এ আবার কি? বিধবার আবার বিবাহ কি? একথা তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপহাসাস্পদ হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যৎপরোনাস্তি যত্ন স্বীকার ও বহুল অর্থব্যয় করিয়া দুই দশজন নব্য সাম্প্রদায়িকের ঘরে বিধবা বিবাহ দিলেন। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত; আর বিধবার বিবাহ শব্দ বৎসরেও একবার শুনা যায় না। বিদ্যাসাগব মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া নিরস্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সুমহৎ সামাজিক সংস্কার নিষ্ফল হইল কেন, যাঁহারা ইহার নিগূঢ় কারণানুসন্ধান করিতে যাইবেন, তাঁহারা স্থির বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গালীজাতি এই সংস্কারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। যে বাঙ্গালী জাতি সামাজিক স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্রের সাগরে কখন বিচরণ করিতে জানে নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই বাঙ্গালীজাতিকে একেবারে এক দিনে এই সাগরের মধ্যস্থলে আনিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতি এ সাগরে কখন সন্তরণ দেয় নাই, সন্তরণ জানিত না, সুতরাং অধিকাংশ লোকেই তীরবর্ত্তী হইতে চাহে নাই; যাঁহারা বুক বাঁধিয়া তীরে আসিয়াছিলেন, সাগরের মহা বিভীষিকা দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন। আর শীঘ্র এ তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। অগ্রে তাঁহারা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে সন্তরণ শিখুন, অগ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার ক্ষেত্রে স্বাধীন, চিন্তাশীল, ও কার্য্যশীল হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করুন, তবে বৃহৎ ব্যাপারে ও বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন। যে শিশুর পদে উঠিবার বল হয় নাই, সে শিশু কি দৌড়িতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ শিশুকে দৌড়িতে বলিয়াছিলেন। সে শিশু দৌড়িতে পারিবে কেন? সুতরাং বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইল না।

প্রকাশ্য সামাজিক কার্য্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির কতদূর কার্য্য করিবার শক্তি জন্মিয়াছে তাহা বিধবা বিবাহের উদ্যোগে বিশিষ্ট-রূপে প্রতীত হইয়াছে। তবু আমাদিগের সামাজিক কোন শাসনকর্ত্তা নাই। সমাজ যাহা বুঝিয়া ঠিক করিতে পারে, তাহা অনায়াসে কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসী হইতে পারে; তাহার প্রতিবন্ধক কেহ নাই। তথাপি বঙ্গবাসিগণ স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে সাহসী হয় না কেন?

সামাজিক স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার

পূর্ব্বে বঙ্গবাসিগণের মনে স্বাধীনতার ভাব উদিত হওয়া আবশ্যক। আজিও স্বাধীনতার জ্ঞান বঙ্গবাসীর মনে কিছুই উদ্রিক্ত হয় নাই। স্বাধীনতা কি অমূল্য নিধি যত দিন না সাধারণ জনগণ সকলেই বুঝিতে পারিবে, যত দিন না তাহাদিগের হৃদয়ে স্বাধীনতা-প্রিয়তা স্বতঃই উদ্রিক্ত হইবে, ততদিন বঙ্গসমাজ নিশ্চেষ্ট অসাড় ও নির্জ্জীব থাকিবে। সমাজ-সংস্কারের পক্ষে যে সমস্ত মহৎ ভাবের প্রচারের আবশ্যক, আজিও সে সমস্ত ভাব সর্ব্বসাধারণে অবগত নহে। বঙ্গসমাজ আজি পর্য্যন্ত কেবল আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতেছে। কয় জন স্বাধীনতা, স্বদেশ-প্রিয়তা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাবলম্বন প্রভৃতি উচ্চ ভাবাদির আলোচনা করিয়া থাকেন? আজিও অনেকের জ্ঞান নাই, কিসে স্বদেশের অবমাননা হয়, কিসেই বা তাহার গৌরব বৃদ্ধি হয়। বঙ্গজাতি কেন, ভারতবর্ষীয় সমস্ত সাধারণ জনগণ আজিও নিতান্ত লজ্জাকর কার্য্য সমূহে ব্রতী হইয়া সমস্ত সভ্য সমাজের উপহাসাস্পদ হইয়া রহিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বদেশীয়গণ দ্বারাই দেশের যত অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে এবং আজিও সাধিত হইতেছে, তত অপর জাতীয়গণ দ্বারা সাধিত হয় নাই, হইতেও পারে না। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, যে এই সমস্ত সাধারণ জনগণের মনে, তাহারা যে কি করিতেছে, আজিও এমত বিবেচনা ও জ্ঞানের উদয় হয় নাই। কোন্ কার্য্যে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, কিসেই বা তাহাতে কলঙ্কপাত হয়, তদ্বিষয়ে আজিও সাধারণ্যে কিছুই সংস্কার নাই। সাধারণ্যে এই সমস্ত ভাব প্রচারিত হইতে বহুকাল যাইবে। কিন্তু এই সমস্ত ভাব প্রচারের জন্য কয় জন ব্রতী হইয়াছেন? শিক্ষিত জনগণের মধ্যে যাহারা উচ্চ ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয় জন সেই সমস্ত উচ্চ ভাব, ও উচ্চ অভিলাষ স্বদেশ মধ্যে প্রচার করিয়া থাকেন? গণনা করিলে অঙ্গুলী মাত্রেই তাঁহারা গণনীয় হইতে পারেন। যত দিন না সর্ব্ব সাধারণে উচ্চভাব সকল সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ততদিন তাহাদিগের নিকট হইতে সৎকার্য্যের প্রত্যাশা করা অবিবেচনার ফল। গ্রামে গ্রামে গিয়া দেখ, সাধারণ সমস্ত জনগণই ঘোর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। কোন সাধু ভাব, কোন উচ্চ চিন্তা তাহাদিগের মনে স্থান পায় নাই। শত সহস্র জনগণের মধ্যে এক জনও উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। ভদ্র লোকের মধ্যে অর্দ্ধ শিক্ষিতের দল অনেক। নীচ লোকের মধ্যে শিক্ষার সংস্পর্শ নাই। সুতরাং সাধারণ জন সচরাচর সামান্য কথা বার্ত্তায় দিন যাপন করিতেছে। সেই কথা বার্ত্তার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ তন্মধ্যে উচ্চ ভাব কিছুই নাই; বরং সমস্তই নীচ ভাবের পরিচায়ক। সেই সমস্ত কথা বার্ত্তায় বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়, আজিও

আমাদিগের সাধারণ জনগণ মধ্যে নীচ ভাব সকল কত প্রবল। কাহাকে নীচতা বলে এবং কিসে নীচতা হয়, আজিও অনেকের এমত জ্ঞান নাই। সকলেই স্বার্থ-পরতার ও আত্ম চেষ্টায় ফিরিতেছেন। এই স্বার্থপরতার উদ্দেশে অনেকে সমাজের বিশিষ্ট অনিষ্ট সাধনও করিতেছেন। তাহারা হয়তো আত্মসুখ ও আত্মোন্নতির সহিত সামাজিক সুখ ও সামাজিক উন্নতির প্রভেদ জানেন না। সমাজ-সম্বন্ধে কোন কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করা তাঁহাদিগের ক্ষমতাতীত। সামাজিক ভাব আজিও তাঁহাদিগের মনে কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় নাই। তাঁহারা সকল বিষয় আত্ম-সম্বন্ধে ও বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধেই বিচার করিয়া পরিসমাপ্ত করেন। ভবিষ্য বিবেচনা ও সামাজিক ভাবে তাঁহাদিগের মন বিস্তৃত হয় না।

অধীনতায় আমাদিগের মন এত নীচ হইয়া গিয়াছে যে আর আমরা অধীনতায় কোন লজ্জা বোধ করি না। পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে আমাদিগের কিছুই লজ্জা বোধ নাই। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি কিছু সম্পন্ন হইয়া উঠেন, আমি অমনি নিশ্চেষ্ট হইয়া আস্তে আস্তে তাঁহার অধীন হইয়া রহিলাম। আমার সন্তানাদি সমগ্র পরিবার তাঁহার গলগ্রহ হইল। তাঁহার লাঞ্ছনা অকাতরে সহ্য করি। তাঁহার কোন বিষয়ে ক্রটি হইলে নিন্দা করিয়া বেড়াই। তিনি আমার নিকট যেন ঋণগ্রস্থ হইয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যসাধনে ক্রটি আমার অসহ্য হয়। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের অংশে আমি স্বত্বাধিকারী।

অধীনতা আমাদিগের শুদ্ধ ব্যক্তিগত ভাব নহে, ইহা আমাদিগের জাতীয় অবস্থা। চাকরী করা ও পরের দাস হইয়া থাকা আমাদিগের জাতীয় ব্যবসায় ও জাতীয় জীবনের ধর্ম্ম। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতির চাকরী করা জাতীয় ব্যবসায় নহে, আর কোন জাতি এতদূর নীচ-প্রকৃতি নহে। চাকরী ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর চিন্তাও বিস্তৃত হয় না। যাহার চৌদ্দপুরুষ চাকরী ও গোলামী করিয়া আসিতেছে, সে কি অন্য দিকে চিন্তা বিস্তৃত করিতে পারে? বাল্যকাল অতীত হইয়া গেলে, জীবিকা নির্ব্বাহের কাল উপস্থিত হইলেই বাঙ্গালীর মন চাকরীর দিকে যেন এক স্বাভাবিক সংস্কার প্রভাবে নীয়মান হইবে। সে প্রভাব বিধ্বস্ত করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। শতবার স্বাধীন ব্যবসায়ের শত চিন্তা উদিত হইবে, বাঙ্গালী অমনি শত সহস্র বিভীষিকা দেখিতে থাকিবেন। কিছুতেই তাঁহার মন সুস্থির হইবে না। অবশেষে চাকরী;—নিরীহ দাসত্ব ব্যবসায়। ইহাতেই মন সুস্থির হইল। শত-কোটি দিন চাকরীর জন্য বাঙ্গালী পরের উপাসনা ব্রতে ব্রতী হইলেন। পরের পাদলেহনে ও উপাসনায় বাঙ্গালী বিলক্ষণ পটু। সে কার্য্যে তাঁহাকে আর শিক্ষা দিতে হয় না। সে কার্য্যে যে চাতুরী,

যে নীচতার আবশ্যক তাহা বাঙ্গালী বিলক্ষণ জানেন। চাকরী হইলে, আবার সেই চাকরী কিরূপ চাতুরী ও নীচতার সহিত রক্ষা করিতে হয়, তাহাতেও বাঙ্গালী বিশিষ্টরূপে পারদর্শী আছেন। বাঙ্গালী আর কিছুর জন্য গৃহত্যাগী হইবেন না, কেবল চাকরীর জন্য হইবেন। বাঙ্গালী আর কিছুরই জন্য আত্মস্বজন ও পরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ও থাকিতে পারেন না, কেবল চাকরীর জন্য পারেন। বাঙ্গালী কিছুতেই জাতিভ্রষ্ট হইতে স্বীকৃত হইবেন না, কেবল চাকরীর জন্য হইতে পারেন। আর কিছুর জন্য বাঙ্গালীকে স্বদেশ ত্যাগ করিতে বল, বাঙ্গালী তিলার্দ্ধও নড়িবেন না। কিন্তু চাকরীর জন্য তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে স্বীকৃত আছেন ও বাস্তবিক তাহাই করিতেছেন। তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া কি জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন?—পরের চাকরী ও দাসত্ব করিবার জন্য। এই দাসত্ব বিশিষ্টরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বিশিষ্টরূপে শিক্ষিত হইয়া আসিলেন। স্বাধীন দেশে পদার্পণ করিয়া, চারিদিকে স্বাধীন ভাব বিরাজিত দেখিয়া, চারিদিকে স্বাধীন ব্যবসায়ের ধূমধাম, ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তিনি কণামাত্র স্বাধীনভাবে উদ্বোধিত হইলেন না; তাঁহার মন স্বাধীনব্যবসায় ও স্বাধীন চিন্তায় প্রধাবিত হইল না। তিনি সে সমস্ত ভাব পরাজয় করিয়া মস্তকে অধীনতার ভার বহন করিয়া স্বদেশে আসিলেন; আসিয়া এখানে গোলামী করিতে লাগিলেন। এখানে ইংরাজের অবজ্ঞাপাত্র হইতে আসিলেন। এখানে ইংরাজের পদসেবা ও তিরস্কার সহ্য করিতে আসিলেন। এখানে স্বদেশীয়গণকে দাসত্ব শিক্ষা দিতে আসিলেন। হায়! বঙ্গের অবস্থা কি হইবে? ধিক্ বঙ্গের সন্তানগণ!

ইহাতেই প্রতীত হইতেছে আজিও অধীনতায় বাঙ্গালীর লজ্জা বোধ হয় নাই। চির-অধীনতায় তাঁহার প্রকৃতি এরূপ অসাড় হইয়া গিয়াছে, যে তিনি শীঘ্র সে জড়তা, সে অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। কোন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী যে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবেন, তাঁহার জড়তা ও তাঁহার অধীনতা-প্রিয়তা তৎপক্ষে ঘোর প্রতিবিরোধী হইয়াছে। যত দিন এই জড়তা ও অধীনতা-প্রিয়তা দূরীভূত না হইবে, ততদিন বঙ্গবাসীগণের অভ্যুদয় হইবে না। অধীন হইয়া কোন জাতি মহত্ত্বের সোপানে উঠিতে পারে নাই। স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন না করিলে, স্বাধীন চিন্তা সকল স্ফুরিত হয় না; অধীনতার নীচতা ও অসুখ বোধগম্য হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, অগ্রে জ্ঞান, তৎপরে ভাবসম্ভূত আকাঙ্ক্ষা, এবং সর্ব্বশেষে কার্য্য। অগ্রে বঙ্গবাসীর মনে অধীনতার নীচতা বোধগম্য হওয়া চাই, অগ্রে স্বাধীনতার সুখ ও গৌরব জ্ঞানগোচর হওয়া

চাই, তৎপরে স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও তজ্জন্য চেষ্টা। অগ্রে উচ্চভাব সকল জাতি মধ্যে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক, তৎপরে কার্য্যের কথা।

অতএব বঙ্গদেশ মধ্যে অগ্রে সুমহৎ ভাব সমুদায় যাহাতে সুপ্রচারিত হয় তৎপক্ষে সমাজ সংস্কর্ত্তাগণের বিশেষ যত্নের আবশ্যক। অগ্রে মনকে ফিরান চাই, মন ফিরিলেই হৃদয় ভাববেগে পূর্ণ হইবে, এবং সেই বেগ কার্য্যক্ষেত্রে স্বতঃই প্রকাশিত হইবে। বঙ্গবাসিগণের জড়তা ও অসাড়তা অপনয়ন করিবার এই প্রধান উপায়। তাঁহাদিগের মধ্যে মহৎ-ভাব সকল উত্তমরূপে সুপ্রচারিত ও হৃদয়ঙ্গম হইলে কে তাঁহাদিগের ভাববেগ নিবারণ করিবে? তখন ভাববেগ স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, ভাববেগ প্রবল হইলে স্বতঃই কার্য্যক্ষেত্রের দিকে প্রবাহিত হইবে। তখন তাঁহারা আপনারাই আপনাদিগের জড়তা অপনীত করিবেন।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকেই উচ্চভাব সকলের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কাহাকে জাতীয় ভাব বলে, কাহাকে স্বদেশানুরাগ বলে, তাহা অনেকেরই বিদিত নাই। প্রকৃত বীরত্ব ও পুরুষকার, আত্মমর্য্যাদা ও সম্ভ্রম, গৌরব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভাব কয়জন বাঙ্গালী অবগত আছেন? এই সমস্ত উচ্চভাব দেশ মধ্যে প্রচারিত হউক; শুধু পুস্তকে নয়, শুধু সম্ভাষণে নয়, বাগ্মীর অগ্নিপরীত বাক্যে প্রচারিত হউক, হৃদয়-মধ্যে সুদৃঢ় অঙ্কিত হউক, তবে তাঁহাদিগের ভাববেগ বঙ্গবাসীর হৃদয়কে প্রতাড়িত করিবে। আজি বঙ্গবাসিগণের হৃদয়ে এ সমস্তের কোন ভাবই জাগরিত নাই, আমরা কিরূপে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অবদান-পরম্পরা প্রত্যাশা করিতে পারি? দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, ভ্রমণ করিয়া দেখ, বঙ্গবাসিগণ বিষম অজ্ঞানতার ঘোরে নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। কাহার মনে জাতীয় ভাবের সংস্কার মাত্রও নাই, স্বাধীনতা ও স্বদেশানুরাগের স্ফুলিঙ্গ মাত্রও নাই। কেবল অধীনতার ভাব জাজ্বল্যমান; জড়তা ও উদাসীনতাই প্রবল।

যে মহাজনেরা বঙ্গের উন্নতির জন্য ব্যস্ত ও চিন্তাপরায়ণ, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করুন, যাহাতে এদেশ মধ্যে অগ্রে মহৎ ভাব সমুদায় সুপ্রচারিত হয়। এক্ষণে বঙ্গের বিশাল ক্ষেত্রে বাগ্মীর উৎসাহ-সূচক প্রবোধনার নিতান্ত আবশ্যক। যাহাতে বঙ্গবাসিগণের মন সদ্ভাবে পূর্ণ হয়, যাহাতে তাহারা এই সদ্ভাবে আকৃষ্ট হন, যাহাতে তাঁহাদিগের হৃদয়ের অধঃস্থল পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠে, যাহাতে তাঁহারা এক্ষণকার কালোচিত কর্ত্তব্য সমুদায় বুঝিতে পারেন, এক্ষণে বাগ্মীর এরূপ উত্তেজন বাক্যের নিতান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালীর পূর্ব্বকালের ভাব সকল যেরূপ ছিল, তাহাতে কেবল নীচতারই পরিচয় দেয়; তাহাতে স্বদেশানুরাগের

চিহ্ন মাত্র নাই, জাতীয়ভাবের সংস্পর্শ নাই। সেই সমস্ত ভাব আজিও কিছুই উন্মূলিত হয় নাই। নীচ-শ্রেণীস্থ লোকের কথা দূরে থাক, অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রজনগণের মুখে আজিও সেই পূর্ব্বকার ভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ভাব বিষয়ে নীচ শ্রেণীস্থ জনগণ হইতে ভদ্রলোকের বড় প্রভেদ নাই। তাঁহারা কেবল জাতিতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আর কিছুতেই তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয় না। জাতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কেবল ব্যবসায়ে ভিন্ন। তাঁহারা জাতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, যে চাকরী, যে গোলামী করিয়া বেড়ান, তাহারই গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, এবং এই গৌরবে পূর্ণ হইয়া আত্মাভিমানে আপনাদিগকে বড় লোক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, শ্রেষ্ঠ জাতি সমুদায়কে চাকরী করিতে দেখিয়া নীচ-জাতীয় লোকেরাও সাধ্য হইলে আপনাপন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক চাকরী করিয়া ভদ্রলোক হইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে স্বাধীন ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, ক্ষমতাহীন, দীন ও দরিদ্র তাহারাই কেবল স্বজাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। ক্ষমতাবানেরা ভদ্রলোক হইয়া দাড়াইয়াছেন। সুতরাং স্বাধীন ব্যবসায়ের একান্ত হীনাবস্থা ঘটিয়াছে। সমস্ত স্বাধীন ব্যবসায় নীচ হইতে নীচতর হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে স্বজাতীয় ব্যবসায় করাও নীচ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন কালের সুব্যবস্থা সকল এক্ষণে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে। যে সদুদ্দেশ্যে এই ব্যবসায় সকল বংশপরম্পরা ক্রমে ধারাবাহিক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য বিফল হইতেছে। এক্ষণে বঙ্গধামে আর শিল্পের চাতুরী, কৌশল ও উৎকর্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্যবসায় জাতীয় এবং বংশপরম্পরা ক্রমে ধারাবাহিক ছিল বলিয়া, প্রাচীন কালে বঙ্গীয় শিল্প এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার গৌরবে ইউরোপীয় বণিক্‌গণও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন *। এক্ষণে সেই স্বাধীন ব্যবসায় সকলের গৌরব কমিয়া চাকরীর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। ভদ্রলোকের নীচ ভাব সকল নিম্ন শ্রেণী মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কোথায় বঙ্গদেশ ইউরোপীয় স্বাধীন বাণিজ্যের সংস্রবে দেশীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিবে, তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিবে, না সেই ব্যবসায় সকল পরিবর্জ্জন করিয়া উৎসন্ন যাইতেছে। আজি বঙ্গদেশ যদি ব্যবসায়ী হইয়া ইংরাজী বাণিজ্যের ধূমধামে মাতিয়া যাইত, নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহা হইলে

* Vide Appendix to Dr. Robertson's Historical Disqusition concerning the knowledge which the Ancients had of India.

বঙ্গদেশ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইত। স্বাধীন ব্যবসায়ের গৌরব বৃদ্ধি হইত। স্বাধীন চিন্তা প্রসারিত হইত। স্বাধীন ভাব সকল উন্মেষিত হইত। সমাজ স্বাধীন ভাবে সংগঠিত হইয়া আসিত। বঙ্গবাসিগণের স্বাধীন কার্য্যে শক্তির বল বৃদ্ধি হইত। তাঁহারা একটি গণনীয় জাতি হইয়া দাঁড়াইতেন। বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল হইত। এরূপ না ঘটিয়া এক্ষণে ইহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে। স্বাধীন বৃত্তি সকল চাকরীতে লোপ পাইতেছে। সর্ব্ব সাধারণে এক্ষণে নীচ প্রকৃতির লোক হইয়া দাঁড়াইতেছেন। দাস্য বৃত্তিতে সমুদায় স্বাধীন প্রবৃত্তির লোপ করিতেছেন। দাস্যকে গৌরবে পূর্ণ করিতেছেন। ক্রমে বাঙ্গালী জাতি একটি প্রকাণ্ড দাস জাতি হইয়া পড়িতেছেন। বাঙ্গালী জাতির এইরূপ গতি চলিলে আর পঞ্চাশৎ বৎসর পরে বঙ্গদেশ দাসের দেশ হইয়া দাঁড়াইবে। এদেশে চাকরী না জুটিলে, বাঙ্গালীরা দেশ দেশান্তরে চাকরী করিতে বহির্গত হইবেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাঙ্গালী দাসে পরিপূর্ণ হইবে। পৃথিবীতে বাঙ্গালীর নাম আর দাসের নাম এক হইয়া যাইবে।

এই কি উন্নত ইংরাজী শিক্ষার ফল? এই কি স্বাধীন ইংরাজজাতির সহিত সম্মিলন ও সহবাসের ফল? এই কি স্বাধীনভাবাপন্ন ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষার পরিণাম? বাঙ্গালী জাতি না গৌরব করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষায় ভারতীয় অপরাপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর? ইংরাজী-সাহিত্য শিক্ষার কি এই শ্রেষ্ঠতর ফল? ভারতের রাজধানীতে থাকিয়া ইংরাজী বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধুমধামে পরিবৃত থাকিয়া বাঙ্গালী কি এই ফল লাভ করিলেন? তিনি দাসত্বে কেবল নিপুণ হইলেন! এই কি বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠতা! এই বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠতা লইয়া তিনি আবার বড় হইতে চাহেন। আগে তিনি দাসত্ব পরিত্যাগ করুন; আগে তিনি আপনি স্বাধীন হউন; দাসের কলঙ্ক আপনার গাত্র হইতে প্রক্ষালণ করুন, তার পর সমাজকে স্বাধীন করিতে যাইবেন। তিনি নিজে যতক্ষণ চাকরী করিবেন, পরের দাসত্ব করিবেন, ততক্ষণ সমাজকে সেই দাসত্ব শিক্ষা দিবেন, এবং সেই দাস্যে ক্রমে ক্রমে অপরকে আকৃষ্ট করিবেন। আপনি স্বাধীন হউন, পরকেও স্বাধীন করিতে পারিবেন। আপনি স্বাধীন হইয়া দেশ মধ্যে উপদেশে এবং কার্য্যে স্বাধীনতা শিক্ষা দিন, আপনার অদূর-প্রসর জীবন-ক্ষেত্র মধ্যে স্বাধীনতার বীজ রোপিত করুন, নিজে স্বাধীন হউন, নিজ পত্নীকে স্বাধীন ভাবে পূর্ণ করুন, ক্রমশঃ সমাজ মধ্যে স্বাধীন ভাব আপনাপনি প্রচারিত হইবে। ইহাই কার্য্যের সোপান। ইহাই সমাজ সংস্কারের সহজ পন্থা। ইহাই উন্নতি ও স্বাধীনতার মূল।

ক্রমশঃ শ্রীপূ

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

(ষষ্ঠ প্রবন্ধ।)

বাহ্য বিপ্লব অন্তর্ব্বিপ্লবের প্রতিফলন মাত্র। কি নৈতিক, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক যে কোন বিপ্লব সাধন করিতে যাও না কেন, অগ্রে তোমাকে অন্তর্ব্বিপ্লব সাধন করিতে হইবে;—অগ্রে তোমাকে লোকের মনের ভাবস্রোত তদনুকূল দিকে প্রধাবিত করিতে হইবে। অভীপ্সিত কার্য্যারম্ভ হওয়ার অগ্রে লোকের মনকে অনুকূলভাবে প্রমত্ত করিতে হইবে। লোকের মন অনুকূলভাবে প্রমত্ত হইলে, তাহা কার্য্যের দিকে অপ্রতিহত বেগে আপনিই প্রধাবিত হইবে। সে বেগ নিবারণ করে কাহার সাধ্য? 'ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ?' অভিলষিত বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প মন ও নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতি কে রোধ করে? এ স্রোতের বেগে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া যায়, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিপত্তি সকল অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্ব্বিপ্লব সাধন করাই—জনসাধারণের মানসিক ভাবস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করাই—সংস্কারকদিগের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এই গভীর বিপ্লব সাধনের দুই মাত্র অস্ত্র—লেখনী ও জিহ্বা। বাগ্মী হৃদয়ালোড়নকারিণী বক্তৃতা দ্বারা সমাগত শ্রোতৃবর্গের চিত্ত উন্মাদিত করিয়া দেন; লেখক হৃদয়প্রজ্বালন-কারিণী রচনা দ্বারা অনাগত পাঠকবৃন্দের হৃদয়কে অগ্নিময় করিয়া তুলেন। অন্তর্বিপ্লব সাধন করিতে হইলে এই দুই শ্রেণীর সংস্কারকেরই একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু অধীন দেশে বাগ্মীর সংখ্যা অতি বিরল। ইতালী বহুকাল হইতে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। যে ইতালী একদিন বাগ্মিকশ্রেষ্ঠ সিসিরোর বক্তৃতায় উন্মাদিত হইয়াছিল, সেই ইতালী এক্ষণে চির-অধীনতায় নীরব! অষ্ট্রিয়ার দৌরাত্ম্যে মনের দুঃখ ব্যক্ত করিতেও অক্ষম! পিশাচদিগের আবির্ভাবে সেই দেবভূমি এক্ষণে শ্মশান! কুত্রাপি জীবনের কোন চিহ্ন উপলক্ষিত হইতেছে না; কেবল সেই পিশাচ-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শ্মশানের অদূরে কয়েকটী নির্ভীক কাপালিক একত্রিত হইয়া শব সাধন করিতেছিলেন মাত্র। বলা বাহুল্য মাত্র যে এই কাপালিক সমাজ নির্ব্বাসিত ম্যাট্‌সিনি ও তৎ-সহচরবৃন্দ দ্বারা সংগঠিত। সেই কাপালিক সমাজ পৈশাচিক আবির্ভাব হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করিবার জন্য—ইতালীয়দিগের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিবার নিমিত্ত, ভগবতী সঞ্জীবনী শক্তির আরাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। কিয়ৎকাল দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেই

তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইলেন। তাঁহাদিগের অবসন্নপ্রায় হৃদয় ভাব-বেগে উচ্ছ্বলিত হইল। তাঁহাদিগের শিথিলিত হস্ত নূতন বল পাইয়া লেখনী ধারণ করিল। তাঁহারা পিশাচগ্রস্ত ইতালীয়দিগের রুধিরে—তাঁহাদিগেরই বক্ষফলকে এই মূল মন্ত্রগুলি লোহিতবর্ণে অঙ্কিত করিলেন ঃ—

"ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিশাচদিগের হস্তে পতিত হইয়াছ! তোমাদিগের হৃদয় ক্রোধে ও দুঃখে ভস্মীভূত হইতেছে! তোমাদিগের শোণিত ভয়ে শুষ্ক হইতেছে! পিশাচ-তাড়নে তোমাদিগের মাংস অস্থি হইতে বিশ্লেষিত হইতেছে! কিন্তু ভয় পাইও না। হৃদয়ে ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং সিদ্ধির আশা ধারণ কর, দেখিবে অবিলম্বেই সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হইবে। আমাদিগের এই উক্তি নির্ব্বাসিতের বিলাপমাত্র মনে করিও না।

আমরা জানি যে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অনেক সময় কেবল বৃথা বাক্যব্যয়েই অতিবাহিত হইয়াছে, কিছুই অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমাদিগের নিজের হৃদয়-প্রবণতার অনুসরণ করিলে আমরা আর বৃথা বাক্যব্যয় করিতাম না, অত্যাচারের গভীর প্রায়শ্চিত্তের দিন পর্য্যন্ত নীরবে থাকিতাম; কিন্তু আমাদিগের মরণোন্মুখ ভ্রাতৃগণের কাতরোক্তিতে ও অনুরোধে সাধারণ হিতের জন্য আমরা সঞ্জীবনৌষধ স্বরূপ গুটিকত বীজ মন্ত্র না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদিগের হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া সরলভাবে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে গুটিকত অকাট্য সত্যের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবং যে সকল জাতি অবিচলিতভাবে ও অম্লানমুখে ইতালীর কষ্ট, যন্ত্রণা, দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও গুটিকত মর্ম্মভেদী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

হৃদয়-ভাবের উদ্বেলতা হইতেই মহতী বিপ্লব-পরম্পরা সংসাধিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন যে শুদ্ধ শাণিত বেয়নেটেই বিপ্লব সংসাধিত হইতে পারে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। নৈতিক উৎকর্ষ অন্তর্বিপ্লব সংসাধন করিলে, বেয়নেট্ বা শারীরিক বল বাহ্য বিপ্লব মাত্র সম্পাদিত করে। ভাবোদ্বোধিত স্বত্ববিশেষের সমর্থন কালেই বেয়নেট্ প্রকৃত শক্তিশালী। জনসাধারণের মনে নৈতিক জ্ঞান বদ্ধমূল হইলেই, তাহা হইতে সামাজিক স্বত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। অন্ধ পাশব বলে কখন কখন দুই একটী জেতৃপুরুষ সমুদ্ভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের জয় প্রায়ই জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিকূলে, এইজন্য তাহার পরিণাম প্রায়ই যথেচ্ছাচার—সাধারণ হিতের সমূলোৎপাটন।

যখন লেখকের তেজস্বিনী রচনা স্বাধীনতার ভাবে জনসাধারণের মনকে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয় তখনই লোকের স্বাধীনতা লাভে প্রকৃত অধিকার জন্মে। যখনই লোকে স্বাধীনতার অভাব অনুভব

করিতে শিখে, তখনই তাহাদিগের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা বলবতী হয়। তখন বিপ্লব আপন হইতেই আবির্ভূত হয়। তখনই বিপ্লব বিধি ও ন্যায়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তখন বিপ্লবের সাধন-সামগ্রীও ন্যায় ও বিধির অনুমোদনে দুর্নিবার্য্য বল প্রাপ্ত হয়।

অদ্বিতীয়-প্রতিভাশালী প্রশস্ত-হৃদয় মনীষিগণ জগতে যে নূতন উন্নতির বীজ রোপণ করেন, অসংখ্য লোকের জলসেচনে সেই বীজ হইতে প্রথমে অঙ্কুর ও পরে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেই বৃক্ষ আবার বহুকাল জলসেচনের পরে ফল ধারণ করিয়া থাকে।

মানব সমাজের শিক্ষা একদিনে সম্পন্ন হইতে পারে না। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের বহুকাল-ব্যাপিনী পর্য্যালোচনায়, ঘটনানিচয়ের অক্লান্ত অধ্যয়নে, এবং অধিগত সত্য সমূহের ধীর ও বহুকাল-ব্যাপী প্রয়োগেই মানবমনে নূতন সংস্কার—নূতন বিশ্বাস—প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে।

এই ক্রমিক উন্নতি ও ক্রমিক শিক্ষার প্রধান সাধন সাময়িক পত্র। যাঁহাদিগের জীবনের এক লক্ষ্য, তাঁহাদিগের সমবেত শ্রমে ও সমবেত যত্নেই এরূপ গুরুতর ব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে। এই সাময়িক পত্র—সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবে, কোন ঘটনাকেই তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে না। ইহা প্রত্যেক ঘটনার অভ্যন্তরে যে গভীর ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্য নিহিত আছে, তাহার অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিবে। এরূপ শিক্ষাপ্রণালীই এক্ষণকার ঘটনাস্রোতের গতিপ্রাবল্যের সম্পূর্ণ উপযোগিনী।

ইতালী এক্ষণে একটী নব জীবনের দিকে প্রবলবেগে প্রধাবিত। সুতরাং এতদবস্থ অন্যান্য দেশের ন্যায় ইতালীতেও এক্ষণে ভীষণ শক্তি সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। লক্ষ্যের অবৈষম্য সত্ত্বেও, সাংঘাতিক মতবৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই এক লক্ষ্য; কিন্তু কি উপায়ে সেই লক্ষ্য সংসাধন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

অষ্ট্রিয় জেতৃগণের প্রতি কতকগুলি লোকের বিদ্বেষ এরূপ প্রবল, যে বিদেশীয় অষ্ট্রিয়গণ স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছে বলিয়াই, তাঁহারা স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত। কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনতার স্বতন্ত্র মূল্য এখনও অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বিচ্ছিন্ন ইতালীয় প্রদেশ গুলিকে একত্রিত করা কতকগুলি লোকের আবার এত ইচ্ছা, যে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা বরং বিদেশীয় যথেচ্ছাচারী প্রবল রাজার অধীন হইতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি তাঁহারা অসংখ্য স্বদেশীয় রাজার অধীনে ইতালীকে দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্নাঙ্গ দেখিতে প্রস্তুত নহেন।

আবার কতকগুলি লোক প্রাদেশিক বিদ্বেষের সংঘর্ষ হইতে এতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করেন, এবং সহসা প্রাদেশিক

স্বার্থের মূলোৎপাটন, চেষ্টার সাফল্য বিষয়ে এতদূর সন্দিহান, যে ইতালীর পূর্ণ একতা বিধান চেষ্টা অসম্ভব ভাবিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকিতে চাহেন এবং আপাততঃ এমন যে কোন নব বিভাগে সম্মত আছেন, যাহাতে ইতালীর বিচ্ছিন্ন ভাব কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত হয়।

একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য—এই তিন অপরিহার্য্য ভিত্তির উপর ইতালীর উন্মোচন চেষ্টা সংস্থাপিত না হইলে যে ইতালীর প্রকৃত উন্নতি পদে পদে প্রতিহত হইবে, ইহা এক্ষণে অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন।

কিন্তু যাঁহারা এরূপ বুঝিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; এবং আশা করা যাইতে পারে যে অচিরকাল মধ্যেই এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসের অভ্যন্তরে অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাস বিলীন হইবে।

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, অষ্ট্রিয়ার প্রতি ঘৃণা, এবং অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হওয়ার জ্বলন্ত ইচ্ছা, এক্ষণে প্রায় ইতালীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ভয় এবং রাজনৈতিক কৌশল এত দিন যে সকল জঘন্য সামের অনুমোদন করিয়া আসিতেছিল, তাহা অচিরাৎ পরিত্যক্ত হইয়া জাতীয় ইচ্ছার গৌরব পরিরক্ষিত করিবে। ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে তোমাদিগের সম্মুখে দুইটী মাত্র সম্ভবনীয় ঘটনা রহিয়াছে—এই শক্তি-সংঘর্ষে হয় ইতালীতে বৈদেশিক যথেচ্ছাচারের চূড়ান্ত আধিপত্য পরিবর্দ্ধিত হইবে, নয় তোমাদিগের অমানুষ বীরত্বে বৈদেশিক যথেচ্ছাচার ইতালীক্ষেত্র হইতে জন্মের মত বিদূরিত হইবে।

কি উপায়ে সেই গভীর লক্ষ্য সংসাধন করিতে হইবে, এবং কি উপায়েই বা এই অন্তর্বিদ্রোহানলকে চিরস্থায়ী ও সফল বিজয়ে পরিণত করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে।

একদল সম্ভ্রান্ত ও দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে কৌশলে ও গুপ্তভাবেই বিপ্লব সাধিত হইতে পারে। বিশ্বাসের অবিচলিততা ও ইচ্ছার দৃঢ়তার অনিবার্য্য বল অপেক্ষা এই কৌশল ও গূঢ়তার উপরই তাঁহারা অধিকতর আশা সংন্যস্ত করেন। তাঁহারা আমাদিগের মতের অনুমোদন করেন বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত। বিদেশীয় অধীনতায় দেশের অসীম অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন এবং তজ্জন্য মর্ম্মপীড়িত; তথাপি তাঁহারা উৎকট রোগের প্রতীকার জন্যও উগ্রতর ঔষধ প্রয়োগ করিতে ভীত হয়েন; তথাপি যে কৌশলে ও যে ধূর্ত্ততায় ইতালী যথেচ্ছাচারী অষ্ট্রিয়ার পদানত হইয়াছে, সেই কৌশল ও সেই ধূর্ত্ততা দ্বারাই তাঁহারা ইতালী উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন।

তাঁহারা যে সময়ে ইতালীতে জন্ম গ্রহণ

ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে ইতালীয়গণের অন্তরে স্বাধীন জাতির কর্ত্তব্য-জ্ঞান উদ্বোধিত হয় নাই, সুতরাং অতীত মহিমার স্মরণে, প্রাকৃতিক স্বত্ব সমর্থনের জন্য, প্রাণের দায়ে, প্রজাসমূহ অভ্যুত্থিত হইলে যে, তাহাদিগের বেগ অসম্বরণীয়—এ বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। জ্বলন্ত উৎসাহে তাঁহাদিগের কোন বিশ্বাস নাই। যে কূট ও জটিল রাজনীতিতে আমরা সহস্রবার ক্রীত ও বিক্রীত হইয়াছি, এবং যে বৈদেশিক বেয়নেট বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদিগকে সহস্রবার শক্রহস্তে সমর্পিত করিয়াছে, সেই কূট ও জটিল রাজনীতি এবং সেই বিশ্বাসঘাতক বৈদেশিক বেয়নেটেই তাঁহাদিগের সমস্ত আশা সন্ন্যস্ত রহিয়াছে।

অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে যে—ইতালীয় হৃদয়ে সঞ্জীবন ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে, ইতালীয় জাতি সাধারণের মন উৎকৃষ্টতর অবস্থার জন্য প্রবলবেগে প্রধাবিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন।

তাঁহারা জানেন না যে বহুকালব্যাপী দাসত্বের পর পুনরুজ্জীবিত হইতে হইলে অসাধারণ নৈতিক উৎকর্ষ ও জীবনের নির্ভীক উৎসর্গীকরণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

তাঁহারা জানেন না যে ইতালীর শতাধিক সার্দ্ধদ্বিকোটী অধিবাসী এই সুমহৎ লক্ষ্য সাধনে সমব্রত ও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে, জয় দুর্নিবার্য্য! ইতালীর সমস্ত অধিবাসী যে এক লক্ষ্যে ও এক উদ্দেশ্যে কখন সমবেত হইতে পারে ইহা তাঁহারা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি কখন একাগ্র চিত্তে ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন? 'তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত' কখন কি তাঁহারা এরূপ ভাব ইতালীয় ভ্রাতৃগণের নিকট প্রদর্শন করিয়াছিলেন? শুদ্ধ ইতালীয় ভ্রাতৃগণের উপর নির্ভর করিয়া কখন কি তাঁহারা বিদেশীয় জেতৃগণের উপর রণোদ্ঘোষণ করিয়াছিলেন? 'আত্মনির্ভর ব্যতীত উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই'—স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের নিকট তাঁহারা কি কখন এই অমূল্য সত্যের উদ্‌ঘোষণ করিয়াছিলেন? 'তাঁহাদিগের স্বাপক্ষ্যে যে আন্দোলন অভ্যুত্থিত হইবে তাহা স্বশোণিতে পরিপুষ্ট ও পরিরক্ষিত করিতে হইবে'—ইহা কি তাঁহারা কখন লোকসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন? 'যুদ্ধ অপরিহার্য্য—সেই সাংঘাতিক ও অপরিহার্য্য যুদ্ধকে হয় জাতীয় সমাধিতে নয় জাতীয় বিজয়ে পরিণত করিতে হইবে'—এ উপদেশ তাঁহারা কখন কি প্রজাসাধারণকে প্রদান করিয়াছিলেন?

না; কখন না; তাঁহারা কার্য্যের গুরুত্বে ভীত হইয়া হয় কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিতি ছিলেন, নয় সভয়ে সন্দিগ্ধচিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, যেন তাঁহারা যে গৌরবের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা ন্যায় ও বিধির অনুমোদিত নহে।

যে সকল নিয়মাবলী ও বিধিব্যবস্থা

বৈদেশিক মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, প্রজাসাধারণকে সেই সকলের অনুবর্ত্তনে শিক্ষা দিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন; বৃথা বৈদেশিক সাহায্যের আশা দিয়া—যাহারা হৃদয় চিরিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল—তাহাদিগের উৎসাহানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন; এবং যে সময় অক্লান্ত কার্য্যে বা রণক্ষেত্রে যাপিত করা উচিত ছিল, সেই সময় আলস্যে বা বৃথা বৈধিক তর্ক বিতর্কে অতিবাহিত করিয়াছেন।

অবশেষে যখন আপনাদিগের আশা-মরীচিকায় আপনারা উদ্ভ্রান্ত হইলেন; যখন বৈদেশিক কূট-রাজমন্ত্রণা-জালে আপনারা প্রবঞ্চিত হইলেন; যখন দ্বারে শত্রু ও হৃদয়ে ভীতি বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল; যখন স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাধীনতা সমর্থনের জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত করা তাঁহাদিগের মহৎ পাপের মহৎ প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল; তখন তাঁহারা ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

যাঁহারা কখনই আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা জাতীয় হৃদয়ে জাতীয় বিশ্বাস উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারাই এক্ষণে জাতীয় বিশ্বাসের শক্তি অস্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা আপনাদিগের ভীরুতা ও সন্দিগ্ধতা দ্বারা জাতীয় উৎসাহানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এক্ষণে জাতীয় উৎসাহের অস্তিত্ব বিষয়েই সন্দেহ করিয়া থাকেন। আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারা শান্তিলাভ করুন। তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের কোন বিদ্বেষ বা ক্রোধ নাই। আমরা জানি তাঁহাদিগের ভ্রম মানসিক-দুর্ব্বলতা-জাত, নীচতা-সম্ভূত নহে। কিন্তু যে কার্য্যের আদ্যন্ত ধারণা করিবার তাঁহাদিগের শক্তি নাই, সে কার্য্যের অধিনেতৃত্ব গ্রহণে তাঁহাদিগের কি অধিকার?

বিপ্লবের পরিণতির সময় প্রত্যেক ভ্রম প্রত্যেক স্খলন সত্য নির্ণয়ের এক একটী সোপান স্বরূপ হইয়া উঠে। অতীত ঘটনাবলী অভ্যুত্থানশীল পুরুষের বিশেষ শিক্ষাস্থল; এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী অতীত কালের পুরুষদিগের সহিত নব্য ইতালীর পূর্ণ বিচ্ছেদ—পূর্ণ পৃথক্‌ভাব—সংসাধিত করিয়াছে।

এই শেষ দৃষ্টান্ত—যথায় যে শপথ সপ্ত সহস্র দেশীয় বীর পুরুষের দেহ স্পর্শ করিয়া গৃহীত হয়, তাহাও অগৌরবে ও প্রবঞ্চনায় পরিণত হইয়াছে—এই শেষ দৃষ্টান্তও কি ইতালীয়দিগকে শিক্ষা দিবে না যে জয় অসি-অগ্রে, রাজপুরুষদিগের কূট মন্ত্রণাজালে নহে?

সহস্র বৎসরের শিক্ষা এবং শত সহস্র প্রতারিত পিতৃপুরুষদিগের মৃত্যুশয্যায় প্রদত্ত শাপ, কি ইতালীয়দিগের মনে এই প্রতীতি জন্মাইতে পর্য্যাপ্ত নহে, যে বিদেশীয়দিগের হস্তে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা মরীচিকা মাত্র।

অসংখ্য স্বাধীন ব্যক্তি যে ইতালীর

সহিত এত বার প্রবঞ্চনা করিল; কত সহস্র নির্ব্বাসিত ইতালীয় যে এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা ভোগ করিল; কত সহস্র ইতালীয় যে স্বদেশে থাকিয়াও এত দুর্ব্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিল; ইহাতেও কি ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে না?

অদ্য উনবিংশ শতাব্দী। এতদিন পরে এ—আমাদিগের বিশ্বাস—ইতালী জানিতে পারিয়াছেন যে লক্ষ্য ও সাধনার একতা ব্যতীত ইতালী উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই; যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গীকৃত না করিলে ইতালী উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই; বিজয়ের পথ রুধির-কর্দ্দমিত, পুষ্পবিকীরিত নহে।

ইতালীর ভাবী অদৃষ্ট লম্বার্ডীক্ষেত্রেই পরীক্ষিত হইবে; বৈদেশিক দিগের একটী চরণও ইতালীক্ষেত্রে থাকিতে ইতালীতে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না।

ইতালী এতদিন পরে জানিতে পারিয়াছে যে—জন-সাধারণের অভ্যুত্থান ব্যতীত জাতীয় সমর সংঘটিত হইতে পারে না; যাঁহারা সেই জনসাধারণের অধিনেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইতে চাহেন, জনসাধারণকে উত্তেজিত ও অভ্যুত্থিত করা তাঁহাদিগেরই হস্তে, তাঁহাদিগেরই দৃষ্টান্তে; নূতন ঘটনা নূতন প্রকার লোকের সৃষ্টি করিয়া থাকে—যাঁহারা প্রাচীন অভ্যাস ও প্রাচীন নিয়মের অধীন নহেন, যাঁহাদিগের হৃদয়ে ভাবী শুভের ভাব জীবন্ত ও জাজ্বল্যমান; অবিচলিত বিশ্বাসই শক্তির গূঢ় কারণ; আত্মত্যাগই প্রকৃত ধর্ম্ম; এবং আত্মবলই সর্ব্ব কৌশলের মূল।

নব্য ইতালী সমাজ এ সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন। তাঁহারা আপনাদিগের সাধনার মহত্ব অনুভব করিতেছেন, এবং তৎসিদ্ধি বিষয়েও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে অসংখ্য ইতালীয় স্বদেশের উদ্ধার-সাধন-ব্রতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পবিত্র নামে শপথ করিয়া আমরা বলিতেছি যে নির্যাতনে আমাদিগের বিশ্বাস বিদলিত না হইয়া বরং দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

যে মহাত্মাগণ স্বদেশ উদ্ধার-যজ্ঞে জীবন বলি প্রদান করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদিগের রুধিরের অভ্যন্তরে একটী সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে। যে স্বাধীনতাবীজ বীরপুরুষদিগের রুধিরে অভিষিঞ্চিত, কোন শক্তিই তাহাকে অঙ্কুরে দলিত করিতে সমর্থ নহে। আমাদিগের অদ্যকার ধর্ম্ম স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতানলে জীবন আহুতি প্রদান; আমাদের কল্যকার ধর্ম্ম হইবে—জাতীয় বিজয়ের উদ্বোধন করা।

নব্য ইতালী সমাজ যুবকমণ্ডলী-সংগঠিত—আমরা একমন্ত্রে দীক্ষিত—এক সাধনায় নিমগ্ন; যে কোন প্রকারে সেই পবিত্র ব্রতের উদ্যাপন করা আমাদিগের এক মাত্র কর্ত্তব্য ও একমাত্র লক্ষ্য। যেহেতু আমরা অস্ত্রের ব্যবহারে নিষিদ্ধ, এই জন্য আমরা লিখিব।

যে সকল উদার—মত যে সকল উন্নত হৃদয়ভাব—আমাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত ও বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে সংশ্লেষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিব। যদি কোন দাসোচিত অভ্যাস—যদি কোন কাপুরুষোচিত হৃদয়ভাব—নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্নিহিত থাকে, আমরা অচিরাৎ তাহাকে অঙ্কুরে দলিত করিব।

আমরা ইতালীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া এই গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার আমাদিগের মস্তকে গ্রহণ করিলাম; আমরা অদ্য হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ইতালীয় বিবিধ কষ্ট যন্ত্রণা, বিবিধ আশা ভরশা, বিবিধ অভিলাষ আকাঙ্ক্ষা খ্যাপনের মুখযন্ত্রস্বরূপ হইলাম।

আমরা এই লক্ষ্য সাধনের জন্য মধ্যে মধ্যে পত্রিকাদি প্রচার করিব। আমরা যে সকল মত ব্যক্ত করিলাম আমাদিগের রচনা সেই সকল মত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ইতালীই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য; সুতরাং আমরা অকারণে বৈদেশিক রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইব না; কিন্তু যখন দেখিব যে বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনায় ইতালীয়দিগের শিক্ষার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, যখন দেখিব বৈদেশিক দৃষ্টান্তের তুলনায় মানবদ্রোহী অত্যাচারিগণের কীর্ত্তি অধিকতর কৃষ্ণবর্ণে অভিরঞ্জিত হইতেছে, যখন দেখিব বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনায় সর্ব্বদেশীয় স্বাধীন জনগণের ভ্রাতৃভাব অধিকতর দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা, তখন বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনা হইতে আমরা বিরত হইব না।

আমরা জানি যে **প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব ধর্ম্ম।** যেখানেই দুই হৃদয় এক লক্ষ্যে প্রধাবিত, যেখানেই দুই আত্মা এক ধর্ম্মে দীক্ষিত, সেই খানেই এক দেশ, সেই খানেই এক জাতি। সমস্ত জগতের সাধুব্যক্তিদিগকে এক সমাজে আবদ্ধ করার বর্ত্তমান সময়ের যে অত্যুদার চেষ্টা তাহার অনুকূলতা সাধন বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিব না।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বৈদেশিকদিগের হস্তে ইতালী—হৃদয়ে যে গভীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, যত দিন না সেই ক্ষত শুকাইতেছে, যত দিন না সেই ক্ষতদেশ হইতে রুধিরনির্গমন বন্ধ হইতেছে, ততদিন ইতালী বৈদেশিকদিগকে ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না। যে সকল জাতি দ্বারা আমরা সহস্রবার ক্রীত, বিক্রীত, অবমানিত, ঘৃণিত ও পদদলিত হইয়াছি; যত দিন বিশ্বাসহত ব্যক্তিদিগের মৃত্যু-শয্যায় ক্রন্দন সেই সকল বৈদেশিক জাতির ও আমাদিগের অন্তর্বর্ত্তী থাকিবে, ততদিন আমরা বৈদেশিকদিগকে ক্ষমা করিতে পারিব না। ক্ষমা বিজয়ের ধর্ম্ম, দাসত্বের ধর্ম্ম নহে। প্রেম ক্ষমতা ও শ্রদ্ধার সাম্য-সাপেক্ষ, ক্ষমতা ও শ্রদ্ধার বৈষম্যে প্রেম জন্মিতে পারে না।

যদিও আমরা বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক কৃপার বিদ্বেষী, তথাপি আমরা

ইউরোপীয় মনের উৎকর্ষ বিধানে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করিব না; আমরা দেখাইব যে ইতালীয়েরা এখনও পূর্ব্ব গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে পরিরক্ষিত করিয়াছেন, আমরা দেখাইব যে ইতালীয়েরা হতভাগ্য হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা অন্ধ বা কাপুরুষ নহেন; এইরূপ সহানুভূতি কার্য্যে পরিণত করিয়া আমরা ভাবী বন্ধুত্বের মূলভিত্তি পরস্পর শ্রদ্ধার উপর সংস্থাপিত করিব।

ইতালীর নাম লুপ্তপ্রায়, ইতালীর এক্ষণে প্রকৃত ইতিহাস নাই। বৈদেশিকেরা স্বার্থসাধনোদ্দেশে ইতালীয় ঘটনা সকলকে, ইতালীয়দিগের প্রবৃত্তিনিচয়, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার এবং অভ্যাস সকলকে অসত্য বর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা আমাদিগের হৃদয় খুলিয়া বৈদেশিকদিগের সম্মুখে আমাদিগের ক্ষত প্রদর্শন করিব, দেখাইব কূটমন্ত্রীরা সাধারণ শান্তিরক্ষা ব্যপদেশে ভয়ে আমাদিগের হৃদয়-ক্ষত হইতে কত পরিমাণ রক্ত উদ্গীরিত করিয়াছে, আমরা গগণ বিদারিয়া, বৈদেশিকদিগকে আমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিব; বৈদেশিকেরা যে অসত্যজালে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা সে জাল ছিঁড়িয়া আমাদিগের প্রকৃত ছবি দেখাইব।

আমরা বৈদেশিক হস্তে যে অসংখ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, এবং সেই অত্যাচার ও সেই যন্ত্রণার মধ্যেও যে অতুল নৈতিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছি, আমরা কারাগারের অন্ধকার হইতে, এবং অত্যাচারীর মন্ত্রভবনের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে, অসংখ্য লেখ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা প্রমাণ করিব।

যে সকল মহাত্মা ইতালীর উদ্ধার সাধন করিতে গিয়া বৈদেশিক হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন; যাঁহারা আমাদিগের কষ্ট যন্ত্রণা, আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও আমাদিগের দুঃখে বৈদেশিকদিগের পাপময় উপেক্ষা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং যে মহাত্মাদিগের নাম পর্য্যন্তও ইউরোপে অদ্যাপি বিদিত নাই; আমরা আমাদিগের সমাধিস্থলের অধস্তম তলে নামিয়া সেই মহত্মাদিগের অস্থি উত্তোলন করিয়া বৈদেশিকদিগকে দেখাইব; দেখাইয়া বলিব যতদিন এই মহাত্মাদিগের অস্থি ইতালী-বক্ষে নিহিত থাকিবে, ততদিন বৈদেশিকদিগের মঙ্গল নাই, ততদিন বৈদেশিকদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যসংস্থাপনেরও কোন আশা নাই।

যে ইতালী দুইবার ইউরোপে স্বাধীনতা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন, সে ইতালীর ধ্বংস দেখিয়াও ইউরোপ উদাসীন—এই দেখিয়া যেন সেই সমাধিনিহিত ব্যক্তিগণের হৃদয় ভেদ করিয়া সহসা গগণবিদারী রোদনধ্বনি উত্থিত হইল।

আমরা সে রোদন শ্রবণ করিয়াছি; আমরা সেই রোদনের প্রতিধ্বনিতে সমস্ত ইউরোপ পরিপূরিত করিব। যতক্ষণ না

ইউরোপ বুঝিবে ইতালীর প্রতি কি পরিমাণ অত্যাচার কৃত হইয়াছে, ততক্ষণ সে প্রতিধ্বনি নীরব হইবে না। আমরা ইউরোপীয় লোকবৃন্দকে বলিব দেখ! কোন্ মহাত্মাদিগকে তোমরা ক্রীত ও বিক্রীত করিয়াছ, দেখ! কোন্ পুণ্য ভূমিকে তোমরা চিরবিচ্ছিন্ন ও চিরদাসত্বে পরিণত করিয়াছ।"

কাপালিকসমাজের এই প্রথম শবসাধন। নব্য ইতালী সমাজের এই সর্ব্বপ্রথম-মন্তব্য উদ্ঘোষণ। নব্য ইতালী সমাজের মুখযন্ত্রস্বরূপ 'নব্য ইতালী' নামক পত্রিকার এই প্রথম মুখবন্ধ। এই শবসাধনে—এই মন্ত্র-উদ্ঘোষণে—আল্‌প্‌স্‌ হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ইতালী কাঁপিল! অষ্ট্রিয়সম্রাটের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িল! সেই তমসাচ্ছন্ন শ্মশানভূমিতে জীবন-সঞ্চার পুনরায় সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল! যেন তাড়িত যন্ত্র ইতালীর মৃতদেহ আলোড়িত করিয়া তাহাতে চৈতন্য সঞ্চার করিল! যেন এই আলোড়নে অধীনতাপ্রপীড়িত জাতিমাত্রেরই হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল!

ক্রমশঃ।

দিল্লী।*

দিল্লী, ভারত-মানচিত্রের একটী বিন্দু মাত্র। কিন্তু এই বিন্দু অতীত-সাক্ষী পবিত্র ইতিহাসের অতি আদরের ধন। ভারতরাজচক্রবর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমান সম্রাট্‌গণের বীরত্ব, সাহস ও বৈভব এই বিন্দুতে উদিত হইয়া এই বিন্দুতেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। গ্রীসের এথেন্‌স্‌, ইতালীর রোম, যদি কবি ও ঐতিহাসিকগণের হৃদয়গত শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য হয়; তাহা হইলে দিল্লীও সেই শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলির সম্যক্ অধিকারী। কল্পনা যাঁহার নর্ম্মসখী, ললিত পদাবলি যাঁহার জীবনসহচরী, শব্দচাতুরী যাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারিকা, ভাবঘটা যাঁহার ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী, দিল্লী সেই স্বভাবপ্রিয় অন্তস্তত্বজ্ঞ কবির উপাস্য দেবতা স্বরূপ। আবার সত্য যাঁহার হৃদয়সখা, ন্যায় যাঁহার মন্ত্রদাতা, সমবেদনা যাঁহার জীবনতোষিণী, দিল্লী সেই অপক্ষপাতী সহানুভূতিপর ঐতিহাসিকের অতি আদরের সামগ্রী। কবির রসময়ী কবিতায়, ঐতিহাসিকের সারল্যময়ী বর্ণনায় দিল্লীর গৌরব, দিল্লীর বীরত্ব, দিল্লীর বৈভব অনন্তকাল লীলা করিবার যোগ্য। যাঁহারা বিষয়-নিস্পৃহ ভোগসুখে বিরত; সর্ব্বপ্রকার উদাসীনতা, সর্ব্বপ্রকার

* Archiological Report. Vol. I. By Alexandar Cunningham c. s. i.

নিবৃত্তি যাঁহাদিগের জীবনের অবলম্বন, যাঁহারা "নলিনীদলগত" জলের ন্যায় জীবনের ক্ষণস্থায়িতা, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় সৌভাগ্যলক্ষ্মীর চঞ্চলতা, চক্রনেমির ন্যায় অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখিয়া সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন, নির্জ্জন গিরি-কন্দরে বা নির্জ্জন অরণ্যে নীরবে বসিয়া অন্তিমে অনন্ত পদ প্রাপ্তির আশায় অনন্তশক্তির ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত থাকেন, দিল্লী সেই সংসারবিরাগী যোগরত তাপসগণের যোগাভ্যাসের প্রবর্ত্তক। তাঁহারা সৌভাগ্যলীলা-তরঙ্গায়িত দিল্লীর ইদানীন্তন শ্মশান ভাব,—হিন্দু রাজ-চক্রবর্ত্তিগণের উত্থান ও পতন, মুসলমান সম্রাটগণের উদয় ও বিলয় ভাবিয়া সংসারের অসারতা, অদৃষ্টের চঞ্চলতা অনুভব করিবেন, এবং ক্ষণস্ফূর্ত্তিশীল জলবিম্ব জলে মিশাইতে দেখিয়া প্রবৃত্তির অনুরাগ, মায়ার কুহকে আকৃষ্ট না হইয়া গম্ভীর ভাবে যোগাসনে সমাসীন থাকিবেন। ফলে ভারতমানচিত্রের এই বিন্দু, ভারতসাম্রাজ্যের এই নগর—সকলেরই প্রাণগত প্রীতির অধিকারী। এই দিল্লীই অগাধসত্ত্ব পাণ্ডবের লোকবিমোহন রাজসূয় সভা এবং সৌভাগ্যগর্ব্বিত মোগলের নয়নরঞ্জন আমখাসের বিলাস-ভূমি।

এই দিল্লীই হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরায় এবং মোগল-শিরোভূষণ আকবরের নন্দন কানন। ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য এক সময়ে এই দিল্লীতেই উদিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ বিভাসিত করিয়াছিল, এবং অধুনাতন ব্রিটেনিয়ার গর্ব্বস্বরূপিণী মহারাণীর 'ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরীর উপাধী' ঘোষণা" জন্য যে মহতী ঘটা ও মহদাড়ম্বরের বিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও এই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইবে।

যে প্রসন্ন-সলিলা যমুনা দিল্লীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই যমুনাও দিল্লীর পূর্ব্বতন সজীবতা এবং ইদানীন্তন শ্মশানভাবের নিমিত্ত স্বদেশ-বৎসল কবির মোহিনী কবিতায় বর্ণিত হইয়া অদ্যাপি লোকের রসনায় রসনায় লীলা করিয়া বেড়াইতেছে। কবি এই দিল্লীর বিগত মহত্ত্ব, বিগত কীর্ত্তি ও বিগত বৈভব স্মরণ করিয়া যমুনাকে বলিতেছেন :—

"তব জল কল্লোল, সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরেও।
আজি সব নীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব, কালেও॥
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতেও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিনও॥"

আবার যে দিন এই হিন্দুকুল-সূর্য্য অস্তমিত হইল, যে দিন দুরন্ত যবন-রাহু আসিয়া ভারতের ষোড়শ-কলা-পূর্ণ সুখশশী গ্রাস করিল, সেই অশুভদিনের সাক্ষীভূত যমুনাতীরবর্ত্তী দিল্লীই পুনর্ব্বার কবির মর্ম্মে আঘাত করিল :—

"কভু শতধারে, এ উভ পারে,
পাঠান আফগান মোগলও।
ঢালিল সৈনা, গ্রাসি নিবাসী,
ঘোর সে ভারত-বন্ধনেও॥
অহ! কি কুদিবসে, গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আরও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুঠি নিল যা ছিল সারও॥
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
পর-অসিঘাত-নিপাতেও।
সেদিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহ,
পরবল-অর্গল-পাতেও॥
সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরসে না কুলবালাও।
সেদিন হইতে, ভারতনারী,
অবরোধে অবরোধিতও॥
সেদিন হইতে, তব তটগগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরবও।
সেদিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
সেদিন ভারত বন্ধনও॥"

এইরূপ ঐতিহাসিক ঘটনাপূর্ণ এক দিন সৌভাগ্যলীলা-তরঙ্গায়িত, সুখবল্লীর বিলাসভূমি, অপর দিন বিকট শ্মশানের বিকট মূর্ত্তির উদ্দীপক যোগনিদ্রাভিভূত বিরাট পুরুষের ন্যায় অনন্ত জড়তায় সমাচ্ছন্ন দিল্লীর বিষয় লইয়া প্রত্নবিষয়-প্রিয় পাঠক! অদ্য আমরা তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি।

দিল্লীর পুরাবৃত্ত-ঘটিত বিবরণের প্রসঙ্গে আমরা সর্ব্বাদৌ সুবিশ্রুত ইন্দ্রপ্রস্থের সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কোন কোন মতে ইন্দ্রপ্রস্থ এবং দিল্লী দুটী পৃথক্ নগর। এই নগর-দ্বয় পরস্পর পাঁচ মাইল ব্যবহিত। কিন্তু এই মতের সহিত অন্যান্য বিষয়ের সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে না। কারণ, মুসলমান দিগের আক্রমণ সময়ে যে স্থান দিল্লী নামে কথিত হইত, তাহা বর্ত্তমান লাল্‌কোট ও রায়পিথোরার কেল্লার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার পর দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ সা ফিরোজাবাদে (পূর্ব্বতন ইন্দ্রপ্রস্থ) স্বীয় রাজধানী উঠাইয়া নিলে কিয়ৎকাল সমস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ এবং কেল্লা আলাই * ও জহাপনা নামক নগরোপান্ত জনপদ দিল্লী নামে উক্ত হইত। পরিশেষে মোগল সম্রাট্ হুমায়ুন পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থের সংস্কার করিয়া উহার 'দিনপনা' নাম দেন। হুমায়ুনের পর সের সা আবার ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে 'সের সা কেল্লা' নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই অবধি সাধারণ লোকের মধ্যে "পুরাতন দিল্লী" ও "নূতন দিল্লী" বলিয়া দুটী সংজ্ঞা প্রচলিত হয়। প্রথমটী হিন্দুরাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের এবং দ্বিতীয়টী ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ যমুনাতীরবর্ত্তী স্থান সমূহকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদনুসারে ইন্দ্রপ্রস্থও দিল্লীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ দিল্লী একটী সাধারণ

* অন্যতর নাম সিরি। খ্রীঃ ১৩০৪ অব্দে আলাউদ্দীন এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

নাম। এই নাম উচ্চারণ করিলে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ ও মুসলমান রাজধানী প্রভৃতি সমস্তই বুঝাইয়া থাকে। সুবিখ্যাত বিশপ হিবার দিল্লীর ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, "ভগ্নাবশেষের পর ভগ্নাবশেষ, মসজিদের পর মসজিদ, অট্টালিকাচ্যুত ইষ্টকরাশি, গ্রেনাইট, মার্ব্বেল প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরস্তূপ, বৃক্ষশূন্য দুই একটী স্বল্পায়তন ক্ষেত্র ব্যতীত বহুবিস্তৃত অকৃষ্ট ভূমির চতুর্দ্দিকে 'পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই বিরাট দৃশ্য অতি গম্ভীর ও ভক্তি-মিশ্র ভয়ের উদ্দীপক" †। বিশপ হিবার-বর্ণিত এই ভগ্নাবশেষের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ বর্ত্তমান সা জাহানাবাদ নগরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে রায় পিথোরার কেল্লা এবং তোগলকাবাদ পর্য্যন্ত ১০ মাইল। বিস্তারের পরিমাণ উত্তরদিকে প্রায় ৩ মাইল এবং দক্ষিণদিকে কুতব মিনার হইতে তোগলকাবাদ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ৬ মাইল। সমস্ত ভগ্নাবশিষ্ট ভূখণ্ডের পরিমাণ অন্যূন ৪৫ বর্গ মাইল। এই ৪৫ বর্গ মাইল পরিমিত ভূমির সাধারণ নাম দিল্লী— এক্ষণে ভগ্ন মসজিদের পর মসজিদ, অট্টালিকাচ্যুত ইষ্টকরাশির পর ইষ্টকরাশি মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে অভ্রভেদী প্রাসাদশ্রেণী, সে অভেদ্য দুর্গরাজি এক্ষণে কালের অসীম শক্তির প্রভাবে ধরাশায়ী হইয়াছে। সে সুষমা সৌন্দর্য্য সমস্তই অনন্ত সময়ের সহিত বিলীন হইয়া গিয়াছে। অদ্য দিল্লী শ্মশান! সে ইন্দ্রপ্রস্থ সভার গৌরব নাই, সে আমখাসের মাধুরী নাই, সে বিলাস-ভবনের সৌন্দর্য্য নাই, অদ্য দিল্লী শ্মশান! সে হিন্দুকুল-কীর্ত্তি সে মুসলমানকুল-গৌরব-স্রোত অনন্ত কালসাগরে মিশাইয়া গিয়াছে; অদ্য দিল্লী শ্মশান! অদ্য এই মহা শ্মশানে লোকবিমোহন প্রাসাদ, লোক-বিমোহন দুর্গ, লোক-বিমোহন মন্দির প্রভৃতির কঙ্কালস্তূপ ইতস্ততঃ গড়াগড়ি যাইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী। ইহার অন্যতর নাম ইন্দ্রপথ। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় ইহা পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল, যথাঃ—পানীপথ, সোনপথ, ইন্দ্রপথ, তিলপথ এবং বাঘপথ। শেষোক্ত বাঘপথ ব্যতীত অন্য পথ-চতুষ্টয় যমুনার পশ্চিম তটে অবস্থিত ছিল। যুধিষ্ঠির বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের নিকট এই পঞ্চ পথেরই অন্যতম পথ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই পঞ্চপথ পাণ্ডবদিগের পঞ্চভ্রাতার আবাস স্থান বলিয়া সাধারণে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রপ্রস্থ কোন্ সময়ে পাণ্ডবদিগের রাজধানী ছিল, তাহা সূক্ষ্মরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই। জেনারেল কানিংহাম, এই সময় খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য মতের সহিত কানিংহামের এই মতের

† Bishop Heber's Journal Vol. II p. 290.

একতা লক্ষিত হয় না। সাধারণ কিম্বদন্তী অনুসারে মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। এই মহাভারত রামায়ণের পরসাময়িক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত *। ইতালীয় পণ্ডিত গোরিসিও রামায়ণ রচনার কাল খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নিবেশিত করিয়াছেন†। মনিয়ার উইলিয়ম্‌সের মতানুসারে রামায়ণ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছে ‡। যাহা হউক; রামায়ণের সময় এইরূপ পরস্পর-বিসম্বাদী হইলেও উহা যে মহাভারতের অগ্রে প্রণীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এক্ষণে গোরিসিওর মতানুসারে যদি রামায়ণকে খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে মহাভারতের সময় খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী অপেক্ষা অনেক আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সময়ও খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর নিম্নগামী হইয়া উঠে। পরন্তু ভট্ট মোক্ষমুলর লিখিয়াছেন, বেদে মহাভারত বর্ণিত কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের কোনও উল্লেখ নাই। কোল্‌ব্রুক প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন বেদসংহিতার কাল খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী নিরূপণ করিয়াছেন *। সুতরাং এই প্রমাণ অনুসারে মহাভারত ও যুধিষ্ঠিরের সময় খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরে নিবেশিত হইতেছে। এই সমস্ত কারণে অনেকে কানিংহামের মতে আস্থাবান্ হইবেন না। যাহা হউক; আমরা বিষয়ান্তরগত তর্কের অবতারণা করিয়া প্রস্তাবটি ভারাক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করিনা। গবেষণা-প্রিয় পণ্ডিতবর্গ যতই বিভিন্ন মত উপন্যস্ত করুন না কেন, যুধিষ্টির যে রামায়ণের পরে ও খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তদ্বিষয়ে বোধ হয় অনেকেই সন্দিহান হইবেন না। আমরা এস্থলে কেবল এই কথা বলিয়াই প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

ভাগবত পুরাণ অনুসারে যুধিষ্টির ইন্দ্রপ্রস্থের প্রথম রাজা। যুধিষ্ঠিরের পর তদীয় ভ্রাতা অর্জ্জুনের বংশধর-গণের ৩০ জন ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে

---

* কেহ কেহ আবার মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন, কিন্তু এই মতের প্রতি অনেকের আস্থা নাই।

† Christian Observer Aug. 1850. p 375.

‡ Indian Wisdom p. 319.

* Maxmuller's Ancient Sanskrit Literature P. 46.

Colebrook's Missellaneons Essays" Vol I (Ed. By E. B. Cowell) P. 99, or As. Res, Vol VIII. P. 493.

Wilson's "Introduction Rigveda", P. 48

অধিরোহণ করেন। সর্ব্বশেষ ভূপতির নাম ক্ষেমক। রাজাবলি অনুসারে এই ক্ষেমক স্বীয় মন্ত্রী বিশ্ব রায় কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন। বিশ্বরায়ের বংশধর গণের ১৪ জন ৫০০ বৎসর কাল পাণ্ডবদিগের রাজ্য ভোগ করেন। ইহার পর ইন্দ্রপ্রস্থ গৌতমবংশীয় দিগের অধিকৃত হয়। ১৫ জন গৌতমবংশীয় নৃপতির রাজত্বের পর উহা আবার ময়ূর-বংশীয়দিগের অধিকারে আইসে। এই ময়ূরবংশীয় সর্ব্বশেষ নরপতির নাম রাজ পাল। ইনি কমায়ুন দেশের অধিপতি শকাদিত্যের সহিত সমরে নিহত হয়েন। কানিংহাম বলেন, এই শকাদিত্য কমায়ুন-রাজের প্রকৃত নাম নহে। সম্ভবতঃ উহা শকজাতির অধিপতির দ্যোতক। কারণ সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য এই শক প্রভু শকাদিত্যকে সমরে পরাজিত করিয়া শকারি নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। যাহাহউক; কিম্বদন্তী অনুসারে এই শকরাজ শকাদিত্যের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লী নামে পরিণত হয়। এই নাম পরিবর্ত্তনের কোন প্রামাণিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়না। প্রথিত আছে, দিল্লীপ নামক জনৈক চন্দ্রবংশীয় নৃপতি একটী নগর স্থাপিত করিয়া উহার দিল্লী নাম দেন। এই দিল্লীপ পঞ্চপাণ্ডবের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ। কিন্তু এই কিম্বদন্তী নিরবচ্ছিন্ন মানব-কল্পনা-সম্ভূত। ইহার সহিত কোনরূপ প্রকৃত ঘটনার সংশ্রব নাই। দিল্লী নাম নিঃসন্দেহ ইন্দ্রপ্রস্থ অপেক্ষা আধুনিক। কুরুপাণ্ডবের সময়ে সাধারণতঃ ইন্দ্রপ্রস্থ নামেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি পাণ্ডবদিগের ঊর্দ্ধতন পুরুষের স্থাপিত বলিয়া দিল্লীর নামকরণ হইত তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরদিগের গমনকালে তদীয় রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের পরিবর্ত্তে দিল্লীনামেই সর্ব্বত্র পরিচিত হইত।

অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক প্রবাদ অনুসারে দিল্লী অথবা ঢিল্লী দিলু অথবা ঢিলুনামক জনৈক রাজার নাম হইতে উদ্ভূত। কোন্ সময়ে এই দিলু দিল্লী নগর স্থাপন করেন, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। ফেরিস্তার মতানুসারে রাজা দিলু ৪০ বৎসর রাজত্বের পর কমায়ুনরাজ ফর অথবা পোরসের সহিত সমরে পরাজিত ও নিহত হয়েন। এই পোরসই পঞ্জাবে সুবিখ্যাত সেকন্দর সাহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক প্রমাণের সহিত যদি ফেরিস্তার লিখিত এই বিষয়ের সামঞ্জস্য লক্ষিত হইত, তাহাহইলে অনায়াসে ইহা অবলম্বন করিয়া দিল্লীর প্রাচীনত্ব নিরূপণ করিতে পারা যাইত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই ফেরিস্তা প্রাচীন ঘটনাবলির সময় নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অনেক স্থলে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে পোরসকে সেকন্দর সাহের সমকালীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই পোরসের ভ্রাতৃপুত্র জুনাকে খৃষ্টীয় ২২৬ অব্দে আনয়ন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আবার অন্য স্থলে জুনার সম-

কালিক সামনী বংশের সংস্থাপয়িতা আর্দ্দসির বাবখান উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এইরূপ এক-পর্য্যায়-নিবদ্ধ ঘটনার সহিত বিভিন্ন সময় অনুস্যূত হওয়াতে ফেরিস্তার লিখিত ঐতিহাসিক সত্য অনেক স্থলে প্রসাদ-সঙ্কুল বোধ হয়। যাহাহউক ঘটনা অংশে ফেরিস্তা বর্ণিত কমায়ুনরাজ ফর কর্ত্তৃক রাজা দিলুর পরাজয়ের সহিত শকাদিত্য কর্ত্তৃক রাজপালের পরাভবের বিশিষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে। অন্যান্য স্থানের কিম্বদন্তীর সহিতও ইহার বিশিষ্ট একতা লক্ষিত হয়। গোয়ালিয়র-নিবাসী খড়্গা রায় নামক জনৈক ভাট মোগল-সম্রাট সাজাহানের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, কলির তিন হাজার বৎসর গত হইবার পর (খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দে) পাণ্ডুবংশীয় শেষ রাজা নীলাঘপতি দিল্লীর অধিপতি ছিলেন। ঐসময়ে শঙ্খধ্বজ নামে জনৈক রঘুবংশীর রাজা সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তাহাকে আক্রমণ করেন। উভয়ের মধ্যে ১৭টা যুদ্ধ হয়। পরিশেষে নীলাঘপতি ৪৪ বৎসর রাজত্বের পর সমরে পরাজিত ও নিহত হয়েন। সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য আবার এই শঙ্খধ্বজকে যুদ্ধে নিহত করিয়া দিল্লীর অধিপতি হয়েন, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের বংশধরগণ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন নাই। তাঁহারা ৭৯২ বৎসর ব্যাপিয়া উজ্জয়িনীতেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ৭৯২ বৎসর কাল দিল্লী লোক-বসতি-শূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে। পরিশেষে (৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) তুয়ার-বংশীয় বিলাসদেবের (নামান্তর অনঙ্গপাল) সময়ে দিল্লীতে পুনর্ব্বার লোক-সমাগম হয়। তুয়ার-বংশীয়গণের পরে চোহান-বংশীয় বিশাল দেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

খড়্গরায়ের এই বিবরণ ব্যতীত রসিদুদ্দীন প্রণীত মোজমলাৎ তোয়ারিফ গ্রন্থে এইরূপ আর একটী গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। গল্পটী এই :—"রাসল নামক হিন্দুস্থানে জনৈক নৃপতি কোন বিদ্রোহী কর্ত্তৃক সিংহাসন হইতে তাড়িত হয়েন। পরিশেষে বর্কমার্য্যের সহিত যুদ্ধে এই বিদ্রোহীর পরাজয় হয়। রসিদুদ্দীনের রাসল এবং বর্কমার্য্য সম্ভবতঃ রাজপাল এবং বিক্রমাদিত্যের অপভ্রংশ। পরন্তু খড়্গারায় যাঁহাকে 'শঙ্খধ্বজ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত অনায়াসে শকাদিত্যের অভিন্নতা রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু খড়্গারায়ের নীলাঘপতির সহিত রাজপাল কিম্বা দিলুর কোনও সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। যাহাহউক, ফেরিস্তা, খড়্গা রায় ও রসিদুদ্দীনের বর্ণিত বিবরণ যখন পরস্পর অংশতঃ সমন্বসীভূত হইতেছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, দিল্লীর সংস্থাপয়িতা একসময়ে শকনৃপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং বিক্রমাদিত্য এই শকনৃপ-

তিকে সমরে পরাজিত করিয়া শকারি নামে প্রথিত হয়েন। বোধ হয় ফেরিস্তা রাজপালেরই নামান্তর দিলু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কানিংহাম ফেরিস্তার মতানুবর্ত্তী হইয়া স্থির করিয়াছেন, বিক্রমাদিত্যের সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দে দিল্লীর নামকরণ হয়। টলেমী স্বপ্রণীত গ্রন্থে দিল্লীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, দিল্লী নাম অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ—

শারদীয় জলদখণ্ড।

১

জল-গর্ভ বরষায় দেখেছি গগন-গায়
তোমারে, জলদ, আমি রজনী দিবায়;
সেরূপ এখন্ কই? বদল হয়েছে অই;
সে রূপ এ নব রূপে হারে তুলনায়!
দেখিতেছি ঘন ঘন, তুমিই যে সেই ঘন,
এরূপ বিশ্বাস বশ করে না আমায়;
বাস্তবিক, তুমি সেই, সম্মুখে যা হেরি এই?
তুমিই কি সেই এই গগণের গায়?
বল রে জলদ, বল, সুধাই তোমায়?

২

আঁখি ভরে, প্রাণ খুলে, উচুঁ পানে মুখ তুলে
এবে যে তোমারে হেরি—আশা না ফুরায়;
তখন হেরিলে পরে, তোমারে গগন পরে,
আজের এ সুখ তুমি দিতে কি আমায়?
কালিমাখা ভয়ঙ্কর, নভোগ্রাসি-কলেবর,
যে দিকে তাকাই—দেখি সে দিকে তোমায়
গরজিতে ঘোর ডাকে, জলধারা লাখে লাখে
পীড়িত প্রবল বেগে ধরণীর গায়।
আতঙ্কে যেতাম ছুটে, ধারা গুলো গায়ে ফুটে,
জ্বালাইত—তাড়াইত আশ্রয় বথায়?
তুমিই কি সেই এই গগনের গায়?

৩

দুদিন না যেতে যেতে, রূপের পসার পেতে,
ভুলাইলে, বহুরূপী, নিমেষে আমায়;
একেবারে রূপান্তর, কিছুই তেমনতর,
এ শরতে, জলধর, নাই রে তোমায়!
বরষায় এই খানে, চেয়েছি তোমার পানে,
আজিও রে এই খানে আঁখি মোর চায়;
সেই তুমি, আঁখি সেই; কিন্তু সেই ভাব নেই
আজের ভাবের ভাব কি কব কথায়?
সরে না মনের ভাব ও তোর শোভায়।

৪

সে দিন দেখেছি তোরে আকাশের গায়,
যত দূর দৃষ্টি যায়, অভিন্ন অসীম কায়;
সে ভীষণ রূপ ভাল লাগে না আমায়।
আজের যেরূপ তোর, মানস করিল ভোর,
ফেরে না নয়ন-যোড় ত্যজিয়ে তোমায়!
নূতন নূতন বই, পুরাতনে সুখী নই,
নূতন জিনিস পেলে, নয়ন জুড়ায়।
রে জলদ, তাই আজ, নূতন নূতন সাজ
কে, বল, পরালে তোর মনোহর গায়?
আমার মনের কথা, মনেই রয়েছে গাঁথা,

কি আশ্চর্য্য, কে কহিল একথা তাহায় ?
অবশ্য সর্ব্বজ্ঞ সেই, সন্দেহ কি তায় ?

৫

মরি, কি সুন্দর দেহ, অতুল আনন্দ-গেহ,
অনন্ত আকাশ মাঝে ধীরে ভেসে যায় ;
সুনীল সাগর-নীরে ভাসে কিরে ধীরে ধীরে
গিরি-চূড়া ?—অসম্ভব, কে বিশ্বাসে তায় ?
ভারতে কি রাম আছে, ভাসা'বে শিলায় ?
ও নয় ভূধর-খণ্ড, ও যে রে বাষ্পের পিণ্ড,
দেখিতে ওজনে ভারী, কিন্তু লঘু-কায়,
বিজ্ঞানের কথা এই ; সে কথায় কাজ নেই,
বিজ্ঞান নীরস শাস্ত্র, কে তাহারে চায় ?
কবি যাহা বলে ওরে, বিশ্বাসি তাহায়।

৬

ভারত-গৌরব-রবি কালিদাস মহাকবি
আঁকিল যেরূপে ওরে দৈবী তুলিকায় ;
ব্রিটনীয় কবি শেলি তেজাল সুরঙ্গ ঢালি,
আঁকিল যেরূপে ওরে, তাই চিত চায়।
বিজ্ঞানেতে বৈজ্ঞানিক একেবারে অরসিক,
সুধারে গরল করে ; ভাল যেটি পায়,
সেটিরে খারাপ করে, তবে রে কেমনে তারে
ভাল বলি ?—কবি-শত্রু—ধিক্ সে জনায় !

৬

শরতের জলধর, কবিকুল-প্রিয়তর
তুই রে ; কবিই তোরে সুন্দর সাজায় ;
বিজ্ঞানবিতের কর করে তোরে জর জর,
এমন বিদ্বেষী নর আছে কি ধরায় ?
যারে দেখে সুখ লভি, যারে প্রিয়তর ভাবি,
যার মনোহর ছবি মোহিছে আমায় ;
কবিকুল যার তরে সদাই ভ্রমণ করে,
বৈজ্ঞানিক অরসিক বাষ্প বলে তায় ?
নকুল অহির ভাব তাই দুজনায়।

৭

ভাবুক জনের চিত, কর তুমি বিমোহিত,
ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধরি নব নব কায় ;
ভব-রঙ্গভূমি মত বদলিছ অবিরত ;
বহুক্ষণ একভাবে দেখি না তোমায়।
তোরি বহুরূপ নরে অবস্থা শিখায় ?
কখন মুকুট পর, কভু ম্লান কলেবর,
কখন বিজলী হার চমকে গলায় ;
কভু শোভ স্তরে স্তরে, কভু এক কলেবরে
কভু এ সুন্দর দেহ আকাশে মিলায়
তোরি বহু রূপ নরে অবস্থা শিখায় !

৮

অস্তগামী দিবাকর ঢালি নানারঙ্গি কর,
তোরে লয়ে কত রঙ্গে আকাশে খেলায় ;
এ কালের ভাব হেরি, রেতে ছায়াবাজী-
কারী
রসায়ন-দীপে ছবি দেয়ালে খেলায় ;
রবি, তুই শিক্ষা তার—সন্দেহ কি তায় ?
তোরি মত, জলধর, মনে মোর ভাবান্তর,
কতই ঘটিছে—আমি কি কব কথায় ?
কভু ভাবি মনে মনে, ব'সে আছি সিংহাসনে,
কখন এ দেহ মোর ধূলায় লুটায় !
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায় !

৯

আদর্শ করিয়ে তোরে, এ অনন্ত ভব ঘোরে,
ঘুরিছে আমার মন প্রতি লহমায় ;
কখন ভূতলে ছুটে, কখন আকাশে উঠে,
কখন সাগর-জলে হাবু ডুবু খায় !
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায় !
কেবল আমিই নই, বাঙ্গালি মাত্রেই তাই,

নিরেট পাগল, মেঘ, সন্দেহ কি তায় ?
নাশিতে দেশের দুখ, বাক্যে হয় শত-মুখ,
কবন্ধের মত কিন্তু কাজের বেলায় ?
নিরেট পাগল এরা বিশাল ধরায়।
বালক-ক্রীড়ার মত, সভা করে কত শত,
বক্তৃতা বিতর্ক তর্ক যেমনি ফুরায়,
আকাশ কুসুম সম শেষটা দাঁড়ায় !
কারে বলে দেশোন্নতি, নাহি জানে এক রতি
সকলি সম্পন্ন করে কথায় কথায় ;
দরিদ্র স্বজাতি যারা, নিরাহারে যায় মারা,
ভুলেও তাদের পানে ক্ষণেক না চায় !
কিন্তু তৈল ঢালে তৈলাক্ত মাথায়।

১০

কিসের, কিসের বাধা ? সাহেবে চাহিলে চাঁদা.
সহস্র অযুত লক্ষ অনাসে বিলায় ;
হায়, একি অবিচার, কার টাকা হয় কার,
পরধনে পোদ্দারীর এই ব্যবসায় ;
ধনীরা প্রজার ধনে ধনিত্ব ফলায় !
'রাজা', 'রায় বাহাদুর' লভিতে বাঙ্গালি শূর
ছিছি রে, জীবন কাটে 'ইংরেজ সেবায় !'
খানিক কাগজ দিয়ে, রাশি রাশি টাকা নিয়ে
চতুর ইংরেজ বেস্ চাতুরী খেলায় !
বাঙ্গালি বিষম বোকা বিশাল ধরায় !

১১

বাঙ্গালি বিষম খেপা, বধূর বিননী খোঁপা,
সাদরে ধরিয়ে, ফুল বসায় তাহায় !
এ দিকে নিজের শিরে, ছিছিরে, ছিছিরে,
ছিরে,
বিলাতী পাদুকা, ছিছি, বহে লয়ে যায় !
বাঙ্গালি পাগল শুধু ?—অধম ধরায় !
বাঙ্গালির কত গুণ, মুখে মাখে কালি চূণ,
স্বজাতির মন্দ বই ভাল নাহি চায় ;
হাত পা সকলি আছে, তবু বিলাতের কাছে,
কি লজ্জা ঢাকিতে লজ্জা বস্ত্রখানা চায় !
এমন নিরেট বোকা দেখেছ কোথায় ?
বাঙ্গালি নিরেট বোকা, বুকে ভয়, মুখে রোখা
সকল লক্ষণ গুলি পাগলের প্রায়।
কতকাল এই ভাবে বাঙ্গালি-কুলের যাবে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায় ?
রে মেঘ বরষাকালে, কি ছিলে গগন-ভালে,
এবে বা কেমন তুমি আকাশের গায় ;
কতকাল এই ভাবে কিন্তু বাঙ্গালির যাবে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায় ?
না ফিরিলে,—কে ফিরাবে কে হেন ধরায় ?

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

নবাব সেরাজুদ্দৌলা ; ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা ক...প্রেসে মুদ্রিত। সন ১২-৮৩ সাল।

যে মহা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে বঙ্গরাজ্য মুসলমানদিগের হস্ত হইতে সভ্যতাভিমানী ইংরাজগণের কর-কবলিত হয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি

প্রণীত হইয়াছে। ইহাতেও সাক্ষ্য দিতেছে কতিপয় প্রধান প্রধান বাঙ্গালীগণই এই ষড়যন্ত্রের সৃষ্টিকার, প্রতিপোষক এবং সিদ্ধিদাতা। ইংরাজগণ সকলেই এক্ষণে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাদিগের কৃতজ্ঞতার পরিচয় উমিচাঁদের পুরস্কারে বিলক্ষণ প্রকাশিত আছে। আজিও প্রতি দেশে ও প্রতি জেলায় গিয়া দেখ, ইংরাজগণ, তাঁহাদিগের ভক্ত বাঙ্গালীজাতির প্রতি প্রতিদিন কিরূপ ব্যবহার করিতছেন। তাঁহারা না বলিয়াছিলেন বাঙ্গালীজাতির অভিধানে কৃতজ্ঞতা-ব্যঞ্জক কোন শব্দ নাই? ধন্য ইংরাজ জাতির কৃতজ্ঞতা! তাঁহাদিগের অভিধানে কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক শব্দ আছে বটে, কিন্তু সে শব্দের অর্থ কি, তাহা কেবল ইংরাজজাতির ন্যায় অন্যান্য সভ্যজাতিতেই বলিয়া দিতে পারেন।

একচক্ষু মেকলে এবং তৎ-সদৃশ অন্যান্য ইংরাজী ইতিহাস-বেত্তাগণ সেরাজুদ্দৌলা, ক্লাইব, মীরজাফর, উমিচাঁদ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণকে যেরূপে বর্ণিত করিয়াছেন, লক্ষ্মী বাবুর নাটকে তাহার অনুরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ চিত্র মেকলে প্রভৃতি ইংরাজ ইতিহাস লেখকের সমুচিত বটে, কিন্তু বাঙ্গালী চিত্রকরের সেই চিত্রের আদর্শে চিত্র প্রস্তুত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের নবীন চিত্রশালিকা ভূষিত করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না, অথবা তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ইংরাজী চিত্রের যাথার্থ্য কতদূর, তাহার কি অন্য প্রমাণ আবশ্যক নাই? যদি আবশ্যক থাকে তবে ইংরাজী-চিত্র আজি ঠিক বলিয়া কখনই গ্রহণীয় হইতে পারে না। যাহাই হউক, ইংরাজীচিত্র যদি ঠিক বলিয়া ধর্ত্তব্য হয়, তবে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর নাটকীয় চিত্র গুলি যে ঠিক হইয়াছে তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সেরাজুদ্দৌলা, উমিচাঁদ, মীরজাফর, ক্লাইবকে দেখিলে মনে হয় আমরা যেন মেকলের চিত্রই দেখিতেছি; তাহার বিন্দু বিসর্গ প্রভেদ নাই। এই আদর্শ ধরিয়া অবশ্য বলিতে হইবে, লক্ষ্মী বাবুর ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের চরিত্র যেরূপ সুরক্ষিত হইয়াছে, এরূপ বাঙ্গালা সাহিত্যে অধিক দেখা যায় না।

কিন্তু তাঁহার ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের সংখ্যা অনেক। এত ব্যক্তির একত্র সমাবেশ প্রায় নাটকে সচরাচর দেখা যায় না। যে নাটকে এত ব্যক্তির সমাবেশ, সেখানে যে কাহারই চরিত্র সম্যক্ চিত্রিত হইবে না, এই রূপই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এ নাটকে তাহাই ঘটিয়াছে। এক এক জন রঙ্গভূমিতে সং সাজিয়া আসিতেছেন, আর অমনি অদৃশ্য হইতেছেন; কেহই মনোমধ্যে নিজ নিজ ভাব অঙ্কিত রাখিয়া যাইতে পারেন না। তন্মধ্যে কেবল সেরাজুদ্দৌলা, মীরজাফর, উমিচাদ, ক্লাইব এবং রায়দুর্লভ কথঞ্চিৎ

নিজ নিজ ভাব অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছেন।

এ নাটকে লক্ষ্মী বাবু চিত্র কার্য্যের যেরূপ আধিক্য দেখাইয়াছেন, রচনায় সেরূপ নহে। তাঁহার রচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে গোসাঁই দাস এবং স্ত্রীগণের মধ্যে সত্যবতীই প্রধান। কিন্তু গোসাঁই দাস এক জন সামান্য ব্যক্তি; তাহার চরিত্রের বৈশেষ্য কিছুই নাই। তিনি নাট্যব্যাপারে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, ব্যক্তি মাত্রেই তদবস্থায় সেইরূপ করিয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যেতে লোকের চরিত্র প্রকাশ হয় না; মনুষ্যেরই প্রকৃতির ভাব প্রকাশ হয়; কিন্তু যিনি যে ভাবে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; যেরূপ চিন্তা করেন, যেরূপ যাঁহার কার্য্যের গতিক, এবং সেই কার্য্যে অভিযুক্ত থাকিয়া কিরূপ নিজ প্রকৃতির পরিচয় দেন, তাহাই সুন্দর রূপ বর্ণিত হইলে, তবে নাটকীয় ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা হয়। হ্যাম্‌লেট্ ইহার দৃষ্টান্ত। নহিলে লক্ষ্মী বাবুর নন্দ যেমন, গোসাঁই-দাসও তেমনি। উভয়েরি কার্য্যে কেবল মনুষ্য-প্রকৃতির পরিচয় হয়; তাহাদিগের বিশেষ চরিত্রের কিছুই পরিচয় হয় না। নন্দ রাজপুত্র, এই জন্য একটু সাহসী ও তেজীয়ান্, গোসাঁইদাস সামান্য ব্যক্তি এবং নবাবের সহিত তাহার বৈরতাসাধন, এই জন্য তাহাকে অনেক সতর্ক ও সাবধানে চলিতে হইয়াছিল। নহিলে বলিতে গেলে, গোসাঁই নবাবের আমলেরই নন্দ; নাটক-মধ্যে ইহাদিগের কাহারই চরিত্র নাই। মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতির পরিচয় এবং তাহার বিশেষ প্রকৃতির পরিচয়, এই দুইটী স্বতন্ত্র বিষয়। গোসাঁইদাসের সাধারণ-প্রকৃতির পরিচয়ের মধ্যে আমরা তাহার বিশেষ প্রকৃতির পরিচয় কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। আর সত্যবতী; তিনিত একাধিক সহস্রতম বাঙ্গালী সতী।

লক্ষ্মী বাবু নাটকীয় স্বগত বাক্য রচনায় একজন উৎকৃষ্ট লেখক। তাঁহার পূর্ব্ব-রচিত নন্দবংশোচ্ছেদ এবং কুলীন-কন্যায় উহার পরিচয় আছে। এ নাটকেও তিনি সেই প্রকার রচনার গৌরব সমান রক্ষা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটি স্বগত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নবাবের অন্তঃপুর-অবরুদ্ধা সত্যবতীর মনের সুন্দর ভাব দেখুন:—

"আঃ সত্য! আঃ অভাগিনী সত্য! যে জহরত তুমি জন্মে কখন দেখ নাই, সেই হীরা পান্না আজ এই ছড়াছড়ি, যে একটি মুক্তার তরে তুমি লালায়িত হয়েছিলে, আজ হাজার হাজার সেই মুক্তা তোমার চরণতলে। পর সত্য, গহনা পর, একবার অমূল্য রত্ন অঙ্গে ধারণ করে জীবন সার্থক কর। একখানি ছোট আর্‌শিতে দিবানিশি তোমার প্রাণ পড়ে থাক্‌ত, আজ শত শত প্রকাণ্ড দর্পণ তোমার চারিদিকে। দেখ সত্য, একবার মনোহর মুখখানি দেখ। একবার তিল তিল করে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কর, একবার নির্জ্জনে ব'সে আপনার রূপে আপনি মোহিত হও। হতভাগিনি! এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, হীরা

মুক্তায় সুখ নাই, অহঙ্কারে সুখ নাই; রাজরাণীর যে সুখ নাই, ভিখারিণীর ও সে সুখ আছে। হায়! অভিমানই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। আমি সুন্দরী লোকে আমায় সুন্দরী বলে, আমায় দেখ্‌লে মুনিরও মন টলে—কেন এই চিন্তায় আমার আমোদ হত? কেন বেস বিন্যাসে আমার তত অনুরাগ ছিল? পথের লোক হাঁ করে চেয়ে থাক্‌বে বলে, কেন আমি জানালায় বসে থাক্‌তে ভাল বাস্‌তেম? হায়! রূপ-গর্ব্বেই আমার সর্ব্বনাশ হল! নহিলে আমার এ দুর্দ্দশা হ'ত না, আমিই আমার সর্ব্বনাশের মূল!"

লক্ষ্মীবাবুর নাটকাবলির আর একটি গুণ এই, তাঁহার গ্রন্থ-মধ্যে ধর্ম্মনৈতিক ভাব বিশিষ্টরূপে প্রবল থাকে। যে কোন বিষয় বর্ণিত হউক না কেন, তন্মধ্যে ধর্ম্মনৈতিক ভাব প্রবিষ্ট করিয়া তাহা প্রবল করিয়া দিলে, তাহাতে যে গ্রন্থ পাঠে শুভ ফল উৎপন্ন হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। লক্ষ্মীবাবুর গ্রন্থাবলিতে এই গুণটি বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। নাটকের বিষয় সমুদায় পাপময়, কি নবাবী রাজভবন, কি ক্লাইবের ও মীরজাফরের ষড়যন্ত্র এবং চরিত্র সকলই দূষিত ও অধর্ম্মে কলঙ্কিত, বাস্তবিক গ্রন্থের সমগ্র বিষয়-ভূমিই পাপময়, কিন্তু তন্মধ্য হইতে অবশেষে সত্যবতীর উদ্ধার, নবাবের পতন, গৌরাইদাসের কার্য্যসিদ্ধি, ধর্ম্মের জয় বিলক্ষণ মনে প্রতীত হয়। ক্লাইবের কার্য্যসিদ্ধি এবং উল্লাস উমিচাঁদের মনোভঙ্গ-জনিত বুদ্ধিনাশে যেন ভৎর্সিত হইতেছে। পাঠক উমিচাঁদের জন্য দুঃখিত হইয়া দুর্জ্জন ক্লাইবকে শত বার তিরস্কার করিতে উদ্যত হয়েন। যে রাজ্যস্থাপনের মূলে এই রূপ অধর্ম্ম তাহার পরিণাম যে কিরূপ হইবে তাহা ভবিষ্যতই জানেন। সেই অধর্ম্মকে ভৎর্সনা করিবার জন্যই যেন, গ্রন্থকার প্রধান নাট্যব্যাপারকে একটু প্রবৃদ্ধ করিয়া উমিচাঁদের মনোভঙ্গের চিত্র রঙ্গভূমিতে অবতারিত করিয়াছেন। ইহা তো উমিচাঁদের লোভের পরিণাম নহে, ক্লাইবের সমুচিত তিরস্কার। যিনি তাঁহার উন্মত্ততায় লোভের দণ্ড দেখেন, তিনি আজিও ধর্ম্মরাজ্যের জটিল গ্রন্থের উচ্ছেদ করিতে শিখেন নাই। বিশ্বরাজ্যের ধর্ম্ম-কৌশল এই রূপ জটিল। ইহার এক কৌশলে শত শত কার্য্য সম্পাদিত ও ফলাফল প্রদত্ত হইতেছে।

আর আমরা এ সমালোচনা প্রবৃদ্ধ করিব না। উপসংহার কালে অবশ্য স্বীকার করিব যে এ নাটক খানির ভাষা অতি উত্তম এবং নাটকীয় ব্যক্তিগণের কথোপকথনে জীবিত ভাব বিদ্যমান দেখা যায়।

মিত্রোদয়—ইংরাজী এবং বাঙ্গালা মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীহিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵৹ আনা মাত্র। আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত। আমরা

ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠ করিলাম। ইহাতে তিনটী প্রবন্ধ লিখিত আছে—Education and toleration, সুন্দর-বনের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও শাক্য সিংহ। তিনটীই অসমাপ্ত, ক্রমশঃ প্রচারিত হইবে। সম্পাদক পৃষ্ঠদেশের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "মিত্রোদয়ের আকার, অতি স্বল্প বলিয়া আমরা ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার ভূমিকা লিখিতে পারিলাম না। তবে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, এই পত্রে সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের বিবিধ প্রবন্ধ ব্যতীত, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদও থাকিবে"। আমরা এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া আনন্দে অভিভূত হইলাম। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যসমাজে যাঁহারা সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই এরূপ সর্ব্বভাষা ও সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী বলিয়া আপনাকে খ্যাপন করিতে পারেন নাই। আমরা কখন বঙ্গভাষায় দেবভাষা সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতির অন্তর্নিহিত রত্নরাজির একত্র সমাবেশ দেখি নাই। হিরণ্ময় বাবু যদি সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদিগকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বঙ্গবাসিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

"শিক্ষা ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা প্রবন্ধে লেখক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আমরা ভারতকে আর প্রাচীন কালের ন্যায় পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে ও ললাটে পারলৌকিক ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ দেখিতে চাহিনা। ঐহিক বিষয়ের অনুসরণে প্রকৃত উন্নতি নাই—এ মত আমরা আর ভারতে পুনঃ প্রচারিত করিতে চাহি না। এই ভয়ঙ্কর মতের অনুসরণেই ভারতের আজ এ দুর্গতি! ঐহিক সুখের অনুসরণেই ইউরোপের আজ এত উন্নতি! ইউরোপের উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নহে—একথা অশ্রদ্ধেয় যেহেতু প্রত্যক্ষ-বিলোপী। সুতরাং 'ভারতে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মোন্মাদ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে,—এ সংবাদ আমাদিগের নিকট অশুভসংবাদ নহে।

'সুন্দর বনের প্রাচীন ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধটী মন্দ নহে। 'শাক্য সিংহ' এটী কবিতা, মধুসূদনের অনুকরণে অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে লিখিত। লেখক এই অনুকরণে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহার দ্বারা শুদ্ধ যে তাঁহার অক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে এরূপ নহে; শাক্যসিংহ—জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতৃগণের মধ্যে যাঁহা অপেক্ষা উচ্চতর আসন গ্রহণের অধিকারী আর কেহই নাই, সেই শাক্যসিংহের অত্যুচ্চ চরিত্র তাঁহার তুলিকায় বিকৃত হইয়াছে। যে অত্যুচ্চ চরিত্র স্পর্শ করিতে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের লেখনীও সাহস করে নাই, সে চরিত্র স্পর্শ করিতে যাওয়া সামান্য কবির পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

মনুষ্যবংশ।

দিনমণি! এই উজ্জ্বল গগণতল পরিশোভিত করিয়া বসুন্ধরার প্রতি হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে এক চক্রপথে আজি তুমি এই উদয়গিরি পরিত্যাগ করিয়া অস্তগিরি মুখে গমন করিতেছ, আমরা চাহিয়া দেখিতেছি; এইরূপে তুমি কতবার গিয়াছ, কতবার আসিয়াছ, কতবার যাইবে আসিবে এবং এইরূপে মনুষ্য-নয়ন তোমাকে কতবার নিরীক্ষণ করিয়াছে, আবার করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু যে দিন তোমার কিরণ-প্রতিভাতে প্রথম প্রভাত হইতে দৃষ্টি করিয়া মানবচিত্ত বিগলিত হৃদয়ে হর্ষ-ভয়-বিমিশ্রিত লোচনে বক্ষার্পিত করে স্রষ্টার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিয়াছিল "প্রভু! এই আমি উপস্থিত, কি নিমিত্ত আমার আবির্ভাব, আমাকে কি করিতে হইবে বল" সে দিন তুমি কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? অথবা যে দিন তোমার প্রথম অস্তগমন দর্শনে বিক্ষুব্ধ ভাবে তারকামালা-বিভূষিতা স্তিমিতা লোকময়ী অবনীর নৈশ বসন দেখিয়া ভয়-বিহ্বল চিত্তে তোমার পুনরাগমন কামনা করিয়াছিল বা শারদ-শোভা-মণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র দর্শনে তোমার বিরহ-দুঃখ কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছিল, সেই দিনই বা কোথায় রাখিয়া আসিলে? তুমি ত আসিতেছ যাইতেছ, কতবার আসিবে যাইবে, কিন্তু তোমার সে দিনটি কোথায়? সে দিন কি আর ফিরিবে?—আর ফিরিবে না, দিন যাইবে, মাস যাইবে, বৎসর যাইবে, যুগ গত হইবে, সূর্য্য! তুমি তোমার সহচরীবর্গ সহ আবার পরমাণুতে মিশিবে, শূন্যে মিশাইবে, তথাপি সে দিনটিকে ফিরাইতে পারিবে না। উহা স্মৃতিরও দর্পণ-তল হইতে লুপ্ত, ভূত সাগর-গর্ভে অন্ধতম গুহায় নিহিত।

যাহা স্মৃতির আয়ত্ত হইতেও অতীত, তখন আর কি অবলম্বনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে?—তথাপি কেন চিত্ত তদালোচনায় এতদূর ব্যাকুলিত? যাহা ভূতগর্ভে নিহিত, যাহা চিরদিনের মত গতাশু এবং শাস্ত্রের অগম্য,—তথাপি তাহা আয়ত্ত করিতে আমাদের কেন এত যত্ন? উহা মানব-চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমরা কোমল উজ্জ্বল চক্ষু পাইয়াছি, দিবায় দিনদেব রাত্রিতে নৈশগগন, আলোক দানে অনন্ত বস্তু-মালা সেই নয়ন-পথে প্রতিমুহূর্ত্তে উপস্থাপিত করিতেছেন, এবং নয়ন [illegible] [illegible] [illegible] সাগর-গর্ব্ভস্থিত রত্ন লাভে উৎসুক,—আপাততঃ মৎগৃহীত বিষয় তদ্রূপ হেতু

হেলা করিতে হয়, তাহাও স্বীকার তথাপি অতীত বস্তুর স্পৃহা ক্ষান্ত হইবার নহে। ইহার কারণ কি?—এই সংসার-নাট্যশালায় জীবন-প্রবাহ মহানাটক স্বরূপ। প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক যুগ—এই নাটকের এক এক অভিনেতা। যে কৌশলী এই নাটকের কর্ত্তা তিনিই প্রত্যেক অভিনেতার অভিনয় অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই বৃহদ্ব্যাপারের তুমি বিন্দুমাত্র অংশ অভিনয়ের ভারযুক্ত বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অলসপ্রিয়তায় যদি কেবল আপন অংশ টুকু মাত্র অভ্যাস করিয়া নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হইয়া অভিনয়ে প্রবৃত্ত হও, কোন্ কথার পর কোন্ প্রত্যুত্তর দিবে?—পূর্ব্বগত ভাবের সহিত সামঞ্জস্যে যথায় যে যে রসের উদ্দীপন আবশ্যক তথায় তুমি কি করিবে?—গোলমাল করিয়া সমস্ত পণ্ড করিবে, সুধু আপনি নিন্দনীয় ও তিরস্কৃত হইবে না, মূল বিষয়ও কলঙ্কিত করিবে!—ছি ছি—বড় লজ্জা, বড় ধিক্কারের কথা! তাহা করিও না, পূর্ব্বগত বিষয় জ্ঞাত হও, গৃহীত-ভাব অংশের অপর পক্ষীয় অংশ জ্ঞাত হও—অভিনয়ে সুখ্যাতি লও—কেন তুমি নিন্দা কিনিবে। কি একক মানবীয় চিত্ত, কি তৎসমষ্টিবর্দ্ধিত জাতীয় চিত্ত, উভয়েরই এই আত্ম-তিরস্কার, এই আত্ম-উত্তেজনা, ভূতবিষয় অবগতি-বাসনার মোহমন্ত্র। এ মোহমন্ত্র বলেই পুরাণ ইতিহাসের সৃষ্টি, ইহারই তেজে কাব্য বিজ্ঞান প্রভৃতির উদ্ভব ইহারই উৎসাহে এ সকলের ও অতীত ভূতকালীয় ব্যাপার অবধারণ ও উপলব্ধি করণ হেতু আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই আগ্রহই নিরন্তর আমাদিগকে সেই দিকে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।

এই আত্ম-তিরস্কার, আত্ম-উত্তেজনা প্রতিপোষণ বা অবহেলনের সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল ভারত রোমক ও গ্রীক চিত্ত। সংসার-নাট্যশালায় ভারত—ভরত-ঋষি-প্রণীত লক্ষ্মীনাটকের উর্ব্বশী। উর্ব্বশী অনিন্দিতা অতুলনীয়া, রূপের ভারে ফাটিয়া পড়িতেছে, গুণের গরিমা গগণস্পর্শী, স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশ অভিনয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপন গুণের উপর নির্ভর করিয়া অভ্যাসে বাহিত হইয়া যোগ্য সময় অন্যমনস্কতায় নিয়োজিত করিয়া অনভ্যস্ত উর্ব্বশী যখন নাট্যমন্দিরে স্বামি প্রার্থনায় পৃষ্ট হইলেন, কোথায় নারায়ণ যাচিতে, যাচিয়া বসিলেন পুরোরবা। ভরত ঋষি ক্রোধে শাপ দিলেন অধঃপাতে যাও। স্বর্গগৌরব উর্ব্বশী স্বর্গ বিচ্যুতা হইলেন, স্বর্গাপ্সরা হইয়াও মানবে মন অর্পিত করিয়া, মানব লোকে মানব ধর্ম্ম-বিহারিণী হইয়া, আনুসঙ্গিক সুখ দুঃখের অধীনে জীবন সমর্পণ করিতে হইল। অভ্যাস-বিরহিতা ভারতেরও সেই দশা, উর্ব্বশীর অবস্থায় আর ইহার অবস্থায় প্রতি বিষয়ে তুলনা। বিধাতার মানসী কন্যা বটে—কিন্তু আপন দোষে শেষে পথের ভিখারিণী! আর রোম ও গ্রীক, নিকৃষ্ট

হইলেও অভ্যাসের গুণে এমন বাহবা লইল, যে এক অভিনয়ে ক্ষান্ত নাই, বেশ বদলাইয়া আবার নব্যাভিনয়ে প্রবৃত্ত, চতুর্দ্দিকে, ধন্য ধন্য পড়িতেছে। কি ভাগ্য-বৈচিত্র্য!

মনুষ্য একবংশজ অর্থাৎ আদিতে এক পিতা মাতা হইতে মনুষ্য-বংশের উৎপত্তি কি না এই স্মার্ত্ত ও ঐতিহাসিক কাল বহির্ভূত সাময়িক ব্যাপার অদ্য আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। এতদ্বিষয় অবধারণার নিমিত্ত কেবল বাহ্যিক প্রমাণাদি মীমাংসা-স্থলীয়; কিন্তু তাহা বর্ত্তমানে এখনও এতদূর সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, যে তাহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তথাপি সেই সকলের বর্ত্তমান অবস্থায় যথাবুদ্ধি ও যথাসম্ভব তদ্বিষয়ের আলোচনায় ক্ষতি কি আছে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভূতঘটনা জ্ঞাত হইতে মানব চিত্ত অতিশয় ব্যগ্র। ব্যগ্রতা এত অধিক, যে মূলভিত্তি স্মৃতি বহির্ভূত হইলেও, তাহা কোন না কোনরূপ যথাবুদ্ধি ও যথাআগ্রহ অবধারণ ব্যতীত, জীবন-লীলায় অগ্রসর হইতে পারে না। ইহা কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার আশ্চর্য্য এই যে সেই সকল জাতিরই অবধারিত আদি বৃত্তান্ত কিছু না কিছু অবান্তর ভেদে একই রকমের বলিলে হয়। ইহার কারণ কি, যখন সকলেরই কথার ঐক্য অনেকাংশে দেখা যাইতেছে, তখন তাহা "যথাবুদ্ধি অবধারণা" ইহা স্পষ্ট জ্ঞাত হইতে পারিলেও ঐ শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ বাধ লাগিয়া থাকে। তবে কি সে ঐক্যের কোন সারবত্তা আছে। ভাল, দেখায় ক্ষতি কি? কোন্ জাতি কিরূপ আদি বৃত্তান্ত কল্পিত বা বিবৃত করিয়া থাকে অগ্রে তাহাই পরীক্ষা করা যাউক।

আমেরিকা-দেশীয় আদিম অসভ্য জাতির পোপল বুঃ (Popul Vuh) (১) নামক সংগৃহীত পৌরাণিক গ্রন্থে কথিত আছে, যে আদিতে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র পৃথিবী ইত্যাদির কিছুই ছিল না, কেবল ঊর্দ্ধে আকাশ, নিম্নে দিগন্ত-ব্যাপিনী জলরাশি ব্যাপ্ত ছিল। সেই জল-রাশির উপর দেবতাগণ তপোমগ্ন ছিলেন।

---

(১) এই তত্ত্বটি এবং পরে উদ্ধৃত অপরাপর তত্ত্ব গুলি সমস্তই সংগৃহীত। কোন্ পুস্তক এবং কোথা হইতে সে সকল সংগৃহীত হইল তাহা বিবৃত করিয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অযথা কলেবর বৃদ্ধি করা তত আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না। তজ্জন্য যেন বঙ্গীয় পাঠক মহাত্মাগণ লেখককে অকৃতজ্ঞ বা চোর বলিয়া গণ্য করিবেন না। বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে এখন প্রথা বটে যে শ্রুত এবং দৃষ্ট বহু পুস্তকের নাম গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব মধ্যে সন্নিবেশ পূর্ব্বক স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রচার করা; কিন্তু কি করিব, এ দুর্ভাগ্য লেখকের ভাগ্যে বিধাতা সে পাণ্ডিত্য এবং তজ্জনিত প্রশংসা প্রাপ্তি লিখেন নাই।

অনন্তর তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে জলভাগ অপসারিত হইয়া, রাত্রি দিবা ও বৃক্ষ-পুষ্প ফলাদি ধারণের উপযোগি স্থল ভাগের আবির্ভাব হইল। অতঃপর তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন-সক্ষম জীব সৃষ্টির মানসে কতকগুলি জীবের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু যখন তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন প্রত্যেকে আপিনাপন নাম বলিতে অক্ষম হওয়ায়, তাহাদিগকে পশু আখ্যা প্রদান করা হইল। তৎপরে দেবতারা মৃত্তিকা লইয়া মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহারা জলচর হইল; এবং যদিও বাক্-শক্তি-বিশিষ্ট হইল বটে; তথাপি বুদ্ধি-বৃত্তির অভাবে কোন-কার্য্য-ক্ষম হইতে পারিল না। তাহারা মস্তক এদিক্ ওদিক্ ফিরাইতে পারিত না এবং তাহাদের দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন হইল। অতএব দেবতা-দিগের অভিপ্রায় নিষ্ফল হওয়ায় সমুদ্র সে মানব-বংশ গ্রাস করিয়া ধ্বংস করিল। তৃতীয়বারে দেবতারা কাষ্ঠ লইয়া মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ইহারা শূন্য-হৃদয় ও শূন্য-বুদ্ধি হওয়ায় এবং স্রষ্টার কথা কিছু-মাত্র স্মরণ না থাকায়, সমুদ্র আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ধ্বংস করিল। চতুর্থবারে দেবতারা ঝিটে (tzite) নামক বৃক্ষ লইয়া মানব এবং সিবাক (Sibac) নামক বৃক্ষের মজ্জা লইয়া মানবী সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ইহারাও দেব সমীপে অকৃতজ্ঞ হওয়ায় পূর্ব্ব কথিত রূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই জাতির অবশিষ্ট যাহা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের বংশাবলী অদ্যাপি অরণ্যবাসী বানর জাতিতে দৃষ্ট হয়। পঞ্চমবারে অনেক চিন্তার পর দেবতারা চারি জন মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন। ইহারা তাঁহাদের অভিপ্রায় পরিপূরণ করিল বটে, কিন্তু ইহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও দর্শন-শক্তি এত তীক্ষ্ণ হইল, যে দেবতারা তাহাতে ভীত হইয়া ইহাদের দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন এবং দর্শন-পথের সীমা নিরূপণ করিয়া দিলেন। এই চারি জন মনুষ্য যখন নিদ্রাভিভূত হইল, সেই সময়ে দেবতারা চারিটি পরমাসুন্দরী মানবী সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে স্ত্রীরূপে প্রদান করিলেন। এই চারিটি দম্পতি হইতে কালক্রমে জগতের সমস্ত জাতির উৎপত্তি হইল।

গ্রীকদিগের মধ্যে অর্ফিক্ পুরাণ অনুসারে সৃষ্টি-প্রকরণ নিম্নলিখিত প্রকারে কথিত হইয়াছে। আদিতে এক মাত্র ক্রনস্ (Chronos) অর্থাৎ কাল বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সর্ব্ব নিয়ম-বিরহিত (Chaos) শূন্য হইতে একটি অণ্ডের উৎপত্তি করিলেন। এই অণ্ড ভেদ করিয়া স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ফানিস (Phanes) নামক প্রথম দেবতার উৎপত্তি হইল। ইহা হইতে নিক্স (Nyx) নামক দেবীর জন্ম হইল। এই দেব এবং দেবী উভয়ের সহযোগে ওরেনস (Ouranos) অর্থাৎ আকাশ এবং গিয়া (Gœa) অর্থাৎ পৃথিবী জন্ম গ্রহণ করিলেন। ওরেনস এবং গিয়া স্বামী ও ভার্য্যারূপে ব্যবহার করিয়া ক্রমশঃ

(Kronos) এবং অন্যান্য বহুবিধ দেবতা ও অসুর গণের উৎপত্তি করিলেন। ক্রনস্ আপন ভগিনী রিয়াতে (Rhea) উপগত হইয়া অন্যান্য দেবতার সহ জিউসের (Zeus) জন্ম প্রদান করিলেন। এই জিউস বিশ্বের ঈশ্বর হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ লোক সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে যাহাদের সৃষ্টি হইল, তাহারা নিরোগী ও যদৃচ্ছা আহার প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে ও সুখে ভ্রমণ করিত, এই নিমিত্ত এই জাতির অবস্থিতি-কালকে স্বর্গযুগ কহিয়া থাকে। ইহারা মৃত্যুর পর অশরীরী হইয়া মানবজাতির সৎ অসৎ কার্য্যের পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এইরূপে এজাতির ধ্বংস হইলে যে জাতির সৃষ্টি হইল, তাহারা দুর্দ্দান্ত, ক্রূর-কর্ম্মা ও দেবনিন্দক হওয়ায় অত্যল্পকালে তাহাদিগের নিপাত সাধন হইল। ইহার পরে অ্যাস্ নামক কাষ্ঠে গঠিত আর একজাতির উৎপত্তি হইল, কিন্তু ইহারাও অপরিসীম-বলশালী, দুর্দ্দান্ত, ক্রূরকর্ম্মা হওয়ায় ইহাদিগকে বিনাশের নিমিত্ত সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইল। কেবল প্রোমিথ্যুসের (Prometheus) পুত্র একমাত্র ডুকালিওন (Duekalion) আপন স্ত্রী সহ এক খানি তরণীতে রক্ষা পাইলেন। এই ডুকালিওন হইতে বর্ত্তমান মনুষ্যবংশের উৎপত্তি হইল।

হিন্দুমতে সৃষ্টি-প্রকরণ একমত নয়। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত। কোন কোন বর্ণন উপরে কথিত বৃত্তান্তের সহ সাদৃশ্যযুক্ত আছে বটে, কিন্তু আবার তেমনি কতকগুলি আছে যে যাহা সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র আকারের। অতএব তাহার কোন একটি মাত্রের সারসংগ্রহ এখানে করা বৃথা শ্রমমাত্র। এখানে এইপর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, আদি সৃষ্টি-প্রকরণ যতই ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হউক না কেন, সর্ব্বত্রই ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে যে আদিতে একমাত্র জনক জননী হইতে মনুষ্য-বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

এইরূপে অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য এবং আদিম সভ্য জাতির মানববংশের উৎপত্তি-বিষয়ক মত কি তাহা দেখা গেল। অধুনাতন উন্নতিশীল সভ্যজাতির গৃহীত মত কি তাহা দেখা যাউক। বর্ত্তমান সভ্যজাতির চূড়া-স্বরূপ খ্রীষ্ট-শিষ্যদিগকেই ধরিতে হয়। তাঁহারা কি কহেন এবং কি বিশ্বাস করেন তাহা দেখ।—সয়তান অধঃপাতিত হওয়ার পূর্ব্বে স্বর্গীয় দূতের প্রধান ছিল। ঈশ্বরের সহ বিবাদে স্বদলসহ সয়তান স্বর্গচ্যুত হইলে, তাহাদের স্থান পরিপূরণ কল্পনায় অনন্তশূন্য প্রদেশে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর তাহাতে মনুষ্য স্থাপন করিলেন। এই স্থাপিত মনুষ্যেরা এক স্ত্রী ও এক পুরুষ মাত্র। ইহাদের হইতে যে বংশাবলীর উৎপত্তি হইল তাহারা ক্রমে অত্যন্ত পাপাসক্ত হওয়ায় ঈশ্বর তাহাদিগকে জলপ্লাবনের দ্বারা ধ্বংস করিলেন, কেবল

এক মাত্র ধর্ম্মশীল ব্যক্তি, তাহার স্ত্রী, তিন পুত্র এবং তাহাদিগের স্ত্রী ও যাবতীয় জীবের এক এক জোড়া রক্ষা করিলেন। এই পুত্রত্রয় হইতে মনুষ্যবংশের এবং জীবগণ হইতে জীববংশের বিস্তার হইল। এই জলপ্লাবন খৃষ্টের ২৩৫২ বৎসর পুর্ব্বে হইয়াছিল, অর্থাৎ উহা হইতে বর্ত্তমান সময়ের অন্তর ৪২২৮ বৎসর।

কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বা যে কেহ অন্যদর্শন-বিরহিত হইয়া, কেবল পূর্ব্ব-কথিত জাতীয় সৃষ্টি-প্রকরণ অবলম্বন করিয়া যদি মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উহাদের বাহ্যিক যে কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য, তাহা উপেক্ষা করিয়াও কেবল মাত্র অন্তর্ভূত সাদৃশ্য দর্শনে এরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হইবে, যে বস্তুতই মনুষ্যজাতি আদিতে এক জনক জননী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পুত্রগণ পিতার নিকট সৃষ্টি-প্রকরণ জ্ঞাত হইয়া, যথাস্মৃতি নানাস্থানে প্রচার করিয়াছে; নতুবা এই বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক কথিত বিবরণের মধ্যে এরূপ সৌসাদৃশ্য থাকার কারণ কি? বস্তুতঃ এরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া শুদ্ধ অনভিজ্ঞ বা একদেশদর্শীর কার্য্য নহে। অনেক বহুদর্শী ও মহামহোপাধ্যায় গণকেও এইরূপ সাদৃশ্য মাত্র দর্শনে এইরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে দেখা যায়। অতএব ইঁহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে ভ্রম-যুক্ত জানিতে পারিলেও, তাহার সম্যক্ আলোচনায় হতচেষ্ট হইতে পারা যায়না। এ নিমিত্ত এতদ্রূপ সাদৃশ্য-মালা, মানবের এক-পিতৃত্ব নিরাকারণ স্থলে, পর্য্যাপ্ত প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় কিনা; এবং এরূপ সাদৃশ্য মানবের কেবল এক-পিতৃত্ব হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কি তাহার উৎপত্তির আরও বহুবিধ কারণ আছে, অগ্রে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

কি আচারগত কি ঐতিহাসিক সৌসাদৃশ্য মনুষ্য-মণ্ডলী একবংশোদ্ভূত না হইলেও নানা কারণে উপস্থিত হইতে পারে। ভিন্ন-ভিন্ন-দেশবাসী ও ভিন্ন-ভিন্ন-ভাষা ব্যবহারী হইলেও, পরস্পর-কার্য্যব্যপদেশে সংলগ্ন হওয়ায় পরস্পরের আচার ব্যবহার ইতিহাস উপন্যাসাদি পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইয়া জাত্যন্তর হওত কখন প্রায় অবিকৃত থাকে অথবা দেশকাল পাত্র অনুসারে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই জাতীয় মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। কালসহকারে যখন সেই বিনিময় স্মৃতিপথ বহির্ভূত হয়, অথবা সেই সকল নীত বিষয় বারম্বার ব্যবহারে এবং হস্তান্তরে কিয়ৎ পরিমাণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, কিম্বা উভয়বিধ কারণেই যখন একত্র সমাবেশ হয়, তখন সেই বিনিময়-লব্ধ বিষয় আবার নয়ন-পথে পতিত হইলে, দর্শকের নেত্রে সহসা তাহাদের বিভিন্ন জাতিতে স্বাধীন উৎপত্তি বোধের প্রতি-পোষক ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে এবং তজ্জনিত ভ্রান্তিময় চিন্তার কারণ হইয়া থাকে।

। পৃথিবী মনুষ্য-নিবাস হওয়া অবধি এরূপ ঘটনা শত শত হইয়া গিয়াছে। মানবের সভ্যাবস্থায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংলগ্নের কারণ অসংখ্য, জাতি হইতে জাত্যান্তরে গৃহীত বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায়ও তেমনি সভ্যজাতির মধ্যে অসংখ্য রহিয়াছে। অবনীতে সভ্যতা-সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে, সভ্যতার আনুসঙ্গিক জাতির সংলগ্নের কারণ সমুদয় যদিও ছিল না, তথাপি তাহা অন্য কারণে সমাধা হইত। সভ্যতা সময়ে মানব আশ্রমী হইয়া এক স্থানে বাস করিয়া থাকে, কেবল কার্য্য-ব্যপদেশে কোন নিয়মিত সময়ের জন্য স্থানান্তরিত হয়, সেই সময়েই যাহা কিছু বিজাতীয় সংস্রব হয়। কিন্তু অসভ্যাবস্থার মানব নিরাশ্রমী, পশু-পালন বা মৃগয়া মাত্র জীবিকা, যথায় যথায় তাহার সুবিধা, তথায় তথায় অনবরত বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিতেছে। যে স্থান হইতে প্রথম যাত্রা করিল, হয়ত আর কখন সে স্থানে পুনরাগমন করিবে না এবং এ গমন যে কোথায় গিয়া নিবৃত্তি হইবে, এবং নিবৃত্তি হওয়ার পূর্ব্বে কত কত স্থান পদতল-গত হইবে, তাহা এক অদৃষ্ট ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তন সময়ে পথ মধ্যে ভিন্ন-জাতীয় সংস্রব ঘটিয়া থাকে। যেখানে ঘাস জল ও মৃগ প্রচুর দেখিল, সেই খানেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত অনেক জাতির একত্র সমাবেশ হইল এবং সেই সময়ে ব্যবহার ইতিহাস উপন্যাসাদির বিনিময়-কার্য্য সমাধা হইল। যখন সে স্থানের বাস ফুরাইল, তখন সর্ব্ব সম্বন্ধ-বিরহিত হইয়া যে যাহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল, হয়ত ইহকালের মত আর কখন পুনর্মিলন হইল না। কাল গত হইল, জাতির সংস্রব বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিল,—কিন্তু দূরকালে এক-দেশ-দর্শীর ভ্রম-উৎপাদক স্বরূপ' বিনিময়-লব্ধ বিষয় সমূহ অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া, স্থায়ীভাবে জাতীয় সম্পত্তির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিল। আমরা যখন দেখিতেছি যে সভ্য সমাজেও,—যখন মানবের জ্ঞান-চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছে তখনও,—যখন ভিন্ন জাতীয় বিষয় জাতীয় সম্পত্তি পদে অধিরূঢ় হইতেছে; তখন যে অসভ্য, বাস-পরিবর্ত্তন-শীল মানব সমাজে উহা কতদূর সম্ভব, তাহা বলা বাহুল্য। সভ্য সমাজের একটি দৃষ্টান্ত এখানে বলিব।

সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কৌতুকাবহ উপন্যাসে পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা জন-সমাজে সমাদৃত। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ খস্রু নওসি রোঁয়া ইহার সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পহ্লবী অর্থাৎ তাৎকালিকী পারস্য ভাষায় ইহার অনুবাদ করাইয়াছিলেন। যখন পারস্য মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, সেই সময়ে আরবী ভাষা মুসলমানদিগের প্রচলিত ভাষা হওয়ায় ৭৭০ খৃষ্টাব্দে আলম্ম কাফা নামে এক জন আরব উহা আরবী ভাষায় অনু-

বাদ করেন। আলম্ কাকার আরবি অনুবাদ হইতে, সিমিওন্ নামক এক ব্যক্তির দ্বারা খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই গ্রীকের আবার লাটিন অনুবাদ ১৬৮৭ শকে প্রকাশিত হয়। পুনশ্চ আরবী অনুবাদ হইতে. রাবি জোয়েল এই পুস্তকের হিব্রু অনুবাদ করেন। এই হিব্রু অনুবাদ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায় যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষায় নীত হইয়া সমস্ত ইউরোপে বিস্তৃত হয়। এবং এ যাবৎ ইউরোপ ভূমে লোকের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই সকল উপন্যাস সমূহ হিব্রু জাতির জাতীয় সম্পত্তি। এ দিকে আবার পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরবি অনুবাদ হইতে হুসেন বেগ আধুনিক পারসিতে অনুবাদ করিয়া, অন্যান্য গল্পের সহ সমাবেশ করিয়া, আজওয়ার সোহেলি নামে প্রকাশ করেন। উহা সপ্তদশ শতাব্দীতে দাউদ সৈয়দ ইস্পাহানি কর্ত্তৃক ফরাসি ভাষায় নীত হইয়া নূতন আকারে (Fables of Pilpay) পিল্পে কৃত গল্পাবলী নামে প্রচার হয়; তাহার পর অনুসন্ধানের আরম্ভ হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে এত গোলযোগের মূল ক্ষুদ্র পুস্তক সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র মাত্র।

অতএব যখন ঐতিহাসিক এবং সভ্যতালোকময় সময়েরই এই দশা, তখন দুরগণ্ড আদিম সময়ে কি না হইয়াছে। একারণে সৌসাদৃশ্য-যুক্ত বিষয় দেখিলেই যে পাঁচ ভাই এক ঠাকুর মার আগুণের মালসীর পাশে বসিয়া এক উপন্যাস শুনিয়া পাঁচ যায়গায় পাঁচ রূপে প্রচার করিয়াছে, এরূপ ভাব বা মীমাংসায় উপনীত হইতে প্রস্তুত নহি।

যদৃচ্ছা জাতীয় সংস্রবে বিষয় পরিবর্ত্তন হেতুই যে কেবল ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে বহু বিষয়ের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই এমন নহে। সমজাতির পদার্থ মাত্রেরই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কতকগুলি স্বাভাবিক অবস্থা এবং কার্য্য আছে, যাহা সেই সেই জাতির প্রত্যেক পদর্থই নিয়মিত সময়ে সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। বাহ্যিক আকৃতিতে সেই সকল কার্য্য এবং অবস্থার কিছু কোথাও রূপান্তর থাকিলেও, উহার অন্তঃপ্রকৃতি সর্ব্বত্র এক এবং সাদৃশ্যময়। বিবেচনা কর কোন উন্নত-চূড় ক্ষুদ্র শাখ এবম্ভূত জাতির বৃক্ষবিশেষ যেরূপে উৎপন্ন এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ সে জাতীয় যে কোন বৃক্ষ তদ্বৎ ভাবে সমধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া, সমান স্বভাব প্রকাশ করিয়া বর্দ্ধিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সেই পরিবর্দ্ধন সময়ে অমুক বৃক্ষের শাখা সরল ভাবে, অমুকের শাখা ঈষৎ ন্যুব্জ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবম্ভূত বৈলক্ষণ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ছাগজাতি শৈশবে একইরূপ চপল ও ক্রীড়ন-শীল এবং তাহাদের ক্রীড়া-প্রণালী ও বয়সে ছাগ-ভাব ছাগ-জাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই সমান। মনুষ্য-শিশু বাল্যে যে ক্রীড়া কৌতুক এবং চাপল্য ও তদ্বৎ

অন্যান্য স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সকল মনুষ্য-শিশুতেই তাহা দেদীপ্যমান, এবং সেইসমস্ত কেনা বলিবে যে এক-জাতীয়, তবে প্রভেদের মধ্যে এই, কেহ বা পেন্সিলটি লইয়া দন্তে চর্ব্বন করিল, কেহবা তাহা লেহন করিয়া আনন্দ বোধ করিল। মনুষ্য একইরূপ মনোবৃত্তি এবং স্বভাব লাভ করিয়া শৈশব যৌবন প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করিয়া থাকে, এবং তাহাদের সেই অবস্থা ভেদে মনোবেগ বা কার্য্য দেখিলে, তাহাদের সমজাতীয়ত্ব এবং সৌসাদৃশ্য হেতু অনায়াসেই জানিতে পাওয়া যায় ইহা শৈশব, বা যৌবন বা বার্দ্ধক্য হইতে উৎপাদিত। এমন কথনই বোধ হইবে না যে সেই সকল এক-পিতৃত্ব বা পরস্পর সংস্রবে একজন অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। সেইরূপ মনুষ্যের অনন্ত জীবন প্রবাহও, গন্তব্য পথে গমন করিতে এমন কতক গুলি অবস্থা ভেদ করিয়া যাইতে হয়, যে সেই প্রবাহের যখন যে অংশই হউক না কেন, অবস্থা-বিশেষে আসিয়া পতিত হইলেই সেই অবস্থানুরূপ আকার ধারণ করিবে, মানসিক এবং দৈহিক গতি তদ্বৎ হইবে এবং তদ্বৎ কার্য্যের উৎপাদক হইবে, এবং একাংশের ক্রিয়া সহ সেই অবস্থায় পতিত প্রবাহের অপরাংশের ক্রিয়ার যদিও কিছু বাহ্য রূপান্তর দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাকে ভিন্ন বলিয়া বলা যাইবে না। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে কতক গুলি এমন সমজাতীয় ও সৌসাদৃশ্য-যুক্ত বিষয় আছে, যাহাকে এক-পিতৃত্ব নিবন্ধন বা জাতীয় সংস্রবে উৎপন্ন বলিতে পারি না। উহা স্বাভাবিক ক্রিয়ার জীবন-প্রবাহের অবস্থা-বিশেষে উৎপন্ন বলিতে হইবে। এতদ্বিষয় নিম্নে উদাহরণ দ্বারা আরও পরিস্ফুট করণের চেষ্টা করা যাইতেছে।

ম্যাকলিনান সাহেবকৃত পুরাকালীয় বিবাহ (On Primitive marriage) বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিত আছে যে অতি পুরাকালে প্রায় সকল জাতির মধ্যেই বল পূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইউরোপের উত্তর প্রদেশের প্রাচীন জর্ম্মণীয় ভাষায় quan-fang অর্থাৎ স্ত্রী ধৃত করণ এবং Crut Loufti অর্থাৎ কন্যা শিকার ইত্যাদি কথার অস্তিত্ব থাকায় নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে অনুমান হয় যে বলপূর্ব্বক স্ত্রীগ্রহণ ঐ সকল দেশেও অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। আমাদের জাতিতে রাক্ষস বিবাহ আমাদের দেশেও স্ত্রী শিকার পক্ষে বিশেষ প্রমাণ। কুক্ সাহেব তাঁহার দ্বিতীয় বার মহার্ণব ভ্রমণে যখন অষ্ট্রেলিয়ায় উপনীত হয়েন, তখন তথাকার অসভ্যবাসীদিগের বিবাহ-প্রণালী এইরূপ অবলোকন করিয়াছিলেন। কোন পুরুষ স্বদল হইতে দলান্তরে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়া আড়ি পাতিয়া থাকে, এবং সেই সময় কোন নিঃসহায়া স্ত্রীলোক দেখিলেই, মস্তকে লগুড়াঘাত দ্বারা তাহাকে ভূপাতিত করিয়া, কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ছেঁচড়াইয়া

লইয়া স্বদলে উপস্থিত হয় এবং গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করে, এতদ্ব্যতীত বিবাহের নিমিত্ত আর কোন স্বতন্ত্র পর্ব্ব ও আচার করিতে হয় না। এই স্ত্রীগণ এতদূর আজীবন উৎপীড়িত, যে কন্যা প্রসব করিলেই ভাবী দুঃখ হইতে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিবার নিমিত্ত হত্যা করিবার ক্ষণ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। মালয় এবং মধ্য আসিয়ায় এইরূপ রীতি দৃষ্ট হয় যে কন্যা এবং বিবাহার্থীগণ ঘোটকারূঢ় হইলে, কন্যা দৌড়িতে আরম্ভ করে, যে ব্যক্তি তাহাকে ধরিতে পারিবে, কন্যা তাহারই পরিণীতা হইবে। এই শেষোক্তটি নিঃসন্দেহ পূর্ব্ব-গত রাক্ষসাচারের কিঞ্চিৎ সংস্কার মাত্র। এখন দেখা যাইতেছে যে এই কন্যা-শিকার প্রথা পশুবদ্ভাবেই হউক বা তদপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত ভাবেই হউক আদিতে প্রায় সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ নিমিত্ত ইহা বলা যাইতে পারে না, যে এই রীতি নোয়ার (Noah) জাহাজ হইতে সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতৃত্রয় পৃথিবী লোক-পূর্ণ করিতে বহির্গত হইয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক সূত্রে উৎপন্ন। এই রীতির স্রোত, নিতান্ত মৃদুভাবে হইলেও, মানবের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা পর্য্যন্তও চলিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু ইহার উৎপত্তি নিঃসন্দেহই মানব-জীবনের অভ্যুদয়ে হয়। মনুষ্য তখন পশুবৎ, জীবন কেবল পশুর ন্যায় আহার নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়-তুষ্টির ইচ্ছাতে পরিপূর্ণ এবং তৎতৎ বিষয়ের জন্য ব্যবহারও পশুবৎ। এমন অবস্থায় তাহারা যে স্ত্রীজাতি লইয়া পশুদিগের ন্যায় কাড়াকাড়ি, বিবাদ বিসম্বাদ সর্ব্বদা করিবে তাহা স্বাভাবিক। মানববুদ্ধিহেতু উন্নতির মধ্যে এই মাত্র দৃষ্ট হয়, যে কেহ কেহ সম্মুখ বিবাদের বিপদ এড়াইতে গুপ্তভাবে স্বকার্য্য সাধন করিত এবং বুদ্ধি হইতেই স্ত্রীবিশেষে আকর্ষণের আধিক্য হেতু বিবাদের সম্ভাবনা অধিক হইত। এ রীতির সৃষ্টি এইরূপে, এবং কাল-মাহাত্ম্যে বদ্ধমূল হওয়ায়, মনুষ্যের উন্নত অবস্থা পর্য্যন্তও ইহার স্রোত কিয়ৎ পরিমাণে চলিয়াছিল।

এইরূপ আরও একটি বিষয় দেখা যাউক। ইতর হইতে উচ্চতম সকল জীবেই আত্ম-জীবনে মমতা সমান উগ্র। সর্ব্বস্ব একদিকে, আত্মজীবন একদিকে। মানবী প্রকৃতিও সেই আত্ম-জীবন-প্রিয়তা হইতে পৃথক্ নহে। যখন মানবেরা বাক্য-স্ফূর্ত্তি এবং বুদ্ধিশক্তির পরিমার্জ্জনা দ্বারা আপনাদিগের আত্মত্ব জ্ঞাত হইয়াছিল এবং পশুসৃষ্টি হইতে পৃথিবীর সুখগ্রহণে অধিক পটুতা লাভ করিয়াছিল, তখন যে সেই-জীবনের প্রতি তাহার সাধারণ মমতার আধিক্য হইবে, এবং জীবলীলা মাত্রে জীবনের ব্যাপ্তিকাল নিরূপণ করিতে কষ্ট বোধ করিবে, ইহা সম্ভব। অতএব বোধহয় সেই মমতা হইতেই পরলোক কল্পিত, ইহাই পশুসৃষ্টি হইতে মানবীয় বুদ্ধির উৎকর্ষ। এমন বিষয়ে সকল জাতিরই উদ্ভাবিত তত্ত্ব এক প্রকৃতির হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই।

সেই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত কতক গুলি আকৃতির এস্থলে পরীক্ষা করা যাউক।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত পলিনেসিয়া নামক দ্বীপাবলীর অধিবাসী দিগের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস, যে মানব মৃত্যুর পরে ক্যানো (Canoe) অর্থাৎ বৃক্ষকল্কল-নির্ম্মিত নৌকা বিশেষ দ্বারা গন্তব্যস্থানের ব্যবধানস্থিত জলের তরঙ্গ পার হইয়া, যথাস্থানে উপনীত হয়। ইস্কম নামক উত্তর আমেরিকা এবং গ্রীন্‌লণ্ড বাসীদিগের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস যে মানব মৃত্যুর পর টরণ-গারসুক (Torn-Garsuk) নামক স্থানে নীত হয়। ঐ স্থানে সর্ব্বদা উত্তাপময়, এবং পরিষ্কার তরল জল, পক্ষী, মৎস প্রচুর। সূর্য্য-কিরণ সর্ব্বদা পাওয়া যায়। সীল নামক মৎস্য এবং বল্‌গা হরিণ তথায় অপর্য্যাপ্ত বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং বিনা ক্লেশে তাহাদিগকে ধৃত করা যায়। কিন্তু এই স্থানে যাওয়া বড় কষ্টকর, সেই পথে পূর্ব্বগত যাত্রীদিগের রক্তে এবং বরফে আর্দ্র অত্যুচ্চ পর্ব্বতের গা বহিয়া ক্রমাগত পাঁচদিন গমন করিলে তবে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারে। এপথে বড় সাবধানে যাইতে হয়, হঠাৎ পিছ্‌লাইয়া পড়িলে যদি আবার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেই তাহার একেবারে ধ্বংস হইল। এই হেতু যাহারা শীতকালে মরে, তাহাদের বড় কষ্ট, বড় ভয়, কেননা সে সময় দুরন্ত শীত এবং ঝটিকায় পথ-ভ্রষ্ট হওয়ার অত্যন্ত সম্ভাবনা। এখানে দেখা যাইতেছে যে জীবনের মমতায় এই নির্ব্বোধেরা প্রথম মৃত্যুতেও কোনরূপে প্রাণ বাঁধিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার মৃত্যুতে যে আর নিস্তার আছে, ইহা নিরূপণ করিতে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি আর সাহসী হয় নাই।

থক্ত নামক আদিম আমেরিকদিগের মধ্যে বিশ্বাস যে মনুষ্যকে মৃত্যুর পর এক অতি ভয়ঙ্করী নদী পার হইয়া পশ্চিম দেশে যাইতে হয়। এই নদী পার হওয়া বড় সুকঠিন। ইহার উপরে অতি পিচ্ছল-গাত্র এক খান পাইন নামক কাষ্ঠ ভেলা আছে, তাহার উপর দিয়া যাইতে হয়। পার হওন সময়ে ছয় ব্যক্তি অপরদিক্ হইতে আগত ব্যক্তির উপর ক্রমাগত ধূলামাটি ও প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে থাকে। যে ব্যক্তি ভাল এবং জীবন্তে সকলকে নিজ-আহৃত শিকারের ভাগ দিয়াছে, সে স্বচ্ছন্দে নির্ভীক চিত্তে পার হইয়া যায়, কিন্তু যে দুষ্ট সে পদস্খলিত হইয়া নিম্ন-নদী-তরঙ্গে পতিত হইয়া হাবু ডুবু খাইতে থাকে। ইহাদের এই সুখময় পশ্চিম-দেশ-স্থিত পরলোক নিরূপিত হওয়ার কারণ, থক্ত জাতির বাসস্থানের পশ্চিমস্থ দেশ অপেক্ষাকৃত সুখময়। এইরূপ কষ্টসাধ্য পরলোক গমন সকলদেশেই কোন না কোন রূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং সুজনের জন্য সুখ ও দুর্জ্জনের জন্য দুঃখ কল্পনা করা হইয়াছে। সেই সুখ ও দুঃখ পার্থিব সুখ

তুলনার আধিক্য মাত্র। মুসলমান দিগের পরলোক গমনের পথে একটি সেতু পার হইতে হয়, উহা কেশাপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং খড়্গের ধার হইতেও তীক্ষ্ণতর। আমাদিগের অথর্ব্ব-বেদ অনুসারে আত্মাকে মৃত্যুর পর ঘোরতর-অন্ধকার-ময় এবং কষ্টসাধ্য স্থান দিয়া পরলোকের পথ অতিক্রম করিতে হয়। পৌরাণিকী গাথা অনুসারে বৈতরণী নদীর উপর দিয়া মহাক্লেশে যাইতে হয়।

এই সকলের দ্বারা কি অনুমিত হয়? মানবচিত্ত যখন দেখিতেছে যে পরলোক গমনের সূচনা রূপ মৃত্যুই যখন এত কষ্ট-কর, তখন গমন এবং গমন-পথ যে আরও কষ্টকর বিবেচনা করিয়া লইবে তাহাতে বিচিত্র কি? এ কষ্ট সীমা-পর্য্যন্ত। যে জাতি আপনার চতুঃপার্শ্ব অবলোকনে যাহা যাহা অত্যন্ত কষ্টের বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে তাহাই এই পথের সঙ্গে যোজনা করিয়াছে; এবং বহুকষ্ট ভোগ হেতু স্বভাবজাত সুখের আশায়, গন্তব্য স্থানকে যথাবুদ্ধি সুখময় বিবেচনা করিয়া লই-য়াছে। জীবন্তে লোকে যাহার মঙ্গল কামনা করে, পরলোকে তাহারই মঙ্গল সূচিত হইয়াছে, এবং জীবন্তে লোকে যাহার অমঙ্গল কামনা করে, পরলোকে তাহারই অমঙ্গল সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-রূপ আশাহেতু যেমন সুখের আধিক্য কল্পনা, তেমনি দুষ্টের প্রতি ক্রোধের আধিক্য হেতু তাহার ক্লেশাধিক্য কল্পিত হইয়াছে। এই পরলোক-বিষয়িণী তত্ত্বা-বলী এত সাদৃশ্যযুক্ত হইলেও, ইহা মানবের এক-পিতৃত্ব-রূপ মূল হইতে উৎপন্ন না হইলেও হইতে পারে; দেখা যাইতেছে যে ইহা অবস্থা-বিশেষে মানবের আত্ম-স্বভাব হইতেই উৎপন্ন।

সর্ব্বসংস্রব-শূন্য হইলেও, মানবের আত্ম-স্বভাব হইতে সমজাতীয় চিন্তক্রিয়া এবং তজ্জনিত কার্য্য বিশেষ যে স্বাধীন ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইব। যেখান হইতে এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলাম, সেই স্থান, পাঠকের মনে পূর্ণরূপে ভাবো-দয় করিবার নিমিত্ত, অবিকল উদ্ধৃত করিলাম:—

An ingenious little drilling instrument which I and other observers had set down as peculiar to the South sea Islanders, in or near the Samaon group, I found kept one day in stock in the London tool-shops"—Tylor's Researches into the early history of mankind, and the Development of civilisation.

এখানে নিঃসন্দেহ কেহই এমন কথা বলিতে পারিবেন না যে টাইলর সাহেব দক্ষিণ-সমুদ্রস্থ দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে যে অস্ত্র দেখিয়াছিলেন, দ্বীপবাসীরা তাঁহার নির্ম্মাণ-কৌশল হয় লণ্ডনবাসী-দিগকে শিক্ষা দিয়াছিল, অথবা তাহারা লণ্ডন-বাসী-দিগের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিল।

পুনশ্চ মেক্সিকোর আদিম অধিবাসি-বর্গ গ্রহণ সম্বন্ধে বলিত যে সর্প-দ্বারা চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রাসিত হওয়ায় চন্দ্র বা সূর্য্য-গ্রহণ হইয়া থাকে। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারেও কেতু নামক সর্পদ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রাসিত হয়েন। এই সৌসাদৃশ্যও আমি টাইলর কর্তৃক দর্শিত অস্ত্রের শ্রেণী-ভুক্ত করি।

উপরি উক্ত উদাহরণ-মালা হইতে বিভিন্ন-প্রকৃতির আর কতক গুলি সাদৃশ্য-যুক্ত বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, যে ইহাদের উৎপত্তি কিরূপে হইল।

সন্তান প্রসবকালীন নানা স্থানে একটি অতি অদ্ভুত এবং কৌতুকাবহ ঘটনা অবলোকিত হয়। দুতার্তে (Du-Terte) নামক একজন ভ্রমণকারী আমেরিকার নিকটস্থ সাগর-স্থিত দ্বীপাবলীর আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে সন্তান প্রসবকালীন যে সকল নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তাহা এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরেই প্রসূতি স্বাভাবিক-অবস্থা-যুক্তের ন্যায় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হয়, কিন্তু তাহার স্বামী তৎক্ষণাৎ পীড়িতের ন্যায় তাহার স্থানাধিকার করিয়া সন্তান কোলে করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া, ক্রমাগত চল্লিস দিন নিতান্ত রোগীর ন্যায় পথ্য ও শুশ্রূষা পাইয়া থাকে। চল্লিস দিনের পর জ্ঞাতিবর্গ নিমন্ত্রিত হয়, তাহারা আসিয়া প্রহার এবং আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করিয়া সেই বেচারাকে প্রকৃতই রোগীর ন্যায় করিয়া তুলে। তাহার পর বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল ৬০টি মরিচকে গুঁড়া করিয়া জলের সঙ্গে মিলাইয়া তাহার ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া, তাহাকে শয়ন করাইয়া জ্ঞাতিবর্গ পান ভোজনে প্রমত্ত হয়। এই সকল যন্ত্রণাতেও দুর্ভাগ্য পিতাকে রা শব্দ করিবার যো নাই, তাহা হইলে অতি মন্দ-ভাগ্য এবং ভীরু বলিয়া তাহার কলঙ্ক হইয়া থাকে। ইহার পর আর কয়েক দিন বিছানায় কাল কাটাইয়া শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠে। (২)

দক্ষিণ আমেরিকার আবিপোন নামক আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে পাদ্রি দব্রিজফার এ প্রথা এইরূপ অবলোকন করিয়াছিলেন। যেমাত্র স্ত্রী সন্তান প্রসব করিয়াছে, অমনি স্বামী তাহার স্থানে সন্তান কোলে করিয়া এরূপ আচরণের সহিত শয়ন করিল, যে লোকে দেখিলে

---

(২) এই বিষয়টি দাম্পত্য-দণ্ডবিধির আইন-কর্ত্তার কৌন্সিলে এবং আমার দেশস্থ সুবদনীদিগের বিচারাধীনে অর্পণ করিতে চাই। তাঁহারা দেখিবেন যে স্বামী-শাসনের পক্ষে ইহা এক অতি সুন্দর শাস্তি। বিশেষতঃ ইংরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক এদেশে আনীত সভ্যতার কল্যাণে, স্ত্রী পুরুষের সম সত্ত্বাধিকার লইয়া অনেক কলহ কচ্ কচি চলিতেছে, অতএব এটি যদি ঐ আইনের একটি ধারা রূপে বিধিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তৎপক্ষেও ইহা অল্প সহায়তা করিবে না।

হঠাৎ মনে করিবে, যেন এই সন্তানটি এই পুরুষটিরই গর্ভজাত এবং ইহা হইতে প্রসূত। পাছে পুরুষটির গায় বদ হাওয়া লাগিলে সন্তানটির অমঙ্গল হয়, এজন্য সে মাদুর বা চর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ কিছুকাল উপবাস, তৎপরে নিয়ম-পূর্ব্বক আহারাদির সহিত কাল যাপিয়া, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্ক পলো (Marco Polo) নামক বিখ্যাত ভ্রমণকারী এইরূপ রীতির আভাস, মিয়াং সি নামক এক জাতীয় চীন-বাসিদিগের মধ্যে অবলোকন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে সন্তান-প্রসবান্তে প্রসূতি সবল হইয়া বিছানা পরিত্যাগ করিলে, স্বামী তৎস্থান অধিকার করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া, আগত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সন্তানের জন্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্ত্রাবো নামক বিখ্যাত গ্রীক ভূগোলবেত্তার কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, উত্তর স্পেনে ইবিরীয় জাতির মধ্যে প্রসূতি সন্তান প্রসব করণান্তর স্বামীকে আপন স্থানে শয়ন করাইয়া, তাহাকে প্রসূতির অনুরূপ সেবা শুশ্রূষা করিত। দিওদোরুস সিকুলসের কথিত বৃত্তান্ত অনুসারে জানা যায় তাঁহার সময়ে কর্সিকা দ্বীপেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এইরূপ আপলোনিয়াস রোদিউসের বৃত্তান্ত অনুসারে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী তিবারেনিস্ নামক জাতির মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

এখন দেখা যাইতেছে, যে এই প্রথা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়যোগে ব্যাপ্ত, এবং যথায় যথায় অবলোকিত, তথায় তথায় ইহা একরূপ ভাবাপন্ন দৃষ্ট হয়। ইহা কিরূপে উৎপন্ন? স্বভাব হইতে নিশ্চয়। এই স্থানে পূর্ব্ব-কথিত স্বভাবোৎপন্ন সৌসাদৃশ্য-বিষয়িনী কারণ-পরম্পরার সম্প্রসারণ করিয়া—আরও কিঞ্চিৎ বলিব। প্রথা যে কোন প্রকারের হউক, তাহার অঙ্কুর স্বভাব হইতে উৎপন্ন, তাহার কোন কোনটীর উপর কাল সহকারে লৌকিক আকার নির্ম্মিত হয়। কেবল মাত্র, ভিন্ন-জাতিগত হইলেও যখন একরূপ দৃষ্ট হয়, তখনই তাহাকে পূর্ব্বকথিত স্বভাবোৎপন্ন সৌসাদৃশ্য শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়, অথবা সেই অঙ্কুরের উপর নির্ম্মিত লৌকিক আকার, বিভিন্ন জাতিগত হইয়া সৌসাদৃশ্য-যুক্ত হইলেও, যখন দেখা যায়, যে তাহা তন্নির্ম্মাণোপযোগী স্বাভাবিক কারণের অধিকার-বহির্ভূত নহে; তখন সেই লৌকিক আকারকে তৎশ্রেণী-ভুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু যখন অঙ্কুরের উপরে নির্ম্মিত লৌকিক আকার সর্ব্বত্র সমতা-যুক্ত, অথচ তাহা স্বাভাবিক কারণের সীমা-বহির্ভূত, তখন সে লৌকিক আকার সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে স্বভাবোৎপন্ন বলিয়া ধরিতে পারা যায় না। তাহা হয় এক-বংশত্ব নতুবা জাতীয় সংস্রবে উৎপন্ন বলিতে হইবে। উপরে কথিত প্রথাটিতে

দেখা যাইতেছে, যে ইহার মূল যদিও এরূপে, যে সন্তান প্রসব কালীন কোন বিঘ্ন-উৎপাদন রহিত করিবার নিমিত্ত কর্ম্মঠ স্বামীকে কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিয়া শান্ত ভাব ধারণ কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহাকে চিত্তি করিয়া স্বামীর-পক্ষে যে ব্যবহার নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক; অতএব এরূপ অস্বাভাবিক বিষয় স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা দেশ কাল পাত্র ভেদে কোন স্থানে মনুষ্য দ্বারা উৎপাদিত হইয়া দিগন্ত বিকীর্ণ হইয়াছে। এই বিকীরণ কার্য্য এক-বংশত্ব হেতু সাধিত হইয়াছে কি না? যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তবে একথা বলিতে হইবে, যখন আদি পিতার এরূপ লৌকিক ব্যবহারও আজি পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে অনুকৃত হইয়া আসিতেছে, তখন অবশ্য যে ভাষায় প্রথম বাক্য স্ফুরণে মা বাপ বলিতে শিখিয়াছিল, সেই ভাষাগত ঐক্যও দৃষ্ট হইবে; তাহা না হইলে, অন্ততঃ আজন্ম উচ্চারিত পিতৃ মাতৃ সম্বোধন সূচক শব্দগত একতাও দেখিতে পাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। এ বিষয় সবিস্তারে প্রবন্ধের যথা স্থানে আলোচ্য। অতএব এখানে এমন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে, এই প্রথা এক-বংশত্ব হেতু উৎপাদিত। সুতরাং জাতীয় সংস্রবে ইহার উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়।

এইরূপ উপর্য্যুপরি আর উদাহরণ প্রদান করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বিভিন্ন-জাতিগত বিষয়ের সৌসাদৃশ্য বিষয়ে দ্বিবিধ কারণ প্রদর্শিত হইল। এক এই, জাতীয় জীবন গন্তব্য পথে গমন কালীন যখন অবস্থা-বিশেষে উপনীত হয়; তখন সেই অবস্থা-প্রভাবে অনুরূপ চিত্ত-ক্রিয়ার অধীন হইয়া, অনুরূপ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই কার্য্য দেশ, কাল, পাত্র ভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াও যদি সম্যক্ বা কিয়ৎ-পরিমাণে সাদৃশ্য-যুক্ত হয়, অথচ তদুৎপাদক স্বাভাবিক কারণের সীমা-বহির্ভূত না হয়, সেই সকলকে এই প্রথম শ্রেণীরই অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু যখন সেই কার্য্য দেশ, কাল, পাত্র ভেদ না করিয়া সর্ব্বত্রই সমান আকারের দৃষ্ট হয়, অথচ উৎপত্তি বিষয়ে স্বাভাবিক কারণের বহির্ভূত হয়, এবং পরে যে অপরাপর কারণ কথিত হইবে তাহার মধ্যে না, আইসে তখনই সেখানে জাতীয় সংস্রব ধরিতে হইবে এবং এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইবে। ইহা ব্যতীত অপরাপর কারণ ক্রমে বিবৃত হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে দেখা যাইবে যে এই জাতীয় সংস্রব এমন দূরতর স্থানে, এমন কি আসিয়া, আমেরিকায়, সেই আদিম কালে—যখন আপাততঃ দৃষ্ট কোন সুবিধারই অস্তিত্ব ছিল না—কিরূপে হইবার সম্ভব।

ক্রমশঃ—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃক্ষচ্যুত লতা।

১

একি তব দশা লতা?—ধরায় লুটাও!—
ছিন্ন ভিন্ন পত্রদাম,
দলিত অঙ্গ ললাম,
মলিন বরণ শ্যাম,
ধূলি-ধূসরিত, হায়, কে করিল হেন?
সুষমা সুখের ভোগে এ বিরাগ কেন?

২

কোথায় আশ্রয়তরু?—কুঠারে পাতিত!
হায়, তার পাশে পড়ি,
যে তোমারে শিরে করি,
সুখ-ধ্যানে মগ্ন, মরি,
ছিল এত কাল, ডুবে বিস্তারালিঙ্গনে,
আপনি যে শুষ্ক, নষ্ট, না ভাবিয়া মনে।

৩

কি এ দৃশ্য প্রণয়ের, দুর্দ্দশায় এই!—
আবার সুখেতে পুনঃ,
যবে ভোগ অগণন,
ফুলে ফুলে বিচুম্বন,
পত্রে পত্রে জড়া-জড়ি, হৃদয়ে হৃদয়,
গাঢ়, গাঢ়তর সুখ আবেশ দোলায়।

৪

হায়!—
কোথা সেই দিন তব গিয়াছে এখন?—
যে দিন রূপের ভার,
বৃক্ষের শিরেতে আর,
না ধরি, বহিয়া তার
পড়িত ঢাকিয়া মুখ ঝালরে যেমন,
কি সুন্দর সে ঝালরে মৃদু আন্দোলন!

৫

পুনঃ—
নিশীথে নীরবে যবে ডুবিত সংসার,
উজ্জ্বল উত্তপ্ত বাস,
খুলিয়া যেলি আকাশ,
নির্জ্জনে হৃদ-বিকাশ
করি যবে, বাতে তনু শীতলিত তার,
কিবা শোভা সেই শ্যাম হৃদে তারা-হার!—

৬

তদা
তোমারও শ্যামল অঙ্গ ধরায় বিশাল;
উরসে কুসুম-হার,
খচিত রত্ন নিহার,
মলয় সঞ্চলে যার
ঝঙ্কারে মধুপকুল উড়িত সকলে,
সুখেতে বিনিদ্র, মগ্ন, যার তব কোলে।

৭

তাহে—
বিস্তৃত সুষমা, গন্ধে যোজন আকুল;
সুবর্ণে, চন্দ্রিকা হাসে,
মলয়, সৌরভে ভাসে,
নির্জ্জন সে সুখাবাসে,
ফুকারি উঠিত রয়ে কেবল পাপিয়া,
হৃদিভেদী সপ্তস্বরে প্রান্তর জাগা'য়া।

৮

আরো—
আকাশে জ্যোতির খেলা, নিম্নে জ্যোতি-
মেলা;
উভয় শোভার মাঝে,
চকোর বিভ্রান্ত সাজে,
উঠি, পড়ি শেষে, লাজে,

ঊর্দ্ধেতে না পেয়ে সুধা নামি তব পাশ,
বলির্ত পীযূষ পিয়ে এইই স্বর্গবাস!

৯

এবে!—
সব সুখ হত সেই, সকলি উচ্ছিন্ন!—
নিষ্ঠুর মানব, হায়,
কাটিয়া পাদপাশ্রয়;
টানিয়া ফেলি ধরায়
দিয়াছে হেলায়; শেষে পশু-পালে দলি,
ছিঁড়ি, খুঁড়ি ভক্ষিয়াছে লোভে কুতূহলি।

১০

হায়!—
দাঁটা-সার মাত্র অঙ্গ!—তবু দেখি একি!
পুন মুঞ্জরিছ কেন?—
আবার সৌভাগ্য যেন,
আসিবে ভাবিছ হেন;
আশ্রয়, রক্ষক বিনা সব সুখ বেশ,
সংসারের ক্রূর ক্রীড়া-স্থল হবে শেষ।

১১

বলি,—
মুঞ্জর না, বলি লতা, আর মুঞ্জর না।
শুকাইয়া ফেলি কায়,
মাটিতে মিশাও তায়,
কেহ যেন নাহি পায়,
অস্তিত্বের চিহ্ন তব পৃথিবীতে আর,
আত্মত্ব বিনাশে হিংসা সাধ ক্রূরতার।

১২

প্রত্যুত্তর আশে নর চাহে লতা পানে।
কাতরে তখন, লতা,
কহিল কি কহ কথা?
সত্য বটে বড় ব্যথা
পেয়েছি সংসার হতে, জীবন সংশয়,
বাঁচিব না এও সত্য, মরণই নিশ্চয়।

১৩

ভাল তা সুধাই, নর, দেহ ত উত্তর?—
কি উদ্দেশ্য জীবনের?—
সুখোদ্দেশ্য যদি এর,
সে উদ্দেশ্য সাধনের
কি উপায় সুনিশ্চয় দেখাও আমায়,
জানি আমি পেলে বস্তু সুখ চলে যায়।

১৪

শুন—
নবীন পল্লব সাজে নধর এ তরু,
দেখে ভুলাইল মন,
এই চিন্তা অনুক্ষণ,
মস্তকে এর কেমন,
বিস্তারিবে বপু মোর, সুবর্দ্ধন, নব,
সংসারে বিকাশি রূপ সুখী কত হব।

১৫

ধাইলাম বৃক্ষ পাশে, উঠিলাম শিরে;
পুরিল মনের সাধ,
কিন্তু সুখে পরমাদ,
আমার অদৃষ্টে বাদ,
মনোজ-মোহিনী ভাব যেই গেল চলি,
বিকৃত আকুল শূন্য অন্তর সকলি।

১৬

পেয়েছি ত বস্তু তবে সুখী কি এ আমি?—
জিজ্ঞাসেছি যেই এই,
দেখি আর সুখ নেই,
কাটি গেছে সুখ-খেঁই,
আত্ম-চেতনার জ্ঞান বড় ভয়ঙ্কর,
হৃদ ফাটি, চাঁচে প্রাণ [illegible]

১৭

সৌন্দর্য্যেতে ভোলে মন, তাই ভুলে রব,
এবে করিয়াছি সার,
কিন্তু যেন নাই আর
ক্ষুদ্রাশ্রয়ে এ আমার
সুখভঙ্গ হয় ক্ষণে আশ্রয়ের নাশে,
আত্মত্ব ঢেলেছি তাই সংসার বিকাশে।

১৮

যাক্—
গেছে তক ক্ষুদ্রাশ্রয় কি ক্ষতি আমার ?
সংসারে ভুলেছি আমি,
সংসার আমার স্বামী
তারি কার্য্য অনুগামী
সহিছি এ প্রেমপীড়া সুখের লাঞ্ছনা,
হোক্ মৃত্যু, মৃত্যু মোর সুখের বাসনা।

১৯

ভুলিলে আত্মত্ব তবে মৃত্যু আর কিবা ?
নহে মৃত্যু ভয়ঙ্কর,
সুখের ক্রীড়ার পর,
শান্তির বিরাম ঘর,
এখন এ তথ্য আমি বুঝিয়াছি সার,
এহেন দশায় তাই সন্তৃপ্তি আমার।

২০

যাও নর, ভুল গিয়া পরার্থ-সুখেতে।
উহাতেই পেয়ে সুখ,
বিদ্বেষে হয়ে বিমুখ,
এড়ায়ে জীবন-দুখ,
পরার্থ আমার ব্রত,—তাই যতক্ষণ
ভ্রমে মূল, দিই প্রাণ পরের কারণ।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ।

অদ্য উনবিংশ শতাব্দী। চতুর্দ্দিকে সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের স্রোত তর্ তর্ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ধর্ম্মের মূল পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সামাজিক নিয়মের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, রাজনীতি নূতন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইতেছে, জীবনের লক্ষ্য নূতন আকার ধারণ করিতেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন আবার নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। এই বিশ্বব্যাপী প্রলয়কালে—যখন সকল বস্তুই আমূল আলোড়িত হইতেছে, যখন সুসভ্য দেশ মাত্রই নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিতেছে—জগতের আদি সংস্কারক, সভ্যতা মার্গের প্রথম অধিনায়ক, মানবকুলের শৈশব দোলা, ভারত কেন ঘুমাইয়া রয় ?

যে তারে একদিন আর্য্যহৃদয় পরস্পর-গ্রথিত ছিল, যে তারে একদিন ভারত-বাসী মাত্রেরই হৃদয় অনুস্যূত ছিল, সে তার আজ কেন ছিন্ন ? যে তারের বৈদ্যুতিক বলে এতদিন কতিপয়মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অমানুষী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; যে তারের বৈদ্যুতিক সংযোগে একটী আর্য্যহৃদয়ে আঘাত

লাগিলে একদিন সমস্ত আর্য্যহৃদয় আহত হইত, আজ কেন সেই তার বিযুক্ত? ভারতকে জগতের আদর্শ বলিয়া পরিচয় দিয়া যে আর্য্যজাতি একদিন স্বদেশানুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে আর্য্যজাতি আপনাদিগকে "আর্য্য" (পূজ্য, বা মানবকুলের শ্রেষ্ঠ) এই উপাধি প্রদান করিয়া একদিন স্বজাতিপ্রেমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে আর্য্যজাতি আজ কোথায়? স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের সে জলন্ত দৃষ্টান্ত আজ কোথায়?

যৎকালে ঋক্‌বেদ-প্রণেতা ঋষিগণ কতিপয় বীর পুরুষ ও কতিপয় বণিক্ সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে হিন্দুকুশ বাহিয়া সিন্ধু উত্তরণ পূর্ব্বক পঞ্চ নদ প্রদেশে অবতরণ করেন, তখন তাঁহারা কয় জন ছিলেন? যখন কপালাভরণা কালী তাঁহাদিগের হইয়া অসুরবিমর্দ্দে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা কয় জন ছিলেন? রাক্ষসদিগের উপদ্রবে যখন ঋষিদিগের পদে পদে তপোবিঘ্ন ঘটিত তখন তাঁহারা কয় জন ছিলেন? অভ্রভেদী হিমশৃঙ্গ হইতে পাতাল ভেদী দক্ষিণ পয়োধি পর্য্যন্ত এবং প্রবল স্রোতস্বিনী সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত এই বিশাল ভারতক্ষেত্রের প্রায় সমস্তই তখন অসুর ও রাক্ষসাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল। এই বিশাল ভারতক্ষেত্রের এক সহস্রাংশ মাত্রও তৎকালে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ও উপনিবেশিত হয় নাই। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের সংখ্যার সহিত তুলনায়, তদানীন্তন আর্য্য ঔপনিবেশিক দিগের সংখ্যা অনন্ত সাগরে জলবিন্দু পতনের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইত! অসুর ও রাক্ষসাদি যে শুদ্ধ সংখ্যায় অনন্ত ছিল এরূপ নহে; তাহাদিগের প্রবল পরাক্রমের অজস্র দৃষ্টান্ত প্রাচীন ঋক্‌বেদ হইতে আধুনিক কাব্য পুরাণাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে কি বলে ও কি সাহসে সেই অসংখ্য ও প্রবল শত্রুদিগের বিরুদ্ধে কতিপয় মাত্র আর্য্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন? কি সাহসেইবা তাঁহারা শত্রুসমাচ্ছন্ন ভারতক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিলেন? তাঁহাদিগের কি জীবনে কোন মায়া ছিল না? তাঁহাদিগের কি বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল? অসুর রাক্ষসাদির প্রবল পরাক্রমের সংবাদ কি তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই? জীবনে মায়া না থাকিলে তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অসংখ্য গিরি নদী উত্তরণপূর্ব্বক সুদূর প্রাচ্য প্রদেশে কখনই আগমন করিতেন না। অধিকতর সুখের আশা না থাকিলে তাঁহারা জন্মভূমির মায়া জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। আর বৃহস্পতি যে আর্য্যদিগের উপদেষ্টা, তাঁহাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, এবং চাণক্য যে আর্য্যদিগের মন্ত্রী, তাঁহারা যে ভারতের শূদ্রাসুর রাক্ষসাদির প্রবল পরাক্রমের বিষয় অবগত ছিলেন না একথাও বিশ্বাস-যোগ্য হইতে

পারে না। তবে তাঁহারা কি বলে ও কি সাহসে গিরিনদী-সাগর-পরিবেষ্টিত অনন্ত ভারতক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, এবং অবতরণ করিয়া কি বলে ও কি সাহসেই বা প্রবলপরাক্রান্ত আদিম অধিবাসিদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন? কি বলেই তাঁহারা অবশেষে রাক্ষস ও অসুরকুলধ্বংশ করিয়া অসীম ভারতক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করিলেন? কি বলেই বা শেষে তাঁহারা অসংখ্য বিজিত আদিম অধিবাসিদিগকে বিনয়াবনত দাস করিতে সক্ষম হইলেন? এ মর্ম্মভেদী গভীর প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? স্বজাতি-প্রেমের বলের এরূপ উদাহরণ আর কোথায়?

যৎকালে অসংখ্য জেরাক্সিস-সেনা প্রবল সাগরতরঙ্গের ন্যায় উত্তর গ্রীস প্লাবিত করিয়া থার্ম্মোপিলি সমীপে উপনীত হয়, তখন কি সাহসে ও কি বলে বীরচূড়ামণি লিয়োনিডাস্ ত্রিশত মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে সেই প্রবল সাগরতরঙ্গের প্রতিরোধে বক্ষ পাতিয়া দিয়াছিলেন? কি আভ্যন্তরীণ বলেই বা সালামিস্ যুদ্ধে কতিপয় গ্রীক্‌যোদ্ধা জেরাক্সিসের অনন্ত সেনাসাগরের অপ্রতিহত গতি প্রতিরুদ্ধ করিলেন?

যৎকালে বীরবর হানিবাল্ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ইতালী বিলেড়ান পূর্ব্বক অবশেষে কাণিসমরে অধিকাংশ রোমীয় জননীকে পুত্রবিরহে ও অধিকাংশ রোমীয় পত্নীকে পতিবিরহে বিধুর করিয়াছিলেন, তখন কোন্ দৈবী শক্তি বলে কতিপয় দিবসের মধ্যেই রোমরাজ্য অনন্ত সেনা সংগ্রহ করিলেন?

যৎকালে আফ্রিক্‌বিজয়ী সিপিয়ো জামাসমরে অজেয় হানিবল্‌কে পরাজিত করিয়া দুরন্ত সেনা সমভিব্যাহারে হানিবলের প্রতি প্রতিহিংসা বিধানার্থ কার্থে জাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, তখন কি আভ্যন্তরীণ বলের প্ররোচনায় কার্থেজ্ রমণীগণ রজ্জু ও অস্ত্র প্রস্তুত করণার্থ আপনাদিগের কেশমুণ্ডন ও অলঙ্কারোন্মোচন করিয়াছিলেন?

যৎকালে দৃপ্ত বৃটিশসিংহ সোদরপ্রতিম আমেরিকাবাসীদিগের ক্রন্দনে বধির হইয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের উপর কর স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন, তখন কি বলে অস্ত্র শস্ত্রে অসজ্জিত. শিল্প-বাণিজ্য-বিবর্জ্জিত আমেরিকা বৃটিশসিংহের গতিরোধ করিতে সাহসিনী হন? যখন আমেরিকা বৃটিশসিংহের কোপানলে পতিত হন, তখন আমেরিকাকেও সামান্য সূচিকা হইতে পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত গৃহসামগ্রীর জন্যই বৃটনের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। ভারত অপেক্ষাও আমেরিকা তখন বৃটনের অধিকতর মুখাপেক্ষিণী ছিলেন; ভারতে স্বদেশজাত অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়, কিন্তু তৎকালে আমেরিকাকে চিনিটী পর্য্যন্তের জন্য বৃটনের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। এরূপ অবস্থায় কি বলে আমেরিকা দৃপ্ত বৃটিশসিংহের কোপানল

উদ্দীপিত করিতে সাহসিনী হইলেন? কি আভ্যন্তরীণ তেজ তাঁহাদিগকে বহির্জ্জাত দ্রব্যমাত্রেরই ব্যবহার হইতে একেবারেই নিরস্ত করিল? কোন্ বলেইবা তাঁহারা অচিরকাল মধ্যেই আপনাদিগের সমস্ত অভাব বিদূরিত করিতে পারিলেন? কোন্ বলেই বা নিরস্ত্র বীরশূন্য মার্কিন্ভূমি অচিরকালমধ্যে অনন্ত-বীর-প্রসবিনী হইয়া উঠিলেন? কোন্ বলেই বা এই অনতিপ্রৌঢ় বীরমণ্ডলী বৃটিশ বীরকেশরীদিগকে রণে পরাস্ত করিলেন? যে আমেরিকা একদিন বৃটনের পদভরে বিকম্পিত, যে আমেরিকা এক দিন কিশোরবয়স্কা বালিকার ন্যায় সকল বিষয়েই বৃটনের মুখাপেক্ষিণী, যে আমেরিকা একদিন অনন্ত জাতি-সাগরে একটী নগণ্য জলবুদ্বুদ, আজ কোন্ বলে সেই আমেরিকা—জগতের সভ্যজাতিগণের অগ্রগামিনী? কেন আজ সেই স্বগর্ব্বাচ্যুতা দুহিতার বীরদর্পে বৃদ্ধা বৃটনজননী কম্পিত-কলেবরা?

অজেয় জর্ম্মান্ সেনা রাজরাজেশ্বরী পারিনগরী অবরোধ করিল; দিন গেল, পক্ষ গেল, মাস গেল, অর্দ্ধ বৎসর অতীত হইল; ক্রমে ধনাগার শূন্য, অস্ত্রাগার শূন্য, খাদ্যাগার শূন্য; ক্রমে শৃগাল কুক্কুর অশ্ব মূষিক ভেক প্রভৃতি মনুষ্যের অখাদ্যও উপাদেয় খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইল; তথাপি কোন আভ্যন্তরীণ বলে বলীয়ান হইয়া বীরকেশরী ফরাশিগণ অদমিত বীর দর্পে শত্রুসেনার ভীষণ গর্জ্জন উপেক্ষা করিলেন? কোন্ বলেই বা তাঁহারা তাদৃশ বিপৎপাতের পরও অচিরকাল মধ্যেই পরাজয়ের নিষ্ক্রয় স্বরূপ অগণিত মুদ্রা উত্তোলিত করিলেন? কি বলেই বা সেই মৃতপ্রায় জাতি প্রতাপে আবার দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিল?

আবার যাও, একবার ইতালীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যে ইতালী এক সময় তদাপরিজ্ঞাত জগতের অধীশ্বরী ছিলেন, যে ইতালী ইউরোপে দুইবার সভ্যতা ও স্বাধীনতা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই ইতালী প্রায় সহস্র বৎসর দাসত্বে জর্জ্জরিত-প্রায় হইয়াছিলেন; ইতালীর নাম লুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল; ইতালীর ইতিহাস বৈদেশিক প্রবঞ্চকদিগের অসত্য বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইতালীর বীর পুরুষগণ নির্ব্বাসিত, জহ্লাদ হস্তে হত, কারাগারে রুদ্ধ বা অন্যান্য নানা নিষ্ঠুর উপায়ে পর্য্যুদস্ত হইতেছিলেন; পুণ্য ভূমি ইতালী ভীষণ শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তথাপি কোন দৈবীশক্তি বলে সেই ভীষণ প্রেতভূমি হইতে, সেই বীরপুরুষগণের রুধির সিঞ্চনে, আবার দুই প্রকাণ্ড বীরতরু অভ্যুত্থিত হইল? কোন্ আভ্যন্তরীণ বলে ঋষিপ্রবর ম্যাট্‌সিনি ও বীর-চূড়ামণি গ্যারিবল্‌ডি সেই শ্মশান ভূমিতে বহুদিনের পর আবার জীবন সঞ্চার করিলেন? কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়াই বা অসংখ্য ইতালীয় বীর পুরুষ স্বদেশ-উদ্ধারব্রতে জীবন আহুতি প্রদান করিলেন?

আজ কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর মাত্র ব্রিটিশকেশরী ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। এই অল্পকাল মধ্যে কোন্ দৈবী শক্তি বলে ব্রিটিশ কেশরীর গর্জ্জনে সমস্ত ভারত কম্পান্বিত? আজ কয় দিন হইল কয় জন মাত্র শ্বেত বণিক্ পশ্চিম সাগরের উপকূলে আসিয়া কেমন অদ্ভুত কৌশলে ধীরে ধীরে গগন-স্পর্শী হিমশৃঙ্গ হইতে সিংহল ও আফ্গানস্থান হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য বিস্তার করিল! কেন এই কয়েকটী মাত্র শ্বেত পুরুষের সম্মুখে মোগল পাঠান মহারাষ্ট্র সীক একে একে সকলেই বায়ুর নিকট তুষের ন্যায় উড়িয়া গেল? কেন আজ এই গুটি কত শ্বেত পুরুষের সম্মুখে বিংশতি কোটী ভারতবাসী মৃৎপুত্তলীর ন্যায় নিস্পন্দ ও নীরব? কেন আজ কাশ্মীর, সিন্ধু, বরদা, হোলকার, সিন্ধিয়া, নিজাম, নেপাল, ভূটান সকলই এই শ্বেত-চরণে লুণ্ঠিত-শির? কেন আজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের নিকট গললগ্নকৃতবাস? রাজরাজেশ্বর হইয়া কেন আজ আমরা পথের ভিখারী? রত্ন প্রসবিনী জননীর সন্তান হইয়া কেন আজ আমরা অন্নের কাঙ্গালী? জগতের সভ্যতামার্গের নেতা হইয়া, কেন আজ আমরা লজ্জা নিবারণের জন্য শ্বেত দ্বীপের মুখাপেক্ষী? জগতের শিক্ষক হইয়া, কেন আজ আমরা সকলের অশ্রদ্ধার ভাজন? বীরত্ব রত্নাকর ভারতের সন্তান হইয়া, কেন আজ আমরা সকলের চরণতলে? যে সিংহাসন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিল, কেন আজ সেই সিংহাসন শূন্য? যে বেদি একদিন ঋক্ ও সামগায়ী ঋষিবৃন্দ দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছিল, কেন আজ সেই বেদি নীরব? যে ক্ষত্রিয়-জানু ও ক্ষত্রিয় শির কেবল অভীষ্ট দেবতা ও বেদগায়ী ব্রাহ্মণগণের নিকটই বিনত হইত, কেন আজ সেই ক্ষত্রিয়-জানু ও ক্ষত্রিয়-শির সদা-বিলুণ্ঠিত? যে আর্য্যপতাকা একদিন জগতে হিন্দুজয় ঘোষণা করিয়াছিল, কেন আজ সেই আর্য্যপতাকা ধূলি-বিলুণ্ঠিত? যে আর্য্যজাতির সময় একদিন নিরন্তর অসুরবিমর্দ্দে অতিবাহিত হইয়াছে, কেন আজ সেই আর্য্যজাতির সময় নিরন্তর মসীমর্দ্দনে ও পাদুকাবহনে অতিবাহিত হইতেছে? যে আর্য্যজাতির সেনা একদিন পারস্য আফ্গান বিদলিত করিয়া, সুদূর স্কন্দনভ (Scandinavia) পর্য্যন্তও উন্মথিত করিয়াছিল, দূরতম আমেরিকাপর্য্যন্তও বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, কেন আজ জগদুন্মাথিনী সেই আর্য্যসেনা মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভোগীর ন্যায় নিস্পন্দ ও নির্জ্জীব? যে আর্য্যজাতির রণতরি একদিন পূর্ব্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে—জাবা, সুমাত্রা, সিংহল, সকট্রা, মিসর প্রভৃতি আলোড়িত করিয়াছিল, কেন আজ সেই আর্য্যজাতি সমুদ্রযাত্রায় ভীত? যে আর্য্যললনা একদিন বক্ষঃস্থল হইতে স্তন্যপায়ী শিশুকে উন্মোচিত করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন, কেন আজ সেই আর্য্যললনা

পুত্রকন্যাগণের সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের প্রতিকূল? যে আর্য্যবীরনারী এক দিন স্বামী সঙ্গে অসিহস্তে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বদেশহিত ব্রতে সোণার অঙ্গ আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, কেন আজ সেই আর্য্যনারী স্বামীর স্বদেশানুরাগ প্রদর্শনের অন্তরায়? যে আর্য্যবীরনারী একদিন ধনুর্নির্ম্মাণার্থ অঙ্গের স্বর্ণাভরণ খুলিয়া দিয়াছেন, আবার সেই ধনুকের ছিলা নির্ম্মাণার্থ একটী একটী করিয়া মস্তকের কেশ কাটিয়া দিয়াছেন, আজ কেন সেই আর্যনারী স্বদেশ-হিত ব্রতে আত্মত্যাগ-বিধুরা?

যে আর্য্যাবর্ত্ত একদিন কুরুক্ষেত্র রণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলেন, কেন আজ সেই বীরভূমি বীর শূন্য? যে আর্য্য তেজ একদিন দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের অপ্রতিহত গতি রোধ করিয়াছিল, কেন আজ সেই আর্য্য-তেজ প্রভাহীন? যে আর্য্য-প্রতাপের সম্মুখীন হইতে একদিন বীরবর মহম্মদ ঘোরীও ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন, কেন আজ সে প্রতাপ তেজোহীন? সহস্র বৎসরের দাসত্বেও যে প্রতাপ নির্ব্বাপিত হয় নাই, কেন আজ সে প্রতাপ নিষ্ক্রিয়? মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে, সীক যুদ্ধে, যে বীর্য্যবহ্নি বিস্ফুরিত হইয়াছিল, কেন আজ সে বীর্য্য-বহ্নি নির্ব্বাণপ্রায়? যে ভারত-সন্ততিগণ একদিন বীর-দর্পে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন, কেন আজ সেই ভারত-সন্ততিগণ বীরত্বে মেষ প্রায়? কি শাপে আজ ভারতের এ দুর্দ্দশা? কি পাপে আজ ভারত শ্মশানপ্রায়?

এ হৃদয় আলোড়ন-কারী গভীর প্রশ্ন সকলের কে মীমাংসা করিবে? কিসের অভাবে ভারতের এ দুর্গতি? কিসের জন্য পাশ্চাত্য দেশ সকলের এত উন্নতি? এই প্রশ্নের একই মীমাংসা—একই উত্তর! স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব ও সত্তা! স্বদেশ-হিতব্রতে জীবনের পূর্ণ আহুতির ভাবাভাব! ইহার অভাবে ভারতের এ দুর্গতি—ইহার ভাবে পাশ্চাত্য দেশ সকলের এত উন্নতি। যাও আমেরিকায় যাও, যাও শ্বেতদ্বীপে যাও, বীরভূমি ফ্রান্সে যাও, যাও জগদীশ্বরী ইতালীতে যাও, যাও জার্ম্মাণীতে যাও, যাও মৃতোত্থিত গ্রীসে যাও, যাও জগদ্বিজয়ী রুসে যাও, তাঁহাদিগের স্ব স্ব দেশের বিরুদ্ধে একটী কথা বল, দেখিবে অচিরাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে! দেখিবে বাল হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, কৃষক হইতে রাজা পর্য্যন্ত, মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত, অধিক কি বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত, সকলেই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবে! জলে, স্থলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে—যিনি যেখানে আছেন, স্বদেশ ও স্বজাতি তাঁহার এক মাত্র উপাস্য দেবতা, এক মাত্র চিন্তার বিষয়। শয়নে স্বপ্নে, অশনে, উপবেশনে, লেখনে কথনে, স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান। তাঁহার প্রতি কার্য্য ও প্রতি চিন্তায় স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত।

সাহারার ভীষণ মরুভূমিতে, গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের তুহিনরাজিসমাচ্ছাদিত অনুর্ব্বর প্রদেশে, হিমালয়ের অত্যুঙ্গ শিখরে, অসভ্য-দস্যু-সমাচ্ছন্ন মধ্য আসিয়ায়—একটী ইউরোপীয় যে যেখানে আছে স্বদেশের ও স্বজাতির পরিরক্ষণীয়। একটী ইউরোপীয়ের কেশ স্পর্শ কর, একটী ইউরোপীয়ের প্রাণ নাশ কর, দেখিবে তাহার জাতি ও তাহার দেশ, তোমার জাতি ও তোমার দেশকে রসাতলে দিবে। দেখিবে সেই ক্রোধানলে তোমার জাতি তোমার দেশ, চির-জীবনের জন্য স্বাধীনতা-হারা হইবে। এক অন্ধকূপ-হত্যার অপরাধে মুষলমানেরা চিরকালের মত ভারত হারাইল! এক মার্গেরি সাহেবের মৃত্যুতে চীন ব্রহ্ম চলস্থূল! এক সৈনিক বধে আবিসিনিয়া সমাকুল!

প্রত্যেক ইউরোপীয়ের হৃদয় স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমে বিচ্ছুরিত। তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ, কাম মোক্ষ সমস্তই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম। তাঁহার স্নেহ, তাঁহার ভক্তি—প্রবলতর হৃদয়ভাব স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমের অন্তর্লীন। আমাদিগের রাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অব্ এডিন্‌বরা স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া পত্নী-প্রেমে বিসর্জ্জন দিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্‌স, ইতালী, আমেরিকা প্রভৃতিতে স্বদেশানুরাগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পাঠকগণকে আক্রান্ত করিতে চাহি না। যাহা প্রদত্ত হইল—যদি দৃষ্টান্তের উদ্দীপনা শক্তি থাকে—ইহাতেই স্বদেশবাসিগণের অন্তরে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত হইতে পারিবে।

বহুদিনের দাসত্বে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম ভারতবাসিদিগের হৃদয় হইতে একবারে উন্মূলিত হইয়াছে। যে প্রবল স্বজাতি-প্রেমের বলে একদিন কতিপয় মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অনন্ত ভারত ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, আবার যে প্রবল স্বজাতি-প্রেমের বলে এক্ষণে একতিপয় মাত্র শ্বেত বণিক্ ভারতে অভূত-পূর্ব্ব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, সে স্বজাতি-প্রেম ও সে স্বদেশানুরাগ ভারতবাসীর হৃদয় হইতে এক্ষণে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ইংলণ্ডের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সেই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম ধীরে ধীরে দুই একটী মনীষীর হৃদয়-কোটরে প্রবেশ করিতেছে। ইংলণ্ডের উদ্দীপক সাহিত্য ও স্বাধীন ইতিহাস ধীরে ধীরে দুই চারি জনের অন্তরে সেই মূল মন্ত্র—স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম—উদ্বোধিত করিতেছে। ইংলণ্ড! তোমার নিকট যদি আমরা কোন বিষয়ে ঋণী থাকি, তবে ইহারই জন্য। কিন্তু তোমার ভাষা, তোমার দৃষ্টান্ত, ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর কয় জনের অধিগম্য? এক লক্ষ লোকের নিকটও ইহা অধিগম্য কি না সন্দেহ। অবশিষ্ট উনবিংশ কোটী একোন-শত লক্ষ লোকের স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগ শিক্ষার কি উপায়?

ইংলণ্ড! শুনিয়াছি তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য; একবার চক্ষু বুজিয়া, সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ তোমার অসংখ্য প্রজার উদার শিক্ষায় বিন্যস্ত কর; উদার শিক্ষা বিধান দ্বারা তোমার বিংশতি কোটী প্রজাকে স্বদেশহিত-ব্রতে দীক্ষিত কর; তাহাদিগকে স্বদেশহিত-ব্রতে জীবনকে পূর্ণাহুতি দিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য আত্ম ভুলিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশের জন্য স্বদেহের রুধির বিন্দু বিন্দু করিয়া বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দাও; পিতা যেমন শিশু সন্তানকে হাঁটিতে শিখায়, তেমনই ধীরে ধীরে আমাদিগকে স্বাধীনতার পথে লইয়া চল; যখন আমাদিগকে স্বাধীন ভাবে চলিতে সমর্থ দেখিবে, তখন আমাদিগকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বন প্রদান কর; তোমার জ্যেষ্ঠের সন্ততিগণকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত কর। ইংলণ্ড! এ সৌভাগ্য কয় জনের অদৃষ্টে ঘটে? ইংলণ্ড! এই অনন্ত কীর্ত্তি তোমার হস্তেই রহিয়াছে। ইংলণ্ড! এই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক জ্যেষ্ঠ-সন্ততিগণের ধন, মান, প্রাণ সকলই তোমার হস্তে। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের উদার শিক্ষা বিধানপূর্ব্বক তাহাদিগকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পার ও তাহাদিগের ন্যস্ত ধন তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে পার; আবার ইচ্ছা হইলে তাহাদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে চির-অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিতে পার। একে অনন্ত কীর্ত্তি ও অক্ষয় স্বর্গ! অপরে অনন্ত অপযশ ও অনন্ত নিরয়! এক্ষণে তোমার যাহা অভিলাষ!

আবার ভারতবাসি! তোমায় বলি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, আমেরিকা প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তেও যদি তোমার স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত না হয়, যদি ইহাতেও তুমি একতা ও আত্মত্যাগ শিখিতে না পার, যদি ইহাতেও তোমার মনে জাতিগত ও দেশগত গৌরবের ভাব অঙ্কিত না হয়, যদি ইহাতেও তুমি প্রত্যেক ভারতবাসী ও প্রত্যেক জাতীয় ভ্রাতার জন্য ধন, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে না শিখ, যদি ইহাতেও তুমি কেবল আত্ম লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাক, তাহা হইলে বুঝিব যে নরকেও তোমার আর স্থান নাই! তাহা হইলে বুঝিব যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও আমেরিকার পবিত্র নাম গ্রহণে তোমার কোন অধিকার নাই! বুঝিব তুমি মৃণ্ময়, সুতরাং, মৃৎপিণ্ডে ইংলণ্ড প্রভৃতির উদার শিক্ষা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইল না! 'প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।' বিশুদ্ধ মণিই বিম্বগ্রহণে সমর্থ, মৃৎপিণ্ড নহে। জাপান সেই বিশুদ্ধ মণি, এই জন্য জাপানেই ইংলণ্ড প্রভৃতির উদার শিক্ষা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইল! ভারতবাসি! ইহাতেও যদি তোমার চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে আর তোমার আশা নাই!

মেহের আলি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ফজরআলির গৃহে আমীরজান একাকিনী বসিয়া আছেন। যে স্ফূর্ত্তিযুক্তা চপলা পরিহাস-প্রিয়া সতেজ রমণী মেহেরন্নিসাকে সর্ব্বদা সাহস ও উৎসাহ দিতেন, এখন যে সেই রমণীই শয্যাতে বসিয়া আছেন চেনা ভার। শরীর শীর্ণ ও স্ফূর্ত্তি-বিহীন হইয়াছে। বদনের সে গোল গোল চাকচিক্যময় ও সুপুষ্টি শ্রী নাই। নয়নের যে শ্বেতবর্ণে সতত হাস্য ভাব প্রকটিত হইত, এখন তাহা পাংশুবর্ণ হইয়াছে। অস্থিময় শরীর, সচিন্তভাব ও বিমর্ষ বদন দৃষ্টে যথার্থই যে দেখে তাহার দুঃখ হয়। আমীরজান শয্যায় বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন।

এ বিপরীত ভাব কেন? যে অবধি মেহেরন্নিসা ভবন ত্যাগ করিয়াছেন, নানা কারণে আমীরজানের দশা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যে সতীর সতীত্ব রক্ষার্থ আমীরজান বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ জন্য সতত ব্যস্ত ছিলেন, সে তাঁহার পতির তাড়নে কোথায় লুকাইয়াছে। তাঁহাকেও সে হয়ত অবিশ্বাস করিতেছে! নয় ত সংবাদ দেয় না কেন? অথবা সে অধিকতর বিপদে পড়িয়া আত্ম-বিনাশ করিয়াছে। পরোপকারী ব্যক্তির মনে এ চিন্তা মর্ম্মভেদী। আবার তৎসঙ্গে তৎসঙ্গে আমীরজানের পতিরও পত্নীর প্রতি বিসদৃশ অনাস্থা হইয়াছে। পত্নীর ব্যাঘাতে এমন রূপ-ললাম ফজরআলির হস্তগতা হইয়া ভোগে এল না, এ রাগ কি যায়? যত দিন না লোকে পাপ-সাগরে নিমগ্ন হয়,—লোক-লজ্জা, নিন্দা-ভয়, আত্মীয় জনের অসন্তোষ-আশঙ্কা, সজীব থাকে। যেই অন্তর পাপ-ভরা হয় এবং সেই পাপ উথলিয়া কার্য্যে প্রকাশ হয়, সেই লজ্জা নিন্দা আশঙ্কা ভাদ্র মাসের বন্যা জলে কোথায় ভাসিয়া যায় বলা যায় না। এতদিন আমীরজানকে তাঁহার স্বামী শ্রদ্ধা করিতেন, ভয় করিতেন, এখন আর সে ভাব নাই। বিরাগ, বিতণ্ডা, বিস্বাদ উক্তি এবং সর্ব্বাপেক্ষা কটুতম—উপেক্ষায়—আমীরজান শুকাইয়া যাইতেছেন। ফজরআলির চরিত্র মন্দ হইয়াছে।

ফজরের চরিত্র মন্দ হইল কেন? তিনি স্বীয় খুল্লতাত আসগরআলির সহবাসে যে কোন দুষ্টতা, প্রবঞ্চনা, ও দুরভিসন্ধি শিক্ষা করুন না, তাঁহার চরিত্র মন্দ ছিল না। বিশেষতঃ প্রেমময়ী রসিকা আমীরজানের সহবাসে তিনি বড়ই প্রীত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। রূপের লোভে, গৌরবের লোভে, মেহেরন্নিসার আকাঙ্ক্ষী হয়েন। তখনও তিনি আমিরজানের প্রেম ভুলেন নাই, অশ্রদ্ধা অনাস্থা করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। তাঁহার সর্ব্বদা ইচ্ছা

ছিল, যদি আমীরজান বুঝে, তাঁহাকে বুঝান, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখার্থ অপরারমণী ভোগে,—প্রাণের পুত্তলি প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি অনাস্থা হইবে না, হইতে পারে না। একদিন সাধ করে কেহ ফলাহার করিলে কি চিরকালের অন্নকে অনাস্থা করিতে পারে ?

যে অবধি মেহেরন্নিসা হরণার্থ ফজরের কল্পনা চালিত হইল, ফজরের চরিত্র মন্দ হইতে লাগিল। ফজর যে দিন প্রথমে মেহেরের ঘরে প্রবেশ করেন, তাহার পূর্ব্বে কতবার যে কল্পনায় ঐ কার্য্য করেছেন, কতবার যে মনে মনে মেহেরকে উপভোগ করেছেন—কে জানে ? কল্পনাই মনুষ্যের বন্ধু, কল্পনাই মনুষ্যের পরম শত্রু। প্রথমে যখন মন্দ ইচ্ছা হয়,—কল্পনায় তাহা উপভোগ হয়—মনে মনে হচ্চে কেহ দেখিবে না, জানিবে না, ভয় কি, লজ্জা কি ? কাহার ত কোন অপকার করা হইতেছে না, ইহাতে দোষই বা কি, পাপই বা কি ? এই সকল পাপের প্ররোচনায় মন দূষিত হয়। যখন মনের রোগ বাড়ে, যখন মন পাপ-ভরা হয়,—মন ফাটিয়া যায়—পাপ কার্য্যে নামে। লোকে মনে করে দ্বার বন্ধ করে মদ খাইব, কে জানিবে ? কিন্তু মত্ত হইলে দ্বার খুলে খানায় পড়িতে কোন বাধা দেখা যায় না। যেমন মল্লযুদ্ধের পাঁইতারা, নাপীতের ক্ষুর শানান, তেমনই পাপ-কার্য্যের উদ্যম পাপ-চিন্তা, দুষ্ট কল্পনা। প্রথম উদ্যম আমীরজানের কৌশলে ভঙ্গ হইল; কিন্তু তাহার ফল গেল না। এখন কিসে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে এই চেষ্টা হইল এবং ফজর আলি দ্বিতীয়বার মেহেরের ঘরে গিয়া অধিক সফল হইলেন। এবার আর মাথা ঘুরিল না, সাহসে স্বকার্য্য সাধনে ব্যস্ত হইলেন। নৃত্য করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর অবগুণ্ঠনে প্রয়োজন কি ? ফজর আলি নিষ্ফল হইয়াও দুঃসাহসী হইয়াছেন। পরনারী-ভোগলালসা এত উদ্দীপ্ত হইয়াছে যে যতক্ষণ না সে "দিল্লীকা লাড্ডু" আহার করেন, নিস্তার নাই। প্রতিবাসিনী একটী রমণী শীঘ্র ফজরের হস্তগত হইল এবং ফজর প্রকাশ্যেই দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিলেন।

আমীরজানের তিরস্কার, লাঞ্ছনা, উপহাস সহ্য করা দূরে থাকুক, ফজর আলি তাঁহার স্ত্রীর বিমর্ষ ভাব ও ক্রন্দনেও বিরক্ত হয়েন। কটূক্তি, অশ্রদ্ধা ও প্রহার পর্য্যন্ত আমীরজানের সহ্য হইয়া আসিয়াছে। যখন ভাবেন তখনই আমীরজান বিমর্ষ হয়েন, আবার বলেন "দূর হউকগে ভেবে মরি কেন ?" এজন্য তাঁহার অতি অস্থির ভাব হয়েছে। এক এক বার গম্ভীর, মলিন, সচিন্ত ভাব; এক এক বার পূর্ব্ববৎ চপল ভাব। আমীরজান বসিয়া বেড়ার গায়ের বল্মীক গৃহ ভাঙ্গিতেছেন ও ভাবিতেছেন। যাহাতে কীট নাই এমন ঘর ভাঙ্গিলেন, আর তাহা পূর্ণ হইলনা। একটীতে কীট ছিল, যেমন ভাঙ্গিলেন, কীটেরা অবিলম্বে সে ভগ্ন

স্থল পূর্ব্ববৎ করিল। আমীরজান দেখিলেন ও হাসিলেন; ঘর ভাঙ্গিলে আবার গড়ে। জীব থাকিলেই গড়ে; যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তবে কেন এত দুঃখ, এত অভাব ভাবনা? আমীরজান হাসিলেন, একটী পান খাইলেন, দর্পণ আনিয়া এলোথেলো চুল বাঁধিলেন। এখন মুখশ্রীতে সেই যে চপলা আমীর জান, বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল। না হইবে কেন? প্রকৃতি মরিলেও যায় না।

এমত সময় আমীরজানের পিত্রালয়ের দাসী আবজানি গৃহ-দ্বারে উপস্থিত। "কিলো আবজানি! এতক্ষণে তোর বার হলো!"

আবজানি। "কি করিব দিদি ঠাকুরুণ, খানা পেকয়ে বাসন ধুয়ে আস্‌ছি, পান পর্য্যন্ত এখনও খাই নাই।"

আমীরজান একটী পান দিয়া কহিলেন, "বোস্‌ তোর সঙ্গে দুটা রঙ্গরসের কথা আছে।"

আবজানী হাসিল, চক্ষু হস্তুতে বুজিয়া গেল কাল কাল দাঁতগুলি বাহির হইল ও বিকটাকার এক মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। আবজানি কহিল, "সে কি দিদিঠাকুরুণ্‌! আমরা কি তোমার অঙ্গ অসের লোক? দাদাঠাকুরকে ডাক না।"

আমীর। দূর পোড়ারমুখী, তোর দাদাঠাকুর কত জায়গায় রঙ্গ করে বেড়াচ্ছে, এখানে কি আসে?

আবজানি। ওমা সে কি গা? এতেও আসবে?

আমীর। পরের বাড়ী রাত্রিতে নয় ও কি দিনের বেলা রঙ্গরস হয়? রাত্রিতে তুই তোর দাদাঠাকুরকে লয়ে যাস্‌—কত রঙ্গরস পাবি!

আবজানি আবার হাসিল, সে মূর্ত্তি দেখা অভ্যস্ত না হইলে আমীরজান ভয় পাইতেন।

আবজানি। ওকি গা? অমন কথা কেন? আমাদের কি অমন কপাল?

আমীরজান। "তোর কপাল মন্দ কি? আমার চেয়ে ভাল।" এমত সময় ফজরআলির আসিবার শব্দ পাইয়া বলিলেন, "এই দেখ তোকে হাতে হাতে সঁপে দিই।"

ফজর আলি আসিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন ও আমীরজান পান সাজিতেছেন দেখিয়া একটী পান চাহিলেন এবং আমীরজান আবজানিকে দিয়া পাঠাইলেন। ফজর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আবজানি কি তোমার একটীন্‌, নড়ে বস্‌তে পাব না?" সেই দন্ত-চর্ব্বিত বাক্যে আমীরজানের যেন অস্থি চর্ব্বিত হইল। তথাপি সহ্য করিয়া কহিলেন "আবজানি যে আজ রাত্রে তোমাকে তাহার ঘরে নিমন্ত্রণ করিতে এসেছে। তা আমার সাম্‌নে পানটা খেতে দোষ কি?" ফজরআলি রোষ-কষায়িত লোচনে কহিলেন, "যত বড় মুখ তত বড় কথা! চক্ষে পাণি না পাড়ালে বুঝি থাকিতে পার না? ফের যদি উপহাস করিবে লাথিতে মুখ

ভেঙ্গে দিব।" বলিয়া ফজরআলি চলিয়া গেলেন ও কহিলেন "কাল সকালে আসিব সকাল সকাল ভাত করে রেখ।"

আমীরজান অপমানে নীরব রহিলেন, এবং ফজর আলি চলে গেলে বলিলেন, "দেখ্‌লিলো আবজানি! কত রঙ্গ রস দেখ্‌লি? আমার শরীরে যদি একটু রস থাকিত দুই চক্ষু দিয়া নদী ভেসে যেত।"

আবজানি। তাইতগা, দাদাঠাকুর এত বদ্ হয়েছেন্; ঐজন্য মাঠাকুরুণ্ তোমার জন্য দুঃখ করেন।

আমীর। দুঃখ কিসের? যে যেমন তাহাকে তেমনি ব্যবহার করিতে হয়। আমি কি ওর শাসনে কি প্রহারে ভয় করি? ও সব সহে গেছে। তুই না থাক্‌লে আজ সত্য সত্যই আমার মুখ ভেঙ্গে দিত। এমন পোড়ার মুখোর হাতে পড়ে আমার অঙ্গ কালী হল।

এখন উপায় কি বল দেখি, আবজানি?

আবজানি। আমি কি বলিব, তোমাদের বড় ঘরের বড় কথা, আমরা হলে অমন ভাতার কে ফেলে পালাইতাম।

আমীর। আবজানি! ঠিক বলেছিস অমন ভাতার চাহিনা, কিন্তু পলাব কোথা?

আবজানি। কেন বাবা ঠাকুর কে বলে তালাক করোনা, আর একটা মনের মত নিকাহা করে সুখী হইবে।

আমীর। সে ভাতারটাও যদি অমনি হয়?

আবজানি। তবে আর উপায় কি?

আমীর। উপায় নাই?—ওরা যেমন পাঁচ ফুলের মধু খেয়ে বেড়ায়, আমরা কি পাঁচটা মাছি ডেকে আন্‌তে পারিনা?

আবজানি। ওমা! ভদ্দর ঘরে কি ও হয়? তোমার আমার ঘরে একদিন তা চলে।

আমীর। আবজানি, যা চালাও তাই চলে। তোকে একটা গোপনে কথা বলি কাহাকেও বলিবিনা শপথ করিতে পারিস্?

আবজানি। তোমার কথা কি কাহাকে বলিব, আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিতেছি কাহাকেও বলিবনা। তুমি যাতে সুখী থাক, আমারও সুখ তাতে।

আমীর। আজ সন্ধ্যাকালে তবে এখানে, আসীস্; আমার এক উপপতি আছে, তার কাছে তোকে সঙ্গে করে যাব।

আবজানি অবাক্ হইয়া কহিল "সত্য?"

আমীর। সত্য না কি মিথ্যা? তুই কি বলিস; আমার ভাতার ঘরে আসেনা আমি আর এক ঘরে যাবনা? আমার কি সুখেচ্ছা নাই?

আবজানি। আমি তোমার দোষ দিতে পারিনা, তবে কিনা, তোমাদের ভদ্দর ঘরে—"

আমীরজান ২টা টাকা আবজানিকে দেওয়ায় আবজানি অমনি বলিল "যাবেই তখুব করিবে। মেয়ে মানুষ কি চোর-দায়ে ধরা পড়েছে? দিদিঠাকরুণ, আমি ঠিক সন্ধ্যাকালে এস্‌ব, তৈয়ার হয়ে

থেকো—নরকে যেতে বল আবজানি কোমর বেঁধে আছে।”

আমীরজান,” আবজানির প্রকৃতি জানিত, কিছু টাকা দিলে ও খোসামোদ করিলে সে সব করিতে পারে। আমীর জান ঐ দিবস মেহেরন্নিসা হইতে এক পত্র পাইয়াছেন।, মেহের জীবিতা আছেন,—নানা ঘটনার পর অরণ্যে গিয়াছেন। আমীরজান হইতে কিছু আহার দ্রব্য ও সাহায্য চাহিয়াছেন এবং একবার দেখা করিতে চাহিয়াছেন। আমীর জানের বড় আহ্লাদ সখীকে দেখিবেন। বনে বনেই স্বীকার—তথায় যাইবেন। সঙ্গে কারে লন্; আবজানিই উপযুক্ত পাত্র। গোপনীয় ব্যাপার; আবজানিকে উপপতির কথা বলিলে সে বুঝিবে ওকথা প্রকাশ-যোগ্য নহে। তাই রঙ্গ করিয়া অমন কথা কহিতে ছিলেন। নয়ত, ফজর আলি যত কেন উৎপীড়ন করুন না, আমীরজানের সতীত্ব চঞ্চল হইবার নহে। সন্ধ্যা হইল, আবজানি আসিল এবং আমীরজান আবজানীর সম্বন্ধে চাউল ডাউল লঙ্কা ও মৎস্য কিছু পোঁটলা বাঁধিয়া দিয়া ঝবঝব্যা বটতলাভিমুখে গেলেন।

যেই ঝবঝব্যা মসজিদ পার হইয়া যথার্থই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল, আবজানি কহিল “দিদি ঠাকরুণ সত্য সত্যই বনে যাচ্ছেন। কেন আপনার পেয়ারকে আমার ঘরে আনাননী—ব্যেহ টের পাবে না।”

আমীর। তোর সাহস না থাকে তুই মসজিদে থাক্ আমি অগ্রসর হই।

আবজানি আমতা আমতা করিল এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পরে দুই একটী পাহাড় পার হইয়া যেই আর একটী পাহাড়ের কাছে আসিয়া একটী আলোক দেখা গেল, আমীরজান আবজানিকে মসজিদে পাঠাইয়া একাকিনী বোচ্কা সহ আলোকাধিষ্ঠান এক কুটীর দ্বারে উপনীত হইলেন। আবজানি যাইতনা, তবে আমীরজান কহিয়া ছিলেন তাহাকে দেখিলে তাঁহার উপপতি আস্‌বে না। “কেন?” “তাঁহাকে দেখিলে তুই মূর্চ্ছা যাবি।” “কেন?” “সে ভূত।”

আবজানি। ভূত আবার মানুষের উপপতি হয়?

আমীর। ভূত না হলে কি এত রেতে বনে আস্‌তে হয়। রঙ্গ রস সব জাতেরই আছে, ভূতের কি পেত্নী ছাড়া আর কাহার কাছে যাইতে সাধ নাই? আর মানুষেরও কি মানুষ ছাড়া ভূতের কাছে যাইতে নাই? আবজানি বুঝিল হবেইবা, কহিল “আল্লা! আমাকে মসজিদে রেখে এস।” আমীর কহিল, “ভয় নাই ভূত আমার পোষা, তুই মসজিদে যা, দেবতার ঘরে ভয় কি?”

ক্রমশঃ।

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি।

ব্রজ-বিপিন।

সময় সন্ধ্যা।

(শ্রীকৃষ্ণ, সিদাম, সুবল ইত্যাদি রাখালগণ আসীন)

কৃষ্ণ। সখে!——

অপরূপ পেখনু যমুনা-কিনারে
নীল-চল-সলিলে কনক-নলিনী!
যুগল পয়োধর মগন সলিলে
রতি-পতি-বাঞ্ছিত রতনাবলি
গ্রীবা ঘেরই খেলত সুনীল সলিলে
—থর থর কম্পিত অধীর সমীরে!
বাধই পয়োধরে মৃদু কল নাদে
চলল জল রাশি উজলি যমুনে
মুকুতা-ফলে ঘেরই কনক প্রতিমা!—
যুগল ভুজ-লতা তুলল রাই
রাগ রাগিণী ক্বণ বাজল বলয়ে!
নখ চন্দ্র-দলে যতনে মিলই
কবরী এলায়ল নীরদ-সলিলে—
শোভল ভানু বালা শ্যামল শৈবালে!
স্খলিত ফুল-দল চলল কাতার—
নয়ন ভরিয়া হম্ পেখনু তাহারে!
সখা হে চারি আখে মিলল অমনি!—
ক্ষণ সৌদামিনী-সম হাসই
ঢাকল বিধুমুখ নীরদ দুকূলে—
আকুল ভেয়নু মদন-বিকারে!—
(দীর্ঘনিশ্বাস)

সিদাম—(অন্যমনস্ক করিবার বাসনায়)—
সখে—নিরখও গিরি গোবর্দ্ধনে—
কিবা সুশোভিত কিসলয়ে মধু-সমাগমে
দোলত তরু লতা মৃদু মধুরিমে!
ফুল-দল অধর লুটই ধীরে ধীরে
চলত রিমি ঝিমি মলয় অনিল!
কুহরত কোকিল নব অনুরাগে
গোবর্দ্ধন গিরি কিবা অপরূপ সাজে!—

কৃষ্ণ।—সখাহে—গোবর্দ্ধন নাই মোর নয়নমে লাগে
রাই-রূপ সদা হৃদয়মে জাগে?—
—তেয়াজই যমুনা উঠল রাই
ক্বণ ক্বণ নূপুর বাজল সোপানে!—
গায়ন পীককুল নাচল পাপিয়া
কাঁদল ভানু বালা কল কল নাদে
রূপ-মাধুরী ভাসল তরল সমীরে!—
নীরদাম্বর ত্যজই রজ-বিন্দু ছটা
গিরই রিমি ঝিমি তিতল সোপানে!
অম্বর ভেদই স্থির সৌদামিনী
খেলল!—মদনানল দহল হমারে!—
(দীর্ঘনিশ্বাস)—

সুবল। (অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টায় মুরলী লইয়া সাধিতে সাধিতে)——
কেশব তোমার মুরলী
পাকর!—ফুকারি মিধুরিম মোহি!
সবই শিরথব কদম্ব-শেখরে

কইসন ঠববে কোকিল কোকিলা !—
তেয়াজই মঞ্জরী গুঞ্জরে বিরত
শুনবে মধুকর-সঙ্গীত-লহরী
ব্রজ কি গোয়ালিনী গেহ কাজ ত্যজই
উভ কাণে শুনবে দীরঘ নিশাসি !—

সিদাম।—(কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ক্রোধ ভরে)—
হট্ না ত্যজ বনয়ারী !——
করত কইসন ?—ফুকার বাঁশরী !
ধায়ত দোহা মেলি ধবলী সামলী
নব দুর্ব্বাদলে ভুলই দূব পাথারে !
বিষাদিতা ক্ষীরদা করুণা-নয়নে
তৃণদল ত্যজই নিবখত মোহে !—
তুহ কি করত ?—বাজাও মুরলী
আনাই ফিরব ধবলী সামলী !—

শ্রীকৃষ্ণ। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত বংশী-ধ্বনি)—
নয়নাসারে ভিজল হমার মুরলী—
বাসনা ভেয়ল বাজাই তাহারে
বাজল না সথে !—রাই রূণ চরণে
ঝঙ্কার শুনই গিরল ভূতলে !
দশ দিশ উজলি গজেন্দ্র-গমনে
কোমল পরিমলে পুরই সমীরে—
সলাজ নয়নে ক্ষণে ক্ষণে তাকই
বিহ্বল জর জর !—অরুণ কপোলে
তরুণ দিবাকর ললিত নলিন
সরস-কর-সম শোভল সুরাগ !—
নবীনানুরাগে নব নব ভাবে
মিলল প্রাণ-সখা !—দুরাশা-কাননে
ফুটল কলিকুল; যুটল ভ্রমরা;
গায়ল পীককুল; খেলল সমীর !—

সুবল।—সখা হে !—
প্রণমই হামই রমণী-চরণে
পীরিতি-চরণে সহস্র বার !
ধন মান আহুতি পরাণ প্রদানে
মন নাহি কহি চরণ না পারও !
গরবমে অধীরা ধরায় না ধরে
সমুদ্র গোষ্পদ গিরি তৃণ জ্ঞাণ !
সাম্রাজ্য যৌবন ইন্দ্রত্ব ছার—
লাবণ্য সম্পদ—কটক মাধুরী !
—অটল-দুর্গ অচল সদৃশ
পশুপতি-ত্রাস কটাক্ষ-বাণ
মদন-সহায় বধয়ে পুরুখে
প্রণমই শতকোটী রমণী-চরণে !—

শ্রীকৃষ্ণ। হামত চাহত বিসরিতে রাই
মন নাই মানত ধেয়ায়ত তাই !
—অধর সুমধুর প্রবাল-রঞ্জিত
মনমথ-বাঞ্ছিত অমৃতাগার !—
নিতম্ব-বিম্বে বাসনা-তরঙ্গ
ইন্দু-বিনিন্দিত বদন-মাধুরী !
মদন-নিকেতন যুগল মলয়ে
সুললিত আবলি জলদ ধনুক !—
কবরী-কুঞ্চিত ফণিনী আকারা
ফুলদল শোভিত মণি হেন তায় !—
সথাহে, রাই মোর চন্দন-কলিকা
কোমল বায়ুভরে গিরত ধরায় !
সুধাংশুবদনী কোমল নবনী
কোমল প্রভাকর গলত কিরণে !
সথাহে, রাই মোর শারদ চন্দ্রমা
হৃদয়-সরোবরে মরীচি বিতরে !
'রাই ভুবনময় আরাধনা রাই
কষিত হেম-রেখা হৃদয়-পাথানে'!—

সিদাম। অব আয়ত বলাই !—

কদম্ব কলি ভরে বঙ্কিম ভই ;
নূতন কিসলয়ে শোভিত সুন্দর
রজত গিরি যেন ভূতলে বিরাজে !
অস্তাচল-চূড়ে পুন পুন চাহই
আয়ত দ্রুত পদে !—বাজাও মুরলী !
সিরথত ধেনুদলে বিলোল নয়নে
আহার পরিহরি নেহালত তোয় !—
যামিনী আগত জসমতি রোয়ত
ব্রজ-রাজ ভাবত তোহার বিরহে
চল সব মিলই ধেনু লই যাই
পায়ব করে চাঁদ জসমতি মাই।—
(কদম্ব ফুল সহ বলরামের প্রবেশ)
বলরাম। আওরে কানাই
কদম্ব দলে আজি তোহারে সাজাই !
(শ্রীকৃষ্ণের কর্ণমূলে কদম্ব পরাইয়া)
দেখরে গোপাল গোপাল-রাজে
নূপ কলি কইসন অপরূপ সাজে !—
সুবল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপনে কটাক্ষ-
পাত করত)
অপরূপ যৈসন যমুনা কিনারে
নীল চল সলিলে কনক-নলিনী !—
কৃষ্ণ। (লজ্জিত হইয়া)
অই হের নলিনী মোহনে—
অস্তাচল-চূড়ে মধুরিমে হাসই
মোহই ত্রিভুবন মাঙত বিদায় !—
কন্দর ত্যজই ভীতান্ধকার
নিরখত ভাস্কর গমন-প্রয়াসি !—
চল সব মিলই ধেনু লই যাই
অব বংশী ফুকাবব রোয়ত মাই।
(বংশী ধ্বনি ও ধেনু একত্র করণ)
যবনিকা পতন।

ক্রমশঃ—

পাণিনি।*

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত "জয়দেব-চরিত" রচনা করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। পুনরায় পাণিনি-বিচার সম্বন্ধে ১৫৮ পৃষ্ঠাধারী একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহার কিয়দংশ মাত্র "বান্ধব" নামক মাসিক পত্রে পাঠ করিয়া বঙ্গদেশীয় প্রাচ্য-তত্ত্বানুশীলনকারী মহোদয়গণ প্রস্তাবটী সম্পূর্ণাবয়বে গ্রন্থবদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রজনীবাবু স্বল্প-কালের মধ্যে তাঁহাদিগের সে আশা পূর্ণ করিয়াছেন। প্রস্তাবটী অধিকাংশ পণ্ডিতবর গোল্ড ষ্টুকর-প্রণীত "পাণিনি-বিচার" হইতে অনুবাদিত। তদ্ভিন্ন ইহাতে মোক্ষমূলর, বোতলিঙ্ক, বেবর, লাসেন্, মণিয়ার উইলিয়ম্‌স্ প্রভৃতি উরোপীয় প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতবর্গের মত যথাবিহিত বিচারপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে। রজনীবাবু বিশেষ পরিশ্রমের সহিত গ্রন্থখানি সঙ্কলন

* পাণিনি। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত।

করিয়াছেন, এবং ইহার রচনাও বিশদ হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের সমালোচন উদ্দেশে সংক্ষেপে স্বতন্ত্ররূপে পাণিনিবিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

পাণিনি পাণিন্-বংশোদ্ভব এবং দেবলের পৌত্র। এ দেবেল কে? তাহার বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলাম না; কিন্তু তিনি ঋষি দেবল নহেন, তাহা পাণিনির পরিচয়ে সুপ্রমাণ হইবেক। পাণিনির মাতার নাম দাক্ষী, এজন্য তাঁহার অপর নাম দাক্ষেয় এবং তিনি সালাতুর নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সালাতুরীয় বলিত; ইহা "সালাতুরাদীয়ন্" সূত্রে প্রকাশ আছে। সালাতুর গান্ধার (কান্দাহার) প্রদেশের নগর, উহা আধুনিক অটকের উত্তর পশ্চিম দিকে স্থাপিত ছিল। আর্ষগ্রন্থে পাণিনির উল্লেখ নাই, এবং কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও আমরা পাণিনির বিষয় কিছুমাত্র দেখিতে পাই না; কেবল এক সোমদেব ভট্টকৃত কথাসরিৎ-সাগর নামক কথা গ্রন্থে পাণিনির সম্বন্ধে আখ্যায়িকা দেখিতে পাইতেছি। কথাসরিৎ-সাগর * বৃহৎ-কথামঞ্জরী হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত হইয়াছে। পাণিনি সম্বন্ধে তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য কিছুমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাতে এইমাত্র জ্ঞাত হওয়া যায় যে তিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও নন্দের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। আচার্য্য গোল্‌ড ষ্টুকারের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এবং বুদ্ধদেবের ধরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। উরোপীয় অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে খৃষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক স্থির করিয়াছেন। তিব্বত দেশীয় লামা তারানাথ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মের একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস রচনা করেন। তিনি তাহাতে পাণিনিকে মহারাজ নন্দের সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি খৃষ্ট জন্মের ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন স্থির হইতেছে। বৌদ্ধ তারানাথ ও পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি উভয়েই বৃহৎ-কথার প্রমাণানুসারে তাঁহাকে রাজা নন্দের সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন। এটী সম্ভবপরও বটে, কেননা পাণিনি আর্ষ কালের লোক নহেন এবং কোন ঋষিও তাঁহার উল্লেখ করেন নাই। পাণিনি ঋষি নহেন, একজন আচার্য্য; এবং মুনি বলিয়াও তাঁহাকে সম্বোধন করা যায়।

পাণিনি যুধিষ্ঠিরাদির পরবর্ত্তী, যেহেতু তিনি যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির শব্দ নিষ্পাদনের নিমিত্ত ষত্ব

* বর্নেল্ সাহেব অনুমান করেন কথাসরিৎসাগর বৃহৎ-কথামঞ্জরী হইতে সঙ্কলিত কিন্তু তাহা নহে উহা গুণাধ্যায়কৃত বৃহৎ-কথা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী ক্ষেমেন্দ্র কৃত। উহা বৃহৎ-কথার সার সঙ্কলন মাত্র; ক্ষেমেন্দ্র বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী ভিন্ন ভারত-মঞ্জরী নামক মহাভারতের সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

প্রকরণে "গবি যুধিভ্যাং স্থিরঃ *" এই সূত্র-রচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ গবি এবং যুধি এই আকারের শব্দের পরবর্ত্তী স্থির শব্দের ষত্ব হয়। পাণিনির কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে এ সকল স্থূল কথা মাত্র। এক্ষণে পণ্ডিতবর গোল্‌ড ষ্টুকার মহোদয়ের কথার বিশেষ সামঞ্জস্য করা যাইতেছে। ইহাতে আচার্য্য গোল্‌ড ষ্টুকরের সহিত আমরা ঐকমত্য না হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি; সুতরাং সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ আমাদিগের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

বৈয়াকরণিক ভাষার দ্বারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বা তৎকালের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায় না; এজন্য গোল্‌ড ষ্টুকর মহোদয় দ্বারা এতৎ সম্বন্ধে যে যুক্তি উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভ্রম-পূর্ণ বোধ হইতেছে। সাধু অর্থাৎ বৌৎপত্তিক শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণালী প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্থ-বিশেষ ব্যবস্থাপন করাই ব্যাকরণের মুখ্য প্রয়োজন এবং "ব্যাকরণ" এই শব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহাই প্রতীত হয়। পারিভাষিক বা সাঙ্কেতিক শব্দের উপর ব্যাকরণের প্রভুতা নাই; এবং পারিভাষিক শব্দের সহিত কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। একটী প্রকৃতি ও একটী প্রত্যয় দ্বারা যে পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহার দ্বারা এককালীন বহু অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না; বরং বারে বারে অর্থ পরিবর্ত্ত করা যাইতে পারে। একটী শব্দদ্বারা যুগপৎ বহুদ্রব্য বা বহু অর্থের মধ্যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট অর্থ বুঝাইতে হইলে পরিভাষা অপেক্ষা করে। সেই সর্ব্বজনীন-পরিভাষা-কবলিত পদার্থের সহিত পরিভাষা-কারকদিগের সহিতই সম্বন্ধ, ব্যাকরণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। মনে করুন 'পঞ্চাম্র' একটী পারিভাষিক শব্দ। নিম্ব, অশ্বত্থ, বট, জাতিপুষ্প, দাড়িম্ব, এই বৃক্ষগুলি একত্রিত হইলে তাহাকে পঞ্চাম্র বলে। এখন বিবেচনা করুন শব্দ হইল পঞ্চাম্র, কিন্তু আম্রবৃক্ষের নাম গন্ধও উহাতে নাই এবং থাকিলেও পাণিনি কি প্রকারে ঐ পঞ্চাম্র শব্দকে প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগ-প্রদর্শক ব্যাকরণ শাস্ত্রে আনিতে সমর্থ হইতেন? ফলে পারিভাষিক শব্দের উপর ব্যাকরণের সম্বন্ধ নাই। এই জন্য শব্দপারঙ্গত প্রবীণ মনুষ্যেরা শব্দ শক্তি জ্ঞানের ৮ প্রকার পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন—ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার ইত্যাদি। যখন পারিভাষিক শব্দ ব্যাকরণের নিয়মের অধীন নহে, তখন তাহা কি জন্য ব্যাকরণে থাকিবে? এজন্য সে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যাকরণে না থাকিলে সেই সেই শব্দ সেই সেই

* কাতন্ত্রে অবিকল এই সূত্রটী রহিয়াছে। পদ্মনাভ পঞ্চাধ্যায়ী অর্থাৎ সুপদ্ম ব্যাকরণে "গবিষ্ঠির—যুধিষ্ঠিরা" এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

ব্যাকরণরচনার সময় ছিল না, ইহা কি প্রকারে অনুমান করিতে পারি?

পাণিনি সূত্রে "আরণ্যক" শব্দের অরণ্যবাসী অর্থ দেখিয়া, পাণিনির সময় আরণ্যক নামক বেদ ভাগ বর্ত্তমান ছিল না সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। মনু ও ব্যাস যখন আরণ্যক নামক বেদ-ভাগ অবগত ছিলেন, তখন পাণিনি তাহা জানিতেন না এবং তাঁহার সময় তাহা বর্ত্তমান ছিলনা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। আরণ্যক শব্দ পবিত্র বেদাংশবিশেষ অর্থে পরিভাষিত। ঐ পরিভাষা ঋষি-প্রচারিত; সেই জন্য পাণিনি উহা ত্যাগ করিয়াছেন, এবং এই জন্যই সায়নাচার্য্য "এতদারণ্যকং সর্ব্বং নাব্রতী শ্রোতুমর্হতি" পরিভাষাটী দেখাইয়াছেন। কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রভৃতি পারিভাষিক অর্থ গুলি যথাযথ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন মাত্র, তাহার কোন স্বতন্ত্র বিধি বন্ধন করেন নাই।

পঞ্চাম্ শব্দের ন্যায় আর একটী শব্দ শোমশী। এই শব্দের পুরাণ-পরিভাষিত অর্থ তীর্থস্থলে প্রদত্ত ৯ পিণ্ড। বেদ-পরিভাষিত অর্থ সোমরস গ্রহণের পাত্র বিশেষ। পাণিনি বৈয়াকরণিক নিয়ম দ্বারা ঐ অর্থ বিস্তার করিতে পারেন নাই, তাহা বলিয়া কি পাণিনির পূর্ব্বে কেহ যাগ যজ্ঞ করেন নাই বুঝিতে হইবেক? এইরূপ পারিভাষিক শব্দ বোধ হয় সমস্ত ভাষার অর্দ্ধেক হইবেক, ইহার সহিত ব্যাকরণের কোন সংস্রব নাই।

ন্যায়দর্শন, ও সাঙ্খ্যদর্শন, ঐ রূপ পারিভাষিক। ঐ পরিভাষা আর্ষ নহে, উহা শিষ্য সম্প্রদায়ের। যাঁহাকে শিষ্যেরা বা আমরা যোগ বা পাতঞ্জল দর্শন বলি তাহার প্রকৃত নাম সাঙ্খ্য-প্রবচন। আমরা যাহাকে উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন বলি, তাহার আর্ষ নাম উত্তর-কাণ্ড ইত্যাদি। উপনিষদ শব্দও এইরূপ পারিভাষিক।

পণ্ডিতবর গোলড্‌ষ্টুকরের তর্কের অনুসরণ করিয়া রজনী বাবু "পাণিনি" পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠার টীকায় "আশ্চর্য্যমনিত্যে" পাণিনি সূত্র ও "আশ্চর্য্য অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্" এই বার্ত্তিক উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে পাণিনির সময় ও তাঁহার পূর্ব্বে অনিত্য শব্দ বিনশ্বর-বোধক ছিল; কিন্তু আশ্চর্য্য শব্দ তদ্বোধক ছিল না. বস্তুতঃ তাহা নহে— অনিত্য শব্দে বিনশ্বর অর্থ বুঝেন এই আশঙ্কায় বার্ত্তিককার স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, নচেৎ কাত্যায়নের সময়ে যে নূতন কোন অর্থ ছিল তাহা নহে। পাণিনির সময় যদি আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, চিত্র, আদি শব্দ এক-পর্য্যায়াক্রান্ত না থাকিত, তবে পাণিনি "আশ্চর্য্য" অর্থে চিত্র শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। তিনি "চিত্রঙ্ আশ্চর্য্যে" এই একটী সূত্র করাতে আচার্য্য গোলড্‌ষ্টুকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। পুনরায় তিনি "ভোজ্যং ভক্ষ্যে" এই সূত্র উদ্ধার করিয়া যে নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ও অসম্যক্। সুপদ্মকার ঠিক ঐ সূত্র রাখিয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন.

"অন্যত্র ভোগ্যাস্ত্রী" যেখানে উপভোগার্থে ভুজ ধাতু প্রয়োগ করিবে, সেখানে জ—বর্ণ স্থানে গ বর্ণ হইবে, এই মাত্র নিয়ম, নচেৎ পাণিনির সময়ে ভোজ্য শব্দের এক অর্থ আর কাত্যায়নের সময় আর এক অর্থ তাহা নহে; এবং অব্যবহৃত বা অব্যবহার্য্য শব্দ যে তরল ও কঠিন উভয়বিধ অর্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে, একথা অপ্রামাণিক বরং অমর প্রভৃতি কোষকারেরা খাদ্য অর্থে ব্যবহার, বন্ধন করিয়া গিয়াছেন।

এখানে একটী গুরুতর বিচার উত্থাপিত হইতেছে। পাণিনি কেবল সূত্রস্থান রচনা করিয়াছেন, বৃত্তি বা উদাহরণ তাঁহার নহে, তবে কি প্রকারে অন্যের দত্ত উদাহরণ দ্বারা পাণিনির সময়ের ব্যবহারিক ভাব নির্ণয় করা যাইতে পারে?

পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকরের মতানুসারে রজনী বাবু কহেন, পাণিনি-সূত্রে "প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে অথর্ব্বাঙ্গিরস "শব্দের উল্লেখ কোন স্থলে দৃষ্ট হয় না" ইহাতে পাণিনি অথর্ব্ববেদের বিষয় অবগত ছিলেন না, অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু ষষ্ঠাধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৭৪ সূত্রে "দাণ্ডিনায়ন হাস্তিনায়নাথর্ব্বণিক—" এই সূত্রে স্পষ্ট অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ আছে এবং "কপিবোধাদাঙ্গিরসে" এই সূত্রে আঙ্গিরস মুনির উল্লেখ দেখা যাইতেছে: সুতরাং সিদ্ধান্তটী ভ্রমপূর্ণ হইতেছে।

উক্ত জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে পাণিনির পরভাবী বলিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত, কেন না দুইজন যাজ্ঞবল্ক্য বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার মধ্যে একের নাম যাজ্ঞবল্ক্য ও অপরের নাম যাজ্ঞবল্ক। যিনি যাজ্ঞবল্ক্য তিনি যোগী বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকেন যথা "তথাচ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ"। দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক ঋষিপুত্র নহেন; তিনি অরিষ্টনোম নামক সামান্য ব্রাহ্মণের পুত্র। যাস্ক পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, গালব যাস্ক মুনির পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং এই গালব ভাগুরিকে জানিতেন, সেই ভাগুরি-প্রোক্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উল্লেখ আছে, সুতরাং এই যাজ্ঞবল্ক্য পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্রমাণ হইতেছে। পাণিনি যে সকল ঋষির নামোল্লেখ করেন নাই, তাঁহারা পাণিনির পরভাবী কোন্ যুক্তি অনুসারে মনে করা যাইতে পারে? শঙ্করাচার্য্য পাণিনিকে অতিক্রম করিয়া স্ফোটবাদী উপবর্ষের বাক্য প্রামাণ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাই বলিয়া কি পাণিনিকে শঙ্করাচার্য্যের পরভাবী মনে করিব? পুনরায় পাণিনি যদি কোন শব্দের উল্লেখ না করিয়া থাকেন, তবে সেই শব্দ পাণিনির সময়ে ছিল না, তাহার অনুমান কি প্রকারে হইতে পারে?

এইরূপ পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকরের পাণিনির সূত্র আলোচনায় পাণিনির কাল নির্ণয়ের প্রয়াস অযৌক্তিক বোধ হইল, এজন্য তাঁহার কতিপয় বাক্য খণ্ডন করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা পাণিনির কাল নির্ণয়ের বিশেষ প্রমাণাভাবে তাঁহাকে

বৃহৎ-কথার আখ্যায়িকা অনুসারে বাজা নন্দের সমসাময়িক স্থির করিলাম। এক্ষণে তাঁহার ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাইতেছে।

সর্ব্বাদৌ কি আকারের ভাষা মানব-কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ফল সেই ভাষার পরিণাম বা সংস্কার হইয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত ভাষা আর্য্যদেশে ব্যাপ্ত হইলে, ঋষিরা সানন্দ চিত্তে স্তোত্র, শস্ত্র, গীতি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। এই ভাষা তৎকালের লোকের অতীব হৃদয় আকর্ষণ করিতে লাগিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপন আরম্ভ হইল। তৎপরে শিক্ষার সুগম উপায় করিবার নিমিত্ত সঞ্জাত শব্দের জাতি বিভাগ ও লক্ষণাদি নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল এবং এতদ্বারা অধ্যেতৃগণের অনেক আয়াস লাঘব হইল। ভাগুরি, গালব, ব্যাঘ্রপাৎ, মিমত, তৌকায়ন প্রভৃতি ঋষিরা উহার সূত্রপাত করেন। শাকটায়ন, যাস্ক, ব্যাড়ি প্রভৃতি ঋষিদিগের দ্বারা উহার পূর্ণতা জন্মে, তৎপরে অধিক সহজ উপায় অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখ সূত্র রচনার উপায় স্থিরীকৃত হয়। এই সূত্রনির্ম্মাতাদিগের মধ্যে পাণিনি মুনি শ্রেষ্ঠ।

সূত্র দ্বিবিধ—সূচক ও সর্ব্বতোমুখ। সূচক কারের সূত্র বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বতোমুখ সূত্র মাহাত্ম্য ইন্দ্রদত্ত কর্ত্তৃক প্রথম বিরচিত হয়। ইন্দ্রদত্তের ঐন্দ্র ব্যাকরণ, চন্দ্রাচার্য্যের চান্দ্র, কাশমুনির অঙ্গব্যাকরণ, কৃষ্ণাচার্য্যের ব্যাকরণ, আপিশালীর আপিশাল সূত্র, এতৎপরে পাণিনির সূত্র, তৎপরে অমরসিংহের বর্গসূত্র এবং অবশেষে জিনেন্দ্র বুদ্ধিপাদআচার্য্যের সংগ্রহ-সূত্র জন্মলাভ করে।

উন্নতির সময়ে ভাষার অধিকার এত অধিক হইয়াছিল যে সকল শব্দের রূপ নিষ্পত্তি সূত্র দ্বারা নির্ব্বাহ হইত না "উপসর্গ-নিপাতাঃ" এই বলিয়া যাস্কাদি আর্ষ সময়ে নিপাতের প্রয়োজন হইয়াছিল। "নিপাত" শব্দের অর্থ এই যে "যদ্ যল্লক্ষণেনানুৎপন্নংতৎসর্ব্বংনিপাতনাৎসিদ্ধম্" (কাতন্ত্রীয়ে দুর্গসিংহ) যে সকল পদের রূপ নিষ্পত্তি লক্ষণ দ্বারা না হয়, সে সমস্ত নিপাতন-সিদ্ধ জানিবে।

যাস্ক বলিয়াছেন "নিপতন্তি উচ্চাবচেষর্থেষু ইতি নিপাতাঃ" 'উচ্চাবচ' অর্থাৎ শব্দ সকল বিচিত্র অর্থে নিপতিত হইলে তাহা নিপাত নাম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নিপাতের প্রয়োজন পাণিনির সময়েও ছিল, পাণিনিও ইহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অর্থাৎ সূচকার্থ সূত্র দ্বারা সকল শব্দকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। পাণিনি সংজ্ঞা প্রকরণে বলিয়াছেন, "প্রাগীশ্বরান্নিপাতাঃ" অর্থাৎ ঈশ্বর শব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিপাতের অধিকার। এই নিপাতের ন্যায় আর একপ্রকার সঙ্কেত আছে। তাহার নাম পৃষোদরাদি। ইহাও একপ্রকার নিপাতের জাতি। ইহার বলে যে সকল

বর্ণের আগম, বর্ণের বিপর্য্যয় ঘটনা প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহা সূত্র দ্বারা হয় না। সিংহ শব্দ পৃষোদরাদি-সিদ্ধ। হিংস্ ধাতু' ঘঞ্, সকারের স্থান পরিবর্ত্তন ও অনুস্বারের আগম ঐ পৃষোদরাদি নিয়মে হইয়াছে। পাণিনিকেও এই নিয়মের অধীন থাকিতে হইয়াছিল।

পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, বর্ষ, উপবর্ষ, ব্যাড়ি, ভাগুরি প্রভৃতি বৈয়াকরণিক আচার্য্যেরা বৈদিক ভাষার পরিবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বেও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কোন নিয়মের মধ্যে ছিল না। বৈদিক ভাষার উচ্ছেদ না হয় এবং তাহা বুঝিতে পারা যায়, এই মাত্র রক্ষা করা উল্লিখিত আচার্য্যগণের উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল আচার্য্যগণের মধ্যেও পাণিনি বৈদিক ভাষার জন্য এবং তাহার বাক্য বিন্যাস ও তাহার রূপ নিষ্পত্তির আকার কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্য 'ছান্দস' প্রকরণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এটী কাজে কাজেই ঘটিয়াছে, কেন না সে সকল বিষয় সূত্র নিয়মে আবদ্ধ হইতে পারে না। সেই জন্য কেবল "ছান্দসি" "আর্ষে" ইত্যাদি প্রকার বলিয়াছেন। বৈদিক পদ পদার্থ আর কেহ বলেন নাই। কেবল পাণিনিই বলিয়াছেন। লৌকিক ব্যাকরণে ল কার দশটী, কিন্তু বৈদিক ব্যাকরণে ১১টী, সেই অতিরিক্তটীর নাম 'লেট্'। এই 'লেট্' লকারের রূপ 'লট্' ল কারের তুল্য, কিন্তু তাহার অর্থ ভিন্ন "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যস্থ "বিবিদিষন্তি" এই ক্রিয়াতে 'লেট্' ল কারের ব্যবহার হইয়াছে।

বেদের ব্যাকরণের জন্য প্রাতি-শাখ্য পৃথক্রূপে রচিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য * অতি প্রাচীন। ইহা পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর ও ওয়েষ্টর্ গার্ড, ইহা যে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। ভট্ট মোক্ষমূলর, মস্যুর রেণিয়ার ও সুপণ্ডিত বর্ণেল, ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহা স্বীকার করিয়াছেন।—তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য † ও বাজসনেয়ী বা কাত্যায়নপ্রাতিশাখ্য ‡ নামক যজুর্ব্বেদের প্রাতিশাখ্য, ও অথর্ব্ববেদের প্রাতিশাখ্য আছে। নাগোজী ভট্ট সামবেদের প্রাতিশাখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা "সামলক্ষণম্

---

* আনন্দপুর (কাশী ?) বাসী বজ্রটের পুত্র উয়ট ভট্ট ইহার টীকাকার। এই টীকার নাম পার্ষদ ব্যাখ্যা। উয়ট ভোজ দেবের সময় বর্ত্তমান ছিলেন।

† তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের অনেক ভাষ্য ছিল, তন্মধ্যে এক্ষণে ত্রিভাষ্য রত্ন নামক ভাষ্যই প্রচলিত। এতৎ-পূর্ব্বে ইহার বররুচির আত্রেয় ও মাহেয়ী ভাষ্য ছিল।

‡ উয়ট ভট্ট ইহার টীকাকার। ইহা ভিন্ন রামচন্দ্র-কৃত প্রাতিশাখ্যজ্যোৎস্না নামক একখানি আধুনিক টীকা আছে।

প্রাতিশাখ্যম্ শাস্ত্রম্” কিন্তু এক্ষণে উহা এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হইবেক। অধ্যাপক হৌগ সাহেব কহেন সামবেদের কোন প্রকার প্রাতিশাখ্য এখনও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। *

প্রাতিশাখ্য এক প্রকার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে আছে। কেবল লৌকিক শব্দের জন্ম-বিবরণ নাই। ফল, বেদ ব্যাখ্যার জন্যই ইহার নির্ম্মাণ। প্রাতিশাখ্যে সংজ্ঞা, সন্ধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস, সকলই আছে। কিন্তু তাহা কেবল বৈদিক পদ সাধনের উপযোগী। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রথম সূত্র এই “অথ বর্ণ-সমাম্নায়” এই সূত্র দ্বারা বর্ণ উচ্চারণ অধ্যয়ন এবং প্রযত্নাদি ভেদের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। তৎপরে ক্রমে অন্যান্য সূত্রে অন্যান্য প্রকার সাধনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—“অথ নবাদিতঃ সমালক্ষরাণি” “(২)” দ্বে দ্বে সবর্ণ হ্রস্ব দীর্ঘে “(৩)” নপ্লুত পূর্ব্বম্ “(৪)” ষোড়শাদিতঃ স্বরাঃ “(৫)” শেষোব্যঞ্জনানি “(৬)” ইত্যাদি।

পাণিনির পূর্ব্বে যে ব্যাকরণ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ পাণিনি স্বয়ং ৫ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন “খার্যাঃ প্রাচাম্” অর্থাৎ খারী শব্দান্ত দ্বিগু ও অর্দ্ধ শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হওয়া পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পাণিনির পূর্ব্বে ব্যাকরণের আচার্য্য ছিল।

ব্যাড়ি-কৃত লক্ষ-শ্লোকাত্মক সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ পাণিনি ব্যাকরণের জন্ম হওয়ার পরে তদ্বিরুদ্ধ ব্যাকরণ জন্মে নাই। যিনি যিনি ব্যাকরণ করিয়াছেন সকলকেই পাণিনির নিয়মানুগত থাকিতে হইয়াছে; কিন্তু ব্যাড়ি-কৃত ব্যাকরণ তদ্বিরুদ্ধ-মতাক্রান্ত এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রথিত। ই, উ, ঋ, ৯, বর্ণের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে মধ্যে য, ব, র, ল, ব্যবধান হওয়া কেবল ব্যাড়ি ও গালব এই দুই ব্যক্তির মত যথা “ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ” কালিদাসঃ। ত্রি + অম্বক। এই বিষয়ে পাদ্মনাভিক পঞ্চাধ্যায়ী ব্যাকরণে এক সূত্র আছে যথা—

“যথা ব্যবধানং ব্যাড়ি গালবয়োঃ।”

এতভিন্ন ভাগুরি-প্রোক্ত ব্যাকরণ ছিল। ইঁহার মতে অব ও অপি এই উপসর্গ দ্বারা আকার লোপ হইয়া যায়, কিন্তু পাণিনির মতে তাহা হয় না।

কথিত আছে, পাণিনি মহেশ্বরের নিকট বর্ণমাত্রের উপদেশ পাইয়া ব্যাকরণ রচনা করেন যথা—

“যেনাক্ষর-সমাম্নায় অধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ
পাণিনয়ে নমঃ।”

* “Ich Bweifle nicht, dass noch weitere Prateca´khyas aufgefunden werdon, so vermisse ich bis jetzt das Beeder Meaitrayani´ Samhita´ die so velles Eigwthiimliche hat, und gewiss ein besonderes Pratica´khya besitzt.”

লিঙ্গানুশাসনের বৃত্তিকার প্রভৃতি।

এই মহেশ্বর মনুষ্য কি মহাদেব বলা যায় না। বৃহৎ-কথায় লিখিত আছে যে, মহাদেবের তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করেন, যাহাই হউক পাণিনি মুনি মহেশ্বরের নিকট যে বর্ণোপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন যথা অ ই উ ন। ঋ ৯ ক্। এ ও ঙ। ঐ ঔ চ। ইত্যাদি ক্রমে বলিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি" অর্থাৎ এই সকল মহেশ্বরপোদিষ্ট সূত্র। কেহ কেহ বলেন "ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি" এই বাক্য পাণিনির মুখ-নির্গত বাক্য নহে। ইহা বার্ত্তিক-কারের বাক্য।

পাণিনির ব্যাকরণ ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, এজন্য ইহার নাম "অষ্টাধ্যায়ী।" প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টী করিয়া পাদ আছে। ইহার সূত্র সংখ্যা ৩৯৬৫। পাণিনি এই গুলি সূত্রদ্বারা সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিক্ষা, তদ্ধিত প্রভৃতি যে কিছু বৈয়াকরণিক বস্তু আছে, সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে এই সকল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পাঠ করিতে হইত; এক্ষণে আর তাহা হয় না। তজ্জন্য পৌর্ব্বকালিক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত গ্রন্থ প্রভৃতি বিরল-প্রচার হইয়া উঠিয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণ যথার্থ সর্ব্বতোমুখ হওয়াতে লোক-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ইহার উপর বৃত্তি, বার্ত্তিক, ভাষ্য, টীকা লিখিত হইয়াছে এবং ঐ সকলের মত সমালোচন ও প্রয়োগাদির পরিদর্শন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার নাম মালা এই প্রস্তাবের যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙের (ফরাশীস অনুবাদিত) জীবনচরিতে লিখিত আছে, তিনি খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পাণিনি ব্যাকরণের মূল সূত্র ও তাহার সংশোধিত সূত্র দর্শন করিয়াছিলেন। বর্ণেল মহোদয় এই কথায় আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন. কিন্তু আমাদিগের মতে এ কথা যুক্তি-সিদ্ধ নহে, কেন না পাণিনি-ব্যাকরণের পাঠ পরিবর্ত্ত হইলে তাহা অদ্যতনীয় আচার্যগণের গ্রন্থে অবশ্যই উল্লেখ থাকিত বেদার্থ প্রকাশক সায়নাচার্য্য, ভট্টভাস্কর, ও ভরত স্বামী বেদ-ভাষ্যে পাণিনির অনেক সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে পরিবর্ত্তিত পাঠ কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না।

কাত্যায়ন পাণিনি সূত্রের বার্ত্তিক-কর্ত্তা ইহাঁর নামান্তর বররুচি, মেধাজিৎ, ও পুনর্ব্বসু। বৌদ্ধ কাত্যায়ন ও ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা কাত্যায়ন হইতে ইনি পৃথক্ ব্যক্তি, কাত্যায়নের বার্ত্তিকের উপর পতঞ্জলি "মহাভাষ্য" লিখিয়াছেন। পতঞ্জলির অপর নাম গোনর্দ্দীয়। ইনি গোনর্দ্দবাসী এবং ইহাঁর মাতার নাম গোণিকা; যোগশাস্ত্র-প্রণেতা পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকর্ত্তা পতঞ্জলি উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি।

আচার্য্য গোল্‌ড ষ্টুকেরের মতে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি ১৪০ হইতে ১২০ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। পণ্ডিতবর রামকৃষ্ণগোপালভাণ্ডারকর পতঞ্জলিকে পাটলীপুত্রাধিপতি পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে মহাভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায় ১৪৪ হইতে ১৪২ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই তিন জনে ব্যাকরণের পূর্ণ অবয়ব প্রদান করিয়াছেন। এই তিন জন সংস্কৃত ভাষায় যে কীদৃশ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টীকার নাম ভাষ্যপ্রদীপ। কৈয়ট ইহার প্রণেতা। কৈয়টের টীকার উপর নাগোজী ভট্ট টীকা লিখিয়াছেন; তাহার নাম "ভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত"। কৈয়টের টীকার আর এক খানি টীকা আছে, তাহার নাম ভাষ্যপ্রদীপ-বিবরণ, উহা ঈশ্বরানন্দ কৃত।

কাত্যায়নের ন্যায়, বামন, পাণিনির এক খানি বৃত্তি লিখিয়াছেন, উহার নাম কাশিকা-বৃত্তি। ইহা অতি মান্য গ্রন্থ, এবং আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও প্রসাদ গুণবিশিষ্ট। যিনি একবার এই গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাঁহার আর সিদ্ধান্ত-কৌমুদী স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না। সিদ্ধান্তকৌমুদীর গ্রন্থকার ভট্টোজি দীক্ষিত অষ্টক পাণিনীয় সূত্র-সমূহের ক্রমভঙ্গ করিয়া বুৎক্রমে অর্থাৎ যেখানে সেখানে হইতে সূত্র আনিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, গ্রন্থ সহজ করিবেন; কিন্তু তাহা হয় নাই। "মনোরমা" "শেখর" প্রভৃতি ভূরি ভূরি টীকাতেও তাহার সাধুত্ব সম্পাদিত হয় নাই। তাহা পাঠ করিতে হইলে এখনও যেখানে সেখানে "ফাঁকি" উপস্থিত হয়। গ্রন্থ সকলের দোষেই ফাঁকি বা পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। বামন কাত্যায়ন অপেক্ষা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি এবং হীন, তথাপি ইনি যেরূপ সরলভাবে সূত্রার্থ প্রকাশ করিয়াছেন; একপ সারল্য কাত্যায়নের বৃত্তিতে নাই। কাত্যায়নের বৃত্তি দেখিয়াই বামন-বৃত্তি লিখিয়াছেন। এজন্য কাশিকা বৃত্তি প্রাঞ্জল হইয়াছে। কাশিকাবৃত্তির দুই খানি টীকা আছে। হরদত্ত-মিশ্র-কৃত পদমঞ্জরী ও জিনেন্দ্রকৃত কাশিকাবৃত্তি পঞ্জিকা।

উণাদি বৃত্তি—পাণিনির অংশ-বিশেষ, পরন্তু পাণিনির পূর্ব্বেও এতদ্বিষয়ের গ্রন্থ ছিল, কিন্তু তাহা কিরূপ ছিল বলা যায় না। ফল পাণিনি-কৃত কৃৎসূত্র এবং উণাদি-সূত্র এই বৃত্তির অবলম্বন। সর্ব্বসমেত ৩২৫টী প্রত্যয় আছে, তাহা "উণাদয়ো বহুলং" (পাণিনি) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রকাশ আছে।

ব্যাকরণের উণাদি অংশের বৃত্তির মধ্যে উজ্জ্বল দত্তের বৃত্তিই প্রচলিত এবং মান্য। ইহার পরে দৌর্গসিংহীয় বৃত্তি। ব্যাকরণ মাত্রেরই উণাদি সূত্র আছে। সকল ব্যাক

রূপে উহা সংক্ষেপ রূপে আছে। কেবল কলাপ ব্যাকরণের উণাদি কিছু বিস্তৃত এবং শৃঙ্খলা-সম্পন্ন। তদ্ভিন্ন উণাদি কোষ নামক এক খানি কোষ অর্থাৎ আভিধানিক গ্রন্থ আছে, তাহাও মন্দ নহে।

বৃত্তিকার উজ্জ্বল দত্ত মুখবন্ধ শ্লোকে লিখিয়াছেন "আমি গণপতি, ঈশ্বর, গুরুর পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া উত্তম বৃত্তি নির্ম্মাণ করিলাম। বৃত্তি ন্যাস, অনুন্যাস, রক্ষিত, ভাগবৃত্তি ভাষ্য, ধাতু প্রদীপ, তাহার টীকা, আর উপাধ্যায়ের সর্ব্বস্ব স্বরূপ সুভূতি, কলিঙ্গ, হড্ডচন্দ্র, ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন এবং আলোচনা করিয়া ইহা করিলাম। উণাদি বৃত্তি অনেক আছে, সে সকল এখন সূত্র, শব্দ রূপ, ধাতুগত বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে; তন্নিমিত্ত তন্মাত্রের উপর নির্ভর না করিয়া সে সকল এবং অন্যান্য গ্রন্থ বিচার করিয়া সে সকল হইতে সার আকর্ষণ করিয়া আমি এই বৃত্তি রচনা করিলাম।

উজ্জ্বল দত্তের অপর নাম জাজলি। ইনি সুভূতিকারের শিষ্য। উজ্জ্বল দত্ত কোন্ সময়ের লোক, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইনি অমরের পরবর্ত্তী, কেন না তাঁহার বৃত্তিতে অমরকোষের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বৃত্তিকার মুখবন্ধ শ্লোকে এইরূপ খেদ করিয়াছেন "যে ব্যক্তি আমার কৃত এই বৃত্তি দেখিয়া আপনার পৌরুষ কামনায় আমার নাম লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার সমস্ত পুণ্য ধ্বংস হইবে।" (৭ শ্লোক)।

উণাদি সূত্র ৫ পাদে বিভক্ত।

ইহা ভিন্ন, পাণিনি ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার কতক গুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুরুষোত্তম দেবকৃত ভাষা-বৃত্তি। সৃষ্টিধর ইহার টীকাকার। টীকার নাম ভাষা-বৃত্ত্যর্থ বিবৃতি।

ভট্টোজি দীক্ষিত কৃত শব্দকৌস্তুভ। গ্রন্থকার এখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বালাম ভট্ট ইহার টীকাকার। টীকার নাম প্রভা।

রামচন্দ্র আচার্য্যকৃত প্রক্রিয়া কৌমুদী। ইহাতে পাণিনি-সূত্র সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থখানি পাণিনি ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার বিঠ্ঠল আচার্য্য-কৃত প্রসাদ এবং জয়ন্ত চন্দ্র কৃত তত্ত্বচন্দ্র নামক দুইখানি টীকা আছে।

ভট্টোজি দীক্ষিত কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদী। ইহার মনোরমা * তত্ত্ববোধিনী, শব্দেন্দু-শেখর, লঘু শব্দেন্দুশেখর † প্রভৃতি টীকা আছে।

লঘুকৌমুদী ও মধ্যকৌমুদী—বরদারাজ কৃত।

---

* হরিদীক্ষিত মনোরমার টীকাকার, পুনরায় ইহার উপর ভাব-প্রকাশিকা নামক এক টীকা আছে।

† ইহার উপর এক টীকা আছে, তাহার নাম চিদস্থিমালা।

পরিভাষাসংগ্রহ ও পরিভাষাবৃত্তি। পরিভাষেন্দুশেখর—নাগেশ ভট্ট কৃত। বৈদ্যনাথ পাণ্ড ইহার টীকাকার।

ভর্তৃহরি-কারিকা বা বাক্যপদীয় *। ইহা আদ্যোপান্ত শ্লোকে রচিত। ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহাদের নামোল্লেখ করিলাম না।

কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণ, অতি বিশদ এবং পাণিনি হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার প্রত্যয়, সংজ্ঞা, প্রভৃতি পাণিনির অনুরূপ। ইহাতে পাণিনি, পতঞ্জলি, ব্যাড়ি, ভাগুরি, প্রভৃতি ব্যাকরণের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। পাণিনির ২। ৩ সূত্র একত্র করিয়া ইহার এক একটি সূত্র হইয়াছে ইহার উদাহরণ যথা

পাণিনি—

"ক্রু বা পাঞ্জ মেধ দি সাধ্য শুভাউন্"

"ছন্দসাণঃ" দৃ সনি জনি চরি চটি-

ভ্যোঞ্ণ্"

এই সূত্র একত্র করিয়া কাতন্ত্রের এক সূত্র, যথা

কাতন্ত্র—

"কৃক আজি মিস্বদি সাধ্য শূ দৃসনিজনি-

চরি চটিভ্য উণ্"

ইহার অনেক স্থলে পাণিনির অবিকল সূত্র আছে, এবং কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রক্ষেপ নিক্ষেপ আছে। ইহাতে একটী পরিভাষা অংশ এবং একটী পরিশিষ্ট থাকাতে বড় সুগম হইয়াছে।

প্রয়োগ-রত্নমালা—ইহাতে পাণিনি এবং কলাপসূত্র একত্রে আছে। সূত্রগুলি পদ্য। এই সকল সূত্র পদ্যে রচনা করিতে গ্রন্থকার পুরুষোত্তম বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। পুরুষোত্তম ভূমিকায় লিখিয়াছেন "শ্রীমল্লদেবস্য গুণৈকসিন্ধো মহীমহেন্দ্রস্য যথা নিদেশং। যত্নাত্ প্রয়োগোত্তম-রত্নমালা, বিতনোতে শ্রীপুরুষোত্তমেন"।

এতদ্দ্বারা তিনি শ্রীমল্লদেব রাজার সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমল্লদেব কুচবিহারের রাজা ছিলেন।

পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী সূত্র পাঠ ভিন্ন ধাতুপাঠ, লিঙ্গানুশাসন ও শিক্ষা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। শ্রীধরদাস সঙ্কলিত সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে পাণিনির প্রণীত বলিয়া কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলবৎ প্রমাণাভাবে তদীয়-লেখনী-প্রসূত বলিতে পারিলাম না।

এই প্রস্তাবে পাণিনির শিক্ষা গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না। তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীরামদাস সেন।

* কোলব্রুক বাক্যপদীয় ভ্রমে বাক্যপ্রদীপ ভর্তৃহরি-প্রণীত লিখিয়াছেন। বাক্য-প্রদীপ হরি-বৃষভ কৃত, তাহার টীকাকার পুণ্যরাজ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কর্ণার্জ্জুন কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীবলদেব পালিত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা মাত্র। কবি-কুল-তিলক মহর্ষি

দ্বৈপায়ন পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী হইয়া মহাভারতে পাণ্ডবপ্রতিদ্বন্দ্বী মহামতি কর্ণের চিত্র যথাযথ বর্ণে রঞ্জিত করেন নাই। কর্ণ প্রাচীন ভারতের একটী উজ্জ্বল মণি। বীরত্ব, দাতৃত্ব, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণে তিনি শুদ্ধ ভারতের কেন জগতের আদর্শ ছিলেন। তাদৃশ নরশ্রেষ্ঠের চরিত্র এরূপ বর্ণে চিত্রিত করা মহর্ষি দ্বৈপায়নের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে। কবিবর বলদেব পালিত মহর্ষি দ্বৈপায়ন-কৃত এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কর্ণার্জ্জুন কাব্যে কর্ণের একটী সুন্দর ছবি চিত্রিত করিয়াছেন।

এই কাব্য খানি বীররস-প্রধান। ইহা বিবিধ ছন্দে গ্রথিত। বলদেব বাবু লিখিয়াছেন যে এই কাব্য খানি 'সর্ব্বত্র একটী ছন্দে রচিত হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন'। আমরা ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। বাস্তবিক এই কাব্য খানির যদি বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য থাকে, তাহা ইহার বিবিধছন্দোগঠিততা। আমরা কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবিদিগের মহাকাব্য সকল আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে সে সকল মহাকাব্যের একটী বিশেষ ও প্রধান গুণ, তাহাদিগের বিবিধ-ছন্দ-ছটা। বিশেষতঃ কালিদাসের একটী অসাধারণ ক্ষমতা এই যে তিনি হৃদয়ের ভাব-স্রোতের গতি অনুসারে ছন্দঃ প্রয়োগ করিতে পারিতেন। বর্ণনীয় নায়ক নায়িকার হৃদয় যখন যে ভাবে উচ্ছ্বলিত হইত, তখন তিনি তদনুরূপ ছন্দঃ প্রয়োগ করিতে পারিতেন। তাঁহার রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের অনেক স্থল এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তাঁহার ছন্দঃ প্রণালীর এরূপ অদ্ভুত মহিমা যে কবিতা পাঠ করিবা মাত্র অর্থ বোধ হইতে না হইতেই, বর্ণনীয় ব্যক্তির হৃদয় শোকে অভিভূত কি সুখে উচ্ছ্বসিত, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুধাবন করা যায়। ছন্দের এই অদ্ভুত শক্তি বাঙ্গালা কবিতায় পরিব্যক্ত হয় ইহা বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষা হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। নানাবিধ ছন্দে কবিতা রচনা করার পদবীতে যে বলদেব বাবু সর্ব্ব প্রথম পদার্পণ করিতেছেন এরূপ নহে। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, মদনমোহন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণ এই পথে অনেক দিন পূর্ব্বে বিচরণ করিয়াছেন। কেবল অল্পদিন মাত্র ইংরাজী কাব্য-সাধারণের অনুকরণে কতিপয় নব্য কবি এক ঘেয়ে ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। তাহা সাধারণ-রুচির অনুমোদিত কি না বলিতে পারি না; কিন্তু আমাদিগের নিতান্ত অরুচিকর।

আমাদিগের বিশ্বাস যে সংস্কৃত কাব্যে যে সমস্ত সুললিত ও ওজস্বি ছন্দঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বাঙ্গালা পদ্যে সেই সমস্ত ছন্দঃ প্রযুক্ত হইলে বাঙ্গালা কাব্যের শুদ্ধ যে ভূয়সী মাধুর্য্য বৃদ্ধি হইবে

এরূপ নহে; নির্জ্জীব বাঙ্গালা কবিতার ওজস্বিতা দশগুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে। এদেশে স্বরবর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কবিতা পাঠ করার পদ্ধতি প্রচলিত না থাকায়, আপাততঃ সে সকল ছন্দঃ সাধারণের প্রীতিকর না হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস যে সংস্কৃত ছন্দঃ বাঙ্গালা কাব্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইলে, স্বরবর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কবিতা পাঠ করার পদ্ধতি আপনিই প্রবর্ত্তিত হইবে। কবিবর মধুসূদন দত্ত যখন বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর পদ্য প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তখন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পয়ারে গ্রথিত কবিতা কিরূপে পড়িতে হয় তাহা অনেকেই জানিতেন না। এই জন্য অনেকেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-গ্রথিত-কবিতা মালাকে কবিতা বলিয়াই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা মধুসূদনের প্রতি এই জন্য রহস্য বিদ্রূপ করিতেও ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন নির্ভীক চিত্তে সেই প্রণালীতে ক্রমাগত কবিতা লেখায় ক্রমে তৎপ্রবর্ত্তিত পদ্য বাঙ্গালা ভাষায় আদর্শ স্বরূপ হইয়া উঠিল। সেইরূপ বলদেব বাবু যদি এই নূতন পথে নির্ভীক চিত্তে বিচরণ করেন, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই সংস্কৃত ছন্দঃসমূহ বাঙ্গালায় আদর্শ হইয়া উঠিবে। আমরা আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্তবাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কেও অনুরোধ করি তিনি যেন এই কার্য্যে বলদেব বাবুর সহযোগিতায় অবতীর্ণ হন। সংস্কৃত দুরূহ ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা রচনায় তাঁহারও বিশেষ পারদর্শিতা আছে। ইহাঁরা দুইজনে এই ব্রতে সমব্রত হইলে এবিষয়ে সাধারণের রুচি নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে।

বলদেব বাবু কর্ণার্জ্জুনকাব্যের প্রতিসর্গের শেষের দুইটী করিয়া কবিতা মালিনী বসন্ততিলক প্রভৃতি দুরূহ সংস্কৃত ছন্দে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র যে তাঁহার এই উদ্যম সফল হইয়াছে। আমরা সহৃদয় পাঠকগণের প্রীত্যর্থ নিম্নে দুই তিনটী নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

মালিনীচ্ছন্দঃ।

দিনকর সমতেজাঃ, সত্যবান্ সত্যবাদী,
বলি-সমধিক দাতা ধীর বীরেন্দ্র কর্ণে
মনন করি' মহীক্ষিৎ সৈন্যভার প্রদানে,
ঘন ঘন 'জয়' শব্দে পূরিলা যুদ্ধ-শঙ্খ।

দ্বিতীয় সর্গ।

বসন্ততিলকচ্ছন্দঃ।

সংক্ষুব্ধ কৌরবসভা হইতে সদর্পে,
নিঃশঙ্ক সিংহসম বাহিরিলে ব্রজেন্দ্র,
দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীর সভাবসানে
কোলাহলে উঠিল উদ্ধত ক্রুদ্ধ চিত্তে।

তৃতীয় সর্গ।

উপজাতিচ্ছন্দঃ

দৈবানুকূলে বলহীন শক্ত;
বলী অশক্ত প্রতিকূল দৈবে।
দৈবে হবে নির্জ্জিত সূত-পুত্র;
তোমার ভাগ্যে ঘটিবে জয়শ্রী।

ষষ্ঠ সর্গ।

ANGLO-INDIAN PRIZE POEMS. বা যুবরাজের ভারতে আগমন-বিষয়ক পারিতোষিক-প্রাপ্ত কবিতামালা। এই সৌবর্ণললাটধারী রঞ্জিতপার্শ্ব সুন্দর পুস্তকখানি সমালোচনার নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কন-পারিপাট্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, তেলুগু, ইংরাজী—এই কয় ভাষারই কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভাষার অক্ষরগুলি যেন এক একটী মুক্তা সাজান রহিয়াছে। বৈদেশিক ভাষার অক্ষরগুলিও ইংলণ্ডে এত সুন্দররূপে প্রস্তুত হয় তাহা ইংলণ্ডের পক্ষে সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে।

যুবরাজের ভারতে আগমন-সময়ে লণ্ডনস্থ ক্রাউন্ পার্ফিউমারি কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী মহোদয় যুবরাজের ভারতে আগমনবিষয়ে ভারতীয় বা ইংলণ্ডীয় ভাষায় যাঁহারা উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে একশত গিনি-পরিমিত মুদ্রা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সংবাদ ইংলণ্ডে ও ভারতের সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হয়। ইহার ফল যুবরাজের ভারত-ভ্রমণবিষয়ে সার্দ্ধ শত কবিতার উৎপত্তি। এই সার্দ্ধ শত কবিতার তৃতীয়াংশ ভারতীয় কবিগণ কর্ত্তৃক—সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু, উর্দ্দু ও ইংরাজী প্রভৃতি নানা ভাষায় রচিত। এই ভারতীয় কবিগণের মধ্যে ভারতবাসী পর্টুগীজ, দেশীয় খৃষ্টান, ইউরেসীয়ান, পার্সী, হিন্দু, মুষলমান প্রভৃতি সকল জাতিই আছেন। ভারতীয় ইংরাজী পদ্যগুলির জন্য দুইটী পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এই দুইটীই দুইজন বাঙ্গালী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের নাম শচীশচন্দ্র দত্ত এবং রাম শর্ম্মা। আমরা আরও আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার বাঙ্গালা স্তোত্রের জন্য ৫০০ শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে ভারতের সুশিক্ষিত যুবকেরা রাজদ্রোহী। আমাদিগের অনুমান হয় যুবরাজের অভিপ্রায় মতে ক্রাউন পার্ফিউমারী কোম্পানীর অধ্যক্ষ সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত এই কৌশল খেলিয়াছিলেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে এইক্ষণে আশা করি যাঁহাদিগের মনে সেরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এই যুবরাজ-স্তোত্রগুলি পাঠ করিয়া সে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

এই যুবরাজ স্তোত্র গুলির গুণাগুণ নির্ব্বাচন করা আমাদিগের ইচ্ছা নহে। কারণ যে সুযোগ্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর উপর এই গুরুভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারাই তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা কেবল জানিতে চাই ভারতীয় কবিগণ রাজস্তোত্রে যেরূপ অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি

প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বদেশীয় বা স্বজাতীয় উদ্দীপনা উপলক্ষে তাদৃশ কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন কি না? আমরা অনুমান করি ধনিগণ বা রাজগণের স্তোত্র উপলক্ষে ভারতীয় কবিগণের যাদৃশী কবিত্বশক্তি বিকাশ পায়, অন্য কোন উপলক্ষে তাদৃশ হয় না। যদি আমাদিগের এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা ইচ্ছা করি, যেন সরস্বতীর বীণা কিছুকালের জন্য ভারতে নীরব হয়। আমরা আর "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" শুনিতে চাই না! যথেষ্ট হইয়াছে। বীণাপাণি! এখনও বীণা সম্বরণ করিয়া ভারতের লজ্জা নিবারণ কর।

ব্যবসায়ী—কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে শ্রীশ্রীনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত। ভবানীপুর সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে বাঙ্গালার এই এক মাত্র কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকার জন্য আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যাপেক্ষী হইতে হইল। ইহা শুদ্ধ সম্পাদকের লজ্জার কথা নহে, জাতিসাধারণের লজ্জার কথা। কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত যে ভারতের উন্নতির আশা নাই একথা কাহাকে বুঝাইতে এক্ষণে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। কারণ পুনঃ পুনরালোচনায় ইহা এক্ষণে স্বতঃসিদ্ধ সত্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভারতের ভাবী উন্নতির মূল সেই কৃষি শিল্প ও ও বাণিজ্য বিষয়ে সুচারুরূপে উপদেশ প্রদানে সক্ষম শ্রীনাথবাবু ভিন্ন বাঙ্গালায় আপাততঃ আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইনি ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও বহুদর্শন লাভ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এক্ষণে সেই শিক্ষা ও বহুদর্শন স্বদেশের উপকারে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যেন তিনি স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট অনুকূল করাবলম্ব প্রাপ্ত হয়েন।

আমরা অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, বাতির উপকরণ, রবার, কৃষির উন্নতি উপায়, কার্পাস প্রভৃতি ইহার কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। আমরা ইচ্ছা করি যেন শ্রীনাথবাবুর উপদেশগুলি অচিরাৎ কার্য্যে পরিব্যক্ত হয়। ভূম্যধিকারিগণ যেন অচিরাৎ শ্রীনাথ বাবু প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে তাঁহাদিগের ভূমি-সম্পত্তির উৎকর্ষ বিধান করিতে চেষ্টা করেন; এবং ব্যবসায়ীরা যেন অবিলম্বে এ দেশে সমস্ত জিনিস পত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীনাথ বাবু তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করিবেন।

পরলোক ও সমাজ।

মৃত্যুর পর আত্মার জীবিত-কালকে পরকাল কহে। পৃথিবীর অতি প্রাচীন কাল হইতে লোকের এই পরকালে বিশ্বাস পরিদৃষ্ট হয়; এই বিশ্বাসের আদি ও উৎপত্তি কি তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত অসাধ্য ব্যাপার। আত্মার পরকাল আছে এই মাত্র বিশ্বাস, কি প্রাচীন, কি আধুনিক সকল জাতিতেই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই পরকাল কিরূপ, আত্মার পরকালে কিপ্রকার অবস্থা হইবে তদ্বিষয়ে মতামতের ও বিশ্বাসের বিষম বৈষম্য দৃষ্ট হয়। তদ্বিষয়ে এক জাতির মতামত হয়ত অন্য জাতির মতামত হইতে সম্পূর্ণ প্রভিন্ন অথবা বিপরীত। আত্মার পরকালের অবস্থাকে আমরা পরলোক বলিলাম। আমাদিগের পরকাল ও পরলোক দুইটী স্বতন্ত্র বিষয়। পরকাল বলিলে—মৃত্যুর পর আত্মা জীবিত থাকে—কেবল এই মাত্র জ্ঞান অথবা বিশ্বাস বুঝাইবে; পরলোক বলিলে সেই জীবিত কালের অবস্থা, ভাব, বিকার, প্রকার প্রভৃতির জ্ঞান অথবা বিশ্বাস বুঝিতে হইবে। এই পরলোকের ভাব বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্নপ্রকার হওয়াতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে তাহা পরকালের জ্ঞান ও বিশ্বাস হইতে ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়াছে। ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয়।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই আর্য্য জাতির বৈদিক সাহিত্য বিলোড়ন করিয়া দেখ, তথায় পরলোকের ভাব অতি সামান্য ও সরল। অতি প্রাচীন বেদে এই ভাব নিতান্ত অস্ফুট। ক্রমশঃ বৈদিক সাহিত্য যেমন বিস্তৃত হইয়াছে এই ভাবও ক্রমশঃ ততই স্ফুরিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখ, পৌরাণিক সাহিত্যে এই পরলোকের ভাব যেমন সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল, যেমন পরিষ্কার ও বিস্তৃত, তেমন স্মৃতি শাস্ত্রে অথবা বৈদিক সাহিত্যে নহে। পুরাণে তুমি পরলোকের বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞাত হইতে পারিবে। কয়টী স্বর্গ, কয়টী নরক, কোন্ স্বর্গ ও নরক কিরূপ, কোন্ কর্ম্ম করিলে কিরূপ ফল হয়, কোন্ কর্ম্মে আত্মা পরকালে কোন্ যোনি প্রাপ্ত হয়, এই সমস্ত বিষয়াদির সম্পূর্ণ বিবরণ পুরাণাদিতে প্রকটিত আছে।

হিব্রু জাতিও একটি প্রাচীন জাতি। হিব্রুজাতির ধর্ম্মপুস্তক খুলিয়া দেখ তাহাও উক্ত মত সমর্থন করিতেছে। মোসেসের গ্রন্থখণ্ড অবধি ম্যাকাবিন গ্রন্থ পর্য্যন্তে ঈষৎ পরকালের জ্ঞান হইতে পরলোকের জ্ঞান ক্রমশঃ বিস্ফুরিত হইয়াছে। নিউ-টেষ্টমেণ্টে পরলোকের ভাব সম্পূর্ণ চিত্রিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থখণ্ডে আমরা

পরকালের জ্ঞান ও বিশ্বাস দেখিতে পাই, কিন্তু পরলোকের ভাব অত্যন্ত অস্ফুট। তখন এই বিশ্বাস মনুষ্য-কার্য্যের প্রয়োজন কারণ (motive) রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মোসেসের বিধানাবলিতে ইহার উল্লেখ নাই; ইহুদী জাতির পূজাতে ইহার চিহ্ন নাই। কেহ কেহ শরীরের শোণিতে, কেহ বা প্রাণবায়ুতে কেহ বা হৃদয় ও অন্ত্রাদিতে আত্মার অবস্থানের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন *। প্রথমে আত্মার অমরত্বের জ্ঞান ও স্বর্গ নরকের জ্ঞান অতি অপরিস্ফুট ছিল। নির্ব্বাসন হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে হিব্রুজাতির এই জ্ঞান বিস্তৃত হইল। তখন শরীরের পুনরুত্থান + মতের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। মলমন এবং ম্যাকাবিসের চতুর্থ পুস্তকে এই মত পরিস্ফুত রূপে প্রচারিত হইয়াছে। এই মত এবং পরলোকে যে আত্মা ইহলোকের পাপ পুণ্যের ফলাফল অবশ্য ভোগ করিবে এই বিশ্বাস জিসস পূর্ব্ব-স্থাপিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন।

পূর্ব্বতন গ্রীশ ও রোমে গিয়া দেখ হোমর হইতে সিসেরো পর্য্যন্ত পরলোকের ভাবে কত পরিবর্ত্তন। হোমরের পরলোকের ভাব নিরানন্দময় পরকাল মাত্র। এখিলিস বলিয়াছিলেন চিরদিন পরলোকবাসী হওয়া অপেক্ষা এক দিনের জন্যও ইহলোকে নৃপতি হওয়া সুখকর জ্ঞান করি। হিসিয়ডে পরলোকের ভাব উন্নত হইয়াছে। তিনি পুণ্যবান্‌দিগের জন্য স্বর্গ প্রস্তুত করিয়াছেন। পিণ্ডার সেই স্বর্গধামের বিবরণ দিয়াছেন; তিনি নরকেরও বিবরণ দিয়াছেন। তদনন্তর দার্শনিকগণ * আত্মার অমরত্ব মতের প্রচার ও শিক্ষা দিয়াছেন।

আধুনিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা এই পারলৌকিক ভাবের কত প্রকার শাখা বিশাখা বিরচন করিয়াছেন। নিজে জিসস যে সকল মত জানিতেন না ইঁহারা তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন। ক্যাথলিকেরা অনন্ত নরকের ভাব কিছুই জানিতেন না; তাঁহাদিগের নরকের উদ্ধার আছে; কিন্তু ক্যাল্‌ভিনের শিষ্যগণ অনন্ত নরকে জ্বলিয়া মরিতেছেন।

এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে পরকালের সংস্কার ক্রমশঃ পারলৌকিক ভাব সমূহে পরিভূষিত হয়। কারণ ইহা মানবের কল্পনার কার্য্য। যে জাতির কল্পনা যে উপকরণ পায় সেই জাতি পরকালকে তদ্রূপ ভূষণে ভূষিত করে। যে জাতির সুখের ও দুঃখের প্রবৃত্তি যেরূপ, সেই জাতি সেই প্রকার সুখ ও দুঃখে

* See Theodre Parker's Discourse of matter pertaining to Religion. Book 1. chap. VI sec 11.

+ Resurrecion of the body—a notion perhaps of Zoroastrian origin.

* Pherecydes, Plotinus, Thales, Pythogoras, Socrates, Plato, Aristotle, Cicero, Plutarch, Epictatus.

পরলোক পরিপূর্ণ করে। ইহলোকের সুখ দুঃখের কাল্পনিক ভাব সমূহ পরকালে আরোপ করিলেই পরলোক সৃষ্ট হয়। মানবের জ্ঞান যত বৃদ্ধ, সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ হইয়া আইসে তাহার পরলোকের ভাবও ততই উন্নত হইতে থাকে।

যেরূপে পরকালের সংস্কার ও পরলোকের ভাব উৎপন্ন হউক না কেন, তদ্বিষয় আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। মনুষ্য-সমাজে পরলোকের কিরূপ প্রভাব তাহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। সমাজ মধ্যে যখন পরকালের সংস্কার মাত্র প্রচারিত থাকে, সেই সংস্কার দ্বারা মানবের জীবন কিছুই নিয়মিত ও চালিত হয় না। কিন্তু মনুষ্য যখন ক্রমশঃ বিশ্বাস করিতে থাকেন, যে ইহলোকের কার্য্যের ফলাফল পরলোকে গিয়া ভোগ করিতে হইবে, এবং যখন সেই ফলাফলের বিশেষ বিশেষ চিত্র তাঁহার মনোমধ্যে বিশ্বাসের সহিত অঙ্কিত হয়, তখন হইতে তাঁহার জীবন সেই ভাবাদির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর জনসমাজের ইতিবৃত্ত তাহাই প্রতিপাদিত করে।

এই পারলৌকিক প্রভাবে মনুষ্য-সমাজের অধিক ইষ্ট কি অনিষ্টসাধন হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মনুষ্য-সমাজ যখন বাল্যদোলায় অধিষ্ঠিত ছিল, যখন মনুষ্য আত্ম-অর্থ অধিক বুঝিত, তখন এই পারলৌকিক ভাবে মনুষ্যসমাজ অধিক বিচালিত হইত। যখন মনুষ্য-সমাজে ইহলোকের সুখ অত্যল্পই ছিল, তখন মানবের পারলৌকিক সুখভোগের ইচ্ছা বলবতী ছিল। দুঃখময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলে লোকে অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া জ্ঞান করিত। যে পরিমাণে মানবসমাজে ইহলোকের দুঃখ, সেই পরিমাণে পারলৌকিক ভাব প্রবল হয়। দুঃখের যেমন হ্রাস হইতে থাকে, মানব ততই ইহজীবনকে আদরণীয় জ্ঞান করিতে থাকেন, ততই তাঁহার মনে পারলৌকিক প্রভাব বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বকার বর্ব্বরসমাজে সুখাংশের পরিমাণ অল্প ছিল, সুতরাং তখন লোকের মনে পারলৌকিক ভাব অধিক প্রবল ছিল। ইহজীবনে যিনি যত সুখী, মৃত্যুমুখে যাইতে তিনি ততই সঙ্কুচিত হন। নিশ্চিত সুখভোগ ত্যাগ করিয়া কে অনিশ্চিত সুখের জন্য অগ্রসর হইবে? বর্ত্তমান সুখ ত্যাগ করিয়া কে ভবিষ্যৎ সুখের জন্য লালায়িত হইবে? কিন্তু জীবন যত ক্লেশকর বোধ হয় মনুষ্য ততই মৃত্যুর ইচ্ছা করে। এন্‌টিগোনসের সৈন্যাবলীর মধ্যে এক জনের অদ্ভুত সাহস ছিল, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা পীড়িত হইতেন এবং তাঁহার মুখ-কান্তি বিবর্ণ হইতেছিল। এতদ্দর্শনে এন্‌টিগোনস একদিন তাঁহাকে মুখ-বিবর্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসায় প্রকাশিত হইল, তাঁহার কোন গোপনীয় পীড়া ছিল। এন্‌টিগোনস তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রোগী

ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন। যখন তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন তাঁহার জীবনে অধিকতর আদর বৃদ্ধি হইল। তাঁহার পূর্ব্বকার সাহস তিরোহিত হইল। তিনি আর আপদ্ বিপদে তত অগ্রসর হইতেন না। এনটিগোনস ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সৈন্যবয় উত্তর দিলেন:—"আপনিই আমাকে এক্ষণে সাহসহীন করিয়া দিয়াছেন; যে রোগের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার জন্য আমার জীবন মৃত্যু জ্ঞান ছিল না, আপনি সেই রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া আমার জীবন দান করিয়াছেন; আর আমি মরিতে চাহি না।" এই জন্যই স্পার্টানদিগকে দেখিয়া এক জন সাইবিরাইট * বলিয়াছিলেন "স্পার্টীয়েরা যে এত মৃত্যুমুখী ও সাহসী হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। স্পার্টীয়েরা এত কষ্ট ভোগ করেন, এত ক্লেশে ও দুঃখে তাঁহাদিগকে জীবনাতিপাত করিতে হয় যে তাঁহারা সে জীবন হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যত হইবেন তাহা বিচিত্র নহে।" *

২। এই পারলৌকিক ভাবে পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ, অনেক শোণিতপাত উৎপাদন করিয়াছে। যুদ্ধ-নিহত বীরগণকে সকল ধর্ম্মেই পুণ্যবান্ জ্ঞান করিয়াছে। রণোন্মত্ত ক্ষত্রিয় কি জন্য রুধিরময় রণক্ষেত্রে ধাবিত হইতেন? কি জন্য তিনি শত শত নরবলি দিয়া আপনি অকাতরে ও আনন্দ মনে শরশয্যায় প্রাণত্যাগ করিতেন? এরূপ ক্ষত্রিয়ের জন্য কি স্বর্গধামে উচ্চ স্থান সঞ্চিত থাকিত না? তাঁহারা সেই গৌরব লালসায়, সেই পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য শত শত অরাতিকুল নির্ম্মূল করণে কি উদ্যত হইতেন না? সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্ষত্রিয়-কুলের প্রকৃতি অবশেষে কিরূপ রণলোলুপ হইয়া পড়িয়াছিল, একজন সুলেখক † তাহা এই প্রকার উদ্দীপক বাক্যে বর্ণন করিয়াছেন। "যাহাদিগের যুদ্ধই বিনোদন, সমরে সাহস প্রকাশই আনন্দ হেতু, শত্রু-দমনই গৌরবের নিদান, বিপদে ধৈর্য্য প্রদর্শনই কীর্ত্তি এবং অদ্ভুত পরাক্রম-প্রকাশই এক মাত্র অভিলাষ, সেই মহোদ্যোগশালী দুর্জ্জয় হৃদয় ক্ষত্রিয়দিগের কি সন্ধির সময় সুখে অতিবাহনীয় হয়! তাঁহাদিগের মন বিগ্রহের নিমিত্ত প্রদীপ্ত থাকে ও বিপদাগমের নিমিত্ত উৎসুক থাকে এবং পাণি শস্ত্র-গ্রহণের নিমিত্ত কণ্ডূতিযুক্ত থাকে। কার্য্যহীন তরবারি তাঁহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া

* পূর্ব্বকালে টারেণ্টমের উপকূলে যে গ্রীসীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তাহাদিগকে সাইবিরাইট্ বলিত। তাহাদিগের প্রধান নগর সাইবেরিস্। সাইবিরাইট জাতি, বিপুল ধন, ঐশ্বর্য্য এবং সুখের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

* See Plutarch's Life of Pelopidas.

† শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। বিচিত্র বীর্য্য দেখ।

ভৎসনা করে। বর্ম্মহীন দেহ সন্নদ্ধ হইবার নিমিত্ত মহোদ্বিগ্ন থাকে, ধাবনহীন রণতুরঙ্গ আন্তরিক তেজে জ্বলিত হইতে থাকে। যেরূপ সাগরের অগাধ পয়োরাশি নিরন্তর প্রচণ্ড বাতাঘাতে সংক্ষোভিত না হইলে দুর্গন্ধ ও দূষিত হইয়া যায়, সেরূপ ক্ষত্রিয়-দিগের আলস্য-দ্বেষী দেহ সমরের মহা-ব্যাপারে ব্যাপৃত না থাকিলে শুষ্ক ও নীরস হইয়া যায়। লোক-সমাজে এরূপ বীর-শ্রেণীর যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। ভারতবর্ষ যদি এই-রূপ-বীর্য্যশীল-ক্ষত্রিয়-হীন না হইত তাহা হইলে তাহা কখন যবন করে কবলিত হইত না, এবং ভারতবাসিগণ যবনের দাস হইয়া থাকিত না। কিন্তু পারত্রিক প্রবো-ধনায় উদ্বোধিত না হইলে কি অন্য কোন কারণে ও উত্তেজনায় জাতিমধ্যে বীর-কুলের উৎপত্তি হয় না? লাইকার্গসের নিয়মাবলী ও স্পার্টীয় জাতি এবং সোলনের নিয়মাবলী ও এথিনীয় জাতি কি সাক্ষ্য দেয়?

সেই গ্রীকগণের পারত্রিক আশা এবং প্রবোধনা তাদৃশ প্রবল ছিল না। সুপ্রবল স্বদেশানুরাগ স্পার্টীয়গণের জাতীয় ধর্ম্ম, এবং জাতীয় উন্নতি ও সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনই এথিনীয়গণের সুপ্রধান ব্রত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের পারত্রিক প্রবো-ধনা কিছুই ছিল না বলিলেও হয়। তাঁহাদিগের জাতীয় ও সামাজিক প্রবৃ-ত্তিই প্রবল ছিল। যে বীরত্ব শুদ্ধ স্বদেশ ও স্বসম্পত্তি রক্ষণের জন্য আবশ্যক, তাহা মানবের স্বার্থপরতাই উৎপাদিত করে। কিন্তু যে বীরত্ব অকারণ পরদ্রোহী হইয়া উঠে, লোভই তাহার প্রণোদক, এবং পারত্রিক উদ্বোধনা তাহার সহায়তা করে। জাতি বিশেষে পারত্রিক প্রবোধনাই প্রধান কারণ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ইউরোপীয় গথ জাতি ও মুসলমানদিগের উল্লেখ করিলাম।

বীরগণের যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতে কি কোন ধর্ম্মে বিধান আছে? যে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম এক্ষণে পৃথিবীর সভ্যসমাজ মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, সে ধর্ম্ম কি বীরগণকে, সৈন্য-মণ্ডলীকে, এবং নরপালগণকে যুদ্ধকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে? আয়র্লণ্ড এবং ফ্রান্সের ইতিবৃত্ত কি আরক্ত অক্ষরে লিখিত নহে? সেই শোণিত-পূর্ণ ইতি-বৃত্ত অধ্যয়ন করিতে গিয়া একদা পাষ-ণ্ডের মনও খৃষ্টান দিগের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। সমগ্র ইউরোপ-মণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত রুধিরপাত হইয়াছে তুলনা করিয়া দেখিলে আর কোন স্থানে বোধ হয় ততোধিক হয় নাই। ক্রুসেডের যুদ্ধে কি সমগ্র ইউরোপ-মণ্ডলী একদা উন্মত্ত হইয়া পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য ধাবিত হয় নাই? পোপের ক্ষমতা ও লোভ নিবারণ জন্য খৃষ্টানমণ্ডলী মধ্যে কত সহস্র বার না ঘোর রণ-কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল! এই সমস্ত ধর্ম্মযুদ্ধে কত অসংখ্য খৃষ্টান পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য পোপের পক্ষাবলম্বন করিয়া নৃশংসরূপে নরহ-ত্যায়, শত শত নর বলিদানে, বালবৃদ্ধ

বনিতা হত্যায় * দেশ বিদেশ রুধির-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন। কি জন্য খৃষ্টানগণ এ সমস্ত ধর্ম্মযুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া উঠেন? কি গূঢ় অভিপ্রায় তাঁহাদিগের মনকে উত্তেজিত করিয়াছিল? ইহার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা কি দেখিতে পাই না, ইহাঁরা পারলৌকিক ভাবে পূর্ণ হইয়া অবিপরীত হৃদয়ে নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন?

খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভে ইউরোপের উত্তর প্রদেশ হইতে যে বর্ব্বর জাতির রণোন্মত্ত লোক প্রবাহ নদীবন্যের ন্যায় দক্ষিণাভিমুখে বিসারিত হইয়া বিশাল রোমরাজ্য বিধ্বংশ করিয়াছিল, তাহারা কোন্ প্রবোধনায় উত্তেজিত হইয়া এরূপ বিসারী প্রাণি-সংহারে প্রবৃত্ত হয়? ওডিন ইহাদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন। বৈরনির্য্যাতন ও নর-রুধিরেই ওডিনের আনন্দ। ইহাদিগের বীরগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে ভালহালার ভারজিন * নাম্নী একশ্রেণী সুরদেবী ইহাদিগের সেবার্থে নিযুক্ত থাকিত। যুদ্ধে অথবা স্বহস্তে যাঁহারা প্রাণত্যাগ করিতেন তাঁহারাই ওডিনের ভক্ত ও তাঁহারাই ওডিনের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেন। যাঁহারা রোগে, অথবা বয়োবৃদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব পাইতেন, স্বর্গে তাঁহাদিগের স্থান নাই, এবং তথাকার বিপুলানন্দ সম্ভোগে তাঁহারা অধিকারী নহেন। তাঁহাদিগের স্বর্গীয় সুখ কি ছিল? তাঁহাদিগের স্বর্গীয় সুখ অনিবার যুদ্ধ বিগ্রহ ও হত্যা ব্যাপার, এবং নরকপালে সুরাপান। এই সুখ চিরকাল সম্ভোগ করিবার জন্য বীরগণ বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। রেগনার লড়ব্রক * মৃত্যু-শয্যায় যখন নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার অসংখ্য নর-হত্যার গণনা করিয়া কথঞ্চিৎ সন্তোষলাভ ও যন্ত্রণার বিমোচন করিয়াছিলেন +। যে ড্রুইড ধর্ম্ম কেলট জাতির অবলম্বনীয় ছিল, সেই ড্রুইড ধর্ম্মেরও এইরূপ রুধির-ময় ভাব। ড্রুইডেরা দেবতার নিকট নরবলি দিত। যে সাধুপুরুষ বলি হইতেন, তিনি দেবতার গ্রহণীয় হইয়া স্বর্গে অতুল সুখ সম্ভোগ করিতেন।

আর আমরা দৃষ্টান্ত বাড়াইতে চাহি না। মুসলমান ধর্ম্মের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। যে কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত করিতেছে। পারত্রিক

* See Irish Rebellion and Massacre of the Protestants in 1641 October 23, and Massacre of St Bartholomew in 1572 August 24.

* Virgins of the Valhalla.

* Regner Lodbrok, whose death-song is a faithful picture of the Scandinavian character.

+ Tytler's General history, section XLVII epitomized from Gibbon.

মঙ্গল লাভের জন্য এক এক জাতির প্রাকৃতজনগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মনুষ্যকুল সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অন্য কোন প্রবোধনায় এত দূর হইত না।

৩। পারলৌকিকভাবে পার্থিব ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য উৎপাদিত হইয়া পৃথিবীর অধিক ক্ষতি হইয়াছে। পৃথিবীর সুখে বিরাগী না হইয়া সন্ন্যাসিগণ যদি ঐহিক সুখ প্রবর্দ্ধনার্থ যত্নবান্ ও উদ্যোগী হইতেন, তাহা হইলে আজি পৃথিবীর অনেক দূর উন্নতি সাধন হইত। যে অবধি ইংলণ্ডের ধর্ম্ম মঠসকল ভগ্ন হইয়াছে, সেই অবধি তাহার সহস্র উদাসীন ব্যক্তি পার্থিব কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জাতীয় পরিশ্রমের * উন্নতি সাধন করিয়া ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত করিয়াছে। যাহা ইংলণ্ডে ঘটিয়াছিল ইউরোপের সাধারণ ধর্ম্ম-সংস্কার † কাল হইতে সমগ্র ইউরোপ-মণ্ডলীতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। এই সময় হইতে ইউরোপের ক্রমশঃই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তাহার জনসাধারণ আর ধর্ম্মমঠে প্রবেশ করে না। তাঁহারা যে স্বর্গীয় কাল্পনিক সুখের জন্য সমস্ত ঐহিক সুখ বিসর্জ্জন দিত, যে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইবার জন্য পৃথিবীকে দুঃখ পূর্ণ করিয়াছিল, এখন সেই জনগণ পৃথিবীকেই স্বর্গধাম করিয়া তুলিতেছেন। আর তাঁহারা স্বর্গের জন্য ব্যস্ত নহেন; এখন মৃত্যু তাঁহাদিগের যন্ত্রণার কারণ এবং স্বর্গের সোপান নহে। এই বৈরাগ্য বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য, স্থলান্তরে ● আমি তাহা ব্যক্ত করিয়াছি; এই স্থানে পড়িবার সুবিধার জন্য তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "মানবের কল্পনা ও আশা পরলোকের বৈকুণ্ঠধামকে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিতেছে। তিনি ইহলোকের শোক-সন্তাপ পরলোকে গিয়া দূরীকরণ করিবেন বলিয়া কতই সহিষ্ণুতার সহিত পৃথিবীর যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা অকাতরে বহন করিতেছেন। কেহ বা পরলোকের কাল্পনিক সুখে এত প্রমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন যে ইহলোকের কোন সুখই তাঁহার নিকট সুখ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সমুদায় পার্থিব সুখকে অবহেলা করিয়া পরকালের কাল্পনিক সুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। পূর্ব্বকালের যোগী ও ঋষিগণ এইজন্য সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সুখ তাঁহাদিগের নিকট কিছুই নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। পরলোকের আশা-রঞ্জিত সুখময় দেশ তাঁহাদিগের কল্পনার চক্ষে এত উজ্জ্বলবর্ণে দেদীপ্যমান হইয়াছিল যে তজ্জন্য তাঁহারা সংসারের সকল বাস্তবিক সুখকে হেয় জ্ঞান করিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে কিছু মহত্ব আছে বটে, কিন্তু সংসারের সুখ

* National Industry.

† Reformation.

● ১২৮৩ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের আর্য্য-দর্শনে "শরীর ও মন" নামক প্রস্তাবের শেষ ভাগ দেখ।

বৃদ্ধি করিলে যে মহত্ত্ব হয় সে মহত্ব, কি সংসারের সুখত্যাগের মহত্ত্ব অপেক্ষা গরীয়ান্ নহে ? সহস্র জনকে সুখী করাতে যে মহত্ত্ব সে মহত্ত্ব কি আপনাকে সংসার-সুখে বিরাগী দেখাইয়া স্বতঃই কষ্ট ও যন্ত্রণাকে আলিঙ্গন করার মহত্ব অপেক্ষা উচ্চতর নহে ? কিন্তু যোগী ও ঋষিগণের বৈরাগ্য ও মহত্ত্বের কি ফল ফলিয়াছে ? সেই অলীক মহত্ত্বের জন্য অনেকে লালায়িত হইয়া তাঁহাদিগেরই অনুসারী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাতে সংসারের অনেক অনিষ্ট সাধন হইয়াছে। যে দিন হইতে এই সাংসারিক ঔদাসীন্য ভাব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই দিন অবধি পৃথিবীর অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে মানব পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ, যে মানব পৃথিবীকে সুখ সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন, যে মানব পৃথিবীকেই বৈকুণ্ঠধাম ও ইন্দ্রালয় করিতে পারেন, সেই মানব সেই পৃথিবীর প্রতি উদাসীন! ভারতে এই ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্যের উপদেশে ইহার কতই না সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। আমরা ধার্ম্মিক ও সাধুজনের সহিষ্ণুতার মহত্ত্ব ভাবিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে প্রস্তুত আছি বটে, কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য-ভাবকে আমরা কিছুমাত্র প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি। তিনি যদি সংসারের সুখ বর্দ্ধনের নিমিত্ত সেই অসহ্য ক্লেশ বহন করিয়া সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন, আমরা তাঁহার সহিষ্ণুতাকে শতমুখে আনন্দরবে সাধুবাদ দিতাম। তিনি সে বৈরাগ্য লইয়া বনবাসী হউন। তিনি সংসারে থাকিবার উপযুক্ত নহেন। তিনি যেমন সংসারধামকে হেয়জ্ঞান করিয়াছেন, সংসারও তাঁহাকে হেয়জ্ঞান করিয়া বনবাসে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার দ্বারা সংসারের কিছুই মঙ্গল সাধিত হইবে না। বরং তাঁহার উপদেশে ও দৃষ্টান্তে অনেক অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।”

খৃষ্টানধর্ম্ম এই বৈরাগ্যের অনেক গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। জিসস ইহার উপদেশ দিয়াছিলেন; এবং পল বৈরাগ্যের প্রধান ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যের বৈরাগ্য-ধর্ম্মে বঙ্গদেশে যে সমূহ অনিষ্টোৎপাদন হইয়াছে, পলের বৈরাগ্য উপদেশেও তদ্রূপ ইউরোপের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ইউরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে পলের বৈরাগ্য ধর্ম্মকে গ্রীশীয় দর্শন • আসিয়া বলীয়ান্ করিয়া তুলিল। সিনেকার উপদেশ চারিদিকে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম প্রচারিত করিতে লাগিল। ইউরোপের অর্দ্ধভাগ বৈরাগ্যাবলম্বন করিল। চারিদিকে ধর্ম্মমঠ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। মানব-সমাজের অর্দ্ধভাগ সংসার পরিত্যাগ করিল। যে অর্দ্ধভাগ সংসারে অবশিষ্ট ছিল, তাহারা ও ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত। এক দিকে ঔদাসীন্য অন্যদিকে ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ। ইহাতে ইউরোপের যে অবনতি ঘটিয়াছিল তাহা ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে। এই সময় স্কুলমেন নামক পণ্ডিতগণ

• Stoicism.

তাহার হইয়া পূর্ব্বকালে পৃথিবীর অজ্ঞানান্ধকার [illegible] সম্প্রদায়কে অধিকতর দুঃখের ভাগী করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের জন্য খ্রিষ্টীয়দের মধ্যে সকল গ্রহণ করিলেন। বৈরাগ্যের শতগুণ বৃদ্ধি হইল, এবং সংসার আরও ক্রমশঃ উৎসন্ন যাইতে লাগিল। অন্যান্য কারণে ইউরোপ হইতে যদি এই বৈরাগ্য তিরোহিত না হইত, আজি ইউরোপের যে কতই দুর্দ্দশা ঘটিত কে বলিতে পারে? আজি ইউরোপীয় সভ্যসমাজ হয়তো উদাসীন ভারতীয় সমাজের দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইত।

৪। পারলৌকিক ভাবে ধর্ম্ম ও মানব-সমাজ অধিকতর স্বার্থপর হইয়াছে। ইহা মানবের স্বার্থপরতা ও লোভ প্রবৃত্তিকে বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ও চরিতার্থ করিতেছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে লোপ হইতেছে। যে ব্যক্তি ও যে সমাজ যত ধর্ম্মপরায়ণ, সেই ব্যক্তি ও সেই সমাজ তত স্বার্থপর। সাধুজনে ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী নহেন। তিনি আপনার পরকালের কার্য্য করিতেছেন। দাতা পরকালের দিকে চাহিয়া দান করিতেছেন। উপকারী প্রত্যুপকার পাইবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। নিস্বার্থ উপকার ও নিষ্কাম দান কয়জন করিয়া থাকেন? জনসাধারণই স্বর্গের দিকে পুরস্কারের জন্য তাকাইয়া আছেন। লোকে শতগুণ লাভের জন্য একগুণ বিসর্জ্জন দেয়। পৃথিবীতে ধর্ম্ম যে এক বাণিজ্যাগার প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, আপনার লাভের জন্য কয় জন না সেই আগারে প্রবিষ্ট হয়েন? যিনি পৃথিবীর মধ্যে হয় তো শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম-পরায়ণ ও সাধু ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি ন্যায়বানের নিকট হয় তো ঘোর বিষয়ী, প্রধান ব্যবসায়ী, ও বিষম লোভী বলিয়া তিরস্কৃত এবং ঘৃণিত হইয়া দাঁড়াইবেন। তিনি ধর্ম্ম-বাজারে একগুণ দিয়া শতগুণ ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তিনি এক মুষ্টি অন্নদান করিয়া স্বর্গে চিরদিনের জন্য শতমুষ্টির প্রার্থী হইয়াছিলেন। সংসারের ধূলি তিনি স্বর্গে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, স্বর্গে গিয়া দেখিতে পাইবেন তাঁহার জন্য সে ধূলিও নাই। নিষ্কাম ধর্ম্মকে যদি যথার্থ ধর্ম্ম বলা যায়, তবে পৃথিবীতে যতদিন পরলোকের বিশ্বাস জীবিত থাকিবে, যতদিন মানব পরলোক না ভুলিবে, ততদিন তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া গণনীয় হইবেন না। তিনি এক জন লোভী ব্যবসায়ী মাত্র, অধিক লাভের জন্য অল্পলাভে বিসর্জ্জন দিতেছেন। ধর্ম্ম তাঁহার নিকট ক্রেয় সামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিষ্কাম ধার্ম্মিক ব্যক্তি পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। ইহা যদি সত্য হয় তবে পারলৌকিক ধর্ম্মদ্বারা পৃথিবীকে অধিকতর স্বার্থপর করিয়া তুলিতেছে। যিনি যত ধার্ম্মিক তিনি তত স্বার্থপর। তিনি হয় পৃথিবীর যশঃ-প্রার্থী, না হয় পরলোকের ঐশ্বর্য্য ও সুখাভিলাষী। এই প্রকার ধর্ম্মশীল ব্যক্তির স্বার্থপরতা সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যে

বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তিনি সকল বিষয়ে ন্যায় বুঝিতে যান। তাঁহার ন্যায় বুঝার অর্থ স্বার্থ বুঝা। তিনি আপনার স্বার্থ ও ন্যায় বুঝিবার সময় এত দৃঢ়হৃদয় ও দুর্দমনীয় হইয়া বসেন যে অতি দুর্জ্জনেও ততদূর হইতে পারে না। তাঁহার ভিলার্দ্ধ অর্থ বিপুল-সম্পত্তি-সমান। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মকার্য্যে কেবল স্বার্থের অনুসারী হইয়া আপনাদিগের প্রকৃতিকে কতদূর কলুষিত করিয়া বসেন, ধর্ম্ম ভিন্ন সামান্য সাংসারিক কার্য্যে তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। তখন তাঁহাদিগকে এতদূর আত্মসার জ্ঞান হয়, যে তাঁহাদিগকে সাধু ব্যক্তি বলিতে ঘৃণা বোধ হয়। আমরা এই প্রকার আত্মসার সাধু ব্যক্তির অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। সমাজ মধ্যে তাঁহাদিগেরই সংখ্যা অধিক। স্ত্রী মণ্ডলীতে তাঁহাদিগের গণনা করা যায় না; কারণ স্ত্রীলোকে স্বাভাবিকই অধিকতর ধর্ম্মপরায়ণা ও পারত্রিক-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া থাকেন। এই স্বার্থপর ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা যে জন-সমাজের উপকার হয় নাই, আমি একথা বলি না; তদ্দ্বারা সমাজের বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছে, জনসমাজের অনেক দুঃখ মোচন হইয়াছে, কিন্তু সেই ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের প্রকৃতি যেরূপ স্বার্থপর হইয়াছে তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

৫। পারলৌকিক ভাব দ্বারা জনসমাজে প্রতারণার বৃদ্ধি হইয়াছে। চতুর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় পুরোহিতশ্রেণী এই পারলৌকিক ভাব দ্বারা জনসমাজের নানা খেলা খেলিয়াছেন। তাঁহারা জানেন মনুষ্যজাতি স্বাভাবিকই স্বার্থপর; এই স্বার্থপরতার সুবিধা লইয়া তাঁহারা নানাপ্রকার চাতুরীজাল বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, মানব ধর্ম্মের নামে আপনার স্বার্থসাধন জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়ান। যে গুলি বাস্তবিক সৎকার্য্য ও ধর্ম্ম তাহাদিগকে তো অগ্রেই ধর্ম্মের নাম দিয়া স্বার্থের বাজারে প্রচালিত করিয়াছেন; অথবা তাহারা আপনারাই প্রচলিত হইয়া আছে। তাঁহারা দেখিলেন ধর্ম্মের নামে মনুষ্য যাহা পান, তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতেও স্বীকৃত হন। তাঁহার ধর্ম্ম কি কি মনুষ্য একবার জানিতে পারিলে, অমনি তাহার জন্য সকলই বিসর্জ্জন দিতে ধাবিত হয়েন; একগুণ দিয়া শতগুণ ক্রয় করেন। যাহা দেন তাহা প্রকৃত পদার্থ, যাহা লইতে চান তাহা কাল্পনিক বিষয়। তাহা ভবিষ্যতে অলীক ও কাল্পনিক স্বর্গধামে সঞ্চিত রহিল। যাহা বিসর্জ্জন দিলেন তাহা প্রকৃত সুখ অথবা সুখোৎপাদক পদার্থ, যাহা পাইবেন তাহা কাল্পনিক সুখ এবং তাহা স্বর্গের অলীক রাজ্যে অদৃষ্টভাবে সঞ্চিত থাকিবে। মনুষ্য পরকালে তাহা পাইবেন। তাঁহারা দেখিলেন, জনসমাজ নির্ব্বোধের ন্যায় এই প্রকার অলীক চক্রে ঘুরিতেছেন। তখন তাহাদিগকে বঞ্চিত করা দুঃসাধ্য নহে; মনে করিলেই হইতে পারে। সেই

ধন্ধিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদিগের হস্তে। অতএব জনসমাজকে প্রতারণা করিতে অধিক কৌশলের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা এইজন্য অনেক অলীক কার্য্য ধর্ম্ম নামে চালাইয়া দিলেন। কেবল অর্থদান সেই ধর্ম্মসঞ্চয়ের উপায়। ইহার জন্য জনসমাজ যে অর্থ বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন, যে প্রকৃত সুখের সাধন পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, পরজন্মে ও পরকালে তাহার ফলভোগী হইবেন। এই কৌশলে পুরোহিতবর্গ জন-সমাজ হইতে অর্থ বাহির করিয়া আপনারাই সুখভাগী হইতে লাগিলেন, জনসমাজ দুঃখে নিমজ্জিত হইল। জনসমাজের সুখ এখন নয়, সেই পরলোকে গিয়া। অগ্রে পুরোহিতগণ সুখী হউন, পরে জনসমাজ সুখী হউক আর নাই হউক তাহাতে পুরোহিতগণের কি? তাঁহারাতো কৌশল পূর্ব্বক পৃথিবীর সুখভোগ করিয়া লইলেন। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, পৃথিবীতে যাহা যাহা ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত আছে, একবার দেখা উচিত তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম কর্ম্ম কি না? যাহা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি তাহাই যে ধর্ম্ম, এরূপ বিবেচনা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। কারণ যে যে সমাজে পুরোহিত-শ্রেণীর প্রভুত্ব ছিল সেই সেই সমাজে অনেক অপধর্ম্মও ধর্ম্ম নামে প্রচলিত থাকিতে পারে। পৃথিবীর ইতিবৃত্তে দেখা যায়, সমস্ত প্রাচীন সভ্য সমাজেই ধর্ম্মপুরোহিত বর্গের আধিপত্য ছিল, এবং সকল প্রাচীন সমাজের ব্যবস্থা মতেই ধর্ম্মীয় ব্যবস্থা আধুনিক সমাজে চলিয়া আসিতেছে। অতএব এই ধর্ম্মের স্রোত মূলদেশেই আবিল হইয়াছে; এবং সেই স্রোত সর্ব্ব সমাজেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে পৃথিবীতে যে ধর্ম্ম ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে তাহা কতদূর পরিশুদ্ধ তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। মনুষ্য-সমাজ যে প্রতারিত হয়েন নাই, এরূপ কখনই নহে। যে সমস্ত সুকৃতি-অভিধেয় কার্য্যের পাপ-মলিনতা স্পষ্ট দেখা গিয়াছে এবং আজিও দেখা যাইতেছে, তাহারা তৎক্ষণাৎ ধৃত হইয়া পুরোহিত-বর্গের কৌশল চিহ্ন বলিয়া কলঙ্কিত ও চিহ্নিত হইয়াছে। জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তি যতই উন্মেষিত হইবে, ততই তাঁহারা এই কৌশল বাগুরার ছেদ করিতে পারিবেন। কে জানে ভবিষ্যতের ধর্ম্ম ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম-প্রণালী কি হইবে? মনুষ্য-সমাজের জ্ঞানোদয়ের এই তো প্রভাত-কাল। প্রভাত-কালের আলোক দেখিয়া কি আশা হইতেছে না, দ্বিপ্রহরের প্রভাগমে সত্যের কত শত স্বর্ণময় বিশাল রাজ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে!

শ্রীপুঃ—

বিবিধ সমালোচন।*

জাগ্রতি ও বিস্মৃতি মানবজীবনের এই দুইটিই বর্ত্তমান ভাব; দুঃখ এবং সুখ এই উভয় ক্ষেত্রেরই সমুৎপন্ন ফল; তন্মধ্যে জাগ্রতির যে কার্য্যমাত্র তাহাই দুঃখ, এবং বিস্মৃতির যে কার্য্য মাত্র তাহাই সুখ। সুমধুর বীণা বাদিত হইতেছে, অন্তর তাহাতে আকৃষ্ট, ক্রমে আত্ম বিস্মৃত ও উহার সহিত লয়-প্রাপ্ত হইল। আত্ম-জ্ঞান-শূন্য অন্তরের এই বিস্মৃতি দশাই সুখের দশা; শব্দ যেমন বীণার সপ্তসুরে ক্রীড়া করিতেছে, অন্তরও তেমনি অপর বীণার ন্যায় প্রতি শব্দে তাহার সহিত সমক্রীড়া করিতেছে—সুন্দর ঐকতান! সুন্দর সুখ-লয়! তৎপরেই চেতন, সৌন্দর্য্য বা সুখ-বস্তু-বিচ্যুত অন্তর আত্ম গত; আত্ম-চৈতন্যে অন্তরের এই দশা, ঘোর বিকৃত বিশৃঙ্খল দুঃখের দশা। অন্তর আত্ম গত হইবা মাত্র সুখের অনুসন্ধানে ব্যাকুল। যে স্থলে যাহার অভাব সেই স্থলেই তাহার অনুসন্ধান; আত্মস্থলে আসিবা মাত্র অন্তর সকলি শূন্য দেখে, সে যেন কিছু চায়, যাহা সে চায় তাহার অভাবে তাহার জীব জল-বিচ্যুত মৎস্যের জীবের ন্যায় যন্ত্রণা-পীড়িত, উহা যেন উহার প্রাণ-প্রয়োজন। অন্তর যাহা চায়, উহা কি অন্তর তাহা জানে না, অন্তর তদ্বিষয়ে অন্ধ; তবে অন্তর আপাততঃ চাহে কি?—মুক্তি, আত্ম-চেতনার যন্ত্রণা হইতে মুক্তি; সেই মুক্তির উপায় কি, তাহা অন্তর জানে,—বিস্মৃতি। কিন্তু সেই বিস্মৃতি কোথায়, তাহাই তাহার অনুসন্ধান।

মানব অন্তরে একটি সম-তৌলতা ভাব বিদ্যমান আছে; উহার একদিকে জাগ্রতি, অপর দিকে বিস্মৃতি। জাগ্রতি ও বিস্মৃতি অন্তরের এই দুইটি ভাবকে পৃথক্ সংজ্ঞা দেওয়া হইলেও, উহারা একই প্রকৃতির, উভয়ই চিন্তা। বস্তুর সহিত অন্তরের নিত্য সম্বন্ধ; অন্তর নিত্যই বস্তু-আশ্রিত। অন্তর বস্তু-বিরহিত বিশুদ্ধ আত্ম চিন্তা করিতে অক্ষম, সুতরাং বিশুদ্ধ জাগ্রতি কাহাকে বলে তাহা আমরা জানি না। আবার ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর সহিত অন্তরের সম্বন্ধ জাত যে জ্ঞান, তাহার অতীত বিশুদ্ধ বস্তু যে কি তাহাও আমরা জানি না; সুতরাং বিশুদ্ধ বস্তু যে কি, তাহাও আমরা জানিতে অক্ষম। যাহা আমাদিগের চিন্তা বা জ্ঞান, তাহা বস্তুর সহিত অন্তরের সম্মিলন-জাত ভাব মাত্র; এই নিমিত্ত মানবীয় জ্ঞান সকলি একই-চিন্তা-ময়; তবে জাগ্রতি ও বিস্মৃতি অর্থে আমরা এখানে

* বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত।

এই বুঝাইতে চাই যে অন্তর ত নিত্য বস্তু-আশ্রিত, তবে সমতুলায় উহার আশ্রিত বস্তু যেখানে লঘু এবং চৈতন্যভাব প্রবল, আমরা সেই অবস্থাকে উহার জাগ্রতি অবস্থা কহিতেছি। আর যেখানে চৈতন্য-ভাবের লঘুত্ব বস্তুরও প্রাবল্য হইয়া দাঁড়ায় আমরা সেই অবস্থাকে অন্তরের বিস্মৃতি অবস্থা কহিতেছি, নচেৎ এক কালে বস্তু-বিরহিত চৈতন্যভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সাংখ্যকার বিশুদ্ধ চৈতন্য ও বিশুদ্ধ বস্তুকে ক্রমান্বয়ে পুরুষ এবং প্রকৃতি সংজ্ঞা দিয়াছেন, এবং ইহাদিগের সম্মিলনই জীবন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি দেহ এবং দেহের আশ্রিত আত্মার উল্লেখে ঐ কথা বলিয়াছেন, আমরা মন এবং মনের আশ্রিত বস্তুর উল্লেখে সেই কথাই বলিলাম। যেমন পুরুষ নিত্য প্রকৃতি-আশ্রিত, তেমনি অন্তরও নিত্য বস্তু-আশ্রিত। পুরুষ এবং প্রকৃতির সম্মিলন-ফল যেমন জীবন, অন্তর এবং বস্তুর সম্মিলন ফল তেমনি চিন্তা, এই চিন্তা ও জীবন একই কথা।

জাগ্রতি ও বিস্মৃতি অর্থে আমরা কি বুঝাইতে চাই তাহা বলিলাম। অন্তর অতি তরল পদার্থ, ক্ষুদ্রাশ্রয়ে উহা সদত টলমল করে ও ভ্রষ্ট হয়, ইহাই দুঃখ; আশ্রয়-বস্তু উহার ঠিক্ অনুরূপ হইলেও উহাকে উহা তিষ্ঠিতে পারে না, কারণ উহার গতি আছে; আশ্রয়-বস্তু যেখানে উহা অপেক্ষা প্রশস্ততর সেই খানেই উহা প্রকৃতিস্থ ও সুখী। অন্তর কোন সীমা-বদ্ধ আশ্রয়ে গতি রুদ্ধ হইয়া কূপবদ্ধ বারির ন্যায় ক্রমে মলিন, দূষিত হইয়া আত্ম প্রকৃতির নাশ করিতে থাকে; কিন্তু অন্তর যেখানে ব্যাপক আশ্রয়ে নিত্য গতি-শীল সেইখানেই উহা বিশুদ্ধ এবং ক্রীড়া-মত্ত! কিন্তু অন্তরের স্বাভাবিক গতি সৌন্দর্য্য-পথ বিনা অপর কোন পথে নাই; ঐ পথে উহা অক্লান্ত ক্রীড়ায় উন্মত্ত; যেহেতু ঐ পথে উহা আত্মবিস্মৃত। অন্তর আত্ম-চেতনায় পীড়িত হইলে এই বিস্মৃতির নিমিত্ত ব্যাকুল হয়; এই বিস্মৃতি কেবল সৌন্দর্য্য-পথে, অতএব ইহা বলিতে পারা যায় জীবের জীবনীই (vital element) সৌন্দর্য্য। আবার যাহাতে জীবের অন্তর আশ্রয়, গতি এবং মিলন বা লয় পাইতে পারে তাহাই সৌন্দর্য্য। মেঘমালা, মন্দাকিনী, নক্ষত্র, চন্দ্র পরিমণ্ডিত শরৎযামিনীর শোভায় নিশীথ-বিহারী যে ভাবুকের মন আত্ম-বিস্মৃত বা লয়-প্রাপ্ত ও দুঃখ-বিবর্জ্জিত, সেই ভাবুকই সুখী, এবং শরৎযামিনীর সেই বিচিত্র সাজই সৌন্দর্য্য। রমণীয় মনসিজ গুণের আধার ঐশিকভাবে বিজন-কানন-বাসী যোগ-মগ্ন যে যোগীর মন আত্ম-বিস্মৃত বা লয়-প্রাপ্ত ও দুঃখবিবর্জ্জিত, সেই যোগীই সুখী, এবং সেই মনসিজ-গুণাধার রমণীয় ঐশিক ভাবই সৌন্দর্য্য। জীবিত বা গত প্রণয়পাত্রের অনন্ত-মাধুরীময় মুখচ্ছবি দর্শনে বা ধ্যানে যে প্রেমিকের মন আত্ম-বিস্মৃত বা লয়-প্রাপ্ত ও দুঃখ-বিবর্জ্জিত, মনীষী

কোমৎ বা মিলের ন্যায় সেই প্রেমিকই সুখী, এবং সেই প্রণয়-পাত্রের মাধুরীময় মুখচ্ছবিই সৌন্দর্য্য। স্বদেশবাসী বা সমস্ত-পৃথিবীবাসী মানবমণ্ডলীর উৎকৃষ্ট সুখের বিশাল সুন্দরভাবে যাহার মন আত্ম-বিস্মৃত বা লয়-প্রাপ্ত ও দুঃখ-বিবর্জ্জিত, সেই দেশহিতৈষী বা নরহিতৈষীই সুখী; এবং মানবমণ্ডলীর সেই উৎকৃষ্ট মনসিজ সুখের জ্ঞানই সৌন্দর্য্য।

অন্তর এই সকল মহৎ সৌন্দর্য্যে ভাসিত হইলে তাহা ক্রমে আত্মত্ব-রহিত হইতে থাকে। যে পরিমাণে অন্তর সৌন্দর্য্যগত, সেই পরিমাণে উহার আত্ম-জ্ঞান ক্রমে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর; অবশেষে আত্মজ্ঞান রহিত হইয়া অন্তর সৌন্দর্য্যেই মিলিয়া যায়, ইহাই জীবনের চরম সুখ। স্বার্থের পূর্ণ মূলোচ্ছেদে জীবের সুখোদ্দেশ্যে পূর্ণ অধিকার! এই যোগ-সাধনের দুইটি মাত্র উপায় আছে, একটি সংসারকে অনন্ত সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করা, অপরটি অন্তরকে সৌন্দর্য্যের বিচিত্র গূঢ় এবং অনন্ত দূর পথে প্রবেশের উপায় শিক্ষা দেওয়া। কাব্য-কলা বা কল্পনা বুদ্ধি প্রথম উপায়টি সাধন করে, এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বুদ্ধি দ্বিতীয় উপায়টি সাধন করে। কল্পনা বুদ্ধি বা কাব্য কলার চরম লক্ষ্য এমন সৌন্দর্য্য সকল সৃষ্টি করা—যাহা অতল, অসীম, ও অনন্ত; অন্তর যেন একবার উহাতে নিমগ্ন হইলে আর উহার তল, সীমা ও অন্ত না পায়, চিরকালই যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া উহাতে নিমগ্ন থাকিতে পারে, বিস্মৃতি ভঙ্গে আত্ম-চেতনার যন্ত্রণা আর যেন তাহার উপস্থিত না হয়; কাব্য-কলার চরম লক্ষ্যই অসীম ও অনন্ত। যাহা কিছু সৌন্দর্য্য তাহাই কাব্য, আবার যাহাকিছু সর্ব্বাঙ্গীন ও পূর্ণ, তাহাই সৌন্দর্য্য; আবার যাহাকিছু সর্ব্বাঙ্গীন ও পূর্ণ তাহাই অনন্ত ও অসীম; এই নিমিত্ত কাব্য মাত্রই অনন্ত। ভিক্টর হিউগো কহিয়াছেন "Poetry cannot grow less, because it cannot grow greater." কাব্যের কখন হ্রাস হইতে পারে না, কারণ, কাব্য কখন বৃদ্ধি পাইতে পারেনা।

তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বুদ্ধির চরম লক্ষ্য এই অনন্ত কাব্যের গভীর অনন্ত পথে হৃদয়কে লইয়া গিয়া হৃদয়ের প্রত্যেক কবাট ভাঙ্গিয়া প্রতিপদে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-বিকশিত তরঙ্গমালা উহার অভ্যন্তরে পূরিয়া দেওয়া, সৌন্দর্য্যের সেই সিক্ত-কারী তরল রসে হৃদয়ের প্রতি অণুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উহার সহিত সম্পূর্ণ মিলিত ও একীভূত করা, অনন্ত সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে হৃদয়কে অনন্ত প্রসারিত করা, এবং কলুষিত ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়কে উজ্জ্বল অনন্ত ভাব প্রদান করা। ধন্য সেই আরাধ্য বুদ্ধি! ধন্য তাহার কার্য্য-ফল!

সেই কল্পনা-বুদ্ধি ব্যক্তিই কবি, সেই তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বুদ্ধি ব্যক্তিই সমালোচক। এই উভয় বুদ্ধিরই সীমা আছে, কিন্তু এই উভয় বুদ্ধির কার্য্য-ফলের সীমা নাই। কাব্য-কলার সীমা আছে, কিন্তু কাব্যের সীমা

নাই, কাব্য অনন্ত। যেমন সূর্য্যের সীমা আছে, সূর্য্যালোকের সীমা নাই; তেমনি কাব্য-কলার সীমা আছে, কিন্তু তদুৎপন্ন সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বুদ্ধি কাব্য-কলার রচিত পথ সকলেই গমন করিতে পারে, তাহা ছাড়াইয়া সৌন্দর্য্যের পথে উহার গতি নাই; সৌন্দর্য্যের পথে কেবল মাত্র হৃদয়ই যাইতে পারে। হৃদয়ের গতি অতিব্যাপ্ত; হৃদয় এবং সৌন্দর্য্য ইহারাই অনন্ত।

অস্থি নাড়ী, শিরা সকলের সংযোজন-কৌশলে যেমন দেহ ও দেহের লাবণ্য, তেমনি কাব্যকলার স্থূল এবং সূক্ষ্ম কৌশল সকলের সংযোজনে কাব্য ও কাব্যের সৌন্দর্য্য। সমালোচন-বুদ্ধি কাব্য-কলার এই সকল স্থূল এবং সূক্ষ্ম পথে বিচরণ করে এবং তথা হইতে হৃদয়কে দূরব্যাপ্ত সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্র দেখাইয়া দেয়, হৃদয় উহাতে ছুটিয়া পড়ে, এবং উহার সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়ায় মত্ত হয়।

বুদ্ধি এবং হৃদয় উভয়ে স্বতন্ত্র প্রকৃতির; বুদ্ধি সংযত এবং সূক্ষ্ম, হৃদয় তরল এবং প্রশস্ত; বুদ্ধি খঞ্জ, হৃদয় অন্ধ; উভয়ে উভয়ের অর্দ্ধাঙ্গ, উভয়ের মধ্যে একাত্মা সখিত্ব ভাব; কেহ কাহাকে ছাড়িয়া চলে না, চলিতে পারেও না। বুদ্ধি উচ্চ নীচ ও বিবিধ বক্র পথে ধীরগতি, হৃদয় সমক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-গতি। কোন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির বাহ্য সমক্ষেত্রে হৃদয় গিয়া আগে পতিত হয়, কিন্তু কাব্যকলার উচ্চনীচ বা বক্র কৌশল পথে উহার গতি রোধ হয়, বুদ্ধি তখন উহার অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইয়া উহাকে ঐ সকল পথে আরোহিত অবরোহিত বা প্রত্যাগত করিয়া দেয়, তখন উহা আবার যত টুকু সমক্ষেত্রে ধাবিত হইয়া থাকে। এইরূপে কোন কাব্য বা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির আদ্যন্ত অনন্ত পথে উভয়ে নেতা। যাঁহারা বিবেচনা করেন উভয়ের বুদ্ধির উন্নতি ও হৃদয়ের উন্নতি স্বতন্ত্র কথা, তাঁহারা ভ্রান্ত; বুদ্ধি ও হৃদয়ের একের উন্নতি অপরের উন্নতির অপরিহার্য্য কারণ। যেখানে হৃদয়ের আকর্ষণ নাই সেখানে বুদ্ধিও উত্থিত হয় না। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উজ্জ্বল বিভায় আগে মানবের অন্তর মুগ্ধ হইয়াছিল, পরে বুদ্ধি তাহা হইতে উত্থিত হইয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে পার্থিব সাগর, নদী, তরু, লতা পল্লবাদির বিবিধ শোভার আকর্ষণ হইতেই বিবিধ বিদ্যার উৎপত্তি। যে বস্তুর কোন গুণে অন্তর আকৃষ্ট হয়না, তাহার তত্ত্ব নিরূপণে বুদ্ধির স্বাভাবিক গতি হয় না, আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য উপভোগের আশা দেখাইয়া বল-পূর্ব্বক-বুদ্ধিকে ইহাতে নিযুক্ত করিতে হয়। এক্ষণে বোধ হয় বুঝা গিয়া থাকিবে হৃদয়ের ও বুদ্ধির শিক্ষা, একই শিক্ষা। যিনি কাব্য বা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পূর্ণ-উপভোগাভিলাষী, সমালোচন-বুদ্ধি তাঁহার শিক্ষক; আর যিনি জীবনের প্রকৃত যোগ-সাধন আত্ম-বিস্মৃতি শিক্ষা করিতে অভিলাষী, কল্পিত কাব্য তাঁহার শিক্ষক। এক্ষণে বুঝা গেল কাব্যের উদ্দেশ্য মান-

বীয় সারাংসার শিক্ষা। এক্ষণে বুঝা গেল কল্পনা-বুদ্ধি কবিই সকল শিক্ষার গুরু।

যিনি কবি তিনিই সমালোচক; যাঁহার সৃষ্টি-বুদ্ধি আছে, তাঁহার সৃষ্টির কৌশল-বুদ্ধি অবশ্যই আছে। এই নিমিত্ত কবিই পূর্ণ ব্যক্তি। কবির শিক্ষার উদ্দেশ্য কতদূর?—জনসাধারণকে মনসিজ পূর্ণ ভাব প্রদান করা। যিনি কবির রচিত কোন কাব্য-পথে বিচরণ সমাধা করেন, তাঁহার হৃদয় এবং বুদ্ধি কবির ন্যায় সমান হইয়া যায়। কবি সকলকেই কবি করিতে থাকেন। ধন্য তাঁহার কল্পিত কাব্য-কলা! ধন্য তাঁহার মহদাশয়! কবি জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সেক্সপিয়র, কালিদাস—ইঁহারা মনসিজ পুরুষ। জনসাধারণ ইঁহাদের অবস্থাপন্ন নহে। সাধারণ লোকে ইঁহাদিগের কাব্য-কলার কৌশল সকলে প্রবেশ করিতে পারে না, এই নিমিত্ত যাঁহারা উন্নত-বুদ্ধি, এবং উন্নত-হৃদয় তাঁহারাই কবির কৌশল-পথে সাধারণের নেতা হইয়া থাকেন; ইঁহারাই সাধারণ সমালোচক। সাধারণ অর্থে আমরা কেবল কবি হইতেই প্রভেদ করিলাম। যিনি কোন কবির প্রকৃত সমালোচক হইতে পারেন, তিনি সেই কবির কবিত্বের দ্বিতীয় মুখযন্ত্র স্বরূপ। সাধারণ সমালোচক-সকল কবির প্রতিনিধি, দ্বিতীয় কবি, তাঁহারাই সাধারণের শিক্ষক।

এই সকল সমালোচকেরা কবিকৃত-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কৌশল-পথে আমাদিগের নেতা, এবং সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্রের প্রদর্শক। কাব্যের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সমালোচকের ধৃষ্টতা মাত্র, উহাতে উহাঁর অধিকার নাই। যাহা কাব্য-কলার সুসম্পন্ন ফল তাহা বিচারের অধীন নহে। যাহা সৌন্দর্য্য তাহা অপার, তাহার গুণ-ব্যাখ্যা হইতে পারে না; আর যাহা খুঁত, তাহা অভাব পদার্থ, তাহার দোষ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। যাহা কাব্যের বস্তু কিন্তু কাব্যাকারে পরিণত হয় নাই, এমন অসম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যই সমালোচকের বিচারের শিক্ষা দেওয়ার বস্তু। অসম্পূর্ণ হইতে সম্পূর্ণ কতদূরবর্ত্তী তাহাই দেখাইয়া দেওয়া, সেই সকল ক্ষেত্রে কাব্য-কলার বিস্তারের চরম সীমা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দেওয়া, উৎফুল্ল প্রতিভা-কলিকার পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করা। এরূপ সমালোচক তুমি আমি নই, যিনি হৃদয়ে এবং বুদ্ধিতে বিশারদ তিনিই।

ইউরোপে প্রকৃত সমালোচনার জীবন-দাতা জর্ম্মনেরা; বঙ্গভাষায় প্রকৃত সমালোচনের জীবনদাতা বঙ্কিমবাবু। বঙ্গভাষায় দুই একটি প্রকৃত কবি দেখা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত সমালোচক এপর্য্যন্ত দেখা দেন নাই। এইটি বঙ্গদেশের অজ্ঞানতা ও অনুন্নতিরই পরিচয় দিতেছে। কবি সর্ব্বকালেই জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার শক্তি তত শিক্ষা-সম্ভূত নহে, কবি বিশেষ ব্যক্তি; কবি-সংখ্যানুসারে আমরা দেশের উন্নতি বা

অনুভূতি ধরিতে পারি না। যে দেশে যে পরিমাণ সমালোচন-বুদ্ধি, সে দেশ সেই পরিমাণে শিক্ষিত ও উন্নত; কারণ সমালোচন-বুদ্ধি শিক্ষার ফল। বঙ্গদেশের সাধারণ সমালোচনের আলোচনা যাহা কিছু বঙ্গদর্শনই সূত্রপাত করিয়াছে। বিবিধ সমালোচনের সমালোচনা গুলিই তাহার দৃষ্টান্ত।

উত্তর চরিতের সমালোচনে বঙ্কিমবাবুর অবলম্বিত উপায় উপযুক্ত সমালোচকের ন্যায় হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যাহা কিছু সুসম্পন্ন কাব-কলার ফল তাহা দোষ গুণ বিচারের অধীন নহে, ভবভূতির উত্তর চরিত কাব্যকলার চূড়ান্ত শক্তির ফল। উহা দোষ গুণ-বিচারের অধীন নহে। আমাদিগের সুবুদ্ধি, সমালোচক ইহার দোষ গুণ-বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল ইহার সৌন্দর্য্য-পথের নেতা হইয়াছেন মাত্র। চিত্র দর্শন নামক প্রথম অঙ্কে কবির কৌশল খেলা কি, তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন। সহজ-বুদ্ধি লোকে সহসা এই অনুমান করিতে পারেন, চিত্র দর্শন কাণ্ড লইয়া বুঝি ভবভূতি রাম সীতার পূর্ব্ববৃত্তান্তের পরিচয় দিতে বসিলেন; কিন্তু আমাদের সুবিজ্ঞ সমালোচক তৎ সম্বন্ধে কি বুঝাইয়াছেন, এবং কেমন সুন্দররূপে উহা বুঝাইয়াছেন, আমরা সেই ভাগটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

"এই চিত্র-দর্শন কবি-সুলভ কৌশলময়। ইহাতে চিত্র-দর্শনোপলক্ষে রাম সীতার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে কবি সংক্ষেপে পূর্ব্বঘটনা সকল বর্ণন করেন। রাম সীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ়, প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতা-নির্ব্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রী বিয়োগ নহে। স্ত্রী-বিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। * * * *" তৃতীয়াঙ্কে সেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্যোগে প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণয় সর্ব্ব-প্রফুল্লকর মধ্যাহ্ন সূর্য্য—সেই বিরহ-যন্ত্রণা ইহার ভাবী করাল কাদম্বিনী,—যদি এ মেঘের কালিমা অনুভব করিবে, তবে আগে এই সূর্য্যের প্রখরতা দেখ। যদি সেই অনন্ত বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখ-সাগরের ভীষণ স্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সুন্দর উপকূল—প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জ্বল, ফলপুষ্পপরিশোভিত বৃক্ষবাটিকা-পরিমণ্ডিত এই সর্ব্ব-সুখময় উপকূল দেখ। এই উপকূলস্থিতা সীতাকে রামচন্দ্র নিদ্রাবস্থায় ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকার-সাগরে ডুবাইলেন।"

বঙ্কিমবাবু এইরূপ প্রণালীতে আপূর্ব্ব গ্রন্থের সমালোচনা করেন নাই, কৌশল-খেলার তাৎপর্য্য বুঝান ছাড়িয়া দিয়া কেবল মাত্র সৌন্দর্য্য পথে আমাদিগকে বিচরণ করাইয়াছেন; যেখানে যাহা কিছু সৌন্দর্য্য তাহার অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন; কিন্তু তত্রাচ তাঁহার সমা-

লোচন অসম্পূর্ণ; কেন অসম্পূর্ণ তাহা তিনি আপনিই পরিশেষে স্বীকার করিয়াছেন। এক একটি করিয়া সৌন্দর্য্য দেখাইয়া বহু-সৌন্দর্য্য-সমাবেশোৎপন্ন মহৎ সৌন্দর্য্যের ভাব দেখান যায় না। সাধারণ পাঠকে একটি একটি করিয়া সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্মৃতিপটে সমস্ত-সৌন্দর্য্য-সন্নিবেশোৎপন্ন মহৎ সৌন্দর্য্যের ভাব মনে ধারণা করিতে পারে না, উহার মাধুর্য্য তাহাদিগকে একত্র সাজাইয়া দেখাইতে হয়। কাব্যের মূর্ত্তি ও দৃশ্য সকল লইয়া, কাব্যের পার্শ্বে তাহার প্রতিচিত্র চিত্রিত করিয়া দেখাইতে হয়; এই চিত্রন কালে সহজ-বুদ্ধি লোকেরা কবিকৃত কৌশলের পুনঃ-সন্নিবেশ প্রত্যক্ষ দেখিয়া উহার তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য শিখিয়া ও অনুভব করিয়া লয়। এবং তৎপরে পূর্ণ মূর্ত্তির ব্যাপক-সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া অভিভূত হয়। কাব্যের এরূপ প্রতিচিত্র না দেখাইলে তাহার উদ্দেশ্য মূল-সৌন্দর্য্যের কিছুই দেখান হয় না। বঙ্কিম বাবু এরূপ চিত্র প্রদর্শন করণে অপটু নহেন, কারণ তিনি নিজে সুন্দর কবি; তবে তাঁহার উহাতে প্রবৃত্ত না হওয়ার কারণ তিনি কহেন সমালোচনা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে; কিন্তু সে দীর্ঘতায় আমরা অসন্তুষ্ট হইতাম না। তিনি কাব্যের উপর মোটামুটি যে দুই চারিটি কথা বলিয়াছেন তাহা উক্ত কাব্যের প্রতিচিত্র অঙ্কিত করার রেথাকর্ষণ নয়, কাব্য-সাধারণের সার লক্ষণ সকলের বিচার মাত্র, ঐ সকল লক্ষণানুসারে ভবভূতিকে পৃথিবীর অপরাপর কবিগণের সহিত শ্রেণীবিশেষ-ভুক্ত করা মাত্র। উত্তর চরিতের সমালোচন বঙ্কিম বাবু কর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গীন সুসম্পন্ন না হইলেও তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা বঙ্গ-ভাষায় অতুল্য। উহার আদ্যন্ত পাঠে যে কোন ব্যক্তির কাব্যানুরাগ পরিবর্দ্ধিত ও সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী শক্তির উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

বিবিধ সমালোচনের প্রবন্ধ গুলির মধ্যে গীতিকাব্য, এবং প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত নামক দুইটি প্রবন্ধে কাব্যের সার ও বিবিধ মূল-তত্ত্ববিচার দেখান হইয়াছে। এই বিচারগুলি গভীর-চিন্তা-প্রসূত এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির ফল। ইহাতে অসার ও অলীক কাব্যরসতরঙ্গে তাড়িত বঙ্গীয় যুবকগণের মনকে কাব্যের মহতী ও গম্ভীর মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করাইতে পারিবে।

বিদ্যাপতি ও জয়দেব নামক প্রবন্ধে—নিয়মের ফলে, কালের গতিতে, মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে, কাব্যের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্ত অতিসুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তটি নূতন না হইলেও, বঙ্কিম বাবু ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের গতি—কালের গতি ক্রমে যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহা উল্লেখ করিয়া ইহাকে যেন একটা নূতন আকার প্রদান করিয়াছেন।

আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প নামক প্রবন্ধটির মুখবন্ধ ভাগ কিছু অপরিস্ফুট, আমরা

উহার সহিত সম্পূর্ণ এক-মত হইতে পারি নাই। সুখদায়ী বস্তু হইতে সৌন্দর্য্য পৃথক্ ইহা আমাদের বোধ হয় না। যাহাতে সুখ পাওয়া যায় তাহাই সুন্দর, তুমি ধ্যানে সুখ পাও, ধ্যানের বস্তু অবশ্যই তোমার পক্ষে সুন্দর; আমি ভোজনে সুখ পাই ভোজ্য দ্রব্যের রস আমার পক্ষে সুন্দর; কেহ ভোগে সুখ পায়, উপভোগের বস্তু তাহার কাছে সুন্দর। তৎপরিবর্ত্তে কেবল কতক গুলি উজ্জ্বল ভাবকেই সৌন্দর্য্য বোধ করিয়া সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে গেলে বিবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাহাহউক তদ্বিষয়ে আমাদিগের অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

কৃষ্ণ চরিত্রে বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধের তাৎপর্য্য ভাগ পুনর্ব্বার অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

বঙ্কিম বাবু দ্রৌপদী-চরিত্রের বীর সৌন্দর্য্য-ভাব, বর্ত্তমানকালের প্রচলিত কোমলতা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি স্ত্রীগুণের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করায় অতি অপক্ষপাতদর্শন, [illegible]শী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। আমাদিগের বিশ্বাস বঙ্কিম বাবু সুকবি, ও সুন্দর বুদ্ধি সমালোচক বলিয়া বঙ্গ সাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবেন। পরিশেষে আমাদিগের এই বক্তব্য যাঁহারা কাব্যানুশীলন ও কাব্যের রসাস্বাদন করিতে অভিলাষী, তাঁহারা বঙ্কিম বাবুর এই সমালোচনা গুলি বিশেষরূপে পুনঃপুনঃ আলোচনা করুন, তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহাদের কিয়ৎ-পরিমাণেও কাব্যবুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীরামঃ—

মেহের আলি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অরণ্য-মধ্যে রজনীতে একটী ক্ষুদ্র পর্ণাচ্ছাদিত সামান্য কুটীরে একটী রমণী বসিয়া ভাবিতেছেন। মধ্য স্থলে বসিয়া আছেন, নতুবা চালের জঙ্গল তাঁহার মাথায় লাগিত। রমণী একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন এবং নির্জ্জন ব'লে তাহা দ্বারাও যথোচিত শরীর আবৃত করেন নাই। বস্ত্র খানি মলিন চীর মাত্র; কিন্তু কোন উত্তম বস্ত্রের অবশেষ বিলক্ষণ জানা যায়। এক ধারে একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করিতেছে। তাহাতে রমণীর মলাচ্ছাদিত গৌরবর্ণ ঈষৎ আভা প্রকাশ করিতেছে দেখা যায়। বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য হেতু রমণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শোচনীয় অস্থিসার অবস্থা বিলক্ষণ প্রকাশমান। বদনের আকার ব্যতীত বয়সের পরিচয় আর কোথাও হইতে পাওয়া ভার। তাহাতেও প্রকৃত বয়স জানা ভার।

অন্নাহারাভাব জন্য শীর্ণ দেহে, তৈল-বিহীন মলিনীভূত গৌরবর্ণে ও বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধো-লঙ্গ শরীরে, সহসা ভূতযোনি বলিয়াও বোধ হইতে পারে; আবজানি দেখিলে অনায়াসে ভূতের গৃহিণী বোধে পলায়ন করিত।

আমীরজান কুটীর-দ্বারে উঁকি মারিয়া দেখিলেন; দেখিয়া অবাক্ হইলেন। নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে আমীর-জান চিনিলেন ও স্বীয় অঞ্চলে অশ্রুধারা মোচন করিতে করিতে মুখ ফিরাইলেন। পরে কম্পিত গদগদ স্বরে বলিলেন "কে ও মেহেরন্নিসা না কি? এমন দশা কেন?" মেহেরন্নিসা শব্দাকর্ণনে অপেক্ষিত প্রাণ-সখী আমীরজান আসিয়াছেন বুঝিয়া কুটীর হইতে বাহির হইলেন এবং আমীরজানের হাত ধরিয়া এক বৃক্ষতলে বসিলেন। উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কিয়ৎকাল নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। উহাতে তাঁহাদের পরস্পর পরিচয় এবং পরস্পরের পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। চতুর্দ্দিকে অন্ধকারময় ঘোর অরণ্য। উভয় রমণী এমনি পরস্পর আলিঙ্গনে ও মিলনে হতজ্ঞান, যে তৎকালে যদি এক ব্যাঘ্র সম্মুখে আসিয়া আক্রমণ করিত কিম্বা ধরিত তাহাও হয়ত তাঁহারা জানিতে পারিতেন না। অনেকক্ষণের পর আমীর-জান বাক্য স্ফুরণ করিলেন ও কহিলেন;

"একি বন্, এ দশা কেন? এ বনেই বা কেন? আর কি দোষেই বা এ হত-ভাগিনী সখী হইতে এতদিন গোপন ছিলে? বল বল বন্ সব কথা বল আমার বুকটা ধড়ফড় করিতেছে।"

তখন অতি ক্ষীণস্বরে মেহেরন্নিসা কহিলেন, "ভাই, এ বনে যদি আহার-যোগ্য ফল পাইতাম গ্রাম অপেক্ষা এ সুন্দর নিরাপদ স্থল। পুরুষের যন্ত্রণায় পৃথিবী ছাড়িতে সাধ যায়; ইচ্ছা হয় আর মানুষের মুখ না দেখি।"

আমীরজান স্বভাব-সুলভ চাপল্য সহ কহিলেন "সেই পোড়া পুরুষের জন্যই তোমার এত দুঃখ।"

মেহের। সত্য বলেছ, যার যে মনের পুরুষ সে ছাড়া অন্য গুল জ্বালাতন করে কেন? আমরা ত অন্য কাহাকে বিরক্ত করিতে যাই না?

আমীর। ঐত মজা, আমরা বিরক্ত হতেই জন্মেছি। যাহা হউক তোমার গল্পটা বল। এ বনেই বা কতদিন এলে ও কেন এলে?

মেহের। দুই দিন বনে এসেছি; একটা রাখাল বালক দিয়া এই কুটীর ক'রে লয়েছি।

আমীর। আহার?

মেহের। কলা জল-পানীয় কিছু ক্রয় করিয়া আনাইয়া খাইরাছি।

আমীরজান অমনি স্মরণ হইলে এই ভাবে আপনার পুঁটুলী আনিলেন ও তাহার একাধার হইতে রন্ধন করা কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য মেহেরকে খাইতে অনুরোধ করিলেন। মেহের আহার করিয়া কুটীর

হইতে জলানয়ন পূর্ব্বক পান করিলেন এবং আমীরজান আঁচল হইতে একটী পান দিলেন। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মেহেরন্নিসা আপন গল্প সখীকে বলিতে লাগিলেন।

যে রজনীতে মেহের আমীরজানের বাটী ত্যাগ করেন ও যে ঘটনা জন্য ত্যাগ করেন, সেই রজনীর ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক মেহেরন্নিসা বর্ণন করিলে আমীরজান বুঝাইলেন তিনি নিদ্রিত ছিলেন নচেৎ প্রাণ থাকিতে ঐ ব্যাপার ঘটিত না। মেহেরও কহিলেন তিনি প্রথম প্রথম মনে করেছিলেন সখী স্বামীর উত্তেজনায় অবসন্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন সখীর ভাব হৃদয়ে উদয় হয় তখন সে সন্দেহ থাকে না। তথাপি কেন আর সখীকে যন্ত্রণা দিবেন ভেবে যতদিন পারিয়াছিলেন সংবাদ দেন নাই এখন আর থাকিতে পারিলেন না।

আমীরজান কহিলেন "তবু ভাল এত দিনের পর হতভাগিনীকে মনে পড়েছে, এও সুখ। এখন কোথা ছিলে বল।" মেহের কহিলেন, "ভাই বৃষ্টির ও তমসাময় রজনীর সাহায্যে আমি এক বাঁশবনে লুকাইলাম। প্রাতে কোথা যাইব জানি না। এমন সময় এক প্রাচীনা দৃষ্টিগোচর হইলে আমি তাঁহার পদানত হইয়া কাঁদিলাম। বলিলাম আমি সদ্য বিধবা হইয়াছি; আমার ভাসুর আমাকে বিষয় লোভে বিবাহ করিতে চাহেন, তিনি অসচ্চরিত্র, আমি আর বিবাহ করিব না বিষয়ও চাহি না। ভয়ে পলায়ন করে এসেছি আশ্রয় পেলে বাঁচি। বৃদ্ধা আপন বাটীতে লয়ে গেলেন এবং তাঁহার এক মাত্র কন্যা আমার সখী হইলেন। কএক মাস তথায় সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন হইল। পুরুষের সংস্রব সে বাটীতে ছিল না।"

আমীর। সে বাটী ছাড়িলে কেন?

মেহের। কিয়ৎকাল পরে সেই বৃদ্ধার জামাতা বিদেশ হইতে ঘরে আসিল। বৃদ্ধা ও তৎকন্যা ঐ জামাতার বিদ্যা ধর্ম্ম ও সচ্চরিত্রের প্রভৃত প্রশংসা করিলেন। আমিও দেখিলাম যুবাটী সহৃদয় ও ভদ্র বটে। আমার কথায় যুবা অনেক অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন। যুবার মতে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বিদ্যালোচনা এবং ধর্ম্ম-চর্চ্চা একান্ত প্রয়োজনীয় যুবা আপন বন্ধুর সহিত স্বীয় স্ত্রীর আলাপ করাইলেন। আমার সহিত আলাপ করিবার তাঁহার নিতান্ত বাঞ্ছা। যুবার সরলতা দৃষ্টে এবং বিদেশ হইতে যদি এই ব্যক্তি দ্বারা জীবিতেশ্বরের বার্ত্তা পাই এই আশায় আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সম্মত হইলাম। আলাপেও যুবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মিল।

আমীর। পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা বড় ভাল কথা নহে, তার পর।

মেহের। বলেছ ভাল, সে শ্রদ্ধার উচিত ফল পাইয়াছি। একদা প্রথম রজনীতে আমার সখী ও আমি সখীর শয্যায় শয়িত হইলাম। আমি তথায়

নিদ্রা যাইলাম; কিন্তু তাঁহার বলে রাখি সখী যেন আমাকে তাঁহার স্বামী এলে উঠাইয়া দেন। সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখি শয্যায় সখী নাই এবং তাঁহার স্বামী আমার পার্শ্বে বসিয়া আছে। যেমন ধড়ফড়িয়া উঠিতে যাব, যুবা হাত ধরিয়া থামাইল ও কহিল ভয় কি, আমি তোমার বন্ধু, তোমার অহিতাশঙ্কা কি? সে আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া আমি সখীর নাম করিয়া ডাকিলাম। উত্তর নাই—অথচ গৃহ-পার্শ্বে চুড়ীর শব্দে সখির আবির্ভাব ও গোপন জানিলাম। তখন বুঝিলাম, স্ত্রী পুরুষের ষড়যন্ত্র। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া শয্যা হইতে উঠিলে যুবা বলপূর্ব্বক হাত ধরিয়া বসাইল। মুখমধুর বাক্যে তুষ্ট করিতে লাগিল; "সুন্দরী তুমি বিধবা অসহায়া, তোমারি রক্ষার জন্য আমি তোমাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছি এবং ইহাতে আমার সরলা স্ত্রীরও অভিমত আছে।" আমি হাত ছাড়াইয়া কহিলাম "বিবাহ কি গোপনে হয়, না বলে হয়?" যুবা কহিল 'না না, বল কি? গোপন কি?"—আজ যদি তোমার হৃদয় পাই কাল প্রকাশ্যে বিবাহ করিব; আর স্ত্রীলোকের উপর একটু কৃত্রিম বল প্রকাশ না করিলেও লজ্জা ভাঙ্গে না।"

"আমি দেখিলাম সমূহ বিপদ্, কিন্তু জানি যুবা একপ্রকার নির্ব্বোধ চাটুকার বংশ। আমি তখন—সাচ্ছন্দ হইয়া বসিয়া বলিলাম—"তবে তোমাকে ভয় করিতে হইবে না, তুমি আমার ধর্ম্মনাশ করিতে এস নাই। হবেইত তুমি এমন বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক। আমার অপরাধ হইয়াছে স্ত্রী-সুলভ সন্দেহে তোমার উপর কলঙ্কপাত করিতেছিলাম।"

যুবা কহিল, "সত্যইত, তুমি সুবোধ, আমি যে তোমার উপযুক্ত পাত্র ও তোমার হৃদয় পাইবার অধিকারী তাহা বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। আর নির্ব্বোধেরাই বল প্রকাশ করিতে যায়।

আমি কহিলাম, "সুন্দর পুরুষ, জানিয়াছি, তুমি আমার বন্ধু তোমাকে বিবাহ করিতে আমার কোন আপত্তি নাই; তবে কি না আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে যে আমি পুস্তকে এক সমস্যা পড়িয়াছি, এবং প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি উহা প্রকৃত ঘটনা। সেই সমস্যার বিবরণ যে বলিতে পারিবে আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

যুবা কহিল—"সমস্যা কি?"

আমি অনেক দিন হইতে এক শ্লোক করে রেখেছিলাম, বলিলাম,

"নবীন সন্ন্যাসী এক বসি বৃক্ষোপরি।
কাঠকুড়ানীরে করে রাজরাজেশ্বরী॥
হৃদে প্রেম থাকে ছাড়ি অসাধ্য সাধন।
পথ চেয়ে আছে তারে করহ বরণ॥"

যুবা কহিল। "একি? কোথায় ইহার অর্থ জানা যাইবে বল?"

আমি কহিলাম, রেঙ্গুণে যে চট্টগ্রামীয়েরা আছে ইহার বিবরণ তাহার মধ্যে

কেহ না কেহ জানে শুনেছি। অন্নায়াসে তাহা লব্ধ হইতে পারে।

যুবা কহিল "আচ্ছা ইহাতে তোমার লাভ কি?" আমি কহিলাম, "সব আপনাকে বলিব? ইহার গূঢ় অর্থ আছে। যে আমার জন্য বিদেশে একটা সন্ধানে বেড়াইবে ও সফল হইবে, অবশ্য তাহার প্রণয় গাঢ়।"

যুবা কহিল "হাঁ বটে। আচ্ছা আমি কল্যই রেঙ্গুনে যাইব।"

এইরূপে সহজে দুষ্ট যুবার হাত এড়াইলাম। কোথা যাই ভাবিয়া কিছুদিন সেই বাটীতেই রহিলাম যতদিন যুবা বিদেশে থাকে। কিয়ৎকাল নির্ব্বিঘ্নে রহিলাম।

আমীরজান। আবার কি সে মিন্‌সেটা এল? বাড়ী ছাড়িলে কেন?

মেহের। সেই আমার সখী, নাম করিম বিবি, স্বামীর আদেশমত স্বামীবন্ধু একযুবার পাঠনায় নিযুক্ত হইল। একদা দেখিলাম যুবা ও করিম এমত ভাবে বসিয়াছে এবং চুম্বনাদি কার্য্যে এরূপ লিপ্ত আছে যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ অসম্ভব। বৃদ্ধাকে কহিলাম, বৃদ্ধা কহিলেন "ছেলে মানুষ উহারা আমোদ করে তাহাতে দোষ কি?" বৃদ্ধা ও তাঁহার কন্যার আবরণ দেখে সংসারে হত শ্রদ্ধা করিয়া সেই সুখের কাঠকুড়ানী অবস্থা মনে ভাবিয়া এই বনে এসে পড়িলাম।

আমীরজান কহিল, "তোমার তিতিক্ষা হতে পারে কিন্তু ভাই এখন এ যৌবনকালে বনে অসহায়া থাকাও নিরাপদ নহে।"

মেহের। কেন আহারের উপায় হইলে ভয় কি?

আমীর। আমি থাকিতে সে উপায়ের ভাবনা নাই। তবে যদি তোমার সন্ধান পেয়ে দুষ্ট লোক আসে।

মেহের। আর কিছু উপায় আছে?

আমীর। আমার এক বুড় দাদা আছেন তাঁহার কেহ নাই—তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে গোপনে নিরাপদে থাকিবে।

মেহের। না ভাই, আর সাহস হয় না, বনে থেকে দেখি। মরিলে হয় কিন্তু ক্রমে ক্রমে তুমি থামাইলে, আর সেদিকে সাহস হয় না।

আমীর। "আচ্ছা বনের সাধ মিটুক চল্ ভাই, একবার তোর কুঁড়ে দেখি।" কুটীর-মধ্যে কষ্টে উভয়ের সমাবেশ হইল। দীপালোকে আমীরজানকে দেখিয়া মেহের আশ্চর্য্য হইলেন ও কহিলেন "সেকি বন্! তোমায় চেনা ভার, এদশা কেন?" তখন আমীরজান স্বীয় পতির ব্যবহার বর্ণন করিয়া, কহিলেন, "পুরুষ কি লোক, বিবাহ কি সুখ, তা কি জান নাই তাই আশ্চর্য্য হইতেছ। আমিও নূতন দুর্দ্দশায় পড়েছি তাই এমন; এরপর সহে যাবে ও যেমন তেমনি হইব।"

আমীরজান সখীর সহায়ার্থ এক বৃদ্ধ ফকীরকে অর্থদ্বারা বস করিয়া মেহেরের রক্ষক করিয়া দিলেন এবং সতত তাঁহাদের আহারীয় পাঠাইতে লাগিলেন। এক রাখাল

বালক দ্বারা সর্ব্বদা সংবাদ লইতে লাগিলেন। একদা ঐ বালক কহিল "বাকরআলি জনকএক লোকদ্বারা বৃদ্ধকে বাঁধিয়া রাখিয়া মেহেরকে বনের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে সন্ধ্যার পর বাকরআলি স্বয়ং আসিয়া রমণীর ধর্ম্মনাশ করিবে।"

তৎকালে ফজরআলি ও মোক্তার উভয়ে বিদেশে। বাকর আলি দেশের কর্ত্তা, তাহার প্রভূত ক্ষমতা। আমীরজান আবজানি দ্বারা বাকরকে অনুনয় করিয়া পাঠাইলেন, সে কহিল ও সব কথায় ভদ্রঘরের মেয়ের কাজ নাই। আমীরজান মনে করিলেন, বাকর তাঁহার নিজকথায় ভয় করিবে; অতএব সন্ধ্যার পর আবজানি সহ বনে গিয়া দেখিলেন, মেহেরন্নিসা নিজবস্ত্রে এক বৃক্ষে বাঁধা আছেন এবং চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত আছে। সম্মুখে আলোক জন্য অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। আমীরজান অর্থদ্বারা প্রহরীদের বশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন এমত সময় বাকর উপস্থিত। বাকরকে দেখিয়া আমীরজান ভৎসনা করিয়া কহিলেন, "বাকুরে! তোর আক্কেল কি? আমার স্বামীর পত্নীর প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েছিস্ জানিস্ না বাবা এলে আজ্ তোর কি দশা করিতাম।"

বাকুরে ভয় পাইবার লোক নহে—মান্য করিবার লোকও নহে, তবে নিজের বিপদ করিতেও চাহেনা। সে ভাবিল কুলবধূ আমীরজান বনে এসেছে একথা সে বলিতে পারিবেনা এবং এখন যাহা কর তাহা ফজর ও মোক্তারের গোচর হইবেক না, ভয় কি? বাকুর কহিল; "তুই কেরে ছুঁড়ি, মোক্তারের মেয়ে বলে পরিচয় দিতেছিস্, মোক্তারের মেয়ে কি বনে আসে? ও ছুঁড়ীকেও বাঁধ, জুটো জুটলো, ভাল হল।" আমীরজান বৃথা তিরস্কার গর্জ্জন করিয়া পলায়নোন্মুখী হইলে, বাকরআলি স্বয়ং তাঁহাকে ধরিয়া বিবস্ত্র করিয়া বৃক্ষে বাঁধিল। আবজানি কাঁদিতে কাঁদিতে ঝরঝর্যা বটতলাভিমুখে দৌড়িল।

তৎকালে দুই তিন দিন হইল বটতলা বাগানে এক দল মগ তাঁবু পাটাইয়াছিল। ক্রন্দনের কারণ শুনে আবজানি সহ মগেরা বন্দী রমণীদের কাছে গেল এবং আততায়ীরা পলায়ন করায় বন্দীদের উদ্ধার করিয়া মগেরা তাঁবুতে এল। পরে পরিচয় লইয়া লোক সহ আমীরজানকে স্বভবনে পাঠাইল, কিন্তু মেহেরন্নিসাকে সমভিব্যাহারে রামগড়াভিমুখে লইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জগন্নাথ পুরীর দক্ষিণাংশে চিলকা নামক এক বিস্তীর্ণ সরোবর আছে। তাহা একটী বালুচরে সমুদ্র হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। সমুদ্রের সহিত যোগে এই সরোবরের উপকূলে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দর আছে। বড় বড় জাহাজ মুখ দিয়া প্রবেশ করিতে পার না; তাহাতে এ সকল বন্দরে অর্ণবপোত আসে না।

ঐ চিলকার দক্ষিণে গঞ্জাম বন্দর। জগন্নাথ-পুরীর দক্ষিণে এইটীই প্রধান বন্দর বলিতে হয়। বন্দরের নগরটী অতি সামান্য। খড়ো দোকান ঘরই অধিক। একটী ক্ষুদ্র নদী এই স্থলে অম্বোপসাগরে মিশ্রিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা দূরদেশাভ্যন্তরের পণ্য দ্রব্য সকল সাগরকূলে নীত হয়। মাজী মাল্লা চড়নদারগণের জন্য গঞ্জামে দুই একটী চটী আছে। এ সকল স্থলে বারনারীদেরও বড় ভিড়। জাহাজের মাল্লা ও নৌকার মাল্লারা তাহাদেরই লয়ে আমোদ প্রমোদ করে ও রাত্রি কাটায়।

দোকান ঘরের শ্রেণীর পশ্চাৎ ও বারনারীদের দোকানের সম্মুখে অপেক্ষাকৃত একটী প্রশস্থস্থলে, বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছে। দর্শক-মধ্যে বারনারী, মাজীমাল্লা ও দোকানদারই অধিক। "কুমুর" নামক অতি অশ্লীল স্ত্রী-যাত্রা যে বাঙ্গালার দক্ষিণ দেশে প্রচলিত আছে, তদনুরূপ উড়িয়া স্ত্রী-যাত্রা হইতেছে। অন্ধকার রজনী; মশাল জ্বালিয়া নৃত্যগীত হইতেছে। মণ্ডলীর কিঞ্চিৎ দূরে একটী গৃহের পশ্চাতে দুইটী ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছে?

১ম ব্যক্তি। সত্য জান, ধ'রে বন-বাড়ীতে আটক করেছে? এইবারে মারিবে। আহা! লোকটী বড় ভাল ও নবীন বয়স। তবে শত্রুর হাতে কি দয়া আছে।

২য় ব্যক্তি। দয়া!—অমন দজ্জাল খড়িগাজের উপর দয়া করিলে আর সংসারে টেঁকা দায়। বল কি? শঙ্করসিং তার ভয়ে বনবাস আছে। আর আমাদের কর্ত্তা এই বুড় বয়সে অস্থিচর্ম্ম সার,—কেবল তারই জন্য। ছোঁড়াটাকে তিনি পুত্রবৎ ভাল বাসিতেন, ছোঁড়াটা এখন তার প্রাণ লয়ে টানাটানি কর্‌ছে! একে ছোঁড়া একাই সিংহ-অবতার, আবার বেন্‌কাটা চারিলু তাহার সহায়। মেহের আলি ও বেন্‌কাটা যাঁর শত্রু, তাঁর নিমেষার্দ্ধ বিশ্রাম নাই।

১ম। মেহের আলিকে লয়ে গেল কেমন করে? তারত মাজিমাল্লা সহায় অনেক।

২য়। ভাই! হাজার হোক বুড় হাড়। মোক্তার সাহেব দুষ্টচর দ্বারা মেহেরকে সংবাদ দেওয়ান যে শঙ্করসিং বনবাড়ীর নিকটে আছে। ঐ গুপ্তচর প্রত্যয়ার্থ মেহের আলিকে তথায় ল'য়ে যায়। একটী বনবাসী বুড়াকে এমনি গ'ড়ে রেখেছিল, যে উহারা যাইবা মাত্র সে কহিল, লোকজন অনেক দেখে শঙ্করসিং নামক যে ব্যক্তি এই বন-বাড়ীতে ছিল, এই পলাইল। অনেক অনুসন্ধানে পাওয়া গেলনা। গুপ্তচর বলিল "আপনি গোপনে আমার সহিত রজনীতে আসিবেন ধরাইয়া দিব ও পুরস্কার লইব।" সেই বিশ্বাসে মেহের-আলি গেল ও এক ঘরে যেমন প্রবেশ করেছে—অমনই গুপ্তচর বহির্দ্বার বন্ধ করিল।

১ম। তার পর, মেহের আছে না মরেছে?

২য়। অদ্য রাত্রিতে মোক্তার দলবল সহ গিয়া মারিবে। মেহের আজ পাঁচদিন অনাহার আবদ্ধ আছে। বাছাধন!—

(কিঞ্চিৎ শিহরিয়া সহসা স্থগিত হইল ও কহিল)—"রও, কে যেন নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে না?

১ম। কে? কেহ নহে স্থানটা খারাপ্‌ সরে চল; সাপ থাকিতে পারে।

কিঞ্চিৎ ফাঁকে আসিয়া পুনশ্চ কথোপকথন আরম্ভ হইল।

১ম। আচ্ছা, মেহেরত চারিলুর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করেনা; একথা তাহাকে বলে নাই কি?

২য়। গুপ্তচর কৌশল করে অতি-তাড়াতাড়ি করিল এবং কাহাকেও প্রকাশ করিলে, টের পাবে এবং পলাইবে বলে জানাতে দেয় নাই। নয়ত;—রহ, কার পায় শব্দ?

১ম। ভিড়ের লোক কে কোথায় যাইতেছে।

২য়। না না, যেন দুইজন লোক আমাদের কথা শুনিতেছিল।

বলিতে বলিতে শুভ্রবেশী একজন ত্রস্ত ভাবে চলে গেল, আলোকের আভায় দেখাগেল। কথোপকথন করিয়া অনুসরণ করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তে ছুরিকা ছিল, শপথ করিল পাইলে গোপন-শ্রোতা গণকে জীবিত রাখিবেনা, রহস্য ভেদ না হয় এই ইচ্ছা। ভিড়ের মধ্যে একটু বহির্ভাগে একজন শুভ্রবেশী দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি সহসা তাহার উদরে ছুরিকা আঘাত করিল সে চীৎকার করিল। কে খুন করিল বলে যাত্রা ভেঙ্গে গেল ও খুনের কাছে ভিড় হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি পলাইয়াছে, প্রথম ব্যক্তি দাঁড়াইয়া দেখিল। শুভ্র-বেশী পুরুষ আর কেহ নহে, সেই গুপ্তচর, যে মোক্তারের পরম বন্ধু। মোক্তারের জাহাজের লোক তাহাকে ধরে জাহাজে লইয়া গেল এবং আঘাতকারী পর্য্যন্ত তাহার শুশ্রূষা করিল। অল্পক্ষণেই পুলিস এসে খুনী ব্যক্তিকে, ও যাহারা ধরে আনে, স্বাক্ষী বলে, তাহাদের লয়ে গেল। গুপ্তচর মরিবে, ডাক্তার কহিল, আঘাত সাংঘাতিক। পুলিসের গোলোযোগে সে রাত্রি ও পরদিন মোক্তার ও দলবল বনবাড়ীতে চির-শত্রু মেহের আলিকে মারিতে যাইতে পারিল না। গুপ্তচর মনোহর বস্ত্রে মণ্ডিত হয়ে আহ্লাদে যাত্রা শুনিতে গিয়া আপন দলের হাতে বিপদে পড়িল। পাপের শাস্তি।

পরদিন বৈকালে নিকটবর্ত্তী নদী দিয়া এক ক্ষুদ্র নৌকায় তিনটী আরোহী যাইতেছিল। দুইটী মাঝি প্রাণপণে দাঁড় টানিতেছে ও গান করিতেছে। আরোহী একজন, ছইএর বাহিরে তামাকু সাজিতেছে। আর দুইজন চুপি চুপি কথা কহিতেছে। একজন ভদ্রবেশী, একজন ইতর।

ভদ্র। তুমি কেমন করে জানিতে পারিলে ও সন্ধান পাইলে?

ইতর। মহাশয়! আমি যাত্রা শুনিতে-

ছিলাম, প্রস্রাবের জন্য ঘরের কানাচে যাই। তথায় কাহারা ফুস্ ফুস্ করিতেছে শুনিলাম এবং আপনার ও মেহেরের নাম করিতেছে শুনে আপনাকে সংবাদ দিলাম।

ভদ্র। ভাগ্য! ঐ দিন দোকানে গিয়াছিলাম তাই বন্ধুর বিপৎ-রহস্য সময়ে জ্ঞাত হইলাম। ভাগ্য! আমাকে না পেয়ে, গুপ্তচরকে দুষ্ট আঘাত করেছিল তাই আজ বন্ধুর সাহায্যে যাইতেছি। ভাগ্য! পুলিসের গোলোযোগে মোক্তার আবদ্ধ ছিল, তাই এখনও বন্ধু জীবিত আছেন। এখন বন্ধুকে মুক্ত করিতে পারিলে হয়!

ইতর। আর ভয় নাই, মোক্তার বোধ হয় এখন আসিতে পারে নাই।

ভদ্র। যদি এসে থাকে, এবং দলবল আনে কি করে কার্য্য সিদ্ধ হইবে?

ইতর। আপনি একা সহস্র লোক; হরিদাসও কম নয়! এবং ক্ষুদ্র মুদ্র আমিও বড় কম নহি। তিন জনে যদি ৩০ জনের মওড়া না লইতে পারি, মাএর দুধ খেয়েছি কেন?

হরিদাস তামাকু সাজিতেছিল, তাল ঠুকে বলিল হাজার লোককে পারি।

নদীর ঘাটের দশ ক্রোশ উপরিভাগে পাহাড়ের অঞ্চলে একটী কুটীর আছে। এক সন্ন্যাসী তথায় থাকিত। সময়ে সময়ে গ্রামবাসীরা বন-ভোজনে গিয়া তথায় আশ্রয় লইত। এজন্য ঐ কুটীরের নাম বনবাড়ী। বহুদিবস তথায় আর লোক জনের গতায়াত নাই। বনবাড়ী পরিত্যক্ত ও অরণ্য-বেষ্টিত হইয়াছে। রাখালেরা তাহা মেরামত করিত ও সময়ে সময়ে তাহাতে বিশ্রাম লইত। অধুনা শঙ্কর সিংহকে, মেহেরের ও চারিলুর আক্রোশ হইতে রক্ষার জন্য তথায় লুক্কায়িত করে রেখেছিল। যে অবধি মেহের ধৃত হয়েছেন, শঙ্কর গগ্রামে গিয়াছিল। "বনবাড়ী" নাম প্রসিদ্ধ, কিন্তু দেখিতে অতি সামান্য কুটীর মাত্র।

কুটীরের অভ্যন্তরে মেহেরআলি মৃতবৎ পড়িয়া আছে। ৫ দিন জল ও ফল বিনা কোন আহার পান নাই; অনাহারে অচেতন প্রায় রহিয়াছেন। তাহাতে আবার বন্ধন দশা। পার্শ্বে আসগরআলি মোক্তার, ফজরআলি, শঙ্কর সিং ও আরও জন কএক লোক পরামর্শ করিতেছে। মেহেরকে তিরস্কার গালি ত যথেষ্ট দিয়াছে; তাহারা ও মেহের উভয়েই ক্লান্ত হয়ে নীরব হয়েছে। এখন কিরূপে মনের মত যন্ত্রণা দিয়ে পরম শত্রুকে বধ করা হইবে তাহারই পরামর্শ হইতেছে। জাহাজটী লইবার অভিপ্রায়ে একটী বিক্রয় পত্র সহি করাবার জন্য অনেক ধস্তাধস্তি করা হইয়াছিল, হইল না। মেহেরআলি নিরুপায় হয়ে মরিতে স্বীকার; কিন্তু কাপুরুষ হইয়া কোন বিষয়ে অনিচ্ছা-স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আরও বিরক্ত হইয়া, আততায়ীরা যন্ত্রণা সৃষ্টির উপায় ভাবিতেছে। পরামর্শে স্থির হইল অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া, প্রত্যেক বৈরী ক্ষুদ্র ছুরিকা দ্বারা মেহেরের শরীরের কোন

কোন অংশ আপন বৈরনির্য্যাতন স্বরূপ লইয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিবে। শেষে লবণ দিয়া, ক্ষত-স্থল দ্বিগুণ-যন্ত্রণা-দায়ক করিয়া, অগ্নিতে দেহাবশেষ ক্ষেপ করিবে।

বহির্ভাগে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইল। অস্ত্র, লবণ, সংগৃহীত হইল। মেহেরকে ধরিয়া তথায় আনা হইল। যেমন বক্তৃতা শেষ করে স্বীয় স্বীয় দুরভিসন্ধি সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, সহসা অরণ্য হইতে কয়েক ব্যক্তি লগুড় প্রহারে আততায়ীদের ভয়-ত্রস্ত করিল ও তাহারা পলায়ন করিল। কত লোক, কোথা হইতে, কি জন্য, আসিল কেহ জানিতে না পারায় আরও ভয় পাইল। পলায়ন-কারীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ধাবমান হইল। শঙ্কর সিংহ ধরা পড়িল এবং অগ্নিকুণ্ডের কাছে নীত হইল। আসগরআলি মোক্তার-ও ধরা পড়িতেন কিন্তু তাঁহাকে অপরে সাহায্য করায় পলাইতে সক্ষম হইলেন। তথাপি তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল এবং বোধ হয় সে আঘাত চিরস্থায়ি হইবে।

অজ্ঞাত ব্যক্তিরা আর কেহ নহে, চারিলু ও তাহার দুই অনুচর। তিন জনের দাপটে বহু লোকের ন্যায় প্রভাব প্রকাশ হয়। চারিলু আসিয়াই অগ্নি-কুণ্ডের কাছে গিয়া ভয়ানক ব্যাপার দেখিলেন। দেখিয়া অরণ্য হইতে বৃক্ষশাখা কাটিয়া লগুড় প্রস্তুত করিয়া দুষ্টগণকে দূর করিয়া দেন। মেহেরকে বন্ধন-মুক্ত ক'রে, শঙ্করকে বন্ধন করিলেন। পরে সেই অগ্নিকুণ্ডে শঙ্করকে নিঃক্ষেপ করিয়া মেহেরকে নৌকা করিয়া লইয়া গেলেন। মেহের তখনও অচেতন।

শঙ্কর সিংহের অপরাধ অধিক, যাঁহার অধিক অপকার করেছে, তিনিই আজ তাহার প্রাণদণ্ড দিলেন। যাঁহার প্রতি বৈরনির্য্যাতন জন্য শঙ্কর সিং নিয়োজিত হইয়াছিল, সেই মেহের আলি আজ অচেতন। অচেতন না হইলে হয়ত শঙ্করের প্রাণ বিনাশ হইত না, দুর্গাপতির ন্যায় দূর নিঃক্ষিপ্ত হইত মাত্র। মেহেরও হয় ত আসগর আলির দুরভিসন্ধি জাল মৃত্যু-শয্যায় শঙ্কর সিং হইতে কতক শুনিয়াছিলেন। মরণকালে শঙ্কর স্বীকার করিল আসগর আলির প্ররোচনায় সে ঐ গর্হিত কার্য্য করিয়াছে এবং তাহার সমুচিত প্রতিপ্রতিফলও পাইল।

ক্রমশঃ।

পাণিনি।

বাবু রামদাস সেন মৎপ্রণীত "পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাবের" "সমালোচন উদ্দেশে" যেরূপ যুক্তি ও তর্কের আশ্রয়-গ্রাহী হইয়া পাণিনি-বিচার পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, বিবেচনা

করিবার জন্য প্রত্নতত্ত্ব-প্রিয় সহৃদয় পাঠক-বর্গের সমক্ষে এই প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রাচীন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান অনায়াস-সাধ্য নহে। মানব কল্পনা-সম্ভূত-কিম্ব-দন্তী উপকথা প্রভৃতিতে এই বিষয় এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, ইহা হইতে সত্য সংগ্রহ করিতে হইলে পদে পদে দিশাহারা হইতে হয়। ঈদৃশ সংশয়-তরঙ্গায়িত বিষয়ের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণরূপে দোষ-সম্পর্ক-শূন্য ও প্রমাদরহিত হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ প্রাচীন বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যে যে মত উপন্যস্ত করিতেছেন, কালক্রমে তাঁহার কোনটী যথার্থ কোনটীবা অযথার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আমি এইরূপ মত-বিসম্বাদিতাকে দুর্লক্ষ্য সত্যের প্রসূতি মনে করি। মতের পার্থক্য নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন বিচার-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে; এইরূপ যুক্তি ও বিচারের সংঘাতে সর্ব্ব প্রকার সংশয়-জাল বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিণামে সিদ্ধান্ত-ক্ষেত্র পরিষ্কৃত ও অনায়াস-গম্য হইতে পারে।

এই কারণে আমি রামদাস বাবুর পাণিনি-বিষয়ক প্রবন্ধ আদর-সহকারে পড়িয়াছি। এক্ষণে রামদাস বাবু যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ যুক্তির কতদূর অনুমোদিত, একবার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

রামদাস বাবু "পাণিনির কাল-নির্ণয়ের বিশেষ প্রমাণাভাবে" বৌদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ ও পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচ-স্পতির মতা[illegible] হইয়া বৃহৎকথার প্রমাণানুসা[illegible] রাজ নন্দের সমসামরিক ও খ্রীষ্টের রি শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বৃহৎকথা উপন্যাস গ্রন্থ। ইহা অব-লম্বন করিয়া কোন বিষয়ের কাল বিনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত নহে। রামদাস বাবু স্বপ্রণীত ঐতিহাসিক রহস্যের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ 'বৃহৎ কথার' রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন, কিন্তু মিথ্যা গল্পের পুস্ত-কের এত মান্য (১) করিতে হইলে আর-ব্যোপন্যাসও প্রকৃত ইতিহাস বিবে-চনা করিতে হয়। বিশেষতঃ পাণিনি মুনি কখনই কাত্যায়ন বররুচির সমকাল-বর্ত্তী ছিলেন না। এজন্য 'বৃহৎ কথার, প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতেছে" (২)। রামদাস বাবু এক স্থলে বৃহৎ কথাকে মিথ্যা গল্প-পূর্ণ ও আরব্যোপন্যাসের সমশ্রেণীক

(১) 'মান্য' পদটী বিশেষণ। সুতরাং "পুস্তকের মান্য করা" বাক্য ব্যাকরণ ও রীতি-বিশুদ্ধ নহে। এস্থলে 'মান্য' পদের পরিবর্ত্তে 'সম্মান' লিখিলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা হইত। রামদাস বাবু বাঙ্গালা লিখিতে যাইয়া চ্যুতসংস্কৃতি দোষে পতিত হইয়াছেন।

(২) ঐতিহাসিক রহস্য। প্রথম ভাগ। ৬০ পৃষ্ঠা।

বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন; পুনর্ব্বার অন্য স্থলে সেই মিথ্যা গল্পের পুস্তককেই "বিশেষ প্রমাণাভাবে" সত্য-পূর্ণ পবিত্র ইতিহাসের সম্মানিত পদে স্থাপন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। প্রত্ন-তত্ত্ব-প্রিয় সত্যানুসন্ধায়িগণ এক জনের লেখনী-বিনির্গত পরস্পর এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্যে কিরূপ আস্থা প্রদর্শন করিবেন, বলিতে পারি না।

কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিকূল-বাদীর মত খণ্ডন করিতে হইলে সর্ব্বাদৌ তাঁহার প্রধান যুক্তির মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। বিচারের এই চিরন্তন পদ্ধতির বহিশ্চর হইয়া বিষয়ান্তরের তর্ক উপস্থিত করা উচিত নহে। গোল্ডষ্টুকর ৮।২।৫০ সংখ্যক "নির্ব্বাণোহবাতে" সূত্র অবলম্বন করিয়া যে ভাবে পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্বসাময়িক স্থির করিয়াছেন, রামদাস বাবু তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, অথচ "আরণ্যক" প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের উল্লেখ করিয়া গোল্ডষ্টুকরের মত ভ্রান্তি-পূর্ণ বলিয়াছেন। এস্থলে রামদাস বাবুর প্রবর্ত্তিত বিচার অব্যাপ্তি-দোষাক্রান্ত হইয়াছে।

গুণাঢ্যের উপকথা (৩) পাণিনি, ব্যাড়ি ও কাত্যায়নকে এক সময়ে সন্নিবেশিত করিয়াছে। আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর এই মতের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পাণিনি ও কাত্যায়নের আবির্ভাব-সময়ের পার্থক্য প্রমাণ করিতে যাইয়া এই কয়েকটী যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন:—

১ম। পাণিনির সময়ে যে সমস্ত বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত বা অবিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

২য়। পাণিনির সময়ে শব্দ সমূহ যে যে অর্থদ্যোতক ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অনেক রূপান্তরিত হইয়া যায়।

৩য়। পাণিনি-প্রযুক্ত শব্দার্থ-সমূহ কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত ছিল।

৪র্থ। কাত্যায়নের সময়ে যে শব্দশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না।

এই যুক্তি চতুষ্টয়ের প্রথমটীর উদাহরণ স্থলে ক্লীবলিঙ্গান্ত একতর প্রভৃতি শব্দের রূপ করিবার প্রণালী, দ্বিতীয়টীর উদাহরণ স্থলে আশ্চর্য্য প্রভৃতি শব্দের অর্থ, তৃতীয়টীর উদাহরণ স্থলে প্রত্যবসান প্রভৃতি শব্দ এবং চতুর্থটীর উদাহরণ স্থলে আরণ্যক প্রভৃতির অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। গোল্ডষ্টুকর এই উদাহরণ গুলি দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, পাণিনি ও কাত্যায়ণ এরূপ বিভিন্ন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন যে, শব্দ-শাস্ত্রের যে যে অংশ পাণিনির সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত এবং যাহা পাণিনীর সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল, তাঁহা কাত্যায়নের সময়ে

(৩) বৃহৎ কথা ভূতভাষাখ্যো গ্রন্থভেদঃ। গুণাঢ্যস্তৎকর্ত্তা। ভূতভাষাপ্রণীতাসৌ গুণাঢ্যঃ কবিরুচ্যতে।"

বাসবদত্তা টীকায় নরসিংহ বৈদ্যধৃত বাক্য।

প্রচলিত হইয়া উঠে। সুতরাং গোলড্‌ষ্টুকরের উপন্যস্ত এই দৃষ্টান্ত গুলি, পাণিনি কাত্যায়ন যে, বিভিন্ন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহারই সমর্থন করিতেছে, পাণিনি যে বুদ্ধের পূর্ব্ব-কালবর্ত্তিক তাহার পোষকতা করিতেছে না।

রামদাস বাবু পাণিনির "কাল-নির্ণয়ের বিশেষ প্রমাণাভাবে" বৃহৎ কথার মত বলবৎ রাখিবার নিমিত্ত 'আরণ্যক' প্রভৃতি কয়েকটী শব্দ লইয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। গোলড্‌ষ্টুকর, উদাহরণ স্থলে যে "আরণ্যক" প্রভৃতি শব্দ দেখাইয়া পাণিনি ও কাত্যায়নের আবির্ভাব-সময়ের পার্থক্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন, রামদাস বাবু সেই, 'আরণ্যক' প্রভৃতি শব্দ লইয়া গোলড্‌ষ্টুকরের মত খণ্ডনে প্রয়াস পাওয়াতে স্পষ্ট বোধ হয়, রামদাস বাবুও বৃহৎ-কথার মতানুসারে পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বপ্রণীত ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথম ভাগে বৃহৎকথার প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "পাণিনি মুনি কখনই কাত্যায়নের সমকালবর্ত্তী ছিলেন না।" রামদাস বাবু এক স্থলে বৃহৎ কথার প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া পাণিনি ও কাত্যায়নকে বিভিন্ন সময়ের লোক বলিয়াছেন, পুনর্ব্বার অন্য স্থলে বৃহৎকথার প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়া গোলড্‌ষ্টুকরের "কতিপয় বাক্য খণ্ডনে বাধ্য হইয়াছেন।" এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যে কি সিদ্ধান্ত হইবে? রামদাস বাবু পুরাবৃত্তের অন্ধকার দূর করিতে যাইয়া নিজেই অন্ধকারে দিশাহারা হইয়াছেন।

ক্রমোন্নতি ভাষার একটী প্রধান ধর্ম্ম। উহা এক সময়েই সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনশীল-লহরী-লীলার সহিত ভাষাও ক্রমে পরিবর্ত্তিত, পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। ভাষার এইরূপ ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণও ক্রমে উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। গোলড্‌ষ্টুকরের মতে পাণিনি যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সে সময়ের ভাষা অনেক স্থলে সঙ্কুচিত বিষয়ের সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ ছিল। পরে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির সময়ে ক্রমে তাহা সম্প্রসারিত হইয়া আসিয়াছে। এই সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন শব্দ ক্রমে বহু অর্থ-বোধক কোন কোন শব্দ বা অন্যার্থ-প্রতিপাদক হইয়া উঠিয়াছে।

এই মতের সমর্থন জন্য পাণিনির সময়সম্মত "আশ্চর্য্য," "ভোজ্য" প্রভৃতি শব্দের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। পাণিনি ৬।১।১৪৭ সূত্রে আশ্চর্য্যের অর্থ অনিত্য ও ৭।৩।৬৯ সূত্রে ভোজ্যের অর্থ ভক্ষ্য বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। রামদাস বাবু স্বীয় প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "পণ্ডিতবর গোলড্‌ষ্টুকরের তর্কের অনুসরণ করিয়া রজনী বাবু পাণিনি পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠার টীকায় "আশ্চর্য্যমনিত্যে" পাণিনি সূত্র ও "আশ্চর্য্যমদ্ভুতমিতিবক্তব্যম্' এই বার্ত্তিক উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির সময় ও তাঁহার

পূর্ব্বে অনিত্য শব্দ বিনশ্বর-বোধক ছিল।” রামদাস বাবু এস্থলে নিতান্ত অনবধান তার পরিচয় দিয়াছেন। আমি কখনও গোলড্‌ষ্টুকরের মতানুসরণ করিয়া অনিত্য শব্দ বিনশ্বর-বোধক বলিয়া সিদ্ধান্ত করি-নাই। “পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক-প্রস্তাবে” স্পষ্ট-লিখিত আছে; অনিত্য শব্দের অর্থ কাদাচিৎক, অর্থাৎ যাহা সচরাচর সঙ্ঘটিত হয় না। গোলড্‌ষ্টুকরেরও এই মত। পাণিনি পুস্তকে এ বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে যথাবৎ উদ্ধৃত হইল :—

“পাণিনি, ৬। ১। ১৪৭ সংখ্যক সূত্রে আশ্চর্য্য শব্দের অনিত্য (যাহা সচরাচর সংঘটিত হয় না, কাদাচিৎক) অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু এদিকে কাত্যায়ন স্ববা-র্ত্তিকে ‘আশ্চর্য্য’ শব্দ অদ্ভুত অর্থ-প্রতি-পাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৪)।” এরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকাতেও রামদাস বাবু কি ভাবিয়া বিনশ্বর শব্দ প্রয়োগ করিলেন? কাদাচিৎক ও বিনশ্বর, এই-শব্দ-দ্বয় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ-বোধক।

গোলড্‌ষ্টুকর এই কাদাচিৎক অর্থ দেখাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কাত্যায়ন যখন স্ববার্ত্তিকে আশ্চর্য্য শব্দ অদ্ভুত অর্থ-বোধক বলিয়াছেন তখন পাণিনির সময়ে উক্ত অর্থের প্রচার ছিলনা, অন্যথা পাণিনি স্বীয় সূত্রে উহার উল্লেখ করিয়া যাইতেন। পাণিনির সময়ে আশ্চর্য্য শব্দ অনিত্য অর্থবোধক ছিল, পরে কাত্যায়নের সময়ে উহা অনিত্যের পরিবর্ত্তে অদ্ভুত অর্থ দ্যো-তক হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং পাণিনি ও কাত্যায়ন সমসাময়িক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।

রামদাস বাবু গোলড্‌ষ্টুকরের এই যুক্তির খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন, “পাণিনির সময় যদি আশ্চর্য্য অদ্ভুত, চিত্র আদি শব্দ এক পর্য্যায়াক্রান্ত না থাকিত, তবে পাণিনি আশ্চর্য্য অর্থে চিত্র শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিতেন না, তিনি “চিত্রঙ্‌ আশ্চর্য্যে” এই একটী সূত্র করাতে আচার্য্য গোলড্‌ষ্টুকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হইতেছে”। রাম দাস বাবুর এইরূপ লিখন-ভঙ্গী আমাকে যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি যে সূত্রটী পাণিনির প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অষ্টাধ্যায়ী পাণিনীয় সূত্র পাঠের কোনও স্থলে দৃষ্ট হইল না। রামদাস বাবু এই অপাণিনীয় সূত্র অব-লম্বন করিয়া অসঙ্কুচিত ভাবে “গোলড্‌-ষ্টুকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ” করি-য়াছেন !!

পাণিনি ৩।১।১৯ সংখ্যক সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, ‘নমস্‌ শব্দ, রবিবস্‌ শব্দ ও চিত্র শব্দের উত্তর ক্যচ্‌ প্রত্যয় হইবে।”

(৪) পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাব। ৪৪ পৃষ্ঠা। রামদাস বাবুর প্রবন্ধে ৪৫ পৃষ্ঠার স্থলে ৫৪ পৃষ্ঠা লিখিত আছে।

পতঞ্জলি এই সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন, "পূজার্থক নমস্ শব্দ, পরিচর্য্যার্থক বরিবস্ শব্দ ও আশ্চর্য্যার্থক চিত্র শব্দের উত্তর ক্যচ্ প্রত্যয় হইবে।" অন্যান্য সূত্রে (যথা; আশ্চর্য্যমনিত্যে, ভৌজ্যং ভক্ষ্যে ইত্যাদি) পাণিনি যেমন অর্থের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এস্থলে, "নমস্, বরিবস্ ও চিত্র শব্দের সেরূপ কোনও অর্থের উল্লেখ না থাকাতে পতঞ্জলি স্বীয় ভাষ্যের স্থলান্তরে লিখিয়াছেন "আচার্য্যের (পাণিনির) কি বিচিত্র নিয়ম। তিনি কোন কোন সূত্রে অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কোন কোন সূত্রে করেন নাই (৫)।" পতঞ্জলির এই বাক্যে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পাণিনি, নমস্, বরিবস্ ও চিত্র শব্দের কোন অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। পতঞ্জলি পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্য স্থলে উহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। পতঞ্জলিকৃত পাণিনীয় সূত্রোক্ত চিত্র শব্দের ব্যাখ্যা, "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে (৬)" অর্থাৎ কেবল আশ্চর্য্যার্থক চিত্র শব্দের উত্তর ক্যচ প্রত্যয় হইবে, যে স্থলে 'চিত্র' শব্দ আলেখ্যের দ্যোতক হইবে, সে স্থলে এই প্রত্যয় হইবে না।" পাণিনি যে, চিত্র, অদ্ভুত, আশ্চর্য্যপ্রভৃতি শব্দ এক পর্য্যায়াক্রান্ত বলিয়া জানিতেন, তাহা পতঞ্জলির এই ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইতেছে না। পাণিনিও স্বয়ং এসম্বন্ধে কোনও সূত্রের বিধান করেন নাই। প্রত্যুত পতঞ্জলি স্পষ্ট লিখিয়াছেন, পাণিনি স্বীয় সূত্রে "চিত্র" শব্দের কোনও অর্থ করেন নাই। ইহাতে পাণিনি, "আশ্চর্য্য"

---

(৫) ৩।১।১৯ :—নমোবরিবশ্চিত্রঙঃ ক্যচ্।

ভাষ্য :—নমসঃ পূজায়াম্। বরিবসঃ পরিচর্য্যায়াম্। চিত্রঙ আশ্চর্য্যে। * * * খল্বপ্যাচার্য্যঃ চিত্রয়তি ক্বচিদর্থানাদিশতি ক্বচিন্ন। এবমপ্যর্থাদেশনং কর্ত্তব্যম্।

পাণিনির এই সূত্রানুসারে আশ্চর্য্যার্থক চিত্র শব্দের উত্তর কাচ্ প্রত্যয় করিয়া "চিত্রীয়তে" পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু পতঞ্জলি স্বীয় ভাষ্যে 'আচার্য্যশ্চিত্রয়তি' লিখিয়াছেন। এস্থলে নাম-ধাতু প্রক্রিয়া অনুসারে যদি কেহ 'চিত্রয়তি' পদ ব্যাকরণ-দুষ্ট, বলেন, এই আশঙ্কায়, কৈয়ট লিখিয়াছেন :—

চিত্রয়তীতি। চিত্র বৈচিত্র্য করণ ইতি চৌরাদিকস্য রূপং। অনেকং মার্গং আশ্রয়তীত্যর্থঃ।

(৬) রামদাস বাবুর প্রবন্ধে "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে," স্থলে চিত্রঙঃ শব্দের ঙ হসন্ত (ঙ্) আছে। কিন্তু এস্থলে হসন্ত ঙ হইবেনা। চিত্রঙঃ পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত পদ। শেষে সন্ধির নিয়মানুসারে পরস্থ বিসর্গের লোপ হইয়াছে। সুতরাং "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে." ইহাই বিশুদ্ধ বাক্য। আত্মনেপদ বিধানের নিমিত্ত চিত্র শব্দ ঙান্ত করা হইয়াছে।

কাতন্ত্র ব্যাকরণের টীকায় চিত্রীয়তে পদের সাধনস্থলে "নমোবরিবশ্চিত্রঙঃ ক্যচ" পাণিনির এই সূত্র ও "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে" পতঞ্জলির এই ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

শব্দের অদ্ভুত অর্থ জানিতেন, কিরূপে তাহা সপ্রমাণ হইল? এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, রামদাস বাবুর সিদ্ধান্ত নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি-পূর্ণ। রামদাস বাবু স্বীয় অনবধানতা-দোষে পতঞ্জলির ব্যাখ্যা বিশেষকেই পাণিনির সূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে আচার্য্য গোলড্‌ষ্টুকরের সিদ্ধান্ত অমূলক বলিয়াছেন!! একপ এরূপ অব্যবস্থিতা ও হঠকারিতা প্রদর্শন রামদাস বাবুর ন্যায় শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তির উচিত হয় নাই।

রামদাস বাবু ৭।৩।৬৯ সংখ্যক "ভোজ্যং ভক্ষ্যে" সূত্র অবলম্বন করিয়া যে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। "জ" বর্ণ 'গ' বর্ণে পরিণত করা এই সূত্রের সাধারণ উদ্দেশ্য মাত্র, কিন্তু সূত্রের রচনায় যে অর্থ অনুস্যূত রহিয়াছে, রামদাস বাবু তৎপ্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। পাণিনি এই সূত্রে 'ভোজ্য' শব্দ ভক্ষ্যার্থবাচক বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতানুসারে 'ভক্ষ্যা যবাগূঃ' ইত্যাদি বাক্য রীতি-বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ইদানীন্তন ভাষার রীতির সহিত এইরূপ প্রয়োগের সম্পূর্ণ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে সচরাচর কঠিন খাদ্যকেই 'ভক্ষ্য' বলা যায়। কাত্যায়ন এই রূপ প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াই স্বীয় বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন। রামদাস বাবু লিখিয়াছেন, "পাণিনির সময়ে ভোজ্য শব্দের এক অর্থ, আর কাত্যায়নের সময়ে আর এক অর্থ, তাহা নহে" কি প্রকারে এই বাক্যের সমর্থন হইতে পারে? রামদাস বাবু কি এক্ষণে "মণ্ড ভক্ষণ করিতেছে" এরূপ লিখিতে পারেন? পাণিনি যখন 'ভোজ্য' শব্দ ভক্ষ্যার্থবাচক বলিয়াছেন, তখন তদানীন্তন সময়ে তরল ও কঠিন উভয় বিধ খাদ্যকেই 'ভক্ষ্য' বলিত ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। গোলড্‌ষ্টুকর এস্থলে কেবল অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাণিনীয় সময়প্রসিদ্ধ অর্থ যখন কাত্যায়নের সময়ে রূপান্তরিত হইয়া অন্য বিষয়দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে তখন উভয়ে কখনই একসময়ের লোক হইতে পারেন না। রামদাস বাবু "অভ্যবহার্য্য" (রামদাস বাবুর প্রবন্ধে "অব্যবহার্য্য" লিখিত আছে, প্রস্তাবিত স্থলে এটী বিশুদ্ধ কথা নয়) শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যেরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রমাণ-সিদ্ধ নয়। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই "অভ্যবহার্য্য" শব্দ তরল ও কঠিন উভয় বিধ অর্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৭)। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির প্রতি হতাদর হইয়া রামদাস বাবুর বাক্যে

(৭) ৭।৩।৬৯:—'ভোজ্যং ভক্ষ্যে। বার্ত্তিকঃ-ভোজ্যমভ্যবহার্য্যমিতি বক্তব্যম্। ভাষ্যঃ—ইহাপি যথা স্যাৎ। ভোজ্যঃ সূপঃ। ভোজ্যা যবাগূরিতি।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাবের ৪৬ পৃষ্ঠার ৪৮ টিপ্পনী দেখ।

আখ্যা প্রদর্শন, কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না।* এস্থলে বলা আবশ্যক, গোলডষ্টুকর যে যুক্তি দেখাইয়া পাণিনি ও কাত্যায়নকে বিভিন্নসাময়িক বলিয়াছেন, রামদাস বাবু তাহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং রামদাস বাবুর মতানুসারে এস্থলেও পাণিনি ও কাত্যায়ন সমসাময়িক হইতেছেন। সহৃদয় পাঠকবর্গ স্মরণ করিবেন, রামদাস বাবু অন্য স্থলে পাণিনি ও কাত্যায়নকে বিভিন্ন সময়ের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

রামদাস বাবু স্বীয় প্রবন্ধের স্থলান্তরে লিখিয়াছেন, "পাণিনি কেবল সূত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বৃত্তি বা উদাহরণ তাঁহার নহে, তবে কি প্রকারে অন্যের দত্ত উদাহরণ দ্বারা পাণিনির সময়ের ব্যবহারিক ভাব নির্ণয় করা যাইতে পারে?" প্রশ্নটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। একজন প্রগাঢ়-শাস্ত্রবিশারদ কোন বিষয়ের সমালোচন করিলে, সেই সমালোচন দ্বারা সমালোচিত বিষয়টী অনেকাংশে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। কাত্যায়ন কর্ত্তৃক পাণিনীয় সূত্রে যে যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, পতঞ্জলি যথোচিত ধীরতা ও প্রবীণতা সহকারে তাহার সমালোচন করিয়াছেন। এইরূপ দোষপ্রদর্শন ও সমালোচন দ্বারা পাণিনির সময়ে শব্দ শাস্ত্রের কোন্ বিষয় কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহা অনায়াসেই জানিতে পারা যায়। কাত্যায়নের বার্ত্তিক ও পতঞ্জলির ভাষ্য দ্বারা শব্দ শাস্ত্রের অর্থ বিশেষের আন্দোলন করিয়া পাণিনির কাল নির্ণয়ের বিচার করা হইয়াছে; এজন্য এ স্থলে কেবল শব্দ-শাস্ত্র-ঘটিত অর্থের ব্যবহারই উল্লিখিত হইল। রামদাস বাবুর "ব্যবহারিক ভাব" অন্য অর্থেও প্রয়োজিত হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে তদ্বিষয়ক আন্দোলনের কোনও সার্থকতা দেখা যাইতেছে না। রামদাস বাবু যে বিচার উত্থাপন করিয়াছেন, স্বয়ং যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহার চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই।

রামদাস বাবু ৬।৪।১৭৪ "দাণ্ডিনায়ন হাস্তিনায়নাথর্ব্বণিক" ইত্যাদি (৮) সূত্রে আথর্ব্বণিক শব্দের ও ৪।১।১০৭ সূত্রে 'কপিবোধাদাঙ্গিরসে' সূত্রে 'আঙ্গিরস' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, পাণিনি অথর্ব্ব বেদ অবগত ছিলেন, সুতরাং তদীয় মতানুসারে 'পাণিনি' পুস্তকের এতদ্বিষয়ক সিদ্ধান্তটী 'ভ্রম-পূর্ণ' হইয়াছে। রামদাস বাবু "পাণিনি-বিচার" খানি মনোযোগ সহকারে পড়িয়া দেখিলে কখনই এই অসঙ্গত বাক্যের উল্লেখ করিতেন না। গোলড্ষ্টুকরের মতানুসারে মৎপ্রণীত "পাণিনি" পুস্তকে স্পষ্ট

(৮) সমস্ত সূত্রটী এই :—

দাণ্ডিনায়নহাস্তিনায়নাথর্ব্বণিকজৈহ্মাশিনেয়বাশিনায়নিভ্রৌণহত্যধৈবত্যসারবৈক্ষ্বাকমৈত্রেয়হিরণ্ময়ানি।

রামদাস বাবু এই সূত্রের একাংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

লিখিত আছে, "পাণিনীয় ৪।৩।১৩৩ ও ৬।৪।১৭৪ সংখ্যক সূত্রে 'আথর্ব্বণিক" শব্দ বিনিবেশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু চতুর্থ বেদ-প্রতিপাদক 'অথর্ব্বন্' শব্দ কোন স্থলে সুস্পষ্ট রূপে উল্লিখিত হয় নাই। সবার্ত্তিক সূত্রের ভাষ্যকার পতঞ্জলি এই 'আথর্ব্বণিক' শব্দ ঋত্বিক বিশেষের ধর্ম্মাদি প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২।৪।৬৫ সংখ্যক সূত্রে (৯) অথর্ব্ব বেদোক্ত অঙ্গিরস্ ঋষির নাম আছে বটে, কিন্তু প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে 'অথর্ব্বাঙ্গিরস' শব্দের উল্লেখ কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত কারণে অথর্ব্ব বেদ পাণিনির পর-সাময়িক বলিয়াই বোধ হয়" (১০)। এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন, রামদাস বাবু যে 'আথর্ব্বণিক' শব্দ প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিয়া স্থির করিয়াছেন, অথর্ব্ব বেদ পাণিনির পরিজ্ঞাত ছিল, 'পাণিনি' পুস্তকে সেই আথর্ব্বণিক শব্দ প্রভৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু উহা এবিষয়ে যে যুক্তি সহকারে উপন্যস্ত হইয়াছে, রামদাস বাবু তাহার খণ্ডন করেন নাই অথচ আমাদিগের সিদ্ধান্ত ভ্রম-পূর্ণ, বলিয়াছেন। এরূপ যুক্তি-শূন্য বিচারে রামদাস বাবুর সিদ্ধান্তের সত্যতা স্থাপিত হইতেছে না। (১১)

(৯) ২।৪।৬৫ :—অত্রিভৃগুকুৎসবশিষ্ঠগোতমাঙ্গিরোভ্যশ্চ।

রামদাস বাবুর প্রবন্ধে এই সূত্রের পরিবর্ত্তে ৪।১।১০৭ সংখ্যক 'কপিবোধাদাঙ্গিরসে' সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। যাহা হউক ইহাতে কোনও বাধা লক্ষিত হইতেছে না।

(১০) পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব কালনির্ণায়ক প্রস্তাব। ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা।

(১১) ৪।৩।১৩৩ :—আথর্ব্বণিকস্যেকলোপশ্চ।

বার্ত্তিক :—আথর্ব্বণিকস্যেকলোপশ্চাণ্ বক্তব্যঃ। আথর্ব্বণো ধর্ম্মঃ। আথর্ব্বণ আম্নায়ঃ।

ভাষ্য :—ইদমাথর্ব্বণার্থমাথর্ব্বণিকার্থঞ্চ চতুর্গ্রহণং ক্রিয়তে। বসন্তাদিম্বাথর্ব্বন্ শব্দ আথর্ব্বণিকশব্দশ্চ পঠ্যন্তে, 'ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রকৃতিভাবার্থং গ্রহণং ক্রিয়তে। ইদং চতুর্থমিকলোপার্থং। * এবমাথর্ব্বণমধীত ইতি বিগৃহ্য আথর্ব্বণিক ইতি ভবিষ্যতি। ইত্যাদি।

কৈয়ট :—* * * যদেবাথর্ব্বণা প্রোক্তং আথর্ব্বণং শাস্ত্রং তদেবাথর্ব্বণিকানামাম্নায়ো নতু তেষামাম্নায়ান্তরমাথর্ব্বণশব্দবাচ্যং। ধর্ম্মস্ত্বাথর্ব্বণ সাদৃশ্যাদাথর্ব্বণ শব্দেনাভিধীয়তে।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পাণিনি যে আথর্ব্বণিক শব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অথর্ব্বপ্রোক্ত শাস্ত্র ও তৎশাস্ত্র-সম্মত ধর্ম্মের নির্দ্দেশক। কৈয়ট স্পষ্টাক্ষরে 'শাস্ত্র' বলিয়াছেন। পাণিনির 'আথর্ব্বণিক' শব্দ অথর্ব্ব বেদ প্রতিপাদক হইলে, ভাষ্য প্রভৃতিতে অবশ্যই উহার নির্দ্দেশ থাকিত। কোনও অভিজ্ঞ হিন্দু বেদের অপলাপ করিয়া শাস্ত্রের উল্লেখ করেন না।

রামদাস বাবু যাজ্ঞবল্ক্যকে পাণিনির পর-সাময়িক বলিয়াছেন, কিন্তু "যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি" স্থলে 'যাজ্ঞবল্কানি' পদ কিরূপে সিদ্ধ হইবে, তদ্বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। কাত্যায়ন পাণিনির ৪৩।১০৫ সংখ্যক "পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু" সূত্রে যাজ্ঞবল্ক্যাদির উত্তর ণিন্ প্রত্যয়ের প্রতিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য যদি পাণিনির পূর্ব্ব সাময়িক হইতেন, তাহা হইলে পাণিনি অবশ্যই তাঁহাকে প্রাচীন জ্ঞান করিয়া কাত্যায়নের ন্যায় একটী বিশেষ বিধির নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন। পাণিনি যে শতপথ ব্রাহ্মণের ন্যায় একটী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের বিষয় বিস্মৃত হইয়া যজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ-বাচক পদকে চ্যুতসংস্কৃতি দোষে দুষ্ট করিয়া যাইবেন, তাহা সম্ভাবিত নহে (১২)। রামদাস বাবু এযুক্তির উচ্ছেদে সমর্থ হয়েন নাই, সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রমাদশূন্য বোধ হইতেছে না।

কিম্বদন্তী অনুসারে মার্কণ্ডেয় পুরাণ ভাগুরি-প্রোক্ত বলিয়া পরিচিত। ভাগুরি প্রাচীন হইতে পারেন, কিন্তু তৎপ্রোক্ত বলিয়াই মার্কণ্ডেয় পুরাণ পাণিনির অপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারে না। তন্ত্র সমূহ শিবপ্রোক্ত বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তন্ত্র-বিশেষে ইংরেজ ও লণ্ডন নগরেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১৩)। শিব প্রোক্ত বলিয়াই কি এরূপ

এস্থলে পাণিনি 'আথর্বণিক শব্দের' কোনও অর্থ করেন নাই; কেবল পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রভৃতিই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, পাণিনি 'নমোবরিবশ্চিত্রঙঃ ক্যচ্' সূত্রে নমস্ প্রভৃতি শব্দের কোনও অর্থ করেন নাই পতঞ্জলি উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। পতঞ্জলি, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, প্রভৃতি শব্দ এক পর্য্যায়াক্রান্ত বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে পতঞ্জলির ব্যাখ্যা ধরিয়া পাণিনীয় সময়-সম্মত অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে পাণিনির সময়ে যে "আশ্চর্য্য' অদ্ভুত "প্রভৃতি শব্দ এক পর্য্যায়াক্রান্ত ছিল না, কিরূপে তাহা অস্বীকার করা যায়? এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। পতঞ্জলি চিত্র শব্দের 'আশ্চর্য্য' অর্থ করিয়াছেন মাত্র। 'আশ্চর্য্য চিত্র, অদ্ভুতাদি যে এক পর্য্যায়ে নিবদ্ধ এরূপ কোন কথা বলেন নাই। বিশেষতঃ পাণিনির ৬।১।১৪৭ "আশ্চর্য্যমনিত্যে' সূত্রে পতঞ্জলি অনিত্য শব্দ হইতে 'অদ্ভুত' অর্থ প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন, (পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল নির্ণায়ক প্রস্তাবের ৪৪—৪৬ পৃষ্ঠা)। সুতরাং পতঞ্জলির ব্যাখ্যাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, পাণিনি, চিত্র, 'আশ্চর্য্য শব্দ' অনিত্যের বোধক বলিয়া জানিতেন।

(১২) পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাবের ৫৭।৬৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(১৩) পূর্ব্বাম্নায়ে নব শতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরঙ্গভাষয়া তন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ ভুবি॥

আধুনিক গ্রন্থকেও অতি প্রাচীন বলিতে হইবে? প্রাচীন মুনিদিগের নামে প্রচার করিলে স্বীয় গ্রন্থ সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে ভাবিয়াই বোধ হয় গ্রন্থকারগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ অমুক অমুক ঋষিপ্রোক্ত বলিয়াছেন। অথবা এরূপও হইতে পারে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে সময়ান্তরে যাজ্ঞবল্ক্যের নাম প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে সময়ে কেবল বংশময়ী লেখনীর ব্যায়ামক্রিয়ায় গ্রন্থ সমূহের উৎপত্তি হইত, সে সময়ে এরূপ ঘটনা অসম্ভাবিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কেবল জনপ্রবাদের উপর আস্থা দেখাইয়া প্রকারান্তরে পাণিনিকে অপদস্থ করা নিতান্ত অসঙ্গত।

এপর্য্যন্ত 'আরণ্যক' সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই, এক্ষণে তদ্বিষয়ক বিচার উত্থাপিত হইতেছে। একটী পদের বহু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে অবশ্য পরিভাষার মুখাপেক্ষী হইতে হয়। কিন্তু যেস্থলে শাস্ত্র-বিশারদ আচার্য্যকে কোন একটী শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিতে হয়, সেস্থলে সর্ব্বাদৌ সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ অর্থেরই উল্লেখ হইয়া থাকে। পাণিনি ৪। ২। ১২৯ সংখ্যক "অরণ্যান্ মনুষ্যে" সূত্রে আরণ্যকের অর্থ কেবল অরণ্যবাসী মনুষ্য বলিয়াছেন। অরণ্যবাসী মনুষ্য অর্থে যে আরণ্যক শব্দ প্রয়োজিত হয়, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। কেবল অরণ্যবাসী মনুষ্য নয়; অরণ্যেচর হস্তী, অরণ্য-প্রসূত পথ প্রভৃতি অর্থেও আরণ্যক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এসকল অপেক্ষাও ইহার অন্য একটী গুরুতর অর্থ আছে। সচরাচর পণ্ডিত-সমাজে অরণ্যগীত বেদাধ্যায় বিশেষ 'আরণ্যক' অর্থে অভিহিত হইয়া থাকে। 'আরণ্যক' শব্দ যেমন অরণ্যবাসী মনুষ্য, অরণ্যেচর হস্তী প্রভৃতি অর্থে পরিভাষিত, সেইরূপ অরণ্যগীত বেদাধ্যায় অর্থেও পরিভাষিত। পাণিনি স্বীয় সূত্রে এই প্রচলিত অর্থের উল্লেখ না করিয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত অর্থের উল্লেখ করিছেন কেন? এস্থলে বলা আবশ্যক, পাণিনি "আরণ্যক" শব্দ অরণ্যেচর হস্তী প্রভৃতির বোধক বলেন নাই, তাই বলিয়া যে তদানীন্তন সময়ে হস্তী, পথ প্রভৃতি ছিলনা, তাহা নহে।। গোলড্-ষ্টুকর এস্থলে কেবল এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, কোন অভিজ্ঞ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট 'বাইবল' শব্দের অর্থ-জিজ্ঞাসু হইলে তিনি কখনও অগ্রে উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উল্লেখ করিবেন না। 'বাইবল' শব্দ উচ্চারণ করিলেই প্রথমে স্বজাতির সম্মানিত ধর্ম্ম গ্রন্থের নির্দ্দেশ করিয়া পরে শব্দের ব্যুৎপত্তির অনুসরণ পূর্ব্বক "পুস্তকের" উল্লেখ করিবেন। এইরূপ কোন শাস্ত্রাভিজ্ঞ হিন্দুকে আর-

---

অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ডজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥
(মেরু তন্ত্র)

থাক, শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অবশ্যই প্রথমে স্বসম্প্রদায়মান্য পবিত্র বেদাধ্যায়ের উল্লেখ করিয়া পরে অরণ্যবাসী মনুষ্য প্রভৃতিব নির্দ্দেশ করিবেন। পাণিনি একজন শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত হইয়াও যখন আরণ্যক শব্দে কেবল অরণ্যবাসী মনুষ্যের উল্লেখ করিয়াই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তখন 'আরণ্যক' নামক পবিত্র বেদাংশ তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল, ইহা কিরূপে স্বীকার যায় (১৪)? রামদাস বাবু যুক্তি দেখাইয়া ইহার উত্তর দেন নাই।

মহাভারত ও মনু সংহিতায় বেদাধ্যায় অর্থে 'আরণ্যক' শব্দের উল্লেখ আছে। 'পাণিনি' পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠার ৫৩ সংখ্যক টিপ্পনীতে আমি মনুসংহিতা মহাভারত হইতে উক্ত বিষয়ক বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। মনুসংহিতা ও মহাভারতের সমুদয় অংশ সমান প্রাচীন নয়। বিপ্লবের পর বিপ্লবে উহা অনেক পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া অদ্যতন পাঠক সমাজে উপস্থিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তিত মনুসংহিতা ও মহাভারত কোন কোন মতে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে (১৫)। সুতরাং মনু ও মহাভারতে বেদাংশজ্ঞাপক আরণ্যকের উল্লেখ আছে বলিয়াই যে পাণিনীয় সময়ে উহার অস্তিত্ব ছিল, এরূপ স্থির করা সর্ব্বথা অসঙ্গত।

কেবল পাণিনির কাল নির্ণায়ক বিচার-প্রসঙ্গেই আমাকে এতদূর অগ্রসর হইতে হইল। আমি এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা একরূপ সাঙ্গ হওয়াতে এই স্থলেই উহার উপসংহারে বাধ্য হইলাম।

গোলড্‌ষ্টুকরের মতানুবর্ত্তী হইয়া আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা যে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও প্রমাদ-রহিত হইয়াছে, স্পর্দ্ধা সহকারে এরূপ কথা বলিবার আমার কোনও অধিকার নাই। হয়ত অন্য পণ্ডিতের যুক্তি-পূর্ণ সূক্ষ্ম বিচারে গোলড্‌ষ্টুকরের মতভ্রান্তি-পূর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আমি এইরূপ বিচারের একান্ত পক্ষপাতী।

আমি জিগীষাপরায়ণ বা বিচার-মল্ল হইয়া রামদাস বাবুর প্রবন্ধের সমালোচনে প্রবৃত্ত হই নাই। রামদাস বাবু যে যুক্তি ও তর্ক অবলম্বন করিয়া চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত, বিবেচনা করিবার জন্যই আমার এই প্রয়াস বিহিত হইয়াছে।

সর্ব্ব শেষে আমার বক্তব্য এই:—গোলড্‌ষ্টুকরের মত খণ্ডন করিয়া পাণিনির সময় নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ "নির্ব্বাণোহবাতে' সূত্রে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মূলোচ্ছেদ করা উচিত। রামদাস বাবু ইহা

(১৪) পাণিনি কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল নির্ণায়ক প্রস্তাব ৫১-৫৩ পৃষ্ঠা।

(১৫) Indian Wisdom p p. 215, 319.

না করিয়া কতকগুলি অবান্তর তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ বৃহৎকথার মতানুবর্ত্তী হইলে পাণিনি, ব্যাড়ি ও কাত্যায়ন তিন জনকেই এক সময়ের লোক বলা উচিৎ। কারণ, বৃহৎকথা এই তিন জনকেই এক সময়ে সন্নিবেশিত করিয়াছে। রামদাস বাবু এক স্থলে বৃহৎ কথার প্রমাণানুসারে পাণিনিকে মহারাজ নন্দের সমসাময়িক বলিয়াছেন, স্থলান্তরে আবার বৃহৎকথায় উপেক্ষা করিয়া পাণিনি, কাত্যায়ন ও ব্যাড়িকে বিভিন্নসাময়িক বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত যে সংশয়-বহিষ্কৃত ও প্রমাদশূন্য হয় নাই। ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে একবিষয়ক মতের একাংশ গ্রহণ করিয়া অপরাংশে হতাদর হইলে সিদ্ধান্তের স্থিরতা রক্ষিত হয় না। * শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

* রামদাস বাবুর প্রস্তাবের খণ্ডন করিতে গিয়া রজনী বাবু দুই একটী অপ্রাসঙ্গিক ভাষাগত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন ইহা আমাদিগের মতে সুরুচিসঙ্গত হয় নাই। স

ভারতীয় ইতিহাস *।

প্রথম প্রস্তাব।

যে ভারত একদিন জগতের শিক্ষক ছিল; যে ভারত একদিন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান সকল বিষয়েই আশ্চর্য্য মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছিল; সে ভারত কেবল ইতিহাস বিষয়েই সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিল একথা বিশ্বাস করিতে আমাদিগের বুদ্ধি সঙ্কুচিত হয়, হৃদয় প্রতিহত হয়। বৈদেশিক ইতিবেত্তৃগণ আমাদিগকে এই কথা বিশ্বাস করাইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই আমাদের মন প্রবোধ মানে নাই। আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই কেমন করিয়া এই প্রকাণ্ড জাতি বিনা ইতিহাসে থাকিতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষে আর্য্য উপনিবেশ সংস্থাপনের পর হইতে থানেশ্বরে পৃথুরাজের নিধন পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত কাল মধ্যে ভারতীয় আর্য্যদিগকে যে কত সমরে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল তাহা গণনায় নির্ণয় করা কঠিন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আর্য্যজাতি যে সেই অগণ্য সমরের কোন বিবরণ পরিরক্ষিত করেন নাই ইহা মানব বুদ্ধির অগোচর। যে জাতির একটী সমরের বিবরণে অষ্টাদশ

* An address on the study of Indian History, delivered extempore, at the Anniversary meeting of the Young Men's Union.

পর্ব্ব মহাভারত' পরিপূরিত হইয়াছিল, যে জাতির আর একটী সমরের বিবরণে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই জাতির অসংখ্য সমরের কোন লিখিত বিবরণ ছিল না একথা অশ্রদ্ধেয়! যে জাতির এক একটী সামান্য ঘটনা লইয়া, এক একটী বংশ উপলক্ষ করিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহাকাব্য বিরচিত হইয়াছে, সে জাতির আনুপূর্ব্বিক ঘটনাবলীর কোন ইতিহাস ছিল না, উন্মাদগ্রস্ত ব্যতীত একথা আর কে বলিবে; এবং বিকারগ্রস্ত ব্যতীত আর একথা কে বিশ্বাস করিবে?

আমরা পক্ষপাত দূষিত বা অসম্বদ্ধ-প্রলাপীর ন্যায় একথা বলিতেছি এরূপ নহে; আমরা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়বিধ প্রমাণই প্রদর্শন করিতে পারিব। আমরা সর্ব্বপ্রথমে অনুমাণ-প্রমাণেরই অনুসরণ করিলাম।

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে নিতান্ত অসভ্য দেশেও কি পুরাকালে কি আধুনিক সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহাদি রাজকীয় ঘটনাবলীর লিখিত বা ধারাবাহিক রূপে শ্রৌত বিবরণ উপলব্ধ হওয়া যায়; অধিক কি অমুক রাজা এই কাজ করিয়াছিলেন, অমুক রাণী এই কথা বলিয়াছিলেন, ইত্যাদি সামান্য সামান্য রাজকীয় বিষয়ও তাহাদিগের লেখনী ও পুরুষ-পরম্পরায় তাহাদিগের জিহ্বার বিষয় হইয়া থাকে। যখন নিতান্ত অসভ্য জাতির মধ্যেও রাজকীয় ঘটনাবলী পরিরক্ষণের প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সুসভ্য আর্য্যজাতির মধ্যে যে সে প্রথা প্রচলিত থাকিবে না ইহা একান্ত অসম্ভব।

দ্বিতীয়ঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে গ্রীস্, রোম্, মিসর, আরব প্রভৃতি যে যে প্রাচীন জাতি সভ্যতা শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইতিহাস বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; ভারতীয় আর্য্যেরা অন্যান্য সকল বিষয়েই হয় তাঁহাদিগের অগ্রণী নয় তাঁহাদিগের সমকক্ষ ছিলেন; এরূপ স্থলে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যেরা যে কেবল ইতিহাস বিষয়েই সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবেন ইহা একান্ত অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র সকল এত পরম্পরানুবর্ত্তী যে একের উন্নতিতে অন্যান্যের উন্নতি, একের অবনতিতে অন্যান্যের অবনতি, এবং একের উদ্ভবে অন্যান্যের উদ্ভব ও একের ধ্বংশে অন্যান্যের ধ্বংশ। এই পরম্পরানুবর্ত্তিতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাচীন গ্রীস্, রোম, মিসর, আরব প্রভৃতিতে এবং আধুনিক সুসভ্য দেশসকলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং যখন এই সকল শাস্ত্র এত পরম্পরানুবর্ত্তী, তখন অন্যের উদ্ভব ও উন্নতির সহিত একের প্রাগভাবের সামঞ্জস্য কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে? প্রাচীন ভারতে যখন অন্যান্য সর্ব্বশাস্ত্রেরই

উদ্ভব ও উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়, তখন শুদ্ধ ইতিহাসেরই প্রাগ্‌ভাব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

চতুর্থতঃ। সকলেই জানেন বিখ্যাত সম্রাট্‌ আকবরের আবুল ফজল্‌ নামে এক মন্ত্রী ছিলেন। ইনি প্রাচীন ভারতের এক খানি ইতিহাস লিখেন এই ইতিহাস হয় স্বকপোলকল্পিত, নয় প্রকৃত-ঘটনা মূলক। যদি স্বকপোলকল্পিত হইত তাহা হইলে তৎকালে কখনই ইহা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া আদৃত হইত না; বিশেষতঃ তাদৃশ সত্যপ্রিয় সম্রাটের কখনই অনুমোদিত হইতে পারিত না। সুতরাং বলিতে হইবেক নিশ্চয়ই ইহা প্রকৃত ঘটনামূলক। যদি প্রকৃতঘটনা-মূলক হইল, তবে আবুল্‌ ফজল্‌ সেই সকল উপকরণ-সামগ্রী কোথায় পাইলেন? নিশ্চয়ই তাঁহাকে এক বা বহু প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিতে হইয়াছিল, নতুবা তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

অনুমান প্রমাণ হইতে আমরা এক্ষণে নিশ্চিততর প্রত্যক্ষ প্রমাণে অবতীর্ণ হইতেছি। প্রথমতঃ, খ্রীষ্ট সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ভারতে আগমন করেন। ইহাঁর নাম হিউএন্‌ স্যাঙ (Hiouen Thsang) ইনি একজন বৌদ্ধ পুরোহিত, বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান ও সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থল মগধ পরিদর্শন করাই তাঁহার এই আগমনের উদ্দেশ্য ছিল। ইনি অসাধারণধীশক্তি-সম্পন্ন, অসামান্য-প্রতিভাশালী ও অতিশয়-সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে পঞ্চদশ বৎসর ভারতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তিনি সংস্কৃতের অনুশীলনে, বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক সকলের অনুবাদে, এবং সেই প্রকাণ্ড আর্য্যজাতির রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের অধ্যয়নে নিমগ্ন ছিলেন। এই গভীর ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণের পর তিনি ভারতভ্রমণবৃত্তান্ত নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। মসো ষ্টানিস্‌লাস্‌ জুলিয়ান্‌ (Monseur Stanislas Julien) নামক একজন ফরাশিস্‌ এই গ্রন্থখানি ফরাশিভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ভারতের পুরাবৃত্ত বিষয়ে অনেক আলোক বিকীর্ণ করে। তিনি লিখিয়াছেন পুরাকালে ভারতের প্রতি রাজসভায় একজন করিয়া লেখক নিযুক্ত থাকিতেন, যাঁহাকে সেই রাজসম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে হইত। এই লিখিত বিবরণগুলি নীলপীঠ নামে আখ্যাত হইত। অতীত ঘটনাবলীর এই সকল বিবরণ ইতিহাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ পাঠকগণ সকলেই বোধ হয় চাঁদ কবির নাম শুনিয়া থাকিবেন। যে পৃথুরাজ হিন্দুনরপতিগণের শেষ শৃঙ্খল ছিলেন, যে পৃথুরাজ স্বদেশীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য থানেশ্বর সমরে আত্মদেহ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, চাঁদ সেই শেষ হিন্দু

সম্রাটের সহচর ও নিয়োজিত কবি ছিলেন। এই চাঁদ কবি যবনদিগের সহিত পৃথুরাজের সমর বিষয়ে এক অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাজাদিগের যুদ্ধ বিগ্রহাদির পদ্যে বর্ণনা যে শুদ্ধ চাঁদ কবি একাই করিয়াছিলেন এরূপ নহে; তিনি অন্যান্য অনেক কবির নাম করিয়াছেন যাঁহারাও তাঁহার ন্যায় এই ব্রতে দীক্ষিত ছিলেন। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে রাজাদিগের যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিবরণ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত করার প্রথা পুরাকালে ভারতে বিশ্বজনীন ছিল। এই ছন্দোবন্ধে গ্রথিত যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণ ইতিহাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে? প্রত্যুতঃ পুরাকালে সকল দেশেই যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিবরণ ছন্দোবন্ধে গ্রথিত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎকালে ইহাই প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া পরিগৃহীত হইত।

তৃতীয়তঃ, চাঁদ ও অন্যান্য কবিকর্ত্তৃক ছন্দোবন্ধ-গ্রথিত ইতিহাস ভিন্নও আরও অনেক প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পাণিনির সমসাময়িক কাত্যায়ন প্রণীত বৃহৎ-কথা, ঋষিগণ-প্রণীত নীলপুরাণ, সোমদেব ভট্ট প্রণীত কথাসরিৎসার, কহ্লন ও প্রাজ্যভট্ট প্রভৃতি প্রণীত রাজতরঙ্গিণী, এবং কর্ণাট হইতে কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার ঘটিত বিবরণাবলী-গ্রথিত বিশ্বগুণাদর্শ—প্রধান। রাজতরঙ্গিণী চারি খণ্ডে বিভক্ত; ইহাতে পাণ্ডবদিগের সমকালীন রাজা গোনন্দ হইতে সাহআলম্ বাদসাহ পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের আনুপুর্ব্বিক ইহিবৃত্ত লিখিত আছে। বৃহৎকথায় অসংখ্য রাজবৃন্দের কথা লিখিত আছে। কথাসরিৎসাগর বৃহৎকথার সার-সংগ্রহ মাত্র; ইহাতে বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি অনেক নৃপতির ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। নীলপুরাণে পাণ্ডবদিগের পরবর্ত্তী নরপতি-বৃন্দের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। এই কয়েকটী প্রকাণ্ড ধ্বংশাবশেষ কি প্রমাণ করিতেছে না যে পুরাকালে ভারতে রীতিমত ইতিহাস ছিল?

চতুর্থতঃ, আর একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে 'ইতিহাস' শব্দের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনতম ঋক্‌বেদ হইতে আধুনিক কাব্য পুরাণ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যেই 'ইতিহাস' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'ইতিহাস' শব্দ অতীত ঘটনাবলীর বিবরণ ভিন্ন অন্য অর্থে যে প্রযুক্ত হইত এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ প্রাচীনতম অভিধান অমরকোষে ইতিহাস শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে—'ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তঃ' অর্থাৎ অতীত ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণের নামই ইতিহাস। সুতরাং এই অসন্দিগ্ধ অর্থে যখন ইতিহাস শব্দ সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন প্রাচীন আর্য্যদিগের যে রীতিমত ইতিহাস ছিল তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে যদি প্রাচীন আর্য্যদিগের রীতিমত ইতিহাস ছিল, তবে

তাহার বিলয় সাধন কিরূপে হইল? যদি ইহার উত্তরে বলা যায় যে যবনদিগের আক্রমণ সময়ে সে সমস্ত তাহাদিগের কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে; তাহা হইলে এই উত্তরের এই বলিয়া খণ্ডন হইতে পারে যে যখন নানাশাস্ত্র-বিষয়ক অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ যবনদিগের করকবল হইতে পরিরক্ষিত হইয়া আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তখন কেবল ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইল কিরূপে?

আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বাবু সুরেন্দ্রনাথ তদীয় বক্তৃতায় এই জটিল প্রশ্নের যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন তাহা আমাদিগের নিকট অতি সমীচীন বোধ হওয়ায় আমরা তন্মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম। তিনি বলেন যে পুরাকালে যাঁহারা প্রবহমান বা অতীত ঘটনাবলীর বিবরণ লিখিতেন, তাঁহারা রাজগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন, এবং রাজধনাগার হইতে তাঁহাদিগের বেতন প্রদত্ত হইত। সুতরাং তাঁহাদিগের লিখিত "নীলপীঠ" বা ঘটনা-বিবরণ রাজকীয় অন্যান্য কাগজ পত্রের সহিত হয় রাজপ্রাসাদে নয় দুর্গ-মধ্যে পরিরক্ষিত হইত। এই রাজপ্রাসাদ বা দুর্গ যবনদিগের আক্রমণের মধ্য-বিন্দু-স্বরূপ ছিল। সুতরাং তদন্তর্গত বহু-মূল্য রত্নাদির সহিত এই অমূল্য কাগজ পত্রও আক্রান্ত বিলুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এই কারণে ও ব্রাহ্মণদিগের ঐহিক বিষয়ে স্বভাবসিদ্ধ অনবধানতা বশতঃ ভারতের পুরাবৃত্তের মূল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

কোন কোন বৈদেশিক ইতিবেত্তা ভারতের পুরাবৃত্ত ছিল ইহা স্বীকার করিয়া তাহার অসম্পূর্ণতা বিষয়ে কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের জিজ্ঞাসা—সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ফরাশি বিপ্লবের পূর্ব্বে ইউরোপীয় ইতিহাসের কি অবস্থা ছিল? প্রত্যুতঃ ফরাশি বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ভীষণ জ্ঞান-সংঘর্ষ বা জ্ঞান বিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সংঘর্ষ ও বিপ্লব হইতেই আধুনিক পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত ইতিহাসের উৎপত্তি। ইহার পূর্ব্বে ইউরোপীয় ইতিহাসের অতি শোচনীয় অবস্থা ছিল। অধিক কি ইউরোপে ইতিহাস ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

যাহা হউক ভারতের পুরাবৃত্ত অসম্পূর্ণই হউক আর দুষ্প্রাপ্যই হউক, তাহার অনুশীলন যে আমাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে তাহা বোধ হয় প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। যাঁহার হৃদয় ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হয়, তাঁহার এক মাত্র শান্তি-স্থল ভারতের পুরাবৃত্ত—ভারতের অতীত মহিমা। যাঁহারা ভারতকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চাহেন, ভারতের পুরাবৃত্তের অনুশীলন তাঁহাদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য। জাতীয় অতীত মহিমায় আপনাদিগকে স্ফীত করিবার জন্য নহে, কিন্তু পিতৃ কীর্ত্তিতে আপনাদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য, পতনের কারণ অনু-

ধাবন পূর্ব্বক প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগের জন্য। রোগ নির্ণয় না হইলে ঔষধ প্রয়োগ বিফল। ভারতের অসংখ্য অধিবাসী যে অসহ্য কষ্ট যন্ত্রণা পাইতেছে, যে রোগে তাহারা অস্থি চর্ম্মাবশেষ হইয়াছে, তাহা এক দিনের পাপের ফল নহে; তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে সুদূর পশ্চাতে গমন করিতে হইবে। ভারতের পুরাবৃত্তের অনুশীলন ব্যতীত ভারতের সঞ্জীবন অসম্ভব। সুতরাং প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ও প্রত্যেক সংস্কারকের ভারতের পুরাবৃত্তের অধ্যয়নে নিমগ্ন হওয়া সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য।

ভারতের সঞ্জীবন কার্য্যের নিমিত্ত ভারতের পুরাবৃত্তের অনুশীলন যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ ভারতের আধুনিক ইতিবৃত্ত পাঠও সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য্য। ভারত এক্ষণে বৈদেশিক শাসনের অধীন। বৈদেশিক রাজনীতি দ্বারা ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর অদৃষ্টচক্র নিরন্তর পরিভ্রমিত হইতেছে। বৈদেশিক রাজনীতি দ্বারা ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর জাতীয় চরিত্র সংগঠিত হইতেছে। সুতরাং সেই বৈদেশিক রাজনীতি বুঝিতে না পারিলে আমরা আমাদিগের অদৃষ্ট-চক্রের গতি অনুধাবন করিতে পারিব না; আপনাদিগের নিজ জাতীয় চরিত্রের সম্যক্ অন্তর্ভেদ করিতে পারিব না। কিন্তু স্বদেশীয় ইতিহাসের অধ্যয়ন ব্যতীত আমরা কখনই এই বৈদেশিক রাজনীতির মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিব না। সুতরাং স্বদেশীয় ইতিহাস পাঠই আমাদিগের সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এক দিকে যেমন ভারতের পুরাবৃত্ত লুপ্তপ্রায়, তেমনই অন্য দিকে আবার ভারতের আধুনিক ইতিবৃত্ত বৈদেশিক হস্তে সংগঠিত। বৈদেশিকেরা অনেক সময় ইহাতে ইচ্ছানুরূপ বর্ণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই জন্য ভারতের আধুনিক ইতিহাস অনেক সময় অতিরঞ্জিত বা অসত্য বর্ণে রঞ্জিত হইয়া পড়ে। সুতরাং তৎপাঠে আমাদিগের ইতিহাস পাঠের প্রকৃত ফল দর্শে না। এই অতিরঞ্জন বা অসত্য বর্ণে রঞ্জনের দুটি কত উদাহরণ সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতায় প্রদান করিয়াছেন। তাহা আমরা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম।

মরে এবং সিউএল্ প্রভৃতি সাহেব বলেন অন্ধকূপ-হত্যার অধিনায়ক সিরাজুদ্দৌলা। কিন্তু বাস্তবিক সিরাজুদ্দৌলা অন্ধকূপ-হত্যা ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও লিপ্ত ছিলেন না। সকলেই জানেন,যে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুন ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ সিরাজুদ্দৌলার আক্রমণে পতিত হয়। দুর্গ অধিকারের পর হল্ ওয়েল্ ও এক শত ষট্ চত্বারিংশৎ তদীয় সহচরবৃন্দ ধৃত হইয়া হস্ত-পদ-বদ্ধ অবস্থায় নবাবের সম্মুখে আনীত হন। নবাব তাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্র দয়ার্দ্র চিত্তে তাঁহাদিগের বন্ধন মোচন করিতে আদেশ দেন এবং তাঁহাদিগকে

এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে তাঁহাদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করা হইবে না। এই আদেশ ও আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া নবাব শয়ন-শিবিরে প্রবেশ করেন। নবাবের প্রস্থানের পর ধৃত ব্যক্তিদিগের রজনী-বাসের উপযোগী গৃহের স্থিরীকরণ লইয়া তদীয় কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৪৬ জন লোক বিনা কষ্টে রজনী যাপন করিতে পারে, ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের ভিতর এমন একটী প্রশস্ত গৃহ পাওয়া গেল না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্ম্মচারীগণ দুর্গকারাকেই এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করিল। এই ক্ষুদ্র গৃহটীর আয়তন অষ্টাদশ বর্গ পাদ মাত্র। ভীষণ নিদাঘকালের ভীষণতম রজনীতে এই সঙ্কীর্ণ গৃহাভ্যন্তরে সেই শতাধিক ষট্‌চত্বারিংশৎ ইংলণ্ডীয় ধৃত পুরুষ মেষপালের ন্যায় নিক্ষিপ্ত ও অবরুদ্ধ হইল। এই নৃশংস ব্যাপারের ভীষণ পরিণাম পাঠকমাত্রই বিদিত আছেন। রজনী প্রভাত হইল, প্রাতঃসূর্য্যের শুভ্র রশ্মিমালি ধীরে ধীরে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যে হৃদয়বিদারি দৃশ্য দেখাইল, তাহা বর্ণনার অতীত। সেই ভীষণ রজনীর অসহ্য যন্ত্রণা প্রচার করিবার জন্যই যেন সেই ১৪৬ জন লোকের মধ্যে ২৩ জন মাত্র জীবিত ছিল। এই শোচনীয় ঘটনা শ্রবণ বা পাঠ করিয়া যাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়, যাহার নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত না হয়, আমরা তাহাকে মানুষ বলিতে পারি না। যে নরাধম নবাব-কর্ম্মচারিগণ অবরুদ্ধদিগের ক্রন্দনে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারা নরকের কীট। যতদিন মানবস্মৃতিপটে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড জাগরূক থাকিবে, ততদিন সেই নরাকার পিশাচদিগের নাম তাহাতে রুধিরাক্ষরে লিখিত থাকিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ভীষণ রাক্ষসদিগের সহিত সিরাজুদ্দৌলার নাম কেন মিশ্রিত করিব? সিরাজুদ্দৌলার সহস্র দোষ থাকিলেও এ ব্যাপারে তাঁহাকে কেন সংশ্লিষ্ট করিব? সিরাজুদ্দৌলা কারারুদ্ধদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে আদেশ দেন এবং তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করেন। যে ব্যক্তি কারারুদ্ধদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া অভয় প্রদান করেন, তাঁহা হইতে তাঁহাদিগের তাদৃশ নিদারুণ হত্যা অসম্ভবনীয়। সিরাজুদ্দৌলা ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে পারিতেন, ইচ্ছা করিলে শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে নির্যাতন করিতে পারিতেন। শৃঙ্খলমোচন পূর্ব্বক অভয় প্রদান করিয়া সেরূপ নৃশংস ব্যবহার করায় তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল? তবে এই বিতর্ক উঠিতে পারে, সিরাজুদ্দৌলা তাদৃশ পাষাণহৃদয় কর্ম্মচারীদিগের গুরুতর পাপের গুরুতর দণ্ডবিধান করিলেন না কেন? এই বিতর্কের একই উত্তর একই মীমাংসা। সিরাজুদ্দৌলা অপরিণতবয়স্ক ও আশৈশব দুর্বিনীত তাবকমণ্ডলী পরি-

বেষ্টিত। এরূপ যুবকের হৃদয়ে নীতিশাস্ত্রের সূক্ষ্মতম ভাব সকল অঙ্কিত হইতে পারে না। আর এরূপ সামান্য অপরাধে সিরাজুদ্দৌলাকে নৃপতিকুলাধম বলিতে হইলে আমরা ভীষণতর গ্লেঙ্কো হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মকে মানব-নামের যোগ্য বলিয়াই মনে করিব না।

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণের ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে দ্বিতীয় ভ্রান্তিস্থল শীক-যুদ্ধ। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বলেন দ্বিতীয় শীক যুদ্ধের জন্য শীকেরাই একমাত্র দায়ী। তাহাদিগেরই কৃতঘ্নতা ও রাজবিদ্রোহিতার শাস্তি দিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের রাজ্য পঞ্জাব আত্মসাৎ করেন। শীকেরা ব্রিটিশ সিংহের সংরক্ষণী শক্তির আশ্রয়ে বাস করিতেছিল। তাহারা সেই শক্তির আশ্রয়ে বাস করিয়া তাহার বিরুদ্ধে রণখ্যাপন করিল। সেই রণে তাহারা পরাস্ত হইল। ইহার অনিবার্য্য পরিণামস্বরূপ পঞ্জাব ব্রিটিশ সিংহের করকবলিত হইল। অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকের মত অন্যরূপ। তিনি বলিবেন দ্বিতীয় শীকযুদ্ধের জন্য শীকেরা যেমন দায়ী, ইংরেজেরাও তেমনই দায়ী। শীকেরা বিনা উত্তেজনায় এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহাদিগের উত্তেজনার কারণ তিনটী। (১) বিধবা রণজিৎ-মহিষী মহারাণী ঝিন্দনকুমারীর নির্ব্বাসন; (২) মহারাজা দলীপসিংহের বিবাহের দিন স্থির করণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অসম্মতি, এবং (৩) রাজা শেরসিংহের পিতা সর্দ্দার ছত্রসিংহের নির্য্যাতন। এই সকল ঘটনায় শীকদিগের মনে প্রতীতি জন্মিল যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রক্ষাব্যপদেশে তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ পূর্ব্বক ক্রমে সমস্ত পঞ্জাব আত্মসাৎ করিয়া লইবেন। এই ভয়ে তাহারা রণমত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন ইংরাজ ইতিহাস-লেখক শীকযুদ্ধের এই প্রকৃত ও গূঢ় কারণের উল্লেখ করেন নাই।

অযোধ্যার আত্মসাৎ করণসম্বন্ধে আর একটী ঐতিহাসিক ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন যে মুসলমান নবাবের অধীনে অযোধ্যা অতিশয় কুশাসিত হইয়া আসিতেছিল, এই জন্য ব্রিটিশ সিংহের সংরক্ষণী শক্তি বাধ্য হইয়া তাহাকে করকবলিত করিল। কিন্তু অযোধ্যার কুশাসন, ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদিগের কল্পনা-সম্ভূত, প্রকৃত-ঘটনা-মূলক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ অযোধ্যা যদি কুশাসিত হইত, তাহা হইলে অযোধ্যার অধিবাসীরা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া সন্নিকৃষ্ট ব্রিটিশ রাজ্যে বাসার্থে অবশ্যই যাইতে পারিত। কিন্তু জেনারেল আউটরাম তদীয় অযোধ্যা ব্লুবুক নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে 'আমি মাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট পত্র লিখিয়া অবগত হইয়াছি যে অযোধ্যা হইতে জনস্রোত ব্রিটিশরাজ্যাভিমুখে আসে নাই; যদি অযোধ্যা বাস্তবিকই কুশাসিত বা উৎপীড়িত হইত, তাহা হইলে

নিশ্চয়ই ইহার অধিবাসীরা ব্রিটিশ-সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিত।"* অযোধ্যা যে ব্রিটিশরাজ্য অপেক্ষা অধিকতর কুশাসিত হইত না তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। (১) ১৮০১ খৃষ্টাব্দে, লর্ড ওয়েলেসলী অযোধ্যার কিয়দংশ ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। কর্ণেল্ স্লীমান বলেন, যে সকল জমিদার-বংশ নবাবের অধীনে অক্ষত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল. ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তাহাদিগের চিহ্ন মাত্র রহিল না। অবিশ্রান্ত নির্য্যাতনই এই পূর্ণ বিলোপের একমাত্র কারণ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রিটিশ রাজ্যের সুশাসন ও অযোধ্যার কুশাসন সম্বন্ধে আমাদিগের সংস্কার সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। (২) মিষ্টার হার্মান্ মেরিভেল সার হেন্‌রী লরেন্‌সের জীবনচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন—"অযোধ্যার পরিমাণ ২৫, ০০০ বর্গমাইল অর্থাৎ প্রায় হলণ্ড ও বেলজিয়মের সমান। ১৮৪৫খৃষ্টাব্দে লরেন্স ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ইহার তিন কি চারিবৎসর পরেই আবার নির্ণীত হয় যে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৮০ লক্ষ (অর্থাৎ বেলজিয়ম ও হলণ্ডে প্রতি বর্গ মাইলে যত লোকসংখ্যা)। আবার ১৮৬৯। ৭০ সালের ব্লুবুক্ নামক ভারতবর্ষের উন্নতিবিবরণে ইহার অধিবাসিসংখ্যা ১, ১৫,০০,০০০ (অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে ৫০০ শত) বলিয়া নির্ণীত হয়। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধ জনিত ভীষণ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই বিপ্লবকেন্দ্র অযোধ্যার লোকসংখ্যা এরূপ তাড়িত বেগে কখনই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেনা। সুতরাং অপক্ষপাতিতার সহিত বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওন কালে অযোধ্যা সমৃদ্ধিশালী লোকপূর্ণ ও বাণিজ্যবহুল ছিল।" * (৩) বিশপ হিবার ১৮২৫-২৫খৃষ্টাব্দে তদীয় অযোধ্যা ভ্রমণ বিষয়ক বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "অযোধ্যার কুশাসন ও দুরবস্থাবিষয়ে আমরা অনেক শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু আমি দেখিয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইলাম যে অযোধ্যার একটী ক্ষেত্রও অকৃষ্ট নাই।" (৪) মিষ্টার শোর তদীয় ভারত-বিবরণে লিখিয়াছেন "অযোধ্যার কুশাসন ও তজ্জনিত দুরবস্থা-বিষয়ক মত লক্ষ্ণৌস্থিত রেসিডেণ্টদিগের অতিরঞ্জিত বিবরণ হইতেই সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু আমি স্বয়ং অযোধ্যার অনেক স্থল ভ্রমণ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে অযোধ্যার সর্ব্বত্রই বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতেছে। যদি অযোধ্যা বাস্তবিকই কুশাসিত ও উৎপীড়িত হইত তাহা হইলে কৃষি ও বাণিজ্যের এরূপ অবস্থা কখনই উপলক্ষিত হইত না।"* এই সকল বৈদেশিক ইতিবেত্তৃগণ দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে যে অযোধ্যা দেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কুশাসিত হয় নাই। তবে আত্মসাৎ করণের বৈধতা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কুশাসনের ছল তুলিয়াছিলেন।

* Oude Blue Book .p. p. 44 by General Outram.

* Herman Marivale's Life of Sir Henry Lawrence Vol. II. pp. 288.

* Shore on Indian affairs Vol. I. pp. 152—156.

সাময়িদ্ জাতি।

ধর্ম্মবিশেষ, আচার বিশেষ, সকলেই এই মত ঘোষণা করিয়া থাকে যে তদনুবর্ত্তী হও হাতে হাতে স্বর্গ পাইবে; অননুবর্ত্তী হও নরকে যাইবে। শুধু এখানে ক্ষান্ত নহে, তৎসহ পুনঃ নিয়ন্তার নাম যোজিত করিয়া আত্মবিধি দৃঢ়ীকৃত করিয়া থাকে, পালক তাহাতে ভীত হয়, নেত্রনিবদ্ধ ভাবে যথা প্রদর্শিত পথে বিনা বাক্যব্যয়ে গমন করিয়া থাকে। নিয়ন্তার কি এই ইচ্ছা, বিধি কি এবম্ভূত? বুঝিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তবে সঙ্কেত-শূন্য, ইঙ্গিতশূন্য, এ অস্থিত পঙ্ককে মানবীয় বুদ্ধিকে হাবু ডুবু খাওয়াইয়া নিয়ন্তার কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাহা তিনিই জানেন, আমরা জানিনা, বুঝিতে পারিনা। যদি ধর্ম্মবিশেষ, আচার-বিশেষ, নিয়ন্তার একান্তই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সমগ্র জগৎ এক প্রকৃতির, সমস্ত মানব একস্বভাবের, সমস্ত ঐশ্বরিক মায়া ও অবতার সর্ব্বজনীন, সর্ব্বকালীন ও সর্ব্বব্যাপী করিলেন না কেন? তাহা হইলে শুধু বুঝিতে পারিতাম তাহা নহে, পৃথিবী স্বর্গভূমি হইত, শোক তাপ পাপ অবিশ্বাস প্রভৃতি অসুখের মূলীভূত কারণ সমূহ ক্ষণমাত্র পৃথিবীতে স্থান পাইতনা। যখন এ জগতে এরূপ ভাবেরও অভাব, তখন এইমাত্র বুঝিতে পারি যে যথা প্রকৃতি যথা স্বভাব ও তদুৎপন্ন যথারীতি, জীবনলীলা নির্ব্বাহ করিলেই জীবনকার্য্যের প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইহার পরে সুখাতিরেক মুখ্য উদ্দেশ্য, তদভাবে জীবনকার্য্য একরূপ বিফল বলিতে হইবে; যদি তাহা চাও, তবে জগৎ-বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন স্বাভাবিক জীবন-তত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক সামঞ্জস্য বিধান দ্বারা সাধারণ জীবনতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া, তদ্দ্বারা বিচালিত হও। এখানেও অভীষ্টসাধন পক্ষে নিয়ন্তা যদিচ অস্থিত পঙ্ককে ফেলিয়াছেন বটে, কিন্তু এ অস্থিত পঙ্কক সঙ্কেত-শূন্য, ইঙ্গিত-শূন্য নহে।

আধুনিক ইউরোপীয়দিগের অনেকেই কিয়ৎ পরিমাণে এ সাধারণ জীবন-তত্ত্বের তত্ত্বী, তাই তাঁহাদিগের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি। আমাদিগের অব্যবহিত পূর্ব্বগত পূর্ব্বপুরুষদিগের এ তত্ত্ব-পরিজ্ঞান একেবারে ছিল না বলিতে হইবে। তাঁহাদিগের আত্মদেশ-নিবদ্ধ দর্শন সমক্ষে সীমান্তর্বর্ত্তী ত্রিকোণময়ী ভারতভূমিতেই সমগ্র পৃথিবীর সমাবেশ হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট পার্শ্বস্থ ভূমিই পুণ্য ভূমি, তাহাতে আবার যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, তাহাই দেবানুগৃহীত ও যাজ্ঞিক স্থান। তদ্ব্যতীত আর সমস্ত অস্থান, অগম্য, ভয়াবহ বা তদ্রূপ, বাহ্য জগতের অন্তর্ভূত প্রাকিলেও তদ্বহির্ভূত এবং মানবীয় সংস্রবের অতীত; অথবা যে সকল বৃক্ষ, বৃক্ষ বা

একপদ, এককর্ণ ইত্যাদি জীবের আবাস এবং কিন্নর মিথুনের বিচরণ স্থল। প্রাচীনেরা বহির্জগৎ হইতে এতদূর ছেদ-সম্বন্ধ ছিলেন যে, নিয়ন্তার নিয়ম বশে এবং তাঁহার রোষ তোষের সমবশবর্ত্তী হইয়া, এই পৃথিবী-মণ্ডল ব্যাপিয়া মানবীয় স্রোত নিরন্তর পরিভ্রামিত ও বিচালিত হইতেছে এবং অনুরূপ কার্য্যে অনুরূপ ফলোৎপাদন করিতেছে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধিতেই কখন আসিত না। তাঁহাদের আত্ম-প্রকৃতি দৃষ্টে জীবন-কার্য্যের সমস্ত তত্ত্ব নিরূপিত হইত। তাঁহারা তদনুসারে চলিতেন এবং অপরকে কোন গতিকে প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে চালাইতে বাধ্য করিতেন। তাঁহারা যে ইহা কুমনে করিতেন তাহা নহে, সুমনে করিতেন; দোষ তাঁহাদের নহে, কিন্তু কার্য্যোৎপাদিকার মূল ভাগে; কিন্তু তাঁহারা তাহা সঙ্কীর্ণ দর্শন বশতঃ দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা জানিতেন না যে এরূপ নিরূপিত তত্ত্ব কার্য্য কারণ বশে সর্ব্বজনীন না হওয়ায়, উৎকর্ষাভিলাষী সহচরবর্গের প্রভায় সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সংসার মরুতে শোষিত ও লোপ-যোগ্য হইয়া থাকে এবং তত্ত্ব-প্রতিপালকেরা কালক্রমে হীনতার পরাকষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ স্থানভেদে প্রকৃতি-ভেদ, প্রকৃতি-ভেদে শীতাতপ-ভেদ, শীতাতপ-ভেদে বস্তু-ভেদ, বস্তু-ভেদে মানবীয় প্রকৃতি-ভেদ, মানবীয় প্রকৃতিভেদে সমাজ ও ধর্ম্ম-তত্ত্বভেদ, যথায় যথায় এই সকলের সামঞ্জস্য করিয়া জীবনতত্ত্ব নিরূপিত না হইল, সে তত্ত্বের প্রয়োজন নাই, তাহা সর্ব্বজনীন ভাবে হৃদয়-গ্রাহক ও সাধারণ হয় না, তাহার প্রতি সকলের সহানুভূতি জন্মায় না, তাহা ফলে মঙ্গলকর হয় না। দেখ, তুমি বঙ্গসন্তান, তোমার পক্ষে তোমার জাতীয় অখাদ্য-ভোজন-নিষেধ নিতান্ত দোষের নহে, বরং মঙ্গলকর, কিন্তু অনুকূল-দেশস্থ তদ্রূপ অখাদ্য-ভোজীকে যদি ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ না কর, ঘৃণা কর, সংস্পর্শে আসিতে না দেও, তাহা দোষের। এ দোষ প্রাকৃতিক, পারলৌকিক ও কি না তাহা ধর্ম্ম জানেন, এপ্রস্তাবে পারলৌকিক দোষ গুণের কোথাও বিচার হইতেছেনা। যাহাহউক, প্রত্যেক বিষয়ের এইরূপ দোষ যথায় যথায় পরিহার হইয়া থাকে, তথায় তথায় জীবনতত্ত্ব সর্ব্বজনীন, এবং সেই তত্ত্ব অনুচরেরা মঙ্গল পথে প্রধাবিত হইয়া অচিরে ফল লাভে সমর্থ হয়। তুমি এই জগতের হিত কার্য্যে রত হও; এবং জগৎকে তোমার কার্য্যে নিয়োজিত কর, অভীষ্টলাভ হইবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য অনুধাবনের পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতীয় জীবনের সমালোচনা আবশ্যক। তাহাতে পুণ্য আছে।

আজিকার প্রস্তাবে আমরা ভারতের সহ সর্ব্বপ্রকারে সম্বন্ধ-বিহীন এবং পৃথিবীর দূরপ্রান্ত-নিবাসী একটি নগণ্য জাতির জীবন-তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পৃথিবীর অতি উত্তর প্রান্তে হীম সমুদ্র তীরে সাইবিরিয়া নামে এক দেশ আছে।

এই দেশের উত্তরভাগ প্রায় চির-নিহারা-বৃত্ত বৈধব্য-ধবল-বেশময় বিস্তৃত ক্ষেত্র, এখানে উদ্ভিজ্জাবলী অতি বিরল ও ক্ষুদ্র-তর, কেবল মাত্র কোথায় ক্ষুদ্র গুল্ম, কোথায় ঈষদুন্নত বৃক্ষ মূর্ত্তিমান্ হ্রাসতা-রূপে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দেশ নিস্তব্ধ, ভীষণ ও ভয়ানক, অন্তর যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া ইঁহাকে স্বক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ ইহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতেছেন। প্রকৃতি সতী বস্তুতঃ এখানে চিরবৈধব্য-বেশে কালাতি-পাত করিয়া থাকেন। ইহার মূর্ত্তি শীতা-গমে সহস্র গুণে ভীষণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন ইহা দেখিতে বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর। দিক্ সমস্ত তমসাচ্ছন্ন, রাত্রি-মান অসম্ভব পরিমাণময় ও নিরন্তর নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কেবল মধ্যে মধ্যে অরোরা বোরিয়েলিস নামক উত্তর কেন্দ্রস্থ বৈদ্যুতাগ্নিভাসে কদাচ কদাচ প্রতিভাসিত হইয়া দিক্ সকল ঈষৎ আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। এই সময়ে নিরন্তর তুহিন-পাতে পৃথিবী আকুলিত এবং শৈত্য কম্পিত হইয়া থাকেন। উদ্ভিজ্জাবলী একে বিরল, আরও বিরলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, গুল্ম-বলী বরফে প্রোথিত হইয়া অস্তিত্ব-শূন্য হয়, বৃক্ষাবলী একে ক্ষুদ্র, তাহাতে এক্ষণে অর্দ্ধপ্রোথিত, হিমানীপাতে পল্লবদল শ্বেতবর্ণতা লাভ করায়, সমস্ত প্রদেশ নিবীড় শ্বেতভূমিরূপ প্রতীয়মান হয়। এসময়ে জীব নাই, জন্তু নাই, জীবকণ্ঠ-নির্গত শব্দ নাই, সকলেই নিদ্রাভিভূত; কেবল উত্তরকেন্দ্রজাত দক্ষিণবাহী ভীষণ শীতবায়ুর শন্ শন্ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় এবং মধ্যে মধ্যে শীতাগমে বিদেশ-গমনোন্মুখ বিহঙ্গরবে দিগ্বলয় সুপ্ত-চমকিত হইয়া থাকে। এই দেশে ঋতুভেদ দুইপ্রকার, শীত ও শরৎ। অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী। শরদাগমে প্রকৃতির এই ভীষণ মূর্ত্তি কিয়দংশে দূরীভূত হয়। তখন দিক্ সকল কথঞ্চিৎ পরিষ্কার হইতে থাকে, বরফরাশি কিয়দংশ বিগলিত হইয়া প্রোথিত গুল্মাবলী পুনঃ প্রকাশিত করিয়া থাকে, এবং বিটপ-দেহে কৃষ্ণকায় পল্লব-পুঞ্জ হিমানীমুক্ত হইয়া প্রকাশমান হয়। বরফ-আস্তরণে শৈবালদল উদ্ভূত হইয়া, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত ক্ষুদ্রকায় নানা পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া, বৈধব্যবেশিনী প্রকৃতিকে যেন তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কথঞ্চিৎ অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। উষ্কামুখী শ্বেত-ভল্লুক প্রভৃতি জীবকুল চকিতবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আহারান্বেষণে বিচরণ করে। বন্য হরিণের পাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। এসময় দেখিতে একরূপ নেহাত মন্দ নহে। এই প্রকৃতিময় প্রদেশ সমূহকে তন্দ্রা কহে।

এই স্থান আমাদের দেশের সহ যদি তুলনা করা যায়, তবে আত্ম-প্রকৃতি দৃষ্টে অবশ্যই বিবেচনা করিব যে এস্থান কখনই মনুষ্যের বাস-যোগ্য নহে, এবং এখানে কখন মনুষ্য চিরবাস স্থাপন পূর্ব্বক তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার

কৌশল অপরিসীম, এখানেও মনুষ্য বাস স্থাপন পূর্ব্বক তোমার ন্যায় আহ্লাদ, আমোদ, শোক, দুঃখ, বিলাস, কলা, কৌতুকাদি বিস্তার করিয়া মানবীয় শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই সাইবিরিয়া দেশের উত্তর প্রান্তে এবং ইউরোপীয় রুসিয়ার উত্তরখণ্ডে, শ্বেতসমুদ্রের পূর্ব্ব তীর হইতে ইনিসী নদীর পশ্চিম তট পর্য্যন্ত সমগ্র তন্দ্রা প্রদেশে সাময়িদ্ নামে একজাতীয় মানব বসতি করে। ইহারা দেখিতে ক্ষুদ্রকায়-ঈষৎ ধূম্রাভ ও পীতবর্ণ। ইহাদের ওষ্ঠ স্থূল, চক্ষু ক্ষুদ্র, ললাটদেশ অল্পায়তন ও নিম্ন। গণ্ডাস্থি অতিশয় উচ্চ, নাসিকা এত চাপা যে অগ্রভাগ গণ্ডাস্থির সহ সম সূত্রস্থ। ইহাদের শ্মশ্রু বিরল-উদ্ভূত, কিন্তু মস্তকের কেশাবলী ঘন, কৃষ্ণ এবং কর্কশ। ইহারা স্বভাবতঃ যদিও কুরূপ কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সাধারণ মানবীয় স্বভাবের বিপরীতে বেশভূষা প্রভৃতি দ্বারা তাহার উন্নতিকল্পে সর্ব্ব প্রকারে যত্ন-বিহীন। স্ত্রীলোকেরা যতদিন অবিবাহিত থাকে, ততদিন স্ত্রীর উন্নতি করিবার নিমিত্ত বেশভূষার প্রতি কথঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু একবার বিবাহ হইয়া গেলে জাতীয় শিথিলতায় গা ঢালিয়া দেয়।

ইহাদের আকৃতি যেরূপ, রুচি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। রুচি যতদূর কদর্য্য হইতে পারে, তাহাই। ইহাদের আহার্য্য মৎস্য এবং হরিণ-মাংসই প্রধান, কিন্তু উভয়ই ইহারা বিনা পাকে কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করে। ইহাদের ঘ্রাণ-শক্তি এত ক্ষীণ যে যত বড় দুর্গন্ধই হউক না কেন, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র অসুখ বোধ নাই। এই নিমিত্ত অগ্রাহ্য ভাবে তাহাদের গৃহের চতুষ্পার্শ্বে চর্ম্ম, মাংস বা অন্ত্রাদি নিরন্তর পচিতে দেখা গিয়া থাকে।

মানবীয় মনোবৃত্তি বহিঃপ্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, এবং তাহার পরিমাণ অনুসারে সুখ দুঃখ মায়া মমতা প্রভৃতি বৃত্তি-সমূহ পরিমিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সাময়িদেরা এই দূর স্থানে বাস হেতু শিক্ষা অভাবে এবং আত্ম-শিক্ষার অপকর্ষ হেতু নিরন্তর অজ্ঞানতায় ও আহার্য্য-বিরলতায় সর্ব্বদা দুঃখ ও ক্লেশে বিদ্ধ, এজন্য ইহারা জীবনের উপর এক প্রকার মমতা-শূন্য। বস্তুতঃ ইহাদের এ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহাতে জীবনের উপর ইহাদের মমতা জন্মিতে পারে, এ নিমিত্ত ইহাদের আকৃতি ও মুখশ্রী সর্ব্বদা ম্লান এবং স্বভাব ম্রিয়মাণ। ইহাদের প্রকৃতি তাহা বলিয়া নিতান্ত অসৎ নহে। ইহাদের পূর্ণ মূর্খতা হেতু সত্যাসত্য, ও সদসদ্ জ্ঞান যদিও অতি সামান্য, কিন্তু নিষ্ঠুরাচার, ক্রূর কর্ম্ম হেতু বিপক্ষ পক্ষে প্রতিবিধান চেষ্টা, বা ভয়ঙ্কর পাপ-ক্রিয়া সকল ইহাদের মধ্যে নিতান্ত বিরল বা একেবারে নাই বলিলেই হয়। ইহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা-গুণ অপরিসীম, হৃদয় অকৃতজ্ঞ নহে, ইহাদের

কেহ কোন আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে দুঃখী প্রতিবেশিবর্গের সহিত অংশ না করিয়া আহার করে না। কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত, তাহা ইহাদের দোষ নহে, পদপদে দলিত ও প্রতারিত জাতি মাত্রেরই এই দশা। এরূপ ঘোরতর-মূর্খতা-পূর্ণ জাতি মাত্রেরই আশু উন্নতি কল্পে এক মাত্র সভ্যজাতির সংস্রব ফলপ্রদ। কিন্তু ইহাদের প্রভু যাহারা, ও ইহারা যে সভ্যজাতির সংস্রবে আসিয়া থাকে, তাহারা কেবল ব্যবসাদার রুসিয়ান্। এই রুসিয়ানদিগের দ্বারা সামইয়িদেরা এতদূর প্রপীড়িত প্রতারিত ও উত্ত্যক্ত হইয়া থাকে যে, তাহাদিগের দ্বারা যদিও কখন সামইয়িদ্‌দিগের মঙ্গল-কল্পে কোন সৎকার্য্য কৃত হয়, তাহাও ইহারা প্রতারণা ও প্রপীড়নের পন্থা বলিয়া তাহার প্রতি অবিশ্বাস এবং তাহা যত্ন পূর্ব্বক পরিহার করিয়া থাকে। সুতরাং এ সভ্যজাতির সংস্রবে ইহাদের কোন উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং স্বাভাবিক সদ্‌গুণ গুলির বহুলাংশ দূষিত হয়।

ইহাদের ধনবত্তা অবস্থা-অনুরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি বা গৃহস্থের ভোগ দখলে বন্য হরিণের সংখ্যা অনুসারে ধনী বা নির্ধনী নির্ব্বাচিত হয়। যাহার যত সংখ্যক আছে সে সেই পরিমাণে ধনী। ইহারা আর্কেঞ্জেল ও পস্তসিরস্ক প্রভৃতি স্থানের বাৎসরিক মেলায় পশুচর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা কখন কখন বিনিময়ও ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু হতভাগ্যেরা এস্থানে রুসিয়ান্ ব্যবসাদার দ্বারা অপরিমিত ভাবে প্রতারিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, সাধারণতঃ শিকারই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের কি শ্রবণেন্দ্রিয় কি দর্শনেন্দ্রিয় উভয়ই অতিশয় তীক্ষ্ণ থাকায়, এবং বাহুর স্থিরতাবশতঃ ইহারা শিকারে অতিশয় পারগতা দেখাইয়া থাকে। ইহাদের অস্ত্রের মধ্যে ধনুর্ব্বাণ প্রধান, কিন্তু তাহা অতি কৌশল সহকারে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা দৌড়িতেও অত্যন্ত পটু। ইহাদের শ্বেত ভল্লুক শিকার অতি কৌতুকাবহ। ইহাদের এরূপ জ্ঞান আছে যে শ্বেত ভল্লুক যদিও পশুর আকার-বিশিষ্ট, কিন্তু সেই পশ্বাকারের মধ্যে লোকাতীত জ্ঞান ও দর্শন অবস্থান করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত তাহারা অন্তরের সহিত ভল্লুককে ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকে এবং ভল্লুক-শিকারে যাইবার পূর্ব্বে বহুবিধ রূপে তাহার স্তুতিবাদ করিয়া তবে পদক্ষেপণ করে। ইহাদের এরূপ বিশ্বাস যে মনুষ্য গোচরে অগোচরে যাহা কিছু করে, ভল্লুক তাহা সকলই জানিতে পারে, সুতরাং তাহার স্তুতিবাদ না করিলে অসন্তুষ্ট হইয়া সে শিকারিকে উল্‌টিয়া হত করিতে পারে। ভল্লুকের দ্বারা কেহ হত হইলে, জন্তুর প্রতি ভক্তি-বিহীনতা বা স্তুতিবাদে অযুক্তি, কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ ভ্রান্তিতে যে কেবল সামইয়িদেরা দোষী তাহা নহে। সাইবিরিয়ার উত্তর-

প্রান্ত-নিবাসী প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই এইরূপ। তন্মধ্যে-ওস্তয়াক নামক জাতির মধ্যে শ্বেত ভল্লুকের প্রতি ভক্তি এত প্রবলা যে, ইহারা প্রথমে তাহার যথা রীতি পূজা না করিয়া তৎ-শিকারে বাহির হয় না। আবার শিকারিরা যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকে, ততক্ষণ স্ত্রীগণ চিৎকার স্বরে ভল্লুকের মহিমা গান করে এবং ভল্লুকের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে যেন তিনি শিকারিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়েন। যখন শিকারিরা শিকার সহ ফিরিয়া আইসে, তখন স্ত্রীগণ ভল্লুকের মহিমা গান করিতে করিতে বহুদূর অগ্রগামী হইয়া তাহাদিগকে লইয়া আইসে। তৎপরে যথা রীতি ভল্লুকের মাংস বন্ধু বান্ধব সহ মিলিয়া আহার করে।

সাময়িদ্‌দিগের গৃহকার্য্য যথা নিয়মে সম্পন্ন হয়। পিতা গৃহ-স্বামী, আর সমস্ত তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। এবং গৃহস্বামী নাবালগদিগের জীবন মরণের কর্ত্তা। রুসিয়ার অধিকারে এ ক্ষমতার এক্ষণে অধিকাংশ লোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও যাহা আছে, তাহা অন্যান্য স্থানের তুলনায় অপরিমিত। ইহাদের বিবাহ কার্য্য অতি কদর্য্য, এ নিমিত্ত স্ত্রীলোকের অবস্থা ইহাদের মধ্যে অতিশয় হেয়। কন্যার বিবাহ কালীন যৌতুক দান কাহাকে বলে, তাহা ইহারা স্বপ্নেও কখন অবগত নহে। বিবাহ কালীন কন্যাকে কিছু দেওয়া দূরে থাকুক, বরং কন্যা গৃহান্তর হইলে গৃহকার্য্যের যে কিছু ক্ষতি হইবে, তাহার পূরণ প্রত্যাশা করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত জামাতাকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়া আত্ম-স্ত্রী ক্রয় করিতে হয়। এরূপ ক্রয়-কার্য্যের দ্বারা স্ত্রীর উপর স্বামীর অপরিমিত ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে, এমন কি স্ত্রীর জীবন মরণ স্বামীর রোষ তোষের উপর নির্ভর করে। ইহারা আত্ম-স্ত্রী হত্যাকে এতদূর সামান্য অপরাধ মনে করে যে, একদা এক জন সাময়িদ্‌ স্ত্রী-হত্যার অপরাধে রুসিয়া আদালতে আনীত হইলে, সে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রকাশ করে যে, সে স্ত্রী-হত্যা দ্বারা এমন কি দোষ করিয়াছে যে তদ্দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালতে আনীত ও দণ্ডনীয় হইতে পারে, কারণ সে যখন যথোপযুক্ত মূল্য দানে আপন স্ত্রী ক্রয় করিয়াছে তখন সে স্ত্রীর রক্ষণে বা বধ সাধনে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার। ফলতঃ অসভ্য জাতি মাত্রেই স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশা পশুবৎ, এবং পুরুষগণ কর্ত্তৃক অতি নিকৃষ্ট ভাবে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আবার অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এবং উত্তর মার্কিণ দেশস্থ ডগ্‌রিব্‌ ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির দুরবস্থার চরমাবস্থা।

যে সকল বিজ্ঞ চূড়ামণিরা মনে করেন যে, এই পৃথিবীতে যদি আইন আদালত না থাকিত তবে মানবসমাজ উচ্ছিন্ন যাইত, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং একদেশ-দর্শী। অসভ্যজাতি মাত্রে দেখ আইন আদালতের সম্পর্ক মাত্র নাই। অর্দ্ধ-সভ্য প্রাচীন জর্ম্মাণ জাতির মধ্যেও ছিল না,

কিন্তু তাহাতে তাহাদের কি ক্ষতি? যদি এক মাত্র চিত্ত-প্রসাদই সুখের পরিমাণ হয়, তাহা হইলে তোমাপেক্ষা এক জন নিকৃষ্ট অসভ্য অধম হইবে না। যদি অপরাধের প্রকৃতি এবং অপরাধীর সংখ্যা সামাজিক উৎকর্ষ অপকর্ষের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলেও এক জন নিকৃষ্ট অসভ্য তোমাপেক্ষা অপকৃষ্ট হইবে না। আইন আদালতের আবশ্যকতা না আছে এমন নহে, কেবল সভ্যতা-যুক্ত সমাজেই তাহার আবশ্যকতা। অপরাধের বৃদ্ধি সহ তাহার নিবারণ-উপায় নিত্য এবং বহুতর সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং পর পর যত বৃদ্ধি হয়, সেই উপায় পর পর ততই কঠোরতর হয়। কিন্তু যেখানে যেখানে এরূপ বুদ্ধির অভাব, এবং সমাজ অক্লিষ্ট, তথায় তথায় সামান্য মাত্র উপায়ে শান্তি রক্ষণ হয়,—এরূপ সমাজে যে অপরাধের সংখ্যা অতি সামান্য, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর তোমার সমাজ?—তোমার সমাজ যে অত্যন্ত অপরাধি তাহার প্রমাণ তোমার আইন আদালত। সভ্যতার সহ পাপ-স্রোত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সভ্যতা যেমন লৌকিক এবং মানবীয়; তদ্দ্বারা বৃদ্ধ পাপও সেইরূপ অপ্রাকৃতিক এবং তন্নিমিত্ত অপ্রাকৃতিক উপায় স্থাপনও আবশ্যক। ইহা বলিয়া কি সভ্যতা নিন্দনীয় বলিবে, যদি বল, তবে তুমি এক-দেশদর্শী। মুষ্টি মাত্র স্বর্ণ-রেণুতে মলভাগ অতি সামান্য এবং সাধারণ রকমের, তাহার পরিষ্করণেও অল্প যত্ন প্রয়োগ করিলেই কার্য্য সুসাধিত হয়, কিন্তু এখানে যেমন মলভাগ অল্প, রত্ন-ভাগও সেইরূপ অল্প। আর দেখ স্বর্ণরেণু যদি পর্ব্বত-প্রমাণ হয়, তাহার মলভাগও সেইরূপ বেশি এবং বিকট রকমের এবং তাহা পরিষ্কারার্থে নানাবিধ যন্ত্রেরও আবশ্যক; কিন্তু সে সকলই কষ্ট-দায়ক ও কষ্ট-সাধ্য হইলেও রত্নাধিক্যে প্রার্থনীয়। যাহা হউক সমাজ যথায় সঙ্কীর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত অকলুষিত, তথায় অপেক্ষাকৃত প্রাকৃতিক শাসনেই শান্তি রক্ষণ হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক শাসন দৈবে ভর ও ভয়। ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত-স্থল সাময়িদ্‌দিগের অপরাধের প্রতিবিধান-প্রণালী। ইহাদের মধ্যে গুপ্ত অগুপ্ত সর্ব্ব-প্রকার অপরাধ শপথের দ্বারা প্রতিবিধানিত হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অপরাধী বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করে, তাহা হইলে তাহাকে শপথ দিবার জন্য প্রতিপক্ষ ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার। সাক্ষ্য দ্বারা দোষ সপ্রমাণের রীতি নাই। শপথের দ্বারা দোষ সপ্রমাণ হয় এবং যে দোষী সাব্যস্ত হয়, সে অপরাধের পরিমাণ অনুরূপ মূল্য প্রদান করিয়া মুক্তি লাভ করে। ইহাদের শপথকরণপ্রণালী এইরূপঃ—যদি কাষ্ঠ বা প্রস্তর-নির্ম্মিত কোন দেবমূর্ত্তি নিকটে না থাকে, তাহা হইলে প্রতিপক্ষ ব্যক্তি মৃত্তিকা বা বরফের দ্বারা একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, তাহার নিকট একটি কুক্কুর বলি দান পূর্ব্বক যথা রীতি পূজা করিয়া, অপরাধীর প্রতি কহে "তুমি যথার্থ

অপরাধী হও, তাহা হইলে স্বীকার কর, নতুবা তুমিও এই কুক্কুরের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।” অতঃপর অপরাধী সর্ব্বজ্ঞ ভল্লুকের চর্ম্মে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক শপথ করিয়া থাকে। ইহাদের মিথ্যা কথায় বড় ভয়, এ ভয় পরলোকের দুঃখাতিরেক আশঙ্কায় নহে, তাহাদের বিশ্বাস আছে যে মিথ্যা কহিলে হয় তাহাদের বিকট মৃত্যু হইবে, নতুবা তাহাদের হরিণ চুরি যাইবে; এ নিমিত্ত যথার্থ অপরাধী যাহারা, তাহারা প্রায় আত্মদোষ অস্বীকার করে না।

সাময়িদ্‌দিগের ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সামান্য। ইহাদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার হইতে ক্রটি হয় নাই, এবং খৃষ্টানও অনেক হইয়াছিল, কিন্তু নামে মাত্র। কার্য্যত ইহারা সর্ব্ব প্রকারে প্রাচীন ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাদের সর্ব্বপ্রধান দেবতার নাম নুম বা জিলিবিয়াম্‌বিয়ার্ত্তজি (Jilibiambœrtji), এই দেবতা বায়ু-মণ্ডলে বাস করেন, বিদ্যুৎ ও বজ্র ইহাঁর অস্ত্র, রামধনু ইহার অঙ্গবস্ত্রের উপান্তভাগ। এই দেবতা মনুষ্য হইতে এত অন্তরে অবস্থান করেন, যে দূরত্ব হেতু মনুষ্যের শুভাশুভ সাধন করা ইহাঁর পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। এ নিমিত্ত সাময়িদেরা ইহাঁর প্রতি কি প্রর্থনা কি পূজা কিছুই প্রদান করে না ও কোন খোজ খবরই লয় না। নুম্‌ব্যতীত অপরাপর ক্ষুদ্র দেবতা অনেক আছেন, তাঁহারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের শুভাশুভ বিধান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা মানবের আবশ্যক বোধে প্রার্থনা বা পূজার দ্বারা বা যাদুগুণে বশীভূত হইয়া অভীপ্সিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সাময়িদেরা এক পার্থিব আবশ্যক না পড়িলে ইহাঁদিগের কোন তত্ত্বই লয় না।

সাময়িদ্‌দিগের প্রধান দেবমূর্ত্তি বেগাৎস নামক দ্বীপে স্থাপিত আছে। এই মূর্ত্তি একটি বৃহৎ প্রস্তর, ইহার ঊর্দ্ধভাগে মোচাগ্রবৎ কোণাকারে মস্তক ও মুখ। সাময়িদেরা এ নমুনা অনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সকল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিকট রাখে, এবং হরিণ-চর্ম্ম ও রংরঞ্জিত বস্ত্র বা চর্ম্মখণ্ড দ্বারা সুশোভিত করিয়া থাকে। ইহাদের স্থান হইতে স্থানান্তর গমন কালিন যদি এই মূর্ত্তির কোনটি বেশি ভার বোঝা বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে পথিমধ্যে কোন স্থানে তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়, এরূপ পরিত্যক্ত দেবতা যেখানে পড়িয়া থাকে তাহাও দেবস্থান মধ্যে গণ্য হয়। এরূপ পরিত্যক্ত দেবতাকে সাদারি বলে। যে যে মূর্ত্তি বহন-সুলভ হয়, তাহাদিগকে হোহি কহে। প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক অনুযায়ী তাহার নিকট তত সংখ্যক দেবতা থাকে। কোনটি হরিণের পাল সুরক্ষিত হওন কামনায়, কোনটি উপাসকের স্বাস্থ্য কামনায়, কোনটি দাম্পত্য প্রণয় বন্ধন কামনায়, কোনটি উপাসকের জাল মৎস্যে পরিপূরণ কামনায়, ইত্যাদি অর্থে স্থাপিত, রক্ষিত ও পূজিত হইয়া

থাকে।—কোনটি হরিণের পাল সুরক্ষিত হওন কামনায়, কোনটি উপাসকের স্বাস্থ্য কামনায়, কোনটি দাম্পত্য প্রণয় বন্ধন কামনায়, কোনটি উপাসকের জাল মৎস্যে পরিপূরণ কামনায়, ইত্যাদি অর্থে স্থাপিত, রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। এই সকল দেবতার পূজা নিত্য হয় না, আবশ্যক অনুযায়ী দেবতা বিশেষ ঝুলি হইতে বাহির হইয়া উপাসিত হয়। আবশ্যক পূরণ হইলে, আবার ঝুলিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া আর পাঁচ দ্রব্যের সহ অতর্কিত ভাবে পড়িয়া থাকে। পূজার পদ্ধতি এইরূপ। পূজার সময় ঝুলির বাহির করিয়া মূর্ত্তিটিকে নিকটস্থ কোন বৃক্ষতলে স্থাপিত করা হয়, তাহার মুখ তৈল ও রক্তের দ্বারা ম্রক্ষিত হয়, তৎপরে তাহার সম্মুখে এক পাত্র কাঁচা মৎস্য স্থাপন পূর্ব্বক যথা অভীপ্সিত বস্তুর কামনা সহ উপাসনা কার্য্য শেষ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত দেবতাগণ ব্যতীত, আরও বহুতর অনিষ্টকারী দেবতা আছেন, ইহাঁরা কেবল যাদুকার্য্যের দ্বারা বশীভূত হইয়া দুষ্ট স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ ফল প্রদান করেন।

ঘোরমূর্খ সামগ্নিদ্দিগের উপরিউক্ত মত দৈবে বিশ্বাস, তদ্দ্বারা সমাজ পরিচালন এবং উৎকৃষ্ট খৃষ্টধর্ম্মে অনাস্থা, এতৎত্রয়ে আমাদিগের কি অনুভূত হয়? ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন, নিত্য নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে পটু মানসিক বৃত্তি বিশিষ্ট মনুষ্য সমাজে যদি ধর্ম্মবন্ধন না থাকিত, তবে এসংসারে না জানি কি বিশৃঙ্খলাই ঘটিত, হয়ত মনুষ্যজাতি এতদিন পৃথিবী হইতে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইত। মনুষ্য হইতে অধম জীব পশুমধ্যে গণ্য, পশুদিগের তাদৃশ মানসিক বৃত্তির অভাব বলিয়াই ধর্ম্ম বন্ধন না থাকিলেও তাদৃশ বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং যথা বিচালিত ভাবে তাহাদের জীবন-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। মানবজাতির এ ধর্ম্মবন্ধন ভ্রমবন্ধন হইতে পারে; কিন্তু এ ভ্রম সুখের, শুভসাধক, কল্যাণকর! যাহা মানবজীবন-প্রবাহ পক্ষে কল্যাণকর, প্রকৃতি যাহার বিরুদ্ধবাদিনী নহে, তাহাইত সত্য। প্রকৃতি অসত্য সহনে অপটু, অসত্যের আবির্ভাব হইলে তখনই তাহার প্রতিকারে উদ্যত। কিন্তু কখনও দেখিলাম না যে প্রকৃতি ধর্ম্মবন্ধন রূপ ভ্রমের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে, বরং ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার সপক্ষতাচরণ করিয়া থাকে। অতএব এ ধর্ম্মবন্ধনকে ভ্রম না বলিয়া সত্য বলিতে ক্ষতি কি? সত্যই ঈশ্বর। যে চক্রের মধ্যবিন্দু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান্, সেণ্ট আগ্স্তিন্ তাহাকেই ঈশ্বর পদের বাচ্য করিয়াছেন। সে ঈশ্বর সত্য, সত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মানবীয় ধর্ম্মবন্ধনের মূল জনসমূহ সজ্ঘটনে প্রতিজ্ঞা বন্ধনের ফল বা শিক্ষকের শিক্ষাদ্বারা উদ্ভূত নহে, উহা প্রাকৃতিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা বিশেষ দেবতায় বিশ্বাস লৌকিক কারণ হইতে উৎ-

পন্ন হয় নাই, মনোমধ্যে লোকাতীত শক্তির অস্তিত্ববোধই উহার মূল, উহা হইতে ধর্ম্মবন্ধন উৎপন্ন হইয়াছে। ডারবিনের মতে এ লোকাতীত শক্তির অস্তিত্ববোধ আদিম মানবের স্বপ্নদর্শন ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। হইতে পারে তাহাই, কিন্তু সে আদিম কাল নিরেখ হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সে সময়ের এ বিষয় নিরূপণ কেবল প্রমাণ-শূন্য অনুমানের দ্বারা। এরূপ শূন্যগর্ভ অনুমানের দ্বারা চিরপোষিত ও বিশ্বাসিত বিষয়ের অপলাপ করা আবশ্যক বোধ করি না। সে যাহা হউক বর্ত্তমানে এই পৃথিবীতে যত জাতি মানব বসতি করে, উচ্চ-হইতে অধমতম সকল জাতিতেই কোন না কোন আকারে লোকাতীত শক্তির অস্তিত্ব বোধ বিরাজিত আছে। পাদ্রি দব্রিসফায় প্রভৃতি অনেকানেক প্রচারক ও ভ্রমণকারীবর্গ বলিয়াছেন যে তাঁহারা এমন অনেক অসভ্য জাতি দেখিয়াছেন, যাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বর-বাচক কোন শব্দের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু ইহা কোথাও বলেন নাই, যে লোকাতীত শক্তিতে বিশ্বাস-শূন্য মানবজাতি কোথাও দেখিয়াছেন। আমাদের বোধশক্তির অনুরূপ ঈশ্বরকে তাহারা চিনেনা বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অনেকানেক অলৌকিক দেবতা বা ভূতের উপাসনা বা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এক্ষণে যত হীন প্রকৃতির মানব এ জগতে বাস করে, তন্মধ্যে ফিজি-দ্বীপবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম এবং পশু হইতে অতি অল্পই বিভিন্নতা-যুক্ত, তাহাদের মধ্যেও, মঙ্গলময়, ঈশ্বর যদিও অপ্রচারিত, অমঙ্গলময় দেবতার বহুলতা দেখা গিয়া থাকে। সভ্যতম সমাজে প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক নাস্তিকের কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত নাস্তিক আছে কিনা সন্দেহ। সন্দিগ্ধ-চেতা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত নাস্তিক হয় না ইহা বোধ হয়। যে নাস্তিক বলিয়া যাহারা আপাততঃ ভান করিয়া থাকে, কোন দুরন্ত বিপদে তাহা রক্ষা করিতে পারে না, হইতে পারে ইহা বাল্যশিক্ষার ফল। অতএব বলিতে হইবে যে স্বপ্ন হইতেই হউক আর যে কারণেই হউক, মনুষ্য-বংশের উৎপত্তিদিন হইতে অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এ জগতে একাধিপত্য করিতেছে। এই বিশ্বাস হইতেই সমাজ এবং সমাজের উন্নতি অনুসারে ধর্ম্মবন্ধন উদ্ভব ও পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

মানবের মানসিক উন্নতি বা অবনতি অনুসারে ধর্ম্মভাব ও দৈবে বিশ্বাস উন্নত বা অবনত ভাব প্রাপ্ত হয়। উহা অবস্থা ভেদে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমে মনুষ্যময় স্বচ্ছন্দস্থ অমঙ্গলকর দেবতায় বিশ্বাস। মন্দ কার্য্য করাই এসকল দেবতার বৃত্তি, কেবল উপাসনা বা যাদুবশে বশীভূত হইয়া তাহাতে নিরস্ত থাকে বা শুভ ফল দেয়। ইহা ঘোর মূর্খতাময় পশুবৎ আদিম সমাজের ধর্ম্ম। লোকচরিত্র এবং দেবচরিত্র একই ছাঁচে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সামাজিক শান্তিরক্ষণে

এক্ষণে একমাত্র ভয়ই কার্য্যকর। দ্বিতীয় অবস্থায় ভয় ও ভক্তি, তৃতীয়তে ভক্তি, পরে ভালবাসা, তাহার পরে জগৎকে আত্মাধার জ্ঞান, ইহাই চরম মানসিক বৃত্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধির উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। মানব-চিত্তের উৎকর্ষও উক্ত বিভাগ সহ সহানুভূতি বশতঃ পঞ্চবিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। উভয়ের সম পর্য্যায় পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন, তদন্যথায় সম্মিলন অসম্ভব। যে মানসিক উৎকর্ষে হীন তাহাকে কোন উচ্চরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রদান কর, কিন্তু সেই হীনোৎকর্ষ মানব যতক্ষণ সে তত্ত্ব আপন সমতায় না আনিবে ততক্ষণ তাহার ক্ষান্তি নাই, সুতরাং সে তত্ত্বের হীনতা সাধন করে, বলিতে হইবে। পুরাতন বাইবেল অনুসারে ঈশ্বর স্বয়ং বারম্বার ভয় প্রদর্শন, উত্তাক্ত উত্তেজনা করিয়াও, য়িহুদি জাতির পৌত্তলিকতা নিবারণ করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে মূলপ্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। সামযিদ্‌দিগের নষ্টবুদ্ধি দেবতা দিগকে যাদুদ্বারা বশ করিবার নিমিত্ত যাহারা নিয়োজিত হয়, তাহাদিগকে তাদিবী বলে। ইহাদের কার্য্য আমাদিগের দেশীয় ভূতের ওঝার ন্যায়। ইহারা হরিণ-চর্ম্ম এবং রক্ত বস্ত্রে ভূষিত হইয়া, ঢক্কারব ও গীত দ্বারা দেবতার আবির্ভাব কামনা করিয়া থাকে। ক্ষণেক এইরূপ করিয়া সমস্ত নিস্তব্ধ হয় এবং সেই সময় তাদিবীর সহ দেবতার কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। কখন কখন ইহারা দীপ নির্ব্বাণ পূর্ব্বক অন্ধকার মধ্যে আগত দেবাতকৃত অদ্ভুতপূর্ব্ব শব্দ ও নানাবিধ দৌরাত্ম্য দেখাইয়া থাকে।

যাহারা তাদিবী, তাহারা বংশ-পরম্পরা ঐ কার্য্য করিয়া থাকে। অপরাপর ব্যক্তিও আবশ্যকমত নিয়ম রক্ষা করিলে তাদিবী হইতে পারে। নিজ্জর্ন স্থানে বাস, নিরন্তর বিভীষিকা চিন্তা, রাত্রি জাগরণ, উপবাস, মাদক সেবন ইত্যাদি দ্বারা শরীর সংশোধন করিতে হয়। তৎপরে যখন তাহার মনে প্রত্যয় হয় যে সে বস্তুতই দেবতাদের সাক্ষাৎ পাইয়া থাকে, তখন সমাদর পূর্ব্বক কোন এক নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে নিজ্জর্ন স্থানে ঢক্কারব ও বিবিধ দেবতা মহিমাগণ মধ্যে তাদিবী শ্রেণীতে গৃহীত হয়। তাদিবীরা সচরাচর দেখিতে রক্তচক্ষু, তীব্রদৃষ্টি, অস্থিরপদে গতি এবং নিস্তব্ধ ও ম্রিয়মাণ। হৃত হরিণের অনুসন্ধান, কোন সংক্রামক পীড়া নিবারণ, অধিক পরিমাণে মৎস্য প্রাপণ বা কোনরূপ পীড়া নিবারণার্থে তাদিবীর সাহায্য গৃহীত হয়। পীড়া উপস্থিত হইলে, সামযিদেরা তাদিবীর দ্বারা ভূত ঝাড়ান ভিন্ন অপর কোন প্রকার ঔষধ প্রাণান্তে গ্রহণ করিবে না। শারীরিক নিয়মভঙ্গে রক্তদূষিত হইলে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা আহারা বুঝে না। তাহারা জানে যে কোন অপরাধ হেতু কোন দেবতা তাহাদের এরূপ শারীরিক ক্লেশ দেয়,

সেই দন্ত ক্লেশই পীড়া, সুতরাং ঝাড়ান প্রভৃতি উপায় দ্বারা সে দেবতাকে বশীভূত না করিলে কেমন করিয়া সে পীড়ার উপশম হইতে পারে? এ বিশ্বাস কেবল এখানে নহে, দক্ষিণ-সমুদ্র-গর্ভস্থ প্রায় সমস্ত দ্বীপাবলীতেই প্রবল।

পরলোক সম্বন্ধে সামইদ্‌দিগের এরূপ বিশ্বাস যে কেবল তাদিবী ও যাহারা অপঘাত মৃত্যু সহ্য করিয়া থাকে, তাহাদের আত্মাই মৃত্যুর পরেও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না এবং বায়ুভর করিয়া ভ্রমণ করে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে এরূপ মৃতব্যক্তির আত্মা, জীবিতাবস্থায় যেরূপ, মৃত্যু অবস্থায়ও তদ্রূপ ক্ষুৎপিপাসা অভাব প্রভৃতির বশবর্ত্তী থাকে। এ নিমিত্ত ইহারা তদ্রূপ কোন ব্যক্তি মৃত হইলে, বরফময় ভূমিতে ভ্রমণের উপযুক্ত ডোঙ্গা, বল্লম, রন্ধনপাত্র, ছুরি ও কুঠার পরলোকে আবশ্যক হইবে বলিয়া ঐ ব্যক্তির দেহ সহিত ভূমিসাৎ করে এবং কয়েক বৎসর করিয়া এক একটি হরিণ সমাধিস্থানে বলি দেয়। যখন কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন তাহার সমাধিকালীন মহা সমারোহ হয়, এবং জীবিতাবস্থায় তিনি যেরূপ সম্মানিত ছিলেন তদ্রূপ সম্মান প্রদত্ত হয়। ইহার একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হয়, এবং প্রতি দিন ঐ মূর্ত্তির নিকট আহারীয় দ্রব্য প্রদান, উহার বেশভূষা করণ, এবং শয্যাশায়ী করণ প্রভৃতি জীবনের নিত্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইলে ঐ মূর্ত্তিও সমাধিসাৎ করা হয়।

এই জাতির প্রধান আমোদকর বস্তু প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ-বর্ণিত গীত শ্রবণ। এই গীত শুনাইবার নিমিত্ত জাতীয় কবি নিয়োজিত আছেন। যখন এই গীত আরম্ভ হয়, তখন নিয়োজিত কবি তাম্বুর মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করেন, এবং শ্রোতৃবর্গ চতুর্দ্দিকে তাহাকে ঘিরিয়া বসে। অনন্তর কবি, পূর্ব্বপুরুষগণ ওসিয়াক, তাতার প্রভৃতি জাতির সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল ও যুদ্ধে কিরূপ জয় পরাজয় লাভ করিয়াছিল, তাহা স্থল বিশেষে রসোদ্ভাবন-অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা গান করিতে থাকেন। শ্রোতৃবর্গ নিস্তব্ধ ভাবে শ্রবণ করে। গীত মধ্যে যখন শত্রুবর্গের ষড়যন্ত্রে নায়কের মৃত্যু ঘটনা হয়, তখন শ্রোতৃবর্গ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, ডাক ছাড়িয়া একেবারে চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে। আবার যখন শুনে যে নায়ক মৃত্যু দ্বারা শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বায়ুভর পূর্ব্বক মেঘমণ্ডল মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, তখন আর আনন্দের সীমা থাকে না, হরি ধ্বনি করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গসন্তান! বলিতে পার এ হতভাগ্য জাতিরা এরূপ হইল কেন?—ইহাদের জীবন-তত্ত্বের সহিত কি তোমাদের সহানুভূতি জন্মায়?

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরলোক ও সমাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মনুষ্যের পারলৌকিক বিশ্বাস পরীক্ষা করিতে গেলে ইহাতে, দুইটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস পরিদৃষ্ট হয়। পরলোকে পুণ্যের পুরস্কার হয় এবং পাতকের সমুচিত দণ্ড হয়। এই বিশ্বাসদ্বয় পারলৌকিক বিশ্বাসের নিদানভূত। পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের দণ্ড কিরূপ হয়, তাহা বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু সকল ধর্ম্মেই ইহলোকের সুকৃতির পারত্রিক মঙ্গলের আশা দিয়া জনসমাজকে প্রলোভিত করে এবং দুষ্কৃতির ফলাফল স্বরূপ পারলৌকিক অকল্যাণের ভয় প্রদর্শন করিয়া মানবগণকে উদ্বেজিত এবং পাপনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। অতএব প্রতি জনসমাজমধ্যে পারলৌকিক ভাব এই বিবিধ কার্য্য করিতেছে। ইহা একদিকে পুরস্কারের প্রলোভন দিয়া মনুষ্য-মণ্ডলীকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চাহে, অন্যদিকে পাতকের দণ্ড দেখাইয়া তাহাদিগকে ভয়চকিত এবং অসৎকার্য্য-নিবৃত্ত করিতে চাহে। জনসমাজে পারলৌকিক বিশ্বাসের এই দ্বিবিধ প্রভাব। এই দ্বিবিধ প্রভাবে সমাজের কতদূর ইষ্টানিষ্ট সাধিত হইয়াছে, অথবা জনসমাজে এই প্রভাবের শক্তি কতদূর, তাহাই নির্দ্ধারণ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ পারলৌকিক আশার প্রভাব; দ্বিতীয়ত পারলৌকিক ভয়ের প্রভাব। প্রথমতঃ পারলৌকিক আশায় উত্তেজিত হইয়া মনুষ্যগণ কতদূর সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সামাজিক সমাদর ও সম্মান প্রত্যাশা এবং যশোলিপ্সা যে মানবগণকে সৎকার্য্যে প্রধানতঃ প্রবৃত্ত করে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহলোকের সামাজিক পুরস্কারে মনুষ্যগণ যত প্রলোভিত ও উত্তোষিত হয়, পারলৌকিক আশায় ততদূর নহে। দশজনের মধ্যে আমি গণনীয় হইব, সকলেই আমাকে সাধু বলিয়া প্রশংসা করিবে, সকলের নিকট আমি আদরণীয় হইব, এবং সকলেই আমার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইবে এই ইচ্ছা প্রতিব্যক্তির মনে অত্যন্ত প্রবল। ইহা যত প্রবল অন্য সাধু ইচ্ছা তত প্রবল কি না সন্দেহ। দশজনের মধ্যে গণনীয় হইলে, সমাজ মধ্যে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইলে, অনেকের প্রীতিপাত্র এবং প্রশংসাভাজন হইলে, ইহলোকে জীবনযাত্রা যে প্রকার পরমসুখে এবং প্রভুত্ব সহকারে নির্ব্বাহিত হয়, অন্য উপায়ে বোধ হয় ততদূর হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে এই উপায় অবলম্বন করিতে অনেকেই তৎপর দেখা যায়। এই উপায়ে অনেকে জনসমাজ

মধ্যে উচ্চপদে আরোহণ করিতেছেন, অনেকে লোকমণ্ডলীর মধ্যে প্রধানতঃ প্রভুত্ব লাভ করিতেছেন এবং অনেকে সমাজের নায়ক ও সাধারণজনগণের নেতা স্বরূপ হইয়া আছেন। এই প্রকার উচ্চপদ, প্রভুত্ব এবং সামাজিক প্রভাব লাভের জন্য কি অনেকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত হইয়া উঠেনা? এমত কি, সাধুব্যক্তিগণ যে আত্মপ্রসাদে সুখী হইয়া থাকেন, সেই আত্মপ্রসাদ কি অধিকাংশ সাধারণ জনগণের সাধুবাদের উপর নির্ভর করে না? দশজনে যখন প্রশংসা করে, তখন আত্মহৃদয় মধ্যে যে আনন্দ উৎসারিত হয় তাহা কি মধুর ও অমৃতময় নহে? এই সমস্ত বলবৎ কারণে মনুষ্য সৎকার্য্যে স্বাভাবিকই নীত হন। তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের একবিধ উপায় যখন স্থিরীকৃত হয়, তখন তিনি পৃথিবীর যশের জন্য প্রার্থী হন; সাধারণজনগণের প্রতিষ্ঠাভাজন হইবার জন্য তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া কতই সামাজিক হিতকর ব্রতে এবং লোক-মণ্ডলীর মঙ্গল সাধনে ব্যাপৃত হয়েন। এই প্রবৃত্তি মনুষ্যকে সৎকার্য্যে কতদূর নিয়োজিত করে, তাহা প্রত্যেকেই নিজ অন্তরে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবেন। যিনি নিরপেক্ষভাবে আত্মহৃদয় এই রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার সাধুপ্রবৃত্তি সকল নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান সামাজিক মঙ্গলাশয়ে যেমত উত্তেজিত; সুদূরস্থ, ভবিষ্য পারলৌকিক শুভাকাঙ্ক্ষায় তত দূর উত্তেজিত নহে।

প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, এবং সমাদর লাভার্থ মানবকুল যেমন সর্ব্বদা ব্যাকুল ও সদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকে, আত্মশুভান্বেষণেও তদ্রূপ। অনেকে আপনার প্রতি ভদ্রব্যবহার প্রত্যাশায় অপরের প্রতি ভদ্র ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। অনেকে আপনার অসময়ে উপকার লাভার্থ আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এবং প্রতিবেশীর অসময়ে উপকার করিয়া থাকেন। পরস্পরের উপকার সাধন এবং পরস্পরের প্রতি সদাচার, জনসমাজের একটি সুদৃঢ় বন্ধন। মানবের প্রতি মানবের সহানুভূতি, সৎকার্য্য উৎপাদনের আর একটী কারণ। অপরের দুঃখ দেখিলে স্বভাবতই সকলের মনে পরদুঃখ-কাতরতা সমুদিত হয় এবং স্বভাবতই মানব সেই দুঃখ মোচনের জন্য হস্ত প্রসারণ করেন। এই স্থলে পারলৌকিক প্রভাব তত অনুভূত হয় না। যে স্থলে অনুভূত হয়, তাহা কেবল সুপ্রবৃত্তিকে অধিকতর উত্তেজিত করে মাত্র, কিন্তু তাহা সেই সুপ্রবৃত্তির প্রথম উৎপাদনের মূল কারণ নহে। মূল কারণ মানবীয় প্রকৃতিকেই বলিতে হইবে। প্রকৃতি স্বভাবতই সুপ্রবৃত্তিকে প্রণোদিত করিয়া দিলে, হয় পরলোকের ভাব আসিয়া তাহাতে যোগ দেয়, না হয় অন্যবিধ স্বার্থপরতা সেই প্রবৃত্তিকে কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া যায়। জনসমাজে যখন আমরা দেখিতে পাই, আত্মীয় স্বজন, কুটুম্ব, প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সক-

সেই পরম্পর পরোপকারে ব্রতী হইয়া আছেন, তখন তাহাদিগের মধ্যে কোন্ প্রবৃত্তি ও প্রবোধনা সমধিক প্রবলতর? পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশে এস্থলে কয়জন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন? এস্থলে কি দেখিতে পাই না মানবের সুপ্রবৃত্তি স্বাভাবিকই আত্মীয়তাভাবে সমবেদনায় সমুত্তেজিত হইয়া উঠে, পরে ভবিষ্য আত্মহিত চিন্তায় তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে যান? পারলৌকিক প্রভাব অনুভূত হয় কিনা সন্দেহ। যদি হয়, অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে।

ঐহিক মঙ্গলোদ্দেশেই সংসারীজনগণ সৎকার্য্যে অধিকাংশই প্রবৃত্ত দেখা যায়। পারলৌকিক সাত্বিকভাবে পরিপূর্ণ হইয়া মনুষ্য যে সমস্ত সৎকার্য্য করে সেরূপ সৎকার্য্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক ন্যূন। যে হেতু সাধারণ জনগণের পারত্রিক আশা তত প্রবল নহে। যাহা-দিগের নিকট এই আশা প্রবল, তাহা-দিগের নিকট ইহা সকল সময় এবং সর্ব্বা-বস্থায় ও প্রবল নহে। লোকে বৃদ্ধবয়সে পরলোকের প্রতি যত দৃষ্টিপাত করে, তরুণ বয়সের বিষয়োন্মত্ততায় তত করিতে পারে না। বার্দ্ধক্য কয়জনের ঘটিয়া থাকে? যাহাদিগের ঘটে তাহাদিগের মধ্যে কয়জন আবার পারলৌকিক সাত্বিক ভাবে পূর্ণ রহেন? যে কতিপয় সাধুপুরুষ জীবনের সর্ব্বাবস্থায় এবং সকলকালেই পারলৌকিক ভাবে পূর্ণ থাকেন তাহাদি-গের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তাহারা আবার একটি বিষম পাপে পরিলিপ্ত হয়েন; তাঁহারা সাধু ও ধর্ম্মশীল হইতে গিয়া একান্ত সংসারবিরাগী হইয়া পড়েন। পূর্ব্বকালে যে রূপ বিবেচিত হউক, বৈরাগ্যে যে মহা অধর্ম্ম আছে, তাহা একণে সর্ব্বজনেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

পারলৌকিক মঙ্গলাশয়ে জনসমাজ যে কখন প্রণোদিত হয় না আমরা একথা বলি না। সময়ে সময়ে এই ভাবের বিক্রম সাতিশয় প্রবল হইতে দেখা গিয়াছে। এক এক সময় জন সমাজকে ইহা উন্মত্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সেই উন্মত্ততায় পৃথিবীর যে অনিষ্ট সাধন হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। যদ্দ্বারা পৃথিবীর এত অনিষ্ট সাধন হয় সেই ভাবকে প্রবল হইতে দেওয়া উচিত কি না, অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশে মনুষ্য যে সমস্ত সৎকার্য্য সাধন করিয়াছেন তদ্দ্বারা যে পৃথিবীর ইষ্টসাধন হয় নাই, আমি এমত কথা বলি না; আমি বরং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, পুণ্যবানদিগের সৎকার্য্য-দ্বারা পৃথিবীর বিলক্ষণ ইষ্ট সাধন হই-য়াছে, জনসমাজের অনেক দুঃখের অপনোদন হইয়াছে, এবং অনেক কষ্টের মোচন হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও অবশ্য বলিতে হইবে যে ইহা-দ্বারা পৃথিবীর যেমন কথঞ্চিৎ মঙ্গল সাধন হইয়াছে তদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট সাধন হইয়াছে। ইহাদ্বারা পৃথি-

বীর যে অনিষ্ট সাধন হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে একাদিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। আমি আর ও প্রদর্শন করিয়াছি যে, যে সমস্ত সৎকার্য্য পারলৌকিক ভাবে আরোপিত করা হয়, তাহার অধিকাংশই মানবের অন্যান্য প্রবৃত্তি সম্ভূত হইবার কতদূর সম্ভাবনা এবং বাস্তবিকই তাহা হইয়া থাকে কি না তাহা প্রত্যেকেই বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব এই পারলৌকিক পুরস্কার আশায় পৃথিবীর সৎকার্য্যের বৃদ্ধি হইতেছে কি অনিষ্টের অধিকতর বৃদ্ধি হইতেছে তাহা এক্ষণে অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে।

মিল বলেন, পৃথিবীর মধ্যে যাহারা ধর্ম্মবীর বলিয়া গণনীয় হইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগকে সাধারণ জনগণ বিবেচনা করিয়াছেন যে তাঁহারা পারলৌকিক আশয়ে প্রলুব্ধ হইয়া অকাতরে ইহজীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কেবল পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন এবং অবশেষে বধ্যভূমিতে অনায়াসে দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ ও করিয়াছেন, সেই মহাত্মাগণের ধর্ম্মবীরত্বের যে গৌরব তাহার আমি অপ্রশংসা করিতে চাহিনা। আমি বলিতে চাহিনা তাঁহারা পৃথিবীর যশ প্রত্যাশায় প্রাণ অর্পণ ও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর যশপ্রার্থী হইয়া উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণ, (যাহারা অন্যকিছুতেই ধর্ম্মশীল বলিয়া পরিচিত হয়েন নাই) যে সমসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে লিখিত আছে। পৃথিবীর যশ প্রত্যাশা যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মবীরগণকে প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উত্তেজিত না করিয়া থাকে, তবে তাঁহারা যে কেবল পারলৌকিক সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ততদূর ত্যাগস্বীকার করিয়া গিয়াছেন আমি একথা ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিনা। এই প্রাণবলিদান কালে তাহাদিগের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহাকে এক প্রকার ধর্ম্ম-উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এই উন্মত্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া ছিলেন। তাহাদিগের মনে একটি ভাব তখন এত সুপ্রবল হইয়াছিল, যে সেই ভাবে নিমগ্ন হইয়া তাহারা প্রাণত্যাগকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মেতে এই উচ্চ ভাব উদিত করিয়া দেয় কেবল। ধর্ম্মেতে এরূপ উচ্চভাব উদিত করিয়া দেয় এমত নহে ; সকল মহৎ কার্য্যেই এই ভাব সঞ্চারিত করিয়া দেয়। মনুষ্যের ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন হইলে অমনি এই ভাবের উদয় হয় ; ইহার সহিত মনুষ্য নামের যে গৌরব আছে, সৎকার্য্যের মাহাত্ম্য এবং কার্য্যোপাধিকার যে প্রকার বৃদ্ধি হয় তাহাতে যে এই ভাব সমুৎপাদনে সহায়তা করেনা এমত বলিতে পারি না। ইহা সচরাচর সকল সময় বর্ত্তমান থাকে না ; ইহা কেবল মনুষ্যের পরীক্ষার সময় উদিত হ, এবং মনুষ্যনামের গৌরব বর্দ্ধন

করে*।

আমাদিগের প্রস্তাবের, একভাগ পরিসমাপ্ত হইল। আমরা এই প্রস্তাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। পারলৌকিক পুরস্কার-আশায় জনসমাজের কতদূর ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও মঙ্গল সাধন হইয়াছে তাহা এক ভাগের বিষয়; এবং এতক্ষণ আমরা সেই ভাগেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলাম। ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পারলৌকিক আশায় জনসমাজে অতি অল্প পরিমাণেই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন হইয়াছে এবং এই অল্প পরিমাণ ধর্ম্মোন্নতি সাধন জন্য জনসমাজ মধ্যে আনুষঙ্গিক সমধিক অকল্যাণেরই উদয় হইয়াছে। এক্ষণে পারলৌকিক ভাবের দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ। জনসমাজে পারলৌকিক ভাবের প্রভাব কত দূর অথবা পারলৌকিক ভাব দ্বারা পাপের কতদূর দমন হয় তাহাই আলোচিত হইতেছে। পৃথিবীর অতি প্রাচীন কালে লোকের বিশ্বাস ছিল, যে, ইহলোকেই পাপের সমুচিত দণ্ড হয়। যখন লোকে প্রকৃতিকেই দৈবীশক্তি মনে করিত, তখন প্রতি দুর্ঘটনাকে লোকে পাপের দণ্ড বলিয়া নিশ্চয় গণনা করিত। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল পাপ করিলে নিশ্চয় কোন দৈব অভিসম্পাতে পতিত হইতে হয়, হয়তো মৃত্যু আসিয়া অকস্মাৎ আক্রমণ করে, না হয় কোন অপ্রতিবিধেয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়, অথবা পুত্র-কলত্রবিহীন হইয়া দারুণ শোকাবেগে অনতিবিলম্বে অকালে জীবন যাত্রা পরিসমাপ্ত করিতে হয়। যখন এই প্রকার বিশ্বাস ছিল তখন লোকে সহসা পাপ-পথে পদার্পণ করিতে সাহসী হইত না। তখন লোকের পাপ-জ্ঞানও তত মার্জ্জিত ছিল না। কিন্তু লোকে যখন দেখিতে লাগিল অনেক ব্যক্তি পাপাসক্ত হইয়াও চিরজীবন সুখে এবং নিরুপদ্রবে অতিবাহিত করিয়া গেলেন তখন ক্রমশঃ লোকের ভ্রমদূর হইতেন লাগিল। ইহুদী জাতির ধর্ম্ম ইতিবৃত্তে এই বিষয় স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত করে। পুরাতন বাইবেল খুলিয়া দেখ, ইহুদীরা প্রথমে বিশ্বাস করিত প্রত্যেকের জীবিত কাল মধ্যেই তাহার পাতকের দণ্ড ভোগ হয়। ক্রমে এই দণ্ড পুত্র পৌত্রে অবনীত হইতে লাগিল। এই বিশ্বাসের অসারতা দিন দিন প্রতিপাদিত হইলে পাপের দণ্ড ভোগ পরকালে প্রচালিত হইল। ইহলোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে কৌশল পূর্ব্বক তাহা অপ্রত্যক্ষ পরলোকে অপসারিত হইল। মানবের চর্ম্মচক্ষু হইতে তাহা অপনীত হইয়া, জ্ঞানচক্ষুর বিষয়ীভূত করা হইল। প্রবল বিশ্বাস এই জ্ঞাননেত্রের দৃষ্টি শক্তি। ধর্ম্ম-বিশ্বাস সুরক্ষিত হইল বটে কিন্তু সেই বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য বিফল হইতে লাগিল। সেই পাপদণ্ড পরকালে আনীত হইলে

* Vide J. S. Mill—'Three essays on Religion"

তাহা এত দুরস্থ ও দৃষ্টি-বহির্ভূত বোধ হইতে লাগিল যে তাহাতে লোকের আস্থা আর তত প্রবল রহিল না। আধুনিক ধর্ম্মেতিবৃত্তে এখন ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে যে সমস্ত লোককে ভয় প্রদর্শন না করিলে কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না তাহাদিগের ও নিকট পারলৌকিক ভয় বিফল হইয়া থাকে। তাহারা সে ভয়ে অনুমাত্র ভীত হয় না। বাস্তবিক "যদি নরকের বহ্নিতাপ লোকের তত ভয়ানক বোধ হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে পাপ-কর্ম্মের এত বাহুল্য থাকিত না। কোন্ জাতির কবিতা ঐহিক পাপের ভীষণ পরিণাম বিষয়ে লোক দিগকে প্রতিবোধিত না করিয়াছে? যদি একবার নরকের যন্ত্রণাবর্ণন পাঠ কর, হৃদয় কম্পিত হইবে, গাত্র উৎপুলক হইবে, এবং সংসারের সমুদয় দুঃখ লঘু বোধ হইবে। তথাপি মানসে সেই ভয়ের তত সংস্কার হয় না, তথাপি সে সমুদায় দুঃখ কাল্পনিক ও অপরিস্ফুট বোধ হয়, তথাপি পরদ্রব্য হরণার্থ যখন হস্ত বিসারিত কর, তখন তাহা স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হয় না; তথাপি তোমার জিঘাংসার আবির্ভাব হইলে, পাশ দণ্ড মনে পড়িয়া দারুণ ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করে না; তথাপি পাপে বিষের ন্যায় অপরক্তি হয় না" *। ইহার অর্থ কি? পারলৌকিক আশা যেমন, মানব-মনে পারলৌকিক ভয়ও তাদৃশ প্রবল নহে ইহা কি এই কথারই যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে না? আর এক কারণেও পারলৌকিক ভয়ের বিভীষিকা ন্যূনকল্প হইয়া গিয়াছে। পাপদণ্ডের অনিশ্চয়তা হেতু তাহা মানবকুলের তত ভয়প্রদ হয় নাই। মৃত্যুর পর পাপভোগ নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে তাহার অনিশ্চয়তা ঘটিয়াছে। কারণ মৃত্যুর পর যে ফলাফল ঘটিবে তাহা কোন কার্য্য বিশেষের ফলভোগ নহে, তাহা সমস্ত জীবিত কালের পাপ পুণ্যের ফলভোগ এই জন্য সকলেই মনে করেন, তাহাদিগের দুষ্কৃতি যত অধিক হউক না কেন, সুকৃতির সঙ্গে তুলদণ্ডে তাহার পরিমাণ হইলে সুকৃতি পরিমাণই অধিকতর হইবে। এই আশা লোকের মনে অত্যন্ত প্রবল। যে ধর্ম্মে পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, সে ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আবার পাপের ভয় কি? কিন্তু যে ধর্ম্মে তাহা নাই, সেই ধর্ম্মাবলম্বিগণ করুণাময় পরমেশ্বরের অপার করুণার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আশা করিয়া থাকেন। তাহাদিগের জীবনের অল্পপাপ পরিমাণ অবশ্য উপেক্ষিত হইবে, এবং অবশেষে তাঁহারা নিশ্চয় স্বর্গবাসী হইবেন। মৃত্যুর পর পাপদণ্ড নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে তাহার দূরত্ব এবং অনিশ্চয়তা হেতু মানব কল্পনায় এই প্রকারে তাহার ভীতি অপনীত হইয়াছে। অপনীত হইয়াছে কিনা প্রমাণ স্বরূপ, তুমি পাপীর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হইয়া দেখ, সেই অন্তিমকালে যখন তাঁহার পাপময় জীবনের ফলভোগের কাল তদীয় কল্পনা চক্ষে

* বিচিত্রবীর্য্য হইতে উদ্ধৃত।

অতি নিকটবর্ত্তী বোধ হইতেছে, তখনও তাঁহাকে দেখিবে তিনিও পুণ্যবানের ন্যায় অতি নিশ্চিন্ত এবং শান্তভাবে জীবনযাত্রা সম্বরণ করিতেছেন; বিগত পাপপুঞ্জ স্মরণে তাঁহার কল্পনা বিশেষ কিছুই নিপীড়িত ও ভয়ত্রস্ত হয় নাই; তিনিও ঈশ্বরের কৃপাগুণ স্মরণ করিয়া এবং স্বকীয় জীবিতকালের পুণ্য রাশি লইয়া সহাস্য আস্যে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে অনায়াসে সাহসী হইয়াছেন, এবং নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, তাঁহার প্রসাদভাজন হইবেন। জীবিতকালে তিনি যেমন পাপভয়ে অণুমাত্র শঙ্কিত হয়েন নাই, এখনও সে ভয় তাঁহার কিছুই যন্ত্রণার কারণ হইল না। তিনি অনায়াসে কৃপাময়ের শরণাগত হইলেন।

স্বভাবতঃই মানবের আত্মম্ভরিতা প্রবল; ভয় অপেক্ষা মানবের আশা প্রবলতর। কেহই আপনার নিকট আপনি অপ্রিয় বলিয়া গণনীয় নহেন। সুতরাং কেহই আপনার নিকট আপনি দারুণ পাপী বলিয়া গণনীয় নহেন। কেহ জ্ঞানসত্ত্বে কোন পাপকর্ম্ম করিলে মনে করেন, করুণাময় তাঁহার ক্ষুদ্র কলঙ্ককে দুর্ব্বলতা ও প্রমাদবশাৎ জ্ঞান করিয়া অবশ্য মার্জ্জনা করিবেন; মনে করেন তাঁহার অসংখ্য পুণ্য পুঞ্জে সে পাপকলঙ্ক অবশ্য ক্ষালিত হইবে; তিনি পাপদণ্ডে দণ্ডার্হ হইবেন না।

প্রতিব্যক্তির নিকট পাপভয় কেমন প্রবল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে একবার লোকসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা যাউক, লোকমণ্ডলী এই ভয়ে ভীত হইয়া কতদূর পাপনিবৃত্ত হইয়াছে। জনসমাজের প্রতি অবলোকন করিলে পরিদৃষ্ট হইবে, যে তাহার অধিকাংশ লোকই পরকাল স্বীকার করেন, এবং পরলোকে তাহাদিগের বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে, কিন্তু সেই বিশ্বাস এত প্রবল নহে যে তাহাদিগকে ইহলোকের সুখসম্ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। অধিকাংশ লোকেই ইহলোকের সুখ সম্ভোগে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বেড়ান। তাঁহারা পৃথিবীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আছেন। তাঁহাদিগের নিকট বর্ত্তমান সুখ যত প্রবল, ভাবী সুখ তত প্রবল নহে। তাঁহারা ইহজীবনের কষ্ট ও দুঃখ যত ক্লেশকর জ্ঞান করেন, পরলোকের কষ্ট ততদূর জ্ঞান করেন না। ইহাই মানবজাতির নৈসর্গিক ভাব। যাঁহারা অলীক ধর্ম্মের প্রবোধনায় প্রকৃতিকে অস্বাভাবিক ও বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারাই পারলৌকিক ভাবে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া পড়েন, এবং তদ্দ্বারা আপনার ও সমাজের যে অনিষ্টসাধন করেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। যে পরিমাণে সমাজে পারত্রিক ভাব প্রবল হইয়াছে, সেই পরিমাণে মনুষ্যসঙ্ঘ স্বার্থপর, প্রতারিত এবং পার্থিব বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন। রক্ষা এই, যে জনসমাজের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস থাকিলেও তাঁহারা এই ভাবে প্রচালিত হয়েন না। প্রচালিত হইলে সমাজের অমঙ্গলের আর

অবধি থাকিতনা। আজি পৃথিবীর উন্নতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর উন্নতি পর্য্যন্ত পরিবদ্ধ হইত; পৃথিবীর দুঃখের আর পরিচ্ছেদ হইত না। বাস্তবিক জনসমাজ যদি ধর্ম্মদ্বারা পরিশোধিত ও পারলৌকিকভাবে উত্তেজিত হইয়া পরিশুদ্ধ হইতে পারিত, তবে সমাজে পাপের এত প্রাবল্য থাকিত না। পারলৌকিক ভয় যদি জনসমাজকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় খৃষ্টধর্ম্মীয় সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পাপক্ষালিত হইত। কারণ কোন ধর্ম্মে পাপদণ্ড ও পারলৌকিক ভয় তাদৃশ ভয়ঙ্কররূপে চিত্রিত হয় নাই। অথচ আমরা কোন জনসমাজকে এত পাপনিরত দেখিনা। খৃষ্টীয় মণ্ডল ইউরোপ যত সভ্যতার শিখরে উন্নত হইয়াছে তাহার পাপভাগের তত বৃদ্ধি হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ভীষণ নরকের অনন্ত যন্ত্রণা যেরূপ উদ্দীপক বাক্যে চিত্রিত হইয়াছে এরূপ আর কোন ধর্ম্মে নহে। এই ধর্ম্ম-পরিস্থাপকেরা বোধ হয় অনুমান করিয়াছিলেন, যে পৃথিবীতে পাপভয় যত সঞ্চারিত হইবে জনসমাজ ততই পাপনিবৃত্ত হইতে থাকিবে। কিন্তু ফলতঃ কি ঘটিল? ফলতঃ কি আমরা দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় ইউরোপ অতি পুণ্যবান সাধুজনগণের আবাস ভূমি হইয়া পরম পবিত্র তীর্থস্থান হইয়াছে? না ঠিক ইহার বিপরীত হইয়াছে? খৃষ্টীয় ইউরোপ পৃথিবীর মধ্যে যে কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, আর কোন দেশ কোনকালে তদ্রূপ হয় নাই। আর কোন মর্ত্ত্যদেশকে যেন তদ্রূপ হইতে না হয়। খৃষ্টীয় ইউরোপ জগতে বিভীষণ দস্যু ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতীত সাক্ষী ইতিহাসে কি বলে? ইতিহাসে কি বলে না সেখানে পারত্রিক ভাব জনসমাজে কিছুই বিদ্যমান নাই। এক কালে যখন পারত্রিক ভাব খৃষ্টীয় ইউরোপকে উন্মত্তপ্রায় করিয়াছিল তখন ইউরোপ পাপে পূর্ণ হইয়া অতি করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। তখন তাহার চারিদিকে নরহত্যা, ব্যভিচার, দস্যুবৃত্তি, প্রবঞ্চনা, এবং পাপের যত প্রকার মূর্ত্তি আছে সকল মূর্ত্তিতেই পাপ ইউরোপময় বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছে এবং নররুধিরে ইউরোপকে প্লাবিত করিয়াছে। এখন পারত্রিক ভাব ইউরোপের জনসমাজ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। এখন সেই পাপ অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে গোপনে গোপনে সমাজকে কলুষিত করিতেছে। এখন পাপ তথায় উপরে একটি সভ্যতার ও বাহ্যধর্ম্মের অবগুণ্ঠন রচনা করিয়াছে; এবং সেই প্রচ্ছন্ন বেশে ইউরোপের জনসমাজের ওতোপ্রোত হইয়া আছে। এখন সভ্যতার নামে ইউরোপীয় জনসমাজকে পাপ নানাবিধ দুষ্কর্ম্মে পরিলিপ্ত করিতেছে এবং দিন দিন সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বরে পরিশোভিত নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতেছে। সভ্য ইউরোপীয় সমাজ ধর্ম্মের নাম মুখে করিয়া সেই পাপপথে এমত সভ্য ভাবে বিচরণ করিতেছেন যে কে তাহাদিগের গোপনীয় পাপস্রোত

ধরিতে পারে? যিনি বহুদিন তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, যিনি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অভিনিবেশ সহকারে বহুকাল ধরিয়া তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন ইউরোপীয় সমাজ পয়োমুখ বিষ-কুম্ভ স্বরূপ। পাপ তাহার স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আছে; কেবল উপরে ধর্ম্ম এবং সভ্যতার আবরণ। স্বার্থপরতা, লোভ, প্রতারণা, খলতা, তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবিদ্ধ হইয়া আছে। ঐ দেখুন সেই লোভপরতন্ত্র ইউরোপীয় জাতি পৃথিবীর এক কোণ হইতে অন্য কোণে বাহুবিস্তার করিয়াছেন। ঐ রুধিরাক্ত দস্যুহস্ত যেখানে প্রবেশপথ লাভ করিয়াছে সেই খানেই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। তাহাদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ও নৃশংসতার ভয়ে পৃথিবীর অন্য খণ্ডের লোক সমাজ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত ও কম্পিত হইতেছে। তাঁহারা লোভের রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন সর্ব্বগ্রাসী হইয়া উঠিতেছেন। সর্ব্বত্রে দারুণ দস্যুবৃত্তি বিস্তারিত করিবার জন্য কেবল ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছেন। ইউরোপকে শোণিতপাতে তো শতবার কলঙ্কিত করিয়াছেন; বোধ হয় খৃষ্টীয় ইউরোপে যত শোণিত পাত হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোন খণ্ডে তত হয় নাই। কিন্তু তাহাতেও খৃষ্টীয় জনসমাজ সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাদিগের সেই রুধিরাক্ত ভীষণ হস্ত কি আফ্রিকা, কি এসিয়া, কি আমেরিকা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই এবং অন্যান্য সাগরের শেষ সীমান্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলিতেও প্রসারিত হইয়াছে, এবং ভয়ানক রুধিরপাতে পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে। যে দিকে চাও, খৃষ্টীয়গণের ভীষণমূর্ত্তি এবং লোভপূর্ণ সবল দেহ অন্তকের প্রায় দেখিতে পাইবে। তাঁহারা সর্ব্বগ্রাসী হইয়া বেড়াইতেছেন। পৃথিবীতে নূতন নূতন চাতুরী, জাল, ও পাপের নূতন নূতন পথ প্রদর্শন করিতেছেন। স্পেনীয়েরা যে নৃশংস ব্যাপারে পিরু, মেক্সিকো, এবং আমেরিকার অন্যান্য স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহার সাদৃশ্য ও দৃষ্টান্ত ইতিহাসের আর কোন্ অধ্যায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইংরাজ জাতি ভারত বিজয় কালিন যে চাতুরী, জাল, ও অসংখ্য খেলা খেলিয়া গিয়াছেন, যদ্দারা ভারতবাসিগণের চক্ষে নূতন নূতন পাপপন্থা প্রকাশিত হইয়াছে, সে রূপ দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যায়? রুশীয়া সর্ব্বগ্রাসী হইয়া পৃথিবীতে যে শোণিত পাত করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা কোথায়? যে উন্নত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের শিক্ষা—সাধু, তোমার এক গণ্ডে কেহ চপটাঘাত করিলে তুমি অন্য গণ্ড তাহাকে ফিরাইয়া দিও——ইউরোপের আধুনিক শোণিত ময় ও পাপময় ইতিবৃত্ত কি সেই ধর্ম্মের পরিণাম? জিসস্, পল, আসিয়া দেখিয়া যাও তোমরা যে বীজরোপণ করিয়াছিলে, তদুৎপন্ন বৃক্ষে কি ফল ফলিয়াছে। এই পরিণাম দেখিয়া তোমরা কি তারস্বরে জগৎময় ঘোষণা করিবে না, জনসমাজে

ধর্ম্মের নাম বৃথায় বাগাড়ম্বর মাত্র ? সেই ধর্ম্মনামে সকলই কৃত হইতে পারে। খৃষ্টীয় পাদ্রিগণ,——তোমরা এই ইতিহাস লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও; আর খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, অন্ধের মত, উন্মত্তের মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিও না। স্বদেশ কিসে প্রকৃত রূপে সভ্য হয়, সেই উদ্দেশে স্বদেশে ফিরিয়া যাও। অগ্রে স্বদেশকে প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্য ও ধর্ম্মপরায়ণ কর, পরে অন্য দেশে ভ্রমণ করিও। তোমরা সভ্যতাভিমানী; কিন্তু তোমাদিগের স্বদেশীয়গণ পৃথিবীর চারিদিকে বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অগ্রে এই বর্ব্বরতা নিবারণ কর। কিন্তু জানি ও তাহা ধর্ম্ম ও পরলোকের আশা বা ভয় দ্বারা প্রচার হইবে না। তজ্জন্য অন্য উপায় অনুসন্ধান কর। ধরণীতে বহুকাল ধরিয়া ধর্ম্মের পরীক্ষা হইয়াগিয়াছে। সে উপায় ব্যর্থ হইয়াছে; আর অধিক কাল এ পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে অন্য সাধনের আবশ্যক।

কিসে তবে জনসমাজের অধিকাংশলোকেই পাপকার্য্য হইতে বিরত হয়, এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। ইহলোকেই অসৎকার্য্যের যে সমস্ত ফলাফল ঘটে, সেই বর্ত্তমান ও প্রত্যক্ষ অমঙ্গল ভয়ে লোকপরম্পরা পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়। কারণ লোকের ইহজীবনের কষ্ট ও দুঃখ, নিন্দা ও অপবাদ, অপমান ও লাঞ্ছনা তাহার অতিমাত্র অসহ্য বোধ হয়। যখন লোকে পাপকার্য্যে প্রলোভিত হয়; তখন তিনি একদিকে সেই দুষ্কৃতিজনিত ক্ষণিক সুখ এবং অন্যদিকে ভবিষ্যজীবনের অবনতি, অপযশ রাজদণ্ড প্রভৃতি সেই পাপকার্য্যের অশেষ কুফল গণনা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। পাপের যদি ইহলোকেই এই প্রকার সামাজিক শাসন এবং রাজদণ্ডভয় না থাকিত, আজি জনসমাজ নিশ্চয় উচ্ছৃঙ্খল ও লণ্ড ভণ্ড হইয়া যাইত।

জনসমাজের অধিকাংশই কেমন পরলোকের প্রতি উদাসীন তাহা বোধ হয় অনেকদূর প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে পারলৌকিক মতামত প্রচার করা কাহাদিগের জন্য ? সমাজের যে অল্পভাগ পারলৌকিক আশায় উৎসাহিত হইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, আমরা স্বীকার করি তাঁহাদিগের সৎকার্য্যদ্বারা কখন কখন ভূমণ্ডলের কথঞ্চিৎ ইষ্টসাধন হয়। কিন্তু অন্যদিকে যখন বিচার করিয়া দেখি, সেই আশা প্রণোদিত ধর্ম্মোৎসাহ জনিত পৃথিবীর যে সমস্ত ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাত হয়, মানবপ্রকৃতি যে রূপ স্বার্থপরতায় কলুষিত হয়, পার্থিব মঙ্গলের প্রতি মানবের যাদৃশ ঔদাস্য জন্মে, এবং জনসমাজ যে রূপ প্রতারিত হয়েন, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, এই পারলৌকিক আশা জনসমাজের একান্ত শুভকরী প্রবৃত্তি নহে; ইহা সমূহ-অমঙ্গল-প্রসবিনী। বাস্তবিক এই প্রবৃত্তিজনিত পার্থিব মঙ্গলের সহিত অমঙ্গলের তুলনা করিয়া দেখিলে

প্রতীত হয়, যে ইহাদ্বারা পৃথিবীর মঙ্গলাপেক্ষা অমঙ্গলেরই ভাগ অধিকতর উৎপন্ন হইয়াছে। আবার যখন দেখিতে যাই পারলৌকিক ভয় দ্বারা জনমণ্ডলীর পাপপ্রবৃত্তির কতদূর দমন হইয়াছে, তখন কি আমরা দেখিতে পাই না, যে জনসমাজ পারলৌকিক ভয়ে ভীত হইয়া অণুমাত্র পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই। তৎপক্ষে পার্থিব ক্লেশ ও দুঃখ ভয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসন অপ্রতিম প্রতাপে মানব হৃদয়কে নিয়মিত রাখিতেছে। পারলৌকিক ভয় প্রভাবে যদি জনসমাজ পাপনিবৃত্ত হইত, তবে খৃষ্টানমণ্ডলীর প্রধান আবাসভূমি ইউরোপ অদ্য পৃথিবীর তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ইউরোপ ঠিক ইহার বিপরীত নামে কলঙ্কিত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী জনসমাজ পারত্রিক ভয়ে কতদূর পাপনিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা ইউরোপের ফলাফল ও দৃষ্টান্ত বিবেচনা করিলেই অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। তজ্জন্য স্বতন্ত্র প্রস্তাবনার আবশ্যক নাই।

জনসমাজের অধিকাংশই যখন পরকালের প্রতি উদাসীন হইয়া কার্য্য করিতেছে, তখন তাহাদিগের পক্ষে সে পরকাল থাকা আর না থাকা সমান। না থাকিলে তাহাদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। থাকিলে বরং ক্ষতিই অধিকতর। যাঁহাদিগের বিশ্বাস যেমনই হউক না, ইহলোক পরিত্যাগ করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না। মৃত্যু সকলের নিকটই সমান অপ্রিয়। কেবল সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া যাঁহারা বিবাগী হইয়া গিয়াছেন, অথবা সংসারেই বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক মৃৎপিণ্ডবৎ অবস্থান করিয়া আপনাদিগেরই কার্য্যফলে ইহজীবনকে দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন, সেই ঘোর ভ্রমান্ধ এবং অধার্ম্মিক জনগণই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। নহিলে যাঁহারা ইহজীবনে নিতান্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগের সেই যন্ত্রণাও এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহাকে আর নিতান্ত ক্লেশকর জ্ঞান হয় না, এবং তাঁহারাও তাদৃশ মৃত্যুর প্রত্যাশী নহেন। কেবল যাঁহারা প্রাণান্তিক পীড়ায় এবং বার্দ্ধক্যের অথর্ব্বতায় জীবনকে ভারবহ ও কেবল ক্লেশের কারণ বিবেচনা করিতেছেন তাঁহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিউন। তাঁহাদিগের ইহজীবনের সুখ একবারে নিঃশেষিত হইয়াছে; আর অধিককাল জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। নহিলে অবশ্য বলিতে হইবে, আয়ুঃস্পৃহা সাধারণ সকলেরই সমান। পরলোকের প্রতি যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহলোক পরিত্যাগ করিতে তাঁহার যেমন অনিচ্ছা, ঘোর বিষয়ীএবং সংসারীরও তদ্রূপ অনিচ্ছা। কিন্তু পারত্রিক সুখের আশা যদি মানবের তত প্রবলতর হইত, তাহা হইলে কি এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। মানবপ্রকৃতিনিহিত যে আয়ুঃস্পৃহা বলবতী আছে, তাহা এই পারলৌকিক প্রবৃত্তির প্রতীপগামিনী হইয়া কার্য্য করিতেছে। সুতরাং

বলিতে হইবে এই পারলৌকিক প্রবৃত্তি মানবপ্রকৃতির উপযোগিনী নহে, এবং মানব-প্রকৃতির সহিত ইহার সঙ্গতি নাই। মানবপ্রকৃতির অসঙ্গত বলিয়া ইহা মানবমণ্ডলী মধ্যে কার্য্যকারী হয় নাই। জনসমাজের অধিকাংশই যখন পরকালের প্রতি উদাসীন হইয়া কার্য্য করিতেছে, তখন তাহাদিগের পক্ষে সে পরকাল থাকা আর না থাকা সমান। ইহলোকেই জীবনের ও জীবাত্মার শেষ হওয়া বাস্তবিক অমঙ্গলের কারণ নহে। মনুষ্য, আত্মব্যতীত কোন জীবেরই পরকাল নির্দ্দেশ করেন নাই। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গাদির যে পরকাল নাই, অধিকাংশ লোকে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। মনুষ্য আত্মশ্লাঘায় পূর্ণ হইয়া কেবল আপনারই পরকাল অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সে অনুমান ও বিশ্বাস দ্বারা তাঁহার চরিত্রের কিছু বৈষম্য ঘটে না। তবে মনুষ্য চিন্তাশীল প্রাণী; ইহলোকেই জীবাত্মার পরিসমাপ্তি হইবে—এই চিন্তাই তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর, ভয়ানক ও নৈরাশ্যজনক। ইহা ভাবিতে গেলেই আমাদিগের মনে হয়, যেন আমরা জীবিত রহিয়াছি অথচ আমাদিগের সকলই শেষ হইয়াছে। জীবিত থাকিতেই মৃতকল্প জ্ঞান হওয়া যে নিতান্ত নৈরাশ্যজনক, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমি আছি, অথচ আমি নাই; এই আসিয়াছি, কিছুকাল পরে আমার কিছুই থাকিবে না, এইরূপ কল্পনা ও স্বপ্নই ভয়ঙ্কর। এই রূপ আত্মঘাতিনী কল্পনা স্বভাবতঃই নৈরাশ্যজনক হইয়া থাকে। মানবের যখন এই প্রকার জীবিতমৃত জ্ঞান হয়, তখন মানব পরকাল কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। নহিলে ঈশ্বর যদি কোটি কোটি প্রাণীর পরকাল না দিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে পারেন, মনুষ্যকে কেন পারিবেন না, আমরা বুঝিতে পারি না। ঐশী শক্তির বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে গেলে, অপরাপর প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যও সেই শক্তির ক্রীড়া পদার্থ অবশ্য মানিতে হইবে। অপরাপর প্রাণীর পরকাল না থাকিয়া যদি তৎসমুদায় সেই ঐশীশক্তির ক্রীড়া পদার্থ হইয়া থাকে, মনুষ্য তবে কেন হইবে না আমরা বুঝিতে পারিনা। সেই অনন্তকাল-ব্যাপিনী ঐশীশক্তির নিকট ৭০ বৎসর-পরমায়ু-বিশিষ্ট মনুষ্যজীবন মধ্যে যাহা সম্ভবিতে পারে সেই জীবন পরলোকে বিস্তৃত করিলেও তাহাই সম্ভবিতে পারে। তাঁহার অনন্ত কৌশলে, অনন্তময় মঙ্গল উদ্দেশ্য ৭০ বৎসরে যেমন সুসম্পন্ন হইতে পারে, শত সহস্র বৎসরেরও ঠিক তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা। যদি না হয়, না হইবার সম্ভাবনা, তবে সেই ঐশীশক্তি অনন্ত-কৌশলময়ী নহে। মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষু অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন বলিয়া তিনি জগৎকৌশলের সমস্ত প্রহেলিকার রহস্য ভেদ করিতে পারেন না। রহস্যভেদ না করিতে পারিয়া মনে করেন, ইহলোকে যাহা অসম্পন্ন রহিল পরলোকে তাহা সুসম্পন্ন হইবে। ইহা মনুষ্যেরই মিথ্যাদৃষ্টি। এই মিথ্যাদৃষ্টি তাঁহার ঐশী-

শক্তির কল্পনার সহিত সুসঙ্গত নহে। হয় এই দৃষ্টি মিথ্যা, না হয় তাঁহার ঐশ্বরিক কল্পনা মিথ্যা, তিনি জগৎকারণকে ঠিক কল্পনা করিতে পারেন নাই। কারণ যে কল্পনা স্থির করিয়াছেন তাহা তাঁহার সমগ্র বিশ্বাসের সহিত সুসঙ্গত নহে। তাঁহার আত্মঘাতিনী কল্পনা নিত্য বিপ্রিয়করী বলিয়া তিনি ইহজীবনকে বিস্মৃত করিতে গিয়াছেন এবং জগৎকৌশলানভিজ্ঞ অজ্ঞানতা সেই পারলৌকিক বিশ্বাসের প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। নহিলে মানবজীবনের পরকালের কিছুই প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বলেন আছে, তাঁহাদিগের তর্কজাল ও যুক্তির বিচার করিয়া দেখ, সেই যুক্তি ও তর্কের মূলে এই আত্মবিনাশের অনিচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং সেই যুক্তি ও তর্কের উপকরণ সমুদায় মনুষ্যের অজ্ঞানতার পরিচায়ক। মনুষ্য আত্মবিনাশ চায় না বলিয়া নানাবিধ অনুকূল তর্কজাল বিরচন করিয়া আত্মার অমরত্ব ও পরকালের সৃষ্টি করিয়াছে —ধরিতেগেলে এই ইচ্ছাকেই পরকাল সৃষ্টির মূল কারণ বলিতে হইবে। মনুষ্যের এই বাসনা চরিতার্থ হউক আমাদিগেরও ইচ্ছা; ইহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিশীল জীব কি শুদ্ধ বাসনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন? এই বাসনার প্রতিপোষক বলবৎ প্রমাণ কই! যদি প্রবল যুক্তি দ্বারা এই বাসনা ও মত সমর্থিত হইত, তবে ইহা বাস্তবিক মানবের পক্ষে বড়ই আনন্দের বিষয় হইত। এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা আজি পর্য্যন্ত কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। তত্ত্ববিৎ লক (Locke) বলিয়া গিয়াছেন যে যুক্তিদ্বারা পরকাল প্রতিপাদিত হয় না। মেষ্টর ষ্ট্রস ও (Strauss) বলেন "পরকাল কেহ প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই।" লক প্রাচীন কালের যুক্তির অসারতার স্বাক্ষ্য দিয়াছেন, ষ্ট্রস আধুনিক পণ্ডিতগণের তর্কজালে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এই মত তবে কেবল বিশ্বাসনীয় বলিতেহইবে। কিন্তু এই বিশ্বাসকে এত প্রবল রূপে প্রতিপোষণ করার আবশ্যক কি? এতদ্দ্বারা জগতের কি ইষ্টসাধন হইতেছে? এ বিশ্বাস না থাকিলে মনুষ্যের ক্ষতিই বা কি! এই দেখুন চিন্তাশীল মিল কি বলিতেছেন:—

"The mere cessation of existence is no evil to any one; the idea is only formidable through the illusion of imagination which makes one conceive oneself as if one were alive and feeling oneself dead."*

মানবের কল্পনা যদি মানবের মনে এই বিপ্রিয় ও নৈরাশ্যজনক স্বপ্ন উদিত না করিত তাহা হইলে তাহার পরকালের বিশ্বাস তাদৃশ প্রবল হইত না। মানবের কল্পনা তাহার হৃদয়কে যত আকৃষ্ট ও

* Vide Mill's essay on the Utility of Religion

মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে, তাহার বুদ্ধি ততদূর সমর্থ নহে। হৃদয়কে অধিকার করিবার কল্পনায় যতদূর ক্ষমতা আছে, বুদ্ধির তত দূর নাই। আমরা মানবজাতিকে বুদ্ধিশীল জাতি কি কল্পনাশীল জাতি বলিব অনেক সময় স্থির নিশ্চয় করিতে পারিনা। কারণ দেখি, বুদ্ধি অপেক্ষা তাহাদিগের কল্পনা প্রবলতর। সাধারণ মানবজাতি কল্পনা দ্বারা যত প্রচালিত হয়, বুদ্ধি দ্বারা তত হয় না। এই কল্পনা-প্রবল মানবজাতির অনেক সংস্কার বুদ্ধির প্রতিপোষক নহে। সেই সংস্কার নিচয়কে এক প্রকার কুসংস্কার বলিলেও বলা যাইতে পারে। আমাদিগের প্রস্তাবিত পরকালের বিবাদকে এই প্রকার একটি কুসংস্কার বলা যাইতে পারে কিনা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।

মনুষ্যের ইতিবৃত্তে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, পারলৌকিক বিশ্বাস না থাকিলেও জনসমাজের জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে। সামাজিক শাসন, এবং যশোলিপ্সা প্রভৃতি সামাজিক প্রবৃত্তি সকল জনসাধারণকে যেমন পাপ হইতে নিবৃত্ত এবং পুণ্যকর্ম্মে উত্তেজিত করে এমত আর অন্য কোন প্রবোধনায় করে না; আমরা তাহা পূর্ব্বেই সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছি। প্রাচীন গ্রীক দিগের স্বর্গনরকের ভাব কিছুই ছিল না বলিলে হয়; অথচ তাহারা উত্তমরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য জাতির মত তাহাদিগেরও মৃত্যুভয় ও আয়ুস্পৃহা প্রবল ছিল। অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহারাও ইহলোকের সুখে সুখী হইতেন, এবং যাহাতে সামাজিক সুখের বৃদ্ধি হয় তাহারই চেষ্টা করিতেন। তাহাদিগের সামাজিক প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলেই সমাজ সুনিয়মে চলিতে পারে। বৌদ্ধসমাজ ইহার আর একটি উদাহরণ। কি খৃষ্টিয়, কি মহম্মদীয় ধর্ম্ম, আজি কোন ধর্ম্মের উপাসক-সংখ্যা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপাসক-সংখ্যার সমান হইতে পারে না। বৌদ্ধের লোক-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর। বৌদ্ধধর্ম্মে স্বর্গের ভাব কি? জীবাত্মার নির্ব্বাণই বৌদ্ধেরা সুখের পরাকাষ্ঠা ও চরম সীমা জ্ঞান করেন। "বৌদ্ধেরা পরলোক স্বীকার করেন না। ইহাঁদিগের মতে নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ বিনাশ; যে রূপ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া যায় সেই রূপ আত্মার ও নির্ব্বাণ অর্থাৎ ধ্বংস হইয়া থাকে। কোন কোন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন যথার্থ বটে, কিন্তু সে সকল কেবল হিন্দুধর্ম্মের সহিত সংস্রবে সংঘটিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।" বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী শতসহস্র জনগণ এই বিশ্বাস চিরকালই ধারণা করিয়া আসিতেছেন, আবার তাহাদিগের সমাজ সংস্থান অতি পরিপাটি এবং জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহিত হইতেছে। এই বিশ্বাস না থাকাতে কি তাহাদিগের সমাজ বিশৃঙ্খল ও বিধ্বংস হইয়াছে? অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বী

জনসমাজের সাধারণ জনগণ যেমন পরলোকের প্রতি উদাসীন থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করিতেছে, বৌদ্ধেরা তদপেক্ষা কিছু হীনতর নহে। যাঁহারা বলেন, পারলৌকিক বিশ্বাস না থাকিলে, নরকের ভয় ও স্বর্গের আশা না থাকিলে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, বৌদ্ধসমাজ তাহাদিগের মতের অসারতা প্রতিপাদন করিতেছে।

আমাদিগের প্রস্তাব অভিপ্রেত বিস্তৃতির সীমা অতিক্রম করিয়াছে; এক্ষণে ইহার উপসংহার করা উচিত। পারলৌকিক আশা দ্বারা জনসমাজের অধিক শুভ কি অশুভ হইয়াছে তাহার আমরা বিচার করিয়াছি। পারলৌকিক ভয়ে জনসমাজ কতদূর পাপনিবৃত্ত ও শাসিত হইয়াছে তাহাও আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। বাস্তবিক সাধারণ জনগণ পারলৌকিক বিষয়ে কেমন উদাসীন তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। পারলৌকিক বিশ্বাসের যুক্তিমূল কত দুর্ব্বল তাহা চিন্তাপরায়ণ তত্ত্বদর্শিগণই বলিয়া দিতেছেন। সমাজে এই বিশ্বাসের ফলাফল কিরূপ তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারিনা। যাঁহারা এই মত প্রতিপোষণ করেন, ইহার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহারা এই মত প্রচার করিতে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন তাঁহারা যদি ইহার যৌক্তিকতা এবং সামাজিক শুভকারিতা প্রতিপাদন করিতে পারেন আমরা তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত হইব। নহিলে আমরা জানি না, যে বিশ্বাস দ্বারা সমাজের অনেক অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, জন-সমাজে যাহার উপকারিতা কিছুই উপলব্ধি হয় না, যুক্তি যে বিশ্বাসকে সমর্থন করে না, সেই অমঙ্গলকর, অমূলক মত ও বিশ্বাস পরিবর্জ্জনে তাঁহারা আজিও কেন অগ্রসর নহেন।

শ্রীপূঃ—

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি।

সময় প্রথম রাত্রি।

রাধিকা ও ললিতা বিসখা ইত্যাদি সখীগণ আসীনা; কুসুম-সজ্জিতা শিলায় রাধিকা অর্দ্ধ শয়িতা ও গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না।

ললিতা —(ব্যজন করিতে করিতে)
সখীলো! আজ কাঁহে মলিন চন্দ্রমা?
আলু থালু ঘাঘরি খেলত মাধুরী
কাঁচলি কি ডোর কাঁহে খুলল স্বজনি!
নাহি প্রভাকর নাহিত নিদাঘ
শশিকরে সুশীতল বহত সমীর।

কেন কোন ... তোহার?
কোন পাপ রোগ আজি গরাসল তোমার?
হের হের বিসথে! হের কিবা রঙমে
নাচি নাচি গুঞ্জরি আয়ত ভ্রমর
ফিরত ঘোমত বৈঠনে চাহত
মধুলোভে পাগল মধুময় অধরে!

বিসখা।—কইসন কহব? মালুম না মোয়
আজ নহে সই নিত নিত কবই
চাঁদমুখে হাসি সতত নিরখই
শ্রবণমে শুনই সুস্বর লহরী!
আজ কোন ভাবে কিবা অনুরাগে
হের সখী পয়োধর কাঁপত থর থর
নাসা মূলে বহত প্রবল সমীর!
কাহে গিরি অধীর? কইসন কহব
কোন ভূকম্পনে এই সন ভেয়ল —

রাধিকা।—সখীলো আজি কিবা নব
রোগ ভেয়ল!
যমুনামে আজি কিবা হৃদয়মে বিঁধল!
ভীষণ হুতাশন পৈঠল হৃদয়ে
কি ফণী দংশল কহন না যায়!—
মরি মরি সখীলো সং... য়
চরণমে গিরত কহলো উপায়!—

ললিতা।—যমুনামে যাওয়া অব ভেয়ল
বালাই,
কদম্ব-তরুতটে রহত কানাই!
নিঠুর নটবর কঠিন কপট
কুটিল বিলোকনে বিঁধব দারুণ।
মদন শরাসন বঙ্কিম লোচন
খর তর সন্ধানে হৃদয় বিদরে!—
হৃদি-রোধ টুটই বাসনা তরঙ্গ
চলত অবিরত প্রবোধ না মানে।
বিসরি গুরুজন হেন মনে হোয়
চরণ-কোকনদে যদি পাই ঠাঁই।

সখীলো!

যমুনামে যাওয়া অব ভেয়ল বালাই!—

রাধিকা।—সখীলো!
পুরুখ রতন শাম অতুল ভুবনে!
শাম মদন তরু হৃদয় কাননে
প্রেম-কিসলয়ে সুললিত শোভিত
দোলত অবিরত বাসনা হিলোলে!—
শাম-অমল শশি প্রতি মধু মূরতি
হৃদিসরে নিতই নাচত হমারি!
সখিলো শামরূপ ভেয়ল কাল হমারি!—

(দীর্ঘনিশ্বাস)—

কিবা সুঠাম সুন্দর রতি-মন-রঞ্জন
ত্রিভঙ্গে বঙ্কিম মোহন মূরতি!
কিবা শিখি-পুচ্ছে খচিত চিকুর-রঞ্জিত
অনিলে প্রতাড়িত দোলত মধুরে!—
নবীন গোপাবলি কোমল সুন্দর
সুরাগে রঞ্জিত ঘেরই অধরে!—
সখীলো রাই হৃদে হেন কয়!
শাম সুন্দর চারুমদন তরু বরে
প্রেম লতা ভেয়ই জড়াই তাহারে!
সুরনর দুর্লভ অধরে অধর
দাগই অমরতা লভই ভূতলে!—
উরস বিশাল ভৃগু-পদ-চিহ্নিত
চরচিত চন্দনে নয়ন নন্দন!—
সার্থক রে কদম্ব তরু বর

জীবন তোমার!—

তোম শিখাও হমারে

গুরু পদে আজু হম বরিণু তোমারে !—
কোন পুণ্য ফলে কিবা যাদু-বলে
লভলি দুল্লভ শাম-আলিঙ্গন?
রাধা আরাধনা যোগ-তপ-ধন !—
(দীর্ঘনিশ্বাস)—

বঙশী বঙশে রচিত
বঙশ তব বঙশ পবিত
রাধা লভল না যায় পরাণ প্রদানে
তুহ লভলি তাহারে বিনা আরাধনে—
(দীর্ঘনিশ্বাস)—

পীত বাস স্মরইলে তোয়
অযুত কাল ফণী দংশয়ে মোয়—
চিতে মোর হোয়ত অনল মে ডারি
পীত বাস—ভসম ফেকই সাগরে
বৃন্দাবন মাঝে নারাখি তাহারে—
ইম রতনাবতী রতন অম্বর
আবরব ভেরই শ্রীঅঙ্গ মোহনে—
লাজ সতিনী এক সাপিনী ফণা হেন
বৃন্দাবন মাঝে ডরাই তাহারে,
লোকালয় ত্যজই হিমাদ্রি শেখরে
পসব তম ময় কন্দর মাঝারে,
আধার না রহব ভেয়ব দূর
সাম সুরয চারু মোহন কিরণে
সখীলো মনে মোর হেন আস হোয় -
সে নীল রতন ধনে দৃঢ় তর বাধই
নীল আচল মূলে রাখই যতনে—
(তমাল শেখরে কোকিলধ্বনি)
অই হানত কুহু বাণ !—
পিকবর তমালে নিঠুর নিদারুণ
রাধা হৃদয় ভেদি বারিখত বাণ !—
ললিতে হাকাও তাহারে
রাধা নিকুঞ্জে পুন পসইতে নারে !
বা কহও তাহারে
হম গজ মতি হার দিয়ব তাহারে !
পাকড়ি নটবরে কুহু বাণে বিঁধই
নীল রতন ধনে আনি দেয় মোয় !—

বিসখা।—পিকবর হম তোরে কহব বাট
তু'গিয়বি নহে দূব যমুনা-কিনারে--
পেখবি নৃপ বর কিসলয়ে শোভিত
প্রতি বিম্ব সুবিম্বিত যমুনা তরঙ্গে !
উঠই শেখরে বহবি গুমারে।

পেখবি এক

নীল রতন ময় ত্রিভঙ্গ নাগর !
শ্রীঅঙ্গ শোভিত সুভাগ চন্দনে
বন মালা লম্বিত উরস বিশালে !
শ্রবণ যুগলে যুগল কুণ্ডল
যুগল কাম-কেতু খেলত তায়।
যুগ করে পাকড়ি মোহন মুরলী
মদন দুন্দুভি অধর কিনারে !
তু' পেখবি নয়নে কালিন্দী জীবনে—
কালিন্দী জীবন বহবে উজন
বৃন্দাবন ভরবে মধুর আরবে !

পিকবর !

কুহু শরে বিতহ তাহারে !
ক্ষম ব্রজ-গোপিনী গিরত চরণে !—

রাধিকা।—সখীলো !—(দীর্ঘ নিশ্বাস)—
সখীলো !—সামরূপ ভেয়ল কাল হমারি
হম যায়ত যমুনা কিনারে !
পেখই নীল নীর অন্তর জ্বর জ্বর
সাম সুন্দর রূপ হৃদয়মে জাগে !

যমুনা প্রতি তরগ

কাল ফণী ভাই দংশয়ে হমারে ! —
সখীলো !—সামরূপ ভেয়ল কাল হমারি ।
হম, গিয়ল যমুনা কিনারে !
কদম্ব তরুতটে পেখনু তাহারে !
লাজ সতিনী আয়ি সাধল বাদ
পূরণ না ভেয়ল মোর মন সাধ !
কদম্ব তরু মূলে পলকে পলকে
নিরখই নটবরে নয়ন ফিরাই
ভাবনু যৌবন যমুনা সলিলে
রাখই মন প্রাণ নৃপবর মূলে—
যমুনা তেয়াজই উটনু আবার
বাসনা পেখব মদন মোহনে
চারি আঁখি মিলল !—ভেয়ল কাল
লাজ সতিনী পুন—পূরল না আশ ।
কুণ্ডল তেয়াজই চলনু আবার
ছলে ফিরি পেখব বাসনা হৃদয়ে
কুণ্ডল ছলে সই ফিরনু আবার
মৃদু-পদে তাকই মদন মোহনে—

সখীলো

পলক পেখনু পলকে অমনি
মিলল চারি আঁখি পলকে খেলল
অযুত তরগ হৃদয় সাগরে—
কুন্তল তেয়াজই ফিরণু আবার
শরমে থর থর মৃদু দর চরণে
হের সখি !—(বাম কর্ণ দেখাইয়া)
কুণ্ডল হীন মোর বাম শ্রবণে—
(দীর্ঘনিশ্বাস)

কেশবে পেখব কেশব না মোর
আসই পসনু গহন বিপিনে—

রসাল তরু-রাজ আড়ে তনু ঢাকই
পেখনু সুর-নর-মোহন মূরতি
সাখীলো !—

যদি সহস্র লোচন ভেয়ত হমার—
সহস্র বরখ অবিরত পেখই
রাধা হৃদি সাধ পূরত কদাচ—
(দীর্ঘনিশ্বাস)

ভুবন-মোহন চঞ্চল লোচনে
চৌদিকে নিরখই পলকে বৈঠল
কদম্ব তরু মূলে—পলকে ফেলল
ব্রজ-মন-মোহন মুরলী ভূতলে—
পলকে উঠল মৃদু মৃদু চলল
পলকে গিরল যমুনা সলিলে—
সার্থক রে যমুনা সলিল
আ ! হম নাহি কাহে ভেয়নু সলিল—
(দীর্ঘনিশ্বাস)

(তমাল শেখরে কোকিল ধ্বনি)

চন্দ্রাবলি ।—অই সখী পিকবর কহরত পুন
তমাল শেখরে

তমাল শেখরে পঞ্চমে কুহরে
বিধই জর জর প্রবোধ না মানে
হানত কুহু বাণ পিক বড় দরুণ
বিধব ফুল-বাণে আজি মোরা তায় ।

চল সখী.

দূরে খেদায়ব নাশব ভয়—

(বিসখা ললিতা চন্দ্রাবলি ইত্যাদি সখীগণ কুসুম স্তবক লইয়া প্রস্থান।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধিকা ।—অইরে বঙশী ফুকরে
উহু মরি পরাণ বিদরে--

উরু উরু দুরু জঘন সঘনে
কাঁপত ঘাঘরি খুলল রে!
গুরু নিতম্ব গিরি পয়োধর
ভরে অধীরা গিরই রে!
হার ভুজঙ্গিনী কালকুটময়ী
দংশত মোর পয়োধরে রে
নীল বসনে জলন জলত—
জলনে হৃদয় জলত রে।
মলয় অনল গরল ঢেউ
হৃদয় কিনার টুটল রে।
রতন নিচোল পাথাণ ভেয়ল
হৃদয়ে চাপান ভেলয় রে।
চরণ নূপুর খর কুশাঙ্কুর
ভেয়ল—চরণে বিপতরে!—
বেণী ভুজঙ্গিনী অযুত বদনা
অযুত বদনে দংশতরে!
মেখলা কুণ্ডল কঙ্কন বলয়
ভূষণ ভেয়ই অশনি রে
হানত।—বাঁশরী বাজত সপ্তমে
রাধার পরাণ বিদরে রে।—
(কুসুম শয্যায় পতিতা
কুসুম শয্যার প্রতি কুসুম
শর সম মোর বিধত রে।
খরতর পুন কুসুম শরের
বিসল শরে প্রাণ যায়ত রে।—
(ক্ষণকাল নিস্তব্ধা; বৃন্দার প্রবেশ)—
(উঠিয়া বৃন্দার হস্ত ধারণ করত—)
কাঁহা পেখলি তাহারে?—
বৃন্দা।—পেখনু তাহারে যমুনা কিনারে
ঝর ঝর ঝর নয়নমে ঝরে।
কুটিল বিলোকন বিহীন নয়ন
বদন বাম করে ধবায় নেহালি।
শ্বাসে শ্বাসে হেলত শিখি পুছ দোলত
পদতলে শোভত গিরই মুরলী।
রাহু গরাসল চাঁদ বন মালী—
মলিন পীতাম্বর পতিত ধরায়
নীল রতন খানি ভূতলে শোভয়।
আছড়ে পাছড়ে 'রাই রাই' স্বরে
নাসায় নিসরে প্রবল সমীর।
বনমালা দোল দোল কুন্তল ঝলমল
রুণ রুণ ঝুন ঝুন চরণ নূপুরে।
রাধানাথ, সুধু "রাধা রাধা" স্বরে।
রাধিকা।—গজমতি হার আজি শিরপি তোহারে—
(বৃন্দার গলায় গজমতি হার প্রদান)
হম যায়ব বৃন্দা পেখব তাহারে
নীল রতন ধোব নয়ন আসারে।
বাম কর হতে তুলই যতনে
চাঁদবদন খানি দাগব অধরে।
পতিত মুরলী পুনরপি তুলই
অঞ্চলে পুছই ধরব অধরে।
বৃন্দে রহ তোম
হম পেখব তাহারে।—(গমনোদ্যত)—
বৃন্দা।—(নিবারণ করিয়া)
ধৈর্য্য ধর শুন মোর বাত
ধৈর্য্য ধর রাই যায়ব মত
সেই নিজে আয়ব চরণমে গিরব
তু' রহবি আপন গুমারে
তু' কাঁহে যায়বি নিজ মান খোয়াবি
এ নহে রমণী কি রীত
যব নলিনী বিকাসত ভ্রমর জুঠত

নলিনী না যাত তার ঠাঁই।
রাধে—রমণী রীতি তোরে কই—
ফাটবে বুক কহবে না মুখ
ভীষণ হুতাশন জ্বলবে অন্তরে
মুখ ফুটি নাহি কহব নাগরে—
আপনি আয়ব পায়ে ধরি সাধাব
শুমাবে না কহব বাত
হৃদি জর জর মুখে কড়া কড়
হাত নাড়'ফের শুনায়ব বাত—
যব অসাধ্য সাধনে নাসিকা নয়নে
নীরে নীরে মিলব মানবে হার
মৌনম' তার শেষ কাহলো তোহার—
রাধিকা বৃন্দে তোর বাত রাধা নাই মানে
রাধা মনন সেই যুগল চরণে।
কুল ভয় পাসরি শরম পরিহরি
যায়ব পেখব মদন মোহনে।
রাধা মনন সেই যুগল চরণে—
বৃন্দে।—রাই ধৈর্য্য ধর না যায়বি তুই
তুই গিয়লে নারী মানে গিরবে ভুই
মুখে কাঁহে কহবি? অন্তরে রাখবি
মুখে দেখায়বি আপন গুমার
হম পুন যায়ব সামে পাকড়ব
আনব সোপব চরণে তোহার
সাবধান ভাঙবি আপন গুমার
পীরিতি কইসন দেখায়ব তার।—
গমনোদ্যত)
রাধিকা।—(নিবারণ করিয়া এবং কণ্ঠ হার লইয়া)
ধর বৃন্দে এই ধর বন হার
পার যদি কৌশলে দিও গলে তার
মোর কিরা মোর হার না কহবি তায়
শরমে পড়ুক বাজ শরম যে তোয়
বাসনা এই মন করি শরম পরিহরি
পাপ শরম তবু ছোড়তনা মোয়।
বৃন্দে।
নীল কলেবরে কইসন শোভত
বন মালা মোর পেখবি তাহারে
মোর কিরা ফের আয়ি কহবি হমারে—
(বৃন্দার প্রস্থান)
যবনিকা পতন।
ক্রমশঃ—

পাণিনি সমালোচন।

গত-সংখ্যক আর্য্যদর্শনে বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত আমার পাণিনি সমালোচনে যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া কেবল আলোচ্য প্রবন্ধের সারাংশ মাত্র বিচার করা হইয়াছে।

৩৬৫ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ।—"পুস্তকের মান্য করিতে হইলে" এইরূপ লেখাতে রজনী বাবু আমার ভাষায় দোষারোপ করিয়াছেন কিন্তু সেটী অযৌক্তিক, কেন না "ভাবে কর্ম্মণি যপ্রত্যৌ" মান্য পদটী ভাব ও কর্ম্ম উভয়বিধ-বাচ্যে নিষ্পন্ন হইতে পারে। ভাব-নিষ্পন্ন করিলে

"পুস্তকের মান্য করা" এইরূপ প্রয়োগ সাধু না হইবে কেন, রীতিবিশুদ্ধ বা হইবে না কেন? "পুস্তকের মানা করা এইরূপ লেখা বিশুদ্ধ না হইলেও "পুস্তকের মান্য করিতে হইলে, যখন আছে তখন তাহা বিশুদ্ধই হইয়াছে, কারণ উহার প্রতিবাক্য কল্পনা করিতে হইলে "মান্যকারী" হইলে এইরূপই হইবে। 'করিতে' 'হইলে'—করা ও হওয়া এই ক্রিয়াদ্বয় থাকাতেই মান্যপদ উভয়াম্বয়ী হইয়াছে। আমার ভাষা চ্যুতসংস্কৃতি দোষে দূষিত বলা রজনী বাবুর অনুকূল যুক্তি নহে সুতরাং তিনি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করিয়া নিজের প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। বঙ্গভাষার রচনাবলীর ভাষাগত সামান্য দোষের এত সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইলে তাহাতে কোন বিশেষ লাভ নাই এবং তাহা হইলে প্রসিদ্ধ পুস্তকের সুলেখকগণের রচনাও এতদূর সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিগণের সমীপে দোষাশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবেক। রজনী বাবু নিজে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক কিন্তু তাঁহার লেখাতেও এইরূপ ভাষাগত দোষ দেখান যাইতে পারে। তিনি আলোচ্য প্রস্তাবের ৩৬৫ পৃ, ১ম স্তম্ভে লিখিয়াছেন "এইরূপ যুক্তি ও বিচারের সংঘাতে সর্ব্বপ্রকার সংশয় জাল বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিণামে সিদ্ধান্ত-ক্ষেত্র পরিষ্কৃত ও অনায়াস-গম্য হইতে পারে" পাঠকগণ বিবেচনা করুন এরূপ লেখা সদোষ কি না? আনন্তর্য্যবোধক অসমাপিকা ক্রিয়া আর সমাপিকা ক্রিয়া এই উভয় ক্রিয়ার কর্ত্তা অভিন্ন হওয়াই নিয়ম। এই নিয়মের অন্যথা হয় না। যদি ঐরূপ দৃঢ় নিয়ম সত্ত্বেও "হইয়া হইতে পারে" লেখা যায়—তবে তাহা অসাধু ও অর্থবোধের ব্যাঘাত-জনক হয়। "সংশয়জাল-বিচ্ছিন্ন হইয়া" এখানে "হইয়া" এই আনন্তর্য্যবোধক ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ "সংশয়জাল-বিচ্ছিন্ন" এই পদের সহিত হইতেছে সুতরাং আনন্তর্য্যবোধক অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তার সহিত "হইতে পারে" "ইত্যাদি সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তার সহিত ঐক্য না থাকাতে নিয়ম ভঙ্গ ও সদোষ হইয়াছে সন্দেহ নাই। "হইয়া" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতের "ভূত্বা" প্রভৃতি শব্দের তুল্য-কার্য্যকারী সুতরাং ক্তাচ্ প্রত্যয়ের এক-কর্ত্তৃকত্ব নিয়ম আছে কি না তাহা সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন।

বৃহৎ-কথা আরব্যোপন্যাসের তুল্য বলিয়াছি বটে কিন্তু তাহার লক্ষ্য গল্পাংশ মিথ্যা হইলেও তাহার অবলম্বন দেশকাল পাত্র মিথ্যা না হইলেও হইতে পারে, কেননা পাণিনির অধ্যাপক উপবর্ষ ও বর্ষ পণ্ডিতের নাম যেমন ইহাতে পাওয়া যাইতেছে তেমনি অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থেও তাঁহাদের নাম ও মত দেখিতে পাইতেছি যথা—

"অতঃ ভগবানুপবর্ষঃ"

(শারীরিক ভাষ্য ২ অধ্যায়)

এইজন্যই আমরা বৃহৎ কথার উল্লেখ

অনুসারে পাণিনিকে নন্দের সমসাময়িক বলিয়াছি। পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকারের পাণিনির কাল নির্ণয় অযৌক্তিক বিবেচনা হওয়াতে আমাদিগকে অগত্যা এই প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইতেছে। রজনী বাবু কিম্বা অন্য কোন প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী মহোদয় বলবৎ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই মত খণ্ডন করিতে পারিলে, আমরা তাঁহার বাক্য সাদরে গ্রহণ করিব।

রজনী বাবু কহেন (৩৬৬ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ) "নির্ব্বাণো বাতে" এই সূত্রানুযায়ী সিদ্ধান্তের যুক্তি উল্লেখ করিয়া আমি তাহাতে কিছু বলি নাই, এজন্য আমার প্রবর্ত্তিত বিচার অব্যাপ্তি-দোষাক্রান্ত হইয়াছে। রজনী বাবু কি অবগত নহেন যে অব্যাপ্তি দোষ লক্ষণ সমন্বয়ের কাল ব্যতীত অন্যকালে স্বরূপ লাভ করে না? অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব, এই ত্রিবিধ দোষ, লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইলে অবশ্য পরিহার্য্য। বিচারের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? "লক্ষ্যে লক্ষণাঽগমন মব্যাপ্তিঃ, অলক্ষ্যে লক্ষণস্য গমনম তিব্যাপ্তিঃ" অর্থাৎ লক্ষ্য পদার্থে লক্ষণ স্পর্শ না হইলে সেই লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয় এবং লক্ষণ অলক্ষ্য বস্তু স্পর্শ করিলে অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। আমি নির্ব্বাণ শব্দের বিচার ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার বিচার অব্যাপ্তি-দোষাক্রান্ত কিরূপে হইল? যদি বলেন, লক্ষ্য পদার্থের ন্যায় বিচার্য্য পদার্থেও বিচারের স্পর্শ না থাকিলেও সে বিচার অব্যাপ্তি-দোষযুক্ত হয় কিন্তু তাহা হইলে বা অব্যাপ্ত হইবে কেন? নির্ব্বাণেঽবাতে এই সূত্রের সিদ্ধান্ত (পাণিনি বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী) আমার বিচার্য্য নহে সুতরাং অবিচার্য্য পদার্থের বিচার করাই দোষ—তাহা না করা দোষ নহে।

৩৬৭ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে তিনি লিখিয়াছেন "আমি চিত্রও আশ্চর্য্য" এই সমুদায় বাক্যকে সূত্র বলিয়াছি এবং ইহা আমার লিখন-ভঙ্গীতেও প্রতীত ঘটে কিন্তু তাহা আমার মনোগত নহে এবং তাহা আমি রজনী বাবুকে বিস্মিত বা দুঃখিত করিবার জন্য লিখি নাই। পাণিনি মুনি যখন চিত্র শব্দের অর্থ বিশেষ অবধারণ করেন নাই, তখন লোকপ্রসিদ্ধ অর্থই যে তাহার অর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ইহা ভাষ্যকারের প্রতীক দিয়া বুঝাইয়াছি মাত্র, আশ্চর্য্যার্থক চিত্র শব্দের উত্তর ক্যচ্ বিধান করা যদি পাণিনির অভিপ্রেত না হয় এবং চিত্র শব্দের অর্থ পাণিনির পরিজ্ঞাত না থাকে, তবে ভাষ্যকার বা বার্ত্তিককার কিরূপে আশ্চর্য্যার্থক চিত্র শব্দের উত্তর ক্যচ্ প্রত্যয় করিতে অনুমতি দিলেন? পাণিনির অভিপ্রায় ব্যক্ত করা ভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যাকরণ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। চিত্র শব্দের আশ্চর্য্য অর্থ যদি পাণিনির পরিজ্ঞাত থাকে তবে পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে গোল্‌ডষ্টুকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হয় কি না? অর্থাৎ চিত্র আশ্চর্য্য অদ্ভুত এই

সকল শব্দ রূপার্থ হয় কি না এবং তাহা পাণিনির সময়ে প্রচলিত কি না? যদি তাহারা বিপরীত তর্ক উপস্থিত করেন তবে বহু পূর্ব্বের এই ঋক্ মন্ত্রের চিত্র শব্দের উপায় কি হইবে?—

চিত্রম্ দেবানামুদাদগ্যানীকম্
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ
সামবেদীয় সন্ধ্যা মন্ত্র।

দেবানাং দ্যোতমানানাং রশ্মীনাং অনীকং সমূহঃ
সূর্য্য উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্তঃ চিত্রং যথাস্যাৎ তথা

এই স্থানে চিত্র শব্দ কখনই কাদাচিৎক অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে না সুতরাং আশ্চর্য্য অর্থ বলা হইয়াছে সন্দেহ নাই সুতরাং কাজে কাজেই পাণিনির পূর্ব্বেও চিত্র শব্দ আশ্চর্য্য অর্থে ব্যবহৃত হইত, সুতরাং পাণিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন।

আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে পাণিনির পর-সাময়িক বলি নাই। পাণিনিই তাঁহার পরবর্ত্তী। রজনী বাবু "যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি" পদ কিরূপে সিদ্ধ হইবেক তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝেন নাই। তাহা "কণ্বাদিভ্যো গোত্রে ৪।২।১১১" সূত্র দ্বারা শৈষিক অণ্-প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইবেক। যদি বলেন "পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু" ৪।৩।১০৫ সূত্র দ্বারা ণিনি প্রত্যয় হইল না কেন? তাহার প্রত্যুত্তর পাণিনি তাঁহাকে অতি পুরাতন বলিয়া জানিতেন না। (একবারে জানিতেন না এরূপ নহে। ২০০ শত বৎসর আগে হইলেও আমরা রঘুনন্দনের স্মৃতিকে নব্যস্মৃতি বলিয়া থাকি, তাই বলিয়া কি আমরা তাঁহাকে জানিনা বলিব?) এটী কাশিকায় বিশদ করিয়া লিখিত হইয়াছে যথা "পুরাণপ্রোক্তেষিতিকিম্ যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি। আশ্মরথঃ কল্পঃ। যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ অচির কালা ইত্যাখ্যানেষু বার্ত্তা। তয়া ব্যবহরতি সূত্রকারঃ।" তয়া বার্ত্তয়া ইত্যর্থঃ। কি আশ্চর্য্য! যে ছান্দোগ্যে যাজ্ঞবল্ক্য ভিন্ন কিছুই নাই পাণিনি সেই ছান্দোগ্যের নাম নির্ব্বাচন করিলেন। অথচ তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জানিতেন না ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? পাণিনি "ছান্দোগ্যৌক্থিক যাজ্ঞিক বহ্বচ নটাঞ্ঞ্যঃ" ৪।৩।১২৯ সূত্র করিয়া ধর্ম্ম বা আম্নায় অর্থে ছান্দোগ্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া দিয়াছেন—ছন্দোগানাং ধর্ম্মো বা আম্নায়ো বা ছান্দোগ্যম্।" অপিচ, পাণিনি ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন বৈশম্পায়নের শিষ্য ৯ জনকে চিনিলেন কিন্তু তিনি তৎসাময়িক যাজ্ঞবল্ক্যকে চিনিলেন না ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ কঠ ও চরক বৈশম্পায়নের শিষ্য, যাজ্ঞবল্ক্যও তাহার অপর একজন শিষ্য। আথর্ব্বণিক ও অথর্ব্ব ও বেদোক্ত আঙ্গিরস ঋষির নাম পাণিনি উল্লেখ করাতেও পণ্ডিতবর গোলডষ্টকরের কথা অনুসারে রজনীবাবু কি জন্য বলিতেছেন যে পাণিনি অথর্ব্ব বেদ জ্ঞাত ছিলেননা—ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি ঋত্বিক বিশেষের ধর্ম্ম কি এই আদি পদ দিয়া আম্নায় শব্দের

আচ্ছাদন করিয়াছেন। আম্নায় শব্দ বেদ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না এবং ধর্ম্ম বলিলেও তাহাতে বেদ বুঝাইবে। যদি অথর্ব্ব বেদ না থাকিত তবে তদ্বেদের ধর্ম্ম বা ঋত্বিক কি প্রকারে হইবেক? কাশি-কাকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন "আথর্ব্বণো ধর্ম্ম আম্নায়ো বা" মনু প্রভৃতি যখন বেদাধ্যায় বাচক আরণ্যক শব্দ অবগত ছিলেন তখন পাণিনি তাহা জানিতেন না এ কথা রজনী বাবু পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করাতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। এ বিষয় পূর্ব্ব প্রস্তাবে লিখিয়াছি এজন্য তাহার পুনর্ব্বিচার নিষ্প্রয়োজন। চিত্রও এইরূপ বর্ণাশুদ্ধির উল্লেখ করাতে রজনী বাবুর অমর্ষ প্রকাশ পাইতেছে। মুদ্রাকর, লিপি-দর্শক ও লিপিকরের অনবধানতার এরূপ বর্ণাশুদ্ধি সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে।

রজনী বাবু বারম্বার লিখিয়াছেন "পাণিনি শতপথ ব্রাহ্মণকে চ্যুত-সংস্কৃতি-দোষে দুষ্ট করিবেন কেন?" তিনি পুনঃ ২ চ্যুত-সংস্কৃত দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন অথচ তাহা তাহার বাস্তবিক স্থল নহে। 'শত পথ ব্রাহ্মণম্' শব্দ দুষ্ট হইবে কেন তাহা বুঝিতে পারিলামনা। পাণিনির জ্ঞানে তিনি অতি পুরাতন নহেন এই জন্য তিনি শতপথাদি ব্রাহ্মণকে ণিনি প্রত্যয় দ্বারা যাজ্ঞবল্কী এই রূপ প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন মাত্র। ইত্যলম্।

শ্রীরামদাস সেন

যুনানী * নাট্যপ্রণালী।

নাট্য রচনা সম্বন্ধে তিনটি পৃথক্ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, ঔপন্যাসিক বা স্বাভাবিক প্রণালী। কালীদাস, ভবভূতি প্রভৃতি আর্য্য কবিগণ; সেক্ষপিয়ার, জনশন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণ; এবং কালডেরণ, লোপডিভেগা প্রভৃতি ইস্পানীয় কবিগণ এই প্রণালীতে অতীব উপাদেয় নাটক-পরম্পরা রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। পাঠক মাত্রেই এই প্রণালীর কোন না কোন নাটক অবশ্যই পাঠ করিয়া থাকিবেন, অতএব এ স্থানে ইহার বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রকৃতিই এই প্রণালীর প্রাণ ও পর-মাত্মা। দ্বিতীয় প্রণালী যুনানী বা নিয়মাত্মক। ইহাই আমাদিগের উপস্থিত প্রস্তাবের বিষয়, ইহার বিবরণ আমরা বিস্তৃত রূপে পরে বলিব। তৃতীয় কাল্পনিক বা অস্বাভাবিক। এই প্রণালীর প্রবর্ত্তক গেটি প্রভৃতি আধুনিক জর্ম্মান্ কবিগণ; এই নিমিত্ত এই প্রণালী, জর-

* Greek.

মান্ প্রণালী জর্ম্মণ প্রসিদ্ধ। ইহা যুনানী প্রণালীর ঠিক বিপরীতাবলম্বী এবং ঔপন্যাসিক প্রণালী হইতেও অনেক বিভিন্ন। এই প্রণালীর নাটকের কেবল বাহ্যাকৃতির সহিত ঔপন্যাসিক নাটকের সৌসাদৃশ্য আছে; কিন্তু প্রকৃতিগত উভয় জাতীয় নাটকে অবাস্তব ভেদ লক্ষিত হয়। কোন কোন জরমান নাটকে সংস্কৃতের ন্যায় সূত্রধার প্রসঙ্গ প্রভৃতি পূর্ব্ব রঙ্গও * দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় নাটক যথেচ্ছা রচিত, কোন নিয়মেরই অধীন নহে এবং আদ্যোপান্ত অস্বাভাবিক ও অসম্ভব সংস্থানে পরিপূর্ণ। ইহার পাত্র সকল ঘোর পাপী ও নীচাশয়। প্রচলিত রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির বিপরীত শিক্ষাই ইহার বীজ মন্ত্র। পাপই ইহার কর্ম্ম এবং অধর্ম্মই ইহার ধর্ম্ম। যথেচ্ছাচারিতা, অবৈধ স্বাধীনতা ও সমাজ-বিপ্লব ইহার লক্ষ্য, এবং বিশ্বজনীন্ নবীনতাই ইহার সৌন্দর্য্য ও মহদাকর্ষণ। ফলতঃ রঙ্গাঙ্গণে এই জাতীয় নাটক অত্যন্ত আমোদজনক ও ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। ইহার অভিনয়ে দর্শক-মণ্ডলীকে কখন উদ্দীপিত, কখন উল্লাসিত কখন বা চকিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। বাঙ্গালা শরৎ-সরোজিনী নাটকে জারমান প্রণালীর অনেক আভাস পাওয়া যায়। বোধ হয় গ্রন্থকার শিলর-প্রণীত "রবর" নাটক আদর্শ করিয়া শরৎসরোজিনী লিখিয়া থাকিবেন।

* See Goethe's "Faust"

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মতে তাঁহাদের ভরত মুনি সর্ব্ব প্রথম পৃথিবীতে নাট্য রচনা প্রচার করেন। প্রত্যুত বিদ্যাভিমানী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে হিন্দুদিগের সাহিত্যে আদৌ দৃশ্যকাব্য ছিল না, তাঁহারা যুনানী জাতির নিকট নাটকের রচনা ও অভিনয়-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভরত মুনি পৃথিবীর নাট্যগুরু কি না তাহা আমরা জানি না, পরন্তু ইংরাজাবিষ্কৃত পুরাবৃত্ত-তত্ত্বেও আমাদের বিশেষ আস্থা নাই। তাঁহারা জটিল তর্ক শাস্ত্রের বলে, অনেক স্থলে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঋষি প্রণীত রামায়ণ যুনানী ইলিয়দের অনুবাদ, এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা বাইবেলের অনুকৃতি। এ প্রকার প্রলাপ বাক্য পরম্পরাও যদ্যপি বিশ্বাস করিতে হয় তত্রাচ আমাদের আর্য্য পিতামহগণ যে যুনানীজাতির নিকট নাট্যামোদ শিক্ষা করিয়াছিলেন এ কথা আমরা কোন মতেই প্রত্যয় করিতে প্রস্তুত নহি, যেহেতু পরে প্রদর্শিত হইবে, সংস্কৃত নাটকের সহিত যুনানী নাটকের কোনই সাদৃশ্য নাই। ইংরেজ পণ্ডিতেরা একদিন যদি বলিতেন যে সংস্কৃত নাটক ইংরেজী নাটকের অনুকরণ, তাহা হইলে বরং তাঁহাদের কথা কতকটা শোভা পাইত; কেন না উভয় জাতীয় নাটক একই প্রণালীতে রচিত। কিন্তু তাঁহাদের সে কথা বলিবার পথ নাই। সেক্ষপিয়র জন্মিবার বহুকাল

পূর্ব্বে কালীদাস মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইংরেজেরা যখন উল্‌কি-কলঙ্কিত গাত্র পশুচর্ম্মে আবৃত করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করেন, তখন বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির রাজসভায় শকুন্তলার শত বার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক য়ুনানী ও সংস্কৃত নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিস্তর বৈষম্য দৃষ্ট হয়। আমরা তুলনায় এই উভয়বিধ নাটকের স্বরূপালোচনা করিয়া, য়ুনানী প্রণালী কিরূপ তাহা পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃত নাটককারগণ স্বভাবের অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। য়ুনানী কবিগণ নাট্যসম্বন্ধে, কেবল কতিপয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকাবলী ঔপন্যাসিক বা স্বাভাবিক প্রণালীতে রচিত, য়ুনানী নাটক সমূহ নিতান্ত নিয়মাধীন। নিয়মের অনুরোধে য়ুনানী নাটককার দিগকে অনেক সময়ে স্বভাবকে উপেক্ষা করিতে হইয়াছে। নাটকে দেশ, কাল ও ঘটনার একতা সংরক্ষণই তাঁহাদের প্রধান নিয়ম*। একস্থলে, একদিনের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ঘটনার পরিসমাপন তাঁহাদের মতে অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত য়ুনানী নাটকের অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক প্রভৃতি কোনই পরিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায় না।

য়ুনানী নাটক অতীব ক্ষুদ্রায়তন প্রায় কি উক্ত প্রণালীর একখানি সম্পূর্ণ নাটক সংস্কৃত নাটকের একটি অঙ্কেরও অপেক্ষা বিস্তৃত নহে এবং উহাতে কোনই প্রকার পূর্ব্বরঙ্গ লক্ষিত হয় না। পরন্তু সংস্কৃত নাটকে দশম অঙ্ক পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে এবং উক্ত ভাষায় একখানিও এমন নাটক আছে কিনা সন্দেহ যাহাতে নট-নটী বা সূত্রধার-প্রসঙ্গ নাই।

য়ুনানী নাটকে দেবতা ও মনুষ্য সাকল্যে প্রায়ই চারি পাঁচটির অধিক চরিত্র থাকে না; এবং একটি করিয়া গায়ক*-সম্প্রদায় প্রত্যেক নাটকে ভিন্ন ভিন্ন বেশে কুশীলবদিগের সহিত নাট্যঘটনায় সমান সহায়তা করিয়া থাকে। ফলতঃ গায়ক সম্প্রদায় য়ুনানী নাটকের একটি প্রধান অঙ্গ। সংস্কৃত নাটকে গায়ক-সম্প্রদায়ের চিহ্নও নাই এবং ধীবর হইতে রাজাধিরাজ, দাসী হইতে রাজমহিষী পর্য্যন্ত বিবিধ-জাতীয় চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুনানী নাট্য

* Unity of time, place, and action.

* Chorus.

"With respect to the character which the Chorus should support in the play, Aristotle says it should be considered as one of the persons of the drama, should be a part of the whole, and a sharer in the action'.

" The chorus must support
an actor's part,
Side with the virtuous
and advise with art.,,
Art of Poetry.

ঘটনা সমস্তই প্রায় অতি-মানুষিক, দেব-তারাই সকল ঘটনার নেতা, মনুষ্যগণ তাঁহাদের হস্তে যন্ত্র-স্বরূপ। মনুষ্যের সকল কার্য্যই দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে। এই নিমিত্ত যুনানী নাটকে মনুষ্য-চরিত্র অনেক স্থলে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে নাটোক্ত পাত্র ও পাত্রিগণ সহ পাঠকের সহানুভূতি জন্মে না। পরন্তু সংস্কৃত নাটকের নায়ক নায়িকার সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, এবং আহ্লাদ বিষাদ, পাঠক বা দর্শকের যেন নিজের বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে। বস্তুতঃ মনুষ্যের স্বাধীন কার্য্যের ক্রমানুসরণে আমাদের যত কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় এবং সেই কার্য্যের ফলাফল জানিবার জন্য যত ঔৎসুক্য জন্মে, দৈবসম্পাদিত ঘটনায় তত কখনই হইতে পারে না।

নবরস-বিশিষ্ট না হইলে সংস্কৃত নাটক, নাটক বলিয়াই ধর্ত্তব্য নয়। অধিকাংশ সংস্কৃত নাটককে, শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, প্রভৃতি বিবিধ রসের পলায় বলিলেও অসঙ্গত হয় না, সংস্কৃত নাটকে শৃঙ্গার রসেরই অধিক প্রাদুর্ভাব। দুই একখানি ভিন্ন প্রায় সমস্ত নাটকই নায়ক নায়িকার প্রণয় প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। কিন্তু রস সম্বন্ধে যুনানী কবিগণ অনেক সতর্কতা ও নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন নাটকেই এক বা দুইটি রসের অধিক অবতারণ করেন নাই। গম্ভীর নাট্যব্যাপার মধ্যে অনর্থক বিদূষকের বিরক্তি-জনক রসিকতা নিবিষ্ট করিয়া কুত্রাপি রসভঙ্গ করেন নাই। তাহাদের হাস্য রসের পৃথক্ নাটক আছে। প্রহসন তাঁহারাই প্রথম কল্পনা করেন। এবং তাঁহাদের রচনাবলীতে আদৌ আদিরসের নামগন্ধ রাখেন নাই। শৃঙ্গার রস ব্যতীত, তাঁহারা যখন যে রসের অবতারণ করিয়াছেন তখন সেই রস যেন মূর্ত্তিমান দেখাইয়া গিয়াছেন।

যুনানী নাটক কোন কোন বিষয়ে ঔপন্যাসিক নাটক অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও আধুনিক জরমান নাটক হইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। যুনানী নাটকে, সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্য আছে; ঔপন্যাসিক নাটকে, সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য আছে; একটি সূর্য্য, অপরটি চন্দ্র—উভয়ই সুন্দর। একটিতে আমাদের ভক্তির উদয় হয়, অপরটিকে আমরা হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। আর্য্য শ্লেগেল যুনানী নাটকের সহিত ভাস্কার্য্যের এবং ঔপন্যাসিক নাটকের সহিত চিত্র কার্য্যের তুলনা করিয়া যাহার পর নাই সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ পুরু-বিক্রম নাটকে যুনানী প্রণালী কিয়দংশে অবলম্বিত হইয়াছে।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

মেহের আলি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এই সকল ঘটনার পর আসগরআলি ও ফজর আলি স্বদেশে গমন করিল। মেহেরকে পরাজয় করিতে না পারিয়া, তাহার আশা ভরসা, মেহেরন্নিসাকে সন্ধান করিতে আসিল, যে তাহার অবস্থা দেখে মেহের আলি মর্ম্ম ব্যথা পায় ও দেশ ছাড়ে। আসিবামাত্র বাকর আলির মুখে শুনিল মেহেরন্নিসা বনবাসে ছিল, একদল মগী এসে তাহাকে হরণ করে লয়ে গেছে। বাকরের নিজ কার্য্য সে গোপন করিল এবং যাহাতে বিশেষ গোপন থাকে, বাকর সেই অহিতাচারের পর আমীর জানের পদানত হইয়া ক্ষমা চায় ও ঐ কথা প্রকাশ না করেন এজন্য জিদ করে। আমীরজানও ভাবিলেন প্রকাশ করিলে তাঁহার অখ্যাতি ও হয়ত অনিষ্ট হইতে পারে, অতএব ঐ প্রস্তাবে সম্মতা হয়েন।

মোক্তার গঞ্জাম হইতে আসিবার কালে একটী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাহাতে নিশ্চিন্ত ছিলেন। মেহের আর দেশে আসিবে না। মেহেরন্নিসা যেন প্রণয়-পাত্র ফজর আলিকে লিখিয়াছে ও মেহের আলির দুরাকাঙ্ক্ষা উপহাস করিতেছে, এইরূপ ভাবে কয়েক পত্রিকা, সৃজন করিয়া একটি তাড়া বাঁধিয়া মেহের আলির পথে ফেলিয়া রাখেন। মেহের ও যে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, মোক্তার সন্ধান পাইয়াছেন। মেহের ও যে তাহার পর জাহাজে চট্টগ্রামে যাইতে নিষেধ করিয়া একেবারে শ্রীহট্ট যাইতে আদেশ দেয়, আসগর আলি তাহাও শুনিয়া আসিয়াছেন।

একদা সন্ধ্যা কালে মোক্তার আপন বাটীর সম্মুখে বেড়াইতেছেন। এমত সময় এক জাহাজী ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। মোক্তার সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিতেছ? কে তুমি? কাহারে চাহ?"

জাহাজী। আপনার নাম কি? আমীর আলি মোক্তার সাহেব? আপনি না রকিমুন্নিসা জাহাজের অধিপতি? আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না?

মোক্তার। কৈ ভাল চিনিতে পারিতেছি না, অন্ধকার! কোথায় দেখেছি বল দেখি?

জাহাজী। আর চিনিতে হইবে না, আমি নিজ পরিচয় দিতেছি। গঞ্জাম জানেন?—মেহের আলিকে জানেন?—আমি মেহের আলির জাহাজের একজন চাকর ছিলাম।

মোক্তার, সন্দিগ্ধ চিত্তে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন ও কহিলেন "এখানে

কি অভিপ্রায়ে? জাহাজী মনোগত সন্দেহ বুঝিয়া কহিল. "হুজুর উহার কি সন্দেহের কারণ নাই। আমি আর মেহেরের চাকর নহি, পরম শত্রু। আপনার কাছে এসেছি তাঁহার প্রতি বৈরনির্য্যাতনের পরামর্শ করিতে।"

মোক্তার। শত্রু কিসে হইলে?

জাহাজী। দেখুন আমার হস্তের অঙ্গুলি নাই, দুষ্ট মেহের আলি আদেশ দিয়া তাহা কাটাইয়াছেন।

মোক্তার। কি জন্য এই দণ্ড দিলেন?

জাহাজী। আমি হাল ধরে ছিলাম, সম্মুখে চড়া বলে হাল ফেরাইতেছিলাম; মেহের কহেন সোজা চল। আমি তাহা শুনিলাম না, হাল ছাড়িলাম না, আমাদেরওত প্রাণভয় আছে। বদরাগী আমীর অঙ্গুলি কাটাইয়া দণ্ড দিলেন! দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি গেছে, খাই কি করে? আল্লা! এ অপরাধ আমি জন্মে ভুলিবনা।

মোক্তার। বুঝিলাম. তুমি তাহার শত্রু হইয়াছ, তোমার অঙ্গদৃষ্টে প্রমাণও পাইলাম, এক্ষণে আমার সহিত তোমার কি পরামর্শ আছে?

জাহাজী। মহাশয় মেহের বড় ভয়ানক লোক, পরমেশ্বর তাহাকে কেমনি আটকে ফেলেছেন, এখন আপনার কৌশল হইলে তাহাকে নাশ করা যায়। — কিন্তু সে কথা গোপনে বলা চাহি, আপনি অগ্রসর হইয়া ঐ নিৰ্জ্জন অশ্বত্থ বৃক্ষ তলে চলুন; বলিতেছি।

মোক্তার। এখানেও কেহ নাই; নয় আমার ঘরে চল।

জাহাজী। আমার বড় ভয় হইতেছে, কে শুনিবে। আপনার কোন ভয় নাই আসুন না।

মোক্তার। তবে বিলম্ব কর কিছু অস্ত্র শস্ত্র লই ও বিশ্বাসী লোক একজন লই।

জাহাজী। মহাশয় আমি শপথ করিতেছি, আমার বিলম্ব সহেনা। আমি অঙ্গুলিহীন নিরস্ত্র ও বিদেশী, আমাকে আশঙ্কা! আপনার বিশ্বাস না হয়, ইচ্ছা না হয়,—আমি চলিলাম। বিলম্ব করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবেক না।

এই কথা বলে জাহাজী চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল ও সেলাম করিল। সাত পাঁচ ভেবে মোক্তার তদনুবর্ত্তী হইলেন। ভাবিলেন দেশের মধ্যে আমার ভয় কি? কিন্তু যেই অশ্বত্থতলে আসিয়াছেন, সহসা অন্ধকার হইতে কে একজন মোক্তারকে ধাক্কা দিয়া ফেলিল, বক্ষঃস্থলে বসিল ও মুখ চাপিয়া ধরিল। সকলই মুহূর্ত্তের কার্য্য। মোক্তারের সাধ্য নাই যে লোক ডাকেন, অথবা বক্ষঃ হইতে অজ্ঞাত শত্রুকে ফেলিয়া দেন। বিশেষতঃ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বনবাড়ি হইতে পলায়নে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। আততায়ী কহিল "দুষ্ট আমায় চিনিস না আমি তোর যম।" সেই গম্ভীর স্বরে মোক্তার শিহরিল—এবার প্রাণ গেল বুঝিলেন। গোঁ গোঁ করে বলিলেন, মুখ ছাড়

চেঁচাইব না। আততায়ী তীক্ষ্ণ অস্ত্র মুখের কাছে ধরিয়া কহিলেন, চেঁচাও ত অমনি গলায় বসাব, নচেৎ প্রাণে মারিব না। মোক্তার স্বীকার হইল। আততায়ী মুখের ধারে একহাত রাখিয়া ও একহাতে ছুরিকা ধরিয়া রহিলেন। জাহাজী আসিয়া মোক্তারের পা চাপিয়া ধরিল। পরে আততায়ী কহিলেন "বল কি বলবি ?"

মোক্তার। আমায় মার কেন ?

আততায়ী। মূর্খ! মারিবার পাত্র তোমা অপেক্ষা আর কে পৃথিবীতে আছে ?—জানিস না, নেমোক্ হারাম! আমার স্বর্গীয় পিতার সর্ব্বস্ব তুই লয়েছিস্!—পরে তাঁহার প্রাণবিনাশের হেতু হয়েছিস্!———আমার মাতার আত্মহত্যা ও অপমানের কারণ তুই। আমার প্রণয়িনীর সতীত্ব নাশের কারণও তুই! এবং আর বাকী কি আছে, আমাকে একবার রাক্ষসের মুখে একবার অনাহারে ও একবার অগ্নিকুণ্ডে মারিতে উদ্যত হয়েছিলি!—আমি সেই মেহের আলি।

মোক্তার এবার প্রাণে হতাশ হইয়া একবার গা ঝাড়া দিল, পারিল না। চেঁচাইবার উদ্যোগ করিল, মুখ তখনি চাপা হইল, চেঁচাইতে পারিল না। অবশেষে নিতান্ত ব্যকুল হইয়া কহিল, আর পলাইবার চেষ্টা করিব না, প্রাণে মেরোনা, তুমি এখন যাহা চাহ করিতে স্বীকার আছি। মোক্তার কাপুরুষ, প্রাণ-ভয়ে নিতান্ত পদানত হইল। মেহের কহিল "পাপিষ্ঠ! তোর কাছে কি চাহিব ? যে কার্য্য করেছিস্ তাহার আর প্রতীকার নাই। পিতা মাতাকে আর পাব না। আমাকে মারিতে পারিস্ নাই, তাহাতে ভয় কি ? ধন লয়েছিস্—ফিরে লইতে পারি, তাহাতে প্রয়োজন নাই। তুই যে আমার প্রণয়িনীর সতীত্ব নাশ করাইয়াছিস্—তাহার প্রতিশোধ তোর জীবন নাশ।"

মোক্তার। সকল অপরাধ স্বীকার করিতেছি; আমার ধন লও সব লও, প্রাণে মেরো না। যে প্রাণের জন্য এতটা করেছি—তাহা ছাড়িতে পারিব না।

মেহের। হতভাগ্য! এখনও তোর জীবনের আশা আছে ?

মোক্তার। আছে, তুমিই আশা দিলে। যদি মেহেরন্নিসার সতীত্ব নাশ ব্যতীত তাবৎ অপরাধ ক্ষমা কর, আমার আশা আছে।

মেহের। হাঁ, ও সব ত যা হইবার হয়েছে। এখন এক মেহেরন্নিসার প্রতি অপরাধই আমার অন্তরের শেল রহিয়াছে—সে অপরাধেই তোর শত প্রাণদণ্ড বিধেয়।

মোক্তার। মেহেরন্নিসাকে ফজর আলি লয়ে গেছিল বটে কিন্তু তাহার সতীত্ব নষ্ট হয় নাই। সে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া বনবাসে গেছিল।

মেহের। প্রমাণ কি ?

মোক্তার। যে রূপে সন্তুষ্ট হও প্রমাণ দিব। পাড়া প্রতিবাসী ঝবঝবয়র দোকানী সকলকে জিজ্ঞাসা কর।

মেহের। মিথ্যাবাদী! আমি মেহেরের প্রেম-পত্রিকা পড়িয়াছি, তাহাতে ফজরের প্রতি তাঁহার ভাব বুঝা গেছে।

মোক্তার। সে গুলি, আমার কৌশল-সৃষ্ট, ভাল করে দেখ মেহেরের হস্ত-লিপি নহে।

মেহের। আচ্ছা আমি যে এত পত্র লিখিলাম, টাকা পাঠাইলাম, মেহেরন্নিসা তাহার প্রত্যুত্তর দেয় নাই কেন?

মোক্তার। সে সবও আমি আটক করেছিলাম, সে পায় নাই।

মেহের। রোষকষায়িত লোচনে দন্তে দন্তে কড় মড় করিয়া কহিলেন, "নরাধম তোর আরও অপরাধ ব্যক্ত হইল। নরপিশাচ! বল্ সেই কামিনীর শেষ দশা কি হইল?"

মোক্তার কম্পিত স্বরে কহিল "শুনেছি এক দল মগ এসে তাহাকে হরণ করে রামগড়াভিমুখে গিয়াছে।"

মেহের। কত দিন হইল?

মোক্তার। ছয় মাস হইবে।

মেহের মনঃকষ্ট আর সহ্য করিতে না পারিয়া ছুরিকা গলে দিবার উদ্যোগ পূর্ব্বক কহিলেন "সকল অনিষ্টের মূল তুই, তোর প্রাণ বিনা আমার তৃপ্তি হবে না। আর ত মেহেরকে পাব না, পেলেও লইব না। সংসারে আর সুখ নাই, কেবল তোকে মারাই এক সুখ।"

মোক্তার প্রাণ ভয়ে ভয়ানক নড়িয়া উঠিল ও চীৎকার করিল। তাহাতেও রক্ষা হইত না, তবে হন্তা কি ভাবিয়া ক্ষান্ত হইলেন এবং কহিলেন "নরাধম! একবার এই রকমে তোকে মারিতে চাই, বাবা রক্ষা করেন। এবার ও বাবার আদেশ জন্য তোকে প্রাণে মারিলাম না, কিন্তু যথোচিত দণ্ড দিব।" বলিয়া ছুরিকা দ্বারা মোক্তারের দুই চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলেন। এই সব কথা ও কার্য্য এত শীঘ্র হইল, যে মোক্তারের চীৎকার-রব গ্রামবাসীরা বুঝিতে না বুঝিতে মেহের পলায়ন করিলেন। গ্রামবাসীরা এসে রক্তাক্ত অচেতন মোক্তারকে লইয়া তাহার বাটীতে আনিল। অনেক সন্ধানেও আততায়ীদের পাওয়া গেল না।

সম্বন্ধ-নির্ণয় *।

সুবিখ্যাত অধ্যাপক ভট্ট মক্ষমূলর তাঁহার একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে "যে জাতি আপনার অতীত ইতিহাসে জাতীয় গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা করে না, তাহার জাতীয় চরিত্রের মূল-ভিত্তি পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। যৎকালে জার্ম্মাণীতে রাজনৈতিক দুরবস্থার পরিসীমা ছিল না, তৎকালে ইহা আপনার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় নিমগ্ন হয়, এবং অতীতের আলোচনা হইতে

* বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। কৃষ্ণনগর নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

ভবিষ্যতের আশা সংগ্রহ করে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে অধুনা ভারতেও ঠিক এইরূপ ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের ভারত-বিষয়ক বহুদর্শন তাঁহা অপেক্ষা অনেক অধিক; এবং আমরা স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি যে ভারতে ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে আরব্ধ হয় নাই। দুই একজন পুরাবিদ্ পুরাবৃত্তের অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু অদ্যাপি জাতি সাধারণের কথা দূরে থাকুক—সুশিক্ষিত দলের মধ্যেও—ইহা সম্পূর্ণরূপে আরব্ধ হয় নাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রশংসাপত্রধারী বিদ্যাভিমানী ছাত্রকে বলিতে শুনিয়াছি যে আর বৃদ্ধ প্রপিতামহের পুরাতন গল্প শুনিয়া লাভ কি? তাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্তকে "বৃদ্ধ প্রপিতামহের পুরাতন গল্প" এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে ভারত কবে কি ছিল, সে পুরাতন কথার আলোচনায় আর লাভ কি? যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না, তাহার জন্য কাঁদিয়া কি হইবে? শ্রুতি স্মৃতি, রামায়ণ মহাভারত, ইতিহাস পুরাণ, সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি আর্য্য কীর্ত্তিকলাপের চর্ব্বিত চর্ব্বণে ফল কি? আর্য্য বীরগণ কবে কি করিয়াছিলেন তাহার আন্দোলনে আর লাভ কি? ইত্যাদি প্রলাপ বাক্য সুশিক্ষিত দলের মুখে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রায় অধিকাংশই অনক্ষর। অতি অল্পসংখ্যকই সাক্ষর। এই সাক্ষর দলের অতি অল্প সংখ্যাই আবার উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন এই উচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের যখন ঐরূপ মত তখন অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদিগের নিকট আমরা কি আশা করিতে পারি?

অতীত মহিমার অনুশীলন যে পতিত জাতির অভ্যুত্থানের একটী প্রধান উপায়, অধ্যাপক মক্ষমূলরের সহিত এবিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ ঐকমত্য। জার্ম্মাণী যেমন অতীত মহিমার অনুশীলন দ্বারা রাজনৈতিক অবনতির গভীরতা হইতে উঠিতে পারিয়াছিলেন, সেই রূপ ভারতও অতীত মহিমার অনুশীলন করিলে এক দিন রাজনৈতিক গিরির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারিবেন। পুরাবৃত্তের আলোচনা তাঁহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত কারণ হইবে। পুরাবৃত্তের আলোচনা তাঁহাদিগকে বলিষ্ঠ করিবে না বটে, কিন্তু বলিষ্ঠ হইবার ইচ্ছা প্রদান করিবে। পুরাবৃত্তের আলোচনা তাঁহাদিগের হস্তে ধন মান ও জ্ঞান আনিয়া দিবে না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তরে ধনী মানী ও জ্ঞানী হইবার ইচ্ছা বলবতী করিয়া দিবে। ইচ্ছা বলবতী হইলে, মন অভিলষিত বস্তুর দিকে আপনিই প্রবল বেগে ধাবিত হয়; এবং "ক ঈপ্সিতার্থ-স্থির-নিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ" নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতির ন্যায় অভিলষিত বিষয়ে স্থির-প্রতিজ্ঞ মনের গতি কে নিবারণ করে? যেদিক

ভারতে পুরাবৃত্তের আলোচনা প্রচুর পরিমাণে আরব্ধ হইবে, সেই দিন আমরা জানিতে পারিব যে, ভারতের জাতীয় অভ্যুদয় অতি দূরবর্ত্তী নয়।

আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যেরা অল্পসংখ্যক মাত্র বিশাল ভারত-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কেমন করিয়া অল্প দিন মধ্যে সমস্ত ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বি রাজত্ব সংস্থাপন করেন, কেমন করিয়া তাঁহারা প্রকাণ্ড অসুরদিগকে সমরে পরাস্ত করেন, অবশেষে কেমন করিয়া তাঁহারা সভ্যতা শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, এবং কি কি কারণে সেই অত্যুচ্চ শিখর হইতে এই গভীরতম নরকে পতিত হয়েন—ইত্যাদি আলোচনা করিলে যে হৃদয় কি ভাব-তরঙ্গে আপ্লুত হয় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। পূর্ব্ব গৌরবে সুখ—বর্ত্তমান অবনতির কারণ অনুসন্ধানেও সুখ। রোগের কারণ জানিতে পারিলে, প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। রোগের কারণ জানিতে না পারিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা উন্মত্ততা মাত্র। এইজন্য যাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্ত আলোচনা না করিয়া ভারতে ভবিষ্য উন্নতির বীজ বপন করিতে যান, তাঁহাদিগকে আমরা উন্মত্ত বলিব। যখন তাঁহারা রোগের মূল কি নির্ণয় করিতে পারিলেন না তখন তাঁহারা কি ঔষধ প্রয়োগ করিবেন?

এইজন্য আমরা ভারতের হিতৈষী মাত্রকেই অনুরোধ করি তাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্তের আলোচনা আরম্ভ করুন। যাঁহারা এই আলোচনার পথদর্শক হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের জাতীয় উৎসাহ ও জাতীয় ধন্যবাদের পাত্র। যাঁহারা এই গবেষণা ইংরাজী ভাষায় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নাম করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর নাম করিতে হয়। আর যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় এই গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম করিতে গেলে, রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, লালমোহন বিদ্যানিধি এবং প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করিতে হয়। আর্য্যদর্শন এই চারি জনেরই নিকট ঋণী আছে। সুতরাং আর্য্যদর্শনে এই চারি জনেরই পুস্তকের যে কিছু প্রশংসাসূচক সমালোচনা বহির্গত হইবে, তাহাই পক্ষপাত-দূষিত বলিয়া সাধারণের প্রতীতি জন্মিতে পারে। আবার যদি নিন্দা করি, তাহা হইলে আর্য্যদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই উভয় সঙ্কট জন্য আমরা আর্য্যদর্শনের লেখকদিগের পুস্তকের সমালোচনা করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু তাঁহারা যখন পীড়াপীড়ি করিয়া ধরেন তখন তাঁহাদিগের পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা না বলিয়া থাকা যায় না। আমরা সেই জন্য আজ সেই চারিজন গ্রন্থকারের অন্যতমের একখানি গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই গ্রন্থখানিরই নাম যে সম্বন্ধ নির্ণয় তাহা বোধ হয় পাঠক মাত্রেই বুঝিয়াছেন।

ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত। অধুনা বঙ্গদেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সাতশতী, মধ্যশ্রেণী ও পাশ্চাত্য প্রভৃতি নানা জাতীয় ব্রাহ্মণ; ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি নানাজাতীয় শূদ্র; নানাজাতীয় বর্ণসঙ্কর; এবং অল্পসংখ্যক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—বাস করিয়া থাকেন। ঊর্দ্ধতম পুরুষ ব্রহ্মা হইতে অধস্তন পুরুষ-পরম্পরার পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং সেই উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদিগের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও সামাজিক সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

লালমোহন বাবু তাঁহার প্রবন্ধে যে উপকরণ-সামগ্রীর সমাবেশ করিয়াছেন তাহা বহুমূল্য। এই উপকরণ-সামগ্রী বঙ্গের ভবিষ্য ইতিহাস লেখকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি ইহাতে প্রকৃত ইতিহাসকে রূপক হইতে বিশ্লেষিত করিতে পারেন নাই। ইহাতে ইতিহাস ও রূপক এরূপ ভাবে সংমিশ্রিত রহিয়াছে, যে ইতিহাসকে রূপক হইতে পৃথক্ করা পাঠকবর্গের পক্ষে অতি দুরূহ।

মগধাধিপতি অশোকের সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বকালের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এতদূর বাড়িয়াছিল যে বঙ্গে ব্রাহ্মণজাতির এবং বৈদিক ক্রিয়া কলাপের একবারে লোপ হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেবল সাতশত ঘরমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, অবশিষ্ট সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বর্ত্তমান সপ্তশতীদিগের আদি পুরুষ সাতশত ব্রাহ্মণের কেহই বেদপারগ ছিলেন না, এই জন্য ৯৯৯ শকে আদিশূর নরপতি পুত্রেষ্টি যাগের জন্য কাণ্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহের নিকট পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চজন সচ্চরিত্র, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ যজ্ঞ-নিপুণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে বীরসিংহ সাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ-গোত্রীয় দক্ষ, বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড়, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ এবং সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ নামক পঞ্চব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। ইহাঁরা রাজদত্ত প্রসাদ স্বরূপ পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, এই পাঁচখানি গ্রাম পাইয়া তাহাতে বসতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের ছপ্পান্নটী পুত্র সন্তান হইল—ভট্টনারায়ণের ষোলটী, দক্ষেরও ষোলটি, ছান্দড়ের আটটী, শ্রীহর্ষের চারিটী, বেদগর্ভের দ্বাদশটী। এই ছাপ্পান্ন জন পুত্রও বাসের নিমিত্ত রাজার নিকট ছাপ্পান্ন খানি গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। এই গ্রামগুলি রাঢ়দেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহাঁরা এখন হইতে রাঢ়ী নামে আখ্যাত হইলেন। যে যে পুত্র যে যে গ্রামে বসতি করিতে লাগিলেন, সেই সেই গ্রামের নামে সেই সেই পুত্রের বংশ আখ্যাত হইতে লাগিল। এইরূপে রাঢ়ীদিগের মধ্যে পঞ্চগোত্র ও ছাপ্পান্ন গাঁইএর প্রাদুর্ভাব হইল। রাঢ়ীরা এই পঞ্চ গোত্র ও ছাপ্পান্ন গাঁইএর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন না। এই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তাছাড়া বামুন নাই" এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।

এক্ষণে কথা হইতেছে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কোথা হইতে আসিলেন। তাঁহারাও আপনাদিগকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণের সন্ততি বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গাঁই স্বতন্ত্র। এক্ষণে ইহার কি মীমাংসা হইতে পারে? পণ্ডিতবর লালমোহন বলেন যে পূর্ব্বোক্ত

ছাপ্পান্ন ভ্রাতার, সন্ততিগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ায় তাঁহারা বরেন্দ্র ভূমিতে রাজার নিকট কয়েকটী গ্রাম ভিক্ষা করিয়া বসতি করেন। সেই অবধি তাঁহাদিগের সন্ততিগণের বিভিন্ন গাঁই হইয়া যায়। ইহা লালমোহন বাবুর অনুমান মাত্র। কারণ তিনি ইহার স্বাপক্ষ্যে কোন প্রমাণ প্রদান করিতে পারেন নাই। এবং তাঁহার এই অনুমান অপ্রতিদ্বন্দ্বি ও নহে। কারণ কেহ কেহ এবিষয়ের অন্যপ্রকার মীমাংসা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক বঙ্গে আসেন নাই। তাঁহারা যৎকালে বঙ্গে আগমন করেন তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বোঢ়া ভার্য্যারা বাটীতেই ছিলেন। ইহাঁরা বঙ্গে আসিয়া এখানকার ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ কন্যাকে বিবাহ করেন; এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগের পাশ্চাত্য সহধর্ম্মিণীরা বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন; আদিশূর ইহাঁদিগের বাসের জন্য বরেন্দ্রভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন; এই রূপে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয়বিধ ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়। এটীও অনুমান। এই অনুমানদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী সত্য নির্ণয় করা দুরূহ।

এই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয়বিধ ব্রাহ্মণেরাই সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ক্রমে বেদানভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। সুতরাং বঙ্গে আবার বেদপারগ ব্রাহ্মণের আগমন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। এই সময় দ্রাবিড় হইতে একদল দাক্ষিণাত্য বৈদিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা বঙ্গে আসার আগে উৎকলে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরাও ক্রমে বেদানভিজ্ঞ হইয়া উঠেন। সুতরাং আবার একদল বৈদিক পশ্চিম হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হয়েন। এইরূপে বঙ্গে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য দুই শ্রেণীর বৈদিকের আবির্ভাব হয়।

ইহার পর পশ্চিম হইতে বঙ্গে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করেন) ইহাঁদিগের লক্ষ্য বাণিজ্য। ইহাঁরা বাণিজ্য দ্বারা ক্রমে ধনবান্ হইয়া স্বদেশের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানেই অবস্থিতি করেন। ইহাঁরাই পাশ্চাত্য বা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হয়েন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজত্ব কালে বঙ্গে একটী প্রকাণ্ড সমাজসংস্কার আরব্ধ হয়। নানাজাতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহাতে আদান প্রদান প্রচলিত হয় মহারাষ্ট্রীয়েরা তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের যত্নে বিভিন্ন-জাতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে আদান প্রদান আরম্ভ করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ে ইহাতে তাঁহাদিগের গৌরব লাঘব না হইয়া বরং গৌরব বৃদ্ধিই হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় প্রাদুর্ভাবের অন্তর্দ্ধানের সহিত তাঁহাদিগেরও গৌরবরবি ক্রমে অস্তমিত হইল। ক্রমে সেই সংস্কারকেরা "মধ্যশ্রেণী" এই অশ্রদ্ধেয় আখ্যা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে অদ্যাপি এই শ্রেণীর কতকগুলি ব্রাহ্মণের বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে বোধ হয় সমস্ত বঙ্গদেশ এই শ্রেণীর লোকে পরিব্যাপ্ত হইত এবং তাহা হইলে তাঁহারা "মধ্যশ্রেণী" নামে আখ্যাত না হইয়া 'উত্তম শ্রেণী" নামে আখ্যাত হইতেন। আধুনিক সমাজ-সংস্কারকেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিলে বঙ্গের বৈবা-

হিক সীমা যে অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এইরূপে বঙ্গে ক্রমে—সপ্তসতী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, পাশ্চাত্য ও মধ্যশ্রেণী এই ছয় প্রকার ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইল।

এক্ষণে ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ প্রবাদ আছে যে ভগবান্ ভৃগুনন্দন পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করেন; পৃথিবী এইরূপে ক্ষত্রিয়-শূন্য হইলে, ক্ষত্রিয়-পত্নীরা বংশরক্ষার্থ ব্রাহ্মণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লয়েন। সুতরাং এক্ষণকার ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয় জাতির ক্ষেত্রে উৎপন্ন। আর একজাতীয় ক্ষত্রিয় আছেন যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁরা রাজপুত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই দুই দল ক্ষত্রিয়ই বঙ্গদেশে বিরল-প্রসর। সুতরাং এস্থলে ইহাঁদিগের সবিশেষ উল্লেখ করা গেল না।

বৈশ্যজাতি—ইহাঁরাও দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য। ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার প্রায় ক্ষত্রিয় সদৃশ। ইহাঁদিগের জাতীয় ব্যবসায় কৃষি বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবহার। ইহাঁদিগের সাধারণ নাম বণিক্। বঙ্গদেশে ইহাঁরা প্রায় সুবর্ণ-বণিক্ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এই সুবর্ণ-বণিকেরা এক্ষণে কর্ম্মদোষে শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের নিম্নেই শূদ্র ও বর্ণসঙ্করের প্রাদুর্ভাব।

শূদ্রদিগের মধ্যে কায়স্থ প্রধান। কায়স্থেরা উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র প্রধানতঃ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। লালমোহন বাবুর কায়স্থ প্রকরণ অতিশয় জটিল ও অপরিস্ফুট। ইহার আলোচনা ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রস্তাব অতিশয় বাড়িয়া যায়; এই জন্য আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম।

পূর্ব্বোক্ত নানা জাতির পরস্পরসংমিশ্রণে যে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বঙ্গীয় সমাজের একটী বিস্তৃত অঙ্গ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। লালমোহন বাবু বলিয়াছেন যে এই বর্ণসঙ্কর সকল স্থলেই বিশুদ্ধ শূদ্র অপেক্ষা নীচ। একথা আমাদিগের সমীচীন বোধ হয় না। কারণ আমরা দেখিতে পাই উচ্চ শ্রেণীর বীজে ও নিম্নশ্রেণীর ক্ষেত্রে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা উচ্চ শ্রেণীর সমকক্ষ না হউক, নিম্নশ্রেণীর অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহীত হয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এবিষয়ে বৈদ্য ও উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি আমাদিগের নিদর্শন।

গ্রন্থের উপসংহারকালে লালমোহন বাবু পঞ্চগোত্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের বর্ত্তমান সন্ততিগণের যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষ উপাদেয়। কুলীন ব্রাহ্মণমাত্রেই এই জন্য এক খণ্ড করিয়া লালমোহন বাবুর সম্বন্ধ-নির্ণয় রাখা উচিত। এমন অনেক কুলীন আছেন যাঁহারা আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের কোন বৃত্তান্তই অবগত নহেন। যে পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণগরিমায় তাঁহারা অদ্যাপি সমাজে সবিশেষ আদরণীয় হইতেছেন, তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত না হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই।

আধুনিক ভারত। *

ভ্রাতৃগণ! আমি অদ্য অনুরুদ্ধ হইয়া আপনাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। বক্তৃতা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কারণ আমার সাহস ও শক্তি বক্তৃতার অনুকূল নহে। তবে আমার কতিপয় বন্ধুর অনুরোধ এই যে—আমি তাঁহাদিগের নিকট যেমন হৃদয়ের কপাট খুলিয়া ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিয়া থাকি, আপনাদিগের নিকটও আজ সেইরূপ নির্ম্মুক্ত ভাবে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে, দুই চারিটী কথা বলি। আমি এই গুরুতর বিষয় ভাবিতে এক দিন মাত্র সময় পাইয়াছি, সুতরাং এপ্রস্তাব যে অসম্পূর্ণ হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আজ কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী হইল এই সোণার ভারত ইংরাজ বণিক্‌দিগের হস্তগত হইয়াছে। পলাশী যুদ্ধের দিন হইতে ভারতের অদৃষ্ট-চক্রের গতি-পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান রাজাদিগের অত্যাচার দুর্ব্বিষহ হওয়ায় কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু চক্রান্ত করিয়া বঙ্গের রাজমুকুট মুসলমাণের মস্তক হইতে তুলিয়া ইংরাজবণিকের মস্তকে অর্পণ করেন। সকলেই জানেন কেমন করিয়া সেই বন্যায় জল সমস্ত ভারত প্লাবিত করে। সকলেই জানেন কেমন করিয়া সেই ধূর্ত্ত বণিক্ সূচ্যগ্র পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়া এক্ষণে বিশাল শালরূপে পরিণত হইয়াছেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিন্ধুর পশ্চিম উপকূল হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত এক্ষণে ইংরাজ বণিকের প্রচণ্ড প্রতাপে কম্পান্বিত। ইহাঁদিগের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের ভয়ে আজ আমাদিগের হৃদয় এতদূর আকুলিত যে এরূপ প্রকাশ্যস্থলে আমরা হৃদয়ের দ্বার সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া কাঁদিতেও অক্ষম।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন পূর্ব্বপ্রভু সিরাজদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই দুর্দ্দান্ত বণিক্‌দিগকে বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার মনে কত আশা কত অভিলাষ ছিল! তিনি ভাবিয়াছিলেন যে ইংরাজেরা যখন হিন্দুদিগের ষড়যন্ত্রে বিনাযুদ্ধে বা কাল্পনিক যুদ্ধে বঙ্গের সিংহাসন পাইলেন, তখন অবশ্যই তাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব সেনাপতিত্ব প্রভৃতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতা বিরাজমান,

* এই প্রবন্ধটী হিন্দুমেলায় পঠিত হইবে বলিয়া লিখিত হয়। কিন্তু পুলিসের অদ্ভুত মহিমায় মেলা স্থলে যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার জন্য ইহা তথায় পঠিত হয় নাই।

তিনি ইংরাজদিগেরও অন্তরে সেই কৃতজ্ঞতার অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান অস্বাভাবিক বা অমানুষ গুণের উপর ন্যস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার একটী গুরুতর ভ্রম হইয়াছিল। তিনি জানিতেন না যে যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা উত্তেজিত করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহাদিগের পক্ষে স্বকার্য্যসাধন হইলে উপকর্ত্তার প্রতিও বিমুখ হওয়া অতি সহজ।

তিনি ইংরাজদিগকে উপলক্ষ করিয়া মুসলমান ভ্রাতৃগণের চরণে যে শৃঙ্খল পরাইতে গেলেন, ধূর্ত্ত ইংরাজদিগের বুদ্ধিকৌশলে আপনারাও সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। কাণ্যকুব্জাধিরাজ জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের চরণে যে শৃঙ্খল অর্পিত হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই শৃঙ্খল উন্মুক্ত না হইয়া দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়াছে। আজ তাঁহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা সকলেই ভোগ করিতেছি।

যৎকালে ভারত ইংরাজাধিকৃত হয়, তখন ভারতবাসী মাত্রেরই মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, ভারতে ইংলণ্ডের ন্যায় প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, যে জাতি স্বাধীনতার জন্য শ্বেতদ্বীপকে রাজরুধিরে অভিষিক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই সে জাতি দ্বারা জাত্যন্তরের স্বাধীনতাপহরণ অসম্ভব। সে জাতি দ্বারা জাত্যন্তরের উপকার ভিন্ন অপকার হওয়া অসম্ভব। দাসত্ব উন্মোচনের নিমিত্ত যে জাতির সহস্র সহস্র রণতরি সদা সপ্তসাগর আলোড়িত করিতেছে, সেই জাতি যে স্থানান্তরে দাসত্ব-বীজ-বপনে এত পটু হইবেন, তাহা কে জানিতে পারিয়াছিল? কে জানিত যে একাধারে এরূপ পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী গুণদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে?

ইংরাজেরা মনে করিতে পারেন তাঁহারা আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছেন বলিয়া আমাদিগের মনে এরূপ ঈর্ষার ভাব উদিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। ভারত এক্ষণে যেরূপ বিচ্ছিন্নাঙ্গ ও হীনবল তাহাতে কোন প্রবলতর রাজ্যের আশ্রয়ে থাকা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে শ্রেয়স্কর। আমরা কেবল এই মাত্র চাই, যেন সেই বৈদেশিক সাহায্য আমাদিগের ভবিষ্য জাতীয় সঞ্জীবনের প্রতিকূল না হয়। ইংরাজদিগের বর্ত্তমান ভারত-শাসনপ্রণালী যে আমাদিগের ভবিষ্য জাতীয় সঞ্জীবনের প্রতিকূল তাহা আমরা সহজেই প্রদর্শন করাইতে পারি।

যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতের শাসনভার অর্পিত ছিল, তখন উক্ত কোম্পানি এই গুরুতর ভারের সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ও ব্রিটীশ সিংহাসনের নিকট দায়ী ছিলেন। তাঁহাদিগের ভারত-প্রতিনিধি ভারতের গর্হিত শাসনের জন্য পার্লিয়ামেণ্টের নিকট দণ্ডার্থ আনীত হইতেন। লর্ড হেষ্টিংসের বিচার তাহার নিদর্শন। তখন কোম্পানির

কর্ম্মচারীকে বিধির কঠোর শাসন হইতে পরিরক্ষিত করায় পার্লিয়ামেণ্ট বা মন্ত্রিদলেরকোনও স্বার্থসাধন হইত না, সুতরাং তাঁহাদিগের উপর পার্লিয়ামেণ্ট ও মন্ত্রিদলের সতত কঠোর দৃষ্টি থাকিত। এইজন্য তৎকালে কোম্পানির প্রতিনিধিকৃত কোন অত্যাচার তাঁহাদিগের নিকট ভাল করিয়া জানাইতে পারিলে তাহার প্রতিবিধান হইতে পারিত।

কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে! এক্ষণে ভারত—মহারাণী ও পার্লিয়ামেণ্টের অব্যবহিত শাসনের অধীনে আসিয়াছে। এক্ষণে ভারত-প্রতিনিধি অপরের কর্ম্মচারী নহেন, তাঁহাদিগেরই খাসের চাকর। তাঁহার গৌরব রক্ষা করা, দোষ করিলে তাঁহাকে দণ্ড হইতে উন্মুক্ত করা, এক্ষণে মহারাণী ও পালিয়ামেণ্টের স্বার্থ। সুতরাং এক্ষণকার ভারত-শাসন-প্রণালী যে সম্পূর্ণরূপে যথেচ্ছাচার প্রণালী (Despotism) হইয়া উঠিয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ গবর্ণরজেনেরেল ও ষ্টেট সেক্রেটারী যাহাই ভাল বুঝেন তাহাই ভারতের অখণ্ডনীয় বিধি হইয়া উঠে। ইহার উপর আর আপিল নাই। দুই জন ব্যক্তির ইচ্ছা ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর দুর্লঙ্ঘনীয় বিধি, ইহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় ভয়ে আকুলিত হয়।

আমরা স্বীকার করি আক্‌বরের ন্যায় নরপতির হস্তে যথেচ্ছাচার-প্রণালী সমর্পিত হইলে রাজ্যের মঙ্গল বই অমঙ্গল নাই। কিন্তু ইতিহাসের আরম্ভ হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমরা কয়টী আক্‌বর প্রাপ্ত হইয়াছি? সহস্র বর্ষে একটী আক্‌বর জন্মে কি না সন্দেহ। এরূপ স্থলে আমরা দুই একটী ব্যক্তির ইচ্ছার উপর আমাদিগের ধন, প্রাণ ও মান অর্পণ করি কিরূপে? ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত আমবা দুই একটি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করি কিরূপে? ইংরাজ রাজত্ব কাল মধ্যে যদি একটী আক্‌বরও আবির্ভূত হইত, তাহা হইলেও আমাদিগের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইত। যদি ইংরাজ-রাজত্ব কালে একটী বীরবল, একটী মানসিংহ, একটি তোদরমল্ল—সেনাপতিত্ব, শাসন-কর্তৃত্ব বা মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত হইত, তাহা হইলেও আমাদিগের মনে একদিন আশার সঞ্চার হইত। কিন্তু সমস্ত ইংরাজ ইতিহাসে এরূপ ঔদার্য্যের একটিও দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। তবে আমরা মনকে কি বলিয়া প্রবোধ দিই? আমাদিগকে কোন নূতন স্বত্ব প্রদান করা দূরে থাকুক, আমরা দেখিতেছি যে একটি একটি করিয়া আমাদিগের স্বভাব-দত্ত স্বত্ব অপহৃত হইতেছে। কাল বলিলেন তোমাদিগকে এই এই স্বত্ব প্রদান করা যাইবেক। আজ বলিলেন না—তোমরা অদ্যাপি উপযুক্ত হও নাই—সুতরাং এক্ষণে তোমাদিগকে সে সকল স্বত্ব প্রদান করা যাইতে পারে না—যদি কখন উপযুক্ত হও, তবে পরে বিবেচনা করা

যাইবেক। ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর শান্তি সংস্থাপনের জন্য রাজ্ঞী বলিলেন "অতঃপর জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ভেদ না করিয়া শুদ্ধ গুণ বিচার পূর্ব্বক তোমাদিগকে রাজ্যের উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠাপিত করা যাইবেক। এখন হইতে ভারতবাসী ও ব্রিটনবাসী বলিয়া কোন বিষয়েই কোন প্রভেদ করা যাইবেক না।" প্রজারা কিছু দিন মুগ্ধ আশ্বাসে রহিল। ভাবিল তাহাদের রাণীর বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সেই ভ্রম বিদূরিত হইল। বিংশতি বৎসর অতীত হইল, তথাপি তাহারা রাজ্ঞীর বাক্য কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিল না। আজ হইবে কাল হইবে এরূপ লুব্ধ আশ্বাসে রহিয়াছে, এমন সময় দিল্লীর দরবার আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই ভাবিল যে এই শুভ লগ্নে রাজ্ঞী তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবেন। অসংখ্য প্রজা নব স্বত্ব লাভের আশায় দিল্লীর অভিমুখে বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইলেন। কত ব্যক্তির অন্তরে কত আশা কত অভিলাষ ও কত উৎসাহ! রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, রাজা, মহারাজা, আমীর ওমরা সকলেই ঊর্দ্ধ শ্বাসে দৌড়িতেছেন, সকলেই ভাবিয়াছিলেন ভারতে কি এক নবীন সৌভাগ্য অভ্যুদিত হইবে। ব্যক্তিগত ও জাতীয় আশায় সকলেরই অন্তর আপ্লুত। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে নৃত্য, গীত ও মহোৎসব। মুগ্ধ আশ্বাসে সমস্ত ভারত যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। সামান্য প্রজা হইতে মহারাজা পর্য্যন্ত সকলেরই গৃহে মহা সমারোহ উপস্থিত হইল। আমাদিগের ভয় হইল বুঝি ভারতের মস্তিষ্কে কোন বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক এই বিশ্বব্যাপী আনন্দোৎসবের পরিণাম কি হইল, না দুই চারি জন শাদা ভারতবাসী রায়বাহাদুর প্রভৃতি রঙ্গে অভিরঞ্জিত হইলেন, দুই চারি জন রায়বাহাদুর রাজা হইলেন, দুই চারি জন রাজা রাজাবাহাদুর হইলেন, দুই চারিজন রাজাবাহাদুর মহারাজা হইলেন। যাঁহারা ১৯ তোপ পাইতেন তাঁহারা ২১ তোপ পাইলেন, যিনি ২১ তোপ পাইতেন তাঁহার ৩১ তোপ হইল, যিনি তোপ পাইতেন না তাঁহার ১৩ তোপ হইল, মহারাণীর এক শত এক তোপ হইল, স্বাধীন রাজাদিগের কণ্ঠে অধীনতাপদক লম্বমান হইল, তাঁহারা রাজা হইতে উচ্চতমপদ সেনাপতিত্বে বৃত হইলেন; অবশেষে শ্রাদ্ধের চূড়ান্ত পরিণাম স্বরূপ লর্ডলীটন স্বাধীন রাজাদিগকে এই মর্ম্মে বলিলেন তোমরা আর এখন হইতে স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবে না, তোমরা এখন হইতে মহারাণীর মন্ত্রি-সভার সভামাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহাতেও তোমরা যদি আপন ইচ্ছায় রাজভক্ত না হও, তাহা হইলে তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক রাজভক্ত করিব। আর প্রজা-সাধারণ! তোমরা অদ্যাপি কোন কাযেরই হও নাই, সুতরাং এক্ষণে তোমাদিগের

কোন উর্দ্ধ পদের আকাঙ্ক্ষা বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ার ইচ্ছার ন্যায় হাস্যাস্পদ হইবে। তোমরা এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা করিও না। আমরা যে দুই চারি টাকা অনুগ্রহ করিয়া দিতেছি তাহাতেই তোমরা এক শাঁক কুরিয়া খাইয়া কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট থাক। মহারাণী তোমাদিগকে পূর্ব্বে যে আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন, সে আশ্বাস বাক্যে আপাতত মুগ্ধ হইও না। তোমরা যদি কখন উপযুক্ত হও, তাহা হইলে মহারাণীর সে কথা বিচার করা যাইবেক। আর তোমরা উপযুক্ত হইয়াছ কি না সে বিচারের ভার আমাদিগেরই হাতে এবং আমরাও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তোমাদিগকে উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিব না। ইহাতেও তোমরা যদি রাজভক্ত না হও তাহা হইলে তোমাদিগকেও বলপূর্ব্বক রাজভক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

মহারাণীর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের বক্তৃতায় আমাদিগের মনে যে কিছু আশা ভরশা হইয়াছিল, লর্ড লীটনের দিল্লীর বক্তৃতায় আমাদিগের সে সমস্ত আশা একবারে সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। প্রলয় ঝটিকার পর যে স্তব্ধভাব, আমাদিগের হৃদয়ের এক্ষণে ঠিক সেই স্তব্ধভাব। আমরা এক্ষণে কোন্ দিকে যাইব, কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যে দুই চারিজন উপাধি পাইয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন, ভারতের আর সমস্ত অধিবাসীই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। সকলেই কোন না কোন প্রকারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সকলেই যেন এতদিন মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, এতদিন পরে যেন তাঁহাদিগের চৈতন্য হইল। চৈতন্য লাভের পর সকলেরই মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল "ইংরাজ রাজত্বে আমাদিগের কি আশা?" ইংরাজদিগের সহিত স্বাধীন বাণিজ্য যুদ্ধে ভারতের বাণিজ্য-প্রতিভা অঙ্কুরে বিদলিত হইল। শিল্পও ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিল। ভারতের যে বস্ত্র ও অলঙ্কার জগতের বিস্ময়োদ্দীপক ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে অবমানিত ও অধঃকৃত হইল; সুতরাং কর্ম্মকার ও তন্তুবায় কুল একবারে উৎসন্ন হইয়া পড়িল। যে অর্থে অসংখ্য ভারতীয় শিল্পীরা প্রতিপালিত হইতে পারিত, সেই অর্থে এক্ষণে অসংখ্য বৈদেশিক শ্রমোপজীবী প্রতিপালিত হইতেছে। একদিকে ভারতের শিল্পীরা দিন দিন শুদ্ধ উদরান্নের জন্য লালায়িত হইতেছে, অন্যদিকে বৈদেশিক শিল্পীরা দিন দিন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পড়িতেছে। শিল্প ও বাণিজ্য ত এই রূপে এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এক্ষণে কৃষিই সাধারণ লোকের জীবন ধারণের এক মাত্র উপায় রহিয়াছে। কিন্তু ইহাও অর্থসাধ্য, অর্থাভাবে কৃষকেরা ইহারও উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না। মহাত্মা আক্‌বর তাঁহার কলেক্টারদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা যেন কৃষকদিগকে প্রয়োজন হইলেই অর্থসাহায্য করেন,

তাঁহারা যেন সকল অবস্থাতেই তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে সচেষ্ট হন। কই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ত কলেক্টরদিগের প্রতি এরূপ কোন আদেশ প্রদান করেন নাই, অথবা যদি করিয়া থাকেন, তাহাও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের ত এই দশা গেল, আমাদিগের একমাত্র আশা ছিল রাজকর্ম্ম। লর্ড-লীটনের বক্তৃতাও সেই চিরলালিত আশালতাকেও সমূলে উন্মূলিত করিল। এক্ষণে আমরা করি কি, যাই বা কোথায়? আমরা প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অসংখ্য ছাত্রকে প্রশংসাপত্র সহ বহির্গত হইতে দেখিতেছি, আমাদিগের প্রথমে ইহাতে বড়ই আনন্দ বোধ হইত। কিন্তু এক্ষণে এই শোচনীয় দৃশ্যে আমাদিগের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ পরীক্ষা দিয়া বহির্গত হইয়াছিলাম, তখন আমাদিগের মনে কতই আশা, কতই উৎসাহ ছিল। তখন দেশের "এ করিব" "ও করিব" বলিয়া আমাদিগের মনে কত প্রকার ইচ্ছা হইত, কিন্তু এক্ষণে "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় সেই সকল ইচ্ছা আমাদিগের হৃদয়ে উত্থিত হইয়াই অন্তর্লীন হইতেছে। আমাদিগের জ্ঞান, আমাদিগের শিক্ষা, আমাদিগের কেবল যাতনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি, এই সকল কার্য্য করিলে আমাদিগের জাতীয় গৌরব ও মনুষ্য নামের মহত্ত্ব পরিরক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যে যে উপায়ে সে সকল করিতে সমর্থ আমরা সে সকল উপায়ে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। আমরা সকলের ঘৃণার কারণ হইয়াছি, যেহেতু আমরা চাকরী ও ওকালতি প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোন জীবিকা অবলম্বন করি না। কিন্তু আমরা জানি না যে চাকরী ও ওকালতী প্রভৃতি ভিন্ন আমরা অন্য কোন্ জীবিকা অবলম্বন করিতে পারি। আমাদিগের শিক্ষা আমাদিগকে যাহা করিয়া দিতেছে, তাহা ভিন্ন আমরা আর কি হইতে পারি? আমরা অন্য যে দিকেই যাইব সেই দিকেই মূল ধনের প্রয়োজন। মূল ধন আমাদিগের নাই। আমাদিগের ধনিকবৃন্দও নিতান্ত স্বার্থপর। তাঁহারা সঞ্চিত অর্থ কেবল আপনাদিগের বৃথা আমোদ প্রমোদে ব্যয়িত করিয়া থাকেন। তদবশিষ্ট যাহা থাকে তদ্দ্বারা অল্পসুদে গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করিবেন, তথাপি অধিক-লাভ-কর বহির্বাণিজ্য, কৃষি বা শিল্পে প্রযুক্ত করিবেন না। তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও অধিকতর লাভ হইতে পারে এবং দেশীয় মস্তিষ্ক পরিচালিত ও দেশীয় শোণিত পরিপোষিতও হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিবেন কেন? উদরান্নের জন্য তাঁহাদিগকেত লালায়িত হইতে হয় না। তাঁহাদিগের স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের দুরবস্থার সহিত তাঁহা-

দিগের কি সম্বন্ধ আছে, কে তাঁহাদিগের সঞ্চিত ধন তাঁহারা এরূপ সংশয়িত কার্য্যে প্রযুক্ত করিবেন? একদিকে যেমন অধিকতর লাভের সম্ভাবনা, সেইরূপ অন্য দিকে মূল ধনের সমূলে বিনষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। এরূপ স্থলে তাঁহারা কি জন্য এরূপ অসমসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইবেন? সুতরাং অধিকতর লাভের আশা দেখাইয়া তাঁহাদিগকে ইহাতে প্রবৃত্ত করা অসম্ভব। তাঁহাদিগের অন্তর যদি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের দুরবস্থা দেখিয়া আপনি না কাঁদে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ইহাতে প্রবৃত্ত করে কাহার সাধ্য? কিন্তু কবে যে তাঁহাদিগের অন্তর স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের জন্য কাঁদিবে আমরা জানি না; এবং তাহা না হইলেও আমাদিগের সুশিক্ষিত দলের আর কোন আশা নাই।

আর একটী দ্বার সুশিক্ষিতদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া মসীমর্দ্দন ও মস্তিষ্ক পরিচালন দ্বারা জীবন দগ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু সরস্বতীর বরপুত্রদিগের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া কেহ সহজে এ পথে অগ্রসর হইতে চাহেন না। এই ব্যবসায়ে দুই চারিজনকে সৌভাগ্যশালী হইতেও দেখা গিয়াছে সত্য, কিন্তু এই ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীদিগের সাধারণ অবস্থা অতি শোচনীয়। বাঙ্গালাভাষা যেরূপ সর্ব্বতঃ অনাদৃত, তাহাতে নবন্যাস, নাটক ও স্কুল বই ব্যতীত ইহাতে অন্য কোন বই লিখিলে মুদ্রাঙ্কন ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইয়া উঠা দুষ্কর। নবন্যাস, নাটক ও স্কুল বইয়ে কিঞ্চিৎ লাভ হয় বলিয়া অধিকাংশ গ্রন্থকারই সেই দিকে ঝুঁকিয়াছেন। এই কারণে এই শ্রেণীর গ্রন্থকারদিগের আয়ও ক্রমে সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া কমিয়া যাইতেছে। এ ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু প্রতিযোগিতাক্ষেত্র পূর্ব্ববৎ একইরূপ সঙ্কীর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের ন্যায় এই শ্রেণীর গ্রন্থকারেরা পরস্পরের মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় আবার বৈদেশিক অর্থলোলুপ গ্রন্থকারেরা প্রতিদ্বন্দ্বীতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা পুস্তকের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা নানাপ্রকারে আমাদিগের শোণিত শোষণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের উদর আমাদিগের মাংসে পরিপূরিত করিয়াছেন, আমাদিগকে কঙ্কালমাত্রে পরিশিষ্ট করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি ও নিবৃত্তি নাই। যখন এদেশীয় গ্রন্থকারকেরা অন্নবিনা মারা যাইতেছেন, যখন দুর্ভিক্ষের জ্বালায় তাঁহারা পরস্পরের মুখের গ্রাস পরস্পরের মুখ হইতে কাড়িয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন, সেই ভীষণ যাতনার সময় তাঁহারা কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পুস্তক নির্ব্বাচন বিষয়ে তাঁহাদিগেরই হাত, সুতরাং তাঁহারা অনায়াসে নিরুপায় বাঙ্গালীদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন করি-

তেছেন। গ্রন্থকারদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ লাভ ছিল, তাঁহাদিগের ও দশাপরিণাম এই হইল। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার আছেন, তাঁহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহাঁরা সাধারণতঃ সম্পাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা সাময়িক পত্রের প্রচার দ্বারা পৈতৃক ধনের বা স্বোপার্জ্জিত অর্থের ধ্বংশ করিয়া থাকেন। দেশের মঙ্গল সাধন করা তাহাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু দেশের মঙ্গল সংসাধিত হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের নিজের অমঙ্গল নিশ্চিত। ক্রমে তাঁহাদিগের মনের স্বাধীনবৃত্তি সকল এতদূর তেজস্বিনী হইয়া উঠে, যে তাঁহারা ক্রমে পরের উপাসনা ও পরের দাসত্ব করিতে অক্ষম হইয়া উঠেন। কিন্তু সাহেবের উপাসনা ও সাহেবের দাসত্ব ব্যতীত আজ কাল যে অর্থসম্বন্ধে আমাদিগের কোন উন্নতিবই আশা নাই তাহা বলা কেবল বাহুল্য মাত্র। সেই সাহেবদিগের সহিত সম্পাদক দিগেরত চিবশত্রুতা দাঁড়াইয়া যায়। তাঁহারা অনেক সময় সাহেবদের বিচারকর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান, এই জন্য সাহেবদিগের অধীনে চাকরীকরাও তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য তাঁহাদিগের অর্থবিষয়ক উন্নতির দ্বার একপ্রকার রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যে দেশের উন্নতি সাধন করিবেন বলিয়া তাঁহারা নিজের উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দেন, সে দেশের লোকের তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার? নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদকদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, কাগজ লইয়া তাঁহারা অনেকেই দাম দিতে চাহেন না। সম্পাদকেরা যে কি খাইয়া তাঁহাদিগের জন্য লড়িবে, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। সম্পাদকদিগেরনিজের উদর পূরণ করা দূরে থাক্, কি দিয়া তাঁহারা মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন তাহাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। স্বদেশীয় রাজা হইলে সম্পাদকদিগের সহিত রাজার সহযোগিতা হইতে পারিত; কিন্তু বৈদেশিক রাজার সহিত সম্পাদকদিগের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিযোগিতা।" সুতরাং তাঁহাদিগের রাজার নিকট কোন উৎসাহ পাইবার আশা নাই। তাঁহাদিগের একমাত্র আশাস্থল স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সম্পাদকদিগের কষ্টে স্বদেশবাসিগণের হৃদয় বিচলিত হয় না। সুতরাং সম্পাদকদিগের ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার আছেন, যাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থ নবন্যাস, নাটক বা স্কুলের বই এ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত উচ্চদরের পুস্তক লিখিয়া থাকেন। ইহাঁদিগেরও দশা সম্পাদকদিগের ন্যায়, সুতরাং ইহাদিগের বিষয় আর অধিক করিয়া বলা বাহুল্য। সুতরাং এ জীবিকা সাধারণের প্রলোভনীয় হইতে পারে না। সুশিক্ষিত দলের বহুমুখে

আর কোন্ স্বাধীন জীবিকার দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে আমরা জানি না।

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি না থাকায় আজ আমাদিগের এই দশা! এখনই আমাদিগের দুরবস্থার পরিসীমা নাই। এর পর আরও কি হইবে ভাবিতে গেলে ভয় হয়। আমাদিগের পুত্র পৌত্রদিগের যে কি দশা হইবে তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। ক্রমে শিক্ষার ব্যয় গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। একজন ভদ্র-বংশোদ্ভব কেরাণীর বেতন ২০ টাকা, কিন্তু পুত্রের সংখ্যা ৫টী। পাঁচটীকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইতে হইলে, তাহাদিগের বিদ্যালয়ের বেতন দিতে হইলেই তাঁহার নিজের বেতন পর্য্যবসিত হয়। মূর্খ করিয়া রাখিলেও তাহারা চির-জীবন গলগ্রহ স্বরূপ হইবে, এবং সমাজে তাহাদিগকে লইয়া তাঁহাকে সতত অবমানিত হইতে হইবে; সুতরাং তাহাদিগকে মূর্খ করিয়াও রাখিতে পারেন না। এস্থলে তিনি কি করেন? কেরাণীর উপরি লাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অগত্যা তাঁহাকে পরের শরণাপন্ন হইতে হয়। একজন এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার উর্দ্ধ সংখ্যা ১০০ শত টাকা বেতন হইল। অসংখ্য নিরন্ন কুটুম্ব আসিয়া তাঁহার গল-লগ্ন হইল। স্নেহ-কোমল হিন্দু-হৃদয় আত্মীয় স্বজনের দুঃখে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সোণামুখ করিয়া সেই গুরুভার বহন করিতে লাগিলেন। যত দিন তাঁহার পুত্রাদি না হইল, তত দিন তিনি দুঃখে কষ্টে সেই গুরুভার কথঞ্চিৎ বহন করিতে পারিলেন, কিন্তু সন্তানাদি হইবামাত্র নানা প্রকার খরচ বাড়িয়া গেল; যে আত্মীয় স্বজনের গুরুভার মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকেও কিছু বলিতে পারেন না, অথচ দেখিতেছেন তাঁহার আয়েও সঙ্কুলান হয় না। সাহেবের নিকট বলিলেন সাহেব! ১০০ শত টাকায় আর কুলায় না। সাহেব পূর্ব্ব সংস্কার মনে করিয়া আছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন, তখন শুনিয়াছিলেন ১০০শত টাকায় একজন বাঙ্গালী ভদ্র লোকের বেশ চলিতে পারে। সেই সংস্কার তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। এদিকে তাঁহারা আসিয়া আমাদিগের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মনে নাই। আগে আমাদিগের একখানি ধুতি ও এক খানি চাদর হইলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের বুটজুতা চাই, ষ্টকিং চাই, পিরান চাই, চাদর চাই, আবার বাহিরে যাইতে হইলে ইহার উপর পেণ্টুলেন, চাপকান, টুপি বা পাকড়ী প্রভৃতি আসবাব চাই। এ সকল না হইলে আবার সাহেব! তুমি আমাদিগকে তোমার নিকটে যাইতে দিবে না। বাটীর কর্ত্তা যখন এই সকল পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন, তখন যে বাটীর অন্যান্য লোক কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার অনুকরণ করিবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রত্যেকের এক দফা করিয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইলে গড়ে

১০ টাকা করিয়া পড়িয়া যায়। ইহার উপর আবার প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ করিয়া বাড়িয়াছে। এ সকল কারণ সত্ত্বেও সাহেব বলিলেন এক শত টাকায় বেশ চলিতে পারে। বেশী পীড়াপিড়ি করিলে বলেন যে ইহাতে সন্তুষ্ট না হও, উন্নতির অন্য চেষ্টা দেখ।

যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার উচ্চতম শাখায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ত এই দশা। যাঁহাদিগের ইহার মধ্যে পদস্খলন হয়, তাঁহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, তিনিত মনুষ্য-মধ্যেই পরিগণিত হইলেন না। ১০, টাকার চাকরীর জন্য তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়। যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার মাসিক ঊর্দ্ধসংখ্যা ১৫ টাকার সংস্থান হইল। যিনি এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধসংখ্যা মাসিক ২৫, টাকার সংস্থান হইল; এবং যিনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন তাঁহার ঊর্দ্ধসংখ্যা ৫০, টাকার সংস্থান হইল। বাজারের দর ক্রমেই কমিতেছে। ক্রমেই কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ২০ বৎসর পরে যে কি হইবে তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় বিকম্পিত হয়। যাঁহারা বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা পাইতেছেন, তাহাদিগেরত এই দশা। আবার যে সকল ভদ্র সন্তান অবস্থার দোষে ইংরাজী শিক্ষা পাইতে পারেন নাই, অথচ হলচালন করিতেও অক্ষম, তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাঁহারা বলেন যে তাঁহারা হলচালন করেন না কেন তাঁহারা অতিশয় মূর্খ। অধিকতর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমসহিষ্ণু কৃষকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুর্ব্বলতর ও শারীরিক-পরিশ্রমকাতর ভদ্রসন্তানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আর কৃষকদিগের অবস্থা এত কি লোভনীয় যে তাহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমরে ভদ্রসন্ততিগণের অবতরণ করা উচিত। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারি যে টাকার সুদ ও খরচা বাদে কৃষকের গড়ে মাসিক ৫৲ টাকার ঊর্দ্ধ লাভ হয় না। একজন মধ্যবিৎ লোকের ৫৲ টাকায় কখন সংসার চলে না। এরূপ স্থলে তাঁহারা কি করিবেন? হয় তাঁহাদিগকে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে, নয় ভিক্ষাব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ জীবিকা যে কিরূপ ক্লেশকর তাহা যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। এই ভীষণ অন্নযুদ্ধের সময় আবার লর্ড লীটন কর্ত্তৃক আশার মূলে কুঠারাঘাত। ভারতবাসির মনে আশা ছিল যে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা রাজ্যের অধিকাংশ উচ্চ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে ক্রমে ক্রমে ভারতে শ্বেতাঙ্গের আমদানী কমিয়া যাইবে। কিন্তু এক্ষণে সে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছে, সে আশা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে ইংরেজেরা সহজে

আমাদিগের মুখের গ্রাস আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন না।

এই নিরাশ সময়ে আমাদিগের একটী মাত্র উপায় করতলস্থ রহিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলে সেই উপায় দ্বারা বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, ইংরাজদিগের উপর জয়লাভ করিতে পারি। এই উপায় একতা ও আত্মত্যাগ। ইংরাজ জাতি অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয়, এইজন্য সাধারণ মতকে (Public opinion) ইহাঁরা বিশেষ মান্য করিয়া থাকেন। সমস্ত ভারতবাসী যদি একস্বর হইয়া ইংলণ্ডের নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করিতে পারেন, ইংলণ্ড সে প্রার্থনা কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ডের এ ঔদার্য্য ও এ মহত্ত্ব আছে। সমস্ত ভারতবাসীর একস্বর হইতে হইলে তাঁহাদিগকে অগ্রে একত্র মিলিত হইতে হইবে। বিংশতি কোটী ভারতবাসী যদি বৎসরে অন্ততঃ একদিনও জাতি, ধর্ম্ম, সমাজের পার্থক্য ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হওয়ার আর বিলম্ব নাই। ভারতের সমস্ত অধিবাসী বৎসরে অন্ততঃ একদিনও একত্র মিলিত হইতে পারেন, এমন একটী উপলক্ষ চাই, এমন একটী স্থান চাই। আমরা মেলার অধ্যক্ষদিগের নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই, তাঁহারা যেন এই মেলাকে কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর সংন্যস্ত না করেন। আমাদিগের ভিক্ষা তাঁহারা যেন এই মেলাকে এখন হইতে হিন্দুমেলা নাম না দিয়া ভারত-মেলা নাম দেন। যেন ইহা এখন হইতে ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসব-স্থল হয়। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাতে যোগ না দেন—আমরা কাঁদিব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ রাখিব না। আমরা সকলকেই ইহার অত্যুস্বরে আহ্বান করিব। আমরা কোনক্রমেই দলাদলির ভিতর যাইব না। দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা আর তাহার শরণাপন্ন হইব না।

ভারতবাসী! হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু!—আসুন আমরা এই প্রস্তাবিত প্রকাণ্ড ভারতবর্ষীয় মেলায় একত্র মিলিত হইয়া একতানে সমস্বরে একবার ইংলণ্ডের নিকট আমাদিগের অপহৃত স্বত্ব যাচ্ঞা করি। ইংলণ্ড সমস্ত ভারতবাসীর মিলিত ক্রন্দনে কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইংলণ্ডকে স্বার্থত্যাগ করিতে অনুরোধ করার পূর্ব্বে আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে হইবে যে আমরা স্বদেশবাসীর জন্য—প্রিয়তম ভ্রাতার জন্য—আত্মত্যাগ করিতে সমর্থ। আমাদিগের নিজের নৈতিক উৎকর্ষ দেখাইয়া আমরা ইংরাজদিগের নিকট নৈতিক উৎকর্ষ ভিক্ষা করিব। ভারতবাসী ধনিক-বৃন্দ! আপনাদিগের নিকটে করযোড়ে আমরা এই ভিক্ষা করিতেছি যে সাধারণের উপকারার্থ আপনারা প্রত্যেকে

এই জাতীয় সভায় অপনাদিগের বিপুল আ-য়েরকিয়দংশ অর্পণ করুন। যদি ভারতকে আবার একটী জাতি করিতে চাহেন, তবে, কিয়ৎ পরিমাণে স্বার্থবিহীন হউন, কিয়ৎ পরিমাণে আপনাদিগের বিলাসিতা ভুলিয়া যাউন। স্বার্থপরতা ও বিলাসিতায় কখন জাতীয়-উদ্ধার সাধন হইতে পারে না। যখন অসংখ্য ভ্রাতা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, তখন আপনারা কোন্ প্রাণে আত্মসুখে নিমগ্ন থাকিবেন? এ সুখের সময় নয়! জাতীয় মৃত্যু সন্নিকট! এসময়ে শেষ চেষ্টা করুন, নতুবা আর কিছু দিন পরে সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। মৃতদেহে ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় তখন ইহা নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইবে। আপনাদিগের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, ইংরেজদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা দিউন। দেখিবেন সেই দৃষ্টান্তের বলে ইংরাজদিগের পাষণহৃদয়ও বিচলিত হইবে!

মেহের আলি।

ষোড়শ অধ্যায়।

ফজর আলির গৃহে ফজর আলি শয্যায় শায়িত আছে এবং আমীর জান তাহার পার্শ্বে বসে আছেন। আমীর জানের বিমর্ষ বদন, কিন্তু তাহাতে অমিয় ভাব প্রকাশ পায়। কোন বিরক্তি জন্য নহে, দৈব দুর্ঘটনা জন্য সেই বিমর্ষতা। রাত্রি প্রায় ভোর হইয়াছে, এখনও আমীর জান বসে ও ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। আমীর জান প্রদীপ নিকটে আনিল এবং ফজর বদন বিবস্ত্র করিল। অমনি ফজরের নাসিকায় এক জঘন্য ক্ষত প্রকাশ পাইল। নাসিকাগ্রভাগ একেবারে নাই, এবং মুখটী ভয়ঙ্কর কদাকার হইয়াছে। পার্শ্বস্থ কাঁচের বাটী হইতে আমীর জান আস্তে আস্তে ঔষধ লেপন করিল এবং রোগী এক একবার লাগে লাগে কহিতে লাগিল। আমীর সস্নেহ বচনে সান্ত্বনা করিয়া এবং বদনের অক্ষত অংশ কোমল অঙ্গুলি দ্বারা সেবা করিয়া রোগীকে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিল।

ফজর আমীরের স্কন্ধে হস্ত দিয়া গদগদ বচনে কহিল; "প্রিয়ে, তোমার জন্য এ যাত্রা বাঁচিলাম। তোমার সেবা শুশ্রূষা নাপাইলে এ রোগ আরাম হইত না। আর তোমায় ভুলিব না। যাহা বলিবে করিব। তোমার কথা অবহেলা ক'রে আমার এত দুঃখ"। আমীর জান দুই এক বার স্মিত বদনে প্রেমোন্মুখী হইয়া নীরব হইলেন।

পরে কহিলেন ; "একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব ঠিক্ বলিবে ?"

ফজর। বলিবনা ? কি বল না।

আমীর। নাকটী ঘুচুলে কেমন করে ?

ফজর। "কেন ? পড়ে গিয়া নাক থেঁতো হয়েছে জান না" বলে একটু মৃদু হাসিল। আমীর কহিলেন ; "প্রবঞ্চনা আবার কেন ? পড়ে গেলে ত নাকের আগাটা গেল কোথায় ? আর কোথায় বা পড়ে গেলে, আর পড়িলেই বা কেন ? রাত্রিতে কুস্থানে গেলেই পড়িতে হয় !"

ফজর। আমায় অবিশ্বাস কর ?

আমীর। বিশ্বাস করিতে পারি—সত্য কহিলে। ঢাক কার কাছে ? নটেরদের মেজবৌ তোমার নাক কাটিবার গুরু নয় ?

ফজর। তাই, তাই।

আমীর। তাই আবার কি ? এখনও মানিবে না।

ফজর। তোমার কাছে আর গোপন করিব না। ওদের মেজবৌ ছুঁড়ি বড় দুষ্ট। আমাকে ইঙ্গীতে ডাকিল, তাহাদের ঢেঁকিশালে রাত্রি দুপুরে থাকিতে বলিল,—আমি গেলাম,—আর তাহার স্বামীরা সাত ভাইয়ে আমার নাক কাটিয়া দিল !

আমীর মনে মনে কহিল "পাপের উচিত ফল হয়েছে।" প্রকাশ্যে কহিল, গৃহস্থ কুলবধূর প্রতি টাঁক করাও দোষ, এবং সেও পর পুরুষকে ডেকে লয়ে মার খাওয়াইয়া ভাল করে নাই।—আচ্ছা কি লোভেতে মেজবৌ পানে নজর পড়িল ; মেহেরন্নিসা—রূপের চাঁদে লোভ করে, শেষে এক কাল শূকরীর ঘাড়ে দোচোট খেলে ! এবুদ্ধি কেন হয় বুঝিতে পারিনা।

কেন হয় ? ফজরও জানে না। রূপের লোভে প্রথম মেহেরন্নিসার প্রতি লোভ হয়। কল্পনায়, পরে কার্য্যে সে প্রবৃত্তি পারিচালিত হয়। প্রার্থনীয় রমণীতে নূতনতা, যৌবন ও সৌন্দর্য্য ছিল। তদভাবে ফজর, যুবতী এক নব রমণীর প্রতি আসক্ত হয়। অবশেষে সে সৌন্দর্য্য ও যৌবনের মান গেল ; কেবল নূতনতারই আদর। নয়ত কাল ভূতিনী পাঁচছেলের মা, মেজবৌ আর ফজরকে ফাঁদে ফেলিতে পারিতনা। যাহা হউক ফজর বিলক্ষণ শাস্তি পেয়েছেন। আজ একমাস শয্যাগত। আমীর জান নিতান্ত শ্রদ্ধার সহিত স্বামী সেবা করিতেন ; ক্ষতস্থলের দুর্গন্ধে কেহ ঘরে যাইতে পারে না, আমীর জান দিবা নিশি তাহার শুশ্রূষায় আছেন। পতি মন্দ হইলে সতী মন্দ হয় না। আমীর জানের ঐ প্রশ্নের উত্তর ফজর দিতে পারিত না এবং তৎকালে আবজানি আসায় সে দায় হইতেও ফজর মুক্ত হইল।

আমীর। কিরে আবজানি ? মুখটা যে তলোমত ? কাঁদ্ছিস না কি ?

আবজানি। কাঁদিবনা ? আহাঃ-কর্ত্তার দশাদেখে——আবজানি অবিশ্রান্ত ভেউ ভেউ করে কাঁদিল।

আমীর। বল্ বল্ কি হয়েছে, বাবার কোন ব্যায়াম হয়েছে ?

আবজানি। ব্যারাম হলেত আরাম হয়; তারও বাড়া।

আমীর। বাবাত প্রাণে বেঁচে আ-ছেন? ওরে আমার বুক ধড়ফড় করছে! বল্ কি হয়েছে।

আবজানি। এমন পরাণ থাকার চেয়ে যাওয়া ভাল ছিল!

আমীর। কি হয়েছে বলবিনা, চল্ দেখে আসি।

আবজানি। আর দেখে কেবল কাঁদবে বৈত নয়, তাব চেয়ে না দেখা ভাল।

আমীর। মর পোড়ার মুখী, দগ্ধে মারিস কেন? বল না কি হয়েছে?

আবজানি। হ্যাঁগা আমার উপর রাগ করলে কি হবে? আমি কি সে কাণ্ড বেধিয়িছি?

আমীর। তুই ছুঁড়ী বলেই ফেল্ না, কি হয়েছে।

আবজানি। তুমি দিদি ঠাকরুণ, যদি দেখ্‌তে, অমন বল্‌তে না, সে কথা কি বলা যায়।

আমীর। দূরহ হতভাগী! তবে বল্‌তে এলি কেন?

আবজানি। হ্যাঁগা, আমাকে পেট্-য়েছে তাই এসেছি, আমায় গাল্ দাও কেন গা?

আমীর। ওরে, তুই এসেছিস বলে কি বলছি; তুই ভালই করেছিস্। কথাটা কি বলে প্রাণটা রাখ্—আমার প্রাণ যে গেল।

আবজানি। ও, বাবা, না শুনেই প্রাণ গেল, তা শুনলে কি হবে! তুমি নেয়ে খেয়ে ঠাণ্ডা হও তারি পর বলব এখন। এখন যাই?

আমীরজান আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া আবজানিকে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "যা মাগি যা আমি নিজে গিয়া সংবাদ জানছি।"

আবজানি কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, "আমাকে অমন করে তাড়াও কেন? ভাল মন্দ খবর টা বল্‌তে আসব না!"

আমীর। হাজার বার আসবি লক্ষ্মী ধন আমার বল্ না বাবার কি হয়েছে! তোকে একটা টাকা দিব।

আবজানি একটু ফিক্ করে হেসে বলিল, তোমাদেরইত খাচ্চি; এই মন্দ খবর দিতে কি বকশিস্ লইব?

আমীর। তবে বল।

আবজানি। এই দাদা ঠাকুরের যেমন হয়েছে কর্ত্তারও ঐ রকম একটা হলো।

আমীর। বাবার নাক গেছে কি? পড়ে গেছেন কি?

আবজানি। নাকই কি সকলের যায়, আর কি কিছু যেতে নাই?

আমীর। কি হয়েছে?

আবজানি রাগ করে বলিল 'কি হয়েছে? কি হয়েছে, একশবারই ঐ কথা; কি আবার হবে? তোমার বাবার চক্ষু দুটি জন্মের মত গেলে দেছে।

আমীর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ওমা বলিস কিরে কে এ কর্ম্ম করলে?"

আবজানি। ক্যাল্ সন্ধ্যাকালে এক জন কর্ত্তাকে ডেঁকে লয়ে গেল, আর খানিক পরেও পাড়ার লোকে তাঁকে ধরাধরি করে আন্‌লে। আহা দুই চোখ দে রক্ত ঝুজ্‌য়ে পড়্‌ছিল। আমীরজান কাঁদিতে লাগিল ও আবজানি ঐ অবসরে চলে গেল।

কয়েক দিবস পরে ফজর আলি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ঐ গৃহে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। আমীরজান তাহাকে বাতাস দিতেছে ও গল্প করিতেছে। পতিব্রতার গুণ এক। অমন যে দুশ্চরিত্র স্বামী তাহাকেও দেবতার ন্যায় আমীরজান সেবা করিতেছে। ফজর আলিও বুঝিয়াছে পতিব্রতা স্ত্রী কি সুখের বস্তু। ফজর আলির ক্ষত অংশে কীট পর্য্যন্ত হয়েছিল, ক্রমে আরাম হয়ে এসেছে। এখন ঘা টা শুকনো শুকনো হয়েছে।

ফজর সহাস্য বদনে আমীরজানকে কহিলেন, "আমীর তোমায় আমি সব বলেছি কোন কথা গোপন করি নাই। তুমি একটি কথা আমায় বলবে?"

আমীর। বলবনা কেন?

ফজর। মেহেরন্নিসা হরণ কালে কে পালকী করে আমার বাটিতে এসেছিল শুনেছি, কে এসেছিল?

আমীর। বিশ্বাস কর ত সব বলি।

ফজর। বল, সত্য হইলে বিশ্বাস করিবনা কেন?

আমীর। সত্যই বলিব।

ফজর। বল।

আমীর জান আদ্যোপান্ত সব বিবরণ বলিলেন। ফজর কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন "এ কথা আগে বল নাই কেন? বাকুরের এত বড় আস্পর্দ্ধা।" আমীর কহিলেন, বাকুরে অপরাধ মার্জ্জনা জন্য ধরে ছিল। আর পাছে ফজর আলি ও মোক্তার উলটা ভাবেন এজন্য বলেন নাই।

ফজর আলি রহস্যভাবে কহিলেন, "আমার যেন দশজনে কুহক করে নাক কেটেছে। তোমায় যে একা বাকর আলি উলঙ্গ করিল ও ধর্ম্মনষ্ট করিত তাতে কি দোষ হয় না।"

আমীর কহিল, "আমার কি দোষ ভাগ্যে সতীত্ব রক্ষা হয়েছে; ধর্ম্ম সতীত্ব রক্ষা করেন। তবে কিনা বাকুরের ভয়ানক অপরাধ! ক্রমে তোমার মন বুঝে সে কথা বলিতাম।"

ফজর। আগে বলা উচিত ছিল। কার এত বড় বিশ্বাস তোমার কথা সত্য মনে করবে? তোমার উপর যদি বাকুরে বল করিত; অবশ্য তুমি বলিতে। এরূপ অপরাধীকে ক্ষমা কর্‌য়ায় কি বুঝায়? লোকের এরূপ ঔদার্য্য কি সতীত্বের লক্ষণ? ছি! ছি! ধিক্! কুলবধূ বনমধ্যেও অসচ্চরিত্র পুরুষের কাছে! আমার কপাল, এ অপমানও সহিতে হইল!

ফজর আলি আরক্তলোচনে, আপন মস্তকে করাঘাত করিলেন। পরে রুক্ষস্বরে কহিলেন, "পাপীয়সি! তুই পরের

সতীত্ব রক্ষাকরে বেড়াস্—স্বামীর চরিত্রে ছিদ্র অন্বেষণ করিস্, আর নিজের এই সব কাণ্ড!”

আমীরজান কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন পরমেশ্বর জানেন পরোপকার ভিন্ন আর কোন অভিপ্রায় ছিল কিনা। আর এই জন্যই তিনি ও কথা উত্থাপন করেন নাই। যাহার চরিত্র মন্দ সে সকলকে মন্দ ভাবে। ফজর কহিলেন “যা দুষ্টা, আর ছলনা করতে হবে না তোকে চিনেছি; অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। থাক্ হারাম্জাদি, তোর শাস্তি পরে দিব; আগে বাকুরের মাথা খাই।” ফজর তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন।

তখন বৈকাল বেলা। সেই রজনী প্রহরেক গতে বাকর আলিও ফজর আলি পূর্ব্বকথিত গোলাম নবীর কবরস্থানে উপনীত হইল। সন্ধ্যাকালে আবজানির কাছে সকল কথা ফজর আলি শুনে, আমীরজানের উপপতি বনে আছে এবং বাকর আলিও তাহাকে তথায় পেয়ে অহিতাচার করিতে উদ্যত হয়েছিল বুঝিলেন। ইহাতেই বাকরকে সঙ্গে করে কবর স্থানে ফজর আলি আসিলেন। কবরের মৃত্তিকা হস্তে বাকরকে কহিলেন, “নরাধম! তোর সঙ্গে যে মিত্রতা ছিল তাহা ভঙ্গ করিবার জন্য এখানে এসেছি। এই মৃত্তিকা ফেলে ফের শপথ করিতেছি আমি তোর পরম শত্রু হইলাম।” বাকর অবাক হইয়া কহিল “বলেন কি? আমার অপরাধ?”

ফজর। অপরাধ! যার পর নাই। তুই আমার স্ত্রীর ধর্ম্ম নাশে উদ্যত হয়েছিলি।

এই কথায় বাকর ভয় পেয়ে পলাইত, কিন্তু ফজর দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করে রেখেছিলেন। নিরুপায় হয়ে বাকর কহিল “এমন কথা কে বলিল? একি বিশ্বাসের কথা?”

ফজর। কে বলিল? ঝব্ঝব্যার দোকানী, আবজানি ও আমীর জান নিজে। বিশ্বাস?—অবিশ্বাস কিসে?

বাকর। কুলবধূ কি বনে যায়? তাহা অবিশ্বাস্য কথা।

ফজর। কুলবধূ কি কুলটা তোর খবরে কাজকি, তুই কি সাহসে এ কাজ করিলি?

বাকর। কেন আমার দোষ দেন, আমি কিছুই জানি না।

ফজর। আচ্ছা মেহেরন্নিসাকে তুই বলাৎকার করিতে গিয়াছিলি?

বাকর। হাঁ বনের একটা মেয়ে জানিতাম, পরে শুনিলাম মেহেরন্নিসা।

ফজর। সেই সময় আর একটা স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়েছিল?

বাকর। হাঁ, সে কে একটা কুলটা।

ফজর। সে কি বলে পরিচয় দেয়?

বাকর। তোমার স্ত্রী বলে, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করি নাই এখনও করিনা।

ফজর। আচ্ছা আবজানি সঙ্গে ছিল?

বাকর। কৈ না! তা হলে কি চিনিতাম না?

ফজর। আমীরজানি এখানে অবস্থিত্যার আগে এ কথার প্রমাণ আছে; আবার মগেরদের মেয়ে যে তথায় যায় তুই অবশ্য জানিস। (বাকর নীরব।)

ফজর। আচ্ছা সেই স্ত্রীলোককেও তুই বিবস্ত্র করেছিলি কি না?

বাকর। সে কোন মতে যায় না, তার সাধ বুঝে করেছি।

ফজর। সে কিজন্য এসেছিল? কি বলেছিল?

বাকর। প্রথম স্ত্রীলোককে মুক্ত করিতে এসেছিল ও আমায় গালি দিয়াছিল।

ফজর। তবে যে বলিলি তার মন্দ অভিপ্রায় ছিল।

বাকর। নীরব।

ফজর। আচ্ছা সেই স্ত্রীলোককে উদ্ধার করে কিনা?

বাকর। হাঁ।

ফজর। একটিকে লয়ে যায়, একটিকে পালকী করে গাঁএর ভিতর পাঠায় কিনা।

বাকর। শুনেছি একটা পালকী আসে।

ফজর। পালকী আমার বাটিতে আসে কি না?

বাকর। জানি না।

ফজর। জানিস না? আমীরজানের কাছে তুই ক্ষমা চেয়ে ছিলি ও একথা গোপন করিতে বলেছিলি, জানিস না?

বাকর। নীরব।

ফজর কহিল, "হয়েছে তোর দোষ সপ্রমাণ, মেহেরন্নিসাও আমার স্ত্রী বলিয়া পরিচিতা; তাহাকেও তুই ছাড়িস নাই। আমীরজানকে—আমার স্ত্রী, কর্ত্তার কন্যা—দেখেও তোর মর্য্যাদা বোধ হলো না। পাজী, আপন কর্ম্মের ফল ভোগ কর্।"

গ্রীক এবং হিন্দু।

ফলদ্বয় একই বৃক্ষে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে দোষ কাহার?—ফলের দোষ কি? কার্য্য কারণ সংযোগে যাহা ঘটিবার, তাহারের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। অতএব নিয়তি প্রবলা। কৃত আয়োজনের উপার্জ্জিত ফলের নাম নিয়তি। ইহার অন্যতর আখ্যা ভাগ্য। নিয়তি আত্মবাতীত দোষগুণ-বিহীন, পরিচ্ছিন্ন নিত্য স্ব স্বভাবে প্রভাময়ী। যৎ কর্ত্তৃক যে ভাবে অর্জ্জিত হয়েন, তাহার নিকট সেইরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। অতএব উপস্থিত শুভাশুভের, কারণ অর্চ্চমাপ্রণালী, নিয়তি নহেন। বৃক্ষস্থ ফল—যাহ

বস্তু, সে অর্চ্চনার উপর স্বেচ্ছাধিহীন, সুতরাং অপরের ইচ্ছায় চালিত। কিন্তু মনুষ্য অজড় জ্ঞানময়, তাহারা স্বয়ং না অন্যের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া থাকে? —বাইবেল শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য স্বেচ্ছাময়, শুভাশুভ যাহা কিছু, তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকে; আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম-শাস্ত্র শ্রুতি অনুসারে কর্ম্মসূত্র মানবীয় ইচ্ছার পরিচালক, কিন্তু এ কর্ম্মসূত্রের মূল ভাগে স্বাধীন ইচ্ছা প্রবলা, অতএব উভয় মতেই বলিতে হইবে যে মনুষ্য যথেচ্ছ নিয়তির অর্চ্চনা করিয়া যথা সম্ভব ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু জগৎ-সৃষ্টির দিন হইতে দিনেকের তরেও ত ইচ্ছাবশে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ফল লাভে সে সামর্থ্য দেখিলাম না, তবে কি এ স্বেচ্ছা আকাশ-কুসুম, কল্পনা মাত্র? শ্রুতির মতে যে কর্ম্ম-সূত্রের মূল স্বাধীন ইচ্ছা, সাংখ্যকারের মতে তাহার "মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলম।" এ কথা নিতান্ত মন্দ নহে, ফলতঃ এজগতে স্বেচ্ছার অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা অন্ধ, স্বয়ং কর্ম্মক্ষম নহে; কর্ম্ম-সূত্র প্রবলা, এবং আপাত-দৃষ্ট স্বেচ্ছা কর্ম্মসূত্র রূপ কারণের কার্য্য মাত্র। যে কর্ম্ম-সূত্র বশে জড়বস্তু ফল চালিত হইয়া থাকে, অজড়বস্তু জ্ঞানময় মনুষ্যও তাহার দ্বারা পরিচালিত হয়—জড় অজড় সকলেই কর্ম্ম-সূত্র বশে দৃষ্ট বা অদৃষ্টপূর্ব্ব নিয়তির অর্চ্চনা করিয়া দৃষ্ট বা অদৃষ্টপূর্ব্ব যথা সম্ভব ফল লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এ কর্ম্মসূত্র কি? —আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে নিয়ন্তা হইতে প্রাপ্ত শক্তি প্রকৃতি হইতে যদৃচ্ছা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়া। স্বর্গে নক্ষত্রমণ্ডল, মর্ত্ত্যে পার্থিব-বস্তু-নিকর, এক কথায় এই বিশ্বস্থিত পরমাণুটি পর্য্যন্ত সেই মোহ-মন্ত্রে পরিচালিত।

হিন্দু এবং গ্রীক জাতির অবস্থাগত বৈষম্যও এই কর্ম্মসূত্রে বশে উদ্ভূত। আদিতে আমি এবং একজন গ্রীক্ পৃথক্ ছিলাম না। আমার এবং একজন গ্রীকের জন্মভূমি স্বতন্ত্র নহে, বাইবেল-ভূমিও নহে। পিতা মাতা স্বতন্ত্র বা আদম্ ও ইবও নহে। কুলপতি স্বতন্ত্র বা মূসা নহে। রাজা স্বতন্ত্র বা দাউদ নহে। আমাদিগের উভয়েরই জন্ম স্থান সেই

"সপ্তর্ষীণাং স্থিতি যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষিচরিতং রম্যং যত্র চৈত্ররথং বনং॥"

এবম্ভূত সর্ব্বসুখপ্রদ স্বর্গসম উত্তর কুরুবর্ষ। মূর্ত্তিমান সৌম্য রূপে যথায় সপ্তঋষি বাস করিতেছেন, যথায় সুধাস্রাবী কলনাদিনী মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছেন, যে স্থান দেবর্ষিচরিতে পরিকীর্ত্তিত, এবং যথায় চৈত্ররথ কানন দেবগন্ধর্ব্ব-বিলাস-যোগ্য প্রাকৃতিক-মাধুর্য্য-পূর্ণ ভাবে বিস্তার করিতেছে, সেই স্বর্গসম উত্তর কুরুবর্ষ আমাদের জন্মস্থান। আমাদের পিতা বিধাতার মানসপুত্র স্বায়ম্ভুব এবং মাতা বিধাতৃ-দুহিতা শতরূপা। কুলপতি, সপ্তঋষি, অদ্যাপি যাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় গগণে জ্যোতিঃ বিস্তার

করিতেছেন। রাজ্যেশ্বর প্রিয়ব্রত, সকাননা সাগরাম্বরা সসপ্তদ্বীপা পৃথিবীর উপর তাঁহার আধিপত্য। মধুস্রাবী একই ভাষা, যুগ যুগান্ত গত হইয়াছে, কত সহস্র সহস্র পরিবর্ত্তন গত হইয়াছে, তথাপি আজি পর্য্যন্ত ভাষাদ্বয়ে শাব্দিক একতা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এইরূপে এক স্থানে, এক পিতৃ-দেবতার বশবর্ত্তিতায়, এক দেবতা-পূজক হইয়া, গ্রীক এবং হিন্দুগণ এক জাতি থাকিয়া, একই ভাবে ও একই বৃত্তিশালী হইয়া, আহার বিহার বিলাস বিস্তার করিয়া কাল যাপন করিতেন। ভিন্নত্বের নাম মাত্রও পরিজ্ঞাত ছিল না। কোন সংযোগই চিরদিনের নহে, পিতা পুত্রে পৃথক্ হইয়া থাকে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথক্ হইয়া থাকে, সুতরাং এ সংযোগও চিরদিনের হইবার নয়। কালবশে ইহাদেরও সম্মিলন ভাঙ্গিল, অভাব বৃদ্ধি হইল, স্বস্থান প্রচুর বোধ হইল না, অথবা যে কোন কারণের উপস্থিতিতেই হউক, আবশ্যক বোধে, পার্থক্য অবলম্বন পূর্ব্বক ইহারা সুখ লালসায় স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদৃচ্ছা অভিগমনে প্রবৃত্ত হইল। হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত অল্প ভ্রমণেই হলস্কন্ধে, হস্তে ধনুর্ব্বাণ, বিশাল হিমাদ্রি-চূড়া লঙ্ঘন করিয়া, পঞ্চনদের তটে অবতীর্ণ হইলেন। অন্যদিকে গ্রীকগণ বহুতর নদ নদী পর্ব্বত বনদেশ অতিক্রম করিয়া, বহুরক্তপাতে, বহুকষ্টে ও বহু শ্রমে, বহুদূর ভ্রমণান্তে, সমুদ্র তীরবর্ত্তী হেলাস ভূমে পদার্পণ করিলেন। স্ব স্ব উপনিবেশ স্থলে পদার্পণ মাত্রেই শান্তিলাভ উভয়ের মধ্যে কাহারই ভাগ্যে বিধাতা লিখেন নাই। উভয়েই উভয়দেশে পদার্পণ মাত্র দেখিলেন যে তত্তৎ স্থানের আদিম অধিবাসীগণ উভয়েরই নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে দণ্ডায়মান।—ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বি দৈত্যকুল, হেলাসে পিলাস্‌গি। উভয়েই উভয়কে দমন করিয়া এবং দাসত্ব পদে আনিয়া আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপনের সূত্রপাত করিলেন। বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থাসঙ্কুল পথাতিক্রমের বিভিন্নতা পরিত্যাগ করিলে, উভয়জাতির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া দূরান্তরে পতিত হইলেও, বৃত্তির এখনও একতা রক্ষিত হইল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এ একতা আর বেশি ক্ষণ থাকে না।

হিন্দু এবং গ্রীক এতদুভয় জাতি যৎকালে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব অধিকৃত দেশদ্বয়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে, সেই স্মৃতি-বহির্ভূত সময়ে, সমস্ত জগৎ ঘোর মূর্খতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। মানব সমস্ত পাশববৃত্তি অবলম্বন করিয়া বনে বনে, গিরিগহ্বরে, সমুদ্রবেলায় ক্ষুব্ধচিত্তে আহার লালসায় যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়াইত। মিসর এবং ফিনিসীয় সভ্যতার স্তিমিতালোক তখনও প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা বোধহয় তৎ তৎ দেশমধ্যে আবদ্ধ এবং দেশবহির্ভাগের যে কোন

বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবিরহিত ছিল। সুতরাং হিন্দু এবং গ্রীক্ উভয় জাতিই স্বীয় স্বীয় গন্তব্য পথের পরিচালক বন্ধু বা শত্রু স্বরূপ দ্বিতীয় কাহাকেও প্রাপ্ত হয়েন নাই।

মানবচিত্ত শৈশবে বিচার-বিহীন, বিকার-বিহীন, দুগ্ধ-মথিত সদ্য নবনীতবৎ নির্ম্মল, কোমল, টল টল করিতেছে, পিপিলিকাটি পর্য্যন্ত তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলে, তাহাতে পায়ের দাগ বসিয়া থাকে। চক্ষু নলীন, নবীন, পূর্ব্বদর্শন-শূন্য, অকপট। যে যে ভাবে নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে, চিত্ত তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে অবিকল সেই ভাবে গ্রহণ করিতেছে। এ সময়ে যে কোন বস্তু, ইচ্ছা করিলেই সেই নেত্র এবং চিত্ত-সমক্ষে রোষ তোষ ভয় বিস্ময় মোহ প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই অনায়াসে উৎপাদনে সমর্থ হয়। এসময়ে প্রবলতা সহকারে যে যে ভাবে এই চিত্তকে আকর্ষণ করিবে, উহা যথাদিষ্ট রূপে সেই ভাবে আকর্ষিত হইয়া অনুরূপ ভাবে শিক্ষিত হইবে। গ্রীকজাতি এবং হিন্দুরা উভয়েই সেই প্রাচীনকালে যদি ও ব্যক্তিগত বলবীর্য্য সাহস ও বীর-দর্প প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণে পরিপূরিত ছিল, কিন্তু তাহা মানবীয় গুণ গণনায় অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীতে অবস্থান করে। যে গুণের উৎকর্ষে মনুষ্যত্ব বোধ হয়, যে জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশ ও দীপ্তিমান হইয়া থাকে, এমন রূপ গুণ ও জ্ঞানের আধার স্বরূপ মানবীয় জ্ঞান-জীবনের তাহাদের এই শৈশবকাল। চিত্ত অনুরূপ শৈশবোচিত। এসময়ের দর্শনস্থলীয়—একমাত্র জড় জগৎস্থ ভৌতিক ব্যাপার। ফলতঃ বাহ্য জগৎ এ সময়ে যে ভাবে যে মূর্ত্তিতে চিত্ত আকর্ষণ করিবেক, উহা সেইভাবে আকর্ষিত এবং তাহাতে পূর্ণ ও শিক্ষিত হইবে। এই শিক্ষা বর্ত্তমান এবং প্রায় ভাবী জীবন প্রবাহেরও পরিচালক হইয়া থাকে, বহু যত্নেও তাহার মোহ পরিত্যাগ করিতে কদাচিৎ সমর্থ হয়।

কিন্তু এস্থলে এক কথা বলা কর্ত্তব্য। উপরে যে মত প্রকাশিত হইল তদ্দ্বারা যেন এরূপ বিবেচিত না হয় যে এক মাত্র বাহ্য-জগতই মানবজীবনের গতিচাতুর্য্য সুস-ম্পাদন পক্ষে বলবতী, অথবা মানব প্র-কৃতি আত্ম স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহ্য-জগতেই লীন হইয়াছে। এস্থলে একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা কর্ত্তব্য। আমরা এপ্রবন্ধারম্ভ হইতে কোথাও প্রকৃতি, কোথাও বাহ্যজগৎ কোথাও বা মনুষ্যপ্রকৃতি এবম্ভূত শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু এই প্রত্যেক শব্দ কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? প্রকৃতি অর্থে যাহার নির্ব্বাচন ও ক্রিয়াফলে কর্ম্মসূত্রের উৎপত্তি, এবং যে কর্ম্মসূত্রে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাহা কেবল নিয়ন্তার পরবর্ত্তী কিন্তু আর সকলের আদি, যাহা নিয়ন্তার আজ্ঞাবশে যথাদিষ্ট কর্ম্মসূত্র নির্ম্মাণে নিরত রহিয়াছে,

যাহা সর্ব্বব্যাপিনী এবং যাহার আদি অন্ত কেবল নিয়ন্তার সন্নিহিত তাহাই প্রকৃতি-পদে বাচ্য। আর মনুষ্যে সন্নিহিত যে স্বভাব, তাহা মনুষ্য প্রকৃতি। তদ্ব্যতীত প্রকৃতিস্থ আর সমস্ত—বাহ্য জগৎ পদে বাচ্য। অতএব বাহ্যজগত এবং মানব প্রকৃতি উভয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, কিন্তু প্রভেদ এই মানব-প্রকৃতি স্বাধীন নহে, বাহ্য জগতের সম্পূর্ণ অধীন, তাহার সহিত সংযোগ ব্যতীত কার্য্যকরণে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অন্তর, মন, অহঙ্কার, প্রজ্ঞা, মেধা, মতি, মনীষা, জূতি, সমৃতি, ক্রতু, ইচ্ছা, ইত্যাদি বৃত্তি নিচয় মনুষ্য প্রকৃতির পৈতৃক সম্পত্তি, বাহ্যজগৎ হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। চার্ব্বাক্ বা ডারবিনশিষ্যগণ বলিতে পারেন যে আদিমকাল হইতে চেতনাচেতন উভয়ের ক্রমান্বয় সংঘাতে উক্ত সমস্ত বৃত্তি উদ্ভাবিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহা হইতে পারে কিন্তু সে মতে আমার আবশ্যক নাই, যাহা দেখিতে পাইতেছি এবং স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাই এস্থলে গ্রহীতব্য। যাহাহউক ঐ সকল বৃত্তি মনুষ্য প্রকৃতির আছে বটে, কিন্তু বাহ্যজগতের সংস্রব বিরহে ঐ সকল বৃত্তি অকার্য্যকর। উহারা শাণিত অস্ত্রস্বরূপ, কর্ত্তনযোগ্য দ্রব্য পাইলেই কার্য্যে লাগিল, এবং তাহাতে যত্ন পূর্ব্বক প্রয়োজিত হইলে হয়ত ধারেরও বৃদ্ধিহইল, কিন্তু যদি তাহা না পাইল, তবে অকার্য্যকর হইয়া অবয়বটী মাত্র লইয়া পড়িয়া থাকে, এবং হয়ত মরিচা পড়িয়া ধারের ধ্বংস হয়। বাহ্যজগতের সহ সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হইলে পর বৃত্তি লইয়া কি করিব? আমার স্মৃতি আছে, কিন্তু কি স্মরণ করিব, স্মরণীয় বস্তু কোথায়? আমার মনীষা আছে, কিন্তু কি লইয়া তাহা খাটাইব. বস্তুর অভাব। আমার অহঙ্কার জ্ঞান আছে, কিন্তু কাহার সহ পার্থক্য দর্শাইয়া এই বোধের ভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিব, তুলনীয় বস্তুর অভাব। এই সকল বৃত্তি নিয়োগ অনিয়োগ, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা সাধারণ মানবীয় কার্য্যেও ইহা নিত্য প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি। ফলতঃ বৃত্তি সমস্ত যদি বাহ্যজগতের সহ সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হইয়া এবম্ভূত অকার্য্যকর হইয়া উঠে, তাহা হইলে মানব প্রকৃতি অস্তিত্ব সত্ত্বেও অস্তিত্ব বিহীনাপেক্ষা অধম ভাব প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় অবাঞ্ছনীয় এবং হেয়তম হইয়া উঠে। কিন্তু সর্ব্বদর্শী নিয়ন্তার তাহা ইচ্ছা নহে।

অতএব মানব প্রকৃতি বাহ্যজগতের সংযোগ ভিন্ন কার্য্যকরণে সম্পূর্ণ রূপে অসমর্থ। আমরা যাহা করি, আমরা যাহা বলি বা আমরা যাহা ভাবি, সে সকলেরই ভাব আমরা অগ্রে বাহ্যজগত হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত সে সকল নিষ্পন্ন হইবার নহে। মানবচিত্তের সহ বাহ্যজগতের সংযোগ, প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিভাসে বিভাসিত হওয়া মাত্র, যদ্রূপ কোন বর্ণ

বিশিষ্ট পুষ্প বা বস্তু বিশেষের সান্নিধ্যস্থিত স্ফটিক পাত্র তদ্রূপ বিভাসিত হইয়া থাকে। বাসন্ত প্রদোষে তমসাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল দেখিয়া আমার মন সহসা তমসাচ্ছন্ন হইয়া ম্লানভাবে অভাবনীয় চিন্তামগ্ন হইল কেন? কোথায় আকাশের দূরপ্রান্তে মেঘমালা ঝুলিতেছে, আর কোথায় আমি এই দূর সংসার কান্তারে পড়িয়া রহিয়াছি, তথাপি কেন উহার দ্বারা আমার চিত্ত আকর্ষিত হইয়া তাহাতে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, ঐ মেঘের সহ আমার মনের কি সম্বন্ধ বলিতে পার? কোকিলের কুহু রবে বিরহিণীর উত্তেজনা, পূর্ণচন্দ্র দর্শনে চিত্তের প্রফুল্লতা, নক্ষত্র-খচিত নীল-চন্দ্রাতপ নভোস্থল দর্শনে মনোমধ্যে স্বীয় অসারত্ব জ্ঞান এবং স্রষ্টার গরিমা এবং দূরস্থ গীত বাদ্যধ্বনি শ্রবণে চিত্তের অস্থির প্রসন্নতা, নির্ঝরিণী-পরিশোভিত গিরিগুহামধ্যস্থ কান্তার ভাগ হইতে বহুবিধ বিহঙ্গরব-মিশ্রিত প্রতিধ্বনিতে মনোমধ্যে জন্মান্তরীণ ভাবের উদয়, এ সকল কি কারণে হইয়া থাকে? ঊর্দ্ধে বিদ্যুৎ বজ্রাদি যুক্ত নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ মণ্ডল, নিম্নে স্বচ্ছন্দ অন্ধকারময়ী রজনী, টিপ টিপ খদ্যোতমালা ঝলিতেছে, বিদ্যুৎ-ঝলসে অন্ধকার আরও বর্দ্ধিত হইতেছে, পতঙ্গের ঝিঁঝিঁ রব, জলের তর তর ধ্বনি, ভেকের কলরব, বায়ুর শন্ শন্ শব্দ, এবম্ভূত সময়ে চিত্ত কেন চমকিত, সঙ্কুচিত এবং ভীত হইয়া আত্মস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই সেই ভাবে লীন হইয়া থাকে? মানবচিত্ত, কোথায় সেই সেই পদার্থ, তথাপি কেন তাহাতে আকর্ষিত ও উত্তেজিত এবং ভাবান্তর-প্রাপ্ত হইয়া থাকে? এ চৌম্বকীয় গুণ ইহাদের মধ্যে কে সংযোজিত করিল? যাহার আজ্ঞায় ফুল ফুটিতেছে, ফল পাকিতেছে, নক্ষত্রমণ্ডল ঘুরিতেছে, পরমাণু উড়িতেছে, আমরা বুঝিতে পারি না পারি উহা সেই বিশ্বকর্ম্মার কার্য্য। অথবা যাহারই হউক, এবং আমরা তাহা বুঝিতে পারি না পারি কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যে বাহ্য জগত ও মানব চিত্তের মধ্যে একটি চৌম্বকীয় আকর্ষণ অবস্থান করিতেছে, ইহা লুকাইবার নহে, হারাইবার নহে, ধ্বংস হইবার নহে। ক্ষুদ্র হইতে মহৎ সমস্ত বিষয়েই বাহ্যজগৎ মানবচিত্তকে আকর্ষিত করিয়া তাহার ভাবান্তর সাধন এবং আপন ভাবে ভাবযুক্ত করিতেছে। লৌহ চুম্বকের ন্যায় পরস্পর গাত্র সংলগ্ন হইতেছে না বটে, অথচ লৌহ চুম্বকের কার্য্যাপেক্ষাও গূঢ় ভাবে গুরুতর কার্য্য সমূহ, বাহ্যজগৎ দূরে এবং মানবচিত্ত অন্তরে থাকিলেও, এতদুভয়ের মধ্যে সুসম্পন্ন হইতেছে। এই জন্য বলিতেছি যে এতদুভয়ের সংযোগ একের বিভাসে অপরে বিভাসিত হওয়া মাত্র। এ সংযোগ তোমার আমার বারণ বা রূপান্তর করিবার ক্ষমতা নাই, কর্ম্মসূত্র বশে যদৃচ্ছা সংঘটিত হয়।

বাহ্যজগতের ভাব একরূপ নহে, বহুতর, অসংখ্য। ইহার মূর্ত্তি ভেদে ভাব ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। মানবচিত্তের

সঙ্কীর্ণতা বশতঃ একুকালে সেই সমস্ত ভাবে সংযোজিত হইতে গেলে তিল তিল হইয়া বিলীন হইয়া থাকে, পরন্তু একের বিস্তার, অপরের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ তদ্রূপ সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। এই নিমিত্ত একে একে তিল তিল করিয়া বাহ্যজগৎ মানব প্রকৃতিকে স্বস্বভাবের শ্রেণী বিশেষে আকর্ষণ করিয়া উহার অনুরূপ ভাবান্তর উপস্থিত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত উহার যখন যে ভাব বিশেষে মানবচিত্ত সংযোজিত হয়, তখন তদ্বৎ কার্য্য প্রসব করিয়া থাকে। এই সংযোগ ও তাহার উত্তেজনা যে কত গূঢ়তম ও কত গূঢ়-ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, এবং এই সংযোগ ও উত্তেজনা যে কেবল চিত্ততেই সমাবেশ বা তদতিরিক্তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের ক্রিয়া গুলি মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয় না তাহা কোন-বিষয় হইতে-উৎপন্ন-আপন-মনের ভাব হইতে যে সমস্ত ক্রিয়া গুলির প্রসন্নতা স্বতঃউৎপন্ন হয়, তাহাদের সম্বন্ধ মিলাইয়া দেখিলে জানিতে পারিবে। কোন বস্তু দৃষ্টে তোমার মন চকিতবৎ ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল, সেই ভাবান্তর-প্রাপ্ত মনে তোমার যত গুলি কার্য্য করিতে ইচ্ছা জন্মিবে, জানিও যে সেই সমস্ত কার্য্য কলাপ, ও তাহাদের প্রসূতি স্বরূপ মানসিক ভাবান্তর বিশেষ উভয়েই এক জাতীয় পদার্থ। আবার যে বস্তু হইতে ভাবান্তরের উৎপত্তি, তাহাতে তাহাদের মূল নিহিত এবং এক গ্রন্থিতে এই ত্রিবিধ পদার্থই গ্রথিত, প্রভেদ মাত্র এই যে কেহ উৎপন্ন, কেহ উৎপাদক। সেইরূপ আবার সময়ান্তরে অন্যরূপ ভাব বিশেষে সংযোজিত হইলে অন্যতর ফল প্রসবিত হয়। সান্নিধ্যস্থিত বস্তু-বিশেষ হইতে স্ফটিক পাত্র যে বর্ণ প্রাপ্ত হয়, আবার প্রতিকূল-বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ সংযোগে যেমন সেই পূর্ব্ব-প্রাপ্ত বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তেমনি বাহ্য জগতের কোন এক ভাবের সহ সংযুক্ত মানব প্রকৃতি যদি অদৃষ্টপূর্ব্ব বা যে কোন প্রকারে আবার ভাব বিশেষ দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎ পরিমাণ অনুরূপ পূর্ব্বভাবের এবং তদুৎপন্ন কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। দৃষ্ট বা অদৃষ্টপূর্ব্ব এই প্রতিকূল সংযোগ বশে, আমরা জাতি বিশেষে যে স্বভাবের কার্য্য নিয়ত প্রত্যাশা করিয়া থাকি, মধ্যে মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। এখানে জাতীয় জীবন আলোচ্য বিষয় বলিয়াই, জাতি বিশেষের কার্য্য গত ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত স্থলে গৃহীত হইল। যিনি এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত এবং বাহ্যজগৎ ও মানব-প্রকৃতির সহ সম্বন্ধ অবধারণ পূর্ব্বক প্রত্যেক কার্য্যে উভয়ের স্বাতন্ত্র্যতা এবং সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া এতৎ জাতীয় জীবনদ্বয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই তদ্বিষয়ে পটুতা লাভে কৃতকার্য্য, এবং মানব জীবন প্রবাহের অদ্ভুত কৌশল জ্ঞাত হইয়া অপার আনন্দ লাভে সমর্থ হইবেন।

বলিয়াছি যে জাতিদ্বয়ের জ্ঞান-জীব-

নের এই শৈশবকাল। চিত্ত তরল, কোন একটি বস্তু-সজ্মাতে সহসা বিপুল তরঙ্গাভিঘাত হয়। সুতরাং এসময়ে বাহ্যজগতের যে যে ভাবের সহিত সংযোগে আসিয়াছে, তাহাতেই তরঙ্গিত হইয়া অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই উভয় জাতি স্ব স্ব উপনিবেশিত দেশে পদার্পণ করিলে পর, বাহ্যজগৎ কাহার নিকট কিরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া প্রত্যেকের ভাবী জীবন প্রবাহ এবং তজ্জনিত শুভাশুভের কিরূপ ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আপাততঃ প্রবোধার্থে অতি স্থূল স্থূল বিষয় লইয়া দেখা যাউক।

ভারতীয়েরা স্বল্পপ্রাণ উত্তরকুরুবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া, সুখলালসায়, মনের সাহসে, অল্পশ্রমে, অনুরূপ স্বল্পপ্রাণ নদী পর্ব্বত কানন প্রভৃতি লঙ্ঘন করিয়া, ভারতে উপনীত হইলেন। হয়ত এখানে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহারা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে যেখানে যাইতেছি, সেখানকার বাহ্যজগতও, আহার-প্রচুর অথচ উত্তর কুরুর ন্যায় চিত্তের সামঞ্জস্য-সাধক হইবে। কিন্তু আশার কি বিপরীত ফল! তাঁহারা ভারতে পাদার্পণ মাত্র দেখিলেন যে ভারতীয় বাহ্যজগৎ অভূত-পূর্ব্বভাববিশিষ্ট। ভয় বাৎসল্যের এককালে যুগপৎ উৎপাদক। উত্তরে বিশাল হিমাদ্রি গিরি শতশৃঙ্গে ধবল মূর্ত্তি ধরিয়া, বিরাট দেহে গগণ ভেদ পূর্ব্বক নক্ষত্র মণ্ডল স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পার্শ্বে সপ্তসিন্ধু বায়ু-বিক্ষোভিত সাগর তরঙ্গ অনুকরণ করিয়া বেগভরে প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণে সমুদ্র গ্রীষ্ম-মণ্ডল-স্বভাবজাত ভীমমূর্ত্তিধর। স্থলে নয়ন পথ অতিক্রম করিয়া নিবিড় বনভূমি, উন্নতশির বৃক্ষাবলি গগণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভীষণ-স্বভাব শ্বাপদ-কুল রব তুলিয়া বনভূমি আলোড়িত ও দিগ্বলয় কম্পিত করিতেছে। উর্দ্ধে গগণ সাগরে ঘোরদর্শন শকুন্তবর্গ সন্তরণ দিতেছে। নিম্নে বীভৎস-মূর্ত্তি-বিশিষ্ট খলস্বভাব বিষধর সরীসৃপকুল ধীরে ধীরে মন্থরগমনে অতর্কিতভাবে তৃণ-শষ্প-সমাচ্ছন্ন হইয়া পদে পদে পদক্ষেপ আশঙ্কা জন্মাইতেছে। ব্যোমমার্গে মেঘদল বিদ্যুৎ বজ্র-পাণি হইয়া যদৃচ্ছা বিচরণ পূর্ব্বক বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া ফিরিতেছে। পবন দেব রোষভরে আমূল জগৎ কম্পনে রত। উত্তর কুরুস্থ হিমানীমুক্ত হইয়া, নিশানাথ এখানে যথার্থই সুধাংশু অংশু হইয়া এবং দিনদেব সহস্র রশ্মিতে বিভূষিত হইয়া অচিন্তনীয় পুরুষ নিয়ন্তার প্রত্যক্ষ প্রভাব জ্ঞাত করিতে করিতে উদয় গিরি হইতে অস্ত-শিখরে গমনাগমন করিতেছেন। নিশা নিবিড়, কখনবা নিবিড়তম হইয়া কেবল খদ্যোত-মালায়, কভুবা নীল উজ্জলমণি খচিত চন্দ্রাতপতলে প্রদীপ্ত মণিসহস্রের স্তিমিতালোকে, প্রতিভাসিত হইতেছেন। এদিকে বসুন্ধরা মাতৃস্নেহ-পরবশ হইয়া অযাচিত ফলমূল প্রভৃতি আহারীয় এবং আশ্রয় দানে যেন সান্ত্বনা এবং

অন্তর্জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলতঃ বাহ্য-জগৎ যেন এখানে আর্য্যগণকে রোষ ও ক্ষমা-বিমিশ্রিত বিকট ভঙ্গীতে সদর্পে কহিতেছেন " দেখ এ তোমার করকামী-হার-পীড়িত সামান্য-প্রাণ উত্তর কুরুবর্ষ নহে যে, যে কোন বিষয় সহজে সাধ্যায়ত্ত করিবে ; বড় তেজে আসিয়াছিলে, দস্যু-দল নিপাত করিয়া বড় দর্পিত হইয়াছ, কিন্তু আমার মূর্ত্তি দেখিলেত! আমার বিকট হাস্য একবার দেখিবে ? না, তাহা হইলে তুমি বাঁচিবে না। এখন দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র, দর্প দূর কর, আমার পায়ে নত হও, ভয় বিস্ময়ে আমাকে নিয়ত দর্শন কর। খাইতে দিতেছি, খাও, তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না ; কিন্তু মাথা তুলিওনা।

আর গ্রীকভূমি দেখ! হিমানী-পীড়িত উত্তরকুরুবর্ষ হইতেও স্বল্পপ্রাণ। যাহারা স্বস্থান পরিত্যাগান্তে বহুদূর অতিক্রম করিতে গিয়া গ্রীস অপেক্ষা ভীষণতর জাগতিক মূর্ত্তিকে উপহাস করিতে করিতে সমাগত হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট ইনি কি ভয় প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন? ইহাঁর প্রাণ স্বল্প, শক্তিও স্বল্প। দর্শন সম্পন্ন দৃঢ়তা-যুক্ত মানব চিত্তকে মোহাভিভূত করিয়া নিয়ত ভয় বিস্ময়ের অধীন রাখা ইহাঁর কার্য্য নহে। ভারতে যেমন জাগতিক মূর্ত্তিদর্শনে মানবচিত্ত বাহ্যজগতের নিকট আত্মপরাধীনতা সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করিয়া দাসবৎ রহিলেন, গ্রীকেরা তেমনি জাগতিক ভীষণতার অভাবে সাহসী হইয়া,— যদিও তাঁহাদের চিত্ত বাহ্য জগতের অধীনতা হইতে পৃথক নহে, তথাপি অধীনে থাকিয়াও,—তাহার উপর প্রভুর ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহারই নিকট বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহারই উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। গ্রীসে জাগতিক মূর্ত্তি উর্দ্ধ অধে সমসামান্য-প্রাণ। সুতরাং এখানে তাহার অসামান্য ভাব কখনই নহে, যদিও বা অপরিচিততায় তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণমাত্র ভীত হইয়াছিল, কিন্তু ফিড্রসের উপন্যাসস্থ ভেককুল-কর্ত্তৃক যাচিত জুপিতুর কর্ত্তৃক একখণ্ড কাষ্ঠ তাহাদিগকে রাজাস্বরূপ প্রদত্ত হইলে, ভেকেরা তদাগমনে কিয়ৎক্ষণ ভীত, কিন্তু পরক্ষণেই যেমন সেই ভয়ের অপনয়নে, রাজার উপর আরোহণ পূর্ব্বক টিটিকার নৃত্য এবং তাহাতে মল মূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেবতার নিকট আর একটি রাজার প্রার্থনা করিয়াছিল, গ্রীকেরাও তদ্রূপ পরক্ষণেই সেই ভয়ের কারণ সকলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সদর্পে বাহ্য জগৎকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আর তোমার কি কি বিভীষিকা আছে উপস্থিত কর, ইহাতে কিছুই হইল না। পূর্ব্বে যে কিছু একটু ভয় ছিল, তোমার নিকট পর্য্যন্ত আসিতে বহু ঘটনায় তাহা তিরোহিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার একটু ভয় প্রদর্শনে সুখ বোধ হইল, নির্ভয়তা আরও বাড়িল। তুমি ভাবিয়াছ, আমাদের জীব-

নোপায় পদার্থ সমস্ত লুকাইয়া রাখিবে, তাহা পারিবে না, তোমাকে চিনিয়াছি, আমরা তাহা বলপূর্ব্বক আহরণ করিব।”

এই খান হইতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে যে গ্রীক এবং হিন্দু এতদুভয় জাতির চিত্তবেগ পূর্ব্বে যাহা একই দিকে প্রবাহিত হইত, এখানে তাহা যথা প্রকৃতি বিচালিত হইয়া দ্বিধা ভাবে বিপরীতগামী হইল। হিন্দুরা বিনা যত্নে অনুকূলা বসুমতী হইতে স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য-পদবীতে পদার্পণ করিয়া মানবীয় ইতরবৃত্তি সমুদয় হইতে অবসর পাইলেন বটে, কিন্তু জাগতিক মূর্ত্তিতে ভীত, বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া, এবং তন্নিকটে পদে পদে দারুণতর আত্মন্যূনতা দর্শন করিয়া, আত্ম-নির্ভরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সে অবসর কাল পারলৌকিক তত্ত্বে ব্যয়িত করিয়া, সেই তত্ত্বেই চিত্ত সমাহিত করিয়া স্থৈর্য্য লাভ করিলেন। আর গ্রীকেরা প্রতিকূলা বসুমতীর কোপে পতিত হইয়া, ইতরবৃত্তি নিচয়ের বশবর্ত্তিতায় বাহ্য জগতের সহ মল্লযুদ্ধ এবং কালে তাহাকে পরাস্ত করিয়া, পূর্ব্বসঞ্চিত আত্ম-নির্ভরতা গুণ আরও দৃঢ়তর করিয়া, সেই পরিমাণে পারলৌকিক তত্ত্বে আস্থাশূন্য হইলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভারতীয়েরা এক পক্ষে আত্মন্যূনতার আধার, আর গ্রীকেরা অন্য পক্ষে আত্ম-সর্ব্বতার আদর্শস্থল হইলেন। এরূপ আত্ম-ন্যূনতা এবং পারলৌকিকে নির্ভরতার গুণ—ধর্ম্ম বিষয়ে এবং চিন্তা বিষয়ে প্রাধান্য লাভ; আর আত্ম নির্ভরতার গুণ—পার্থিব বিষয়ে প্রাধান্য লাভ এবং পারলৌকিক বিষয়ে পরিমাণ-অনুরূপ আস্থা-শূন্যতা। এই উভয়বিধ প্রাধান্য জাতি-বিশেষে কি সাংসারিক কার্য্যে, কি ধর্ম্ম-বিষয়ে, জীবনের সমস্ত কার্য্যেই তৎতৎ বিষয়ের বহুলতা লক্ষিত হইবে।

পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণের দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে উত্তর কুরু হইতে যে যে জাতি বহির্গত হইয়া বিভিন্নদেশে আগমন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কালে ঐতিহাসিক গণনায় পরিগণিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে হিন্দু গ্রীক এবং রোমক এই তিন জাতির মধ্যে রোমকেরা সর্ব্ব প্রথমে আদি স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইতালি ভূমে উপনিবেশ স্থাপন করে। তৎপরে গ্রীকেরা বহির্গত হয়, এবং সর্ব্ব শেষে গ্রীক ও রোমকদিগের স্থানান্তর হওনের বহুকাল পরে হিন্দু জাতিরা আদি স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতে আগত হইয়া পঞ্চনদের ধারে এবং সরস্বতী-তটে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া জাতীয় গৌরব-বিস্তারে রত হয়েন। পুরাবৃত্তবিদ্‌দিগের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রীকেরা গন্তব্য স্থানে অগ্রে উপস্থিত হইলেও, বহুপরে আগত এবং আদিতে গ্রীকদিগের সহ একদেশবাসী ও একপিতৃসন্তান হিন্দুদের আঢ্যতা এবং সভ্যতা কি কারণে গ্রীকদিগের অপেক্ষা বহু পূর্ব্বে উদয় হইয়াছিল এবং কেনই বা পরে উদিত গ্রীক সভ্যতা বহু বিষয়ে হিন্দু সভ্যতাকে

অতিক্রম করিয়াছিল, তাহা অগ্রে আলোচ্য।

উপরেই আভাসিত হইয়াছে যে মানবের সামান্যতর বৃত্তি সমুদয় যত দিন স্বচ্ছলতার সহিত পরিতৃপ্ত না হয়, তত দিন তন্নিমিত্ত ব্যস্ততা বশতঃ অন্য বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিতে অপারগ হয়। হিন্দুরা এই অপারগতা হইতে, ভারতে আগমন দিন হইতেই বোধ হয় নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ভারতের যে স্থানে যাও, তথায়ই স্বচ্ছসলিলা নদী সকল প্রবাহিত, বর্ষাগমে পল্বল দ্বারা সন্নিকটস্থ ভূমি সমস্তকে উর্ব্বরা করিতে পটু। স্বভাবতঃ ভূমি সর্ব্বত্র এরূপ অনুকূলা, যে অতি অযত্ন পূর্ব্বক এক মুষ্টি বীজ ছড়াইলেও অল্প দিনে তাহার ফল লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এবং হয়ত আবার সে প্রাচীন কালে ভূমি অক্ষুণ্ণ থাকাতে অনেক স্থানে শস্য যদৃচ্ছা-উৎপন্ন এবং বিকীর্ণ হইয়া থাকিত। যেখানে যাও, কানন সকল যতই ভীষণ দর্শন হউক, বৃক্ষাবলি পরিপক্ক সুস্বাদু ফলভরে সর্ব্বত্রই অবনত হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বত সকলও সর্ব্বত্র ফল রস জল প্রদান করিয়া পথিকের ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণ করিয়া থাকে। অথবা সংক্ষেপে আকবরের রাজস্ব-সচিবের কথায় এদেশ এতই সৌভাগ্যশালী যে বিধাতা ইহার অধিবাসীদিগের নিমিত্ত বৃক্ষের উপরেও দুই দুই রুটি এবং এক এক পেয়ালা জল রাখিয়াছেন। হিমাদ্রি এবং সন্নিকটস্থ পর্ব্বত সমূহ রত্নাধার, ইচ্ছা করিলেই তাহা হইতে নানা রত্ন উত্তোলিত ও ব্যবহৃত হইতে পারে। যে দেশের এমন অবস্থা, সেখানকার অধিবাসীর আর সামান্য-বৃত্তি-পরিতৃপ্তি-বিষয়িণী চিন্তা কোথায়? ইহার ফল হিত অহিত উভয়ই আছে। মনুষ্যের স্বভাব এই যে সমবেত কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আজ্ঞাদাতা এবং আজ্ঞা-প্রতিপালক এতদুভয় পর্য্যায় সংস্থাপন না করিলে, সে কার্য্য আরম্ভ এবং সংসাধন করিতে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকে, হয়ত অন্তে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়ে। কোন নূতন সমাজ সংস্থাপন করিতে হইলেও এই নিয়ম অভিনীত হইয়া থাকে। যাঁহারা, অপেক্ষাকৃত গুণসম্পন্ন তাঁহারা পর্য্যায় ভেদে নেতার পদ প্রাপ্ত হইয়াথাকেন, এবং যাহারা অল্পগুণসম্পন্ন তাহারা নীত হইয়া থাকে, নেতৃগণ বুদ্ধি কৌশল, বল বা যথাসম্ভব পরিচালন দ্বারা নীত ব্যক্তিগণকে আপদ বিপদ্ হইতে রক্ষণ এবং সংস্থাপন করিয়া থাকেন। নীতগণ কৃতজ্ঞতা বশে, প্রাপ্ত উপকারের এবং বিনিময় স্বরূপে সৌভাগ্যের অংশ নেতা দিগের উচ্চ-নীচ-পর্য্যায় অনুসারে আত্ম হইতে অধিক পরিমাণে নিয়োজিত করে। এই নিয়ম হইতে রাজা রাজ-পরিষদ্ বা ভূম্যধিকারী প্রভৃতি আঢ্য শ্রেণীতে স্থাপিত হয়। এই শ্রেণীস্থের সংখ্যা স্বভাবতঃ এবং কার্যগতিকে অল্প। অপরাপর ব্যক্তিগণ উহাদের আঢ্যতা বশে কিয়দংশে উহাদের আজ্ঞাকারী হয়। সুতরাং তাঁহাদের আজ্ঞাধীনতা বশতঃ

তাহাদিগকে খাটাইয়া আঢ্যেরা আপনাদের পূর্ব্ব হইতেই পুষ্ট সৌভাগ্য আরও পুষ্ট করিতে ক্ষমবান্ হয়। কিন্তু এঅবস্থাতে লোক দাসবৎ আজ্ঞাকারী বা উচ্চ এবং অধমের মধ্যে অপরিমিত ধন-বৈষম্য জন্মায় নাই। অধম শ্রেণী এখনও অপরের জন্য না খাটিলেও, আপন ভাগ্যে স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছলতার সহিত সময় অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়। এবং উচ্চ শ্রেণী ইহাদিগকে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইলে, অনাদর প্রকাশে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন না।

কিন্তু এই ধন-বৈষম্য যথাভাবে স্থিতি বা তাহার বৃদ্ধি, দেশের শীতাতপ, উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতা গুণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। যথা প্রকৃতি শরীর-সঞ্চালন ও শারীরিক কার্য্য সাধনোপযুক্ত শরীরজ তাপ রাশি, পার্শ্বস্থ বায়ুরাশির সংস্পর্শে, তাহার শৈত্য বা উষ্ণতা অনুসারে, হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শৈত্যের যথায় হ্রাস হয়, তথায় তাপের সমতা রক্ষার্থে, ক্ষতি পূরণজন্য মাংস, মাদক বা তৈলাক্ত দ্রব্য আহারার্থে প্রয়োজন হয় এবং পরিশ্রম দ্বারা শরীর সঞ্চালন ও বস্ত্রাদি দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ শৈত্য হইতে সর্ব্বদা শরীর রক্ষার আবশ্যক হয়। আর যথায় উষ্ণতা হেতু তাপের বৃদ্ধি হয়, তথায় তদ্রূপ আহারের অপ্রয়োজন, সাধারণ ফল মূল শস্য প্রভৃতি অল্পায়াস-লভ্য দ্রব্যই প্রচুর বলিয়া গণ্য হয়, শ্রম দ্বারা তাপ বৃদ্ধির অনাবশ্যক; ফলতঃ তাপবৃদ্ধি-জনিত অলসতা উপস্থিত হইয়া পরিশ্রম করিতে মানব প্রবৃত্তি-শূন্য হয়; পরন্তু শরীরে কোন প্রকার আবরণেরও অনাবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ প্রায়ই সজল এবং উর্ব্বরা। কিন্তু যদি জলশূন্য ও অনুর্ব্বরা হয়, তাহা হইলে আবার সজল ও উর্ব্বরা উষ্ণ দেশ এবং নির্জ্জল ও অনুর্ব্বরা দেশ মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রথমোক্ত দেশের বায়ু সজল ও উত্তপ্ত এবং উর্ব্বরা, শেষোক্ত দেশের বায়ুও উষ্ণ বটে কিন্তু শুষ্ক এবং দেশের জল-শূন্যতা হেতু ভূমি অনুর্ব্বরা। এই নিমিত্ত শেষোক্ত দেশীয়েরা দুষ্প্রাপ্য আহারের নিমিত্ত বাধ্য হইয়া শ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে সক্ষমও হইয়া থাকে, কারণ জলীয় বাষ্পযুক্ত উষ্ণ বায়ুমধ্যে দেহ হইতে তাপ নির্গমন পক্ষে যে প্রতিবন্ধক জন্মে, শুষ্ক উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে সে প্রতিবন্ধক থাকে না বলিয়া, তাহাদের শ্রম-জনিত তাপ সহ্য করিতে ক্লেশ বোধ হয় না, এবং অবস্থা গুণে প্রথমোক্ত দেশের অধিবাসী অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম প্রিয় ও কষ্টসহ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত—অপেক্ষাকৃত সজল ও উর্ব্বরা এবং উত্তপ্ত বঙ্গ দেশস্থ এবং অপেক্ষাকৃত নির্জ্জল অনুর্ব্বরা ও সম পরিমাণে উত্তপ্ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ অধিবাসীদিগের মধ্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এখানে দেখিতে পাইবে যে একজন বাঙ্গালী কতদূর অলস, পরিশ্রম-কাতর, ভীরু এবং দুর্ব্বল, আর এক জন হিন্দুস্থানী

কতদূর উদ্যোগী, পরিশ্রমপ্রিয়, সাহসী এবং সবল। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ন্যায় আবার শীত-প্রধান দেশেরও দুইরূপ অবস্থা আছে। যথায় শৈত্যের ভাগ অত্যন্ত অধিক এবং বায়ু সজল, তথায় ভূমি একেবারে অনুর্ব্বরা, এবং আহারীয় অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, অথচ তাপবৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন, সেখানকার লোকের চিরকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দুঃখ ভোগ করিতে জীবন অতিবাহিত হয়, সুখের দিন ভাগ্যে একদিনও ঘটেনা। আর যেখানে শৈত্য-ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং বায়ু শুষ্ক এবং ভূমি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা, সেখানে লোকে নিয়মিত শ্রম দ্বারা অভাব পরিপূরণ করিয়া চিত্তের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমটির আদর্শস্থল—লাপলাণ্ড প্রভৃতি পৃথিবীর উত্তর-কেন্দ্রস্থ দেশ সমুদয়। আর দ্বিতীয়টির আদর্শস্থল—পৃথিবীর সমমণ্ডলস্থ দেশ সমূহ।

যথায় দেশ সজল এবং উত্তপ্ত এবং ভূমি উর্ব্বরা, তথায় কষ্টসাধ্য মাংস মাদক বা তৈলাংশ দ্রব্য প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের অপ্রয়োজন হেতু, মানবেরা অনায়াস-লভ্য ফল মূল শস্যাদি সংগ্রহ দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয়; এবং শৈত্য-প্রধান দেশে তাপ বৃদ্ধি করণ জন্য ব্যয়-বাহুল্য এবং কষ্ট-সাধ্য গাত্রাবরণের অনাবশ্যকতা হেতু তাঁহাদের তাহার ভাবনা ভাবিতে হয় না। এক কথায় অন্ন বস্ত্র অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। ম্যাল্থস্ সাহেবকৃত লোকতত্ত্ব-নিরূপণবিষয়িণী পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছলতা হইলেই লোক দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া সন্তানোৎপাদন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সুতরাং উক্তরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট দেশে অচিরাৎ লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই লোকবৃদ্ধি সহকারে আহারের অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্যতা-জনিত লোককে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং কাযে কাযেই শ্রমজীবির সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ে, কাযেই পরিশ্রমের মূল্য কমিয়া যায়, এ নিমিত্ত পূর্ব্বার্জ্জিত সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ অল্পব্যয়ে অধিক শ্রম বিনিময় করিয়া বহু ধন সঞ্চয়ে বা যথা-অভীপ্সিত কার্য্য করণে সমর্থ হয়; এবং অন্যদিকে সেই পরিমাণে শ্রম-জীবিরা ক্রমে নির্ধন এবং সৌভাগ্য-শালীদের পদানত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত এবম্ভূত দেশ মধ্যে অতি অল্প দিনেই উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী স্পষ্ট রূপে স্থাপিত এবং তাহাদের মধ্যে অপরিমিত বিষয়-বৈষম্য ঘটিয়া উঠে, সুতরাং সামাজিক উৎকর্ষ অপকর্ষের ভার সর্ব্বজনীন না হইয়া, একচেটিয়া ভাবে উচ্চ-শ্রেণীস্থের উপর অর্পিত হয়। আঢ্য বা উচ্চ শ্রেণীরা সম্পত্তি লাভে আলস্য-প্রিয়তা গুণ-বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের স্বভাব-সুলভ বহুবিধ বিলাস বিস্তারে রত হয়, এবং যে বুদ্ধি অন্যাবস্থায় অপরাপর বহুবিধ গুরুতর কার্য্যে ব্যয়িত হইত, এক্ষণে তৎপক্ষে অল্পই ব্যয় করিয়া, অধিকাংশ অভিনব বিলাস দ্রব্যের উদ্ভাবন, সৃষ্টি ও

তাহার ব্যবহার এবং রক্ষণ কার্য্যে নিয়োজিত হয়। তাহার সিদ্ধি পক্ষে লোক সকলও আজ্ঞাকারী থাকায়, দেশ মধ্যে অচিরে শিল্প, চারু, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কার্য্যের প্রাদুর্ভাব ও প্রাচুর্য্য হওয়ায় অনুগামিনী সভ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সভ্যতা সমাজের মধ্যে উচ্চতর ভেদ বিহীন হওত সর্ব্বজনীন না হওয়ায় উহা আভ্যন্তরিক না হইয়া প্রায় বাহ্যিক ভাবে অবস্থিতি করে, এবং ধ্বংস কালে হয়ত সমাজকে একেবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে হয়, নয়ত এমন মুমূর্ষু অবস্থায় তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া যায় যে তাহাকে পুনর্ব্বার সজীব করিতে বহু যত্ন ও বহুকাল ব্যয়িত হইয়া থাকে। সভ্যতাবিষয়কী ইতিহাস-লেখক বকল সাহেবের মত এই যে এইরূপ ধনবৈষম্য হইতে মিসর দেশের আদিম সভ্যতার উদ্ভব হয়। ঐ সভ্যতা বাহ্যিক দৃশ্যে অত্যুৎকৃষ্ট নহে, এবং তাহা সর্ব্ব শ্রেণীতে সমভাবে বিকীর্ণ হয় নাই। উচ্চ শ্রেণীরা যেমন অপরিমিত ধনশালী হইয়া বিলাসরত হইয়াছিল, নিম্নশ্রেণীরা তেমনি নিঃসম্বল ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া কোন রূপে জীবন অতিবাহিত করিতে কালক্ষেপ করিত, এবং সর্ব্বদা আঢ্যদিগের পদানত থাকিত। এতদূর পদানত থাকিত যে আঢ্যেরা যাহা মনে করিতেন, তাহাদের দ্বারা তাহাই সমাপন করিয়া লইতেন। মিসরদেশীয় পীরামিড্ সকল তৎপক্ষে সাক্ষ্য-স্থানীয়। এই পীরামিড সকল পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সপ্তাশ্চর্য্যের আর ছয়টি কতকাল হইল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই পীরামিডগণ অদ্যাপি অচল ও অটল ভাবে বিরাট্ বেশে মেঘমুকুটে শির ভূষিত করিয়া দর্শকের মনে যুগপৎ ভয় বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিয়া মিসরের বিগত গৌরব ঘোষণা করিতেছে। কত কালস্রোত ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহারা সেই একই ভাবে অবস্থান করিতেছে, আবার কত কালস্রোত সেই রূপ অতিক্রম করিয়া কত যুগ যুগান্ত অবস্থান করিবে তাহা কে বলিতে পারে? এই স্থানে যত পীরামিড্ আছে, তন্মধ্যে গিজা নগরের পীরামিড, যাহা খুপ নামক মিসরের প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজার সমাধিমন্দির রূপে নির্ম্মিত হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং বিস্ময়কর। হিরোডোটস লিখিত ইতিহাস অনুসারে এই পীরামিড্ নির্ম্মাণ করিতে প্রতিনিয়ত লক্ষাধিক লোক নিয়োজিত ছিল, এবং কুড়ি বৎসরে এই নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হয়, এই সকল শ্রমজীবি-রক্ষার্থে ৩৮৪০০০০ টাকা ব্যয় হয়। এবম্ভূত কীর্ত্তি এত স্বল্প ব্যয়ে নির্ম্মাণ, শ্রমজীবির সংখ্যা অতি সুলভ ও আজ্ঞাকারী না হইলে সমাপন হইতে পারে না। সাহজাঁহার তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে এরূপ কথিত যে ৭৫০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। মিসরদেশীয় কার্ণাকনগরস্থ প্রাচীন দেব-

মন্দিরের ন্যায় আশ্চর্য্যকাণ্ডও শ্রমের বহুমূলভতা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। উহা কিরূপ আশ্চর্য্যকাণ্ড তাহা বর্ণনাতীত। ইহার আয়তন এবং আকৃতি বিস্ময়কর। ইহার একটি মাত্র হলের অর্থাৎ দালানের স্তম্ভাবলী দেখিয়া বিখ্যাত ভ্রমণকারী সাম্পলিওন বিস্ময় সহকারে এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন যে, "The imagination which in Europe rises far above our porticoes, sinks abashed at the foot of the 140 Columns of the hypostyle hall of Karnak". মিসরের শ্রমজীবিরা কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ ছিল, যদি এ দূরতর সময়ে ও বহুবিপ্লবে রূপান্তর-প্রাপ্ত তাহাদের বংশধরদের দ্বারা কিছু মাত্র প্রতীত হয়, তবে মিসরীয় ফেলাদের অবস্থা বারেক পর্য্যালোচনা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। মিসরের সভ্যতা, ধনবত্তা, কীর্ত্তি এবং সামান্য শ্রেণীদিগের দুরবস্থা যেরূপ যেরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে তদ্রূপ তদ্রূপ কারণের অস্তিত্ব থাকায় অবিকল তদ্রূপ তদ্রূপ ফল ফলিয়া ছিল। বাইবেল গ্রন্থোক্ত ব্যাবিলানের ধনবত্তা, এবং সামান্য শ্রেণীর উপর অত্যাচার, নবখদনজর সম্রাটের ঐশ্বর্য্য, এবং মীডদেশীয় রাজকন্যা অমিতীনাম্নী তাঁহার প্রিয় মহিষীর সন্তোষার্থে মনোহর অট্টালিকা ও গগনোদ্যান প্রভৃতি ইহার পরিচয় স্থল।

ভারতবর্ষের প্রকৃতি বহুবিধ বিভিন্নাকারের ও বিভিন্ন স্বভাবের বটে, কিন্তু সমগ্র ধরিতে গেলে, মিসর যে শ্রেণীতে ইহাকেও সেই শ্রেণীতে গণনা করা যায়। ইহাও উত্তপ্ত ও সজল, এবং বাড়ার ভাগ অন্যান্য দেশাপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বরতাগুণসম্পন্ন। আহারীয় দ্রব্যের অভাব নাই, এজন্য অতি অল্প দিনেই ধনসঞ্চয় এবং নিম্নশ্রেণীর অবস্থাও পূর্ব্ব-কথিত নিয়মানুসারে আরও নিম্নতর এবং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধন-বৈষম্যও জন্মিয়াছিল। আর্য্যেরা আপন অভীষ্ট পরিপূরণার্থে আপনাদের স্বদলস্থ নিম্নশ্রেণী ব্যতীত আর একদল দাসবৎ পদানত লোক পাইয়াছিলেন। ইহারা ভারতের আদিম অধিবাসী, এবং আর্য্য-অস্ত্রের বশ্যতায় আনীত হইয়া দাসপদে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই সময়ে সমস্ত জগৎ পশুবৎ লোক দ্বারা অধিবেশিত থাকায় বহিঃশত্রু হইতে নির্ভাবনায়, এবং এরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট দেশের রীতি অনুসারে, আর্য্য-সন্তানেরা শীতপ্রধান দেশবাসীদিগের অলস ভাব প্রাপ্ত এবং অবসরপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এমন অবস্থায় মানবের যে পরিমাণে বিলাসরত, এবং তজ্জনিত ব্যাবিলনের গগনোদ্যানের ন্যায় অদ্ভুত বিলাস বস্তুর উদ্ভাবন হওয়া উচিত—এ সকল হইতে পায় নাই। তাহার কারণ আছে। আর্য্যদিগের পারলৌকিক বিষয়ে চিত্ত অধিক পরিমাণে সমাহিত থাকায় অবসর কাল এবং চিন্তা শক্তি কেবল বিলাস ভোগে ও বিলাসিতা

উদ্ভাবনে ব্যাপৃত না হইয়া, মনস্তত্ত্ব এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে সম বা তদধিক পরিমাণে ব্যাপৃত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত প্রথম হইতেই ভারতের সভ্যতায় বিলাস-জনিত শিল্প কার্য্য প্রভৃতি মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানাদি সহ পাশাপাশি হইয়া, একত্রে উদ্ভাবিত ও অল্প দিনেই পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সহসা উদিত সভ্যতার দোষ গুণ দেখা যাউক।

মনুষ্য-চিত্ত ভারতের অদ্ভুত প্রকৃতি দর্শনে ক্রমে ক্রমে পারলৌকিক তত্ত্বে এরূপ সমাহিত হইল যে মানবচিত্ত পর পর অদৃশ্য ভেদ করিতে ক্রমাগত উৎসাহবান্ হইয়া, মানব জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা এবং পরলোকেই সমস্ত নির্ভরতা সিদ্ধান্ত করিয়া, পার্থিব বিষয় সমস্তেই আস্থা-শূন্য এবং তাহা ক্ষণ মাত্রের বস্তু বলিয়া, তাহার প্রতি অপেক্ষাকৃত শিথিল-যত্ন হইলেন। সংসার অনিত্য, সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ অনিত্য, পরলোকই মূল বাসস্থান, সংসার কেবল বাসাবাড়ি স্বরূপ। এই নিমিত্ত ইহাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি সকল প্রকার বিদ্যাতেই এই বোধের আধিক্য লক্ষিত হয়। মনস্তত্ত্ব সেই বোধের পরিপোষক বলিয়া তৎসম্বন্ধে যতদূর উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় তত দূর আর কোন বিষয়ে লক্ষিত হয় না। ইহা যথা স্থানে সমালোচিত হইবে। ব্যবহার শাস্ত্র যদিও একরূপ স্বতন্ত্র বস্তু, তথাপি তাহা সেই বোধের সহ এতদূর ঘনিষ্টতায় আসিয়াছিল, যে অন্য কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় না, এবং এই নিমিত্ত তাহাতেও যত্ন অশিথিল না থাকায় তৎপক্ষে উন্নতি-কল্পে ত্রুটি হয় নাই। এই বিষয়ের সত্যতা ভারতীয় প্রাচীন ব্যবস্থা শাস্ত্র এবং সমপ্রাচীন স্পার্টা দেশীয় লাইকর্গস-প্রণীত ব্যবস্থা শাস্ত্র, এতদুভয়ের তুলনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে, লাইকরগসের ব্যবস্থাশাস্ত্র, কিরূপে সমাজের লৌকিক সচ্ছন্দতা সাধিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমাজের মঙ্গল সাধন জন্য যদি কোন নৈতিক বিষয় বা মনুষ্যত্বকে তাহার নিকট বলি দিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি সামাজিক মঙ্গল সাধনে যত্নপর হও। সকল বিধিরই উদ্দেশ্য বাহ্য সম্পদ-সাধন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। একরূপ সোলনের বিধি দেখ, রোমকদিগের ব্যবস্থাগ্রন্থ দেখ, একই উদ্দেশ্য; সেই ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর হিন্দুদিগের ব্যবস্থা গ্রন্থ দেখ, ঠিক ইহার বিপরীত। কর্ম্ম বোধে যে যে বিষয় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত, এবং সেই পবিত্রতা ও ধর্ম্ম সঞ্চয় যাহাতে যাহাতে হইতে পারে তাহারই সংসাধন পক্ষে সমস্ত বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার নিকট যদি লৌকিক নীতি ও বাহ্য সম্পদ বলি দেওয়া আবশ্যক বোধ হয়, তাহাতে ক্রটি হয় নাই। বাহ্য সম্পদ সমস্তই পর্য্যবসিত হউক, তাহাতেও ক্ষতি নাই, তথাপি যাহাতে পরলোকে স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়, এরূপ পবিত্রতা সাধনে ক্রটি না হয়।

লাইকর্গস যাহা সম্পর্কের অনুরোধে অসম্পন্ন-অবয়ব বা ক্ষীণদেহ শিশু হত্যায় কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েন নাই বা তাঁহার মনে; কিছু মাত্র বিষাদ উপস্থিত হয় নাই কিন্তু হিন্দুরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন একটি ইতরজাতীয় প্রাণীবধজনিত নিমিত্তের ভাগী হইলেও, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা স্বরলোকের পথ-পরিষ্কারক অঙ্গ-পবিত্রতা সাধন করিতেন। ইহাপেক্ষা এতদুভয়ের বিভিন্নতা এবং হিন্দু ও গ্রীক চিত্তের গতিবিষয়ক সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ এবং তদানুষঙ্গিক উচ্চশ্রেণীস্থ গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধেও আর্য্যদিগের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তাহাও উক্তরূপ কারণ হইতে প্রধানতঃ উৎপন্ন ও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ব্যতীত হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন হইতে পারিতনা, বিশেষ যে দেশ যত গ্রীষ্ম-প্রধান সে দেশ তত রোগময়, এবং যেরূপ বৃত্তি-বিশিষ্ট চিত্তই হউক শারীরিক স্বচ্ছন্দতা কে না ভাল বাসে। এই সকল কারণে হিন্দুরা প্রথম হইতেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে অতি অল্পদিনেই সুফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং এই সূত্রে বহুবিধ রাসায়নিক, পাশব ও উদ্ভিদ-তত্ত্ব ও সেই সময়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত হয়। উহা এত প্রাচীন সময়ে সংসাধিত হইয়াছিল, যে হয়ত গ্রীকেরা তখন মিসরীয়দিগের নিকট ভৈষজ্যবিদ্যা কর্জ্জ করিবেন বলিয়া খৎ লিখিতেছেন। এই ভৈষজ্য বিদ্যা কালক্রমে আরও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত এবং অন্যান্য জাতি দ্বারা গৃহীত হয়। ব্যবহার শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়েও ঐ রূপ মন্তব্য বর্ত্তে। কিন্তু যেখানে উক্তরূপ বোধের অভাব, সেই সেই স্থানেই অপকর্ষ লক্ষিত হয়। এই অভাব এবং তজ্জনিত অপকর্ষ প্রায় সর্ব্বত্রই পার্থিব। ঐরূপ জ্যোতিষ ও গণিত সম্বন্ধেও ভারতীয়েরা বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অপরাপর অনেক জাতিকে শিক্ষা দিয়াছে। এ মত যদি সত্য হয় যে—চন্দ্র সূর্য্য গ্রহমণ্ডলীর অদৃষ্টপূর্ব্ব গতি বিধি এবং বিস্ময়কর প্রাকৃতিক কার্য্যকলাপ দর্শনে আদি মানবের মনে যে বিস্ময় উৎপাদন ও নৈসর্গিক শক্তিবোধ হয়, তাহা হইতেই কালক্রমে দেবতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়া থাকে—এবং সেই সকল চিত্তমোহকর পদার্থ দেব-পদে বরিত হয়; তাহা হইলে স্বচ্ছলতাযুক্ত মানব যে আপন অবসরকালের কিয়দংশ সেই সেই দেবতত্ত্ব ভেদ ও দেবতার স্বভাব ও গতি বিধি নিরূপণে ব্যয়িত করিবে তাহাতে সন্দেহ কি আছে। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীনকালে যে যে দেশ স্বচ্ছলতা প্রযুক্ত ধনসঞ্চয় করিয়া অল্পদিনেই সভ্যতার উদ্ভাবক অবসর লাভ করিয়াছে, সেই স্থানেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কোন না কোন রূপ চর্চ্চা এবং তাহাতে প্রতিপন্নতা লাভ হইয়াছে। এই নিমিত্ত প্রাচীন জ্যোতিষতত্ত্ব সমালোচনায় মিসর, ব্যাবিলন, চীন বা ভারতবর্ষের নাম

যেরূপ অগ্রে গণনায় আসিবে, গ্রীস কি রোম কিম্বা তদ্রূপ অন্যান্য দেশের নাম গণনায় আসিবেনা। মিসর দেশে এত প্রাচীনকালে জ্যোতিষিক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় যে কথিত আছে খৃষ্টীয় শকের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মিসরীয়েরা রাশিচক্র ও দ্বাদশরাশি নিরূপণ এবং তাহাদের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। এবং ইহাও কথিত আছে যে ইহারা পাশ্চাত্যভূমে সর্ব্বপ্রথমে সপ্তাহ বিভাগ এবং গ্রহগণের নামানুসারে তদন্তর্গত দিবস সকলের নামকরণ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ তত্ত্বও আবিষ্কার তাহাদিগ হইতে উদ্ভূত হয়। ঐরূপ চীনদিগের জ্যোতিষিক তত্ত্ব নিরূপণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কথিত হয় খ্রীষ্টীয় শকের ২৬৯৭ বৎসর পূর্ব্বে হোয়াংসির রাজত্ব সময়ে নক্ষত্র-মণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত ও তাহাদের অনেকের গতি নিরূপিত হয়। ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ঐ তারিখ যদিও সন্দেহস্থল হয়, এবং ঐ নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণ যদিও নামে মাত্র এবং সামান্য হয়, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে চীনেরা অতি প্রাচীনতম কালেই জ্যোতিষ বিদ্যায় মনসংযোগ করিয়াছিল। ব্যাবিলন বাসী ও কাল্‌ডিয়া বাসীরাও জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনার প্রাচীনত্বে ন্যূন নহে, তাহারা বহুবিধ নূতন তত্ত্বাদি আবিষ্কার করে। কোন কোন পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, যে যে জাতি অধিক পরিমাণে ভ্রমণ-শীল, তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বশতঃ দিক্ ও সময় নিরূপণার্থে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে এবং সেই সূত্রে অনেক গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত হয়; একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইলে হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের এরূপ অবস্থায় আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত বিষয় সমস্ত যে জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে কোন স্থায়ী ফল প্রসব করে এরূপ বোধ হয় না। পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রীকেরা অনাশ্রমী ভাবে বহুকাল ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যদ্রূপ গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, ভারতীয়েরা তাহাদের শতাংশের একাংশ ও নহে। পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্কান্দিনেবীয়েরা গ্রীকদিগের অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে নিরাশ্রমী ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে এই শেষোক্ত দিগের মধ্যে জ্যোতিষ-বিষয়ক গণনীয় জ্ঞান কিছুই ছিলনা। গ্রীক দিগের মধ্যে খৃঃ পূ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে জ্যোতিষ-বিষয়ক জ্ঞান অতি সামান্য ও অগণনীয় ছিল। ঐ সময়ের পরে ইহারা মিসরীয় এবং কাল্ডীয় দিগের নিকট হইতে উক্তবিষয়িণী জ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। এবং খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতেই গণনীয় জ্ঞান যথা কথঞ্চিৎ লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে জ্যোতিষ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ-প্রণেতা অতোলিক্ষ সচল গোলক ও গ্রহগণের উদয়াস্তসম্বন্ধীয় দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপরে খৃঃ

পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অগ্নিস্তরিক্ষ এবং ইরতস্থিনিস ও আর্কিমিডিস্ জ্যোতিষের সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের দেশে, তাঁহাদের ঋগ্বেদিক গাথা সমূহ কোন্ দূরতর কালে প্রস্তুত এবং গীত হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি তাহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়িণী বহুতর সারতত্ত্ব সমূহের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত সামবেদীয় গোভিলীয় নবগ্রহ শান্তি পরিশিষ্ট এবং অথর্ব্ববেদী নক্ষত্রকল্প, গ্রহযুদ্ধ, নক্ষত্র গ্রহোৎপাত লক্ষণ, কেতুচার, রাহুচার এবং ঋতুকেতু লক্ষণ ইত্যাদি প্রাচীনতম গ্রন্থে সাক্ষ্য দিতেছে যে, অতি প্রাচীন কালেই জ্যোতিষ-বিষয়ক জ্ঞান ভারতে অপরিমিত ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ইহার কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এখানে তাহার পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। ভারতীয়দের জ্যোতিষ তত্ত্ব সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহ সম্বন্ধ-যুক্ত। কি প্রাচীনকালে কি বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মবিষয়িণী ক্রিয়া কলাপ এতৎ সাহায্যে নিরূপিত দিন ক্ষণের উপর এতদূর নির্ভর করে যে, একের অভাবে অপরটি হইতে পারেনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের সহ জ্যোতিষ এতদূর ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোজিত যে, যখনই জ্যোতিষ-বিষয়ক কোন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, তখনই আর্য্য ঠাকুরেরা ইহাকে বিজ্ঞান-বিষয়িণী জ্ঞানের উন্নতি না ধরিয়া, দেব-প্রসাদে যেন ধর্ম্মবিষয়ক নূতন জ্ঞান লাভ হইল বলিয়া ধরিয়াছেন, এবং কেবল এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়াই, ভারতে যত দিন উন্নতির কাল ছিল, পর পর আরও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে রত হইয়াছেন। ইহাদের উদ্ভাবিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রথমে আরব দিগের দ্বারা দেশান্তরিত হইয়া কাল সহকারে ইউরোপ প্রভৃতি দেশে নীত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সময়ে যদিও ভারতীয়েরা সাহিত্য বিষয়ে অপরিমিত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে তাহাদের সৃষ্ট বহু বিষয় যদিও অনেকের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল, তথাপি অতি প্রাচীন কালীয় বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আর্য্যঠাকুরদিগের সাহিত্য, প্রায় ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থেই সমাহিত হইয়াছে। কেবল এক মাত্র এবং জগতের অদ্বিতীয় মহাকাব্য মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু তথাপি ঐ রামায়ণে ধর্ম্ম ও দেব-বিষয়ক প্রসঙ্গের আধিক্য এত অধিক পরিমাণে আছে, যে কেবল আমরাই উহার ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বাতন্ত্র্য নির্ব্বাচন করিলাম, কিন্তু পৌত্তলিক হিন্দু-ধর্ম্মাশ্রয়ী কোন ব্যক্তি তাহা করিবে না। উহা তাহাদের মনে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া এতদূর প্রতীত যে, কাব্য বলিয়া নহে, কেবল পবিত্র ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াই

উহাকে পাঠ করিয়া থাকে। এবং বিশ্বাস এই যে উহা পাঠ করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইয়া পুণ্যলোকে অবস্থান লাভ হয়। যাহা হউক রামায়ণ অতি অতুলনীয় কাব্য, মহৎ এবং সর্ব্বত্র রস-মাধুর্য্য ও রমণীয়তায় পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ কাব্য বিষয়ে চরমোন্নতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পার্শ্বস্থ পদার্থ মাত্রের মাধুর্য্য-সন্দর্শনে চিত্ত বিমোহিত হইয়া, সেই মাধুর্য্য যখন বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহা কাব্য। মাধুর্য্য অর্থে যে কেবল বাসন্ত দক্ষিণানিলকুলের মধুরিমা বা তথাবিধ বস্তু, তাহা নহে; তমসাচ্ছন্ন নিশি, নিবিড় ঘনঘটা, বিদ্যুৎ, বজ্রাগ্নি বা বীভৎস বস্তু, সর্ব্বত্রই ইহা বিদ্যমান আছে। এই মাধুর্য্য-চিন্তা এবং কল্পনা-সাহায্যে যেরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দর্শিত, এবং চিত্ত যে ভাবে আপ্লুত হইয়া তাহা দর্শন করে, কাব্য সেই পরিমাণে মাধুর্য্য-প্রচুর বা তাহার স্বল্পতাযুক্ত এবং সেই সেই ভাবে পরি-পূরিত হইয়া অনুরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে। চিন্তা এবং কল্পনাদক্ষ ও ধর্ম্মবোধ পরিপূরিত ভারত ভূমিতে যে অত্যুৎকৃষ্ট এবং রামায়ণের ন্যায় স্বভাব-বিশিষ্ট মহাকাব্যের উৎপত্তি হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। রামায়ণের সহ পার্শ্বাপার্শ্বি ভাবে আর এক বিরাটভাব-বিশিষ্ট কাব্য গণনায় গণিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা রামায়ণ অপেক্ষা অনেক আধুনিক, এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যের সহ শ্রেণী-নিবদ্ধ হইতে পারে। এই কাব্যেরও স্বভাব কি রূপ তাহা হিন্দু সন্তান মাত্রে জ্ঞাত আছেন।

এতদ্ব্যতীত কৃষি শিল্প প্রভৃতির আবশ্যক অনুরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ যে যে শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে ধর্ম্ম বোধের অভাব, তথায় তথায়ই উন্নতি বিষয়ে ভারতীয়দিগের মধ্যে অপকর্ষ লক্ষিত হয়। সুতরাং এই অভাব এবং তজ্জনিত অপকর্ষ, বাহ্যিক চাকচিক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দর্শন করিলে, যে যে বিষয়ে বাহ্য সম্পদ মাত্র সংসাধিত হয়, এতদ্রূপ পার্থিব বিষয়ে ও তৎসম্পর্কীয় শাস্ত্রাদিতে প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ ইতিহাস বা পুরাণাদি বিলোড়ন দ্বারা দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষীয়েরা আত্মদেশ-বহির্ভাগে কখন অনধিকার প্রবেশে উদ্যত হয়েন নাই এবং এতদ্বিষয়িণী দুরাকাঙ্ক্ষা বোধ হয় তাঁহাদের মনোমধ্যেও কখন স্থান পায় নাই। ইহাঁরা স্বদেশ আপনা আপনার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকে আপনাপন অধিকার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, সময়ে সময়ে ভারতের মধ্যে কোন কোন রাজা কখন কখন প্রবল ও দুরা-কাঙ্ক্ষান্বিত হইয়া পার্শ্বস্থ বিভিন্নাধিকার সকল আত্মবশে আনিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এতদ্রূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কেবল এইরূপ ঘটনা ঘটিলেই এবং দাসদিগকে কখন কখন দমন করিতে হইলেই সেই সময়ে যে কিছু অস্ত্র চালনা হইত।

নতুবা অধীশ্বর সকলে এক ধর্ম্ম ও এক-জাতিত্ব নিবন্ধন, স্বভাবের মাধুর্য্য বশে পরস্পর সুসম্মিলনে বসতিবাস করিতেন। বিশেষতঃ দেশ যেরূপ প্রাকৃতিক দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত—উত্তরে অভেদ্য হিমাদ্রি, পশ্চিমে পরিখারূপে শতশাখাময়ী সিন্ধু, পূর্ব্বে অগম্য বনভূমি এবং দক্ষিণে ঘোর তরঙ্গসঙ্কুল দুর্দ্দমনীয় সমুদ্র;—তাহাতে আবার সেই দূরতম কালে তৎকালীন অসভ্যতা এবং বর্ব্বরতা-জনিত পশুবৎ পার্শ্বস্থ জাতি সকল হইতেও স্বদেশের স্বাধীনতা লোপ বা কোন বিপৎ-উৎপাদনের সম্ভাবনা না থাকায় বহিঃ-শত্রুর প্রভাব এবং তন্নিমিত্ত অস্ত্র-ধারণের পাট একেবারে ছিল না। এই সকল কারণ-বশতঃ ভারতবর্ষীয়েরা কখন যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিলেন না এবং বোধ হয় এই কারণেই তাহাদের বীরকীর্ত্তি অন্যান্য পুরাতন প্রাচীন জাতির সমকক্ষতায় আসিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে দেশ মধ্যে জীবনের অত্যাবশ্যকীয় কোন দ্রব্যের জন্য বিদেশে যাইতে হইত না, দেশ মধ্যেই সে সমস্ত মিলিত। তদতিরিক্ত দ্রব্যের প্রয়োজন বিলাসবৃদ্ধি বা তথাবিধ কারণের দ্বারা অভাব বোধ ব্যতীত হইতে পারে না। কিন্তু এখানকার লোক সকল মিসর ব্যাবিলন প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদিগের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে বিলাসপ্রিয় এবং খেয়ালময়, সুতরাং কোন বৈদেশিক দ্রব্যের লালসায় বিদেশ গমনের তত আবশ্যকতা ছিল না। এই নিমিত্ত আমরা কদাচ শুনিতে পাই যে ভারতীয়েরা বিদেশ গমন পূর্ব্বক কোন স্থানে বিদেশ-বাণিজ্যে রত হইয়াছে। তবে যে প্রাচীন কালে বিদেশ-জাত কোন দ্রব্যের ভারতবর্ষে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা তৎ তৎ দেশের অধিবাসীদের ভারতে বাণিজ্যহেতু আগমন সুযোগে আনীত হইত, এবং অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশীল এবং সৌখিনদিগের দ্বারা ক্রীত ও ব্যবহৃত হইত। এই রূপে ইহাদের দর্শন স্বদেশ মধ্যে এতদূর আবদ্ধ হইয়াছিল যে স্বদেশই পুণ্যভূমি, আর সমস্ত অপবিত্র প্রেত বা রাক্ষস-নিবাস, তথায় পদক্ষেপ করিলেও পাপ অর্শে। বিদেশ গমনের দ্বারা প্রকৃতির নূতন নূতন মূর্ত্তি এবং বিভিন্ন-জাতীয় মানব-চরিত্র ও মানবীয় কীর্ত্তিকলাপ দর্শনে, তৎতৎ বিষয়ে, যে দূরদর্শন, চিত্তের প্রশস্ততা ও উদারতা, এবং আত্মোন্নতি-কারক ও লোক হিতকর যে জ্ঞান জন্মায়, ভারতীয়েরা বিদেশ পরাঙ্মুখতায় তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যদিও সমুদ্র যাত্রার বহুতর উল্লেখ পাওয়া যায়, সে সকল উল্লেখ যে বৈদেশিক বাণিজ্যের অনুশীলন বশতঃ অনুরূপ কার্য্যে নিয়ত পরিণত হওয়ার ফল তাহা বোধ হয় না। এক সময়ে ভারতে সমুদ্র যাত্রার বহুলতা হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা বৌদ্ধদিগের অধিকার সময়ে। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম যাহা লোকের মনে নূতন প্রকারের তেজ নি-

ক্ষিপ্ত হয়, এবং প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম প্রভাবে লোকের মন পারলৌকিক তত্ত্বে যে মোহাভিভূত হয়, ইহার প্রভাবে তাহার বহুলাংশে অপনীত হইয়া পার্থিব বিষয়ে সেই পরিমাণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই সময়ের রাজা অশোক, সমগ্র পরিজ্ঞাত ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। লোক সকল আত্মোৎকর্ষ অবধারণ ও তাহা রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল; এবং বিদেশ-বাণিজ্যের অভ্যুদয় হওয়ায় ও ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের বহুলতা বশতঃ স্থলপথ ও জল পথে বহু স্থানে যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে তৎকারণ বশতঃ শুধু সমুদ্র যাত্রা ও বিদেশ ভ্রমণ মাত্রই পর্য্যাপ্ত হয় নাই, ইহার ফল স্বরূপ ভূগোল এবং রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানেরও সমালোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে কৃষি বাণিজ্য উভয়বিধ উপায় দ্বারা বহু ধন সঞ্চয় হয় এবং শিল্প বিদ্যারও বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। প্রাচীন রাজনৈতিক সমাজে ভারতের যে কিছু গণনা, তাহা প্রধানতঃ এই সময়েরই প্রভাবে হইয়াছিল। লৌকিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ধরিলে, ভারতের এই সময়ের মূর্ত্তি অতি মনোহর, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, এ মূর্ত্তি বহুক্ষণস্থায়ী নহে, ভারতের পূর্ব্বাপর ধরিতে গেলে, এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবকাল পলকবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

যে সকল শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের আশু ফল পার্থিব সুখ ও স্বচ্ছলতা লাভ, এরূপ কোন শাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য খণ্ড ভাবে তাহাকে কখন২ কখন উদ্ভাবিত ও অপরাপর বিষয়ে নিয়োজিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদের পৃথক্ ভাবে শ্রেণী-নির্ব্বাচন, ধারাবাহিক রূপে সংযোজন ও তাহার উৎকর্ষ সাধন কোথাও দৃষ্ট হয় না। এরূপ শ্রেণীনিবদ্ধ ভাবে ভূবিদ্যা, ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, পাশবতত্ত্ব, ভূমণ্ডলের জল বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়ের তত্ত্ব, এবং তথাবিধ অপরাপর বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান প্রাচীন হিন্দুদিগের একরূপ ছিলই না বলিতে হইবে। তাঁহাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত এ সকল কিছুরই আবশ্যক হয় নাই। যে জাতির পার্থিব জীবনের অনিত্যতা ও তৎপ্রতি তুচ্ছতা শিক্ষা দিবার জন্য লোমশ মুনির উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে এ সকল শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন হয় নাই কেন, তাহা বলিবার আবশ্যক রাখে না। এই মুনির সর্ব্বাঙ্গ মেষবৎ লোমে আচ্ছন্ন ছিল, এবং ঐ লোম প্রতি ইন্দ্রপাতে এক একটি খসিত, এরূপে সমস্ত লোমচ্যুত হইলে তবে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তথাপি ঋষি এই অল্প কয়েক দিনের জন্য আপনার আশ্রম কুটীরের উপরিভাগস্থ আচ্ছাদন প্রদানের আবশ্যকতা নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহাঁদিগের ভূবিদ্যায়-লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পী প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্র এবং ত্রিকোণময়ী ভারতে সমগ্র পৃথিবীর সমাবেশ। ভূতত্ত্ব বিদ্যায় জ্ঞান—বাসুকীর

মস্তকে পৃথিবীর অবস্থিতি, এবং তাহার মাথা ঝাড়াতেই ভূকম্পন উপস্থিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ তত্ত্ব বিদ্যা—কোন্ গাছ ব্রাহ্মণ, কোন্ গাছ চণ্ডাল এবম্ভূত বিভাগ বোধ। পাশবতত্ত্ব বিদ্যা—আত্মার কর্ম্ম-সূত্রে বশে ইতর হইতে ইতরতর অবস্থা প্রাপ্ত্যর্থে চৌরাশি লক্ষ যোনির সৃষ্টি—ইত্যাদি ইত্যাদি। আর মানব জীবন-প্রবাহের উপর এতদূরই আস্থা যে তাহার পুরাবৃত্ত রক্ষণের আবশ্যকতা ইহাঁরা বিবেচনা করেন নাই। অন্যান্য অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিরাও কেবল স্মৃতির সাহায্যে মাত্র যে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ জীবিত রাখিত, হিন্দুদিগের নিকট প্রাচীন পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এতদ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে লৌকিক ব্যাপারে হিন্দুরা গণনার উপযুক্ত কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। জীবনযাত্রা যাহাতে আপাততঃ সুখে অতিবাহিত হয় তৎপক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন, এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে তাহা অতুলনীয় হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ জাতির স্বভাব হইতে যাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সেই নৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি হইয়াছিল। আজি পর্য্যন্ত তাহার মোহিনী শক্তি বহু বিপ্লবগতেও একেবারে অস্তিত্বশূন্য না হইয়া, দর্শকের চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতেছে। সুনীতি বিষয়ে এরূপ শ্রেষ্ঠ জাতি আর হইতে নাই। কাল-আবর্ত্তনে সে সকল সুনীতি যদিও বহুতর বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার জীবনী ও মাধুর্য্য শক্তি এখনও অপরিসীম। যে বল অন্যত্র দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করণার্থে ব্যয়িত হইত, সে বল এখানে অন্যের বিপদোদ্ধারে ব্যয়িত হইত। যে অর্থ অন্যের খেয়াল পরিপূরণার্থে ও বিলাস-বিস্তারার্থে নিয়োজিত হইত, এখানে তাহা দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ ও বিধবার চক্ষুজল মার্জ্জনের জন্য পর্য্যবসিত হইত। যে বুদ্ধি অন্যত্র দুরাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করণের এবং বিলাস বিস্তারণের উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইত, এখানে তাহা ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত হইত। ইহাঁদের জাতীয় জীবন নৈতিক, ইহা কেবল পৃথিবীর প্রথম অবস্থাতেই শোভা পাইয়াছিল। আবার যখন এই পৃথিবী দুরাকাঙ্ক্ষা, দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি পাপরাশি-বিনিবারিত হইয়া নৈতিক ও আর্য্য আকৃতি ধারণ করিবে, তখনই আবার ইহা শোভা পাইবে, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে নহে। লৌকিক বিষয়ে চিত্ত-নিয়োগকারী ও তদ্বিষয়ে উন্নতিশীল জাতির যখনই এমন জাতির পার্শ্বে উদ্ভব হইবে, তখনই ইহাদের লৌকিক গরিমা ও প্রভুত্ব নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যাইবে, হয়ত একেবারে লোপ পাইবে। ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। এই জন্যই গ্রীকদিগের সভ্যতা পরে উদিত হইলেও, লৌকিক দর্শনে বলিতে হইবে যে তাহা ভারতীয় সভ্যতার অপে-

ক্ষা অনেক বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এক্ষণে তদ্বিষয় প্রদর্শনার্থ, হিন্দুদিগের অভ্যুদয়-কালীন সভ্যতা অপেক্ষা, গ্রীক সভ্যতা কিরূপ প্রকৃতির বশে কি ভাবে উদিত হইয়া, লৌকিক দর্শনে কোন্ কোন্ বিষয়ে এই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার যথাযথ সমালোচন করা কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাণিনি।

আমি মনোযোগ সহকারে পৌষ মাসের আর্য্যদর্শনে বাবু রামদাস সেনের পাণিনি-সমালোচন পাঠ করিয়াছি। রামদাস বাবু স্বমতের সমর্থন জন্য যে যুক্তির অনুসরণ করিয়া স্বীয় প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে অতি সংক্ষেপে তদ্বিষয় সমালোচিত হইতেছে।

আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি আশ্চর্য্যাযদি শব্দের উদাহরণ দেখাইয়া পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্বসাময়িক বলা আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের অভিপ্রেত নয়। গোল্‌ডষ্টুকর আশ্চর্য্যাদি শব্দের অর্থতে বৈসাদৃশ্য দেখাইয়া পাণিনি ও কাত্যায়নের আবির্ভাব সময়ের পার্থক্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন মাত্র। গোল্‌ডষ্টুকর কেবল "নির্ব্বাণোঽবাতে" সূত্র অবলম্বন করিয়াই পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। এবিষয় মৎপ্রণীত পাণিনি পুস্তকে ও অগ্রহায়ণ মাসের আর্য্যদর্শনের পাণিনি বিষয়ক প্রবন্ধে বিশেষরূপে লিখিত আছে। উক্ত প্রবন্ধের যে স্থলে এবিষয়ের নির্দ্দেশ আছে, তাহা যথাবৎ উদ্ধৃত হইল:—

"কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিকূলবাদীর মত খণ্ডন করিতে হইলে সর্ব্বাদৌ তাঁহার প্রধান যুক্তির মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। বিচারের এই চিরন্তন পদ্ধতির বহিশ্চর হইয়া বিষয়ান্তরের তর্ক উপস্থিত করা উচিত নহে। গোল্‌ডষ্টুকর ৮।২।৫০ সংখ্যক 'নির্ব্বাণোঽবাতে" সূত্র অবলম্বন করিয়া যে ভাবে পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্বসাময়িক স্থির করিয়াছেন রামদাস বাবু তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, অথচ "আরণ্যক" প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের উল্লেখ করিয়া গোল্‌ডষ্টুকরের মত ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়াছেন।"

স্থলান্তরে:——

"গোল্‌ডষ্টুকরের মত খণ্ডন করিয়া পাণিনির সময় নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ "নির্ব্বাণোঽবাতে" সূত্রে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মূলোচ্ছেদ করা উচিত।"

গোল্‌ডষ্টুকরের মতানুসারে পাণিনির আবির্ভাব সময়ের সহিত "নির্ব্বাণোঽবাতে" সূত্রের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু

এদিকে রামদাস বাবু গোল্ডষ্টুকরের মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন "নির্ব্বাণোহবাতে এই সূত্রের সিদ্ধান্ত (পাণিনি বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী) আমার বিচার্য্য নহে।" নির্ব্বাণোহবাতে সূত্রের সিদ্ধান্ত যদি বিচার্য্য না হইল, তাহা হইলে গোল্ডষ্টুকরের মত খণ্ডিত হইল কিরূপে? রামদাস বাবুর বিচার এইরূপ সঙ্গতিবিরুদ্ধ প্রলাপে পরিপূর্ণ। একজনের যুক্তির বলাবল পরীক্ষা করিব না, অথচ অসঙ্কুচিতহৃদয়ে অবলীলাক্রমে তাঁহার সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ বলিব, এরূপ চাপল্য প্রদর্শন কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না।

রামদাস বাবু "চিত্রঙ আশ্চর্য্য" ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যাস্থলে বিলক্ষণ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার এই সমর্থন চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিফল হইয়াছে। তিনি কার্ত্তিক মাসের আর্য্যদর্শনে এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, পৌষ মাসের আর্য্যদর্শনে তাহার অপহ্নবে ক্রটী করেন নাই। কার্ত্তিক মাসের আর্য্যদর্শনে লিখিত আছে:—

"পণ্ডিতবর গোলডষ্টুকরের তর্কের অনুসরণ করিয়া রজনী বাবু পাণিনি পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠার টীকায় "আশ্চর্য্যমনিত্যে" পাণিনি সূত্র ও "আশ্চর্য্য অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্" এই বার্ত্তিক উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে পাণিনির সময় ও তাঁহার পূর্ব্বে অনিত্য শব্দ বিনশ্বরদ্যোতক ছিল; কিন্তু "আশ্চর্য্য" শব্দ তদ্বোধক ছিল না, বস্তুতঃ তাহা নহে— অনিত্য শব্দে বিনশ্বর অর্থ বুঝেন এই আশঙ্কায় বার্ত্তিককার স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, নচেৎ কাত্যায়নের সময়ে যে নূতন কোন অর্থ ছিল তাহা নহে। পাণিনির সময় যদি আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, চিত্র আদি শব্দ এক পর্য্যায়াক্রান্ত না থাকিত, তবে পাণিনি "আশ্চর্য্য" অর্থে চিত্র শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। তিনি "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে" এই একটী সূত্র করাতে আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হইতেছে।"

ইহার উত্তর স্থলে আমি পাণিনির সূত্র ও পতঞ্জলির ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়াছি, "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে" পাণিনির সূত্র নয়, উহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা মাত্র (১)। পৌষ মাসের আর্য্যদর্শনে রামদাস বাবু তাহার এই উত্তর দিয়াছেন:—

"৩৬৭ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে তিনি লিখিয়াছেন, আমি "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে" এই সমুদয় বাক্যকে সূত্র বলিয়াছি। এবং ইহা আমার লিখন-ভঙ্গীতে প্রতীত (হয়?) বটে, কিন্তু তাহা আমার মনোগত নহে, এবং তাহা আমি রজনী বাবুকে বিস্মিত বা দুঃখিত করিবার জন্য লিখি নাই। পাণিনি মুনি যখন চিত্র শব্দের অর্থ বিশেষ অবধারণ করেন নাই তখন লোকপ্রসিদ্ধ অর্থই যে তাহার অর্থ, তাহাতে

(১) ১২৮৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের আর্য্যদর্শন, ৩৬৮—৩৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

আর সন্দেহ নাই,. ইহা ভাষ্যকারের প্রতীক দিয়া বুঝাইয়াছি মাত্র * *।"

এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, রামদাস বাবু কার্ত্তিক মাসের আর্য্যদর্শনে "চিত্রঙ্‌ আশ্চর্য্যে" এই সমস্ত পদ্যটীকে পাণিনির সূত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় পাণিনি-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পৌষ মাসের আর্য্যদর্শনে উহা ভাষ্যের অন্তর্গত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কার্ত্তিকের সংখ্যায় স্পষ্ট লিখিত আছে, "তিনি চিত্রঙ আশ্চর্য্যে এই একটী সূত্র করাতে আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হইতেছে।" এ স্থলে "তিনি" পদ নিঃসন্দেহ পাণিনির বোধক। পাণিনিই বৈয়াকরণ সূত্রের প্রণেতা, পতঞ্জলি এই সূত্র সমূহের ভাষ্যকার মাত্র। বিশেষতঃ পাণিনির অব্যবহিত পরেই "তিনি" পদের উল্লেখ থাকাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, উক্ত পদ পাণিনি ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও দ্যোতক নহে।

রামদাস বাবু এইরূপে এক স্থলে "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে" পাণিনির সূত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার স্থলান্তরে (পৌষ মাসের আর্য্যদর্শনে) লিখিয়াছেন, "পাণিনি মুনি যখন চিত্র শব্দের অর্থ বিশেষ অবধারণ করেন নাই, তখন লোক-প্রসিদ্ধ অর্থই যে তাহার অর্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই, ইহা ভাষ্যকারের প্রতীক দিয়া বুঝাইয়াছি মাত্র" এস্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে রামদাস বাবুর মতানুসারে "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে" পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্য। অন্যথা, তিনি চিত্র শব্দের লোক-প্রসিদ্ধ অর্থ "ভাষ্যকারের প্রতীক দিয়া বুঝাইয়া দিতেন না। এইরূপ একটী বাক্যকেই ক্রমান্বয়ে সূত্র ও ভাষ্যের অন্তর্গত করা হইল। এরূপ অস্থিরতা কেন? রামদাস বাবু বৈয়াকরণিক নিয়ম সমূহের উল্লেখ করিয়া যতই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করুন না কেন, অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তির লক্ষণাদি দ্বারা তাঁহার প্রস্তাব যতই পুষ্টাবয়ব হউক না কেন, স্থিরতা প্রদর্শিত না হইলে কখনও তাঁহার মত সামাজিক বর্গের আদরণীয় হইবে না। বলিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, সত্যের ঈদৃশ অপলাপে রামদাস বাবুর প্রবন্ধ কলঙ্কিত হইয়াছে। পরন্তু রামদাস বাবু পৌষের আর্য্যদর্শনে লিখিয়াছেন, "তিনি লিখিয়াছেন, আমি "চিত্রঙ আশ্চর্য্যে" এই সমুদয় বাক্যকে সূত্র বলিয়াছি, এবং ইহা আমার লিখনভঙ্গীতেও প্রতীত বটে, কিন্তু তাহা আমার মনোগত নহে।" এস্থলে "লিখন ভঙ্গীতেও প্রতীত হয় বটে কিন্তু তাহা আমার মনোগত নহে" এ বাক্যের অর্থ কি? নিজের মনোগত ভাব বিশদ রূপে পাঠকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেওয়াই প্রকৃত সুলেখকের রীতি। যিনি এই রীতির অনুসরণ করিতে না পারেন, তাঁহার লেখনী ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যেস্থলে বিচার করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, সে স্থলে অস্পষ্টাদি দোষের আশ্রয়গ্রাহী হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। রামদাস

বাবু একজন সুলেখক হইয়াও যে বিশদ রূপে স্বীয় মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না, এরূপ বিশ্বাস হয় না। বস্তুতঃ রামদাস বাবু এস্থলে নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্ভতা প্রদর্শন ও কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন। এরূপ চেষ্টা কত দূর প্রশংসনীয়, সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন।

যাহা হউক, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, পাণিনি চিত্র শব্দের কোন অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই; সূত্রান্তরে তিনি আশ্চর্য্য শব্দ অনিত্যার্থবোধক বলিয়াছেন মাত্র। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, পাণিনীয় সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে চিত্র, আশ্চর্য্যাদি এক পর্য্যায়াক্রান্ত শব্দ সমূহ অনিত্যের দ্যোতক ছিল। গত অগ্রহায়ণ মাসের আর্য্যদর্শনের পাণিনি-শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা বিশদ রূপে লিখিত হইয়াছে।

রামদাস বাবুর মতানুসারে বৃহৎ-কথা গল্পাংশে আরব্যোপন্যাসের সমশ্রেণীক। কিন্তু "উহার দেশ কাল পাত্র মিথ্যা না হইলেও হইতে পারে।" এ মত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। বৃহৎ কথার দেশ, কাল, পাত্র যদি প্রকৃত ইতিহাসের সম্মান-স্পর্দ্ধী হয়, তাহা হইলে তিনি স্বপ্রণীত ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথম ভাগে বৃহৎ কথার প্রমাণানুসারে কাত্যায়নকে পাণিনির সমকালবর্ত্তী বলিলেন না কেন? কাত্যায়ন যেমন বৃহৎ-কথানুসারে পাণিনির সমসাময়িক, পাণিনি ও সেই রূপ বৃহৎ কথানুসারে নন্দের সমসাময়িক। বৃহৎ কথায় এই তিন জনই এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীর কি অপূর্ব্ব গবেষণা! তিনি কাত্যায়নের বেলায় বৃহৎ কথাকে আরব্যোপন্যাসের সমশ্রেণীক বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন, অথচ পাণিনির বেলায় দেশ, কাল, পাত্র, সত্য বলিয়া তাহার প্রতি আস্থা দেখাইতে ত্রুটী করিলেন না, কোন্ প্রমাণ অনুসারে এই অসার মতের সমর্থন হইতে পারে? পাণিনির ন্যায় কাত্যায়নও দেশ, কাল, পাত্রানুসারে বৃহৎ-কথার সহিত সম্বদ্ধ, সুতরাং বৃহৎ-কথার দেশ, কাল, পাত্র সত্য বলিয়া ধরিলে পাণিনি ও কাত্যায়ন উভয়কেই এক সময়ে নিবেশিত করিতে হয়। কিন্তু রামদাস বাবু স্পষ্টাক্ষরে পাণিনি ও কাত্যায়নকে ভিন্ন সময়ের লোক বলিয়াছেন। এরূপ বিভিন্ন মত উপন্যস্ত করা ধীরতা ও শাস্ত্রদর্শিতার লক্ষণ নহে। অলীক উপন্যাসের দেশ কালাদিও অনেক স্থলে অলীকতায় পূর্ণ হইয়া থাকে; সুতরাং তৎসমুদয় অবলম্বন করিয়া সত্য নির্ণয় করা কোনও মতে যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্য ও অথর্ব্ব বেদাদির সম্বন্ধে রামদাস বাবু যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সদ্যুক্তির অনুমোদিত নহে। মৎপ্রণীত পাণিনি পুস্তকে এবিষয় বিশেষ রূপে লিখিত আছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া প্রস্তাবটী পল্লবিত করা বিধেয় নহে। যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি" স্থলে "যাজ্ঞবল্কানি"-পদ যে

রূপে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা আমি পাণিনি পুস্তকের ৪৭—৬৫ পৃষ্ঠায় বিশদ রূপে লিখিয়াছি। সহৃদয় পাঠক বর্গ উক্ত অংশ পাঠ করিয়া রামদাসবাবুর মতের সমালোচন করিলেই দেখিতে পাইবেন, রামদাস বাবু কিরূপ বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া অমর্ষ ও প্রগল্‌ভতার পরিচয় দিয়াছেন।

রামদাস বাবুর মতানুসারে যাজ্ঞবল্ক্য পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। অগ্রহায়ণের আর্য্যদর্শনের পাণিনি-শীর্ষক প্রবন্ধে মুদ্রা-প্রমাদ বশতঃ "পরসাময়িক" স্থলে "পূর্ব্বসাময়িক" হইয়াছে (১)। উক্ত আর্য্যদর্শনের ৩৭৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের পঞ্চম পঙ্‌ক্তি পাঠ করিলে এই ভ্রম নিরাকৃত হইবে।

ভাষাগত দোষ গুণ লইয়া অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছেনা। বহুক্ষণ ব্যাকরণের আরাধনা করিলে "মান্য" পদটী সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ভাববাচ্য-নিষ্পন্ন "মান্য" পদের প্রয়োগ কোথাও লক্ষিত হয়না। "মান্য" পদ সাধারণতঃ কর্ম্ম বাচ্যেই প্রয়োজিত হইয়া থাকে। রামদাস বাবু কূট তর্কের অনুসরণ পূর্ব্বক "পুস্তকের মান্য করিতে হইলে" বাক্য বিশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি একবার লিখিয়াছেন "পুস্তকের মান্য করা" এইরূপ প্রয়োগ সাধু না হইবে কেন?" ইহার পরক্ষণেই আবার লিখিয়াছেন "পুস্তকের মান্য করা" এইরূপ লেখা বিশুদ্ধ না হইলেও "পুস্তকের মান্য করিতে হইলে" যখন আছে তখন তাহা বিশুদ্ধই হইয়াছে"। এটী রামদাসবাবুর অস্থিরতার অন্যতম দৃষ্টান্ত তিনি যে বাক্য ("পুস্তকের মান্য করা") একবার সাধু ও রীতি-বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেন পরক্ষণেই তাহা আবার অবিশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। প্রত্নতত্ত্ব-বিচারকের এরূপ চপলতা কখনও মার্জ্জনীয় নহে। সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে দুঃখ সহকারে বলিতে হইতেছে যে, রামদাস বাবুর বিচারের অনেক স্থলেই এইরূপ অধীরতা ও হঠকারিতা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

রামদাসবাবু আমার লিখিত "এইরূপ যুক্তি ও বিচারের সংঘাতে সর্ব্ব প্রকার সংশয় জাল বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিণামে সিদ্ধান্ত-ক্ষেত্র পরিষ্কৃত ও অনায়াস-গম্য হইতে পারে" এই বাক্যে যেরূপ বৈয়াকরণ জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "সংশয়-জাল বিচ্ছিন্ন হইয়া" এস্থলে "হইয়া" এই আনন্তর্য্য-বোধক ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সম্বন্ধ "সংশয় জাল বিচ্ছিন্ন" এই পদের সহিত হইতেছে, সুতরাং আনন্তর্য্য-বোধক অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তার সহিত "হইতে পারে। ইত্যাদি সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তার সহিত ঐক্য না থাকাতে নিয়ম ভঙ্গ ও সঙ্কোচ হইয়াছে।" রামদাস বাবু এস্থলেও স্বীয় হঠকারিতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত

(১) আর্য্যদর্শন। অগ্রহায়ণ ১২৮৩। ৩৭৩ পৃষ্ঠা। প্রথম স্তম্ভ — ২য় পঙ্‌ক্তি।

হয়েন নাই। "সংশয়জালবিচ্ছিন্ন" কথনও কর্ত্তৃপদ হইতে পারে না। এস্থলে "বিচ্ছিন্ন হইয়া" একবারে অসমাপিকা ক্রিয়া; "সংশয়জাল" উহার কর্ম্ম। "বিচ্ছিন্ন হইয়া" পদের ন্যায় "গম্য হইতে পারে" একবারে সমাপিকা ক্রিয়া। "সিদ্ধান্ত ক্ষেত্র" এই পদের সহিত উহার কর্ম্মত্ব সম্বন্ধ হইতেছে। এই অসমাপিকা (বিচ্ছিন্ন হইয়া) ও সমাপিকা (গম্য হইতে পারে) উভয় ক্রিয়ারই এক উহ্য কর্ত্তার সহিত অন্বয় হইয়াছে। অর্থাৎ অন্বয় স্থলে, পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক (উহ্য কর্ত্তা) বিচ্ছিন্ন হইয়া, পণ্ডিত গণকর্ত্তৃক গম্য হইতে পারে এই এ কর্ত্তৃত্ব স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং এ স্থলে উক্ত নিয়ম অন্যথাভূত হইল কি রূপে? "বিচ্ছিন্ন হওয়া" "গম্য হওয়া" উভয়ই কর্ম্মবাচ্যের পদ। বাঙ্গালা ভাষায় ছেদন করিয়া, গমন করিয়া, একবারে ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, রামদাস বাবু এস্থলে কিরূপ অসাধারণ ব্যাকরণ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

আমি মুদ্রাকরের দোষ প্রদর্শনার্থই রামদাস বাবুর প্রবন্ধোক্ত "চিত্রঙঃ" পদের অশুদ্ধির উল্লেখ করিয়াছি। রামদাস বাবু যে এরূপ একটী সামান্য বিষয় অবগত নহেন, এ বিশ্বাস কখনও আমার মনে স্থান পায় নাই। যখন বৈয়াকরণ সূত্র ও ব্যাখ্যা লইয়া বিচার হইতেছে, তখন তৎসমুদয়ের যথাযথ উল্লেখ না থাকিলে পাঠকগণ সন্দিহান হইতে পারেন এই আশঙ্কায় আমাকে বাধ্য হইয়া "চিত্রঙঃ" পদের বিভক্তিগত বিষয় উল্লেখ করিতে হইয়াছে। এজন্য আমি অমর্ষ প্রকাশ করিয়া রামদাস বাবুকে আক্রমণ করি নাই। রামদাস বাবু এবিষয়ে আমাকে আক্রমণকারী বলিয়া মনে করাতে আমি দুঃখিত হইয়াছি।

উপসংহার সময়ে পুনর্ব্বার আমার বক্তব্য এই, গোল্ডষ্টুকর আশ্চর্য্য, অনিত্য ও যাজ্ঞবল্ক্যাদির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পাণিনি ও কাত্যায়ন যে সমকালবর্ত্তী নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রামদাস বাবুও গোলড্‌ষ্টুকরের মতানুসারী হইয়া পাণিনি ও কাত্যায়নকে বিভিন্ন সাময়িক বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। সুতরাং এবিষয়ে যখন মতবৈষম্য লক্ষিত হইতেছে না, তখন আশ্চর্য্যাদি শব্দ লইয়া বিচার করা বিড়ম্বনা মাত্র। যখন চরম সিদ্ধান্ত এক হইতেছে, তখন তাহার কারণ লইয়া বাগাড়ম্বর করিবার সার্থকতা কি? গোল্‌ডষ্টুকর "নির্ব্বাণোঽবাতে" এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই পাণিনিকে বুদ্ধের পূর্ব্বসাময়িক বলিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, রামদাস বাবু বিচার্য্য বিষয় নয় বলিয়া এই সূত্রের সিদ্ধান্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। যাবৎ "নির্ব্বাণোঽবাতে" সূত্রের সিদ্ধান্ত নিরাকৃত না হইতেছে, তাবৎ পাণিনি যে বুদ্ধের পরবর্ত্তী তাহার সমর্থন হইতেছে না। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা হিন্দু হষ্টেলে প্রকাশিত। বিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।।০ আট আনা।

আমরা সম্বন্ধ-নির্ণয়ের প্রথমভাগ সমালোচন উপলক্ষে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যে দুই চারি জন ভারতের পুরাবৃত্ত ও ইতিহাসের গবেষণায় নিমগ্ন আছেন রজনী বাবু তাঁহাদিগের অন্যতম। রজনী বাবু তদীয় জয়দেব-চরিত ও পানিনি দ্বারা পূর্ব্বেই সাহিত্য-জগতে সবিশেষ পরিচিত হইয়াছেন; সুতরাং এস্থলে আমাদিগকে তাঁহার বিষয়ে অধিক পরিচয় দিতে হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায় আর্য্যদর্শনে প্রথমে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার শীঘ্র গ্রন্থ-সমাপ্তির মানসে ইহাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে প্রতিমাসে এক খণ্ড করিয়া বাহির করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে আর্য্যদর্শনের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণের অধিকতর উপকার হইবে আশায়, আমরা সে ক্ষতিতেও বিশেষ দুঃখিত হইলাম না।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস যদি সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে, ইহা বঙ্গসাহিত্য-মুকুটের একখানি অত্যুজ্জ্বল মণি বলিয়া পরিগৃহীত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ আমরা শুদ্ধ প্রথমভাগের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার ভাষা অতি গম্ভীর ও হৃদয়-উত্তেজক ইহার ভাব আদ্যন্ত স্বদেশ-হিতৈষণাপূর্ণ। ইহার বিষয় অধিকতর গম্ভীর, ও হৃদয়-উত্তেজক। ইহা পাঠ করিলে স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় গভীর ভাবস্রোতে আপ্লুত হয়—না হইয়া থাকিতে পারে না। অতীত গৌরব ও ভবিষ্যতে আশা ভারতবাসীমাত্রেরই নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নিকে সন্ধুক্ষিত করে।

এই খণ্ডে ভাবী প্রকাণ্ড অন্তর্বিপ্লবের ব্যবহিত কারণ-পরম্পরা সমালোচিত হইয়াছে। ভারত বর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ডালহাউসীর সর্ব্বসংহারিণী রাজনীতিই যে সেই বিপ্লবের ব্যবহিত কারণ তাহা ইহাতে একপ্রকার প্রমাণীকৃত হইয়াছে। মুলতানেশ্বর মুলরাজের অকারণ নির্য্যাতন, রণজিৎ-মহিষী লোকললামভূতা মহারাণী ঝিন্দনের নিষ্ঠুর নির্ব্বাসন, নিরীহ ছত্রসিংহের নিষ্কারণ অবমাননা, অভিভাবকতাবস্থায় বিনা দোষে রণজিৎ-তনয় দলিপের রাজ্যাপহরণ, প্রভুশক্তিচ্ছলে সেতারা ঝান্সী প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য সকলের আত্মসাৎকরণ—প্রভৃতি অসংখ্য পাপ যে সেই প্রকাণ্ড বিপ্লবের দূরবর্ত্তী কারণ তাহা ইহাতে বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ বিষয়টি অতি গুরুতর ও প্রকাণ্ড এবং গ্রন্থও আরব্ধ মাত্র। সুতরাং এবার আমরা এতৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে ইহার স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত সমালোচনা করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা রহিল।

ভৈষজ্য রত্নাবলী। আয়ুর্ব্বেদীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থ। শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। আমরা মনে করিয়াছিলাম, এই পুস্তক দুই খণ্ডের সবিস্তর সমালোচন করিব; নানা কারণে এত দিন তাহা

ঘটিয়া উঠে নাই। এজন্য প্রকাশক মহাশয়ের নিকট লজ্জিত আছি। এরূপ ভরসা করি, সুবিধা অনুসারে ভৈষজ্য রত্নাবলী লক্ষ্য করিয়া একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব আর্য্যদর্শনে প্রকাশ করিতে যত্নপর হইব। যাহা হউক, স্বতন্ত্র প্রস্তাবের অপেক্ষায় না থাকিয়া, আপাততঃ আমরা ইহাই বলিতেছি যে, বিনোদলাল বাবুর উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি ভৈষজ্য রত্নাবলী প্রচার করিয়া নষ্ট-প্রায় আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ উদ্ধার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। অনুবাদটী বিশদ হইয়াছে।

গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা— শকাব্দা ১৭৯৯, ইং ১৮৭৭। ৭৮ সাল, ১২৮৪ সাল। বালি নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক গণিত। শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। আমরা এই পঞ্জিকা খানি দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। আমাদিগের দেশে এত স্বল্প মূল্যে এত উৎকৃষ্ট পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতে পারে বলিয়া আমাদিগের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল না। ছবি গুলি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে ইহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুপরিপাটী হইয়াছে। আশা করি দুর্গাচরণ বাবু অচিরাৎ তাঁহার পরিশ্রম ও ব্যয়ের সমুচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

কুসুম—সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মিত্র দ্বারা সম্পাদিত। বহরমপুর ধন সিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য বার্ষিক ১।/০। যখন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র সকল অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, তখন কুসুমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা কি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদিগের ভয় পাছে কুসুম মুকুলেই বিনষ্ট হয়।

My Leisure Hours কবিতা-গ্রন্থ। শম্ভুচন্দ্র দে বি, এল্ প্রণীত। জি পি রায় প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷/০ আনা মাত্র। কবিতাগুলি মন্দ নহে। কিন্তু শম্ভু বাবুর এ পণ্ডশ্রম কেন? কবিতা লিখিবার যদি নিতান্তই ইচ্ছা ছিল, মাতৃভাষায় লিখিলেই পারিতেন। তাঁহার কবিতাগ্রন্থ অনন্ত ইংরাজী সাহিত্যসাগরে নগণ্য জলবুদ্বুদ মাত্র। কিন্তু বঙ্গভাষায় এখানি একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইতে পারিত।

বন-কুসুম—পদ্যগ্রন্থ। কলিকাতা ৯৩ ন কালেজ ষ্ট্রীট, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ৮০ আনা মাত্র। ইহাতে লক্ষ্মী পূজা, পাপিয়া, প্রণয় পরীক্ষা প্রভৃতি ৬টী কবিতা লিখিত আছে। আমরা প্রায় সকল গুলিই একবার করিয়া পাঠ করিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কোনটীতেই আমাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত বা উত্তোলিত হইল না। স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির অনতি-পরিস্ফুট উদ্ভাস দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সমগ্র ধরিতে গেলে বলিতে হইবে যে গ্রন্থকারের উদ্যম বিফল হইয়াছে। চাটরটন্, ক্যাম্বেল্ প্রভৃতি কবিগণ বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে অতি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া সকলেরই আপনাদিগকে ক্যাম্বেল্ বা চাটরটন্ মনে করা উচিত নহে। একথা গ্রন্থকার বুঝেন; বুঝিয়াও যখন উদ্যম নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তখন আমাদিগের অধিক বলা বৃথা। তথাপি আমরা গ্রন্থকারকে একটী উপদেশ দিই। ভারত কবিত্ব-রত্নাকর। এখানে প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি অধিবাসী মাত্রেরই হৃদয়কে আশৈশব কবিত্বপ্রবণ করিয়া তুলে। এইজন্য ভারতে প্রায়

সকলেই কবি। ভাবিতে শিখিলেই কবি, লিখিতে শিখিলেই কবি। যে দেশে যে দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, সে দেশে সে দ্রব্যের কিঞ্চিৎ অনাদর। যাহা দুর্লভ নয়, তাহাতে লোকের চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং ভারতে কবিতা দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট করিতে হইলে, কবিত্ব শক্তির চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করা চাই। যে ভারতে কালিদাস, ভবভূতির জন্ম, যে ভারত হইতে শকুন্তলা, উত্তররামচরিত প্রভৃতির উদ্ভব; সে ভারতে যে, যে সে কবি যেমন তেমন কবিতা লিখিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিবেন, তাহার কোন আশা নাই। কত শত সহস্র কবি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি কয়জন ব্যতীত, আর সকলেই প্রায় কালের অনন্ত প্রবাহে বিলীন হইয়াছেন। সেই শতসহস্র কবি নৃত্যের পুত্তলিকার ন্যায় একবার জন-সমক্ষে আসিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া কৃত্রিম হাসি হাসিয়া কালের কঙ্কাল যবনিকার অভ্যন্তরে অন্তর্ধান করিয়াছেন। কে আর এক্ষণে তাঁহাদিগের সংবাদ লয়? কে আর এক্ষণে সেই ভীষণ যবনিকা উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করে? ক্রমে তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্তও অগাধ বিস্মৃতিসাগরে ডুবিতে চলিল। আমাদিগের নবীন কবিগণ যদি এদশার প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাঁহারা সহস্র কবিতাগ্রন্থ প্রসব করুন আমাদিগের কোন আপত্তি নাই। আর যদি নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল চান, আর স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কালিদাসের ন্যায় ঘোরতর তপস্যায় নিমগ্ন হউন। বহুদিনের তপস্যায় যখন সরস্বতী প্রীত হইয়া বর প্রদান করিবেন, তখনই যেন পবিত্র লেখনী ধারণ করেন। তাঁহাদিগের যেন মনে থাকে যে সামান্য আরাধনায়, সরস্বতী প্রীত হইবার নহেন। এই উক্তি যে শুদ্ধ এই গ্রন্থ ও ইহারই প্রণেতার প্রতি প্রযুক্ত হইল এরূপ নহে, নিম্নলিখিত সমস্ত কাব্যও কবিই ইহার বিষয়ীভূত।

কুসুম-কাননে কণ্টক-তরু। কলিকাতা ১১ নং পটুয়াটোলা লেন, নূতন ভারতযন্ত্র। শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

ভারত-ঈশ্বরী—উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা করপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

বঙ্গাঙ্গনা কাব্য, প্রথম খণ্ড। শ্রীরজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বরিশাল সত্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কবিতা-কুসুম— শ্রীরামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ঢাকা সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

কুসুমকলিকা—শ্রী প্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

মণিহারাফণী ভারত-জননী—পদ্য। শ্রীপার্ব[illegible] নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মুর্শিদাবাদ। বহরমপুর সত্য রত্ন যন্ত্রে শ্রীনবীন চন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

দুখসঙ্গিনী।*

প্রণয়ের গীত চিরকালই মধুর লাগে। যৌবনে মধুর লাগে এই জন্য, যে তখন হৃদয় প্রণয়ে পরিপূর্ণ থাকে। যৌবন অতীত হইলে প্রৌঢ়াবস্থায় যদিও মন সমস্ত যৌবন-লীলায় বিসর্জ্জন দেয়, যদিও মনে মনে আমরা প্রণয়ের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করি, কিন্তু হৃদয় তাহাতে সায় দেয় না। প্রণয়ের কথা উঠিলেই হৃদয় সেই দিকে অনিবার্য্য আকৃষ্ট হয়। জীবন যখন বার্দ্ধক্যের মরুভূমিতে উপনীত হয়, তখন প্রণয়কথা দ্বিগুণতর মধুর লাগে। তখন স্মৃতি তরুণকালের ছবিং দৃশ্যে আপন কনকমন্দির যে রূপে শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বৃদ্ধের কল্পনাচক্ষে উদিত করিয়া দেন। বৃদ্ধ আবার যৌবন-রাগে উৎসাহিত হইয়া উঠেন। তাঁহার শিরায় বলসঞ্চার হয়, তাঁহার বদন হর্ষ-বিস্ফারিত হয়, তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হন। বাস্তবিক প্রণয়ে যে আনন্দ, যে উৎসাহ, যে উল্লাস, যে উন্মত্ততা আছে, জীবনে আর কিছুতেই তাহা পাওয়া যায় না। জীবন যখন প্রণয়-পূর্ণ হয় তখন জীবনের বসন্তকাল উদয় হয়। তখন মানব যেন এক নবজীবন প্রাপ্ত হন। এই বসন্তকালের মধুরতা তাঁহার চির-জীবনে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। তাঁহার জীবনের মধ্যে এই কয়েকদিনই সুখের কাল। যে কয়েক দিন প্রণয়ের উন্মত্ততা থাকে সেই কয়েক দিনই সুখে অতি-বাহিত হয়। আর কিছুতে জীবনে তত-দূর উন্মত্ততা ও উল্লাস উৎপাদিত করিতে পারে না। সুতরাং আর কিছুতেই হৃদয় ও মন ততদূর একাগ্র হয় না; তখন জীবনে কেবল প্রণয়-স্বপন প্রণয়-চিন্তা এবং প্রণয়-ভাবনা। পৃথিবীর দুঃখময়ী ভাবনা চিন্তা সমুদয় তিরোহিত হয়। এক প্রণয়-রাগে সকল শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। পৃথিবীতে স্বর্গসুখ উপলব্ধি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এ সুখ অধিক কাল স্থায়ী হয় না। এ উন্মত্ততা ক্ষণকাল পরেই তিরোহিত হয়। এই দেখুন কবিবর সেক্সপিয়ার কি বলেন :—

> "——And fancy (love) dies
> In the cradle where it lies."

প্রণয়ের উন্মত্ততা ক্ষণকাল-স্থায়ী বটে, কিন্তু ইহা জীবন ময় পরিব্যাপ্ত হয়। সমস্ত ভবিষ্য জীবনে মধুরতা সঞ্চারিত করে। যখনই প্রণয়ের কথা মনে পড়ে, আবার জীবনের বসন্ত-সুখ সকলই মনে হয়। আবার জীবনকে মধুময় জ্ঞান হইতে থাকে। এই জন্যই প্রণয়-গীত চির কালই মধুর লাগে।

* গীতিকাব্য। কলিকাতা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮২ সাল।

আমাদিগের সমালোচ্য গ্রন্থ খানির অধিকাংশই এই প্রণয়-গীতে পরিপূর্ণ। সুতরাং ইহার অধিকাংশই আমাদিগের মধুর লাগিয়াছে। আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি প্রণয়-গীতে আমাদিগের দেশ উৎসন্ন গিয়াছে; এজন্য আমরা শতবার বলি আর প্রণয়-গীতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখনই প্রণয়-গীত পড়ি অমনি আবার হৃদয় নাচিয়া উঠে। আমাদিগের কবিগণও এই গীত যেমন হৃদয়ের সহিত গাহিতে জানেন, আজিও অন্যবিধ গীত সেরূপ গাহিতে পারেন না। এই গীত তাঁহাদিগের হৃদয়ের বীণা হইতে উত্থিত হয়, সুতরাং ইহা সুধারবে বাজিয়া উঠে।

প্রেস্কট্ যদি বাঙ্গালা জানিতেন তাহা হইলে কখনই বলিতেননা, যে ইতালীয় ভিন্ন আর কোন জাতির কবিতায় প্রণয় এত বিচিত্র রূপে চিত্রিত হয় নাই এবং আর কোন জাতির প্রেমগর্ভ গীতাবলি তত প্রচুর নহে †। বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় প্রেমের এত সুন্দর সুন্দর সহস্রবিধ ভাব সুবর্ণিত হইয়াছে যে আমার অনুমান হয়, ইতালীয় ভাষাতেও ততদূর হয় নাই।

প্রণয়ীর এমন ভাব নাই, এমন অবস্থা নাই, যাহা বাঙ্গালা ভাষায় চিত্রিত হয় নাই। আমাদিগের বিদ্যাপতি হইতে, কবিওয়ালার গীতাবলি পর্য্যন্ত বিলোড়ন করিয়া দেখ, প্রণয়ের সমস্ত ভাব ও অবস্থার চিত্র তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবু ও এই প্রণয় গীত আজিও সমুদায় সমাপ্ত হয় নাই। ইহার অন্যবিধ নব নব ভাব ভবিষ্য বাঙ্গালা কবির গাম্ভীর্য্য হইবে। ইতালি যখন অধঃপাতে গিয়াছিল, যখন প্রণয়ে নিমগ্ন হইয়াছিল, তখনও তাহা বাঙ্গালার ন্যায় হয় নাই। বঙ্গদেশ অধঃপাতে গিয়া কেবল প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া আছে। আজিও এ উন্মত্ততার পরিশেষ হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গালি কবি আজিও প্রণয়ের নূতন নূতন ভাব বিকশিত করিবেন। আমাদিগের দুখসঙ্গিনী প্রণেতা এই প্রণয়ের এক নূতন ভাব নূতন সুরে গাহিয়াছেন।

পেট্রার্ক, সুন্দরী লরার প্রেমে হতাশ হইয়া যে খেদ গান গাহিয়াছিলেন, একদা সমস্ত ইতালী তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। পেট্রার্কের খ্যাতি এবং সুমধুর কবিতা দেখিয়া লোরেন্সো ডি মেডিসি, ট্যাসো প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হন কিন্তু কেহই পেট্রার্কের মত কবিতা লিখিতে পারেন নাই। পেট্রার্ক বহুযত্নে অনেক আশা করিয়া যে ল্যাটীন কবিতা কলাপ রচনা করিয়াছিলেন, আজি চারি শত বৎসর হইল, তাহা বোধ হয় চারি জন লোক পড়িয়াছে কি না সন্দেহ; কিন্তু যে প্রণয় গীত লোকে প্রার্থনা করিলেই একদণ্ড বসিয়া রচিয়া দিতেন, সেই অনায়াস-প্রসূত দাতব্য গীত গুলি

† See Pescott's Essay on the Poetry and Romance of the Italians.

সকলের কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়াছে। পেট্রার্ক একদিনও ভাবেন নাই, তাঁহার লরার প্রণয়গীত, তাঁহার লরার জন্য খেদোক্তি শুনিয়া পৃথিবী মোহিত হইবে। কিন্তু সেই হৃদয়ের বেদনা, সেই আন্তরিক খেদগান শুনিয়া লোক বিমোহিত হইল। লোকে পেট্রার্কের সহিত লরার জন্য কাঁদিল। লোকে পেট্রার্কের চক্ষে লরার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইল। ইতালী পেট্রার্কের খেদগানে পরিপূর্ণ হইল। কারণ, সেই গীত হৃদয়ের বীণা হইতে উত্থিত হইয়াছিল; সুতরাং লোকের হৃদয়ে তাহা প্রতিধ্বনিত হইল। যাঁহারা পেট্রার্কের অনুকরণ করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদিগের গীত হৃদয়তন্ত্র হইতে উত্থিত হয় নাই; তজ্জন্য হৃদয়ের লয়ের সহিত তাহা প্রতিধ্বনিত হয় নাই।

পেট্রার্ক লরার প্রেমে হতাশ হইয়া সেই প্রণয়িনীর উদ্দেশে দেশে দেশে ক্রন্দন করিয়াছেন। তাঁহার মন লরার জন্য একান্ত লালায়িত হইয়াছিল। লরা কখনই তাঁহার হন নাই বটে, তথাপি তিনি কখন লরাকে ভুলেন নাই। তাঁহার সেই যৌবন-কালের প্রণয়পাত্রী চিরকাল কল্পনায় এক স্বর্ণ-প্রতিমা রচিত করিয়া রাখিয়াছিল। পেট্রার্ক চিরদিন সেই প্রতিমার নিকট আপন হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই হৃদয় যে অনুরাগপূর্ণ শোচনীয় সুরে গান গাহিয়াছিল তাহাই পেট্রার্কের প্রণয়গীত, এবং সেই গীতেরই সুরে আমাদিগের দুখসঙ্গিনী গান গাহিয়াছেন।

দুখসঙ্গিনী গ্রন্থকারের নিশ্চয় একজন লরা আছে, এবং সে লরা নিশ্চয় পরকীয়া ভদ্র-কুলবধূ। সে সুন্দরী আমাদিগের কবির জন্য নহে; কিন্তু কবি তাঁহার প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ। সুন্দরী পতিদুঃখে কাতরা, সেই দুঃখে কবি আবার দ্বিগুণতর দুঃখিত। এ প্রকৃত ভালবাসারই চিহ্ন।

পেট্রার্ক লরাকে লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া যে গান গাহিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহাতে ইতালীয়গণ তৎসঙ্গে সমদুঃখী হইয়াছিল। আমাদিগেরও কবি যে দুঃখস্বরে গান ধরিয়াছেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি দুখসঙ্গিনীর পাঠক মাত্রেই তাহাতে দুঃখিত হইবেন। তাহার কারণ এই, কবি আত্ম-কথা বর্ণনা করিলে লোকে অধিকতর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে এবং তাহাদিগের হৃদয় অধিকতর আকৃষ্ট হয়। আমরা ও মেকলের সহিত আশ্চর্য্য হইয়াছি * লোকে কবির আত্মকথা পড়িতে এত অনুরাগী কেন? কথাবার্ত্তায় যে আত্মকথা (Egotism) এত বিরক্তিকর হয়, লেখাতে তাহার মোহিনী শক্তি কোথা হইতে আইসে? প্রেমিক দম্পতিরা কেবল পরস্পরের প্রণয়-জ্ঞাপক কথায় সন্তুষ্ট হয়; নহিলে আত্মকথা আত্ম-প্রশংসা ও আত্মশ্লাঘা

* See Macaulay's essays on Petrarch contributed to the Quarterly Magazine April 1824.

কাহারই মুখে মিষ্ট লাগে না। যিনি যেরূপ গুরুজন হউন না কেন, আমার সহস্র উপকার করুন না কেন, আমার পরম আত্মীয় হউন না কেন, রূপে কন্দর্প ও গুণে বৃহস্পতি হউন না কেন, তথাপি আমি কাহারও মুখে আত্মকথা ও দম্ভ শুনিলে অমনি মুখ ফিরাইব। পূর্ব্বকৃতউপকার, ভয়, সম্মান, কিছুতেই আত্মকথার দোষ ও রূঢ়তা অপনয়ন করিতে পারে না। যিনিই আপনার কথা পাঁচ কাহন করেন, তাঁহারই কথায় লোকে চটিয়া উঠে। কিন্তু কথাবার্ত্তায় এত বিরক্তিকর হইলেও লেখাতে ইহার চমৎকার মোহিনী শক্তি আছে। রুসো (Rousseau) ইহার আশ্চর্য্য শক্তি বিলক্ষণ প্রকাশ করেন। লর্ড বাইরণ তদ্রূপ আত্মকথায় তাঁহার কাব্য সমুদায় পরিপূর্ণ করিয়া জগতের মনোহরণ করিয়াছেন। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের প্রচ্ছন্ন আত্মকথায় সহস্র জন তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছে এবং তাঁহার স্তুতিবাদে ও উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। মিল্‌টন যেখানে আত্ম-বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, লোকে তাঁহার কাব্যের সেই স্থল কত অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। কৃত্তিবাস ও কাশী-দাস যেখানে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, সে স্থল লোকের মন কতদূর আকৃষ্ট করিয়াছে। লোকে হোমরের কাব্য পড়িতে ডিমোডোকস্‌কে (Demodocus) হোমর বলিয়া অনুমান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কেহ কেহ বলেন, ইউলিসিস যে ফিমিয়সের (Phemius) জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই হোমরের নামান্তরে কাব্য মধ্যে বর্ণিত হইয়াছেন। আমরা আর দৃষ্টান্তের বাহুল্য করিতে চাহি না, যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে কবির আত্মকথা পড়িতে লোকে সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া থাকে। দুখসঙ্গিনী গ্রন্থকারের প্রণয়-কথা এই জন্য আমাদিগের নিতান্ত চিত্ত হরণ করিয়াছে।

প্রভাতে যখন সরোবরে কমলিনী হাসিতে ও দুলিতে থাকে তখন তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া কে না বিমোহিত হয়েন? কিন্তু যখন গগণ-দেশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, যখন সেই সরোবরে ঘনাবলীর ঘোর মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া বারিরাশি গম্ভীরাকার ধারণ করে, যখন সেই সরোবরের চারিদিক্ অন্ধকারময় হইয়া আইসে, তখন কি কেহ সেই কাল-জলে কমলিনীর স্থির সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন? অন্য যদি কেহ না দেখিয়া থাকেন, কবি তখন সেই সরোবর-কূলে কমলিনীর যে সৌন্দর্য্য দেখিবেন, সাধারণ সকল লোক তাহা দেখিতে পাইবে না। প্রকৃতির মলিন দৃশ্য-মধ্যে কমলিনী তখন আর হাসিতে থাকিবেন না। তিনি সেই গম্ভীর দেশে স্থির ও বিশদবদনে দাঁড়াইয়া থাকিবেন; যেন অপেক্ষা করিতেছেন কখন বাতাঘাতে আহত ও মেঘের বারিধারায় সৌরভলুণ্ঠিত হইবেন। তখন সেই সরোবরে কমলিনীর যে সৌন্দর্য্য, সেই সৌ-

ন্দর্য্য দর্শনের সুখ কেবল কবিরাই সম্ভোগ করিতে পারেন। কামিনীর প্রফুল্ল মুখকমলে যে সৌন্দর্য্য, তাহাতে সকলেই মোহিত হয়েন। কিন্তু কামিনীর বিষণ্ণ মূর্ত্তিতে যে সৌন্দর্য্য, তাহা কেবল কবিরই সম্ভোগনীয়। সুন্দরীর হাস্যবিস্ফারিত বদনকমলে যে সৌন্দর্য্য, তাহা কি তাঁহার অশ্রুবিধৌত বিষণ্ণ বদনের স্থির সৌন্দর্য্যের সমতুল্য হইতে পারে? সুন্দরীর নয়ন হইতে যখন অশ্রুবিন্দু মুক্তিকার ন্যায় বিগলিত হইতে থাকে তখন তাহার বদনদেশ যে ভাবে ঢল ঢল করিতে থাকে তাঁহার শোভা কেবল সহৃদয় কবিগণই বুঝিতে পারেন। এই সৌন্দর্য্য বুঝিবার বিষয়, বর্ণনার বিষয় নহে। কবি ক্যাম্বেল্ (Campbell) কহিয়াছেন :—

"For Beauty's tears are lovelier than her Smile." এই কথার প্রমাণার্থেই যেন আমাদিগের দুখসঙ্গিনীর কবি এই ছবিটি ধরিয়াছেন :—

"সেই দিন প্রণয়িনি! ভুলিব কি হায়!
ভুলিব কি সে প্রতিমা বিষাদ মণ্ডিত—
সেই বেশ বিষাদিনী—
মনোদুঃখে পাগলিনী,
হৃদয়ের পটে মম থাকিবে অঙ্কিত।
সেই যে আমার পানে রহিলে চাহিয়া।
নীরবে সতৃষ্ণ আঁখি আনত আননে,
যথা বননিবাসিনী
পতিহারা কুরঙ্গিনী,
সজল নয়নে চায় সুদূর কাননে।"

এই সুন্দরীর ভাবপূর্ণ মুখে যে সৌন্দর্য্য আছে, আমাদিগের কবি তাহা অনেক স্থলেই প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, বিষণ্ণতায় যদি কিছু সুখ থাকে, আমাদিগের কবি সে সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন। তিনি যে কেবল নিজে সেই সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন এমত নহে, তাঁহার পাঠকগণকেও সেই সুখে সুখী করিবেন। তিনি "Will teach impassion'd Souls the Joy of Grief." সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে সমদুঃখের সুখোৎপাদন করিবেন, এবং যখন সেই সমদুঃখ সুন্দরীর পক্ষপাতী হয়, তখন সেই সমদুঃখীজনকে দেখাইবেন,—বিষাদমণ্ডিত সুন্দরীর মুখপ্রতিমা কত বিমোহনীয় রূপে প্রভাসিত হয়।

আমরা দুখসঙ্গিনী গ্রন্থকারের প্রণয়গীতের যে দুইটী বিশেষ ধর্ম্ম ও গুণ তাহা বিবৃত করিলাম। এই প্রণয়কবিতাগুলির প্রধান দোষ এই, ইহাদিগের অধিকাংশই ইন্দ্রিয়সুখপর আদিরসে পরিপূর্ণ। সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের আদিরসগর্ভ কবিতার বরাবর যে দোষ ঘটিয়া আসিয়াছে, সমালোচ্য কবিতাগুলি সে দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

যৌবনের নবীন হৃদয়ে যে প্রেমানুরাগ সঞ্চিত হয়, বিদ্যাসুন্দর ও রোমীয় জুলিয়েটে যে প্রেমের পরিচয় হইয়াছে, সেই প্রেম বঙ্গসাহিত্যের আদিরস। যে প্রেম ওথেলো ও ডেস্‌ডিমোনার প্রাণ, সে প্রেম বঙ্গসাহিত্যের কোন খানেও দেখা যায় না। ওথেলো ও ডেস্‌ডিমোনার প্রেমের

মূল কোথায়?

"She loved me for the dangers I had passed.
And I loved her that She did pity them"

এই খানে এই দম্পতির প্রেমের মূল। তাহাদিগের প্রেম হৃদয়গত, বাহ্য-সৌন্দর্য্য-সম্ভূত নহে। এইটি বিশেষ রূপে দেখাইবার জন্যই সেক্সপিয়ার ওথেলোকে কৃষ্ণকায় মূর সাজাইয়াছেন। ডেস্‌ডিমোনার এই হৃদয়গত প্রণয়ের প্রসারণ কিরূপ হইয়াছিল, তাঁহার সেই প্রেমের গভীরতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিবার জন্যই যেন সেক্সপিয়ার ওথেলো নামক নাটকখানি বিরচন করিয়াছেন। এরূপ প্রণয়চিহ্ন পাইবার জন্য বঙ্গসাহিত্য বিলোড়ন কর, সকল কষ্ট বৃথায় হইবে। এই দেখুন বঙ্গসাহিত্যের বিরহীর স্বপ্নে কি উদয় হইতেছে।

জীবন সরসে তুই কেন আজি নলিনী
ফুটিলে. ছুটালে প্রাণে দুঃখের লহরী;
মলিন বদন খানি,
সেই সুকোমল পাণি,
আবার পড়িল মনে নয়ন-সফরী।
সেই সুমধুর স্বর প্রণয়-পূরিত,
কোকিল-কাকলী যেন নিকুঞ্জ সদনে;
অধরে সরল হাসি,
বিনোদ সৌন্দর্য্য রাশি,
কুসুমললামময় নবীন যৌবনে।" ইত্যাদি

* * * * *

"অযত্নে বসন খানি পড়িছে খসিয়া,
বিবসনা, পয়োধর চারু বক্ষঃস্থলে,
মন্থর গমন ভরে,
কাঁপিতেছে থরে থরে
খেলাইছে সমীরণ সলিল অঞ্চলে।

* * * * *

চলিতে যখন তুমি বরাঙ্গ নাচিত,
নবচূতলতা যথা মুকুলের ভরে,
পরশিয়া সমীরণ
নাচে সুখে অনুক্ষণ,
ধীরে ধীরে মধুমালা বিতরণ করে।" ইত্যাদি

স্থলান্তরে :—

সখিরে!—
কত সুখে ছিনু দোঁহে প্রণয়ের মিলনে,
যেন রে কুসুম দুটী, একবৃন্তে আছে ফুটী,
সরস মধুর মাসে নিরজন কাননে।
উন্মত্ত যুগল মন, এক মনে সম্মিলন,
মধুর প্রণয়-সুখে বিমোহিত দুজনে।
পরশি প্রণয়-সুখ, আনন্দে নাচিত বুক,
প্রেম-প্রবাহিনী নীর ছুটিত এ মরমে,
কত সুখ হোত হায়, তব প্রেম-প্রতিমায়
স্নেহ-সিংহাসনে রাখি, দেখিতাম নয়নে।
সেই মুখ-শশধর, নিথর নিতম্ব থর,
অধর-জড়িত হাসি নিরুপম ভুবনে।
প্রেয়সি!—
যখন তোমারে ধরে, প্রণয়ে চুম্বন করে,
রাখিতাম প্রেমভরে এই বক্ষঃস্থলেরে;
যবে করে কর ধরি, কহিতাম প্রাণেশ্বরি!
আমার মতন সুখী নাহি ধরাতলেরে,
তখন জানিনি হায়, প্রণয় যে বিষময়,
প্রণয় অমৃত সাথে আছে হলাহল রে!"

এই উদ্ধৃত কবিতাবলির মধ্যে

কত সুখে ছিনু দোঁহে প্রণয়ের মিলনে,
যেনরে কুসুম দুটী, একবৃন্তে আছে ফুটি,

সরস মধুর মাসে, নিরঞ্জন কাননে।" এই কতিপয় পঁক্তিতে যে সুন্দর ভাবটি বিকশিত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অতুলনীয়। ইহাতে দম্পতির প্রণয়-সুখ কি চমৎকারভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু কবি তৎপরে যে সমস্ত ভাব তাহাতে যোজিত করিয়াছেন তাহাতে সেই ইন্দ্রিয়সুখপরতা বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং ঐ প্রথম ভাবটিকে যেন কলঙ্কিত করিতেছে। আমরা নিম্নে ইংরাজী হইতে একজন সামান্য কবির কয় ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ তুলনা করিয়া দেখুন ইহার পবিত্র প্রণয় চিত্র কেমন বিসদৃশ এবং সুন্দর ভাবে পরিপূর্ণঃ—

" For ever would the fond enthusiast rove,
With Julia's spirit, thro'the shadowy grove;
Gaze with delight on every scene she planned,
Kiss every floweret planted by her hand.
Ah! still he traced her steps along the glade,
When hazy hues *and glimmering lights betrayed*
Half viewless forms;

* * * * * *

Dear was the grot that shunned the blaze of day;
She gave its spars to shoot a trembling ray.
The spring, that bubbled from its inmost cell.
Murmurred of Julia's virtues as it fell;
And O'er the dripping moss, the fretted stone,
In Florio's car breathed language not its own."

Rogers.

দুখসঙ্গিনীর কবিতাবলির দ্বিতীয় দোষ—কল্পনার অসঙ্গতি। কবি এক এক সময়ে প্রকৃতির চমৎকার ও গভীর দৃশ্যসমূহ বর্ণনায় কল্পনাকে এরূপ গম্ভীর ভাবে পূর্ণ করেন, যে তৎপরে তৎসদৃশ ভাব আর রক্ষিত হয় না; তৎপরে যে ভাব যোজিত ও অঙ্কিত হয় তাহার সহিত পূর্ণ কল্পনার সঙ্গতি থাকে না। কল্পনা একবার বিসারিত হয়, কিন্তু অচিরাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই দেখুন এ কি?

* * * * *

"বসি প্রেম সিংহাসনে
দেখিনু তোমার সাথে প্রেমের আরতি—
দেখিলাম প্রেমময় অনন্ত গগণ,,..
সুবিমল প্রেমময় সকল সংসার।

এই স্থলে কল্পনা কতদূর প্রসারিত হইল দেখুন, কিন্তু তৎপরেই কবি এই কল্পনাকে কেমন সঙ্কুচিত করিয়া দিলেন দেখুনঃ—

"প্রেম-পূর্ণ চন্দ্রানন,
প্রেমফুল্ল দুনয়ন,
প্রেমময় কথা গুলি, পীযুষ-আসার।

আবার দেখুন একি? কবি একবার কল্পনায় দেখিতেছেন।

"রক্ত তরঙ্গিণীময় অনন্ত আকাশ,
অস্তাচল সুশোভিত রবির কিরণে,
জ্বলিছে নীরদমালা,
যেন কাঞ্চনের থালা,
থুয়েছে প্রকৃতি সতী অম্বরে যতনে।
দূরে শূন্য নীরময়ী গিরিজা জাহ্নবী
গাইছে প্রণয়-গীত বিরহ উচ্ছ্বাসে,
রজত লহরীগণ
শ্যাম অঙ্গে অনুক্ষণ,
নাচিতেছে মৃদু মন্দ সায়াহ্ন বাতাসে।
চুম্বিয়া প্রসূনবনে কুসুম আনন,
বহিতেছে সুকোমল নৈশ সমীরণ,
শ্যাম চূত-দলে বসি,
মিলায়ে রাগিণী-রাশি,
জাগিছে কোকিল-বালা অদূর কাননে।
সকলি আনন্দময় অস্ফুট সন্ধ্যায়—
অস্ফুট তিমিরজালে ভূষিত ভুবন;
পূর্ব্বদিকে নীলাম্বরে,
বসাইতে শশধরে,
সাজায় যামিনী শুধু রজত আসন।"

কল্পনা এই বিশাল প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যে যেরূপ বিসারিত ও মোহিত হইয়াছে, তৎপরে কি নিম্নলিখিত ভাবটি শোভা পায়?

"এ হেন সন্ধ্যায় সেই অদূরে আবার
দেখিনু দাঁড়ায়ে মম প্রেমের পুতলী
যেন মরি বনফণী,
খুলিয়াছে শিরোমণি,
খসেছে ভূতলে কিম্বা কনকবিজলী।

কবি হয়ত ভাবিয়াছিলেন প্রকৃতির এই বিশাল সুন্দর দৃশ্য মধ্যে তাঁহার প্রেম-প্রতিমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমরা বলি ইহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রেম-প্রতিমাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও সামান্য দেখাইয়াছে। কবি আবার যখন বলিলেনঃ—

"যেন মরি বনফণী
খুলিয়াছে শিরোমণি,

তখন পাঠকের কল্পনায় মাণিকের ভাব যত না উদয় হয়, বনফণীর দৃশ্য তদপেক্ষা অধিকতর প্রতীয়মান হয়। তখন তিনি কবির প্রেমপ্রতিমাকে বনফণী রূপে কল্পনা করিতে যান ও সহসা চমকিয়া উঠেন। বনফণী শিরোমণি খুলিয়াছে—এ কথা বলিতে গেলে মাণিকের ভাব কিছুই উদয় হয় না, কল্পনার সমক্ষে একটি বনফণী যেন শির অবনত করিয়া রহিয়াছে, ইহাই জাজ্বল্যরূপে প্রতীত হইতে থাকে। আবার যখন পড়িঃ—

"খসেছে ভূতলে কিম্বা কনকবিজলী"

তখন ভূতলস্থ কনকবিজলীর সহিত 'শূন্য-নীরময়ী' জাহ্নবী এবং উদ্ধৃত গগণস্থ দৃশ্যাবলির সঙ্গতি বুঝিতে পারিনা।

সমালোচ্য কবিতাবলির আর একটি ভাবগত দোষ এই—ভাব সকল নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অসম্বদ্ধ তজ্জন্য অনেক স্থল দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

দুখসঙ্গিনীর ভাবগত দোষ যাহাই থাকুক, ইহার পদবিন্যাস ও রচনায় যে সাতিশয় লালিত্য ও মধুরতা আছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কবি, পদ্য রচনা বিষয়ে অত্যন্ত নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পদগুলি সমান ওজনে বহিয়া যায়, কোথাও বাধে না। কেবল ইংরাজী কবিতার অনুকরণে কবি যেখানে দূরান্বয়ের সমাবেশ করিয়াছেন সেই খানে বাক্যস্রোত বাধিয়া যায়। অমিত্রচ্ছন্দে এ প্রকার দূরান্বয় তত দোষার্হ হয় না, কিন্তু মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে পদভঙ্গদোষ বড় ভাল লাগে না, তাহা ঠিক যেন অমিত্রচ্ছন্দের ন্যায় শুনাইতে থাকে। এই পদ গুলি দেখুন কেমন শুনায়ঃ—

"চিরানন্দ প্রাণিকুল ভ্রমিছে, বদনে
নাহিক বিষাদ ধ্বনি বঞ্চিত যাতনা"
"জীবন সরসে তুই কেন আজি নলিনী
ফুটিলে, ছুটালে প্রাণে দুঃখের লহরী,"
"পরিয়া নবমী শশী
ললাটে, উজলি দিশি
অমৃতমালিনী সন্ধ্যা, ধরাতলে আসিছে।"

দুখসঙ্গিনীর গ্রন্থকার একজন নবীন লেখক, কারণ তাঁহার ভাবের এখনও শৃঙ্খলা ও প্রগাঢ়তা জন্মে নাই। নবীন লেখক প্রথমে যেমন পদ বিন্যাস ও রচনায় প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকে দুখসঙ্গিনী-লেখকও তদ্রূপ করিয়াছেন। এ কথা বলাতে আমরা কিছু এমত বলিতেছি না যে, রচনার পরিপাট্য সাধন করা অনাবশ্যক। প্রত্যুত আমরা বলি, যে রচনার পারিপাট্যসাধন করা আদৌ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু কবির পক্ষে ইহাই শেষ নহে। ভাব লইয়াই কবি, এবং ভাবেই কবিত্ব প্রকাশ হয়। গ্রন্থকার অতঃপর তদ্বিষয়ে অধিকতর মনোনিবেশ করিলে তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ সুলেখক হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। আপাততঃ তাঁহার গ্রন্থ দেখিলে বোধ হয়, তিনি পদ রচনার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন; এবং তদ্বিষয়ে তিনি যে অনেক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার আর সংশয় নাই। দুখসঙ্গিনীর যেখানেই পড়, ইহার রচনার এরূপ লালিত্য আছে যে ইহার সেইস্থলই পড়িতে অতি মধুর লাগে। রচনার প্রাঞ্জলতা থাকিলে ইহার পদাবলি অধিকতর প্রশংসনীয় হইত। আমাদিগের আশা আছে সময় ক্রমে এই গ্রন্থকারের রচনা সরল হইয়া আসিবে এবং তিনি একজন কবি বলিয়া সাধারণ্যে গণনীয় হইতে পারিবেন।

শ্রীপুঃ—

আর্য্যজাতির ব্যবহার-বিজ্ঞান।

৬ষ্ঠ সংখ্যার অনুবৃত্তি।

অন্যান্য দেশের আচার ব্যবহার ও কার্য্যপ্রণালী এরূপ অব্যবস্থিত যে, আজ যে প্রকার আচার, যে প্রকার ব্যবহার ও যেরূপ কার্য্য প্রণালী প্রচলিত আছে—দশ বৎসর পূর্ব্বের বা দশ বৎসর পরের আচার, ব্যবহার ও কার্য্য প্রণালী অনুসন্ধান করিলে তাহার কোনটির সহিত কোনটীর মিল হইবে না, একবারে সমস্তই পরিবর্ত্তিত দৃষ্ট হইবে; কিন্তু এ-দেশের সেরূপ অব্যবস্থিত ভাব নহে। পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন প্রথাও এদেশে অদ্যাপি অবিকৃত ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। এদেশের আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম্ম সংস্রবে নিবদ্ধ, এজন্য তাহা এত দিন এদেশে অটল ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর চলিবে না। এখন মনুষ্যের কল্পিত রীতি নীতির উন্নতির সময় বা প্রলয় দশা, এখন দশ সহস্র বৎসরের প্রতিষ্ঠিত প্রথা এক নিমেষের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইবে।

এখনকার বিচারপতিদিগকে যেমন ১০টার সময় ভাত মুখে দিয়া বিচারালয়ে দৌড়িতে হয়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে এইরূপ ছিল—

"দিবসস্যাষ্টমংভাগং মুক্ত্বা ভাগত্রয়ন্তু যৎ।
স কালো ব্যবহারাণাং শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরঃস্মৃতঃ॥
(কাত্যায়ন)

"ধর্ম্মাসন মধিষ্ঠায় সম্বীতাঙ্গঃ সমাহিতঃ।
প্রণম্য লোকপালেভ্যঃ কার্য্যদর্শনমারভেৎ॥"
(মনু)

বিচারকেরা ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার স্নান আহ্নিক ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া ৪ দণ্ড বেলার পর বিচার স্থানে গমন করিতেন। ৮ দণ্ড কাল বিচার করিতে। তাঁহাদিগকেও এখনকার ন্যায় সম্বীতাঙ্গ হইতে হইত অর্থাৎ জামা জোড়া পরিতে হইত। বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে ধর্ম্ম ও লোকপাল দেবতাদিগের উদ্দেশে নমস্কার করিতেন। অনন্তর কার্য্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইতেন। বেলা দুই প্রহর হইলেই সভাভঙ্গ করিয়া গৃহে আগমন করিতেন।

কি বৈদ্যক শাস্ত্রকার ঋষি কি ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষি সকলকারই মতে এদেশে আহারের পর বিশেষ চিন্তাব কার্য্যকরা নিষিদ্ধ। তাঁহাদের মতে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে "ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ" আহারের

পর নিদ্রা ভিন্ন অন্যবিধ বিশ্রাম করাই বিহিত। দীর্ঘ-অহ নিদাঘ কালে দিবা-নিদ্রাও দূষণীয় নহে; শীত ঋতুতে দিবা নিদ্রাই দূষণীয়। ইহার ভাব এই যে, স্নান আহার করিলে শরীর স্বভাবতঃ শীতল হয় অর্থাৎ শারীরিক উষ্মতার ক্ষতি হয়। শীত ঋতুতে আপনা হইতেই শীতল হইতে থাকে, আহার করিলে ততোধিক শীতল হয়, নিদ্রা গেলে ততোধিক শীতল হইবার সম্ভাবনা। এজন্য বৈদ্যক শাস্ত্রে শীত ঋতুর দিবা-নিদ্রা শ্লেষ্মকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শ্লেষ্মার অপর একটি নাম 'বলাশ' অর্থাৎ বলের নাশক। সুতরাং শীতকালে আহারের পর নিদ্রা না যাইয়া উষ্মতা উত্তেজনের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ শ্রম করা আবশ্যক বটে কিন্তু গ্রীষ্ম কালে তাহার আবশ্যক হয় না। কারণ, গ্রীষ্ম কালের ভোজন উষ্মতার বিনাশক নহে, কালগুণে প্রবৃদ্ধ উষ্মতার শাম্যকারী মাত্র। এই সকল কারণে ঋষিদিগের মতে এদেশে আহারের পর কোন গুরুতর কার্য্য করা অযুক্ত এবং শীত-প্রধান দেশের (দশটা পাঁচটা) প্রথা এদেশীয়দিগের শরীরের ক্ষতিকর।

"তিষ্ঠতু"—এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। বিচার নিষ্পত্তির রীতি পদ্ধতি—পূর্ব্ব কালের বিচার পদ্ধতি প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমতঃ বাদী প্রতিবাদীকে গ্রহণ করা আবশ্যক। অর্থী, প্রত্যর্থী, আর বাদী প্রতিবাদী বা পূর্ব্ব-বাদী ও উত্তরবাদী তুল্য কথা। প্রথম আবেদনকারীর নাম বাদী আর তাহার উত্তর প্রদান কর্ত্তার নাম প্রতিবাদী। বাদী প্রতিবাদীর এইরূপ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ থাকিলেও পূর্ব্বকালে ঠিক এরূপ নিয়মের দৃঢ় ব্যবস্থা ছিল না। অভিযোগের অবস্থা অনুসারেই বাদী প্রতিবাদী নির্দ্ধারিত করা হইত। যথা,—

"যস্য চাভ্যধিকা পীড়া কার্য্যং বাপ্যধিকো ভবেৎ।
তস্যার্থিভাবো দাতব্যো ন যঃ পূর্ব্বং নিবেদয়েৎ।"

(ব্যাস ও নারদ)

অর্থ এই যে বিবাদকারীদিগের মধ্যে যাহার পীড়াধিক্য অনুমান হইবে অথবা কার্য্যাধিক্য অনুমান হইবে, বিচারপতি তাহাকেই অর্থী করিয়া লইবেন। প্রথমে আবেদন করিয়াছে বলিয়া তাহাকে বাদী ভাব প্রদান করিবেন না। যদি যুগপৎ অর্থাৎ এক সময়েই যদি দুই বা তিন ব্যক্তি অভিযোগ উপস্থিত করে, তবে সে স্থলেও বাদী প্রতিবাদী ঐ নিয়মে স্থিরীকৃত হইবে।

পূর্ব্বকালে যে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহা এই রাজ-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলেও প্রতীত হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকেরা বিবাদ করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণের আবেদন অগ্রে গ্রহণ করা হইত। এই রূপ ব্রাহ্মণের অনন্তর ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয়ের অনন্তর শূদ্রের অভিযোগ গ্রাহ্য হইত, যথা,—

"অহং পূর্ব্বিকয়া যাভাবর্থি প্রত্যর্থিনৌ যদা।
বাদো বর্ণানুপূর্ব্ব্যেণ গ্রাহ্যঃ পীড়ামবেক্ষ্য বা॥" (বৃহস্পতি)

বিবাদ কার্য্যে স্বয়ং উপস্থিত থাকাই তৎকালের নিয়ম ছিল বটে কিন্তু বিবাদ বিশেষে স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া প্রতিনিধি দ্বারা সমাধা করিবার রীতিও ছিল।

"মনুষ্য-মারণে স্তেয়ে পরদারাভিমর্ষণে।
অভক্ষ্যভক্ষণে চৈব কন্যা-হরণ-দূষণে॥
পারুষ্যে কূট করণেহনৃপদ্রোহে তথৈবচ।
প্রতিবাদী ন দাতব্যঃ কর্ত্তা তু বিবদেৎ স্বয়ম্।"

(কাত্যায়ন)

অর্থ——

হত্যাকারী (১), চৌর (২), পরস্ত্রী-অপহারী (৩), যে অভক্ষ্যভক্ষণ করিয়াছে (৪), যে কন্যা-হর্ত্তা (৫), পরুষব্যবহারকারী (৬) কূটকারী অর্থাৎ যে জালিয়াৎ (৭),—ইহাদিগকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে। প্রতিনিধি বা মোক্তার দ্বারা ইহাদের সম্বন্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

এক্ষণে (rape) নামক কেস্ যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহার সহিত (৫) চিহ্নিত কন্যা হরণ অপরাধের ভিন্নতা আছে। রেফ শব্দের লক্ষ্য সাধারণতঃ বলাৎকার। কিন্তু কন্যাভিমর্ষণ শব্দের লক্ষ্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা অনুপযুক্ত ব্যবহার অবস্থায় অভিগমন করা। কন্যকা অন্যকা বলিয়া কথা নাই, বলাৎকার করিলেই রেফ কেস্ হয়, কিন্তু অকন্যাকাবস্থায় বলপূর্ব্বক অভিগত হইলে তাহা কন্যকাভিমর্ষণ না হইয়া ঋষিদিগের সময়ে তাহা পরদারাভিমর্ষণের মধ্যে গণ্য হইত। পরদারাভিমর্ষণ শ্রেণী ভুক্ত হইলেও তাহা প্রকৃত পরদারাপহরণের সহিত তুল্য ছিল না। পরদারহরণ অপেক্ষা অবিবাহিতা প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীহরণের দণ্ড কিছু অল্প হইত। ইহাতে যুক্তি এই যে, অকামা পরস্ত্রী হরণ করিলে তাহার এবং তদীয় ভর্ত্তা এই উভয়কেই পীড়িত করা হয় এবং তাহার পাতিব্রত্য নষ্ট করা হয়, কিন্তু তাদৃশ কন্যকাভিমর্ষণে একতরকে পীড়িত করা হয় মাত্র এবং কন্যকা ধর্ম্মের ক্ষতি করাও হয়। কন্যকা ধর্ম্ম অপেক্ষা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গুরুত্ব আছে এবং বহুতরের পীড়ন রূপ অন্য একটি গুরুধর্ম্মও তৎকার্য্যে আপতিত হয়। সুতরাং অকামা প্রৌঢ় কন্যকাভিমর্ষণ পরদারাভিমর্ষণ-শ্রেণী ভুক্ত হইলেও তাহাতে দণ্ডের তারতম্য করা হইত।

৪ চিহ্নিত "অভক্ষ্যভক্ষণ" অপরাধের জন্য নালিশ হইত এবং তাহার যথাযথ বিচারও হইত, এতদনুসারে পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে, পূর্ব্বকালে আর্য্য জাতির মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা কিরূপ দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ ছিল এবং হিন্দু আচার ব্যবহার চিরস্থায়ী এবং অন্যের সহিত সাঙ্কর্য্য নিবারণ করার জন্য কিরূপ যত্ন ছিল। এই সকল কারণে এদেশ এত দিন পর্য্যন্ত এক ভাবে চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে

দেশের ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে কথা এস্থানে অপ্রকাশ্য। যাক্,—এই রূপে অপরাধি বিশেষকে অপরাধীদিগকে রাজদ্বারে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইত—আবার কোন কোন অর্থাৎ সামান্য অপরাধী হইলে তাহার নিমিত্ত মোক্তার নিযুক্ত করিলেই হইত। গুরুতর অপরাধ করিলেও কুলস্ত্রীগণ সহসা বিচারস্থলে নীত হইতেন না। কুলস্ত্রী, অতি বালক, জড়, উন্মত্ত, এবং উৎকট রোগগ্রস্ত ইহাদিগের বিচারস্থানে উপনীত করিবার নিষেধ থাকা দৃষ্ট হয়। যথা,—

কুলস্ত্রী বালকোন্মত্ত জড়ার্ত্তানাঞ্চ বান্ধবাঃ।
পূর্ব্বপক্ষোত্তরে ব্রুয়ু নির্যুক্তো ভৃতকস্তথা।"

(কাত্যায়ন)

যে স্থলে প্রতিনিধি দ্বারা অভিযোগ বা উত্তর প্রদান, সে স্থলে সেই ব্যক্তি যে তৎকার্য্যের প্রতিনিধি, তাহা রাজার বিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক অর্থাৎ এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্ব কালেও রেজেষ্টরী করিয়া মোক্তার নিযুক্ত করিতে হইত। অনিযুক্ত ব্যক্তির কোন পক্ষীয় কথা বার্ত্তা বলিবার অধিকার ছিল না। কেবল পিতা ভ্রাতা, ও পুত্র, এই তিন ব্যক্তি অনিযুক্ত হইলেও উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিতেন যথা,—

"যো ন ভ্রাতা পিতা বাপি ন পুত্রো ন নিয়োজিতঃ।
পরার্থবাদী দণ্ড্যঃ স্যাৎ ব্যবহারেষু বিব্রুবন্॥"

অর্থ— (নারদ)

পিতা, মাতা ও পুত্র ব্যতীত অনিযুক্ত ব্যক্তি যদি বাদী বা প্রতিবাদীর হইয়া কথা বলিবে বা কিছু করিবে, তবে সে দণ্ডনীয় হইবে এবং বিরুদ্ধ ব্যবহার বা মিথ্যা বলিলে বা করিলেও দণ্ডনীয় হইবে

এক্ষণে যেমন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রথমে শাসন পত্র (শমন) দেওয়া হয় অনন্তর ওয়ারণ্ট দ্বারা হাজীর করা হয়—পূর্ব্বে এরূপ প্রথা ছিল না। পূর্ব্বে এইরূপ ছিল যে, কোন ব্যক্তি বাদীর নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলে রাজা বা রাজপ্রতিনিধি তৎকার্য্যের নিমিত্ত যে সকল দূত নিযুক্ত থাকিত—একেবারে তাহাদিগকেই প্রেরণ করা হইত—তাহারা ডাকিয়া আনিত। তাহাদের কথায় না আসিলে বলপূর্ব্বক অর্থাৎ ধরিয়া আনা হইত। বিজ্ঞাপন লিপি অবগত করান প্রথা না থাকিবার কারণ কেবল তাঁহারা ঐরূপ প্রথাকে সদোষ বিবেচনা করিতেন। সে দোষ পরে ব্যক্ত হইবে।

অপিচ, কোন ব্যক্তি বিবাহে প্রবৃত্ত আছে,—কোন ব্যক্তি রোগের যাতনায় কাতর আছে,—কোন ব্যক্তি যজ্ঞ কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, কোন ব্যক্তি ব্যসন গ্রস্ত হইয়াছে,—কোন ব্যক্তি কোন প্রকার রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত আছে,—কোন ব্যক্তি গোরক্ষক, সে যখন গোচারণে প্রবৃত্ত আছে,—কোন কৃষক, কৃষি কার্য্যে বা শস্য বন্ধনে নিযুক্ত আছে,—কোন

শিল্পী কোন এক শিল্প কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আছে,—কোন যোদ্ধা যুদ্ধ কার্য্যে উপস্থিত হইয়াছে,—কোন শিশুর ব্যবহার যোগ্য বয়স উপস্থিত হয় নাই,—কোন দূত দৌত্য কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে,—কোন দাতা দান করিবার আয়োজন করিয়াছে,—কোন ধার্ম্মিক কোন এক ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছে,—কোন ব্যক্তি হঠাৎ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে,—এমন সকল ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বকালের রাজারা তাহাদের কার্য্যের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়া যাইতেন না। উত্তমর্ণ ব্যক্তিরাও এতাদৃশ অবস্থায় তাঁহাদের নামে অভিযোগ করিতেন না। অভিযোগের পর ঐরূপ ঘটনা অথবা তাদৃশ অবস্থা না জানিয়া যদ্যপি অভিযোগ করা হইত, তাহা হইলে রাজা, বা রাজপ্রতিনিধি তাঁহাদের সেই সেই কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন, শেষ হইলে পর ধরিয়া লইয়া যাইতেন। যথা,—

"নির্ব্বেষ্টুকামো রোগার্ত্তো যিযক্ষুর্ব্যসনে স্থিতঃ।
অভিযুক্তস্তথান্যেন রাজকর্ম্মোদ্যতস্তথা॥
গবাং প্রচারে গোপালাঃ শস্যবন্ধে কৃষীবলাঃ।
শিল্পিনশ্চাপি তৎকালে আয়ুধীয়াশ্চ বিগ্রহে॥
অপ্রাপ্তব্যবহারশ্চ দূতো দানোন্মুখো ব্রতী।
বিষমস্থাশ্চ নাসেধ্যা নচৈতান্নাহ্বয়েন্নৃপঃ॥"
(নারদ)

বিবাদ বিশেষে বাদী বা প্রতিবাদী, উভয়েরই প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন লওয়া হইত। জামিন দিতে না পারিলে বিচার নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিতে হইত। এই রূপ আবদ্ধ-থাকা আধু এক্ষণকার 'হাজত' তুল্য বলিয়া বোধ হইতেছে। মহর্ষি কাত্যায়ন সভাপতির কর্ত্তব্য বর্ণন স্থলে ইহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিদংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

"অথচেৎ প্রতিভূ র্নাস্তি বাদযোগ্যস্তু বাদিনোঃ।
স রক্ষিতো দিনস্যান্তে দদ্যাৎ ভৃত্যায় বেতনম্।

এই বচনের "বাদযোগ্য" শব্দের অর্থ এই যে বিবাদের ফল পাক কালে শারীরদণ্ড বা ধনদণ্ড যে রূপ হইবে তাহাই গ্রহণ বা দান করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। "প্রতি ভবতি তৎকার্য্যে তদ্বৎ ভবতীতি প্রতি ভূর্লগ্নকঃ" স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রতিভূশব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর "দিনস্যান্তে" এই অংশের তাৎপর্য্য এই যে বিচার নিষ্পত্তি যাবৎ না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতও এই রূপ যথা,—

"উভয়োঃ প্রতিভূর্গ্রাহ্যঃ সমর্থঃ কার্য্যনির্ণয়ে।
প্রতিভূবস্তু ভাবেচ রাজ্ঞা সংগোপনং তয়োঃ।"

ইহার মর্ম্ম আর কাত্যায়নের মর্ম্ম প্রায় তুল্য। ফল, বাদি প্রতিবাদির জামিন লওয়া প্রথা পূর্ব্বকালেও ছিল কিন্তু তাহা সর্ব্বপ্রকার বিবাদে নহে। বিশেষ

বিশেষ বিবাদ প্রক্ষেই. ঐরূপ করা হইত। পূর্ব্বোক্ত "দদ্যাৎ ভৃত্যায় বেতনম্" এতদনুসারে বোধ হইতেছে, খরচার টাকাও আমানৎ করিতে হইত।

এক্ষণে মোকদ্দমা পোষ্টপোন (Postpone) বা আর্চ্চা লওয়া এবং দেওয়ার প্রথা থাকা যাহা দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে তৎকালে প্রতিবাদীরই আর্চ্চা লওয়ার অধিকার ছিল এবং প্রতিবাদীকেই তাহা দেওয়া হইত। বাদী অভিযোগ উপস্থিত করিয়া কোন বিষয়ের জন্য আর্চ্চা প্রার্থনা করিতে পারিবে না। যদি করে, তবে তাহার অর্থিত্ব বিনাশ অর্থাৎ ডিস্‌মিস্ করা হইত। যথা,—

"প্রত্যর্থী যদি কাঞ্চিৎ কালং প্রার্থয়তে স লভতে, অর্থীতু কালং প্রার্থয়ন্ অর্থীত্ব
মেব ব্যাহন্যাৎ"
অতস্তেন কালো ন প্রার্থনীয়ঃ।"

অর্থ বলা হইয়াছে। অপিচ, আর্চ্চার জন্য নিয়মিত কাল উর্দ্ধ সংখ্যায় সপ্তাহ ছিল। যথা,—

"প্রত্যর্থী লভতে কালং ত্র্যহং সপ্তাহ
মেব বা।
অর্থীতু প্রার্থয়ন্ কালং তৎক্ষণাদ্বর-
হীয়তে॥"
(ব্যবহার তত্ত্ব)

ইহার অর্থ সুগম।

ক্রমশঃ

শ্রীকা——

গ্রীক ও হিন্দু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাহ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে ভারত যদ্রূপ বহুমূর্ত্তি-বিশিষ্ট, গ্রীকদিগের অধিবাসিত ভূখণ্ড তদপেক্ষা যদিও ন্যূন, কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে তাহাদের সন্নিবেশ বশতঃ গাঢ়তাপূর্ণ এবং বৈচিত্রের আধিক্য রূপে প্রতীয়মান হয়। ইহার উৎপন্ন ফলও তদ্রূপ হইবে। যাহা হউক এই সামান্য আয়তনের মধ্যে ইহার ভাব-বৈচিত্র এত অধিক যে তাহার তুলনায়, দূর-বিক্ষিপ্ততা হেতুও ভারতীয় বৈচিত্র সমূহ অগণনীয়ের মধ্যে পড়িয়া যায়। গ্রীসের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিতে পাইবে ইহার তিনধারে সমুদ্রতরঙ্গে উপকূলভাগ ধৌত হইতেছে, উত্তরে পর্ব্বতমালা পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রধাবিত হইয়া বহির্জ্জগত হইতে ইহার বিভিন্নতা সাধন করিতেছে। এই সীমান্তর্বর্ত্তী ভূভাগ ক্রমান্বয়ে পর্ব্বত, নদী, সমতল ক্ষেত্র, উপত্যকা, অধিত্যকা প্রভৃ

ভিতে বিভাজিত হইয়া বহুতর ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশমালায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সকল প্রদেশের প্রত্যেকে এত ক্ষুদ্র যে ইহাদের পরিমাণফল কয়েক বর্গ ক্রোশের অধিক হইবে না, বোধ হয় আমাদিগের এক একটি পরগণাও তাহাদের অপেক্ষা স্থানবিশেষে বৃহৎ হইবে। এই সকল প্রদেশের মধ্যে উত্তরে থেসালী ও এপিরুস, উভয়ে পিন্দুস নামক পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। থেসালি চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত মধ্যে আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র, মধ্যস্থলে একটি নদী প্রবাহিত, ভূমি উর্ব্বরা। এপিরুস উত্তর দক্ষিণে প্রধাবিত পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা আকৃষ্ট, ভূমিতল বন্ধুর এবং অনুর্ব্বরা। এতদুভয় দেশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী ক্রমাগত দক্ষিণপূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া মধ্য গ্রীসকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে, উহার পশ্চিম ভাগে ইটোলিয়া ও আর্কাণনিয় নামক প্রদেশ দ্বয়। ইহাদের মধ্য দিয়া গ্রীসদেশীয় সর্ব্বপ্রধান স্রোতস্বতী আকিলৌস প্রবাহিত হইয়া করিন্থ উপসাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। এ উভয়দেশ পর্ব্বত ও বনময় এবং সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে সম অনুকূল না থাকায়, বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা দস্যুবর্গের দ্বারা অধিবেশিত ছিল।

এই মধ্যদেশের পূর্ব্বভাগ গ্রীক বিদ্যা বুদ্ধি ও বীরত্বের আকর স্থল। যে পর্ব্বত মালা ইহাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে, তাহা পূর্ব্ব দিকে সমুদ্র হইতে অদূরবর্ত্তী ভাবে প্রধাবিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং থেশালি হইতে পূর্ব্বমধ্যদেশে আসিতে হইলে, ঐ পথের এক পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও অপর পার্শ্বে সমুদ্র। এই পথ দিয়া আসিতে হইলেই বিখ্যাত গিরিসঙ্কট থার্ম্মপলি অতিক্রম করিতে হয়। এই পূর্ব্ব ভাগের পূর্ব্ব উপকূল চাপিয়া লোক্রিয়ার নামক প্রদেশ। লোক্রিয়ার পশ্চিমে ডোরিস এবং কোকিস নামক প্রদেশদ্বয়। কোকিস প্রদেশের মধ্য দিয়া পার্নাসুস নামক পর্ব্বতশ্রেণী। ইহার উপরে গীতি-বিষয়িণী অধিনাসিকাগণের অবস্থান এবং নিম্ন দেশে বিখ্যাত ভবিষ্যৎ-জ্ঞাপক আপলো দেবের মন্দির। কোকিসের দক্ষিণে বিওতিয়া নামক প্রদেশ। ইহা চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ এবং জল-নির্গমনের পথশূন্য। এ নিমিত্ত ভূমি সর্ব্বদা সলিলসিক্ত থাকায় তাহা উর্ব্বরতা গুণ বিশিষ্ট, এবং তাহা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু বায়ু সর্ব্বদা সজল এবং কুজ্ঝটিকাময়। বিওতিয়ার দক্ষিণে আটিকা প্রদেশ, এতদুভয়ের মধ্যে পর্ব্বত শ্রেণী। আটিকার পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমে সমুদ্র। এখানকার বায়ু শুষ্ক এবং ভূমি নির্জ্জল, কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু বিবিধ ফলের উৎপাদন-পক্ষে উপযোগী। আটিকার পশ্চিমে মিগারিস। এখান হইতে দক্ষিণ দেশে যাইতে হইলে, করিন্থ যোজক দিয়া যাইতে হয়, কিন্তু এই পথে পর্ব্বতের বাধা এত অধিক যে

স্থলপথ অপেক্ষা দক্ষিণ দেশে জলপথে যাওয়াই সুগম।

উত্তরদেশাপেক্ষা দক্ষিণ দেশ নদী-বিরল ও পর্ব্বতময়। ইহার উত্তরে আর্গো-লিস। এই আর্গোলিস প্রদেশ আবার বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সামান্য স্থানের মধ্যেই আবার প্রকৃতিবৈচিত্র্য, এত যে কোথাও কমলা কমলা প্রভৃতি লেবু পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়, কোথাও আবার কোন দ্রব্যই উৎপন্ন হয়না। ইহার পশ্চিমে আকৈয়া। মধ্যভাগে আর্কেডিয়া, চতুর্দ্দিক্‌ পর্ব্বতমালা প্রাকারের ন্যায় বেষ্টন করিয়া, অন্যান্য প্রদেশ হইতে ইহাকে ছেদসম্বন্ধ করিতেছে। দক্ষিণে মেসিনা ও লাকোনিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। এতদুভয় দেশ যদিও পর্ব্বতময় কিন্তু অনুর্ব্বরা নহে। মেসিনা প্রদেশে খর্জ্জুর প্রভৃতি ফল এবং বিবিধ শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। এই প্রদেশেই সুবিখ্যাত স্পার্টা নগরী ইউরোতাস নামক নদীর তটে অবস্থিত ছিল। আর্কেডিয়ার পশ্চিমে ইলিস নামক প্রদেশ। এই প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত অলিম্পিয়া ক্ষেত্রের অবস্থান।

গ্রীসের এই প্রকৃতি বৈচিত্র্যে লক্ষিত হইবে যে এই ক্ষুদ্রায়তন দেশের মধ্যে প্রদেশভেদে কত স্বভাব-বিভিন্নতা। কোন প্রদেশ হয় ত একেবারে প্রায় চতুর্দ্দিক্‌ সমুদ্রবেষ্টিত, আবার তদ্বিপরীতে কোন স্থান নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ, বহির্ভাগের আর সমস্ত স্থান হইতে সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন, বহুদূর অতিক্রম না করিলে সমুদ্রের মুখ দেখিবার যো নাই। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশ যেন স্বভাব কর্ত্তৃক বিভাজিত হইয়া প্রত্যেকে আত্মস্বাতন্ত্র্য সহ নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পরে যেরূপ আকৃতি ভেদ, গুণ ভেদও তদনুরূপ। কোন প্রদেশ একেবারে উর্ব্বরতা-গুণ-বিশিষ্ট, শস্য প্রচুর, ফল রস জলে পরিপূর্ণ। আবার কোন প্রদেশ একেবারে সে সকল বিষয়ে বঞ্চিত, জীবন ধারণের সমস্ত পদার্থের জন্যই অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া না থাকিলে চলে না। কোথাও নিবিড় বনভূমি, কোথাও কর্কর-পূর্ণ সমতল ক্ষেত্র, কোথাও বা অবিরল শস্য চূড় সকল বায়ু-হিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছে, এবং সর্ব্বত্রই উপল-খণ্ড-বর্দ্ধিত গিরি শ্রেণীতে এই সকল বিভক্ত করিতেছে। এই পর্ব্বত-শ্রেণী এবং বহু মুক্তি-বিশিষ্ট ক্ষেত্র সমূহে, গতায়াতের পক্ষে স্থলপথ দারুণতর কষ্টকর, এজন্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে স্থলপথ অপেক্ষা জল-পথই সুগম।

স্থল ভাগ ছাড়িয়া জলভাগের প্রতি নেত্রপাত কর। পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ সমুদ্রদেশ, ধীর, মৃদু, মন্থরগতি। গ্রীসের অভ্যন্তরে প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা এতদূর প্রবেশ করিয়াছে যে গ্রীস বহু প্রদেশে বিভক্ত হইলেও, কেবল আর্কেডিয়া ভিন্ন সকলেরই সমুদ্রতটে একটি না একটি বন্দর স্থাপিত ও তদ্দ্বারা সমুদ্রে গমনপক্ষে সুবিধার অভাব ছিল না। এই সমুদ্রের সর্ব্বত্র

দ্বীপ শ্রেণিতে এরূপ আকৃষ্ট যে তাহার জন্য সমুদ্রের অস্থি চর্ম্ম অবশেষ। ঐ সকল দ্বীপ অধিকাংশ পর্ব্বতময়, আবার কোনটি অতি উর্ব্বরা, কোনটি বা মধ্যম-প্রকৃতি, কিন্তু সকলেই রমণীয়-প্রকৃতি এবং বাসযোগ্য। ঐ সকল আয়তনে বৃহৎ নহে, আকৃতিতে ক্ষুদ্র এবং পরস্পর এত সন্নিকটে অবস্থান করে যে একটিতে উত্তীর্ণ হইয়া তাহা দেখিতে দেখিতে আর একটিতে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এইরূপে ইউরোপ খণ্ড গ্রীস হইতে নির্গত হইয়া অবলীলা ক্রমে অপর খণ্ড আশিয়ায় উপনীত হইতে পারা যায়। এবং এই গতায়াতের সুবিধা কল্পে অতি অনুকূল বাণিজ্য বায়ু হেলাসপণ্ট হইতে ক্রীট দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। গ্রীসের পূর্ব্ব উপকূলের অনুকূলতা বশতঃ জাহাজ ও নানা বিধ পোত রক্ষার্থে সুন্দর সুন্দর বন্দর সকল সংযুক্ত। পশ্চিম সমুদ্রও দ্বীপাবলী-সংযুক্ত, কিন্তু পূর্ব্ব সমুদ্রের ন্যায় নহে। পূর্ব্ব সমুদ্র অপেক্ষা ইহা আয়তনে বৃহৎ, স্বভাবও অপেক্ষাকৃত উগ্র। উপকূল ভাগ পূর্ব্ব উপকূলের ন্যায় অনুকূল নহে। ইহা উচ্চ এবং দুরারোহ পাহাড়ে আবৃত, সমস্ত উপকূল ভাগ ভ্রমণ করিলে কদাচিৎ একটি সুন্দর বন্দর পাওয়া যায়।

এক্ষণে গ্রীসের পার্শ্বস্থ দেশ সমূহের প্রতি নিরীক্ষণ কর। এই ক্ষুদ্র সমুদ্র অতিক্রম করিলে, একদিকে সুসভ্য ও বিক্রমশালী মিসর, এবং আফ্রিকার উত্তর উপকূলস্থ বল-সম্পন্ন অন্যান্য স্থান—অন্যদিকে সমুদ্র-প্রিয় ফিনিসীয় এবং আশিয়াস্থ অন্যান্য বলশালী প্রদেশনিচয়। অপর পার্শ্বে প্রবল পরাক্রান্ত ইতালী। গ্রীসের যে রূপ সমুদ্র-গতায়াতের সুবিধা, এসকল দেশের পক্ষেও তদ্রূপ। এবং গ্রীসে যে যে কারণে মনুষ্যকে অনুষ্য-পদবীতে স্থাপন করিতে পারে, এসকল দেশেও বিষয়-বিশেষের বৈচিত্র্য-সাধক কারণ-বিশেষের ক্ষীণতা বা পুষ্টতার প্রতি লক্ষ্য না করিলে, সেই সেই কারণের নিতান্ত ন্যূনতা ছিল না।

একজন ফরাসিস বিজ্ঞপ্রবর কহিয়াছিলেন যে তাঁহাকে যে কোন দেশের মানচিত্র প্রদান করিলে এবং তদ্দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যজাত ও পদার্থ-নিচয় কীর্ত্তন করিলে, তিনি বলিয়া দিতে পারেন যে এই দেশ-বাসীরা কিরূপ প্রকৃতির লোক হইয়া কিরূপ কার্য্যফল প্রসব করিবে এবং মানবীয় ইতিহাসের কোন পর্য্যায়ে অবস্থান এবং তাহাতে কিরূপ গণনায় আসিবে। একথা মিথ্যা নহে। পাঠক বলিতে পার গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের অধিবাসীবর্গ কিরূপ অবস্থা-সম্পন্ন হইবে?

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এরূপ স্বভাব বিশিষ্ট দেশের প্রদেশ সমূহ পরস্পর পরস্পর-সম্বন্ধে এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে যে, যেন কাহার সহিত কাহারও সংস্রব নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান এবং স্বতন্ত্র। প্রদেশ-দ্বয়ের মধ্যে দুর্গম ব্যবধানের অভাবে, উভয় প্রাদেশিক

অধিবাসীদিগের মধ্যে গতায়াত সুগম, এবং তাহা হইতে স্বতঃ উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে উভয়কে যেমন একসূত্রে বদ্ধ এবং এক-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ও এক-প্রকৃতি-যুক্ত হইয়া একজাতিত্বে পরিগণিত হয়; গ্রীসের প্রদেশ-পরম্পরায় ব্যবধান দুর্গমতা হেতু এক প্রদেশের অধিবাসীদিগের সহ অপর প্রদেশের অধিবাসীদিগের তদ্রূপ গতায়াতের সুগমতা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা এতদুভয়ের অভাব নিবন্ধন, প্রত্যেক প্রদেশ প্রথম কালে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর প্রদেশ সমূহ যেন সীমাবিশিষ্ট বিভিন্ন দেশস্বরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রাদেশিক এইরূপ স্বাতন্ত্র্য হইতে অধিবাসী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাবও পরিবর্দ্ধিত এবং প্রকৃষ্টরূপে অহঙ্কার বোধ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে এতদ্রূপ অহঙ্কার-বোধ ভাবী গৌরবের ভিত্তি স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের মধ্যে ভূমির উর্ব্বরতাগুণ সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন্ স্থানে আবশ্যকাধিক জীবনোপায় বস্তু সমূহ উৎপাদিত হইয়া থাকে, আবার কোথায় বহুশ্রমেও যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া দুষ্কর। অতএব কালে লোকবৃদ্ধি সহ লক্ষিত হইবে যে কোন কোন প্রদেশ বহু পরিবার-বৃদ্ধি সত্ত্বেও আহার-প্রাচুর্য্যে অত্যন্ত স্বচ্ছলতা-যুক্ত। আবার কোন কোন দেশকে হয়ত তদভাবে এককালে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত যে কোন বস্তু যাহা অপরের নিকট লোভনীয়, তদ্দ্বারা বিনিময় ও ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন ব্যতীত সকলের সমভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এ নিমিত্ত অন্যান্য দেশের সহ তুলনায়, প্রত্যেক প্রদেশ অধিবেশনের অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পরেই, পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। প্রদেশসমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ স্বতন্ত্র, তাহাতে এই বাণিজ্য-সূত্রে, দূরদর্শিতা, বিজ্ঞতা এবং লোক-চরিত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিদেশ বাণিজ্যের যে সকল আনুসঙ্গিক ফল; সেই সকল ফল লাভ হইয়া থাকে। ক্রমে লোক-বহুলতায় যখন বাণিজ্যের আধিক্য হয়, তখন এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে দুর্গম স্থলপথের ক্লেশ অনুভূত হইতে থাকে, এবং সেই অনুভব-শক্তি হইতে প্রতিকার স্বরূপ জলপথে গমনাগমন প্রবর্ত্তিত হয়, এবং এই প্রবর্ত্তন হইতে ক্রমে তদ্রূপ গমনাগমনের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এরূপ ক্রমাগত গতায়াত ও সংশ্রবে পরস্পরের মধ্যে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা উপস্থিত হইয়া, সকল প্রদেশের অধিবাসীরা অন্তরে অন্তরে স্বতন্ত্রতা-যুক্ত থাকিলেও, বাহ্যিকে এক-জাতিত্বের আকার ধারণ করে। একের রীতি নীতি অপর দ্বারা বিচালিত, একের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি অপর দ্বারা গৃহীত হয় বটে; কিন্তু তাহাতেও বহুকাল ধরিয়া অবলম্বিত

সুতরাং অন্তর্নিহিত স্বাতন্ত্র্য ভাবের অপং লোপ করিতে পারে না। এ নিমিত্ত বাহিরে একজাতি হইলেও ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতীয় বোধ-শক্তি বিরাজ করিতে থাকে।

বাণিজ্য দ্বারা এবম্ভূত আহার-স্বচ্ছন্দতা সাধিত হইলে, পরিমাণ অনুসারে ক্রমে লোকবৃদ্ধি হইয়া দেশের মধ্যে যখন স্থান-সঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হয়, তখন, উপনিবেশ স্থাপন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এরূপ উপনিবেশ স্থাপন পক্ষে ঘন সন্নিকটস্থ ঘন-সন্নিবিষ্ট দ্বীপাবলী এবং অপরাপর ভূখণ্ড যেরূপ অগ্রে মনোনীত হওয়ার সম্ভব সেরূপ অন্য স্থান নহে। এজন্য ক্রমে সেই সকল উপনিবেশিত এবং কালে তদ্রূপ উপনিবেশ সমূহের বিস্তার সাধন, এবং তজ্জন্য নূতন নূতন স্থান সকল মনোনীত হইয়া থাকে। এবং ইহা হইতে ক্রমে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তার এবং তজ্জনিত ধন-সঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে। যে সমুদ্র-যানের সুযোগে এই দেশ শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত হইবার কথা, ইহার প্রতিবেশীবর্গেরও তদ্রূপ সুবিধা, সুতরাং তাহাদেরও ইহাদের সঙ্গে একই সময়ে ধনসঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার কথা। অথবা যদি কোনপক্ষে কাহার ন্যূনতা হয় অথচ সে তাহার স্বাদ জ্ঞাত হইয়াছে, তাহাহইলে অপরের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। যেহেতু আপনার হীনতা দর্শনে অপরের অপরিমিত ধন দ্বারা আত্ম পরিপোষণ করার প্রবৃত্তি, পার্থিবসুখে বিমোহিত মানবের মনে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু একপক্ষে হীনতা না থাকিলেও তদ্রূপ মানবের মনে ঐ প্রবৃত্তির ক্রীড়া লক্ষিত হওয়ার অসম্ভাব নাই, অতএব প্রতিবেশীবর্গের নিকট হইতে সর্ব্বদা আক্রমণের সম্ভব। এমন অবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশ স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী হইলেও, এবং আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোন সূত্রে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকিলেও, বাহ্য শত্রুর বিপক্ষে প্রতিযোগিতায় এক এক প্রদেশ স্বতন্ত্রভাবে অসমর্থ হেতু, সকলে সংমিলিত হইয়া একযোগ হওয়া কর্ত্তব্য। এই একতা ক্ষণিক নহে, সর্ব্বদা আবশ্যক, সুতরাং তৎসাধন একমাত্র কথায় সুসম্পন্ন হয় না। অতএব একতা বন্ধনোপযোগী বস্তুর আবশ্যক, এ নিমিত্ত সর্ব্বজনীন কোনরূপ পর্ব্বোপলক্ষে জাতীয় সংমিলন আবশ্যক হয়। তথাপি প্রতিবেশীগণের বহ্বায়তন হেতু, ইহারা প্রতিযোগিতায় উদ্দেশে, একতা সত্ত্বেও সংখ্যায় সামান্য গণনায় আইসে। কিন্তু প্রতিবেশীরা যেরূপ পার্থিব-সুখ-সর্ব্বস্বতা হেতু দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী, ইহারাও তদ্রূপ পার্থিব-সুখ-সর্ব্বস্বতা হেতু আত্ম-ধন রক্ষণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এমন স্থলে সংখ্যার যেমন সামান্য, তাহার পরিপূরণার্থে এক মাত্র বীর কার্য্যে পারদর্শিতা এবং বীরত্বে খ্যাতি লাভ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বাতিরের শৈত্য গুণে অন্তরস্থ তাপ যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি যত

বৈদেশিক প্রতিবেশিরা ইহাদের উপর শত্রুতাচরণ করিবে, এবং তন্নিমিত্ত ইহারা যত বিদেশীয়দিগের উপর বিতৃষ্ণাযুক্ত হইবে, তত ইহাদের স্বদেশ-প্রিয়তা বৃদ্ধি, ধর্মের উপর মমতা এবং স্বদেশ-রক্ষণে বীরত্ব প্রতিভাসিত হইতে থাকিবে। মানবচিত্ত অনেক সময়ে বিস্মৃতি-যুক্ত হয়, আপন ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়বৎ থাকে, কিন্তু বিষয় বিশেষ অনুসারে কবির দ্বারা সেই সেই ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিলে সে জড়তা তিরোহিত হইয়া মানব সতেজ ও উৎসাহিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এবম্ভূত দেশ মধ্যে বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশ-হিতৈষিতা মনোমধ্যে উদয় করার যত আবশ্যক, তত অন্য বিষয়ে নহে। এজন্য এরূপ দেশের সাহিত্য কাব্যাদি বীরত্ব ও স্বদেশ-হিতৈষিতার জীবিত ভাবে পরিপূর্ণ হইবে। এবং এবম্ভূত দেশেই কেবল ইতিহাসের মূল্য অবধারিত ও তাহার উৎপত্তি সাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বগত বীরপুরুষের কীর্ত্তি কলাপে বিমোহিত হইয়া, চিরনেত্রপথে আদর্শ রূপে তাহাকে স্থাপিত করণের আকাঙ্ক্ষায় ভাস্কর্য্যের উৎপত্তি ও তাহার উৎকর্ষ সুসাধিত হয়।

বাহ্যজগৎ ইহাদিগের নিকট সামান্য বেশে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং প্রাকৃতিক অদ্ভুত কার্য্য কলাপের সঙ্কীর্ণতা হেতু, ইহাদের চিত্ত পারলৌকিক তত্ত্বে তাদৃশ আকর্ষিত হওয়ার সম্ভব নাই। এনিমিত্ত ইহাদের পরলোক বিভীষিকা-পূর্ণ এবং দেবতত্ত্ব অমানুষিক হইবার বিষয় নহে। এতদুভয়েরই ইহাদের নিকট মানবোচিত আকৃতি ধারণ করা সম্ভব। পরলোক ভীষণ হইতে ভীষণতর নহে, এবং দেবতারাও অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, বিকট সাজ, বিকট কাজ, বা বিকট মূর্ত্তি বিশিষ্ট নহে। সকলেই মানবের ন্যায় মানবীয় ক্রীড়াযুক্ত, তাহার সহিত মানবের সহানুভূতি জন্মিতে পারে এতদ্রূপ। পরলোক সামান্য বিভীষিকা-যুক্ত বলিয়া, মানব চিত্তকে, তাহা হইতে কিসে উদ্ধার হইবে, এরূপ আকুলতা-যুক্ত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম এরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া হাবুডুবু খাইতে হয় না। সুতরাং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বের উদ্ভাবনের অভাবে সাধারণ দেবতত্ত্বেই মানবচিত্ত সতত সন্তোষ-যুক্ত এবং তাহাতে ভয়-বিরহিত। এ ভয়ের অভাব এত যে মানব দেবতা হইতেও আত্ম-স্বতন্ত্রতা রক্ষণে অপরিমিত-যত্ন-শীল।

মানবচিত্ত পার্থিব বিষয়ে এরূপ সংলগ্ন হওয়াতে, তদ্বিষয়ক যে কোন বিষয়ে সম্যক্ হস্তক্ষেপে শিথিল-যত্ন হয় নাই। সুতরাং সকল বিষয়ের পরিরক্ষক রাজনীতিতে যে ইহারা সম্যক্ হস্তক্ষেপ করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? স্বতন্ত্রতা-প্রিয়তায় প্রত্যেক প্রদেশ এক এক রাজ্য, আবার কোন স্থানে এক প্রদেশের মধ্যেই চারি পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্য। এতদ্রূপ

ক্ষুদ্র রাজত্বের মধ্যে রাজা স্বল্পকাল মধ্যে সর্ব্ব সমক্ষে পরিচিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শিত হওয়াতে আত্ম-দেবত্ব রক্ষণে সমর্থ হয়েন না। এবং রাজনীতির বিস্তার-স্থান অল্পায়তন হওয়ায় প্রজামাত্রই তাহা আয়ত্ত করিয়া, তাহার দোষ গুণের বিচারে প্রবৃত্ত এবং আবশ্যক হইলে তাহার প্রতিকার করণে উদ্যত হয়। এ নিমিত্ত এখানে সর্ব্বদা রাজবিপ্লব এবং প্রজা-বিদ্রোহ হওয়ার সম্ভব। শাসন-প্রণালী এই কারণে কখন রাজতন্ত্র কখন বা তাহা ঘুচিয়া সাধারণতন্ত্র, আবার কখন বা সম্রান্ততন্ত্র ইত্যাদি রূপ যখন যাহা বলবতী, তখন সেই ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কখন বা আত্ম-কলহে দেশ রক্ত-ধারায় স্নাত হয়। কখন বা আবার রাজাপ্রজা-সংমিলনে দেশ মধ্যে সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে। এরূপ স্থানে প্রজা মাত্রেই অল্প বিস্তর রাজনীতি-বিশারদ, তন্মর্ম্মজ্ঞ, এবং তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে আস্থা যুক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্যকলাপ পরিশোধিত করিয়া থাকে।

গ্রীকদিগের অবস্থা অবিকল এইরূপ। ইহার প্রত্যেক প্রদেশ এক এক বিভিন্ন দেশ স্বরূপ, এবং প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী এক এক বিভিন্ন জাতি স্বরূপ। কেহ কাহার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত নহে। ভারতীয়দের অবস্থা তদ্রূপ নহে। প্রদেশ গুলারা সর্ব্বত্র গতায়াত-সুলভ, এবং ঘনিষ্ঠতা-যুক্ত। এই ঘনিষ্ঠতা দস্যুবর্গের ভয়ে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতে যেরূপ আদিম অধিবাসী দৈত্যবর্গের দ্বারা আর্য্যগণ উত্যক্ত হইয়াছিলেন, গ্রীসেও তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যবর্গ না ছিল এমন নহে। কিন্তু গ্রীস যেমন সঙ্কীর্ণায়তন তাহারাও তেমনি সঙ্কীর্ণ-সংখ্যক, সুতরাং গ্রীকেরা অতি অল্প শ্রমেই তাহাদের বল চূর্ণ করিয়া পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় দৈত্যেরা সংখ্যায় সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বালুকারাশির ন্যায়, আর্য্যেরা কিয়দংশের বল চূর্ণ করিয়া পদানত করিয়াছিলেন বটে, তথাপি অবশিষ্ট এত ছিল যে তাঁহাদের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিতে হইত। এই আত্ম-রক্ষার প্রয়োজন হেতু যিনি যেখানে অবস্থিতি করুন না কেন, সকলেই এক-তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এই সূত্র আমূল পরিচালিত বলিয়া, হিন্দু সন্তান মাত্রেই কি ভিতরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকারে প্রথম কালে একজাতি ছিলেন। গ্রীকেরা তদ্বিপরীতে প্রথম কালে প্রদেশ ভেদে সম্পূর্ণই বিভিন্ন জাতি স্বরূপ ছিল। আবার গ্রীকেরা যখন একজাতিত্ব রূপ আকার ধারণ করিল, তখনও চির-প্রবুদ্ধ স্বাতন্ত্র্য ভাব অন্তরে অন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল। তখন ভারতীয়েরা বংশ-বাহুল্যতায় যদিও বিভিন্ন প্রদেশে অধিবেশন ও বিভিন্ন রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক যেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন, তথাপি চির-প্রবুদ্ধ একতা ভাব তাঁহাদের হৃদয় হইতে অপ-

লোপ হইল না। এই নিমিত্ত গ্রীকদিগের যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাব ভাবী গৌরবের সোপান স্বরূপ, ভারতীয়েরা সে স্বাতন্ত্র্য ভাব প্রাপ্ত হইলেন না, এবং অহঙ্কার বোধেও অতি হীনতা প্রাপ্ত হইলেন, যেহেতু এতদ্বোধের প্রথম সাধকতা বাহ্য জগতের নিকট আত্ম-খর্ব্বতা জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাবের অভাব। একতার আবশ্যক প্রধানতঃ বাহ্য শত্রুর বিপক্ষে এবং স্বাধীনতা রক্ষণে; একতার আবশ্যক উপযোগী কার্য্য-কাল সর্ব্ব সময়ে নহে, সুতরাং যদি আর সমস্ত কার্য্যকরী গুণের অসম্পূর্ণতা না থাকে, তবে প্রদেশ-পরম্পরায় মিত্ররাজ্য রূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই একতার উদ্দেশ্য স্থাপিত হইতে পারে। অতএব এতদুভয় ভাবের স্ব স্ব সম্বন্ধীয় ইষ্টানিষ্টের বিষয় দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অন্তরস্থ একতার অভাব গ্রীকদিগের মধ্যে তত অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে নাই, যত ভারতীয়দের মধ্যে লৌকিক মহত্ত্বের ভিত্তি স্বরূপ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাব ও অহঙ্কার বোধের অভাবে অনিষ্ট উৎপাদন করিয়াছে।

গ্রীসের ভূমি উর্ব্বরতা গুণে সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে আবশ্যকীয় জীবনোপায় বস্তু সমূহ অপরিমিত ভাবে উৎপন্ন হয়, কোথাও বা তাহা একেবারে নগণ্য। যে সকল ভূমি খণ্ড উর্ব্বরতা-গুণ-বিশিষ্ট, তাহা যদি ভারতবর্ষীয় ভূ-খণ্ডের সহিত তুলনায় আনা যায়, তাহা হইলে গ্রীসের উর্ব্বরতা গুণকে অনুর্ব্বরতার মধ্যে গণ্য করিতে হয়। এজন্য ভূমির উর্ব্বরতা গুণ উপলব্ধ করিতে গ্রীকদিগকে বহু বুদ্ধি ও বহু পরিশ্রম ব্যয় ও বহুকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই বহু বুদ্ধি ও বহু পরিশ্রম ব্যয় হেতু, তদুভয়ের অভাব-বিশিষ্ট ভারতীয়দের অপেক্ষা গ্রীকদিগের উদ্ভাবনী শক্তি ও শ্রমসহিষ্ণুতা দৃঢ়তা-প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং বহুকাল অতিবাহিত করিবার ফলে ভারতীয়দিগের অপেক্ষা গ্রীকদিগের সভ্যতা বহুকাল পরে উদিত ও বর্দ্ধিত হয়। সে যাহা হউক, ভূমির এই নিকৃষ্ট উর্ব্বরতা হইতে ফল লাভের উপযুক্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং তজ্জনিত যে দর্শন ও দৃঢ়তা লাভ, এ সকল পূর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, যদি একেবারে সমগ্র দেশাধিবেশন ও দেশ-মধ্যস্থ সমগ্র উর্ব্বর ভূমি খণ্ডের সমসাময়িক ফল-প্রসবিতা গণনায় আনিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে লক্ষিত হইবে যে কোন প্রাদেশিক লোক আহার-প্রাচুর্য্যে সচ্ছলতা-যুক্ত, আবার কোন প্রাদেশিক লোককে আহার অভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। আবার দেখিতে হইবে যে শীত-প্রধান দেশের আহার গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ন্যায় সামান্য নহে, উহা গুরুতর ও শ্রম সাধ্য। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত লোভনীয় যে কোন বস্তুর সহ বিনিময় ও বাণিজ্য ব্যতীত একের আহার-বিষয়ক অভাব, অপরের তদতিরিক্ত অপরাপর আবশ্যকীয় বস্তুর

অভাব, এতদুভয় অভাব নিবারণ না হওয়ায়, সকলের সমভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত মানবীয় স্বভাবে ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণের বাঞ্ছার প্রথম উদ্রেকেই, এবং সভ্যতা-সূর্য্যের উদয় কালেই বলিতে হইবে, যে গ্রীকেরা প্রদেশ-পরম্পরায় বিনিময় ও বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এবং এই সকল প্রদেশ পরস্পরের মধ্যে আদিম কালে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন থাকায়, এই বাণিজ্য তৎকালে বিদেশ-বাণিজ্যের আকার ধারণ করিয়াছিল, পরন্তু ইহাতে বলিতে হইবে যে বিদেশ-বাণিজ্য হইতে আত্মোন্নতি কল্পে যে যে ফল লাভ হইয়া থাকে, এই সূত্রে গ্রীকেরা তাহাতেও কথঞ্চিৎ পারগতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এস্থলে যদি ভারতীয়দের সহিত তুলনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে এরূপ কারণ হেতু তাহাদের প্রথম অবস্থায় বাণিজ্য বিনিময়ে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইতে হয় নাই। যখন কাল সহকারে বিলাসের বৃদ্ধি হইয়াছিল তখনই প্রদেশ পরম্পরায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আবার এখানে প্রদেশ-সমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা-যুক্ত, তাহাতে এবম্ভূত বাণিজ্য কখনই বৈদেশিক বাণিজ্যের আকার ধারণ করে নাই। ভারতীয়েরা কখন স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বাণিজ্য করিতেন কি না, এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে অন্ততঃ কারণ হেতু প্রথম কালে কখনই নহে। পরবর্ত্তী সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদেশের দ্রব্য ভারতে আনীত এবং ভারতের দ্রব্য বিদেশে নীত হইতেছে। কিন্তু ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে প্রতীয়মান হইবে, যে এরূপ বিনিময় ভারতীয়েরা বিদেশে গমন পূর্ব্বক সমাধা করিতেন না, বিদেশীয়েরাই তাঁহাদের দেশে আগমন পূর্ব্বক সমাধা করিতেন।

যে সূত্রে গ্রীকদিগের প্রথম বাণিজ্যের উদ্ভব, তাহাতে মূল হইতেই তাহার বিস্তৃত আকার ধারণ করা সম্ভব, এবং লোক বৃদ্ধি সহ যে তাহা আরও বিস্তার-যুক্ত হইবে তাহাতে কথা কি আছে। এই বাণিজ্য নৈমিত্তিক ব্যাপার স্বরূপ, সুতরাং গ্রীসের ন্যায় দুর্গম স্থলপথে ইহা সমাধা করা ক্রমে অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠে; আবার অন্যদিকে সুগম সমুদ্র সর্ব্বদা প্রলোভিত করিয়া থাকে। একদিকে ক্লেশ, অন্যদিকে সুবিধা যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে মানবচিত্তের উদ্ভাবনী শক্তি সুবিধাকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনে তেজস্বিনী হইয়া থাকে। কাযেই বাণিজ্য প্রবর্ত্তনার অল্পকাল পরেই গ্রীকদিগের মধ্যে সমুদ্র গমনাগমনের আরম্ভ হয়, এই নিমিত্ত প্রাচীনকালের অতি দূরতর সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে গ্রীকেরা সমুদ্র গমনাগমন পক্ষে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীতে যদিও সমুদ্র যাত্রার দুই একটি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা যে গ্রীক দিগের ন্যায়

পুষ্টতা-সম্পন্ন তাহা কখনই নহে। গ্রীকেরাই যে অতি প্রাচীন কালে সমুদ্র-যাত্রা পক্ষে অতিশয় দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছিল তাহা নহে। হোমারের সময়ে দেখা যায় যে জাহাজের আকৃতি অতি সামান্য ছিল, এবং সন্নিকট দ্বীপ ও উপকূল ভাগ মাত্রে যাতায়াত ছিল, কৃষ্ণসাগরের পার্শ্বস্থ স্থান সমূহ পরিজ্ঞাত ছিল না, এবং মিসরের জনপ্রকৃতির ন্যায় পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু যে কোন বিষয়ের নিয়ত ব্যবহারে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়। গ্রীসে তন্নিমিত্ত অচির কালমধ্যে সমুদ্র যাত্রার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল আর ভারতে তদভাবে, তাহাদের যে কিছু সমুদ্র যাত্রার প্রবর্ত্তনা ছিল, তাহা হীন ভাবেই বর্ত্তমান ছিল, কালে অতি অল্পই উৎকর্ষ সাধিত হয়। আবার লক্ষিত হইবে যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে কেবল গ্রীকেরাই যে আত্মদেশমধ্যে আপনাপনি লিপ্ত থাকিত এরূপ নহে, ইহাদের প্রতিবেশী ফিনিসীয় প্রভৃতি জাতিরাও অতি প্রাচীন কালে সমুদ্র যাত্রায় প্রবৃত্ত হওয়ায়, গ্রীসে আসিয়া সদা সর্ব্বদা বাণিজ্য করিত; ইহাদের নিকট হইতেও গ্রীকেরা পোত চালনার উৎকৃষ্ট কৌশল সকল অধিক প্রকারে শিক্ষা করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অস্ত্র চালন ও পার্থিব চতুরতা শিক্ষাও এ সূত্রে নিতান্ত অল্প হয় নাই। কারণ ইয়ো, মিডিয়া প্রভৃতির হরণ ও তদানুসঙ্গিক ঘটনাবলী তৎপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতের আদিম কালে দেশ মধ্যে এরূপ বৈদেশিক আগমন একেবারে ছিল না বলিতে হইবে।

ক্রমে লোক বৃদ্ধি সহকারে দেশ মধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে, ভারতীয়েরা যেমন ব্রহ্মর্ষি হইতে ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে মধ্যদেশ, ক্রমে সমগ্র উত্তর দেশ, পরে দক্ষিণাবর্ত্তে জনস্থান স্থাপন পূর্ব্বক উপনিবেশ করিয়াছিলেন; গ্রীকেরাও তদ্রূপ দেশ মধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে ক্রমে ক্রমে সন্নিকটস্থ দ্বীপাবলী—তাহাতেও সঙ্কুলান না হইলে আসিয়া মাইনর প্রভৃতি দূরতর স্থানে উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হয়েন। গ্রীকেরা যখন এইরূপ ছড়াইয়া বিভিন্ন দেশগত হইলেন এবং প্রতিবেশীবর্গ যখন প্রবল হইয়া পরধন লাভে আত্মোন্নতি করিবার অভিপ্রায়ে ইহাদের উপর শত্রুতা-সাধন করিতে লাগিলেন, তখন সাধারণ শত্রুর প্রতিযোগিতায় সকলকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। এইরূপ একতা বন্ধনের নিমিত্তই অলিম্পিক, ইস্থমিয়ান প্রভৃতি পর্ব্বের সৃষ্টি। এবং শত্রুর অপেক্ষা অল্প সংখ্যক হওয়ায়, সামর্থ্যে তাহাদের প্রতিযোগিতার নিমিত্ত ঐ ঐ পর্ব্বে শরীর-পরিচালক ও বলবিধায়ক ক্রীড়া কৌতুকের প্রাধান্য। এই নিমিত্তই সর্ব্বত্র বলের অর্চ্চনা, সর্ব্বত্রই সামাজিক নিয়মাবলীর মধ্যে তৎপ্রতিপোষক নিয়মাবলীর প্রাধান্য। এই নিমিত্ত স্পার্টা নগরে লাইকর্গসের ভয়ঙ্কর নিয়মাবলী—যাহা বল-বৃদ্ধির অনুরোধে

মানবীয় প্রাকৃতিক বৃত্তি নিচয়কেও ধ্বংস করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং যাহার প্রভাব এতদূর, যে সমাজে বল বৃদ্ধি হইবে বলিয়া স্বামী আপন স্ত্রীকে আত্মাপেক্ষা বলিষ্ঠ পুরুষের সহবাস করিতেও অক্লিষ্ট মনে উপদেশ প্রদান করিয়াছে। এই বলের উত্তেজনা হেতু হোমারের চিরনূতন-ত্বময়ী মহাকাব্য—এবং ইহারই পরিপোষক রূপে টির্টিয়স প্রভৃতি কবিগণের গীতি-কাব্যের উৎপত্তি। আবার এই বলের প্রভাবে, এবং বহিঃ শত্রুর উত্তেজনায় বর্দ্ধিত স্বদেশ-প্রিয়তার মোহিনী শক্তির মোহে সালামিস, থার্ম্মপিলি প্রভৃতি তীর্থ-নিচয় গ্রীকদিগের বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশ-প্রিয়তার চির সাক্ষ্য স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রীকেরা এই সুন্দর বল ও সাহস অনেক সময়ে স্বজাতীয় রক্তপাতে অপ-ব্যয়িত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু প্রদেশ-পরম্পরায় অন্তরে অন্তরে স্বাতন্ত্র্য ভাব, এবং আপনাপিনির মধ্যে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি-সম্বন্ধে কেহ কাহার নিকট ন্যূনতা এবং বাধ্য বাধকতা স্বীকার না করা—এ অপব্যয়ের মূলীভূত কারণ।

যাহা হউক এক্ষণে ভারতীয়দের স-হিত তুলনে সাধারণ গ্রীক চরিত্র যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ ও উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্যের পর্য্যালোচনা করা যাউক।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তড়িতের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তড়িৎ ও বিদ্যুতের একতা প্রতিপাদন। ফ্রাঙ্কলিন কর্ত্তৃক তড়িদাক্রান্ত পদার্থের সহিত বিন্দুনিচয়—Points—বা সূক্ষ্মাগ্রের সম্বন্ধ নির্ণয়। তড়িদাক্রান্ত মেঘ-বিষয়ক পরীক্ষার প্রস্তাবনা। ফ্রান্সে মেঘ হইতে প্রথম তড়িতাকর্ষণ। ফ্রাঙ্কলিনের তড়িদাকর্ষক ঘুড়ী। বিদ্যুদ্দণ্ডের (Lightuing Conductor) আবিষ্ক্রিয়া। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ভয়ানক পরীক্ষা। অধ্যাপক রিচমানের (Professor Richman) মৃত্যু। বায়বীয় তড়িতের (Atmospheric electricity) উপর ব্যাকেরিয়ার (Baccaria) পরীক্ষা। তড়িৎ-সংক্রামণের (Eletrical Induction) আবিষ্ক্রিয়া। কাচজ ও লাক্ষাজ তড়িৎ-মতদ্বয় (Vitreous and Resinous theory of electricity) পুনরুদ্দীপন। তড়িৎ-বলের পরিমাণ ফল। টরসন তুলামান যন্ত্র (Torsion Balance) এবং ইলেকট্রোফোরসের (Electrŏphorus)—আবিষ্ক্রিয়া। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ পর্য্যন্ত তড়িৎ-বিজ্ঞানের উন্নতি।

ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাড়িত তরলের অগ্ন্যুদ্যম ও আস্ফোটনের সহিত বিদ্যুৎ ও বজ্রের সাদৃশ্য দর্শনে কতিপয় পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিক তড়িৎ ও বিদ্যুৎকে একই বলিয়া অনুমান করেন। এবিষয় সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়ালের মত যে সময়ে প্রচারিত হয়, তখন তড়িৎ-তত্ত্বের অতি অল্প মাত্র সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এবং তৎ সমস্তের গুঢ় নিয়মাদিও স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তৎপরে উত্তরোত্তর পরীক্ষা দ্বারা, বিশেষতঃ লিডেন বোতলের আবিষ্কারের পর, তড়িৎ দৃশ্য সকলের আরও উন্নতি হওয়ায় অনেকানেক পরীক্ষক (Experimenters) উক্ত বোতলের সাহায্যে সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ ও বজ্রের অনুকরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আবে নলে (Abbe Nollet) তাঁহার লিকন ডি ফিজিক (Lecons de Physique) নামক গ্রন্থে এই রূপ মত ব্যক্ত করেন; "তাড়িত তরলের সর্ব্বব্যাপিত্ব, তাহার ক্ষণস্থায়িত্ব, দাহিকা-শক্তি ও আস্ফোটন প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ লিডেন বোতলের পরীক্ষায় উত্তম রূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতেছে, তদ্দর্শনে আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে প্রকৃতি দেবীর হস্তে যেমন বজ্র, তদ্রূপ আমাদিগের হস্তে তড়িৎ। তড়িৎ-পরীক্ষা দ্বারা আমরা যে সমস্ত বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছি তৎসমুদয় কেবল ভীষণ বজ্রের সামান্যতঃ অনুকরণ মাত্র। উভয়েরই গুঢ় কারণ এবং প্রকৃতি একই রূপ। বায়ু, তেজ, এবং বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সহযোগে বোধ হয় মেঘ তড়িদাক্রান্ত হইয়া পার্থিব কোন তড়িদনাক্রান্ত পদার্থের নিকটবর্ত্তী হইলে বিদ্যুৎ ও বজ্রের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।"

কিন্তু তড়িৎ ও বিদ্যুতের একতা প্রতিপাদন জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় উদ্ভাবনে ফ্রাঙ্কলিনের পূর্ব্বে কেহই কৃত কার্য্য হয়েন নাই। ফ্রাঙ্কলিন্ প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘ হইতে তড়িদাকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরীক্ষার কল্পনা তিনি তাঁহার বন্ধু হপ্‌কিন্‌সনের একটী নিষ্ফল পরীক্ষা হইতে প্রাপ্ত হন। তাঁহার উক্ত বন্ধু কোন সময়ে একটি লৌহ বর্ত্তুলকে তড়িদাক্রান্ত করেন, ও বর্ত্তুলস্থ তড়িৎ সমগ্র এককালীন বৃহত্তর অগ্নিশিখা রূপে নিষ্ক্রামণ করণাভিপ্রায়ে উক্ত বর্ত্তুল-গাত্রে একটি সূক্ষ্মাগ্র সূচি বিদ্ধ করিয়া রাখেন। কিন্তু তাঁহার আশার বিপরীত ফল প্রাপ্তে তিনি বিস্ময়াপন্ন হয়েন, অর্থাৎ তদুপায় দ্বারা অধিকতর স্ফুলিঙ্গ প্রকাশমান না হইয়া বরং সূচ্যগ্র দ্বারা বর্ত্তুলস্থ তড়িৎ রাশি ত্বরায় বিকীর্ণ হইয়া যায়। তিনি এই পরীক্ষার সবিশেষ বিবরণ ফ্রাঙ্কলিনের নিকট ব্যক্ত করেন। ফ্রাঙ্কলিন তৎসংবাদ প্রাপ্তে তৎকারণানুসন্ধানে এবং সূচ্যগ্রের তড়িদাকর্ষণ করিবার ক্ষমতা নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হয়েন। এবং স্বয়ং উক্ত পরীক্ষা পুনঃ সংসাধন দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলেন, কেবল

যে তড়িদাক্রান্ত, বর্ত্তুল-গাত্র-বিদ্ধ স্থচি তড়িৎকে স্ববায় বিসৃত করে এমত নহে, অধিকন্তু ঐ বর্ত্তুল গাত্র হইতে স্থচি স্থানান্তরিত করিয়া বর্ত্তুলকে তড়িৎ-পূর্ণ করত তাহার নিকটে ভূ সংস্পৃষ্ট কোন ধাতব দণ্ডের সূক্ষ্মাগ্র ধারণ করিলে তদ্দ্বারা বর্ত্তুলস্থ তড়িৎ অতি শীঘ্র এবং অলক্ষিত ভাবে পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইয়া যায়।

তড়িৎ-সম্বন্ধে বিন্দু বা সূক্ষ্মাগ্রেব উক্ত ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া ফ্রাঙ্কলিন্ অনেক আন্দোলনের পর অনুমান দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন, যে মেঘ হইতে ঐ রূপ সূক্ষ্মাগ্র কোন ধাতব দণ্ড দ্বারা তড়িৎ রাশি নিঃশব্দে ও নিরাপদে আকর্ষণ করা যাইতে পারে। দণ্ডের সূক্ষ্মাগ্র মেঘের নিকটবর্ত্তী রাখা উচিত। কিন্তু সুদীর্ঘ ধাতব দণ্ড ব্যয়সাধ্য বিধায় তিনি কল্পনা করিলেন যে কোন অত্যুচ্চ প্রাসাদ বা স্তম্ভোপরি উক্ত দণ্ড স্থাপন দ্বারা ও কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। সেই সময়ে ফিলাডেল্‌ফিয়াতে একটি অত্যুচ্চ মন্দিব গঠিত হইতেছিল। তিনি তাহার সমাধা অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার পরীক্ষার ফল সমূহ তিনি প্রচার করিলেন, এবং তৎসঙ্গে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, যাঁহাব সুবিধা হইবে তিনি যেন উক্ত পরীক্ষার অনুষ্ঠান করেন।

চার্‌ল্‌ষ্টন নিবাসী ডাক্তার লাইনিং এর (Dr Lining) এক পত্রের প্রত্যুত্তরে ফ্রাঙ্ক্‌লিন নিম্নলিখিত মর্ম্মে তাঁহার এই মহতী আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে এক পত্র লিখেনঃ-"তড়িৎ ও বিদ্যুতের সমতা সপ্রমাণ জন্য মেঘ হইতে তড়িৎ আকর্ষণের পরীক্ষা অবলম্বনের কল্পনা প্রথমতঃ আমার মনে কি রূপে উদয় হয়, আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে আমার তড়িৎ-তত্ত্বের স্মৃতিকা (Memorandums) হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া পাঠাই। তদ্দর্শনে মহাশয়ের উপলব্ধি হইবে যে উক্ত কল্পনা দূব-পরাহত নহে।"যে কোন তড়িৎবৈজ্ঞানিকের মনে উহা স্বতই উদয় হইতে পারে; নবেম্বব ৭, ১৭৪৯—নিম্নলিখিত কয়েক বিষয়ে তড়িৎ ও বিদ্যুৎকে সমতুল্য বলিয়া বোধ হয়ঃ (১) উভয়েরই দীপিকা শক্তি, (২) বক্র গতি, (৩) দ্রুত বেগ, (৪) আস্ফোটন (৫) জল ও বরফ মধ্যে স্থায়িত্ব, (৬) উভয়ই জীব-নাশক, (৭). ধাতু-দ্রব কারী, (৮). দাহ্য পদার্থ-প্রজ্বলনকারী, (৯). গন্ধকীয় ঘ্রাণ-যুক্ত, এবং ধাতু দ্বারা পরিচালিত হয় (১০) উভয়ের আলোকের বর্ণ একই, (১১). এবং উভয়ই তাহাদের বিসরণে বাধা-সম্পাদক পদার্থ মাত্রকে ছিন্ন ভিন্ন কবিয়া ফেলে। তড়িৎ সূক্ষ্মাগ্র দ্বারা আকর্ষিত হয়। এই গুণটি বিদ্যুতে অবস্থিত কি না, তাহা আমরা অদ্যাপি অবগত হই নাই। কিন্তু আমরা যত প্রকারে পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি তৎ সমস্ত স্থলে যখন উভয়েই এক পদার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন শেষোক্ত বিষয়ে সম্ভবতঃ তাহারা সমতুল্য হইবে।

পরীক্ষা দ্বারা ইহাই "এক্ষণে সপ্রমাণ করিতে হইবে।"

ফ্রাঙ্কলিনের পূর্ব্বোক্ত মতের উপর নির্ভর করিয়া এম ডালিবার্ড (M. Dalibard) ও এম ডেলর (Delor)—নামক ফরাসীদ্বয়, মেঘ হইতে তড়িদাকর্ষণ করণাভিপ্রায়ে দুইটি স্বতন্ত্র স্থানে দুই পৃথক যন্ত্র স্থাপন করেন। ডালিবার্ড ফ্রান্স হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে মার্লি লাভিল নামক এক গ্রাম মধ্যে ৭০ ফীট দীর্ঘ এক সূচ্যগ্র লৌহ দণ্ড স্থাপন করেন। এই দণ্ডই সর্ব্ব প্রথম মেঘ হইতে তড়িদাকর্ষণ করে। সেই সময়ে ডালিবার্ড মার্লি হইতে কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করেন। এবং ঐ দণ্ডের তত্ত্বাবধারণের ভার কইফর (Coiffer) নামক তত্রস্থ জনৈক সূত্রধরের উপর অর্পণ করিয়া যান। ১০, মে ১৭৫২ খৃঃ অঃ দিবা ২।৩. টার মধ্যে এক বজ্রধ্বনি শুনিয়া কইফর দ্রুত বেগে দণ্ডের নিকট উপস্থিত হন। এবং ডালিবার্ডের উপদেশানুসারে একটি লিডেন বোতল দণ্ডের সন্নিকট ধারণ করিবা মাত্র এক উজ্জ্বল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ তীব্র শব্দের সহিত দণ্ড হইতে বোতল মধ্যে প্রবিষ্ট হইল দেখিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার উক্ত রূপে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রতিবেশিগণকে তথায় আহ্বান করিলেন। এবং সেই গ্রামের যাজককে তৎসংবাদ প্রেরণ করিলেন। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র যাজক তথায় যাত্রা করিলেন। গ্রামস্থ অনেকেই কইফরকে বজ্রাহত দেখিবে প্রত্যাশা করিয়া প্রবল বাত্যা ও বৃষ্টি সত্বে ও যাজকের পশ্চাৎগমন করিল। যাজক তথায় উপস্থিত হইয়া কইফরের ন্যায় কয়েক বার স্ফুলিঙ্গ গ্রহণে কৃতকার্য্য হয়েন। এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার এক সবিশেষ বিবরণ লিপি বদ্ধ করিয়া ডালিবর্ডকে প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি লিখেন যে, "স্ফুলিঙ্গ সমূহ নীলবর্ণ, দেড় ইঞ্চ দীর্ঘ, এবং গন্ধকীয় গন্ধ বিশিষ্ট, ৪ মিনিটের মধ্যে ৬ বার তিনি স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করেন। এবং তৎপরীক্ষাকালীন তিনি বাহুতে একটি তীব্র আঘাত প্রাপ্ত হন, ও তথায় এক স্থানে প্রবলতর মুষ্টাঘাতের কালীমা চিহ্ন রহিয়া যায়।"

এবম্বিধ প্রকারে মার্লিতে প্রথমতঃ তড়িৎ ও বিদ্যুতের প্রকৃতি-গত একতা সপ্রমাণ হইলে তাহার ৮ দিবস পরে ডেলার পারিস মধ্যে ৯০ ফীট উচ্চ যে দণ্ড স্থাপন করেন, তাহাতে তিনিও পূর্ব্বোক্ত রূপ স্ফুলিঙ্গ গ্রহণে কৃতকার্য্য হয়েন। উক্ত পরীক্ষা ফরাসী রাজ এবং অনেকানেক সম্ভ্রান্ত সদস্য সমক্ষে প্রদর্শিত হয়। এদিকে ফ্রাঙ্কলিন্ এই সময়ে ফিলাডেলফিয়াতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবিত পরীক্ষা যে ইতিমধ্যে ফ্রান্সে এই রূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইল, তদ্বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। বিদ্যুৎ ও তড়িৎ উভয়ই যে এক প্রকৃতি এবং এক পদার্থ ইহা ক্রমে

তাঁহার মনে এরূপ বদ্ধমূল হইল যে তিনি ফিলাডেলফিয়ার পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দির সমাধা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া উপায়ান্তর দ্বারা তদ্বিষয় পরীক্ষা-সিদ্ধ করিতে অধীর হইয়া পড়িলেন। এবং অনেক আন্দোলনের পর স্থির করিলেন যে বালকের সামান্য ঘুড়ী দ্বারা বৈদ্যুতীয় মেঘের ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে এক প্রকার তাড়িত-সংযোগ স্থাপন করা যাইতে পারে। মার্লিতে পরীক্ষার এক মাস পরে ১৭৫২ খৃঃ অঃ জুন মাসে এক দিবস তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন। পরীক্ষা নিষ্ফল হইলে অপদস্থ ও হাস্যাস্পদ হইবার আশঙ্কায় তিনি তাঁহার পুত্রকে এক খানি ঘুড়ির সহিত সঙ্গে লইয়া, যেন তাহারই সাহায্যার্থে, গ্রাম-প্রান্তস্থ একটী নির্জ্জন মাঠে গমন করেন। ঐ ঘুড়ী খানি সামান্য ঘুড়ী হইতে এই প্রভেদ ছিল যে, বৃষ্টি দ্বারা কোন হানির সম্ভাবনা নিরাকরণ জন্য কাগজের পরিবর্ত্তে রেশমি রুমাল দ্বারা উহা নির্ম্মিত হয়। এবং তাহার শিরোদেশে একটী সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র ধাতব তার সংলগ্ন থাকে তাহাতে সামান্য সূতা বিনা কোন পরিচালক পদার্থ ছিল না। সূতার অপর প্রান্তে একটী চাবি বাঁধিয়া দেন ও ভূপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্নাবস্থায় রাখিবার জন্য উহাকে এক গাছি রেসমের সূতা দ্বারা এক বৃক্ষ-শাখায় বাঁধিয়া রাখেন। এই রূপে ঘুড়ী খানি উড়াইয়া তিনি অনেক ক্ষণ আগ্রহাতিশয়ের সহিত তৎফল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। এক খানি গাঢ় মেঘ ঘুড়ীর উপর দিয়া প্রধারিত হইতে দেখিলেন। কিন্তু তড়িতের কোন লক্ষণ না দেখিয়া তাঁহার আশা ভঙ্গ হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে সামান্য বৃষ্টি পড়িয়া সূতা সিক্ত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে পরিচালক হইল। তখন হঠাৎ দেখিলেন যে সূতার কতকগুলি সূক্ষ্মাংশ খাড়া হইয়া পরস্পর পৃথক হইয়া দাঁড়াইল। তড়িৎযন্ত্র দ্বারা তড়িদাক্রান্ত হইলে সূতা উক্ত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। তদ্দর্শনে তিনি চাবির নিকটে নখ ধারণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটী স্ফুলিঙ্গ ও সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিলনা। কিয়ৎক্ষণ পরে ঘুড়ীর সমস্ত সূতা বৃষ্টিতে উত্তম রূপ সিক্ত হইয়া অধিকতর পরিচালক হইয়া দাঁড়াইল। তখন তিনি বহু সংখ্যক স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করিলেন। এমন কি তদ্দ্বারা একটী লিডেন বোতল সম্পূর্ণ রূপে তড়িৎপূর্ণ করিয়া লন। এই মহতী পরীক্ষা সংসাধনানন্তর তাঁহার পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহেন,—"বাপু! এই মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু হইলেও আমি যে জগতে চিরযশ স্থাপন করিয়া যাইব তাহার আর সন্দেহ নাই।"

তদনন্তর ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন্ নিজ প্রাসাদোপরি এক সুদীর্ঘ লৌহ দণ্ড স্থাপন করেন। তাহার মূল দেশ তাঁহার পাঠগৃহ মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে। তড়িৎযন্ত্র যোগে যত প্রকার পরীক্ষা হইতে পারে

তৎসমস্তই তিনি বিদ্যুৎ হইতে ঐ দণ্ড দ্বারা সংসাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং তড়িৎ ও বিদ্যুৎ যে একই পদার্থ তাহা তিনি নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ করিলেন। উক্ত দণ্ড দ্বারা তিনি বিবিধ পরীক্ষা করেন। যখন দণ্ড দ্বারা তড়িদাকর্ষিত হইত তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য তিনি কএকটী সামান্য ঘণ্টা শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক দণ্ড সংলগ্ন করিয়া রাখেন। দণ্ড তড়িদাক্রান্ত হইলে ঘণ্টাগুলি তড়িদাকর্ষণ ও বিক্ষেপণ ধর্ম্মে স্বতই ধ্বনিত হইয়া উঠিত। তচ্ছ্রবণে তিনি ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিতেন। কখন কখন তাহার ধ্বনি এত প্রবল হইত যে তাহা সমস্ত বাটী মধ্যে শ্রুত হইত।

এই মহতী আবিষ্ক্রিয়ার পর ফ্রাঙ্কলিন বজ্রাঘাত হইতে বাটী সংরক্ষণ হেতু ধাতব দণ্ড ব্যবহার করেন। মানব হিতার্থে তড়িতের এই প্রথম নিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অনুমান করিলেন যে বিন্দু বা সূক্ষ্মাগ্রের যখন তড়িদাকর্ষণ করিবার এরূপ ক্ষমতা সপ্রমাণ হইল, তখন কোন সূচ্যগ্র ধাতবদণ্ড যদ্যপি বাটীর পার্শ্বে এরূপে সংলগ্ন করিয়া রাখা যায় যে দণ্ডের সূক্ষ্মাগ্রভাগ বাটীর উচ্চতা কিঞ্চিৎ অতিক্রম করিয়া থাকিবে এবং অপর শেষাংশ ভূমি সংলগ্ন থাকিবে, তাহা হইলে বাটীর সমীপাগত কোন বৈদ্যুতিক মেঘ হইতে তড়িৎরাশি উক্ত দণ্ড দ্বারা নিঃশব্দে ও নিরাপদে পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইয়া যাইবে। সুতরাং তদ্দ্বারা অকস্মাৎ বিদ্যুৎপাত হইতে বাটীর কোন আশঙ্কা থাকিবে না। এবং যদিও দণ্ডোপরি বজ্রাঘাত হয় তাহা হইলেও তড়িৎ রাশি নিরাপদে পৃথিবীতে পরিচালিত হইবে।

এবম্বিধ সিদ্ধান্ত করিয়া ফ্রাঙ্কলিন সর্ব্ব সাধারণকে, উচ্চ প্রাসাদ ও মন্দিরাদিতে এবং জাহাজের মাস্তুলে উক্ত রূপ বিদ্যুদ্দণ্ড ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। তদবধি সাধারণতঃ এই উপায় অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্দ্বারা যে অনেকাংশে অনিষ্টোৎপাতের নিরাকরণ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

অতঃপর অনেকানেক তড়িৎ-বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করণে সমুৎসুক হয়েন। এবং অনেকে তৎপরীক্ষা সংসাধন কালীন অনবধানতা বা কোন রূপ ব্যতিক্রম বশতঃ প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হন।* কাহার ও বা জীবন পর্য্যন্ত ও বিনষ্ট হয়। ১৭৫৩ খৃঃ অঃ নিরাক নিবাসী এমঃ ডি রোমস্ (M. De. Romas) ৭ ফীট উর্দ্ধে ও ৩ ফীট প্রস্থে এক খানি বৃহৎ ঘুড়ী প্রস্তুত করেন। তদ্দ্বারা তিনি মেঘ হইতে যত অধিক পরিমাণে নিরবচ্ছিন্ন তড়িৎস্রোত আকর্ষণ করেন তদ্রূপ অন্য কেহই সক্ষম হয়েন নাই। তিনি উক্ত ঘুড়ী খানি কেবল শোনের সূতা দ্বারা না উড়াইয়া সূতার মধ্য দিয়া এক গাছি সূক্ষ্ম ধাতব তার সন্নিবেশিত করিয়া দেন।

সূতার সহিত তারের এক প্রান্ত ঘুড়ী-সংলগ্ন থাকে এবং অপর শেষাংশ একটী টিনের নলের এক অন্তে সংলগ্ন করিয়া নলের অপরান্ত এক গাছি বিচ্ছেদক রেশমি সূতায় সংলগ্ন করিয়া ঐ সূতা ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ঘুড়ী খানি ৬০০ ফীট উর্দ্ধে উঠে। এবং টীনের নল হইতে ১০ ফীট দীর্ঘ ও ১' ইঞ্চি প্রস্থ বহুসংখ্যক তড়িতাগ্নি-স্রোত নির্গত হয়। তন্মধ্যে একটী স্ফুলিঙ্গ তীব্র শব্দ সহিত বহির্গত হইয়া ভূমধ্যে এক গর্ত্ত করতঃ প্রবেশ করে। তৎপরে আর একটী বৃহত্তর স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া তাঁহাকে এরূপ সংক্ষোভ প্রদান করে যে তিনি ভীত হইয়া পরীক্ষাটী ঐ স্থানেই সমাপ্ত করেন।

এম. মরমিয়ার্ নামক (M. Mormier) একাডমি অব্ সায়েন্সের (Academy of science) জনৈক সভ্য, এবং মণ্টমারন্সি (Montmorency) নিবাসী এম. বারটিয়ার M Bertier তাঁহাদের নিজ নিজ স্থাপিত বিদ্যুদ্দণ্ড হইতে উভয়েই গুরুতর সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলশায়ী হয়েন।

১৭৫৩ খৃঃ অঃ ২৬ আগষ্ট, সেণ্ট-পিটারস্‌বর্গ নিবাসী অধ্যাপক রিচমানের মৃত্যু এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি তড়িৎ বল-পরিমাপক একটী অভিনব যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করেন। ঐ যন্ত্রের তিনি তড়িৎ নোমন (Electrical gnomon) নাম প্রদান করেন। এক দিবস এম্‌ঃ সলকাউ (M. Solkow) নামক জনৈক খোদকের সহিত উক্ত যন্ত্রটীর উপর বৈদ্যুতিক মেঘের ফল পরীক্ষা করিতেছিলেন। অধ্যাপক যন্ত্রের সন্নিকট প্রায় ১ ফুট অন্তরে মস্তক নত করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। ইতি মধ্যে এক মুষ্টি পরিমাণ নীল বর্ণ একটী অগ্নি-বর্ত্তুল ঐ যন্ত্রের একটী লৌহ দণ্ড হইতে হঠাৎ নির্গত হইয়া অধ্যাপকের মস্তকে প্রবেশ করিল। তন্মুহুর্ত্তেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সলকাউ তাঁহার নিকটেই ছিলেন। তিনি হত-জ্ঞান হইয়া ভূতলশায়ী হন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া পরে তিনি অধ্যাপকের উক্ত মৃত্যু-বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহার নিজের বিষয় তিনি এই মাত্র স্মরণ করিয়া বলেন যে অধ্যাপকের মৃত্যু হইবা মাত্র গৃহ মধ্যে এক প্রকার বাষ্প উত্থিত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সমস্ত শরীর অবশ করিয়া ফেলে। তৎপরে যে উৎকট বজ্র-ধ্বনি হইয়া ছিল তাহা কিছু মাত্র তাঁহার শ্রবণগোচর হয় নাই। সমস্ত ব্যাপার অতিঅল্পক্ষণ মধ্যেই সংঘটিত হয়। পরে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সেই গৃহে বজ্রাঘাতের স্পষ্ট লক্ষণ দৃষ্ট হয়। গৃহের দ্বার বিখণ্ডিত ও কবজা ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

অধ্যাপক রিচ্‌মানের মৃত দেহ পরীক্ষায় ললাটদেশে একটী লোহিতবর্ণ মধ্যমাকৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তথা হইতে দুই চারি বিন্দু শোণিত নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু তত্রস্থ ত্বক্ অক্ষুণ্ণ ছিল। বাম পদের চর্ম্ম-পাদুকা একস্থানে দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। সেই স্থানের পদতলে একটী নীল

...চিহ্ন থাকে।" তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে বিদ্যুৎ তাঁহার কপাল দিয়া প্রবেশ করতঃ শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া পদ-দ্বারা বহির্গমন করিয়াছিল। অন্যান্য বহিশ্চিহ্নের মধ্যে সমস্ত শরীরে বহুসংখ্যক লোহিত ও নীলবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হয়। পরিচ্ছদের কোনও অংশ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা পর সেই দেহ ভেদ করতঃ তাঁহার অন্তর পরীক্ষায় লক্ষিত হয় যে মস্তকের খুলি (Cranium) অক্ষত রহিয়াছে। মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ। তাহার কোন বিলোড়ন ঘটে নাই। শ্বাসনলীর স্বচ্ছ ঝিল্লী সমূহ শিথিলীভূত হইয়াছে। স্পর্শ মাত্রে ছিন্ন হইতে লাগিল। ফুস্ফুসের অধঃস্থ আধার সমূহ শোণিত-গ্রন্থী সকল পূর্ণ হইয়াছে। (Glands,) এবং নাড়ী সমস্ত স্ফীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হয় নাই। মৃত দেহ দুই দিবসের মধ্যে এরূপ পচিয়া উঠে যে তাহাকে অতি সন্তর্পণে কফিনস্থ করিতে হয়।

জীব দেহে বজ্রাঘাতের ও লিডেন জারের ব্যাটারির, উভয়েরই কার্য্য সর্ব্ববিধায়ে সমতুল্য।

বিদ্যুদ্দণ্ডের আবিষ্ক্রিয়ার পর কতিপয় তড়িৎ-বৈজ্ঞানিক মেঘস্থ তড়িতের ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈদ্যুতিক মেঘে যৌগিক না বিয়োগিক তড়িৎ অবস্থিতি করে তাহা নির্দ্ধারণে যত্নবান হয়েন। তন্নির্দ্ধারণোদ্দেশে ১৭৫৩ খৃঃ অঃ ফ্রাঙ্কলিন বহুবিধ পরীক্ষা সাধন করেন। তাহাতে তিনি নির্দ্দেশ করেন যে বিদ্যুদ্দণ্ডের প্রত্যেক পরীক্ষায় যখন বিয়োগিক তড়িতেরই সত্ত্বার লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়, তখন মেঘ অবশ্য সর্ব্বদা বিয়োগিক তড়িদাক্রান্ত হইবে, এবং পৃথিবী যৌগিক তড়িদাক্রান্ত হইবে, তাঁহার এই উপপত্তি যে ভ্রমাত্মক তাহা তিনি ত্বরায় অবগত হইলেন। অন্যতর এক পরীক্ষায় তাঁহার উপলব্ধি হয় যে মেঘস্থ তড়িৎ যৌগিক। কিন্তু অন্যান্য প্রতিভাশালী তড়িৎ-তত্ত্বজ্ঞের মতে মেঘে বিবিধ কারণ বশতঃ কখন বিয়োগিক ও কখন বা যৌগিক তড়িৎ বর্ত্তমান থাকে। ফলতঃ যৌগিক এবং বিয়োগিক যখন কেবল তড়িতের ন্যূনাধিক্যের অবস্থাবাচক মাত্র, তখন সময় বিশেষে মেঘে পৃথিবী অপেক্ষা অধিক, কখন বা ভূপৃষ্ঠে মেঘাপেক্ষা অধিক তড়িৎ থাকিবে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ।

এইরূপে ফ্রাঙ্কলিন কর্ত্তৃক যদিও তাড়িৎ মেঘ সম্বন্ধে একটী মহৎ সত্য নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইল বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং বিদ্যুতের কার্য্য প্রণালী বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে তাঁহার ঘুড়ী ও বিদ্যুদ্দণ্ড দ্বারা এবং বজ্রাঘাত কালীন মেঘস্থ তড়িৎ ভূপৃষ্ঠে নীত হয়। বাস্তবিক তাহা নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বিভিন্ন-ধর্ম্মী কোন দুইটী তড়িৎ যেমন পরস্পর আকর্ষণশীল, সমধর্ম্মী তড়িৎদ্বয় তদ্রূপ পরস্পর বিয়োজনশীল। এই তড়িদ্-ধর্ম্মের কার্য্যকারিতা নিরন্তর প্রকর্ষ-

যৌগিক অথবা বিয়োগিক-তড়িদাক্রান্ত কোন মেঘ পার্থিব কোন পদার্থের সমীপস্থ হইলে সেই মেঘস্থ তড়িৎ উক্ত পদার্থ-নিহিত এবং তৎসঙ্গে ভূপৃষ্ঠস্থ অসমান বর্ণ তড়িৎকে আকর্ষণ করিতে থাকে ও সমধর্ম্মীকে প্রতিক্ষেপ করে। ঐ মেঘ এবং পদার্থ যেমন ক্রমে পরস্পরের নিকট-বর্ত্তী হয় তদুভয়গত তড়িতের আকর্ষণী ও প্রতিক্ষেপণী শক্তি ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে বিভিন্ন-ধর্ম্মী তড়িৎ-দ্বয়ের বিততিষা (Tension) এত বাড়িয়া উঠে যে মধ্যস্থ বায়ু ব্যবধান সত্ত্বেও পরস্পর অগ্রসর হইয়া বেগে মিলিত হয়। বিদ্যুৎই এই মিলন-ফল, এবং বিদ্যুৎপাত কালীন বায়বীয় বিলোড়ন-জনিত শব্দই ভীষণ বজ্র। এবং ফ্রাঙ্ক্লিন্ যে ঘুড়ীর সুতা ও বিদ্যুদ্দণ্ড হইতে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করেন তাহা ঐ সুতা ও দণ্ড মধ্যস্থ পূর্ব্বোল্লিখিত বিক্ষিপ্ত তড়িৎ মাত্র। মেঘের তড়িৎ নহে। কখন কখন এক মেঘের তড়িৎ মেঘান্তরের তড়িতের সহিত মিলিত হইয়াও বিদ্যুদ্দাম ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়টী উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমে তড়িৎ-সংক্রামণ ও সিমারের তড়িৎ-মতের (Symmers' theory of the electric fluid) বিষয় বিশেষ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তদুভয় বিষয়ই যথা-স্থানে উল্লেখ করা যাইবে।

তদনন্তর কতিপয় বৈজ্ঞানিক অনু-সন্ধিৎসু বিদ্যুদ্দণ্ড ও তদানুষঙ্গিক তড়িৎ-পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা ঝাত্যা বা মেঘ-রহিত অতি পরিষ্কার আকাশস্থ বায়ুতেও তড়িৎ-সত্তার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। সিনর বেকেরিয়া (Signor Fachiria) এই বিষয় সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করেন যে, প্রবল ঝাত্যা, বৃষ্টি, শিল, উল্কাপাত, কুজ্ঝটিকা, জলস্তম্ভ, নীহার—আরোরা বরিয়ালিস্ (Aurora Borealis) প্রভৃতি যাবতীয় জলবায়ু ঘটিত প্রত্যক্ষ (Meteorological phenomena) তড়িৎ-মূলক। তড়িৎই তৎসমস্তের মূলীভূত কারণ। উক্ত বিখ্যাতনামা বিজ্ঞানবিদের তত্ত্বানুসন্ধানের পর অন্য কোন বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ের নিগূঢ় নিয়মাদি নির্ণয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

গত শতাব্দির মধ্যে তড়িৎ ও বিদ্যুতের প্রকৃতিগত একতা সম্পাদন দ্বারা তড়িৎ-শাস্ত্রে একটী নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিতে হইবে। এতদ্দ্বারা তড়িৎ-বৈজ্ঞানিকের সম্মুখে তড়িত্তত্ত্বানুসন্ধানের একটী নবক্ষেত্র বিস্তারিত হইয়াছে। তদবধি বিবিধ অভিনব সত্যও নির্ণীত হইতে লাগিল। এবং তড়িৎ-কার্য্য সমূহও অনেকাংশে সুবোধ্য হইয়া আসিতেছে।

বিজ্ঞ তত্ত্ববিশারদ ক্যানটন মহোদয় (Mr. Canton) দ্বারা তড়িৎ-সংক্রামণের (Electrical Indnction) সবিশেষ তথ্য আলোচিত হয়। এবং তৎকর্ত্তৃকই তড়িতের এই ধর্ম্মের কার্য্যাদি বিশেষরূপে নির্ণীত হয়। তদ্দ্বারা তড়িৎ-কার্য্য সমূহ অনেকাংশে সহজবোধ্য হইয়াছে।

কোন পদার্থ তড়িদাক্রান্ত হইলে তড়ি-

কটন্ সহজাবস্থ বস্তুর উপর তাহার কর্তৃত্বার বিষয়ে পূর্ব্বতন তড়িৎবেত্তাদিগের স্পষ্ট কোন জ্ঞান ছিলনা। পরে ক্যানটন বহু পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন; যে তড়িদাক্রান্ত পদার্থ-নিহিত তড়িৎ মাত্রেই তদায়ত্তিস্থ সহজাবস্থ বস্তুতে তড়িৎউত্তেজিত করিয়া থাকে। ইহাকেই তড়িৎ-সংক্রামণ কহে। ক্যানটন কোন বিচ্ছেদক পদার্থোপরি স্থাপিত একটী ধাতব পরিচালকের সন্নিহিত একটী ঘর্ষিত তাড়িত পদার্থ (Excited electric) ধারণ করিয়া দেখেন যে যতক্ষণ ঐ তড়িদাক্রান্ত পদার্থ পরিচালকের নিকট রহিল তক্ষণ পরিচালকও তড়িদাক্রান্ত লক্ষিত হইল। তাড়িত পদার্থটী যৌগিক তড়িদাক্রান্ত হইলে পরিচালকের তদভিমুখস্থ দিক তৎ-বিপরীত অর্থাৎ বিয়োগিক তড়িৎযুক্ত হইবে, ও অপর দিকটী যৌগিক তড়িৎ-পূর্ণ হইবে। কিন্তু ঘর্ষিত তাড়িত-পদার্থ পরিচালকের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিবা মাত্রই পরিচালক পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আবার যদ্যপি ঐ পরিচালকের যৌগিক তড়িৎযুক্ত দিকটি অন্য কোন পরিচালক সংস্পর্শ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উক্ত তড়িৎ-পদার্থ স্থানান্তরিত করিলেও পরিচালক তড়িদাক্রান্ত থাকিবে। ক্যানটন কৃত এই পরীক্ষা সমূহ আতঃপর ফ্রাঙ্কলিন কর্ত্তৃকও পুনরারব্ধ হয়।

তড়িৎ-সংক্রামণের কারণ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া ইপিনস্ M. Aepinus ও উইলকি Mr. Wilke—নামক তত্ত্বজ্ঞদ্বয় তদ্বিষয়ক বিবিধ পরীক্ষায় নিযুক্ত হন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে একটি অভিনব পরীক্ষা সংসাধনানন্তর নিরস্ত হন। তড়িৎ-সংক্রামণের কার্য্য-পরিদর্শনে তাঁহাদিগের অনুমিত হয় যেমন লিডেন বোতলের অন্তর ও বহির্ধাতব ফলকের সাহায্যে তন্মধ্যস্থ বোতলকে তড়িৎ-পূর্ণ করা যায়, তদ্রূপ পরস্পরের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে স্থাপিত দুইটি ধাতব ফলক দ্বারা তন্মধ্যস্থিত বায়ুকেও তড়িৎপূর্ণ করা অসম্ভাবনীয় নহে। এবং তদ্দ্বারা লিডেন বোতলেরও কার্য্য সমূহ সংঘটিত হইতে পারে। তদনুসারে তাঁহারা মধ্যমাকৃতি দুইটী ধাতব ফলক (Plates) দুইটি বিচ্ছেদক পায়ায় সন্নিবেশিত করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া প্রায় ৭। ৮ ইঞ্চ ব্যবধানে স্থাপন করেন। তদনন্তর ধাতব দণ্ড দ্বারা উভয় ফলককে সংযোজিত করিবা মাত্র তীব্র আস্ফোটন ও অগ্ন্যুদ্যম সংঘটিত হয়।

ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে যে ইহার অনেক পূর্ব্বে যখন লিডেন বোতলের প্রক্রিয়া সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এবং ফ্রাঙ্কলিন যখন এতদূর বুঝিয়াছিলেন যে বোতলের আভ্যন্তরিক ফলক এক বর্ণ তড়িৎ-পূর্ণ হইলে বহির্ফলকে স্বতই কাচ ব্যবধান সত্বেও তৎ-বিপরীত-ধর্ম্মী তড়িৎ সংক্রামিত হইবে; তখন তাঁহার অথবা তৎসাময়িক অন্য

কোন তড়িৎ-বিদের মনে ইহা একবারও উদয় হয় নাই যে লিডেন বোতলের কাচের ন্যায় বায়ু ব্যবধান সত্বেও তড়িদাক্রান্ত কোন বস্তু তন্নিকটস্থ সহজাবস্থ পদার্থ মাত্রে তড়িৎ সংক্রামিত করিবে। লিডেন বোতলের প্রক্রিয়া কেবল তড়িৎ-সংক্রামণের ফল মাত্র। সুতরাং লিডেন বোতলের পরীক্ষা আর ক্যান্টনের পূর্ব্বোক্ত সংক্রামণের পরীক্ষা সুদূর-পরাহত নহে।

ক্যান্টন-কর্ত্তৃক আর একটি তড়িৎ-সত্ত্য আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে তড়িৎ-বিজ্ঞান উন্নতি মার্গে আর একপদ অগ্রসর হইয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি নির্ণয় করেন যে কোন পদার্থকে কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দুইএর এক বর্ণ তড়িৎ-পূর্ণ করিয়া, তৎপরে অন্যবিধ কোন বস্তু দ্বারা সেই পদার্থকে ঘর্ষণ করিয়া তদন্তর্গত তড়িৎকে বিভিন্নধর্ম্মী করিতে পারা যায়। অর্থাৎ ঘর্ষণী পদার্থের বিভিন্নতানুসারে ঘর্ষিত এক বস্তুর তড়িৎ কখন যৌগিক কখন বা বিয়োগিক হইয়া থাকে। আরও ঘর্ষিত পদার্থের বহির্গাত্রের মসৃণতা বা বন্ধুরতানুসারে, এক প্রকার ঘর্ষণী দ্বারা তন্মধ্যে যৌগিক অথবা বিয়োগিক তড়িৎ উত্তেজিত হইবে। কাচ-নিহিত যৌগিক তড়িৎ অন্যান্য বস্তুর ন্যায় এ বিষয়ে তত্র পরিবর্ত্তনশীল নহে। অর্থাৎ কাচকে যে কোন পদার্থ দ্বারা ঘর্ষণ করা যাউক না কেন, তাহাতে কেবল যৌগিক তড়িৎই উদ্ভাবিত হইবে। কেবল মাত্র কাচের উপরিভাগ বন্ধুর করিয়া কিম্বা বিড়ালের চর্ম্ম দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহার যৌগিক তড়িৎকে বিয়োগিক তড়িতে পরিণত করা যায়। বিচক্ষণ তত্ত্বদর্শী ক্যান্টন এই খানেই নিরস্ত হয়েন নাই। তৎপরে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে তড়িৎ-যন্ত্রে য়্যামালগ্যাম * Amalgam ব্যবহারের প্রবর্ত্তনা করেন।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তড়িৎ-প্রকৃতি সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিনের যৌগিক ও বিয়োগিক মত—Positive and Negative, or Plus and Minus theory—প্রচলিত ছিল। তৎপরে ঐ অব্দে সিমারস্ সাহেব Mr. Symmers উক্ত মত বিবিধ সদ্-যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া তদ্বিষয়ক এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রএল সোসাইটীতে (Royal Society) প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে তিনি এবম্বিধ কতকগুলি পরীক্ষার প্রস্তাবনা করেন যে দুই বিভিন্ন প্রকার তড়িতের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অন্যমতে তৎ-

* ইহা এক প্রকার মিশ্র পদার্থ। দুই ভাগ দস্তা ও এক ভাগ টিনকে একত্রে দ্রব করিয়া তাহার সহিত ছয় ভাগ পারা মিশ্রিত করতঃ তাহাকে শীতল করিতে হয়। তৎপরে তাহাকে উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া রাখে। আবশ্যক মতে উহার কিঞ্চিৎ তড়িৎ যন্ত্রের ঘর্ষনীয় পাত্রে বিস্তৃত করিলে সত্বরে ও প্রচুর পরিমাণে তড়িদুত্তেজিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।

পরীক্ষা সমূহের ফল অসম্ভাবনীয় হইয়া উঠে। ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ডুফের মতেও তড়িৎ দ্বিবিধ; কাচজ ও লাক্ষাজ। কিন্তু তাঁহার মতে এই দ্বিবিধ তড়িৎ পরস্পরের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, কেহই কাহারও উপর কোন প্রকারে নির্ভর করেনা। এবং উভয়ে কখনও মিলিত অবস্থায় ও থাকেনা। উভয়ের অন্যতর মাত্র এক সময়ে কোন পদার্থে উদ্ভূত হইয়া থাকে।

কিন্তু সিমারের মতে ঐ দুই বিভিন্ন প্রকার তড়িতেরই সম সংযোগে এক প্রকার নিশ্চেষ্ট তাড়িত-তরল (Neutral fluid) পদার্থ মাত্রেই নিহিত আছে। পদার্থের সহজাবস্থায় তাহার সত্ত্বা উপলব্ধি হয় না। কিন্তু কোন কারণে যখন কোন পদার্থস্থ ঐ উভয় তড়িতের সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় তখন একের আধিক্য জন্মায় এবং ঠিক সেই পরিমাণে অপরটির ও হ্রাস হইয়া থাকে। আরও অসমানবর্ণ তড়িৎ পরস্পর-আকর্ষণশীল ও তদ্বিপরীতে সমানবর্ণ তড়িৎ পরস্পর-বিয়োজনশীল। অর্থাৎ যৌগিক তড়িৎ অপর এক যৌগিক তড়িতের নিকটবর্ত্তী হইলে উভয়েই বিক্ষিপ্ত হয়, ও বিয়োগিক তড়িৎ যৌগিককে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং কোন পদার্থের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলেই তাহাকে তড়িদাক্রান্ত কহে। এবং তজ্জনিত সমস্ত তড়িৎ-কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। এই মতানুসারে আবিষ্কৃত তড়িৎকার্য্য সমস্তই বুঝিতে পারা যায়। এবং এই মতই এক্ষণে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।

, মে ইপিনস (Mr. Aepinus) এবং অনারেবল হেনরি ক্যাভেনডিস (The Hon. Henry Cavendish) বহু যত্নে গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে তড়িতের আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী শক্তির পরিমাণ এবং কতক নিয়মাদিও নির্দ্দেশ করেন। ঐ মহাত্মাদিগের আদর্শিত তত্ত্বানুসন্ধান ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে কুলম (M. Coulomb) কর্ত্তৃক অনুসৃত হয়। তিনি তড়িতের আকর্ষণ ও বিয়োজন-পরিমাপক টরসন তুলামান (Torsion Balnce) নামক একটী অভিনব অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্ক্রিয়া করেন। এই যন্ত্রের সূক্ষ্মতা এতদূর যে তদ্দ্বারা অর্দ্ধ কুচের ২০,০০০০০০ বিংশতি কোটি অংশের একাংশ পরিমাণ পর্য্যন্ত তড়িৎ-বল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই যন্ত্র সহযোগে কুলম নিরূপণ করেন যে সমধর্ম্মী তড়িদাক্রান্ত দুই বস্তুর মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের বর্গানুসারে তাহাদের পরস্পরের বিয়োজনী শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। এবং দুইটি তড়িদাক্রান্ত পদার্থস্থ তড়িতের পরিমাণানুসারে তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ অথবা বিক্ষেপণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের বর্গানুসারে তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের হ্রাস হইয়া থাকে। তিনি আরও নির্ণয় করেন যে কোন তড়িদাক্রান্ত পদার্থ উত্তম বিচ্ছেদক বস্তুর উপর স্থাপিত হইলেও কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে তন্মধ্যস্থ তড়িৎ, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বায়ু এবং অন্যান্য বিচ্ছেদক বস্তুর দ্বারা কিয়ৎ-পরিমাণে পরিচালিত হইয়া যায়। বায়ুতে সর্ব্বক্ষণই

ন্যূনাধিক আর্দ্রতা বা জল-কণা অবস্থিতি করে; এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিচ্ছেদক বস্তু ও কিয়ৎ পরিমাণে তড়িৎ-সঞ্চালক। সুতরাং তদুভয় দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তড়িদাক্রান্ত বস্তুর তড়িৎ কিয়ৎকাল মধ্যে ইতস্ততঃ বিসৃত হইয়া যায়। আবও কুলম্ব ই স্পষ্টাক্ষরে ও নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ করেন যে সঞ্চালক বস্তুর বহির্গাত্রেই Surface—ঘর্ষণোত্তেজিত তড়িৎ অবস্থিতি করে। অন্তর ভেদ করে না।

টরসণ তুলামান যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়ার দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত ভল্‌টা—M, Volta ইলেক্‌ট্রোফোরস্‌ (Electro phoras নামক তড়িৎ-যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রটি তড়িৎ-সংক্রামণ কার্য্যের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। গালা, রজন ধুনা অথবা অন্য কোন তাড়িত পদার্থ-নির্ম্মিত একটী চাক্‌তিতে (Disc) ঘর্ষণ দ্বারা তড়িৎ পূর্ণ করিয়া কোন বিচ্ছেদক পদার্থোপরি স্থাপিত একখানি ধাতব চাকতির উপর রাখিবা মাত্র সেই ধাতব চাকতির উপরিভাগে প্রথমোক্ত তাড়িত চাক্‌তিগত তড়িতের বিপরীত তড়িৎ সংক্রামিত হয়। এবং তদ্বিপরীত দিকে অর্থাৎ নিম্ন ভাগে প্রথমোক্ত তড়িৎ সংক্রামিত হয়। অর্থাৎ ধাতব চাকতির উপরিও নিম্নভাগ সংক্রামণ গুণে দুই বিভিন্নধর্ম্মী তড়িদাক্রান্ত হয়। তাড়িত চাকৃতিটী বিয়োগিক তড়িদাক্রান্ত হইলে ধাতব চাকৃতির উপরিভাগ যৌগিক ও নিম্নভাগ বিয়োগিক তড়িৎ-পূর্ণ হইবে। সেই সময়ে, যখন উভয় চাকৃতি পরস্পর সংস্পৃষ্ট ভাবে আছে যদ্যপি ধাতব চাকৃতির নিকট অঙ্গুলি অথবা কোন পরিচালক পদার্থ ধারণ করা যায়, তাহা হইলে চাকৃতির অধঃস্থ বিয়োগিক তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ-রূপে ধৃত সঞ্চালক পদার্থে প্রবেশ করিয়া সঞ্চালিত হইয়া যায়। তখন ঐ তাড়িত চাকৃতিটী স্থানান্তরিত করিলেও লক্ষিত হইবে যে ধাতব চাকৃতি যৌগিক তড়িদাক্রান্ত, এবং এত অধিক পরিমাণে, যে তাহা হইতে প্রায় এক ইঞ্চ দীর্ঘ স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করা যায়। এই রূপে বারম্বার ঐ উভয় চাক্‌তির সংস্পর্শে ও তৎপরে তাহাদের পৃথক করণ দ্বারা এত অধিক পরিমাণে ঐ যৌগিক তড়িৎ বৃদ্ধি করা যায় যে তদ্দ্বারা গুটিকতক লিডেন বোতল তড়িৎ-পূর্ণ করা যায়। তাহাতে প্রথমোক্ত তাড়িত চাক্‌তিটীর তড়িতের কিছুমাত্র হ্রাস লক্ষিত হইবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অবশিষ্ট শেষ ভাগের মধ্যে লাভইসর (Lavoisier) লাপ্লাস্‌ (LaPlace) প্রভৃতি কতিপয় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়াজনিত তড়িৎ-তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুনানী নাট্য প্রণালী।

আমরা আহ্লাদে নৃত্য ও বিষাদে ক্রন্দন করি। নর্ত্তন ও ক্রন্দন মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অত্যন্ত আনন্দ হইলে বালকেরা সহজেই নৃত্য করে। সমাজের বাল্যাবস্থায় মনুষ্য-হৃদয় বালকের ন্যায় সরল ও অকপট থাকে, এই নিমিত্ত অসভ্যাবস্থায় মানবকে যত নৃত্য-পর দেখা যায়, সুসভ্যাবস্থায় তত দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল জাতিই আদিমাবস্থায় নৃত্য করিয়াছে। আমাদের মহাদেব, বলদেব, বাসুদেব, দেবর্ষি নারদ, সর্ব্বদা নৃত্য করিয়াছেন। সমাজের ক্রমোন্নতি-সহকারে নৃত্য-গীত হইতে সর্ব্বজন-মনোহর নাটকের অভ্যুদয় হইয়াছে। কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি অজ্ঞ কি বিজ্ঞ, নাটক সকলেরই মনোরঞ্জন করে। একজন সুবিখ্যাত আর্য্যাচার্য্য কহিয়াছেন "নানা-ভাব-রসৈরাঢ্যং নাটকং সুরয়ো বিদুঃ। কিঞ্চিদঙ্গ-বিহীনন্তু ন, ত্যজ্যং নাটকং কচিৎ।" সুপ্রসিদ্ধ যুনানী পণ্ডিত আরিষ্টটল্ নিজ-প্রণীত অলঙ্কার শাস্ত্রে মহাকাব্য হইতেও নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সহৃদয় শ্লেগেল সহস্র রসনায় নাটকের গুণানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। যেমন শীত ও গ্রীষ্মের সন্ধিকাল মধু মাসে অপর্য্যাপ্ত গোলাপ ফুল প্রস্ফুটিত হয়, সেই রূপ মাধ্য-সমাজের মধ্যাবস্থায় দৃশ্যকাব্য প্রচুর সঞ্জাত হইতে দেখা যায়। সকল সুসভ্য দেশের সাহিত্যেতিহাস আমাদের এই উক্তির পোষকতা করিতেছে।

অতি পূর্ব্বতন কালে গ্রীসদেশান্তর্গত আটিকা প্রদেশে বেকশ্ দেবতার পূজোপলক্ষে প্রতিবৎসর মহা সমারোহ ও উৎসব হইত। এই মহোৎসবে সমাগত যুনানিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য ও গান করিত এবং এতদ্দেশীয় ইতর লোকদিগের তরজার ন্যায় এক দল অপর দলকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গোক্তি কবিতাবলী সমস্বরে আম্রেড়ন করিত। এই সকল বিভিন্ন দল হইতেই পূর্ব্বোক্ত গাথক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। ক্রমে যুনানী জাতির সভ্যতার উন্নতি হইলে নৃত্য-গীতের সহিত কথোপকথন ও পৌরাণিক উপাখ্যান সংযোজিত হইয়া তাঁহাদিগের আদিম অসভ্যতা-সূচক কুৎসিত উৎসব—প্রকৃষ্ট নাট্যামোদে পরিণত হইয়াছিল। এই রূপ নৃত্য-গীত হইতে যে সংস্কৃত নাটকেরও উৎপত্তি হইয়াছিল ইহা বলা বাহুল্য—নাটক শব্দই ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

যুনানীদিগের সর্ব্ব প্রথম নাটককার থেস্‌পিস্। তিনি কতিপয় সুশিক্ষিত চারণ সমভিব্যাহারে নিজ-প্রণীত নাটকাবলি নগরে নগরে অভিনয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই আর ঐ প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। থেস্‌পিসের মৃত্যুর অনুমান বিংশতি বৎসর পরে ফ্রাইনিচস্ নামক তদীয় একজন শিষ্য নাট্য রচনা সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। রাজধানী এথেন্‌স্ নগরে তিনিই প্রথমে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় করেন এবং তিনিই প্রথমে নারী চরিত্র নিবিষ্ট করিয়া যুনানী নাটকে বিশেষ পারিপাট্য বিধান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এক সময় তৎ-প্রণীত নাটকান্তরের অভিনয়ে অসংখ্য দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি সমাগত দর্শকদিগকে এইরূপ ব্যথিত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজাজ্ঞায় তাঁহার অর্থ-দণ্ড হইয়াছিল। তাঁহার পর ইস্কাইলস্, সফোক্লিস্, ইউরিপাইডিস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণ যুনানী নাটকের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া যান। এই সকল মহাকবিগণের অভ্যুদয় সময়ে এথেনস্ নগরে সাধারণ নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এথেনীয় রঙ্গাঙ্গন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাটিনাস্ নামক কবি-রচিত নাটক বিশেষের অভিনয় কালে সেই মন্দির সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বিস্তর লোকের প্রাণ-হানি হওয়ায় নাগরিকগণ অপর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করিয়া প্রস্তর-রচিত এক প্রশস্ত নাট্যশালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই মহদট্টালিকা এত বৃহদায়তন ছিল যে তথায় অন্যূন ত্রিংশৎ সহস্র দর্শক সচ্ছন্দে বসিয়া অভিনয় দর্শন করিতে পারিত। ইহার একদিকে অভিনয়-মণ্ডপ (Stage) ও অপর তিনদিকে স্তম্ভাবলি-শোভিত সুচারু প্রকোষ্ঠরাজি বিরাজিত ছিল এবং মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ অনাবৃত প্রাঙ্গণে দর্শক-মণ্ডলীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি উপবেশনাসন সোপান-শ্রেণী-নিভ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের সাধারণ রঙ্গভূমি ছিলনা। রাজার এবং রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রায়ই এক একটী নিজস্ব নাট্যশালা থাকিত। ঐ সকল নাট্যমন্দির বিস্তৃত, সালঙ্কৃত ও পুরীর বহির্দ্বার সমীপে নির্ম্মিত হইত। যুনানী রঙ্গাঙ্গণের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষীয় নাট্যশালা সকল যে অতীব ক্ষুদ্রায়তন ছিল তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষে কেবল অল্প সংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই নাট্যামোদ সম্ভোগ করিতে পারিতেন এই জন্য যুনানী জাতির ন্যায় প্রাচীন আর্য্যগণের প্রকাণ্ড সাধারণ নাট্যমন্দিরের প্রয়োজন হয় নাই।

এথেনীয় অভিনয়-মণ্ডপ রঙ্গাঙ্গণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত এবং প্রস্তরময় শূন্যতল বৃন্তোপরি প্রস্থাপিত ছিল। ইহার পুরোভাগ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত

সর্ব্বদা অনাবৃত থাকিত—পূর্ব্বতন যুনানীগণ আদৌ যবনিকা ব্যবহার করিতেন না। তাঁহাদিগের দৃশ্যাভিনয়ে চিত্রকার্য্যের অপেক্ষা স্থাপত্য ও ভাস্কার্য্যেরই অধিক ব্যবহার ছিল। অভিনয়-মণ্ডপের পশ্চাদ্দেশে একটি অসিতবর্ণের প্রাচীর লক্ষিত হইত। প্রাচীরে তিনটি প্রবেশ দ্বার ছিল। মধ্যের প্রধান দ্বার দিয়া নাট্যোক্ত রাজা, রাণী, রাজপুত্র প্রভৃতি মুখ্য পাত্রগণ এবং পার্শ্বস্থ অপর দুইটি দ্বার দিয়া ইতর চরিত্র সকল রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিত। দেবচরিত্রেরা যন্ত্রযোগে শূন্য হইতে অবতারিত হইতেন এবং গায়ক-সম্প্রদায়ের নিমিত্ত পৃথক্ প্রবেশ-পথ নির্দ্দিষ্ট ছিল। আর্য্যদিগের অভিনয়-মণ্ডপ সুচারু-কারু-কার্য্য-খচিত কয়েকখানি যবনিকা দ্বারা সংরচিত এবং সুবাসিত-কুসুম-মালায় সুসজ্জিত হইত। দর্শকদিগের সম্মুখস্থ যবনিকা উৎক্ষিপ্ত হইলে সর্ব্বপ্রথম একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দেবতাবিশেষের মহিমা কীর্ত্তনানন্তর মঙ্গলাচরণ বা নান্দী-পাঠ করিয়া যাইতেন। তৎপরে নট-নটী আসিয়া পরস্পর আলিঙ্গন ও চুম্বন সহকারে সরস নৃত্য ও গান করতঃ প্রসঙ্গক্রমে অভিনেয় নাটকের অবতারণ করিয়া দিতেন। নট নটীর এবম্বিধ নৃত্য সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে স্ফুরিত বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

অভিনয় স্বভাবানুরূপ হইতেছে কিনা যুনানীগণ ইহা একবারও অনুধাবন করিয়া দেখিত না। সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্বেই তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই নিমিত্ত তাহারা উচ্চতম উপানৎ, দীর্ঘ কল্পকেশ, সুদৃশ্য মুখস ও মনোহর পরিচ্ছদ সকল ব্যবহার করিত। তাহারা উদাত্ত দৃশ্যাভিনয় দ্বারা দর্শককে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত করিতে পারিত বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিত না। তাহাদিগের কৃত্রিমমুখ দেবানুরূপ পরম সুন্দর হইলেও জীবিত-ভাব-বিহীন্ ও ভাবাভিনয়ের একান্ত অনুপযুক্ত। ভাবাভিনয়ে নানা প্রকার নয়ন ও মুখভঙ্গির আবশ্যক, জড় মুখসদ্বারা সে প্রয়োজন কখনই সংসাধিত হইতে পারে না, সুতরাং যুনানী কুশীলবগণ ভাবাভিনয়ে কোনকালেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কণ্ঠ-স্বর উচ্চ ও সুমধুর করিবার জন্য তাহারা মুখস মধ্যে একটি যন্ত্র ব্যবহার করিত ও অভিনয় সময়ে সেই যন্ত্র-সাহায্যে অস্মদ্দেশীয় রামায়ণ-গাথকদিগের ন্যায় সুর করিয়া কথোপকথন করিত। সুরের সহিত সহজে মিলিত হইবে বলিয়া তাহাদের নাটকেও আদ্যোপান্ত অলঙ্কৃত কবিতায় লিখিত হইত। ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভাষা, যুনানী নাটকে দেখা যায় না। কি সামান্য চরিত্রের কথোপকথন কি গায়ক-সম্প্রদায়ের গীতাবলী সকলই একঘেয়ে গম্ভীর ভাষায় লিখিত, কুত্রাপি বৈচিত্র্য নাই। বৈচিত্র্যই সংস্কৃত নাটকের প্রধান আকর্ষণ। সংস্কৃত নাটকে যেমন বিবিধ প্রকার চরিত্র দেখা যায়, তাহাদের ভাষাও সেইরূপ বিবিধপ্রকার লক্ষিত

হয়। সঙ্গীত-দামোদর-গ্রন্থে নাটক লক্ষণে, সংস্কৃত, প্রাকৃত, ভূতভাষা প্রভৃতি নানাবিধ ভাষার উল্লেখ আছে। বাস্তবিক ভাষা-বৈচিত্র্য না থাকিলে নাটকাভিনয় হৃদয়-গ্রাহী হয় না।

সংসার-যাত্রায় যাহা আমরা নিত্য দেখিতে পাই, মানব-সমাজে যাহা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে, সে সকল সামান্য ব্যাপার যুনানী-নাটককারগণ একেবারে পরিত্যাগ করিতেন। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু ভয়ঙ্কর, যাহা কিছু তেজস্কর, উজ্জ্বল ও উদাত্ত তাহারই অনুকরণ বা কল্পনায় তাঁহারা একান্ত যত্নশীল ছিলেন। সংক্ষেপতঃ নাট্য-রচনা সম্বন্ধে তাঁহারা এক কাল্পনিক পূর্ণতার অনুধাবন করিতেন। কিন্তু তল্লাভে কস্মিন্ কালেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা পূর্ণচন্দ্র ধরিতে গিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক কাল্পনিক পূর্ণতার অনুরোধে তাহাদের প্রণীত নাটকাবলী অনেক স্থলে অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃত নাটক সমূহ ঔদাত্ত্য-বিহীন হইলেও আদ্যোপান্ত স্বাভাবিক ও মনোহর সংস্থাপনে পরিপূর্ণ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

হেম-নলিনী—বিয়োগান্ত নাটক। শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা জি, পি, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। আমরা এই নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ইহাতে বিনা স্বীকারে সেক্‌সপিয়ারের ম্যাক্‌বেথ ও রোমীয় জুলিয়েট্ হইতে অনেকগুলি চরিত্র ও অনেকগুলি ভাব রূপান্তরীকৃত হইয়াছে। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্যভাষা-রত্নাকরে যে অনন্ত রত্নরাশি নিহিত আছে, তাহার উদ্ধরণ ও বঙ্গভাষায় রূপান্তরীকরণ, বঙ্গভাষার আশু দারিদ্র্য নিবারণের একমাত্র উপায় তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি; কিন্তু মৌলিকতার যশোলাভের আশায় আজ কাল সাহিত্য-সংসারে যে সকল চৌর্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা অক্ষমণীয়। গ্রন্থকার রোমীয় জুলিয়েট্ ও ম্যাক্‌বেথ্ হইতে অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন অথবা অবিকল অবিকৃত অবস্থায় ছবিগুলি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে তাঁহার হেমনলিনী যে ঐ দুইখানি বিখ্যাত নাটকেরই বিকরণ বা রূপান্তরীকরণ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

কালিদাস ও ভবভূতি—বাল্মীকি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের নিকট যতটুকু

ঋণী—হেমনলিনীকার সেক্‌সপিয়রের নিকট তাহা অপেক্ষা অধিকতর ঋণী।

কালিদাস রঘু-বংশের প্রারম্ভে এবং ভবভূতি উত্তররামচরিত্রের নান্দীতে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পূর্ব্ব কবিদিগের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা লোকপ্রসিদ্ধঃ—"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ। মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" রঘুবংশম্। অথবা (বাল্মীকি প্রভৃতি) পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ যে বংশরূপ গৃহে বাক্যরূপ দ্বার কাটিয়াছেন—হিরকশলাকা দ্বারা ছিদ্রীকৃতমুক্তায় (কোমল) সূত্রের প্রবেশের ন্যায় সেই বংশে (আমার মত মূঢ়মতি ব্যক্তিরও) প্রবেশ অনায়াস-সাধ্য।

"ইদং গুরুভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।" উত্তররামচরিতম্।

আমি বাল্মীকি প্রভৃতি প্রাচীন গুরুজনদিগকে নমস্কার করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি * *।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হেমনলিনীকার আদর্শকবি সেক্‌সপিয়রের নামোল্লেখ পর্য্যন্তও করেন নাই। ইহা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

হেমনলিনীকার যে যে প্রধান চরিত্র ম্যাকবেথ্ ও রোমিও জুলিয়েট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে বলা যাইতেছেঃ—

উদয়পুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা রণবীরসিংহ স্কট্‌লণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা ডঙ্কানের; উদয়পুরের বর্ত্তমান রাজা যশোবন্ত সিংহ স্কট্‌লণ্ডের বর্ত্তমান রাজা ম্যাক্‌বেথের; রণবীরসিংহের পুত্র হেমচন্দ্র ডন্‌কানপুত্র ম্যাল্‌কম ও রোমীয়ের; যশোবন্ত সিংহের কন্যা নলিনী জুলিয়েটের; পূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ছদ্মবেশীব্রহ্মচারী ফ্রায়ারের; ভূতপূর্ব্ব রাজবয়স্য ইন্দ্রদমন প্রভৃতি, ম্যাক্‌ডফ্‌, লেনক্‌স প্রভৃতি স্কচ্ সম্ভ্রান্তগণের; নলিনীর প্রস্তাবিত বর শিকাবতীর রাজকুমার, প্যারিসের; এবং বিষবিক্রেতা বণিক্ ভেরোণার এপথিকারীর—প্রতিরূপ। যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী রাজ্ঞী বিমলা ও লেডী ম্যাক্‌বেথের চরিত্রের ছায়া অবলম্বন করিয়া গঠিত। যদিও এই দুই কামিনীর চরিত্রে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য উপলক্ষিত হয়, তথাপি ইহাঁদিগের অনুতাপ ও তজ্জনিত উন্মাদ এবং পরিণাম একইরূপ। ম্যাক্‌বেথের ন্যায় রাজা যশোবন্ত সিংহও ভূতপূর্ব্ব রাজা রণবীরসিংহের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন। তিনি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া রণবীর সিংহের গুপ্ত হত্যা সাধন পূর্ব্বক তদীয় গর্ভবতী পত্নীকে বনে বিসর্জ্জন করেন। সেই বনবাস অবস্থাতেই রাণীর গর্ভে যে কুমার জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারই নাম হেমচন্দ্র। ম্যাক্‌বেথ্ যেমন ডাকিনীদিগের মোহমন্ত্রে উত্তেজিত হইয়া তাদৃশ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, নগনলিনীতে যশোবন্ত সিংহও সেইরূপ স্বপ্নের কুহকিনী মায়ায় প্রতারিত হইয়া তাদৃশ যাতুকজনোচিত কার্য্যের

অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ম্যাক্‌বেথের হৃদয় যেমন প্রথমে দয়াদাক্ষিণ্যাদির আধার ছিল, যশোবন্ত সিংহের হৃদয়ও সেইরূপ ছিল। পাপপথে একবার অগ্রসর হইয়া ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ের ন্যায় তাহা ক্রমেই আবিল হইতে লাগিল। ম্যাক্‌বেথের ন্যায় ক্রমেই যশোবন্ত সিংহের রক্তপিপাসা বলবতী ও স্বাভাবিকী হইয়া উঠিল। তিনি অবশেষে রণবীর সিংহের একমাত্র বংশধর হেমচন্দ্রের সংহারে কৃতসংকল্প হইলেন। ইহাই তাঁহার পতনের অপ্রতিবিধেয় কারণ হইয়া উঠিল। রাণী বিমলার নিকট পরামর্শ চাহিলেন, রাণী নিষেধ করিলেন। রাজা তাঁহার নিষেধ শুনিলেন না, রাণী উন্মত্ত হইলেন। কিন্তু এ উন্মাদ লেডী ম্যাক্‌বেথের উন্মাদের ন্যায় স্বকৃত পাপের অনুশোচনার ফল নহে। তাহা সতীত্বের চরম উৎকর্ষের ফল। স্বামী ঘোর পাতকী, নিষেধের অবাধ্য। ইহা অপেক্ষা সতীর অধিকতর যন্ত্রণার বিষয় আর কি আছে? লেডী ম্যাক্‌বেথও সতীত্বের ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্তস্থল। স্বামীকে উচ্চ সিংহাসনে আসীন করিবার জন্য স্ত্রী-প্রকৃতি কতদূর নরকগামিনী হইতে পারে তিনি তাহার চরম নিদর্শন। লেডী ম্যাক্‌বেথ্ নিজকৃত পাপের অনুশোচনায় উন্মাদগ্রস্ত, কিন্তু পবিত্রহৃদয়া দেবী বিমলা স্বামিকৃত পাপের অনুশোচনায় উন্মাদগ্রস্ত। এই দুই রমণী-কুসুমই সেই ঘোর অনুশোচনা-নিদাঘ-তাপে বিশুষ্ক হইয়া স্বামীর অগ্রেই জীবলোক হইতে অন্তর্ধান করেন। তাহার পর, যশোবন্ত সিংহ ও ম্যাক্‌বেথ্ উভয়েরই এক ভীষণ পরিণাম।

রাজবালা নলিনী হেমচন্দ্রের প্রেমভিখারী ও প্রণয়পাত্রী। প্রাণের হেমকে পিতা বধ করিবেন এ চিন্তা নলিনীর অসহনীয়। হেমের প্রাণরক্ষা তাঁহার একমাত্র চিন্তা ও জীবনের শেষ ব্রত হইয়া উঠিল। এই চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় আবার শিকারতীর রাজকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। এই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য নলিনী ব্রহ্মচারীর পরামর্শে ফ্রায়ারের উপদেশে জুলিয়েটের ন্যায় চৈতন্যহারক এক প্রকার ঔষধ পান করিলেন। চৈতন্য লোপ হওয়ার পূর্ব্বে তিনি পিতার নিকট এই অনুরোধ করেন যেন তাঁহার দেহ ভস্মসাৎ করা না হয়। তাঁহার চৈতন্যলোপ হইল, তিনি মৃত বলিয়া উদ্ঘোষিত হইলেন। তাঁহার দেহ সজ্জিত অবস্থায় শ্মশানে পরিত্যক্ত হইল। ফ্রায়ার যেমন জুলিয়েটের মৃত্যু সংবাদের কাল্পনিকতা দূত দ্বারা রোমিওকে লিখিয়া পাঠান; কিন্তু সে সংবাদ রোমিওয়ের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জুলিয়টের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া রোমীয় যেমন ভেরোনা যাত্রা করিয়াছিলেন; সেইরূপ ব্রহ্মচারীও ইন্দ্রদমন দ্বারা নলিনীর কাল্পনিক মৃত্যু-ঘটিত ষড়যন্ত্রের সংবাদ হেমচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠান কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইন্দ্রদমন হেমচন্দ্রের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হেমচন্দ্র নলিনীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া শ্মশানে

তাঁহার শয্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন, দেখিলেন সত্য সত্যই নলিনী মৃতা পড়িয়া আছেন। তিনি স্বহস্তে কোন বণিকের বিপণি হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিলেন। এবং রোমিওর ন্যায় প্রিয়তমার পার্শ্বে বসিয়া সেই বিষপান করিলেন। ক্রমে অবসন্ন ও মৃত প্রায় হইয়া প্রিয়তমার পার্শ্বে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিয়ৎপরে নলিনীর মোহভঙ্গ হইল। নলিনী উঠিয়া দেখিলেন পার্শ্বে প্রাণাধিক হেমচন্দ্রের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলেন হেমচন্দ্র তাঁহাদিগের ষড়যন্ত্রের সংবাদ না পাইয়া তাঁহাকে বাস্তবিকই মৃত মনে করিয়া তাঁহার শোকে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক তিনি বহু বিলাপের পর যে পাত্রে হেমচন্দ্র বিষপান করিয়াছিলেন সেই পাত্রে যে অল্প বিষ ছিল তাহা পান করিয়া প্রিয়তমের অনুগমন করিলেন। জুলিয়েটও যখন মোহনিদ্রা হইতে অভ্যুত্থিত হন তখন পার্শ্বে প্রিয়তমের মৃতদেহ পতিত দেখিয়া বহু বিলাপের পর বিষপানে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু বিষপাত্রে বিষ নাই দেখিয়া স্বামীর বিষসিক্ত অধর চুম্বন করেন। তাহাতেও বিষ নাই দেখিয়া অবশেষে পার্শ্বে পতিত ছুরিকা বক্ষে প্রবেশিত করিয়া স্বামীর ক্রোড়ে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়েন। এই প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সমস্তই ম্যাক্‌বেথ্ ও রোমিও জুলিয়েটের সংমিশ্রণে সংগঠিত।

যাহা হউক গ্রন্থকার যে এই সংমিশ্রণ ও রূপান্তরীকরণ ব্যাপারে কিয়ৎ পরিমাণেও সেই প্রকাণ্ড নাটকদ্বয়ের সৌন্দর্য্য রাখিতে পারিয়াছেন ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয়।

অদ্ভুত দিগ্বিজয়—সারভেন্টিস কৃত সুপ্রসিদ্ধ ডন্‌কুইক্সোট্ ডি লামাঞ্চা নামক গ্রন্থের অবলম্বনে লিখিত উপাখ্যান। পূর্ব্ব খণ্ড, আদিপর্ব্ব। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী-প্রণীত। প্রথম সংস্করণ। কলিকাতা চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। অনন্ত পাশ্চাত্য-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে আমরা যত রত্ন আহরণ করিতে পারি, ততই আমাদিগের মঙ্গল, ততই বাঙ্গালা ভাষার আশু উন্নতি ও পরিণতির সম্ভাবনা। মৌলিকতার অভিমানে যদি আমরা সকল বস্তুই নূতন করিয়া গড়িতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতায় উপনীত হইতে আমাদিগের আরও দুই সহস্র বৎসর লাগিবে। বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় পোত, তড়িৎ-বার্ত্তাবহ, মুদ্রাযন্ত্র, বস্ত্র যন্ত্র, প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র এবং নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য—এ সমস্ত যদি আমরা ইউরোপের নিকট হইতে শিক্ষা ও অনুকরণ না করিয়া আমূল ইহাদিগের উদ্ভাবনে নিযুক্ত হই, তাহা হইলে আমাদিগের যন্ত্রণারও পরিসীমা থাকিবে না এবং বহ্বায়াসজনিত ফলও সুদূর-পরাহত হইবে, এবং যদিও আমরা এ সমস্তের পুনরাবিষ্কারে সমর্থ হই, তথাপি আমরা নবাবিষ্কারের গৌরব

লাভ করিতে পারিব না। বিজ্ঞানবিষয়ে যেরূপ, সাহিত্য-বিষয়েও সেইরূপ। যে সকল অমূল্য চিন্তা, অমূল্য ভাব, এবং অমূল্য কল্পনা পাশ্চাত্য সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার প্রতিরূপ দ্বারা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূরিত করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক। আমাদিগের গ্রন্থকার সেই বিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ডন্‌কুইক্সোট্ ইউরোপে এত আদৃত, যে ইউরোপীয় প্রায় সমস্ত ভাষাতেই ইহার অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। ইহার কল্পনা এরূপ হৃদয়গ্রাহিণী ও কৌতুক-জননী যে যে ভাষাতেই কেন ইহাকে রূপান্তরিত করুন্ না ইহার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য বিকৃত হইবে না। গ্রন্থকার আশঙ্কা করিয়াছেন "হয়ত, আমার এই লেখনীর আঘাতে মহাকবির সুরঞ্জিত চারুচিত্র এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইবে—হয়ত বঙ্গের চক্ষে তদীয় অলোকসাধারণ গুণ সন্নিপাত দোষ রাশিতে পরিণত হইবে—হয়ত তাঁহার সুবিমল কীর্ত্তি-কুসুম মলিন ও বিশুষ্ক হইয়া, নিয়তির অন্তস্তল স্পর্শ করিবে—হয়ত মহাকবির চিরজীবনী প্রতিভা কল্পনা-সাগর মন্থন করিয়া, যে দেবদুর্ল্লভ অপূর্ব্ব দিব্য পদার্থ সৃজন করিয়াছিল, মদীয় পাপ লেখনী সংস্পর্শে তাহাই রূপান্তরে উদ্গত হইয়া, বাঙ্গালার বিরাগ ও অসন্তোষ ভাজন হইবে।" আমরা বলি গ্রন্থকারের এরূপ আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই। মূল গ্রন্থের রূপান্তরীকরণে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন? সারভেন্‌টিসের প্রচণ্ড প্রতিভাবেগ ধারণ করিতে তিনি অনেক পরিমাণে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "কবিকল্পনার আংশিক ছায়া প্রকটন করিতে পারিলেও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।" আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে গ্রন্থকার ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

গ্রন্থের ভাষা অতি সুন্দর। আমরা নিম্নে তাহার দুই একটী নিদর্শন প্রদান করিলাম:—

"—নবোদিত অরুণের আরক্তিম রশ্মি-মালা গগনাঙ্গনে বিকীর্ণ হইলে; সুরঞ্জিত বিহগ-কুল মধুর কূজনে উষাদেবীর শুভাগমন দিগ্‌দিগন্তর বিঘোষণ করিলে; উষাদেবী প্রিয়তমের সহবাস শয্যা পরিত্যাগ করতঃ উদয়-গিরির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া মানবের নয়ন-পথবর্ত্তী হইলে; বিখ্যাত বীর মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাজ সিংহ শয়নাগার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিখ্যাত ঘোটক রোজিনান্তী আরোহণ করিয়া, প্রাতঃস্মরণীয় কুরুক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।"

'—সংসার-ললাম-প্রতিমে! অভাগার বলহীন জীবনের একমাত্র বল! নিস্তেজ অন্তরের প্রচণ্ড হুতাশন! রাজ্ঞি! কমলমালিনি! একবার তোমার মৃগ-লাঞ্ছিত নয়নের কটাক্ষ বিক্ষেপ কর! দেখ, আজি তোমার চিরদাসকে কি অসাধারণ বল বিক্রম প্রকাশ করিতে হইবে।'

বিষ-বিষ চিকিৎসা। The treatment of the Universal poisons শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত। প্রথম ভাগ। আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। আমরা এবার একখানি সংবাদ পত্রে দেখিলাম যে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর গড়ে বিংশ সহস্র লোক সর্পাঘাতে প্রাণ-ত্যাগ করে। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে বিষাক্ত সর্পের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সুতরাং সর্প দংশন ও সর্পাঘাতে মৃত্যুও সচরাচর ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বিষ-চিকিৎসার উৎকর্ষ সাধন বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থে বিষচিকিৎসার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা চিকিৎসকেরা বলিতে পারেন। কিন্তু এবিষয়ের আন্দোলন যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গ্রন্থকার এবিষয়ে যেরূপ আহরণ করিয়াছেন তাহাতে ইহা সাধারণের বিশেষ উপাদেয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থকার উপসংহার-কালে যে সতর্কতার উপদেশ দিয়াছেন সকলেরই তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা উচিত বলিয়া আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলামঃ—

"—বাটী ঘর, প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা, যখন কোন স্থান বেরিতে হইবে তখন বেড়ালতার মধ্যে শ্বেতকরবী ও জবার ডাল পুতিয়া দেওয়া, অন্য বৃক্ষের খুটী না করিয়া জিয়ালী বৃক্ষের (জিকা বা কাকেলা) খুটী দিলে সে অধিক দিন স্থায়ী ও উপকারী উভয়ই হয়। হাঁড়ী, কলসী, প্রভৃতি সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা, গৃহের কোন স্থানে গর্ত্ত থাকিলে তাহা বন্ধ করা, দুই বেলা বেশ করে, ঘর দরজা ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম, সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিতে হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যা-কালে নির্ধূম অগ্নিতে কিছু হলুদ ও কয়েকটা লঙ্কা মরিচ পোড়াইয়া, সেই ধূম গৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া উচিত, বাটী ঘর প্রভৃতি সাজাইতে হইলে, বকুল ফুলের মালা বা পাতার দ্বারা সাজাইলে, সর্প, বৃশ্চিক, প্রভৃতি আসিতে পারেনা। মধ্যে ২ গৃহে কিছু ধুনা, ও গন্ধক জ্বালাও। শয়ন কালে বিছানার আস পাশ দেখিয়া মশারি বন্ধ করিয়া শয়ন কর। এবং যাহাতে বিড়াল বা পোষিত বেজী প্রভৃতি বিছানাতে না আসিতে পারে তাহার উপায় কর। পোষিত পাখী থাকিলে তাহাকে সাবধানে গৃহান্তরে রাখ, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপায়ও দেখ।"

চরক সংহিতা——সূত্রস্থান। প্রথম খণ্ড। শ্রীবামাচরণ বরাট কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। চরক-সংহিতা সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা চারিভাগে বিভক্ত—সূত্রস্থান, নিদান-স্থান বিমানস্থান, শারীরস্থান। প্রকাশক তিন খণ্ডে সূত্রস্থান সমাপ্ত করিবেন এরূপ আশা দিয়াছেন। সূত্রস্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬২৫ টী শ্লোক। প্রথম খণ্ডে তাহার কিয়দংশ-

রাজ প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইংরাজী চিকিৎসার প্রথম আবির্ভাব হইতে অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরাজী চিকিৎসার প্রতি সাধারণের চিত্ত এতদূর আকৃষ্ট হয়, যে আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালীমতে চিকিৎসা করা অনেকেই কুসংস্কারের একটী অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সুতরাং লুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। তৎকালে আর্য্যশাস্ত্রমাত্রেরই প্রতি লোকে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল সে স্রোত ফিরিয়াছে, সে বেগ থামিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে সমস্ত ইউরোপ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যগণের কীর্ত্তিকলাপে বিমোহিত হইয়া ভক্তিপূর্ণ মনে ও নতশিরে তাঁহাদিগের গভীর গবেষণা সকলের অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া ভারতবর্ষীয় আধুনিক আর্য্যগণ লজ্জার অনুরোধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিতেছেন। এই বিপ্লবসময়ে, আমরা আশা করিতে পারি, চরক-সংহিতা অনুবাদ সহ সাদরে পরিগৃহীত হইবে। ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ইউরোপে ইহার গৌরব বিস্তার করিতেছেন। মূলের সহিত ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ—কি চিকিৎসক, কি বিষয়ী, কি সংসারী—বঙ্গবাসিমাত্রেরই যে বিশেষ উপকারে আসিবে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

পরিমিতি বা Bengali mensuration আইনর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার্থিদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়। লীলাবতীর কঠিন প্রশ্ন সমাধা-সম্বলিত পাটীক নিয়মাবলী। ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীহরিচরণ রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, বিরচিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৷৹ বার আনা মাত্র। এই বিষয়ে আরও কয়েক খানি পুস্তক সত্ত্বে যদিও ইহার প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয় না, তথাপি একজন বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া ইহা আমরা সমাদরে গ্রহণ করিলাম। ইহা ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রণীত বীজগণিত ও পাটীগণিত এই তিন খানি পুস্তক মূল অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে বিবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজি গণিত পুস্তকের ও লীলাবতীর এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার দুরূহ প্রশ্ন সকল কষিবার নানা প্রকার সঙ্কেত ও পাটীক নিয়মাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যে এরূপ গুরুতর শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন তাহা সফল হয়, ইহা আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

বাঙ্গালী গরিব কেন ?

বাঙ্গালী গরিব কেন জানিতে হইলে প্রথমতঃ বঙ্গদেশীয় লোকের অবস্থা সম্যক্ রূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশীয় লোক কি উপায়ে দিনপাত করে, কত লোক কোন্ কাজ করে, কৃষকের সংখ্যাই বা কত, শিল্পীর সংখ্যাই বা কত, বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী দুই একটী জেলার অবস্থা কতক জানিয়া এরূপ দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া দুঃসাহসিকের কার্য্য তাহা আমরা জানি। আমরা এই বিষয়ে হাত দিয়া কৃতকার্য্য হইব ভরসা করি না। কিন্তু যেহেতু কেহই দেশের প্রকৃত অবস্থা Economic Condition. দর্শন বিষয়ে মনোযোগী নহেন, এই জন্য যদি আমাদের যৎসামান্য কয়েকটী কথায় দেশের কোন উপকার হয় এই ভরসায় লেখনী ধারণ করিলাম।

টাকায় দেশ ধনী হয় না।

অনেকের সংস্কার আছে দেশে টাকা থাকিলেই দেশ সমৃদ্ধ হয়, টাকা না থাকিলেই নির্ধন হয়। অনেকেই দুঃখ করিয়া বলেন যে কালে রাজাদের বাড়ী কত হীরা জহরাৎ থাকিত, আমাদের দেশে কত ধনী ছিল, সেই সকল মুসলমানে লুট করিয়াছে; যাহা ছিল ইংরাজেরা লইতেছে। ইংরাজেরা রূপা টুকু পর্য্যন্ত দেশে রাখিতে চাহে না। পাঁচ টাকার নোট করিয়াছে, কোন দিন এক টাকার নোট করিবে। এই সংস্কারটী ভ্রান্ত সংস্কার। রূপা সোনা হীরা জহরাতে দেশ ধনী হয় না। বরং যে দেশে ঐ সকল বস্তু অধিক থাকে তথায় ধনাগমের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়। ধন কাহাকে বলে ? যাহা দ্বারা আমরা স্বচ্ছন্দে জীবন অতিপাতিত করিতে পারি তাহার নাম ধন। যে দ্রব্য থাকিলে আমরা অনায়াসে খাইয়া পরিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতে পারি সেই ধন। সে দ্রব্য কি ? রূপা না সোনা ? রূপা বা সোনায় উদর পুর্ত্তি হয় না, শরীর আচ্ছাদন হয় না, শয্যা হয় না, বাড়ী ঘর হয় না, কিছুই হয় না। স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবার জন্য রূপা সোনা কেহই নহে। তবে ধন কি ? কৃষিজ শিল্পজ বাণিজ্যানীত বিবিধ দ্রব্য। যাহাতে উদর পুর্ত্তি হয়, শরীর আচ্ছাদন হয়, শীত নিবারণ হয়, সংক্ষেপতঃ মনুষ্যের জীবন রক্ষা হয় ও স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হয় তাহাই ধন।

তবে টাকার দরকার কি ?

এ প্রশ্নটীর উত্তর দেওয়া আমাদের

প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালী গরিব কেন? এ প্রস্তাবে উহার বিশেষ আবশ্যকতা লক্ষিত হয় না। তথাপি টাকার দেশ ধনী হয় না—এ কথা শুনিয়া অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে টাকার দরকার কি? টাকার দরকার এই:—প্রকৃত ধন শস্যাদি, সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে সেই শস্যাদির বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। একজনে জীবনোপযোগী সমস্ত বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না। আমি ধান্যের চাস করিলাম। তুমি কাপড় বুনিতে শিখিলে, আমার চাসের তোমার দরকার। তোমার কাপড়ের আমার দরকার। আমার চাস বেশী আছে, তোমার কাপড় বেশী আছে। আমাদের বিনিময় প্রয়োজন। আমি চাল দিলে তুমি কাপড় দিবে। কিন্তু মনে কর আমার একখানি কাপড় দরকার, তোমার একসের চালের দরকার কেমন করিয়া বিনিময় হইবে। হয় তুমি ঠকিবে না হয় আমি ঠকিব। অতএব এইরূপ অসুবিধা নিবারণের জন্য এখন একটা জিনিস দরকার যাহা অংশ করিলে নষ্ট হয় না, যাহা সকলেই লইতে চায়। এইজন্য টাকার সৃষ্টি হইল। তোমার একসের চালের দরকার তুমি এতটুকু রূপা কাটিয়া দিলে, আমার একখানা কাপড়ের দরকার আমি এতটা রূপা দিলাম। রূপার প্রয়োজন ধনের বিনিময় সাধন, সেই রূপাকে ধন বলিয়া বলা নিতান্ত অন্যায়।

বাঙ্গালী গরিব কেন?

যাহা হউক আমরা এক্ষণে আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করি। দেশ গরিব হয় কিসে? (১) যদি উৎপন্ন কম হয় তাহা হইলে দেশ গরিব হয় (২) আর যাহা উৎপন্ন হয় তাহা যদি পাঁচ জনে সমান ভাগ না করিয়া একজন অধিক লয় আর চারি জন কিছুই না পায়, তাহা হইলেও দেশ দরিদ্র হইল। ইহা ভিন্ন বোধ হয় কোন্ দেশ গরিব হইবার আর কারণ নাই। এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্গদেশে উৎপন্নই বা কিরূপ হয় আর সেই উৎপন্নের ভাগই বা কি রূপ হয়।

উৎপত্তির কারণ কি?

শস্যাদি উৎপত্তির তিনটী কারণ টকনমিষ্ট মহোদয়গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই তিনটী এই জমী মজুরী আর ধন। তিনটীরই প্রয়োজন, তিনটীর একটী না হইলে উৎপন্ন হইবে না। জমী নহিলে কিছুই হইবে না। আর জমী রহিল তুমি যদি মজুরী না কর কিছুই জন্মিবে না। বনের ফল সংগ্রহ করিবে তাহাতেও মজুরী দরকার। বিনা মজুরীতে জমীতে জঙ্গল হয় কোন উৎপন্ন হয় না। অতএব যেমন জমীর দরকার তেমনি মজুরীর দরকার। তেমনি আবার মূলধনের দরকার। তুমি চাস করিবে তোমার লাঙ্গল চাহি, তোমার মূলধন না থাকিলে তুমি লাঙ্গল কোথায় পাইবে। বলে বা এমন

কার্য্য আছে যাহাতে কোন রূপ লাঙ্গলাদি দরকার হয় না। তোমার ত খাইতে হইবে, বাঁচিতে হইবে, তোমার উৎপন্ন পরে হইবে, বনের ফল তুমি কাল সংগ্রহ করিবে, আজ তুমি কি খাইয়া বাঁচ? তোমার মূল ধনের দরকার সুতরাং মূলধনের প্রয়োজন হইল। তিনের একটীর অন্যথা হইলে হইবে না।

বাঙ্গালায় কি পরিমাণে আছে ?

এখন দেখা যাউক উৎপত্তির এই তিন কারণ বাঙ্গালায় কি পরিমাণে আছে। যে কালে রাশি রাশি শস্য প্রতিবৎসর উৎপন্ন হইতেছে সে কালে এ তিনের কোনটী নাই বলিতে পারি না, তিনটীই আছে তবে কোন্‌টী কি পরিমাণে।

১ম জমী।

বাঙ্গালার জমী অপর্য্যাপ্ত আছে, যত লোক তাহার প্রয়োজনাতীত জমী আছে। জমী অতি উৎকৃষ্ট অতিশয় উর্ব্বরা। বিনা সার প্রয়োগে শস্য উৎপন্ন হয়। তাহার পর বাঙ্গালায় অনেক নদী, শস্য একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবারও বেশ সুবিধা। জমীর উর্ব্বরতা ও শস্য-প্রেরণ-সুকরতা এই দুইটিই প্রধান গুণ বলিয়া ইকনমিষ্ট মহোদয়গণ বলিয়া থাকেন। বাঙ্গালার জমীর দুইটিই আছে। কিন্তু এখন এ জমীর দোষ আছে। বাঙ্গালার অধিকাংশ জমী দেবমাতৃক অর্থাৎ আকাশের উপর অনেক স্থানে নির্ভর করিতে হয়। যদি সেই সকল স্থানে খাল খনন করিয়া এই জমীকে নদী-মাতৃক করা যায়, দুর্ভিক্ষাদির ভয় কমিয়া যাইবে। দেবমাতৃকতা দোষ নিবারণ করা খননাদি দ্বারা হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা উষ্ণ-প্রধান দেশ, এদেশে ধারে অনেক শস্য নষ্ট করে তাহার উপায় হইবার যো নাই। যাহা হউক বাঙ্গালা জমী বিষয়ে গরিব নহে বরং পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা ধনী।

২য় মজুরী।

বাঙ্গালায় লোক অলস বলিয়া ত আজ কাল সকলেই বাঙ্গালীকে গালি দিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহা সত্য? বাস্তবিক কি আমরা বড় অলস? বোধ হয় না। ভদ্র লোকের মধ্যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে, পরিশ্রমী লোক কম বটে, কিন্তু চাসারা ত সকলেই পরিশ্রমী, সকলেই খাটে, আর আমরা যে কোন গ্রন্থ খুলি দেখিতে পাই বাঙ্গালীরা বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী। বাঙ্গালীরা পরিশ্রমী এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ধনোৎপাদনে উচ্চদরের পরিশ্রম একটুও করা হয় না। চাসা লোকের যৎসামান্য বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, তাহারাই খাটে, কোন ভদ্র লোক বা বুদ্ধিমান্ লোক তাহাদের সাহায্য করিতে রাজি নহেন। পরিশ্রম দুই প্রকার শারীরিক ও মানসিক। শুদ্ধ শারীরিক পরিশ্রমও কোথাও মিলে না। শুদ্ধ মানসিক পরিশ্রমও কোথাও মিলে না। চাসারা যে

শ্রম করে তাহাতে মানসিক শ্রম অতি অল্প। ভদ্র লোকের শ্রমে উহাই অধিক; কিন্তু ভদ্র লোকের মানসিক পরিশ্রম এখন চাসাদের সপক্ষে না হইয়া বিপক্ষে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যত ভদ্র লোক, হয় জমীদার না হয় মহাজন। যদি ভদ্র লোকে চাসের তত্ত্বাবধারণ করেন অথবা যদি চাসাদিগকে শিক্ষা দ্বারা সেই দরকারী মত বুদ্ধি টুকু দেওয়া যায় তবেই উচ্চ দরের পরিশ্রম চাসে লাগিবে। নচেৎ বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গীয় উৎপাদক শ্রমের বিজাতীয় দোষ মানসিক শ্রমের সহিত অল্প সম্বন্ধ। বাঙ্গালার শারীরিক শ্রম উৎকৃষ্ট নহে। বাঙ্গালীরা সম্বৎসর নিয়মিত সমান জোরে খাটিতে পাবে না। শীত-প্রধান দেশীয় লোক যেমন ক্রমাগত একই টানে খাটিয়া যায়, আমরা তাহা পারিনা। এই দুই কারণ বশতঃ বাঙ্গালায় উৎপাদক শ্রম অতি মন্দ। উৎপাদন কার্য্যে ইহাতে বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়।

উৎপাদন কার্য্যে মূলধন প্রয়োগের অল্পতা।

মূলধন দুই প্রকার, এক প্রকারে হল লাঙ্গলাদি উৎপন্ন হয়, আর এক প্রকারে শ্রমজীবীদিগের ভরণপোষণ হয়। এতদ্ভিন্ন জমীর উন্নতি কার্য্যেও মূলধন ব্যয়িত হইতে পারে। তিন প্রকার মূলধনেরই এদেশে অভাব। প্রথম মান্ধাতার আমলেও যে হাতিয়ার চলিয়াছে আজিও তাহাতেই চলিতেছে। ইহার কারণ উহাতে মূলধন ব্যয় করা হয় না। জমীর উন্নতি করা হয় না। বিশ ক্রোশ বিল আছে, শস্য হয় না। যদি কিছু খরচ করিয়া জল বাহির করিয়া দেওয়া যায় তবে জমীর উন্নতি করা হইল। কিন্তু তাহা কখনই হয় না। ইহার কারণ কি, মূলধন অল্প। তাহার পর চাসারা যে সম্বৎসর খায় সে টাকাও অল্প। যদি যে টাকায় চাসারা খায় সে টাকা অধিক হইত তবে আর দেড়া বা দুই গুণ বাড়ি গুনিতে পাইতাম না। কাজেই অল্প টাকা ধার করিতে হইলেই অধিক সুদের কম মহাজন ছাড়িবে কেন?

যাঁহারা বলেন বাঙ্গালায় টাকা নাই তাঁহারা এই সময়ে আমাদিগকে বলিবেন এই ত আমরা বলিতেছিলাম বাঙ্গালায় টাকা নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় টাকা নাই সেই তাঁহাদের ভ্রম। টাকা বিনিময়-সাধন-সামগ্রী মাত্র। অধিক থাকিলে বিনিময়ের একটু সুবিধা হইবে, অল্প থাকিলে অসুবিধা হইবে এইমাত্র। বিনিময়ের দ্রব্য শস্যাদি ত আছে, তাহা হইলেই হইল, তাহা হইলেই বাঙ্গালা ধনী হইল।

এরূপ মূলধন-অল্পতার কারণ কি?

কয়েকটী কারণ নির্দেশ করিব। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এদেশে অলস লোক অধিক। একজন উপার্জ্জন-ক্ষম হইলেন ত দশজন অলসে তাঁহার [illegible] পড়ি [illegible] দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া [illegible]

আছেন তাঁহারা এখন জগতের কোন উপকার করেন কি ? করুন আর নাই করুন লোকের টাকা যাহাতে সঞ্চয় না হয় সে বিষয়ে তাঁহাদের খুব নজর। তোমার কিছু নাই, ব্রাহ্মণ তোমার কাছে ঘেঁসিবেন না। দুই টাকা হইবে এই আশা পাইলেই তোমার নিকট আসিলেন। প্রথম মেয়েদের ধন গচ্ছানিয়া ফলদান প্রভৃতি ছোট ছোট ব্রতে দীক্ষিত করিলেন! তাহার পর ক্রমে বড় ব্রত আসিতে লাগিল। ক্রমে ব্রতেই তোমার ২।৩ শত টাকা বৎসর দিতে হইল। তাহার পর পুত্র হইলে একটি নহে আধটি নহে বারটি সংস্কার, পিতৃকৃত্য মাতৃকৃত্য, দোল দোল দুর্গোৎসব, শেষ গ্রামশিলা শেষ বিগ্রহ ও মন্দির। তুমি কত সঞ্চয় করিবে। অলস লোক অধিক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (এই অলস লোক চাসাদের মধ্যে বড় নাই) উহাদের খাওয়া পরা ও বাবুগিরি ইহাতেই অনেক ব্যয় হয়। তাহাতে আমাদের এ সংসারে তত টান নাই। আমরা জানি এসবই মিথ্যা, অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা বৃথা, এই জীবন কাটিলেই হইল। সুতরাং অধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়া এসংসারে অধিক সুখী হইবে সে চেষ্টা নাই। আমাদের কালি কি হবে এ ভাবনাও বড় নাই "জীব দিয়াছেন যিনি শিব দিবেন তিনি" এই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষকার আমরা প্রায়ই বিসর্জ্জন দিই। টাকা হাতে আসিলেই খরচ করিয়া ফেলি। যতক্ষণ খরচ না হয় ততক্ষণ যেন ইহা সর্ব্বাঙ্গ কামড়ায়। আমাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা নাই, সঞ্চয়ের জন্য যত্নও নাই। সঞ্চয় হয়ওনা সঞ্চয় না হওয়ায় শস্য উৎপাদনও ভাল হয় না। চাসারা সঞ্চয় করেনা, বৎসরের তিন মাস ধার করিয়া খায়, এবৎসর যদি ৩ মাস ধার করিয়া খাইল, দেড়া বাড়িদিল; আর বৎসর তাহাকে ৪॥ সাড়ে চারিমাস ধার করিয়া খাইতে হইবে। এইরূপে ধারই বাড়িয়া চলিল। সঞ্চয় না হওয়ায় জমীর উন্নতি হয় না। অস্ত্র শস্ত্র ভাল হয় না। কৃষিকার্য্য ভাল হয় না।

বঙ্গদেশ কৃষি-প্রধান দেশ। এখানকার পরিশ্রম কৃষিকার্য্যেই অধিক ব্যয়িত হয়। শিল্প আমাদের ছিল, রেসম ও তুলার কাপড় এই দেশেই হইত। কিন্তু এক্ষণে তাহা নাই। যে কিছু শিল্প আছে তাহা গণ্যের মধ্যে ধরা যায় না। সোনা রূপার গহনা, কাঁসা পিত্তলের বাসন, মোটা লোহার অস্ত্রশস্ত্র, সরু কাপড়, তসর গরদ কিছু কিছু এখনও আছে। শিল্পজীবিদিগের অবস্থা মন্দও নহে। শিল্পজীবিরা পরিশ্রমী কিন্তু তাহারাও সঞ্চয়ী নহে। শিল্প বিষয়ে ভবিষ্যতে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মূলধনের বিষয় আর এক কথা বলিতে বাকি আছে। ইদানীং আমাদের দেশে বিদেশীয় টাকা অনেক ব্যয় হইতেছে। রেলওয়ে, প্রভৃতি রাস্তা, ভূমির উন্নতি হইতেছে। নীলকুঠি চাকুটি প্রভৃতি

যায় দুতন নূতন ফসল উৎপন্ন হইতেছে। বিদেশীয়দিগের সহবাসে অনেকে সঞ্চয় করা অভ্যাসও করিয়াছে। কয়েক-বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীরা নীলের আবাদে বিলক্ষণ কৃতার্থ হইয়াছেন। অনেক বিলাতী নীলকুঠী উঠিয়া যাইতেছে।' দুই এক জন বাঙ্গালী নীলকুঠী ওয়ালার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইয়াছে। এরূপ ভরসা করা যাইতে পারে অল্প দিনের মধ্যে চাস কর্ম্মে বৈদেশিকেরা এদেশে আমাদের সঙ্গে পারিবে না। নীল চা রেসম লা যাহা এক্ষণে সাহেবদের হস্তেই অধিক, ক্রমে বাঙ্গালীদের হস্তে পড়িতে পারে।

বাঙ্গালার ভূমি উৎকৃষ্ট হইলেও পরিশ্রমের দোষে ও সঞ্চয় না থাকায় ফসল জন্মানর বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতেছে। আমাদের জাতীয় চরিত্র পরিবর্ত্তিত না হইলে আমাদের পূর্ব্বোক্ত দুইটি দোষ যাইবে না। পূর্ব্বোক্ত দুইটি দোষ না গেলেও বাঙ্গালার যেমন ভূমি তেমন ফসল হইবে না। যখন আমরা সঞ্চয় করিতে শিখিব আর যখন ভদ্র লোকে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবেন, তখন বাঙ্গালা বাস্তবিক ধনী হইবে, এখন বাঙ্গালা গরিব। যদিও বাঙ্গালা হইতে শস্য রপ্তানি হইতেছে, তথাপি বাঙ্গালা গরিব। গরিব বলিয়া শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে বাঙ্গালা ধনবান্ হইয়াছে বলিতে হইবে আর হইবারও সম্ভাবনা।

বাঙ্গালার দারিদ্র্যের দ্বিতীয় কারণ উৎপন্ন দ্রব্যের অসম বিভাগ। যাহা কিছু যে বৎসর উৎপন্ন হইল সে সমুদয় জাতীয় সম্পত্তি। রাজার রাজ্যে বাস করিতে হয়, রাজার ও রাজ্যের খরচ সেই জাতীয় সম্পত্তি হইতে দাও। বাকী শ্রমজীবী দিগকে বিভাগ করিয়া দাও। তাহার পর কেহ শ্রমজীবীদিগের নিকট হইতে তাহাদের তুষ্টি সাধন করিয়া যে কেহ কিছু লইতে পারে লউক তাহাতে ক্ষতি নাই। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া, পণ্ডিত বিদ্যা শিক্ষা দিয়া, ময়রা মিষ্টান্ন বিস্ময় করিয়া, বাদ্যকর বাজনা বাজাইয়া, গায়ক গান করিয়া লও ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহাদিগকে পেটে মারিয়া যদি সমস্তই রাজা গ্রহণ করেন, সে রাজা অত্যাচারী রাজা। যদি জমীদারেরা গ্রহণ করেন, তবে জমীদারেরা অত্যাচারী জমীদার। যদি মহাজনেরা গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা অত্যাচারী মহাজন। আমাদের দেশের আইন এ তিনই অত্যাচারী হইয়াছেন। রাজার কর স্থাপনের ক্ষমতা অসীম। তাঁহার এই জ্ঞান থাকিলেই হইল যে প্রজারা কর দিতে পারিবে (প্রজাদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই) নূতন নূতন কর সংস্থাপন করিতেছেন, যত দূর পারিতেছেন নিঙ্গড়াইয়া আদায় করিতেছেন।

এটী অত্যাচার তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সপক্ষে একটী কথা বলা যায় যে তিনি এই সকল কর রেলওয়ে খাল ইত্যাদি করিবার জন্য গ্রহণ করেন। আপাততঃ দেশের উন্নতিই কর গ্রহণের অর্থ। আইন

নহে জমীদার জমীর মালিক। যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খাজনা দিবে সেই জমী করিতে পারিবে। রাজার ন্যায় জমীদারও ক্রপ লাগাইতেছেন, যতদূর পারিতেছেন আদায় করিতেছেন, আইন—তাঁহার জমী তিনি বন্দোবস্ত করিবেন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। অধিক সুদের বিরুদ্ধে যে আইন ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে। মহাজন নাতওয়ান চাসার নিকট যত পারিতেছেন আদায় করিতেছেন। যাহার সমুদয় পাইবার কথা সেকিছুই পাইল না। খাইল বার ভূতে। চাসা ধারে ডুবিয়া মরিল। এরূপ অসম বিভাগ বাঙ্গালার গরিব হইবার প্রধান কারণ। প্রথম যাহা উৎপন্ন হয় তাহা যত অধিক বলিয়া শুনা যায় তত নহে। তাহার পর সেই উৎপন্ন দ্রব্যে কৃষিজীবীদিগের কোন সত্ব নাই প্রায়ই আর পাঁচজনে খায়। আর দেশ গরিব হইবে না ত কি?

যাঁহারা বলেন হীরা জহরাৎ সোণা রূপা থাকিলেই দেশ ধনী হয় তাঁহারা দেশকে কেন গরিব বলেন জানি না। জমীদারের ঘরেত অনেক টাকা থাকার সম্ভাবনা। মহাজনও ত বড় মানুষ হইবার কথা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা থাকে না। সঞ্চয়ের ক্ষমতা কাহারই নাই। সকলেই খরচ করিয়া ফেলে। সে খরচে উৎপত্তির সাহায্য হয় না। মনে কর খরচ নাই করিল, সেটাকা একজন কৃপণ জমীদারের গৃহে জমা রহিল। লাভ কি হইল? দেশের লোক যেমন গরিব তেমনি রহিল জমীদার বড় মানুষ রহিলেন। যদি ঐ টাকা সহস্র কৃষকের ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিত ভূমির উন্নতি হইত। ভাল অস্ত্র শস্ত্র হইত, কৃষককে ধারে ডুবিতে হইত না, বঙ্গদর্শনে চারি বৎসর পূর্ব্বে একবার এই কথার প্রস্তাব হইয়াছিল। আজি আবার হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ—

ফুলবালা

গীতিকা

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ধারা দিতেছে ঢালি।
মলয় চলিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভি ডালি।

যমুনা বহিছে নাচিয়া নাচিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া অফুট গান;
থাকিয়া থাকিয়া, বিজনে পাপীয়া
কানন ছাপিয়া তুলিছে তান।

পাতায় পাতায় লুকায়ে কুসুম,
কুসুমে কুসুমে শিশির ছলে,
শিশিরে শিশিরে জোছনা পড়েছে,
মুকুতা গুলিন সাজায়ে ফুলে।

তটের চরণে তটিনী ছুটিছে
ভ্রমর লুটিছে ফুলের বাস
সেঁউতি ফুটিছে, বকুল ফুটিছে
ছড়ায়ে ছড়ায়ে সুরভি শ্বাস।

কুহরি উঠিছে কাননে কোকিল
শিহরি উঠিছে দিকের বালা
তরল লহরী গাঁথিছে আঁচলে
ভাঙ্গা ভাঙ্গা যত চাঁদের মালা।

ঝোপে ঝোপে ঝোপে লুকায়ে আঁধার
হেথা হোথা চাঁদ মারিছে উঁকি।
সুধীরে আঁধার ঘোমটা হইতে
কুসুমের থোলো হাসে মুচুকি।

এস কল্পনে! এ মধুর রেতে
দুজনে বীণায় পুরিব তান।
সকল ভুলিয়া হৃদয় খুলিয়া
আকাশে তুলিয়া করিব গান।

একই নিমিখে হেরিব দুজনে
আকাশ পাতাল স্বরগ ধরা
তাই বলি বালা বীণাখানি লয়ে
মনে প্রাণে ঢালো সুধার ধারা।

হাসি কহে বালা "ফুলের জগতে
যাইবে আজি কে কবি?
দেখিবে কত কি অদ্ভুত ঘটনা
কতকি অদ্ভুত ছবি!

চারিদিকে যেথা ফুলে ফুলে আলা
উজলিছে মধুপ-কুল।

ফুল দলে দলে ভ্রমি ফুল-বালা
ফুঁদিয়া ফুটায় ফুল।

দেখিবে কেমনে শিশির সলিলে
মুখ মাজি ফুলবালা
কুসুম রেণুর সিঁদুর পরিয়া
ফুলে ফুলে করে খেলা।

দেহখানি ঢাকি ফুলের বসনে
প্রজাপতি পরে চড়ি
কমল-কাননে কুসুম-কামিনী
ধীরে ধীরে যায় উড়ি।

কমলে বসিয়া মুচুকি হাসিয়া
দুলিছে লহরী ভরে
হাসি মুখখানি দেখিছে নীরবে
সরসী আরশি পরে।

ফুল কোল হতে পাপড়ি খসায়ে
সলিলে ভাসায়ে দিয়া
চড়ি সে পাতায় ভেসে ভেসে যায়
ভ্রমরে ডাকিয়া নিয়া।

কোলে ক'রে লয়ে ভ্রমরে তখন
গাহিবারে কহে গান।
গান গাওয়া হলে হরষে মোহিনী
ফুল মধু করে দান।

দুই চারি বালা হাত ধরি ধরি
কামিনী পাতায় বসি
চুপি চুপি চুপি ফুলে দেয় দোল
পাপড়ি পড়য়ে খসি।

দুই ফুল বালা মিলিবা কোথায়
গলা ধরা ধরি করি
ঘাসে ঘাসে ঘাসে ছুটিয়া বেড়ায়
প্রজাপতি ধরি ধরি।

কুসুমের পরে হেরিলা ভ্রমরে
ঘুমায়িছি পাতার ন্যায়
ফুল ফাঁদে ফেলি শাখায় শাখায়
কুসুম রেণুর ভার
ফাঁফরে পড়িয়া ভ্রমর উড়িয়া
বাহির হইতে চায়
কুসুম রমণী হাসিয়া অমনি
ছুটিয়ে পালিয়ে যায়।
ডাকিয়া আনিয়া সবারে তখনি
প্রমোদে হইয়া ভোর
কহে হাসি হাসি করতালি দিয়া
"কেমন পরাগ চোর!"
এত বলি ধীরে কলপনা রাণী
বীণায় আভানি তান
বাজাইল বীণা আকাশ ভরিয়া
অবশ করিয়া প্রাণ!
গভীর নিশীথে সুদূর আকাশে
মিশিল বীণার রব
ঘুম ঘোর হতে জাগিয়া উঠিল
দিকের বালিকা সব।
ধীরে ধীরে ধীরে উঠিলরে তান
সুর বালা এত ফেলিয়া কেলী
শুনিতে লাগিল অবাক হইয়া
পৃথিবীর পানে নয়ন মেলি!
ধীরে ধীরে ধীরে উঠিলরে ধ্বনি
মধুরে ছাপিয়া নদীর গান
আকাশ ছাইয়া, স্বরগ ছাইয়া
কোথায় উঠিল মধুর তান।
ঘুমায়ে পড়িল আকাশ পাতাল
ঘুমায়ে পড়িল স্বরগ বালা

দিগন্তের কোলে ঘুমায়ে পড়িল
জোছনা মাখানো জলদ মালা
একি একি ওগো কলপনা সখি!
কোথায় আনিলে মোরে
ফুলের পৃথিবী—ফুলের জগৎ—
স্বপন কি ঘুম ঘোরে?
হাসি কলপনা কহিল শোভনা
"মোর সাথে এস কবি!
দেখিবে কতকি অদ্ভূত ঘটনা
কতকি অদ্ভূত ছবি!
ওইদেখ ওই ফুল বালা গুলি
ফুলের সুরভি মাখিয়া গায়
শাদা শাদা ছোট পাখা গুলি তুলি
একুলে ওকুলে উড়িয়া যায়
একুলে লুকায় ওফুলে লুকায়
একুলে ওফুলে মারিছে উঁকি!
গোলাপের কোলে উঠিয়া দাঁড়ায়
ফুল টল মল পড়িছে ঝুঁকি!
ওই হোথা ওই ফুল-শিশু সাথে
বসি ফুল বালা অশোক ফুলে
দুজনে বিজনে প্রেমের আলাপ
কহে চুপি চুপি হৃদয় খুলে
কহিল হাসিয়া কলপনা বালা
দেখায়ে কতকি ছবি;
"ফুল বালাদের প্রেমের কাহিনী
শুনিবে এখন কবি?"
এতেক শুনিয়া আমরা দুজনে
বসিনু চাঁপার তলে
সুমুখে মোদের কমল কানন
আছে সরসীর জলে

একি কলপনা, এ কলো তরুণী
দুরন্ত কুসুম শিশু,
ফুলের মাঝারে লুকায়ে লুকায়ে
হানিছে ফুলের ইষু।

চারিদিক হোতে ছুটিয়া আসিয়া
হেরিয়া নূতন প্রাণী
চারিধার ঘিরি রহিল দাঁড়ায়ে
যতেক কুসুম রাণী!

গোলাপ মালতী, শিউলী সেঁউতি
পারিজাত নরগেশ,
সব ফুল বাস মিলি এক ঠাঁই
ভরিল কানন দেশ

চুপি চুপি আসি কোন ফুল শিশু
ঘা মারে বীণার পরে
ঝন্ করি যেই বাজি উঠে তার
চমকি পলায় ডরে!

অমনি হাসিয়া কলপনা সখি
বীণাটি লইয়া করে
ধীরি ধীরি ধীরি মৃদুলমৃদুল
বাজায় মধুর স্বরে।

অবাক্ হইয়া ফুলবালাগণ
মোহিত হইয়া তানে
নীরব হইয়া চাহিয়া রহিল
শোভনার মুখ পানে

ধীরি ধীরি সবে বসিয়া পড়িল
হাত খানি দিয়া গালে
ফলে বসি বসি ফুল শিশুগণ
দুলিতেছে তালে তালে।

হেন কালে এক আসিয়া ভ্রমর
কহিল তাদের কানে—
"এখনো রয়েছে বাকী কত কাজ
বসে আছ এই খানে?

রঙ্ দিতে হবে কুসুমের দলে
ফুটাতে হইবে কুঁড়ি
মধুহীন কত গোলাপ কলিকা
রয়েছে কানন জুড়ি!"

অমনি যেনরে চেতন পাইয়া
যতেক কুসুম-বালা
পাখাটি নাড়িয়া, উড়িয়া উড়িয়া
পশিল কুসুম-শালা

মুখ ভারি করি ফুল শিশু দল
তুলিকা লইয়া হাতে
মাখাইয়া দিল কতকি বরণ
কুসুমের পাতে পাতে।

চারি দিকে দিকে ফুল শিশুদল
ফুলের বালিকা কত
নীরব হইয়া রয়েছে বসিয়া
সবাই কাজেতে রত।

চারিদিক এবে হইল বিজন
কানন নীরব ছবি
ফুল বালাদের প্রেমের কাহিনী
কহে কলপনা দেবী॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য
শ্রীর

পৌরাণিকী গাথা।

পাঠক! তোমার নিকট দশ অবতার বর্ণন কালে কহিয়াছিলাম, সময়ানুসারে তোমাকে পুরাণের রূপক দেখাইয়া দিব, অদ্য রূপক দেখ।

তুমি পুরাণে অবশ্য শুনিয়াছ যে কশ্যপ হইতে সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। তুমি তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পার না? কিন্তু রূপক ভাঙ্গিয়া দিলে তোমার বিশ্বাস জন্মাইবার সম্ভাবনা। প্রথমে দেখ কশ্যপ কোন্ ব্যক্তি? তাঁহার পিতা কে? তাঁহার পত্নীই বা কে? তুমি উত্তর করিবে পুরাণের লিখনানুসারে কশ্যপের পিতা মরীচি, ইনি আবার ব্রহ্মার মানস-পুত্র, তদনুসারে কশ্যপ ব্রহ্মার পৌত্র। কশ্যপের পত্নী কে? এ প্রশ্নের উত্তরে পাঠক কহিবেন কশ্যপের পত্নী একটী নয়, তেরটি। তাঁহারা দিতি অদিতি প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।

পাঠকের পূর্ব্ব পক্ষ প্রমাণ যথা—

মরীচেঃ কশ্যপো জাতঃ

কশ্যপাত্তু ইমাঃ প্রজাঃ ॥

লেখক ও ঐ পূর্ব্বপক্ষকে স্বীকার করিয়া উত্তর দিতে বাধ্য। সুতরাং কশ্যপের ঐ পত্নীগুলির সাধারণ নাম কাশ্যপী। কাশ্যপী শব্দে পৃথিবীকে বুঝায়। যথা—ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রকৃতি খণ্ডে পৃথিব্যুপাখ্যানং—

"কাশ্যপী কশ্যপস্যৈষমনবধা স্থির-রূপতঃ।

বিশ্বম্ভরা বসুন্ধরা……রূপতঃ ॥"

অমরসিংহ নিজ অভিধানেও পৃথিবীকে কাশ্যপী শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"ক্ষৌণী জ্যা কাশ্যপী ক্ষিতিঃ ॥"

পাঠক এ প্রমাণকে যদি সামান্য বলেন তবে অবশ্য অখণ্ডনীয় প্রমাণ দর্শাইতে হইবে, সে প্রমাণ শ্রুতি বা স্মৃতির হওয়া আবশ্যক। পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থ তাহাই দিব। কিন্তু অগ্রে কশ্যপকে স্থিরতররূপে পৃথিবীর পতি রূপে মীমাংসা করিয়া না দেখাইতে পারিলে পাঠকের তুষ্টি জন্মিবে না। সুতরাং প্রথমে তাহাই স্থির করা উচিত।

কশ্যপ শব্দে "আকাশ" যথা কশ্যং পাতি যঃ সঃ কশ্যপঃ।

কশ্য শব্দে মধু বা মদ্য বুঝায় এই কশ্য যিনি পান করিয়াছিলেন তাঁহার নাম কশ্যপ।

যথা

ব্রহ্মণস্তনয়োধীমান্

মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ।

কশ্যপস্তস্য পুত্রোঽভূৎ।

কশ্যপানাৎ চ কশ্যপঃ ॥

বাল্মীকি রামায়ণম্—

কশ্য শব্দে কি বস্তু বুঝায় তাহা অনুসন্ধান করা বিধেয়। তদনুসারে আভিধানিক অর্থ দেখিলে বোধ হইবে কশ্য শব্দে মদ্য। যথা—

গন্ধোত্তমা প্রসন্নেরা কাদম্বর্য্যঃ পরিস্রুতা॥
মদিরা কশ্যমদ্যে চাপি। অমরকোষ:।

মদ্য শব্দে মধুকে বুঝায়—জলের অপর নাম মধু যথা মধুসূক্তের প্রমাণ—

মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ॥

এক্ষণে দেখ ঐ কশ্যপ কোন্ ব্যক্তি বা কি পদার্থ। ভারতীয় আর্য্য জাতির পদার্থতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে জলীয় পরমাণু গুলি বায়ু-সংযোগে আকাশে স্থান প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বায়ু দ্বারা আকাশের জলপান সিদ্ধ হয়। এবং আকাশ সংযুক্ত বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয়। আকাশ, বায়ু ও তেজ এই তিন বস্তু মিলিত হইলে পরিণামাবস্থায় জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং এই চতুর্বিধ পদার্থের পরিণামা বস্থায় পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। প্রথম এই সকল পদার্থ পরমাণুরূপে উৎপন্ন হয়। পরে সংহত হইয়া স্থূলভূত হইয়াছে এবং আমাদিগের জ্ঞানগোচরে আসিয়াছে।

পাঠক তুমি এক্ষণে আপত্তি করিতে পার যে পঞ্চতন্মাত্রের গুণানুসারে পৃথিবী আকাশ সংযোগে সমুদয় বস্তুর সৃষ্টি হইল যখন তখন আকাশকে বা কেন কশ্যপস্থলে অর্থাৎ জনকস্থলে গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য কি? এবং পৃথিবীকে বা কেন গর্ভধারিণীরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। তাহার উত্তর এই "জননাৎ জনকঃ" "ধারণাৎ ধারিণী" এই হেতু আকাশ জনক এবং পৃথিবী সমস্ত বস্তুর আধার এই হেতু পৃথিবী—জননী। যথা ব্রহ্মাণ্ডে।

"ধরাধরিত্রী ধরণী সর্ব্বধা ধারয়ামহ্যা,,

সুতরাং দেবদানবাদির প্রসূতি অদিতি দিতি প্রভৃতির সহিত কাশ্যপীর আর ভিন্নভাব থাকিতেছেনা, সুতরাং কশ্যপের পত্নীগণ হইতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি বিষয়ে আর সংশয় বড় নাই, অথবা কাশ্যপীই সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করেন এই হেতুই কাশ্যপী সকলের প্রসূতি। বিশেষতঃ পার্থিব পদার্থের সংযোগ ব্যতীত কোন বস্তুরই উৎপত্তি সম্ভবে না; এইহেতু বেদে আকাশেরই পৃথিবীর স্বামী শব্দে নির্দ্দেশ আছে। কশ্যপ-সন্তানগণ জনকের নামাপেক্ষায় জননীর নামানুসারে বিশেষ প্রসিদ্ধ। যথা—আদিত্য অদিতি-সন্তান। দৈত্য দিতি-সন্তান ইত্যাদি। আদিত্যগণ আকাশের প্রথম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যথা—

দৌষ্পিতঃ পৃথিবীমাতরধ্রুগ্ অগ্নে
ভ্রাতর্বসবো মৃলতানঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা
অস্মভ্যং শর্ম্মবহুলং বিযন্ত॥
ঋক্ বেদসংহিতা ৫ মণ্ডলম্।
৪৩ সূক্তম্। ৪ ঋক্।

হে দৌষ্পিতঃ (অর্থাৎ পিতা দ্যৌ) অদ্রোহকারিণী মাতা পৃথিবী, ভ্রাতঃ বসুগণ তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। অদিতি

এবং অদিতির পুত্র সমুদায় তোমরা সকলে একত্র হইয়া আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

পাঠক! এখন কহিতে পারেন যে পৃথিবী যে আদিত্যগণের জননী বেদ হইতে তাহার প্রমাণ দর্শাইতে হইবে। লেখকের সুতরাং শ্রুতিকেই প্রমাণ স্থলে আনা উচিত, যথা—

সুবীরস্তে জনয়িতা মন্যত দ্যৌরিন্দ্রস্য
কর্ত্তা স্বপস্তমোভূৎ।
য ঈং জজান স্বর্য্যং সুবজ্রমনপচ্যুতং
সদসো ন ভূম॥

ঋকবেদসংহিতা ৪ মণ্ডলম্। ১৭ সূ। ৪ ঋ

তোমার, জনয়িতা দ্যৌ মনে করিয়াছিলেন আমি সৎপুত্রশালী ইন্দ্রের জনক দ্যৌ সুকীর্ত্তিশালী হইয়াছিলেন। ঐ দ্যৌ স্বর্গ হইতে অবিচলিত। বজ্রশালী মহত্ত্ববিশিষ্ট ইন্দ্রকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

পৃথিবীই যে ইন্দ্রাদি দিক্পালগণের মাতা, তাহাও বেদে প্রমাণী কৃত হইয়াছে। পাঠক তোমার বোধ সৌকর্য্যার্থ আমি কেবল তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিব। তাহাতেই তোমাকে নিরস্ত হইতে হইবে। যথা—

বাতু বাতো ময়োভুবাতু ভেষজং
[তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ।"
ঋক বেদ সংহিতা ১ মণ্ডল, ৮৯
সূক্ত ৪ ঋক্।

বায়ু আমাদিগকে সেই সুখকর ঔষধ প্রাপ্ত করাইয়া দেন তাঁহার মাতা পৃথিবী ও পিতা দ্যৌ সেই সুখকর ঔষধ আমাদিগকে প্রাপ্ত করাইয়াছেন।

পাঠক! এখন তুমি কহিতে পার ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব ইহাঁদিগকে কোথায় রাখিবে, তাহার উত্তর ক্রমে দিব।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন জন হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় হয়। অতএব যাঁহা হইতে সৃষ্টি হয় তিনি সত্ত্ব গুণের আধার, যিনি সৃষ্ট বস্তুর স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা করেন তিনি রজোগুণের আধার, এবং যাঁহাতে সমস্ত বস্তু লয় হয় অর্থাৎ লীন হয় তিনি তমোগুণের আধার।

ভারতীয় আর্য্যগণ এই ত্রিগুণাত্মক মূর্ত্তি ত্রয়কেই এক পদার্থ এবং এক শক্তিরই অবস্থা বিশেষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কি বেদে কি পুরাণে সর্ব্বত্রই তিনেই এক একেই তিন বলিয়াছেন।

এখন দেখ ঐ ত্রিগুণাত্মক মূর্ত্তি এমন কোন্ বস্তুতে আছে যাহাকে আশ্রয় করিয়া ত্রিমূর্ত্তির অবান্তর ভেদ দেখান যাইতে পারে। যাঁহারা নিত্য সন্ধ্যাবন্দন করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে জগৎ-প্রসূতি সাবিত্রীর প্রথম অবস্থা ব্রহ্মরূপা অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রের কৌমারাবস্থা। এই হেতু শক্তির ঐ অবস্থা-বিশেষকে কুমারী বলা হইয়াছে।

শক্তির দ্বিতীয়াবস্থাকে বিষ্ণুরূপা এবং যুবতী রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। বিষ্ণুরূপ শব্দে জল-রূপা ধরিতে হইবে। জল দ্বারাই সমস্ত পদার্থের রক্ষা হয়।

শক্তির তৃতীয়াবস্থা বা প্রৌঢ়াবস্থাকে

শিবরূপা ও বৃদ্ধাবস্থা বলা হইয়াছে। এই অবস্থার নাম তমোরূপা এই খানেই সকল ভূতের পঞ্চত্ব হয়। এইজন্যই শিবের নাম পঞ্চানন অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম রূপ শিবের পঞ্চ বদনে সকল বস্তু স্ব স্ব নিয়মানুসারে লীন হয়। পাঠক তুমি এখন এই সকল কথার প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা কর—সামবেদী সন্ধ্যা দেখ যথা—

প্রাতর্গায়ত্রীং কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং
সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতামিত্যাদি বিচিন্তয়েৎ।
মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাং যজুর্ব্বেদযুতাং যুবতীং
সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতামিত্যাদি বিচিন্তয়েৎ।
সায়াহ্নে শিবরূপাং বৃদ্ধাং সামবেদযুতাং
সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতামিত্যাদি বিচিন্তয়েৎ।

নিত্য ক্রিয়ার প্রকরণ দেখ, শিবের অষ্টমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।

পুরাণ দেখ অষ্টমূর্ত্তির প্রকরণ পাইবে। যথা—

ক্ষিতির্জলং তথা বহ্নি র্বায়ুরাকাশমেব চ।
যষ্টার্কৌ চ তথা চন্দ্রঃ মূর্ত্তয়োষ্টৌ পিনাকিনঃ॥
পূজাপ্রকরণে ক্ষিত্যাদিমূর্ত্তিভেদেন তস্য (শিবস্য) নাম-ভেদঃ। যথা যথাক্রমং পূজয়েৎ।

শর্ব্বায় ক্ষিতি-মূর্ত্তয়ে নমঃ।১
ভবায় জল-মূর্ত্তয়ে নমঃ।২
রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ।৩
উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।৪
ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ।৫
পশুপতয়ে যজমান-মূর্ত্তয়ে নমঃ।৬
মহাদেবায় সোম-মূর্ত্তয়ে নমঃ।৭
ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।৮

এই সকল মূর্ত্তি-বিশিষ্ট যিনি তিনিই ভগবান্, তিনিই শিব, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই আদ্যাশক্তি।

মহা-মহোপাধ্যায় কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস এই অষ্ট মূর্ত্তিকেই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের নিদান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তদীয় শকুন্তলা দেখ। যথা—

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবি-
র্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতি-বিষয়গুণা যা স্থিতা
ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজ-প্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ
প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টা-
ভিরীশঃ॥

উক্ত কবিবর ঈশ্বরকে ত্রিগুণাত্মক রূপে বর্ণন করিয়া কার্য্যকালে ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। ইহাও তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত বা বেদের বিরুদ্ধ নহে। তিনি কুমারসম্ভবে যাহা কহিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। যথা—

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়-বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে॥

এক্ষণে পাঠককে ইহা দেখাইতে হইবে যে যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। তদনুসারে গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত-কৃত শিবের মহিম্নস্তব প্রমাণ-স্থলে উদ্ধৃত করা গেল যথা—

[illegible]
[illegible]

কনকালাদির্ বহতে মেমীয়ানস্তকণী
বিহরন্ আত্মীয়ী ত্রিভুবনমুদ্রীকৃতবতীম্ ।

একণে পাঠক কহিবেন যে, তবে আর্য্য-সমাজ কেন শক্তির উপাসক হইল। লেখক তাহার এই উত্তর দিবে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ জড় বস্তুতেই আছে; কিন্তু শক্তি-সহকৃত না হইলে এই ত্রিগুণের কার্য্যকারিতা হয় না। তজ্জন্যই আর্য্যেরা প্রকৃতিকেই (শক্তিকেই) সর্ব্ব-শক্তি-মতী এবং পুরুষকে জড়-স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। এবং প্রকৃতি-গুণ-সংযোগে শিবের (অর্থাৎ জড় পদার্থের) স্পন্দনাদি ক্রিয়া জন্মে। প্রকৃতির গুণ-যোগ ব্যতীত জড়ের চৈতন্য জন্মে না।

তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য দিব্য-চক্ষুঃ বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী পূজ্যপাদ শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত আনন্দ-লহরীর বচন উদ্ধার করা গেল। বিবেচক পাঠকগণ শিব ও শক্তির প্রভেদ অর্থাৎ জড় ও জড়ের গুণ দেখুন। যথা—

শিবঃশক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যা হরিহর-বিরিঞ্চাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥

এখন প্রিয়দর্শন পাঠকগণ লেখকের প্রতি নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিতে সমর্থ যথা।—

১ম। ব্রহ্মা চতুর্মুখ কেন ?
২য়। বিষ্ণু চতুর্ভুজ কেন ?
৩য়। বিষ্ণুর নারায়ণ মূর্ত্তি মৎস্য-শীর্ষ-মুণ্ড, বামনাকার ইত্যাদি কেন ?
৪র্থ। গণেশের গজেন্দ্র-বদন কেন ?
৫ম। কার্ত্তিকের ষড়ানন কেন ?
৬ষ্ঠ। দুর্গা দশভুজা কেন ?
৭ম। লক্ষ্মী জলনিধিকন্যা কেন ?
৮ম। সরস্বতী আকাশভবা কেন ?
৯ম। কালী শবশিবারূঢ়া কেন ?
১০ম। জগদ্ধাত্রী সিংহবাহিনী কেন ?

ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর এক প্রস্তাবে দেওয়া সহজ নহে। এবং এক স্থলে দিলেও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়। তদ্ধেতু লেখাও নিতান্ত নীরস হইয়া যায়। ক্রমে লিখিলে পাঠকের পাঠ করিতে অভিলাষ জন্মিবে এই আশায় এইখানেই লেখনীকে বিশ্রাম দেওয়া গেল। তথাপি পাঠকগণকে একটী কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা উচিত।—বিচারক পাঠক তুমি এক বার মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ কর, প্রমাণ গুলি প্রকৃত পুস্তকের সহিত মিলন কর, পদার্থ-তত্ত্ব অনুসন্ধান কর, আর্য্য জাতির শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্যও কূটার্থের ব্যাখ্যা দেখ। অবশ্য লেখকের মতগুলি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান হইবেনা। লেখক একজন সামান্য মানব। মানুষমাত্রই ভ্রান্তি-দেবীর নিতান্ত আশ্রিত। এবং পাঠকগণের মধ্যে অনেক প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা অন্ততঃ একবার নিবিষ্টচিত্তে লেখকের অভিপ্রায় গুলি ও প্রমাণ গুলি মিলাইয়া দেখিবেন। এবং যে যে স্থল অসংলগ্ন বোধ হইবে ও পথ-চ্যুত বোধ হইবে তাহার প্রতি বিচার করিতে পারেন। তাহা করিলে লেখকের উৎসাহের উদ্দীপ্তি হইবার সম্ভাবনা। তখন লেখক আশ্রয় পাইবে।

শ্রীলাল—

আর্য্যজাতির ব্যবহার বিজ্ঞান।

(১১ শ সংখ্যার অনুবৃত্তি।)

প্রত্যর্থী বা প্রতিবাদী কাল (আর্দ্ধা) প্রার্থনা করিলে তাহা প্রদত্ত হইত। কিন্তু যিনি-নালিশবন্দী হইতেন (বাদী) তিনি আর্দ্ধা চাহিলে পাইতেন না, প্রত্যুত তাঁহার মোকদ্দামা খারিজ হইয়া যাইত। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

অভিযোগের কাল।

একণকার ন্যায় পূর্ব্বেও অভিযোগের নির্দ্দিষ্ট কাল রাজ ব্যবস্থায় নির্দ্ধারিত হইত কিন্তু এমন কতকগুলি অভিযোগ ছিল যাহা তৎক্ষণাৎ রাজদ্বারে না জানাইলে ব্যবহারোচিত কার্য্য করা হইত না। যথা -

" সাহস-স্তেয়-পারুষ্য-গোভিশাপাত্যয়ে স্ত্রিয়াং।
বিবাদয়েৎ সদ্য এব কালোঽন্যত্রেচ্ছয়া স্মৃতঃ।" [যাজ্ঞবল্ক্য]

'সাহস' মনুষ্যহত্যা, 'স্তেয়' চুরি, 'পারুষ্য' মারপিট্, গালিগালাচ্, 'গো' দুগ্ধবতী গাভিহত্যা; 'অভিশাপ' মহা পাতকের কার্য্য, 'স্ত্রী' কুলস্ত্রীর চরিত্র ঘটিত বিবাদ, এবং দাস দাসী ঘটিত বা তাদিবদক দখাসব ঘটিত, এই সকল কেস্ সদ্যই করিতে হুইত। এ স্থানে সদ্য শব্দের অর্থ ... ছিল। তিন দিনের মধ্যে [illegible] বা করিলে তাহা তমাদি হইয়া যাইত। এতদ্-ভিন্ন অন্যান্য বিবাদ সমস্ত যখন তখন করিতে পারিত। তাহাতে দোষ হইত না। এই সকল বিবাদ যেমন সদ্য উপস্থিত করার বিধি, তেমনি ইহার উত্তরও দিবার নিয়মিত বিধি ছিল। বাদী নালিশ বন্দী হইলে প্রতিবাদী এমন সকল বিষয়ের উত্তর দিবার জন্য আর্দ্ধা প্রার্থনা করিলে পাইতেন না। সদ্যই তাঁহাকে উত্তর দিতে হইত। (ইহা শূলপাণি সম্মত)।

যুক্তি।

প্রতিবাদীই কাল (আর্দ্ধা) পাইবেন আর বাদী তাহা পাইবেন না, এই ব্যবস্থার মূল বা যুক্তি এইরূপ নির্দ্ধারিত আছে। যথা—

" যস্মাৎ কার্য্যসমারম্ভ-চিরাত্তেন বিনিশ্চিতঃ।
তস্মান্ন লভতে কাল মভিযুক্তস্তু কালভাক্।" (কাত্যায়ন)

যে কার্য্য করে, সে অগ্রে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এবং চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া কর্ত্তব্য বক্তব্য স্থির করিয়াই করে। এই জন্য অভিযোগকারী কাল পাইতে পারেন না [illegible]

হঠাৎ উত্তর দিতে হইবে। হঠাৎ উত্তর যাহাকে দিতে হয়, তাহাকেই কিঞ্চিৎ কাল দেওয়া উচিত।

অপবাদ বা বিশেষ বিধি।

অভিযোগ-কর্ত্তা সময় চাহিলে পাইবেন না, ইহা রাজবিধি। কিন্তু এই বিধিতে কিঞ্চিৎ বিশেষ বিধি সংলগ্ন থাকা দৃষ্ট হয়। যথা—

"অভিযোক্তাঽপ্রগল্ভত্বাৎ বক্তুং নোৎসহতে যদি।
তদা কালঃ প্রদাতব্যঃ কার্য্যশক্ত্যনুরূপতঃ।"
(বৃহস্পতি)

যদি এমন প্রমাণ হয় যে, অভিযোক্তা অপ্রগল্ভ অর্থাৎ ভাল-বক্তা নহে বা ভয়াদি দ্বারা জড়বুদ্ধি হইতেছে, তজ্জন্য সে জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে তাহাকে কিঞ্চিৎ সময় দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা অধিক পরিমাণে নহে। তাহা "কার্য্য শক্তির অনুরূপ" অর্থাৎ যত সময়ে সে মাত্র সেই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারে। এতাবতা এই বুঝাইতেছে যে, অভিযোক্তা ২।১ ঘণ্টা মাত্র সময় পাইতে পারেন।

অবধারিত দিনে বাদী প্রতিবাদীর অন্যতর অনুপস্থিত থাকিলে কোন কোন মোকদ্দামা খারিজ হইয়া যাইত। তাহাতে যিনি অনুপস্থিত থাকিবেন তিনিই হারিবেন, এইরূপ নির্ণয় ছিল। সে যদি বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইতে পারে যে, তাহার অবধারিত সময়ে অনুপস্থিত হইবার বিশেষ কারণ ছিল অর্থাৎ কোন প্রকার দৈব বিড়ম্বনা বা রাজার কোন কার্য্য ছিল, তাহা হইলে সে পরাজিত হইবে না কিন্তু ইহা বিশিষ্ট সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ না করিতে পারিলে গ্রাহ্য হইবে না। যথা—

"রাজদৈবকৃতো দোষস্তস্মিন্ কালে যদা-ভবেৎ।
অবধ্যাঽযোগমাত্রেণ ন ভবেৎ স পরাজিতঃ।"
(ব্যাস)

রাজকৃত দোষ কি দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ যদি সে নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত না হইতে পারে, তবে সে, সময়ের অতিক্রমণ জন্য অপরাধী হইবে না এবং পরাজিতও হইবে না। কিন্তু যদি তাহা প্রমাণ না হয় প্রত্যুত যদি তাহাতে কুটিলতা বা কোন দুরভিসন্ধি থাকা প্রকাশ পায় তাহা হইলে সে পরাজিত হওয়া দূরে থাকুক বিশেষ দণ্ডনীয় হইবেক। যথা—

"রাজদৈবকৃতং দোষং সাক্ষিভিঃ প্রতিপাদয়েৎ।
জৈহ্ম্যেন বর্ত্তমানস্ত দণ্ড্যো দাপ্যস্ত তদ্ধনম॥"
(ব্যাস)

ইহার অর্থ উপরে ব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব বাদীর কার্য্য।

এক্ষণে পূর্ব্ব বাদীর কার্য্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। পূর্ব্বকালে বাদীগণ কি প্রকারে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন এবং কি প্রকারে বা উত্তর বাদী উত্তর দিতেন —পাঠকগণকে এই সকল বিষয় অবগত করানই এই অংশের উদ্দেশ্য।

ভাষাপ্রয়োগ।—পূর্ব্ব বাদীর প্রথম কার্য্য ভাষাপ্রয়োগ, বা ভাষা প্রদান। এক্ষণকার দরখাস্ত বা আর্জি দাখিল উক্ত-ভাষা প্রয়োগের সহিত তুল্য; কেননা, সম্পূর্ণ ব্যবহার-ব্যাপারটিকে ৪ ভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেক এক এক ভাগকে পাদ নাম দিয়া এই ভাষাদানকে ১ম পাদভুক্ত ও ইহার যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কথিত বিধ (আর্জি দাখিল) অর্থ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। সেই সেই স্থলগুলি আমরা ক্রমানুরূপ অনুবাদ করিয়া যাই—পাঠকগণ মিলাইয়া যাউন।

ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ, ও নির্ণয়পাদ। এই চতুষ্পাত্ ব্যবহার। যথা—

"পূর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদো দ্বিপাদশ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ।
ক্রিয়াপাদস্তথাচান্যশ্চতুর্থোনির্ণয়ঃ স্মৃতঃ।"
(বৃহস্পতি)

পূর্ব্বপক্ষ প্রথমপাদ (ইহাই ভাষাপাদ নামে বলা হইয়াছে), উত্তর পক্ষ দ্বিতীয়; ক্রিয়া তৃতীয়, এবং নির্ণয় চতুর্থ। প্রথম পূর্ব্বপক্ষ নামক পাদের অন্তর্গত ভাষার স্বরূপ লক্ষণ যাহা কাত্যায়ন ও বৃহস্পতির ব্যবস্থায় বিধিবদ্ধ আছে তাহা বলিতেছি মনোযোগ কর—

"প্রতিজ্ঞাদোষ নির্ম্মুক্তং সাধ্যং সৎকর-ণান্বিতম্।
নিশ্চিতং লোকসিদ্ধঞ্চ পক্ষং পক্ষবিদো-বিদুঃ।" (কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি)

মিতাক্ষরাকার এই শ্লোকস্থ পক্ষ শব্দটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "ভাষা প্রতিজ্ঞা পক্ষ ইতি নার্থান্তরম্" অর্থাৎ ভাষা, প্রতিজ্ঞা ও পক্ষ, ইহাদের অর্থ এক প্রকার, সুতরাং আমরা 'যে ভাষা-প্রয়োগ' বলিয়াছি তাহাও ঐ রূপ বুঝিতে হইবে। আমরা এক প্রকার পদার্থ কখন ভাষা কখন পক্ষ কখন বা প্রতিজ্ঞা বলিয়া উল্লেখ করিব, পাঠকগণ ইহা না ভুলেন। তিষ্ঠতু। এক্ষণে কি প্রকার বস্তুকে ব্যবহার শাস্ত্রে ভাষা বলিয়া উল্লেখ করে, মনোযোগ কর। আবেদন কারী আবেদন পত্রে যাহা লিখে বা বলে তাহার নাম ভাষা। এই ভাষা কীদৃশ হইলে যথার্থতঃ ব্যবহার যোগ্য ভাষা হইবে? ইহারই নির্দ্ধারণ জন্য উপ-রোক্ত শ্লোক বলা হইয়াছে। অতএব ব্যবহারের উপযুক্ত ভাষা এই প্রকার হওয়া আবশ্যক। যথা—প্রতিজ্ঞাবাক্য বা ভাষাটীতে কোন দোষ না থাকা অর্থাৎ লিখিত ভাষাতে পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলা না হয়, "অন্যথা প্রতিজ্ঞাদোষেণ সাধ্য-দোষঃ স্যাৎ" প্রতিজ্ঞার দোষেতেই সাধ্যের দোষ হইয়া থাকে।

অল্প কথায় লিখিতে হইবে এবং পূর্ব্বা পর বিপর্য্যয় না হয়।

এই ভাষার নির্ম্মাণ কালে কোন উদা-সীন অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখাইয়া তাহার দোষ গুণ সংশোধন করা হইত। তাহার কারণ তৃতীয় ব্যক্তিই দোষ গুণ দেখিতে পায়, বাদী প্রতিবাদী সকল দেখিতে পায় না।

"দূতে চ ব্যবহারের প্রবৃত্তে যজ্ঞ কর্ম্মণি। যানি পশ্যন্ত্যুদাসীনাঃ কর্তা তানিন পশ্যতি," দ্যূত, ব্যবহার, যজ্ঞ, এসকল বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তি যেমন দেখিতে পায়, কর্ত্তারা তেমন দেখিতে পান না। বাস্তবিক দাবাখেলায় উপর চাল দেখা যায় ভাল।

এই ভাষা সংশোধন বিধি, দাখিল করিবার পূর্ব্বেই নিয়মিত। কদাচিৎ দাখিলের পরেও করিতে পারে, যাবৎ না উত্তর বাদী উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বকার' এই ব্যবস্থাটি ভাল কি মন্দ নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু, কেবল বৃহস্পতিই ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন যথা,—

"ন্যূনাধিকং পূর্ব্ব পক্ষং তাবদ্বাদী বিশোধয়েৎ। ন দদ্যাদুত্তরং যাবৎ প্রত্যর্থী সভ্যসন্নিধৌ।"

এক্ষণে দেখা যাউক, পূর্ব্বে লিখিয়া দাখিল করিবার নিয়ম ছিল কি না। অনেকেরই জ্ঞান আছে যে, লিপী পদ্ধতি অতি আধুনিক। বস্তুতঃ তাহা নহে। হিন্দু শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে প্রতীত হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই লিখনপদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। আমরা যে হিন্দুদিগের পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যবহার বিধি প্রকট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এতন্মধ্যে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দেখা যাইতেছে, ভাষা প্রয়োগ (দরখাস্ত) লিপিদ্বারা হইত।' সাক্ষীদিগের জবানবন্দী লিপি বদ্ধ করা হইত। নিষ্পত্তি পত্র লিপীবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত। এত প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহারা লিপী প্রথাকে প্রাচীন মনে না করিবেন, তাহাদের মন যে কি দিয়া গঠিত বলিতে পারি না!! যাহা হউক, প্রকৃত বিষয়ে মনযোগ কর—

পূর্ব্বকালে প্রথমতঃ কাষ্ঠফলকে অথবা মৃত্তিকাতে ব্যবহার ভাষার পাণ্ডুলেক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া, তাহার দোষগুণ সংশোধন করণান্তে পত্রারূঢ় করা হইত। পত্র শব্দের অর্থ এখানে কাগজ নহে; কেননা, কাগজ অতি আধুনিক। তালী নামক এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার পত্র ৪—৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত পরিসরযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাই পত্র শব্দের বাচ্য। এই তালী পত্র এখনও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পুস্তক লিখিবার জন্য আহরণ করিয়া থাকেন। উড়িষ্যাতে অদ্যাপি এই পত্র জমীদার দিগের সেরেস্তায় বিদ্যমান আছে। তালী পত্র ভিন্ন আর এক প্রকার বৃক্ষের ত্বক্ ব্যবহার হইত। তাহা অতি আশ্চর্য্য পদার্থ। উহা ঠিক্ ফুলস্কাপ কাগজের ন্যায়। কেবল বর্ণ কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভ। আমরা এই ত্বকের অনেক প্রাচীন পুস্তক দেখিয়াছি। এই ত্বক্‌ও পত্র শব্দের গৌণ নাম।

এক্ষণে পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে ব্যাস কি বলিতেছেন, শুন—

"পাণ্ডু লেখেন ফলকে ভূমৌবা প্রথমং লিখেৎ। ন্যূনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ॥". ইহার অর্থ সুগম।

এই শ্লোকস্থ "ফলক' শব্দের অর্থ কাষ্ঠ পট্টক, কাঠের পাটা। এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গাল মহাজনেরা (ব্যবসায়ী) হিসাব রাখিবার জন্য কাঠের পাটা (পাটীয়া) ব্যবহার করিয়া থাকে, বোধ হয় অনেকেই তাহা অবগত আছেন।

তাদৃশ কাষ্ঠপট্টে অথবা মৃত্তিকাতে ভাষার শরীর রচনা করিয়া পশ্চাৎ পত্রারূঢ় করিয়া প্রাড়্‌বিবাকের নিকট দাখিল করিলে, প্রাড়্‌বিবাক, বা বিচারপতি তদনুসারে প্রতিবাদীকে আহ্বান করিয়া তাহার সমক্ষে অর্থীকে (বাদীকে) লিখিত বিবরণ সম্বন্ধে বাচিক প্রশ্ন করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইতেন। পরে প্রত্যর্থীকেও বাচিক প্রশ্ন পূর্ব্বক তাহার প্রদেয় উত্তর লিপী সংশোধন করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে উত্তর প্রত্যুত্তরের জন্য অর্থী প্রত্যর্থী উকিল নিযুক্ত করিতেন, তাহা এই স্থানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

ভাষা প্রয়োগের পর বিচার পতির নিকট যাহা বাচনিক বলিতে হয়, তাহা এক্ষণে এজাহার নামে চলিতেছে। এই এজাহারের সহিত লিখিত বিবরণের সহিত ঐক্য হইলে এবং প্রশ্নের দ্বারা তাহার অসাঙ্কর্য্য বা অকৃত্রিমতা নির্ণয় হইলেই তাহা সংশোধিত হইল। বাদী প্রতিবাদী বা অর্থী প্রত্যর্থীর এজাহার বা বাচনিক ভাষা এবং সাক্ষীদিগের বাচনিক ভাষা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লিপিবদ্ধ করা হইত এবং তজ্জন্য স্বতন্ত্র লেখক নিযুক্ত থাকিত। পূর্ব্বকালে কায়স্থ জাতিরাই এই কার্য্য করিতেন। অদ্যাপি কায়স্থজাতিরা মসীজীবী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। অর্থী প্রত্যর্থী এবং সাক্ষীরা বলিবেন, প্রাড়্‌বিবাক তাহা সমক্ষে থাকিয়া লেখাইবেন যথা—

"পূর্ব্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্‌বিবাকোহ
থলেখয়েৎ।

পাণ্ডুলেখেন ফলকে ততঃ পত্রেঽভি
লেখয়েৎ।"

(কাত্যায়ন)

এতদনুসারে মিলিত হইতেছে যে এজাহারটিকে, পাণ্ডুলিপীর অনন্তর পত্রারূঢ় করা হইত এবং তাহা ক্রচ্‌ এগজামিনের দ্বারা সংশোধিত করিয়া লওয়া হইত। যথা—

" শোধয়েৎ পূর্ব্বপক্ষন্তু যাবন্নোত্তর দর্শনম্।
উত্তরেণাবরুদ্ধস্থ নিবৃত্তং শোধনং ভবেৎ॥"

(কাত্যায়ন)

লেখকদিগের মধ্যে যদি কেহ উৎকোচ গ্রহণ বা অন্য কোন কারণের বশতাপন্ন হইয়া সাক্ষী বা অর্থী প্রত্যর্থীর বাচনিক ভাষার অন্যথা করেন অর্থাৎ তাহারা এক রূপ বলিল, তিনি অন্যরূপ লিখিলেন, তাহা হইলে সেই লেখকের ভয়ানক দণ্ড দেওয়া হইত। যথা—

" অন্যদুক্তং লিখেৎ যোঽন্য দর্থি
প্রত্যর্থিনোর্বচঃ।
চৌরবচ্ছাসয়েত্তন্তু ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ॥"

(কাত্যায়ন)

অর্থাৎ অর্থী বা প্রত্যর্থী এক প্রকার বলিল, যে লেখক তাঁহার অন্যথা লিখিলে, ধার্ম্মিকরাজা তাঁহাকে চৌরের সমান দণ্ড করিবেন। (লেখকদিগের এই রূপ গুণ এখন আর প্রায় দেখা যায় না, পূর্ব্বে বিলক্ষণ ছিল)।

পূর্ব্বে প্রাড়্‌বিবাকের লক্ষণ নির্দ্দেশ কালে বলা হইয়াছে যে, যিনি প্রাড়্‌বিবাক হইবেন, তাঁহার পর চিত্তজ্ঞতা অর্থাৎ অনুমান শক্তি সমধিক থাকা আবশ্যক, তাহার কারণ, ঐ গুণটি এই সময়ের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্থী প্রত্যর্থী বা সাক্ষীরা যাহা বলিবে তাহা স্বাভাবিক কি কৃত্রিম, তাহা তাঁহাকে প্রায় অনুমান দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে।

"স্বভাবোক্ত মকৃত্রিমম্‌" "এতচ্চ স্বর শেষ বিশেষা দিনা জ্ঞেয়ম্‌।"

(স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য)

যাহা অকৃত্রিম, তাহা স্বাভাবিক; কৃত্রিম অকৃত্রিম, বক্তার স্বর বিশেষ ও মুখাদি অবয়ব বিশেষের ভাবভঙ্গী বিশেষ দ্বারা জানিতে হইবে।

পূর্ব্বকালে ছল বা কৃত্রিমতা দূর করিবার জন্য যে প্রশ্ন করা হইত। তাহার আর একটি নাম ভূত তত্ত্বার্থবাক্য। যথা—

"ছলংনিরস্য ভূতেন ব্যবহারান্নয়েন্নৃপঃ।"

(যাজ্ঞবল্ক্য)

"ভূতং তত্ত্বার্থ সম্বন্ধং" তত্ত্বার্থ সম্বন্ধ অর্থাৎ যাথার্থ্যের উদ্ঘাটক যে বাক্য, তদ্দ্বারা ছল অর্থাৎ কৃত্রিমতা নিরাস করিয়া ব্যবহার নির্ণয় করিবেন।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, কি প্রকার ভাষায় লেখা প্রস্তুত করা হইত। কেন না, এই সকল বিষয় সংস্কৃতে লেখা হইত? কি দেশভাষায় লেখা হইত? এই রূপ সংশয় অনেকেরই হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এস্থলে তাহা অবশ্য বক্তব্য হইতেছে।

স্মৃতিতে এই বিষয়টির কোন নির্ণয় দৃষ্ট হয় না। কেবল পুরাণ সকল পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, সংস্কৃত ও দেশ ভাষা উভয়বিধ ভাষাতেই লেখা দাখিল করা হইত। যাঁহারা সংস্কৃত ভাল না জানিতেন তাঁহারা দেশ ভাষায় আবেদন করিতেন যথা,—

সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈ র্ব্বাক্যৈঃ—।
দেশ ভাষা হ্যুপায়ৈশ্চ—॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

ব্যবহারতত্ত্বেও এই রূপ উল্লেখ আছে, যথা—

"এতত্তু সংস্কৃত দেশ ভাষানান্তরেণ
যথাবোধং বক্তব্যং লেখ্যং বা।"

সংস্কৃতই হউক, আর দেশ ভাষাই হউক, যে যাহা ভাল জানে—সে তাহাতেই বলিবে বা লিখিবে।

একথায় আর একটি সত্য লাভ হইতেছে। এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বকালেও সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন দেশভাষা স্বতন্ত্র ছিল। সংস্কৃত ভাষা কৃত্রিম, কোন কালেই উহা মনুষ্যের স্বাভাবিক নহে। পুস্তকাদি লিখিতে হইলে এই সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত হইত তদ্ভিন্ন গার্হস্থ্য ব্যবহারের

জন্য যে দেশের যাহা মাতৃভাষা—সে দেশের লেখকেরা সেই সেই ভাষাই ব্যবহার করিত। ব্যাস যাজ্ঞ বল্ক্য প্রভৃতির সময় হিন্দুস্থানের গার্হস্থ্য ভাষা কি রূপ ছিল, বঙ্গদেশেরই বা কি আকারের ভাষা ছিল, তাহা এক্ষণে নিঃসন্দিগ্ধ নির্ণয় করা যায় না।

ক্রম প্রকাশ্য।

কালীবর বেদান্ত বাগীশ।

বৃন্দাবন দৃশ্যাবলী।

যমুনাতীর।

নিশীথ সময়।

শ্রীকৃষ্ণ একাকী——

শ্রীকৃষ্ণ।—যমুনে! কহ কিবা ভেয়ল
তব নীল নীরে বিরাজিতা ভুবন-বি-
মোহিনী?
তুহু মন্থর গমনে বারীন্দ্র-সঙ্গমে
চলত কলকলি—কহত হমারে!
হম সুধাই তোহারে!
হম আয়ত নিত নিত তব তীরে খোনত
তব তীর ধোয়ত নয়ন আসারে!
যমুনে!
তব তীরে নিত হম্ ঢোঁয়ত তাহারে!—
(দীর্ঘনিশ্বাস)
এই অত নিশীথ তব নীরে ধীরে
নাচত তারা কোটী শশী থর থরে!
রজ রুচি কৌমুদীময়ী নবরাই
থর থর নাচত মম হৃদি নীরে!
প্রতি এক তরগে ধমনী ভিতরে
বিহারত রাধিকা রুধির প্রবাহে!
অন্তর মাঝারে অনন্ত-রূপিণী
আনন্দ-প্রবাহিনী বহব মধুরে!
প্রতি এক নিশ্বাসে রাধিকা নিস্বরে
প্রতি এক প্রশ্বাসে রাধিকা প্রবেশে!—
রাধা ভুবনময়ী অঙ্কিত অন্তরে
নয়ন দুর্ভাগ কাঁহে না পায় তাহারে?
(দীর্ঘনিশ্বাস)
ইহ বৃন্দাবনে ইহ যমুনা-তটে
নিত নিত নিশীথে খোয়ত রোই!
বিষাদিত ভ্রমর বিকচ কুসুমে
বিরত গুঞ্জরে অহ মোর রোদনে!
কদম্ব-বিটপ সেহ বিষাদিত
ঝর ঝর ঝরত নয়ন-শিশিরে!
তমাল-শেখরে পীক নাহি কুহরে
চলত সমীরণ মেহুল কাতারে!
সচল চন্দ্রমা অচল তেয়ত
করুণা হিম বিথরি!
প্রেম-উন্মাদিনী মদন বাসর

আশয়ে অবিরত চলত যমুনা
সেহ বিষাদিত হমারি রোদনে
সেহ ফিরি পেখত উজন তরঙ্গে!—
(দীর্ঘনিশ্বাস ও ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)
রাধা রমণী শিরোমণি!
রাধা বিধাতা-সৃজন-চাতুরি!
চন্দন-সৌরভ কাঞ্চন গলাই
মদন হুতাশনে মিরমিল তায়!
নিরমল সোহাগ বসান রঞ্জনে
হেমাঙ্গ উজলি সৃজল তাহারে!
নবীন নীরদে গরল মিলাই
রচল কৌশলে নয়ন যুগলে!
তরুণ প্রবালে অমৃতে গলাই
বিরচল অধরে মধুর ভাণ্ডার!
বক্ষে পীনোন্নত বিকচ কমলে
রচল যুগল মলয় মন্দরে!—
কিন্তু—নীল মরমরে গঠন অন্তরে!—
(দীর্ঘনিশ্বাস ও ক্ষণকাল নিস্তব্ধ)
কই বৃন্দে কই আয়ত?
প্রতি পত্র বিকম্পনে চিত্ত বিচঞ্চল
লোচন চকিতে নেহালে!
দুরাশা মরুভূমে দারুণ পিপাসা
অযুত মরীচিকা ছলত মোয়!
নীরস অধর নীরস কণ্ঠ
নীরস মুরলী বাজনে না চায়ও!
(বৃন্দার প্রবেশ)
আও বৃন্দে আও অমৃত সঞ্চারি
যায়ত জীবন বাচাও হমারি!
বৃন্দা।—নবীন যৌবনে গরব গভীর
নবীনা নিমগনা তায়!
নবীনা প্রেম নাহি জানে!
নবীনা নবভুজঙ্গিনী ঔষধি না মানে!—
(শ্রীকৃষ্ণ একএকবার বৃন্দার প্রতি দৃষ্টি এবং দীর্ঘনিশ্বাস)
তায় কি ফল সধনে?—বিফল!—
বিফল যইসন অরণ্যে রোদনে!—
শ্রীকৃষ্ণ।—বৃন্দে
যদি বিফল সাধনা অরণ্যে রোদন
বিফল বিফল তবে মম জীবন!
রাধা রূপ কৌমুদীময় মম অন্তর
রাধা বিনা নিখিল নিরখি আঁধার!
রাধা নাম জপ—রাধা রূপ ধ্যান—
'রাধা রাধা' স্মরি ত্যজব জীবন!—
(অধীর হইয়া উপবেশন)
বৃন্দা।—কেশব নাকহবি মোয়
কহবি তাহারে যুবতী যে হোয়!—
কবে সে যৌবন জোয়ার কি বারি
আয়ল— গিয়ল!—(ফিরল না আর!)
ষোড়শ গ্রীষ্মে বিংশতি বসন্তে
সপ্ত ত্রিংশতি হেমন্তে অতীত!
কেশব না কহবি মোয়
হম নবীনাত নয়ও!—
কত শ্যামে গঠলু কত শ্যামে ভাঙ্গলু
কত শ্যামে পেখলু আকুল পাথারে!
কত শ্যাম আয়ল কত শ্যাম সাধল
কত শ্যাম ভাসল নয়ন কি জলে!
বৃন্দা পুরাতনী অতি
পেখি ঠেকি শিখল পুরুখক রীতি!
প্রথমে সাধত পায়ে ধরি রোয়ত
যাচি যাচি কহত বাত!
ছলে কলে কৌশলে সহজে সহজে
অন্তর কয়ত হাত!

সব মধু লুটল পিপাসা নিভায়ল
ধীরে ধীরে হটইতে চায়!
তবে যদি সাধব শুমার বাড়াব
কত ছল করব কহন না যায়!
তখন কাঁদব সেত পেখি হাসব
নবীনা মরব পীরিতি কি দায়!
শিকল লাগায়ব শিকল না মানব
কাটব পলাব পালাব নিচয়!
বহুবারে পুরুখ নয়ত পায়!

শ্রীকৃষ্ণ।—

ব্যঙ্গ ত্যজ বৃন্দে প্রাণ অত যে হোয়
ব্যঙ্গ ত্যজ বৃন্দে কহ করি কি উপায়!
সাগর শুখায়ব! শশী ভানু খসব!
সাগর উঠব হেমাদ্রি শেখরে!
যদি দিনেশ দেব পচিমে উদয়ব!
গরল খেলব মলয়-অনিলে!
কাম রতি ছোড়ব! জলদে না সাধব
চাতক পিয়ব নিলাম্বু জল!
বৈকণ্ঠ টলব! তাপ নাহি রহব
অনলে! সলিলে ভাসব অচল!
ইহ যমুনা যদি
সাগরে না যাই শেখরে ফিরব!
রাধা-রূপ তবু নাহি পাসরিব!—

বৃন্দা।—নাকহুবি মোয়
ভিষক্‌কে রোগ নাহি ছাপা রয়ও!
বিশাইক কারিগরি না শিখাবি তুইও!
নিরখি পবনে শারদ গগণে
নিরখি জাহ্নবী জোয়ার ভাটায়!
নিরখি সুরবে নিরখি চন্দ্রমে
নিরখি বড়ঋতু আরে আর যায়ও!
নিরখি স্বভাবে স্বভাব না রয়ও!

পুরুখে রহব? হা মোর কপাল!
কোমল পরশে অটল জল?

শ্রীকৃষ্ণ।—

হাম হারনু বৃন্দে!—জিতব তোমারে
জনমিল নাহি আবহি সংসারে!
পীরিতি সাধনে সিদ্ধা ইহ বৃন্দাবনে
উত্তর-সাধিকা তুই!
হম নবীন পথিক নবীন সাধনে
গুরু করি বরত তোয়!
শিষ্যে ত্যজ রঙ্গ
কহ কই সনে সাধব?
সাধনেও কিবা সিদ্ধ নাভেয়ব?

বৃন্দা।—সাধনে সিদ্ধি।

শ্রীকৃষ্ণ।—তবে হম সাধব
বৃন্দাবন ত্যজি শেখরে পসর!
দুরাশা শ্মশানে ভীষণ বিশাল
মদন অনল কুণ্ড জ্বালাই
শ্বাস হবি স্বাহা অবিরত ঢালই
রাধা-স্মৃতি-মালা জপব নীরবে!
রাধা পীরিতি মহান্ মন্ত্রে
দীক্ষিত হমার অন্তর কায়!
সফল মন্ত্র বা শেখরে লয়!

বৃন্দা।—কেশব না যাবি শেখরে
শেখরে জপলে না পাব তাহারে!
হম তোরে কহব দীক্ষিত করব
যোগ যাগ যত শিখয়ব তোরে!—

(বংশী উঠাইয়া।)

লহ বংশী—
এর মধুর বাদনে মদন তুই
মদন-মোহিনী ভগ মগ্ন হোয়ও!
কানন-শোভিনী মোহন মালতী

মদনে গলই অনিকে মিশায়!
পাথার তরঙ্গ যমুনা উজন
ভানুর কিরণ সুশীতল হোয়!
মলয়-সমীর আমোদে বিভোর
পরাগে মিলই নাচিয়া বেড়ায়!
চাঁদের কৌমুদী হাসিয়া হাসিয়া
সোহাগে মাতিয়া ঢলিয়া পড়য়!
বকুল তমাল শ্যামল সরল
মেদুল মেদুল ললিত আসারে!
নবীন নধর ননীর পুতলী
স্বপনে হাসত মধুর অধরে!
লাজের লতিকা নবীন বাসরে
নব বধূ লাজ তেয়জে!
কপোত কপোতী অধরে অধরে
ভ্রমর ঝঙ্কারে কুসুম নিচয়ে!
পেখত ব্রজাঙ্গনা স্বপনেমে তোহে!—
(বংশী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিয়া)
তু'বাজাবি ইহারে দিবসে নিশীথে
প্রদোষে প্রভাতে!
মহেন্দ্র লগনে সৃজন ইহার
আরবে মদন মাত!
তু'আরবি নিত নিত ইহ যমুনা-তীরে
নীপবর মূলে
বৈঠবি—হেরবি—পেখবি নয়নে
যমুন সলিলে!
আয়ব রাধা যমুনার গাহনে
যৌবন-গরবিনী!
ঈষদ বঙ্কিম লোচনে তাকই
পেখবি ত্রৈলোক্য-মোহিনী!
যবে আঁখি মিলব মধুরিমে হাসবি
অন্তর কহবি ঠারে!

যদি সময় পায়বি লাজ নাহি করবি
ছলে কলে কৌশলে যায়বি নিকটে
মন খুলি তারে কবি অকপটে!
এহি তব পাট সাবহ ইহারে
একবারে নার—সহস্র বারে!

শ্রীকৃষ্ণ।—
উৎকট সাধনা বৃন্দে অন্তরে ডরাই!
কইসন সাধব ভাবই না পাই!
শর জাল মাঝারে সহজ গমন
শিহরি স্মরণে নয়ন খরতর
সন্ধানে! কইসন সহব তায়?
বরঞ্চ সহজ তুরগ তুয়ারে
বিপক্ষ শত অসি তরঙ্গ মাঝারে
অটল অন্তরে বিজয় কামনা।—
পীরিতি প্রস্তাবে সম্মতি কামনা
কামিনী সমীপে মানত দুরূহ!
যদি কহব 'না' মরব তখনি!
তার সমতুল নহে সহস্র অশনি!—

বৃন্দা।—
রে নবীন প্রেমিক শুন মোর বাত
আঁগে আঁথে রহবি ডরবি মাত!
যদি আরক্ত লোচনে বঙ্কিম বদনে
দোষব হাসই উড়ায়বি তায়!
কামিনী-অন্তরে যাহা বদনে না কয়!—
ছলে ছলে চলবি সাথ নাহি ছোড়বি
নিষেধ করব নিষেধ না মানবি!
পুরুথ চুম্বক সংসর্গে করষে
কামিনী কোমল আয়সি কি তার!
পুরুথ পরশ পরশে হেম
ভেয়ত কামিনী অন্তর-পাথাণ।
ভানুর কিরণে মোমের কমল

তরল যইসন হোয়ও!
চাঁদের কিরণে আধাব না রয়ও।
শ্রীকৃষ্ণ।—গুরু উপদেশ মানলু হম্
সাধব বংশী—অব বংশী বাজত তোম্।
বৃন্দা।—(বনমালা উন্মোচন করিয়া)
ধর বনমালা যতনে পরবি ইহারে
রতি-পতি-রতি বিরাজে এ হারে!
এর প্রতি এক কুসুম প্রতি এক বিন্দু
অমৃত-নিহারে তিতই রচল!
এর প্রতি এক কুসুম নন্দন-সৌরভ
প্রতি এক হিলোলে শুখাই গাঁথল!
মদন-মন্ত্রময় ইহ হার
যাদুকরী কই রচিল ইহারে!
এর যতেক গুণ কহন না যায়ও
পেখলে যোগিনী চঞ্চলা হোয়ও!
যতনমে রাখবি কণ্ঠমে ধারবি
গঙ্গা-নীরে ধুই পিয়বি নীর!
(শ্রীকৃষ্ণের গলায় পরাইয়া)
অব চলব হম তু'ত বংশী ফুকরি।—
(প্রস্থান)—
শ্রীকৃষ্ণ (দাঁড়াইয়া)
বৃন্দে—বৃন্দে—
ক্ষণ ঠারি শুন এক বাত!—
বৃন্দে—বৃন্দে।—
নেপথ্যে।—বৃন্দা গয়িল বোলায়বি মত।
শ্রীকৃষ্ণ।—(অধীর হইয়া উপবেশন;—ক্ষণকাল পরে বনমালার প্রতি দৃষ্টি করিয়া)—
এর প্রতি এক কুসুম প্রতি একবিন্দু
অমৃত নিহারে তিতই রচল।
এর প্রতি এক কুসুম নন্দন-সৌরভ
প্রতি এক হিলোলে শুখাই গাঁথল।
মদন-মন্ত্রময় ইহ হার!
যাদুকরী রচল ইহারে!
এর যতেক গুণ কহন না যায়ও
পেখলে যোগিনী চঞ্চলা হোয়ও!
যতনমে রাখব কণ্ঠমে ধারব
গঙ্গা-নীরে ধুই পিয়ব নীর!
রাধালাভ ইথে হব কি হমার?
(ক্ষণকাল চিন্তা)
আও বংশী অব সাধব তোহারে।
বাজ দেখি আজি 'রাধা রাধা' স্বরে!—
(ক্ষণকাল চেষ্টার পর ক্ষণকাল 'রাধা রাধা' স্বরে বংশী ধ্বনি—পরে বিরক্ত হইয়া)—
কই বংশী?—তব সাধন বিফল।
কই তব সাধনে রাধিকা আয়ল?
(বংশী ফেলিয়া প্রস্থান)—
নেপথ্যে।— গীত।
বেহাগ। একতালা।
বাঁশরী বাজতরে।
গভীর রজনী চাঁদের কিরণ
হুতাসন সম লাগতরে।
নীরব কোকিল তমাল শেখরে
সে রবে মোহিত বিরত কুহরে
মলয় অনিল চলত মন্থরে
মদন হানত রে।
স্খলিত ঘাঘরি গিরত ভূতলে
উড়ু উড়ু প্রাণ চরণ না চলে
হেলিয়ে পড়ত মেদল অনিলে
অনল নিশাসে বহতরে।
কাঁচলি কবণ এইত খুলল

কষ্টমনে তায় কষব বল;
অন্তর মাঝারে কি যেন বিঁধল
ভূতলে গিবতরে।
হম্ আছলু শয়নে মুদিত নয়নে
সেরূপ কাঁহেবা পেখলু স্বপনে
মদন-মোহনে মুরলী বদনে
রাধা রাধা স্বরে হাঁকতরে॥

(রাধিকার প্রবেশ)

রাধা।—কই যমুনা তীরে কই বনয়ারি?
শ্মশান যমুনা—স্বপন ছললি হমারি!
হম আছলু শয়নে বঙ্শী বদনে
মদনমোহনে পেখলুরে।
ইহ যমুনা-তটে নীপতরু নিকটে
ত্রিভঙ্গ ঠাটে হেলিয়েরে।
বংশী ফুকারে রাধা রাধা স্বরে
নয়ন কি ঠারে বোলায়লরে।
উড় উড় অন্তর শরমে থরথর
জর জর জ্বর ভেয়লরে!
অন্তর টলল পদ নাহি চলল
পাপ শরম বাদ সাধলরে।
কাচলি কষণ পুনপুন বাঁধলু
পুন পুন যেন খুললরে।
নয়ন-যুগল পুনপুন তুললু
পুন পুন পুন মুদলুরে!
দুকূল অঞ্চল পুন পুন গিবল
পুন পুন ঝাড়ি তুললুরে!
ধীরে ধীরে ধীরে মধুব অধরে
হাসি হাসি শ্যাম আয়লরে।
আজানুলম্বিত ভুজ প্রসারিয়া
হৃদয়মে মোয় বাঁধলরে।
সলাজে অন্তব করলু বদন
ফিরায়ে অধরে দাগলরে।
সঞ্জীবনী সুধা রুধিরে মিসল
ধমনী ভিতরে খেললরে।
টলল চরণ কাপল জঘন।
আমোদে নয়ন চাহলরে।
ভাঙ্গল স্বপন আধার নয়ন
বাঁশরি শ্রবণে পসলরে।
আকুল অন্তরে বিপিন মাঝারে
একাকিনী হম পসলুরে!'
শিশির সলিলে দুকূল তিতল
কুশাঙ্কুরে পদ বিধলরে।
গভীর নিশীথ বেতসে বাধই
ভূতলে কতই গিরইরে
আয়লু—এখন যমুনা শ্মশান
পেখতরে।
কুসুম-চাপ অব্ বিষম দাপে
হৃদয়মে মোর হানতরে!

(উপবেশন)

(ক্ষণকাল পরে বংশী দেখিয়া)

আঃ—বাশরী এহি মদন-দুন্দুভি—
অমূল্য নিধি লভলুরে।

(আগ্রহের সহিত বংশী গ্রহণ)

তোয় যতনে রাখব অধরে দাগব

(বংশী চুম্বন)

হৃদয় মাঝারে রাখবরে!

(বংশী হৃদয়ে স্থাপন)

নিত নিত তোয় পুজব রে!
শিরমণি করি রাখবরে!

(বংশী মস্তকে স্থাপন)

(ললাট হইতে সিন্দুর ও চন্দন গ্রহণান্তর বংশীকে অভিষেক এবং বংশী

সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক)

বংশীবর হম নমত তোহারে
কবরী-কুসুমে পূজব তোহারে।

(কবরী হইতে কুসুম উন্মোচন পূর্ব্বক বংশীতে প্রদান এবং করপুটে জানু পাতিয়া ও নয়ন মুদিয়া)

নমতি বংশী ত্রিভুবন-মোহন
ব্রজাঙ্গনা-মন-মোহিত-কারি!
নমতি বংশী তব প্রতি রন্ধ্রে
সপত মোহন সুর-নিসারি!
নমতি বংশী ত্রিভুবন-দুর্ল্লভ
শ্যাম সুন্দরাধর সরগ-নিবাসি!
নমতি বংশী মদন-দুন্দুভি
মদন-বিজয় ঘোষণা-কারি!

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং নিঃশব্দে বংশীর নিকট দণ্ডায়মান)

নমতি বংশী—দেহ এহি বর
পাই যেন হম বংশীধর!—(প্রণিপাত)

(বৃন্দার পুনঃ প্রবেশ)

বৃন্দা।—
উঠলো রাধে পেখলো নয়ন মেলি তুং
বংশী পূজই বংশী ধরে লভলি।

(রাধিকা বংশী গ্রহণ এবং হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিতা এবং মুখ ফিরাইয়া অধোমুখী।)

শ্রীকৃষ্ণ।—আজ
সরগকি দুয়ার খুলল হমারি!
রাধে!
বিনা পরশনে কাহে সঙ্কুচিতা
ললিত লাজবতী লতা-ভেয়ল?
তব যুগ অধর—সরগ অরগল*
পুনরপি খুলই কহত হমারে
ভকত তৃষিত দাঁড়াই দুয়ারে!—

(রাধিকা অধোবদনে গমন—শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

বৃন্দা।—(রাধিকার প্রতি)
ফাটবে বুক কহবে না মুখ
ভীখন হুতাশন জ্বলবে অন্তরে
মুখ ফুটি নাহি কহবে নাগরে!—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)

ছলে ছলে চলবি সাথ নাহি ছোড়বি
নিষেধ করব নিষেধ না মানবি!—

(অগ্রে রাধিকা পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ তৎপশ্চাৎ বৃন্দার প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

ক্রমশঃ—

বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বৈদিক আচার প্রচলিত। তান্ত্রিক আচার কেবল বঙ্গ দেশেই বিশেষ আদরণীয়, অন্যত্র ইহা নিতান্ত বিরল-প্রচার। বৈদিক ক্রিয়া

কলাপের মধ্যে বঙ্গদেশে সামবেদী ক্রিয়া কলাপেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অন্য বেদের অনুষ্ঠান অল্প কেন তাহার উত্তর এই—অন্যবেদী দ্বিজাতির সংখ্যা নিতান্ত ন্যূন। সামবেদের অনুষ্ঠান অপেক্ষা পৌরাণিক ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান নিতান্ত বাহুল্য রূপে দেখা যায়। এক্ষণে বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতি ও শূদ্রাদির ভাগই অধিক। স্ত্রী ও শূদ্রাদির বেদে অনধিকার বশতঃ উহারা বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। তাহাতেই বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠানের হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

কোন্ সময় হইতে বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠানের খর্ব্বতা হয় তাহার প্রমাণ সহজ নহে। তবে মহামহোপাধ্যায় মহর্ষি ভগবান্ ব্যাসদেব মনুষ্যগণের অবস্থা দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়া দ্বাপর যুগের অবসানে যে সকল কথা কহিয়াছেন পাঠকগণ তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, কেন বৈদিক অনুষ্ঠানের হ্রাস হইয়াছে। তিনি কহেন যুগেযুগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তাহারা দুর্ম্মেধ এবং দুর্ভাগ্য হইয়া আসিতেছে। সেই হেতু বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে মনুষ্যগণ নিতান্ত অপারগ হইয়াছে দেখিয়া তিনি (ব্যাসদেব) বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন। তদ্দ্বারা চারি প্রকারে যজ্ঞ সমাধা করিবার উপায় বিধান হয়।

বেদের প্রথমভাগ ঋক্, দ্বিতীয়ভাগ যজুঃ, তৃতীয় ভাগের নাম সাম, চতুর্থ ভাগের নাম অথর্ব্ব। ব্যাসদেবের মতে পুরাণ গুলি বেদের পঞ্চম ভাগ।

এক্ষণে দেখ কোন্‌টীকে মনুষ্যেরা ঋক্ বেদ বলিবেন এবং কোন্‌টীই সাম-বেদ ইত্যাদি। কিন্তু মীমাংসকগণ বেদকে ত্রয়ী নামে আখ্যা দেন, তদনুসারে 'অথর্ব্ব বেদ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। অথর্ব্ব নিজে পৃথক্ নহে। পুরাণ গুলিতে বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রকরণ আছে বলিয়াই তাহাকে পঞ্চম বেদ শব্দ নির্দ্দেশ করা গিয়া থাকে। কিন্তু উহা বেদ হইতে নিতান্ত ভিন্ন পদার্থ।

যথা বেদের মন্ত্র ভাগের নাম ঋক্, যাহাতে লৌকিক অনুষ্ঠান আছে তাহার নাম যজুঃ, যাহা স্বর-সংযোগে পাঠ্য তাহার নাম সাম। অথর্ব্বের সেরূপ কিছু নামান্তর নাই। ইহার মন্ত্র গুলিও ঋকের অন্তর্গত, অনুষ্ঠান যজুর অন্তর্গত, গীত গুলি সাম বেদের অবান্তর ভাগ মাত্র। যথা ঋক্—মন্ত্রম্, যজুরনুষ্ঠানম্, সাম—গানং।

অথর্ব্ব বেদে এই তিনেরই সমাবেশ আছে।

মহর্ষি ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করিয়া কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলেন এবং তাঁহারা কোন্ কোন্ দেশে উহা প্রচার করিলেন এবং কি রূপেই বা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইল, এই সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য লোকের কৌতূহল জন্মিবার সম্ভাবনা, তদনুসারে ভাগবত পুরাণের লিখিত কতকগুলি বিষয় অদ্য এখানে উদ্ধার করা গেল। যথা—

ব্যাসদেবের পৈল নামক শিষ্য ঋক্ বেদ অভ্যাস করেন। জৈমিনি সামবেদের শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী হন। বৈশম্পায়ন সমগ্র যজুর্ব্বেদ পাঠ করিয়া তাহার সমুদায় বিষয়ে অধিকারী হয়েন। সমস্ত ঋষি অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করেন। লোমহর্ষণ মুনি সমুদায় পুরাণ ও ইতিহাস জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই সকল ঋষিগণ নিজ নিজ শিক্ষিত বেদকে বিভাগ করিয়া এক এক বিষয় আপন আপন শিষ্যগণকে অভ্যাস করান। তাঁহাদিগের শিষ্যেরা গুরুর নিকট যেরূপে শিক্ষিত হইয়াছিল তদনুসারে শিষ্যগণের শক্তি অনুসারে শিক্ষিত বেদের শাখা বিশেষকে আবার বিভাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় শিষ্যগণ মধ্যে খণ্ড খণ্ড রূপে প্রচার করেন। তদনুসারে ব্যাসদেবের নিকট হইতে প্রথমে বেদ চতুর্ধা বিভক্ত হয়, পরে বেদব্যাসের শিষ্য সন্ততি দ্বারা শাখা রূপে বিভক্ত হয়, তৎপরে প্রশিষ্য ও তচ্ছিষ্য দ্বারা প্রশাখাদি দ্বারা বিভক্ত হয়। এই রূপে ক্রমে সমগ্র বেদের চর্চ্চার হ্রাস হয়। ক্রমে বেদের শাখা প্রশাখার এক দেশমাত্রের আলোচনা হইতে লাগিল। ইহাতেই সমগ্র বেদের আলোচনা রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে আবার ব্যাস দেব একদিন লোকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে স্ত্রী ও শূদ্রাদি বেদে অনধিকারী। তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি বেদের সার ভাগ সঙ্কলন পূর্ব্বক ভারত নামক ইতিহাস প্রস্তুত করিলেন; তদ্দ্বারা লোকে অল্পায়াসে ও সুখে ধর্ম্ম কর্ম্মের শ্রেয়ো লাভ করিতে লাগিল। তদবধি বেদের চর্চ্চা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণে লোকের বিশ্বাস জন্য আমরা ভাগবত পুরাণের ঐ অংশটী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম যথা—

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥ ১৪

স কদাচিৎ সরস্বত্যাঃ উপস্পৃশ্য জলংশুচি।
বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে ॥ ১৫

পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসঃ।
যুগধর্ম্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে ॥ ১৬

ভৌতিকানাঞ্চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসঞ্চ তৎকৃতম্।
অশ্রদ্দধানান্ নিঃসত্বান্ দুর্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ ॥ ১৭

দুর্ভগান্ স জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাম্ যৎ দধ্যৌ হিতং অমোঘদৃক্ ॥ ১৮

চতুর্হোত্রং কর্ম্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকং।
ব্যদধাৎ যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্বিধং ॥ ১৯

ঋক্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ ॥

তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ স্বামগো জৈমিনিঃ কবিঃ॥ ২০॥
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষামুত॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সমন্তুর্দারুণোমুনিঃ॥২১
ইতিহাসপুরাণানাংপিতামে রোমহর্ষণঃ॥
ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্ননেকধা॥ ২২
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈ র্বেদাস্তেশাখিনো হভবন্॥
ত এব বেদা দুর্ম্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা॥২৩
এবং চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ॥
স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজ-বন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা॥ ২৪
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতিভারতমাখ্যানং কৃপয়ামুনিনাকৃতম্॥২৫

ভাগবত পুরাণ।

১ম স্কন্দ। চতুর্থ অধ্যায়।

এখন দেখা যাউক পুরাণ অপেক্ষা বেদের চর্চ্চায় লোকের অনুরাগ কম হইল কেন। তাহার উত্তর এই—বেদ শিক্ষা করিতে গেলে অন্যান্য শাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক, যথন শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ ছন্দ, ঋষি ও স্বরাদি জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু পুরাণ শিক্ষায় কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ জ্ঞান যোগ থাকিলেই হয়। না থাকিলেও ভাবার্থ জানিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। যেহেতু বেদের ভাষা অপেক্ষা পুরাণের ভাষা সহজ সুললিত এবং মার্জ্জিত। বেদ পাঠের অধিকারী ও অনধিকারীর ক্রম যেরূপ লেখা আছে তদনুসারে বেদের তাৎপর্য্য ও স্বর সম্যক্‌রূপে না জানিলে, যজমান হোতা, আচার্য্য শ্রোতা প্রভৃতির কর্ম্ম-সিদ্ধি হয় না বরং বিপরীত ফল হয়। কিন্তু পুরাণ সে প্রকার নহে। সমাহিত চিত্তে পুরাণের বিষয় শ্রবণ করিলেই শ্রোতার সমস্ত ইষ্ট সিদ্ধি হয়। বক্তা স্বর্গগামী হন—যে ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি পুত্র পৌত্রাদির সহিত অনন্ত কাল সুখ ভোগ করে। পুরাণে ইত্যাদি প্রকারে বিস্তর ফল শ্রুতি আছে। সেই ফল শ্রুতি গুলি লোকের মনোহারিণী।

ইহ জগতে মনোহর বাক্যই লোকের সুখপ্রদ ও সহজে তাহাতে আস্থা হয়। সুতরাং বেদের চর্চ্চা ক্রমশঃ লোপ হইতে লাগিল। যাহাতে যত ফলশ্রুতি অধিক, তাহার প্রচার তত অধিক। এবং যাহা যত সহজে বোধগম্য হয়, সেই রূপ ধর্ম্ম-পদ্ধতি তত শীঘ্র তত সহজে তত অধিক প্রচার হইয়া থাকে ইহা লোক-প্রসিদ্ধ।

সে মৌলিক নিয়ম অনুসারে অন্যান্য বেদ অপেক্ষা সাম বেদের প্রচার অধিক। যেহেতু সাম বেদের ক্রিয়া কলাপ তত জটিল নহে। সাম বেদকে স্বরসংযোগে যথার্থরূপে সংগীত করিতে পারিলেই বেদের লিখিত ফল প্রাপ্তি বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। সামবেদের দেবতা সূর্য্য (রবি), ইনি প্রত্যক্ষ বস্তু এবং অষ্টমূর্ত্তি স্বরূপ শিবের, রূপান্তর মাত্র। শিবানীই সামবেদযুক্তা, সুতরাং শক্তির উপাসক মাত্রই সামবেদী। শক্তিকে ভজনা

করা সহজ। শক্তিই বেদমাতা গায়ত্রী।

যজুর্বেদের দেবতা বায়ু—এবং যজুর্ব্বেদের সাবিত্রীকে বৈষ্ণবীরূপে নির্দ্দেশ আছে। তদনুসারে যজুর্বেদীরা প্রায় বিষ্ণু-মন্ত্র-উপাসক। ঋক্‌বেদীদিগের মধ্যে অগ্নির উপাসক অধিক এবং শক্তির উপাসনাও দেখা যায়।

অগ্নির্বায়ুরবিভ্যস্ত এবং ব্রহ্মসনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃক্ যজুঃ সামলক্ষণং॥

মনু। ২ য়। ২৩ শ্লো—

বিশেষতঃ ভগবদ্গীতায় সামবেদের এত প্রশংসা যে লোকে সেই প্রশংসা পাঠ করিলেই ও তাহার জন-শ্রুতি দেখিলেই প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে সাম বেদকেই আশ্রয় করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহা ভগবদ্গীতার লিখিত আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তি।

তিনি কহিতেছেন আমি বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে বাসব (ইন্দ্র) এবং ইন্দ্রিয় গণের মধ্যে মনঃ, জড় পদার্থের মধ্যে চৈতন্য, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে ধনপতি, বসুগণের মধ্যে অগ্নি এবং গিরি সমূহের মধ্যে সুমেরু। অর্থাৎ এই সকল সমান-জাতীয় বস্তুর মধ্যে যে বস্তু শ্রেষ্ঠ তৎসমস্তই আমাতে আছে। সুতরাং সামবেদ সমস্ত বেদের সার ভাগ। এই বিশ্বাসে অধিকাংশ লোকে সামবেদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ভগবদ্গীতার বচন যথা—

বেদানং সামবেদোস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।

ইন্দ্রিয়াণাংমনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২

রুদ্রাণাংশঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাং॥

বসুনাংপাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণা মহং॥ ২৩

৩৩ অ। ২২।

মৎস্য পুরাণে পার্ব্বণ কালে অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞে কাহাদিগকে ভোজন করান নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ ছলে ব্যাসদেব কহিয়াছেন যত্ন পূর্ব্বক সামস্বর-জ্ঞান-বিশিষ্ট পংক্তি-পাবন ব্রাহ্মণকে এবং সামগ ব্রহ্মচারীকে অগ্রে যত্ন পূর্ব্বক ভোজন করাইবে। অন্যবেদীদিগের মধ্যে যাঁহারা সাগ্নিক, স্নাতক অর্থাৎ সমগ্র বেদ পাঠানন্তর সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়াছেন, ষড়ঙ্গ বেদ উত্তম রূপে অবগত আছেন, তাঁহারাও সামবেদীর তুল্য। সুতরাং সামবেদ সকলের উপমান স্থলে আসিতেছে। মনুতেও লেখা আছে যে দেব কার্য্যের জন্য ঋক্‌বেদ প্রশস্ত, অর্থাৎ দেবগণই ঋক্‌বেদের দেবতা, মনুষ্যগণের সাংসারিক কার্য্যে যর্জুবেদ প্রসিদ্ধ। পিতৃ কার্য্যের জন্য সামবেদ প্রশস্ত। সেই হেতু সামবেদের পাঠানন্তর অন্য বেদ পাঠ করিবার আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ সামগীত শ্রবণানন্তর অন্য মন্ত্র ও শ্রুতি গুলির ধ্বনি শ্রুতি-সুখকর হয় না। এই কারণে সাম ধ্বনির পর

অন্য বেদের ধ্বনি অশুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। লোক ব্যবহারেও দেখা যায় তাললয়বিশুদ্ধ গীত শ্রবণানন্তর অতি সুমধুর বাক্যও আর তাদৃশ রূপে প্রীতিপ্রদ হয় না।

মৎস্য পুরাণের বচন দেখ এবং মনুর আদেশের সহিত মিলন কর। তাহা হইলেও দেখিতে পাইবে পিতৃগণ হইতে দেবাদির উৎপত্তি হইয়াছে এবং দেবতাগণ হইতে সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের উৎপত্তি। এই কারণে পিতৃগণ সকলের নিকট পূজ্য। যথা—

ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ
পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জাতংসর্ব্বং
চরং স্থাবরমনুপূর্ব্বশঃ॥ মনু
ঋকৃবেদো দেবদৈবত্যো
যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্য-
স্তস্মাত্তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥

মৎস্য পুরাণের প্রমাণ যথা—

পার্ব্বণে যে নিযোজ্যাস্তু তান্ শৃণুষ্ব নরাধিপ।
পঞ্চাগ্নিঃ-স্নাতকাশ্চৈব ত্রিসুবর্ণে যড়ঙ্গবিৎ॥
সামস্বরবিধিজ্ঞাশ্চ পংক্তি-পাবন-পাবনাঃ।
সামগো ব্রহ্মচারীচ দেবভক্তোথ ধর্ম্মবিৎ॥
এতে ভোজ্যা প্রযত্নেন বর্জনীয়াঃ নিবোধনে।

ইতি মৎস্য পুরাণে ষোড়শ অধ্যায়ঃ—

পুরাণাদি বাহুল্যরূপে প্রচার হইলে বেদ চর্চ্চা ক্রমশঃ অল্প হইতে লাগিল। স্ত্রী ও শূদ্রগণের জন্য যে পুরাণ সৃষ্ট হইয়াছিল উহা অজ্ঞ প্রাজ্ঞ ও মহর্ষিগণের আশ্রয় হইয়া উঠিল। এদিকে সৌতি, উগ্রশ্রবা, লোম হর্ষণ প্রভৃতি এরূপে পুরাণের ব্যাখ্যা ও কথা আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতেই লোকে মুগ্ধ হইতে লাগিল ক্রমে ব্রত নিয়ম বহির্গত হইতে লাগিল। পুরাণের মতানুসারে ক্রমে সকলেই চলিতে আরম্ভ করিলেন।

স্মৃতি-সংগ্রাহকগণ পুরাণের বচন গুলি বেদবৎ মান্য করিয়া নিজ নিজ সংগ্রহের দৃঢ়তা সংস্থাপন করিতে লাগিলেন॥ ক্রমে যখন ঐ সংগ্রহ গ্রন্থগুলি লোকের নিকট সমাদৃত হইতে আরম্ভ হইল, তখন পুরাণের প্রতি লোকের বিশ্বাস একবারে বদ্ধমূল হইয়া আসিল। তদবধি পুরাণের মত সকল অবিসংবাদী রূপে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া উঠিল।

এদিকে লোকের বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও ভক্তি সকলই পুরাণে আবদ্ধ হইল। ধর্ম্মকার্য্য মাত্রেই পুরাণ পাঠের প্রাধান্য হইল। শ্রাদ্ধে মহাভারতের বিরাট পর্ব্বের পাঠ আরম্ভ হইল। সামান্য কার্য্যেও পুরাণের আদরে বৈদিক অনুষ্ঠান সহজেই লোপ হইতে আরম্ভ হইল। এমন কি একের উদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ পর্য্যন্তেও বৈদিক মন্ত্র অপেক্ষা পুরাণের বচনের প্রতিই লোকের বিশেষ আস্থা হইতে লাগিল। তাহার প্রামাণ্য ব্যবস্থাপন জন্য আমাদিগকে মহাভারতীয়

বিরাট্ পর্ব্বের বচন উদ্ধার করিতে হইল।

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ।

স্কন্ধোর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা

মাদ্রীসুতো পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং-কৃষ্ণঃ ইত্যাদি।

দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ

শকুনিস্তস্য শাখা মূলং ধৃতরাষ্ট্রোমনীষী ইত্যাদি।

সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগকাঞ্জরে গিরো-চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে তেভিজ্জাতা কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। ইত্যাদি।

এই তিনটী মন্ত্রে মহাভারতীয় সমস্ত কথা সমাপ্ত হইয়াছে। অধুনা শ্রাদ্ধে যে ইতিহাস পাঠ হয় তাহা এই।

পাঠক তুমি এখন দেখ যে পিতৃকার্য্যে সামগান হইত, সেই পিতৃকার্য্যে এক্ষণে কেবল মহাভারতের তিনটী শ্লোক মাত্র পাঠ হয়। তাহাতেই পিতৃলোকের তৃপ্তি ও শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার আনৃণ্য লাভ হইয়া থাকে, যখন অল্পায়াসে ও অল্প কথায় মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারিল তখন বৃথা অধিক আড়ম্বরের সহিত সামগানের আবশ্যকতা কি! সে গানও গাবার সহজ নহে, তাহা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ—এই তিন স্বর এবং ষড়জ, মধ্যম, ঋষভ, গান্ধার ধৈবত ও পঞ্চম মিলন পূর্ব্বক সংগীত করিতে হয়। কিন্তু বিরাট পর্ব্বের বচন আবৃত্তি করিলেই চলে। এবং এই বচন গুলি স্ত্রী শূদ্রাদির নিকটও অনায়াসে বলা যায়। সুতরাং ইহা সর্ব্বত্র সমান রূপে সমাদরে স্থান প্রাপ্ত হইল। ইহাই বৈদচর্চ্চার হ্রাসের একটী প্রধান কারণ।

পাঠক তুমি এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার—পুরাণ ত এইরূপেই সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিল, তৎপরে কি প্রকারে পুরাণকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া তান্ত্রিক দীক্ষা বেদের আসন অধিকার করিল? তাহা তুমি জানিতে চাহ, তাহা এক প্রস্তাবে বলিতে গেলে এপ্রস্তাব নিতান্ত দীর্ঘ হয়। এবং সংক্ষেপে বলিতে গেলে-ও সহজ হইবার সম্ভব নহে। এই কারণে প্রস্তাবান্তরে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। অদ্য এই খানেই বিশ্রাম-সুখ লাভ করুন।

শ্রীলাল মোহন শর্ম্মা।

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

(সপ্তম প্রবন্ধ।)

ম্যাট্‌সিনি "নব্য ইতালী" নামক পত্রিকায় অনেক গুলি প্রস্তাব লিখেন; তন্মধ্যে প্রথম কয়েকটী বৈদেশিকদিগের তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

ইহার পর তিনি—ইতালীর স্বাধীনতার

পরিণতি যে কারণ-পরম্পরায় এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হইয়া আসিয়াছে—তদ্বিষয়ে দুইটী সুদীর্ঘ ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব লিখেন। ম্যাট্‌সিনির রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতি বৎসরে অভ্যুত্থিত বিপ্লবসকল যে যে কারণে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল, এই প্রস্তাবদ্বয়ে সেই কারণমালা সাবধানে সমালোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ—অধিনেতৃগণের ভ্রম ও অক্ষমতা, ইতালীয় জাতির বীরত্ব ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব নহে। কারণ প্রত্যেক অভ্যুত্থানই সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল।

ইতালীয় জাতির সহজজ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে ইতালীয়ক্ষেত্রে ইতালীয় পতাকাই উড্ডীন করিয়াছিল; এবং বৈদেশিকদিগেকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিবার জন্য যদিও জাতীয় একতা (Unity) সংসাধিত করিতে না পারুক, অন্ততঃ জাতীয় সম্মিলন (Union) সংসাধনের জন্য একাগ্র হইয়াছিল।

অধিনয়নকার্য্যের বিশৃঙ্খলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যুত্থানের পতনের কারণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অধিনয়ন কার্য্য অক্ষম ও বিশ্বাসহীন অধিনেতৃগণের হস্তেই পতিত হয়। তাঁহারা জনসাধারণের অন্তর্নিগূহিত বলবতী হৃদয়াকাঙ্ক্ষার মর্ম্মবোধে অক্ষম এবং ইষ্টসাধনে জীবন উৎসর্গীকৃত করণে. বীতসাহস ছিলেন। তাঁহাদিগের সাহসও ছিল না এবং আপনাদিগের উপর বা জনসাধারণের উপর বিশ্বাসও ছিল না বলিয়াই তাঁহারা বৈদেশিক শক্তি ও কূট মন্ত্রণাজালের উপর তাঁহাদিগের বিজয়াশা সন্ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে সেই বৈদেশিক শক্তি ও কূট মন্ত্রণাজালই তাঁহাদিগকে পদে পদে পরিত্যক্ত ও শত্রুহস্তে সমর্পিত করে।

ঔদার্য্য ও বীরত্বের সহিত আরব্ধ এতগুলি জাতীয় অভ্যুত্থানের পতনের পরিণাম শেষে এই দাঁড়াইল যে ইতালীয় হৃদয়ে গভীর হতাশতা ও নিরুৎসাহতার ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। এবং তাহার বিষময় ফলস্বরূপ এরূপ কার্য্যবিমুখতা জন্মিল যে তাহা হইতে ইতালীকে উদ্ধৃত করিতে না পারিলে ইতালীর আর কোন আশা রহিল না।

যাঁহারা ভবিষ্য অভ্যুত্থানের অধিনায়ক হইবেন তাঁহাদিগকে জাতীয় শক্তির উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে এবং জনসাধারণকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মনে এই ধারণা চাই যে বিপ্লবের কৃতকার্য্যতা আক্রমণেই; এবং বৈদেশিক অস্ত্রে শাসিত দেশে যুদ্ধ অভ্যুত্থানের প্রতিশব্দমাত্র। সুতরাং যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য, তখন ইহা এরূপ প্রণালীতে আরব্ধ করা চাই, যে যত দিন ইতালীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা বিকীর্ণ না হইবে ততদিন যেন শান্তি বা সন্ধি অসম্ভাব্য হয়।

জানিও যদি এই জাতীয় অভ্যুত্থান জাতিসাধারণের জয় শব্দে উদ্বোধিত না হয়, তাহা হইলে ইহার পতন অনিবার্য্য।

জাতীয় অভ্যুত্থানের পতনের আর একটী কারণ—অধিনেতৃগণের অবিচলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্বাসের অভাব। বর্ত্তমান অবস্থার বিপর্য্যাস সাধন—যে শৃঙ্খলে ইতালীর জাতীয় চরণ আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করণ—এবিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই বটে, কিন্তু তাহার পর কি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনিশ্চিত, সন্দিগ্ধ ও নানামতে বিভক্ত। কিন্তু যাঁহারা প্রতিষ্ঠাপিত সমাজের শৃঙ্খল ভেদ করিয়া জনসাধারণকে উন্নতি-মার্গে অগ্রসর করিতে চান, তাঁহাদিগের উচিত অগ্রগামী হইয়া অগ্রবর্ত্তী পথে আলোক বিকীর্ণ করেন।

ব্যক্তি-বিশেষের আধিপত্য, বা ব্যক্তি-বিশেষের রাজত্বের কাল অতীত হইয়াছে; এক্ষণে সংঘাতমানবযুগ আবির্ভূত হইয়াছে। সংহিতমানবের শক্তি জগতে অনিবার্য্য। **জনসাধারণ কর্ত্তৃক জনসাধারণের জন্যই বিপ্লব আরব্ধ ও সংসাধিত করিতে হইবে**—ইহাই নব্য ইতালীসমাজের মূলমন্ত্র; ইহাই নব্য ইতালীসমাজের বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম, প্রীতি ও চিন্তা. লক্ষ্য ও কার্য্য।

ইতালীয় জনসাধারণ বহুদিন হইতে অসংখ্য অত্যা[illegible] অসংখ্য মনঃকষ্ট সহ্য করিতেছে; য[illegible]চারিণী প্রভুশক্তি এবং গর্ব্বিত ও ঘৃণিত উচ্চশ্রেণী দ্বারা প্রতিদিন পদদলিত হইতেছে; যদি তাহাদিগকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিতে হয় তবে স্পষ্টাক্ষরে তাহাদিগের নিকট বলিতে হইবে যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয় তাহা হইলে অত্যাচারের এই দুইটী মূলই উন্মূলিত হইবে।

তাহাদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে হইলে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। ইতালীয় অতীত অবদান-পরম্পরা—ম্যাসানিলো, পারিস, ব্রসেল্‌স, ওয়ার্‌সা প্রভৃতি নগরের আধুনিক যুদ্ধ সকল—তাহাদিগের স্মরণপথে অবতারিত করিতে হইবে। তাহাদিগকে বলিতে হইবে "যদি তোমরা এই সকল কীর্ত্তিকলাপের অনুকরণ করিতে চাও, তবে অসুরের বল ধারণ কর। ঈশ্বর তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। উৎপীড়িতদিগের সহিতই ঈশ্বরের সহানুভূতি। যখন দেখিবে এই উদ্দীপনাবাক্যে ইতালীয় ললাট স্ফুরিত হইতেছে, সাগর-হৃদয়ের ন্যায় ইতালীয় হৃদয় তরঙ্গায়িত হইতেছে, তখনই অপ্রতিহত বেগে সমরশীর্ষে প্রধাবিত হইবে এবং লম্বার্ডী ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে—

যাহাদিগ কর্ত্তৃক তোমাদিগের দাসত্ব-নিশা বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে, ঐ দেখ সেই জাতি অদূরে দণ্ডায়মান। তাহার পর আল্‌পসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিবে—এই আমাদিগের স্বাভাবিকী সীমা—যে অষ্ট্রিয়া সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর।

"ঈশ্বর জনসাধারণের মঙ্গল বিধান

করিবেন! জনসাধারণ তাঁহারই অনুগৃহীত এবং তৎকর্ত্তৃকই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রেমের উদ্‌ঘোষণ কার্য্যে নিয়োজিত"।

"ভবিষ্য বিপ্লব সকল জনসাধারণের জন্য জনসাধারণ কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হইবে" —এই আধুনিক মতের প্রবণতা সাধারণ-তন্ত্রেরই দিকে। এই জনসাধারণকে সাধারণ-তন্ত্রের মূল সূত্রে দীক্ষিত করাই নব্য ইতালীসমাজের প্রধান লক্ষ্য। ম্যাট্‌সিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সাধারণ তন্ত্র ব্যতীত ইতালীয় একতা ও স্বাধীনতা কখনই সংসাধিত হইবে না।

ইউরোপ নানা আকারে রাজতন্ত্রের পরীক্ষা করিয়াছে; কিন্তু কোন প্রকার রাজতন্ত্রেই শান্তি পাইতেছে না। এক্ষণে সাধারণতন্ত্র ব্যতীত ইউরোপের উন্নতি ও শান্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। নেপোলিয়ান্ সেণ্ট্‌হেলেনায় বসিয়া বলিয়াছিলেন যে "চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সর্ব্বত্র হয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইবে অথবা ইহা কসাকদিগের অধীন হইবে" ম্যাট্‌সিনির মুখ হইতে নেপোলিয়ানের সেই বাক্য সর্ব্বদা উচ্চারিত হইত।

সাধারণতন্ত্রের প্রতি লোকের যে বিদ্বেষ ও ভয় আছে তাহার কারণ প্রথম ফরাশী বিপ্লবের ভীষণ রণোন্মাদ। কিন্তু লোকের জানা উচিত যে তখন বস্তুতঃ ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপনের চেষ্টামাত্র হইতেছিল—সাধারণতন্ত্রানুকূল সমরমাত্র আরব্ধ হইয়াছিল—সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই।

লোকে সাধারণতন্ত্রের নামেই কম্পিত-কলেবর হয়। কিন্তু সাধারণ-তন্ত্র কি উপাদানে গঠিত, যদি একবার ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলে ইহার গ্রহণে কখনই অস্বীকৃত হইবে না।

জাতীয় শাসন-ভাবের জাতীয় হস্তে পরিরক্ষণের নামই সাধারণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠাপন। যে বিধিমালা দ্বারা এই শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে তাহা জাতীয় ইচ্ছা দ্বারা সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই শাসন-প্রণালীতে জাতীয় প্রভুশক্তিই সর্ব্বোচ্চনিয়ামক শক্তি ও সর্ব্বপ্রকার প্রভুতার কেন্দ্র ও মূল বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

ইহা এরূপ একপ্রকার জাতীয়সম্মিলন যথায় সংখ্যার শক্তি অনুসারেই প্রত্যেক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; যথায় সর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদা (Privilege) আইনে অস্বীকৃত হয় এবং কার্য্যের দোষ গুণ অনুসারেই দণ্ড ও পুরস্কার প্রদত্ত হয়; যথায় সর্ব্বপ্রকার কর, সর্ব্বপ্রকার উপায়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উপর সর্ব্বপ্রকার শুল্ক ন্যূনতম পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়; যথায় সাধারণ-কর্ম্মচারিগণ সংখ্যায় স্বল্পতম ও বেতন-পরিমাণে পরিমিততম; যথায় সাধারণ অনুষ্ঠান মাত্রেরই প্রধান লক্ষ্য সংখ্যায় অধিকতম অথচ অবস্থায় দরিদ্রতম শ্রেণীর উপকার সাধন।

"নব্য ইতালী" পত্রিকায় ম্যাট্‌সিনি-লিখিত পরবর্তী দুইটী প্রস্তাবের মধ্যে

একটী নিয়োপলিতান্ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার-বিষয়ক অপরটি "ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দের প্রতি প্রযুক্ত চিন্তামালা" নামক। ম্যাটসিনি নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টের পুত্র ডিউক অব্ রায়েশ্‌ষ্টাডের মৃত্যুতে তাৎকালিক কবিবৃন্দের তুষ্ণীম্ভাব দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া কবিত্ব-পূর্ণ এই প্রস্তাবটি লিখেন। আমরা যতদূর সামর্থ্য ইহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদান করিলামঃ—

১৮১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের বিংশ দিবসে এই রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হন। সে দিন পারীনগরী কামানের গভীর শব্দে নিদ্রোত্থিত হয়।

তৎকালে পারীনগরী জগতের আদর্শরূপিণী ছিল; তখন ফরাসি পতাকার আধূননে জগৎ-হৃদয় বিকম্পিত হইত, এবং তাহার আহ্বানে ফরাশি-হৃদয় সম্মান ও গৌরব লালসায় উদ্দীপিত হইত।

কুমারের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে অধীর হইয়া প্রজাবৃন্দ পারীনগরীর রাজপথ সকল অবরুদ্ধপ্রায় করিয়া তুলিল। এই সংবাদে কত ইচ্ছা কত আশা তাড়িত বেগে তাহাদিগের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইল। তাহারা সেই একাধিক শত তোপধ্বনি একটি একটি করিয়া গুণিতে লাগিল— যেন সেই তোপ-ধ্বনিতে ফ্রান্সের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। অবশেষে যেমন সেই একাধিক শততম তোপ-ধ্বনি সতৃষ্ণ প্রজাবৃন্দের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, অমনি এই বিশ্বব্যাপী জয়ধ্বনি ভূতল বিদারিয়া গগণে উত্থিত হইল—

"জয় নেপোলিয়ানের জয়! জয় বিজয়লক্ষ্মীর প্রেমাস্পদের জয়! আনন্দ ও শান্তি ফ্রান্সের সর্ব্বত্র বিরাজ করুক। ফ্রান্সের অধিনায়কের অদ্য একটি নবকুমার জন্মিয়াছে।"

আর সেই ফরাশিনায়ক স্বয়ং কুমারের দোলার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অভিবাদন ও জয়োদ্ঘোষণ করিতেছে; তাঁহার মুখমণ্ডলে বিজয়-স্ফূর্ত্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে; এবং বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট তৃণবৎ প্রতীত হইতেছে।

সেই এক দিন আর এই এক দিন! একাধিক বিংশতি বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে! আজ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২শরা জুলাই।

আজ গাত্রে অষ্ট্রিয় পরিচ্ছদ, ললাটে গভীর চিন্তার রেখা, হৃদয়ে মর্ম্মভেদী যাতনা, "নেপোলিয়ান" নামের গুরুত্বে চূর্ণীকৃত ও বিশীর্ণ, এই অবস্থায় ফরাশি-যুবরাজ স্কীন্‌ব্রন্ প্রাসাদে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান!

মরণোন্মুখ রাজকুমারের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে একটি সমগ্র জগৎ, কিন্তু বাহিরে অসীম শূন্য। যে সকল পরিচারক ও বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস অপেক্ষা করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিল, তাহারা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছিল তাহা তাঁহার জাতীয় ভাষা নহে— যে পতাকা তাঁহার নয়ন-সমক্ষে দুর্গোপরি তরঙ্গায়িত হইতেছিল তাহা সেই ফরাসী পতাকা নয়, যে পতাকা একদিন তদীয়

পিতার আদেশে অষ্ট্রিয় রাজপ্রাসাদের উপর সগর্ব্বে ক্রীড়া করিয়াছিল!

বিখ্যাত ২০শে মার্চের শিশু আজ ধরাশায়ী! জন্মদিনে অসীম সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের পুত্র—যাঁহার প্রথম ক্রন্দনে গগণ ভেদিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল—আজ অনাদরে অপমানে মৃত্যু শয্যায় শয়ান! পিতৃ সম্বন্ধিনী অমর গৌরব রশ্মিমালার ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত। তিনি তাহার ঔজ্জ্বল্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই মৃত্যু কালেও—গৌরব, সাম্রাজ্য, ভ্রষ্ট-লব্ধ মুকুট—এই সমস্ত গভীর চিন্তা অনিবার্য্য বেগে যুগপৎ তাঁহার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখ হৃদয়-বহ্নিকে সহসা উদ্দীপিত ও পরক্ষণেই নির্ব্বাপিত করিল। তাঁহার অন্তর্নিগূহিত হৃদয়বহ্নিতে কেহই সান্ত্বনা-বারি প্রদান করিল না। প্রলাপোদ্গীরিত তদীয় মুখোচ্চারিত "যুদ্ধ" "যুদ্ধ" শব্দ কেহই প্রতিধ্বনি দ্বারা সম্মানিত করিল না। অদ্ভুত-প্রভুশক্তি-সম্পন্ন মহান্ পুরুষের সন্ততি এইরূপে অজ্ঞাত ভাবে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

এই অদ্ভুত রাজকুমারের জন্ম ও মৃত্যু—গভীর কবিত্ব শক্তির অনুকূল দুইটী প্রকাণ্ড যুগ।

অবিশ্রান্ত কার্য্য, অবিশ্রান্ত আন্দোলন, ধারাবাহিক আনন্দ, এবং মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় খরতর প্রভুশক্তি ও উজ্জ্বলতর বিজয়-পরম্পরায় যে কবিত্ব, প্রথম-যুগের সেই কবিত্ব; আর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় গম্ভীর বিষণ্ণ এবং নিস্তব্ধ আভ্যন্তরীণ চিন্তায় যে কবিত্ব, দ্বিতীয় যুগের সেই কবিত্ব। বিশ্বাস ও বিজয়ে যে কবিত্ব, প্রথম যুগে সেই কবিত্ব; অসীম মহত্ত্বের ধ্বংসে যে কবিত্ব, দ্বিতীয় যুগে সেই কবিত্ব। একটী বর্ত্তমান-বিষয়ক, অপরটী অতীত-বিষয়ক। ম্যারেঙ্গো, পিরামীড্‌স, ওয়েগ্রাম এবং অষ্টারলিট্‌স্ প্রভৃতির যে সকল প্রকাণ্ড সমরে বিজয়-লক্ষ্মী নেপোলিয়নের অঙ্কশায়িনী হন, প্রথম যুগ সেই সমর-নিচয়ের কিরণ-মালায় উদ্ভাসিত; এবং মস্কাউ, ওয়াটার্লু ও সেণ্টহেলেনা প্রভৃতি যে সকল স্থল নেপোলিয়ানের অধঃপতনের সাক্ষীভূত, দ্বিতীয় যুগ সেই সকল স্থলের ভীষণ স্মৃতিতে তমসাচ্ছন্ন। একটী উদ্দীপনাপূর্ণ, অপরটী শোকোদ্দীপক। একটী জীবন বিষয়ক, অপরটী মৃত্যু-বিষয়ক।

যে ব্যক্তিগত চরম মহত্ত্বের নিকট একদিন সমস্ত ইউরোপ নতশির ছিল, সেই ব্যক্তিগত চরম মহত্ত্বের একমাত্র প্রতিনিধির মৃত্যুতে কেন আজ ইউরোপ এত উদাসীন? কেন আজ এই উজ্জ্বল তারকার অন্তর্ধানে—এই প্রকাণ্ড ব্যক্তিগত মহত্ত্বরূপ ভাবের জগৎ হইতে অপুনরাগমনের নিমিত্ত তিরোধানে—ইউরোপীয় কবিবৃন্দের এরূপ তুষ্ণীম্ভাব? ব্যক্তিগত মহত্ত্বের চরম দৃষ্টান্তস্থল যে চতুর্দ্দশ লুই, দশম চার্লস ও প্রথম নেপোলিয়ন্ প্রভৃতির নিকট আজ দুই শতাব্দীকাল সমস্ত

ইউরোপ লুণ্ঠিত-শির ছিল, সেই ব্যক্তিগত মহত্ত্বের শেষ স্ফুলিঙ্গের নির্ব্বাণে কেন আজ ইউরোপের এত ঔদাসীন্য ?

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফরাশি কবি এই প্রকাণ্ড ঘটনাবিষয়ে দুইটী চরণ ছন্দোবদ্ধ করিতে পারেন নাই। সম্পাদকেরা এই মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া একটী গুরুতর আন্দোলন উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের রচনায় প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাস বা গভীর শোকের কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। বরং তাঁহাদিগের রচনায় এই বিস্ময়ভাব পরিব্যক্ত ছিল যে তাঁহারা যেরূপ আশা করিয়াছিলেন আপনাদিগকে ততদূর উত্তেজিত করিতে পারেন নাই।

কুমারের জন্মদিনের দোলা হইতে তদীয় সমাধি-মন্দিরের পথ একাধিক বিংশতি বৎসর মাত্র।

কিন্তু এই একাধিক বিংশতি বৎসর যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, পূর্ব্বে কখন এক শতাব্দী তাহা করে নাই।

কুমারের জন্ম-দিনের এক বৎসর পরে রুসিয়া হইতে নেপোলিয়নের পলায়ন, তাহার পর বৎসর জর্ম্মাণীতে লৌকিক অভ্যুত্থান, এবং তাহার পর বৎসর নেপোলিয়ান্ এল্‌বায় নির্ব্বাসিত। তৎপরে অদ্ভুত উপায়ে নেপোলিয়ানের প্রত্যাগমন এবং অবিচলিত-বিশ্বাস জনসাধারণের অনুগ্রহে সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্তি। তাঁহার পর ওয়াটার্ল সমরে পরাজয় ও সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসন। এ সকলের পর স্পেনিস্ বিপ্লব, গ্রীস্ ও ইতালীর ক্রমিক অভ্যুত্থান, পারীনগরীর ত্রৈদিবসিক বিপ্লব এবং ব্রসেল্‌স্‌ ও ওয়ার্সার সেই সকল ভীষণ দুর্দ্দিন ; কত কত রাজবংশ বিধ্বস্ত, কত কত রাজা ইউরোপে নির্ব্বাসিত পরিব্রাজক ; শ্রেষ্ঠতন্ত্র ভাবের ইংলণ্ডেও মূলোৎপাটন ; এবং সাধারণতান্ত্রিক ভাবের জর্ম্মাণীতেও সবিশেষ উদ্দীপন।

এই সমস্ত ঘটনা সত্ত্বেও কেন আজ কবিবৃন্দের বীণা নেপোলিয়ন্-তনয়ের সমাধির নিকট নীরব ?

ইহা এখন হইতে আর এক তানে বাজিবে। বিগত একাধিক বিংশতি বৎসরের ঘটনা-স্রোতে ব্যক্তি-বিশেষের নাম এবং অবিমিশ্রিত জিগীষা ও যশোলিপ্‌সা ভাসিয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত যুগের পরিবর্ত্তে এক্ষণে জাতীয় যুগ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। কবিবৃন্দের বীণা এখন হইতে আর ব্যক্তি-বিশেষের যশোগান করিবে না। এখন হইতে জাতীয় সংগীত—জন-সাধারণের যশোগানই—ইহার লক্ষ্য হইবে। এই জন্যই নেপোলিয়ন্-তনয়ের মৃত্যুতে ইহা নীরব। অতীত সঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া এখন ইহা ভীষণ ও প্রকাণ্ড ভবিষ্যতের সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিবে। ভবিষ্যৎই এখন সকলের চিন্তা ও অভিলাষের বিষয়ীভূত ; অনন্ত ভবিষ্যৎ—সাগরের ন্যায় তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক আগ্নেয় গিরির ন্যায় ধাতু-নিস্রব নির্গত করিয়া, দ্রুতপদে ও অনিবার্য্য বেগে আসিয়া মানব-মণ্ডলীর উপর অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিতেছে। ইহার আগমনে বিলয়োন্মুখ জাতিসকল

আবার উঠিতেছে, বিচ্ছিন্ন জাতিসকল পুনরায় মিলিতেছে; ব্যক্তি-পরম্পরা প্রকাণ্ড মানব-গিরির আরোহণোপযোগিনী সোপান-পরম্পরায় পরিণত হইতেছে।

নেপোলিয়ন্ ও বাইরন্—ব্যক্তিগত যুগের দুই প্রকাণ্ড বীর, দুই প্রকাণ্ড অধিনায়ক। ইহাঁদিগের আবির্ভাবেই ব্যক্তিগত যুগ পরিণতির চরম শিখরে আরোহণ করে, আবার ইহাঁদিগের অস্ত-গমনের সহিতই ইহা অস্তমিত হয়। এক জন সাংগ্রামিক রাজ্যের অধীশ্বর; আর এক জন কল্পনা-রাজ্যের অধিপতি। এক জন কার্য্যবিষয়ক কবিত্বের, আর এক জন চিন্তাবিষয়ক কবিত্বের পারদর্শী।

এক জন এক হস্তে নবোদ্ভাবিত দণ্ড-বিধি ও অন্য হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক, জাতিবৈষম্য উপেক্ষিত ও পদদলিত করিয়া, একই সংস্কারমালায় ও একই শৃঙ্খলদামে ইউরোপীয় জাতি সমূহকে আবদ্ধ করিতেছেন; এবং তাহাদিগের রাজনৈতিক অবস্থাকে একীকৃত ও তাহা-দিগকে এক সম্মিলন-সূত্রে গ্রথিত করিতে-ছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভবিষ্যতের সংগঠনের নিমিত্ত ইহাঁকে দ্বিতীয় আটিলার ন্যায় ইউরোপীয় একতার প্রচারক করিয়া পাঠা-ইয়াছেন। এক বার ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে সংহতি-যুগের (Epoch of association) মূল ভিত্তি দৃঢ়তর রূপে সন্ন্যস্ত করিবার জন্যই যেন বিধাতা ইউ রোপীয় জাতিসমূহকে পূর্ব্ব হইতেই বল-পূর্ব্বক একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন; "এক দিন তোমরা যেমন দাসত্বের বোঝা একত্র বহন করিয়া আসিয়াছ, এখন সেইরূপ একত্র এক সময়েই ব্যক্তি-গত ও জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবে" ইউরোপীয় জাতি সমূহকে এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই যেন বিধাতা নেপোলিয়ান্কে জগতে প্রেরণ করিয়া-ছেন।

এক্ষণে সে সময় আসিয়াছে, যখন লোকে আপনাদিগের শক্তি বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে; যখন ইউরোপ জানিতে পারি-য়াছে যে ব্যক্তি-বিশেষের শক্তিনিরপেক্ষ হইয়া উন্নতি-মার্গে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। যে দিন জাতিনিচয় আপনাদিগের কার্য্য বুঝিতে শিখিয়াছে, সেই দিনই নেপোলিয়নের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে।

সেই দিন হইতেই নেপোলিয়নের পরাজয় আরম্ভ হয়। সেই জন্যই তাঁহার অবরোহণ ও পতনের বেগ, তাঁহার অভ্যু-দয় ও আরোহণের বেগ অপেক্ষা দ্রুততর ও ভীষণতর হয়। বোধ হইল যেন ভবিষ্য পুরুষ-পরম্পরার সৌকর্য্যার্থে কোন ঐশী শক্তি দ্বারা তিনি ইউরোপক্ষেত্র হইতে সহসা অপসারিত হইলেন।

আত্লান্তিক-বক্ষে অবস্থিত হইয়া তিনি চিন্তানলে আত্মভস্মীকরণ আরম্ভ করিলেন। বোধ হইল যেন লোকতা-ন্ত্রিক মতের (popular principles) পর্য্যাপ্ত প্রচারের সুবিধার জন্য ব্যক্তিত্ব বাদের (Individual principles) পরি-

রক্ষক ও মূর্ত্তাস্তর নেপোলিয়ন ইউরোপ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন।

আর এক জন—কবিত্বের নেপোলিয়ন্—একই সময়ে অভ্যুদিত হন। প্রকৃতি যেন দৃশ্যমান প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি-নিচয়ের গভীর অনুভূতি ও তাহাদিগের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্তির জন্যই তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বাহ্য জগতের উপর ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সে দৃশ্যে পরিতৃপ্ত হইলেন না।

বাহ্যজগৎ দর্শনে হতাশ হইয়া তিনি নিজ অন্তর্জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এবং তাহার গভীরতম প্রদেশে অবরোহণ করিয়া গূঢ় গণনায় নিমগ্ন হইলেন। তথায় সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন যেন একটা প্রকাণ্ড আগ্নেয় পর্ব্বত অবস্থিত রহিয়াছে, তথা হইতে দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয় সকল ভীষণ ধাতুনিঃস্রব ও অগ্নিশিখা উদ্গীরিত করিতেছে; যথেচ্ছাচার সমাজকে যে শোচনীয় অবস্থায় আনীত করিয়াছে, এবং পোপ ও যাজকমণ্ডলী ধর্ম্মকে যে কলঙ্কিত আকার প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত হইয়াছে; মানবজাতি যেরূপ অবনত বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার বিরুদ্ধেও ভীষণ ভ্রূকুটী আবদ্ধ হইয়াছে। তিনি হৃদয়ের সেই সকল ক্রন্দন শুনিলেন, এবং নানা সুরে কিন্তু একই তীব্রতা ও একই বলে, সেই গুলি গাইলেন; এবং সৃষ্টির কার্য্যের বিরুদ্ধে সেই ক্রন্দনের অভিসম্পাত প্রদান করিলেন।

ইহার ফল বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত কবিতামালার উৎপত্তি—ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাসে ও ব্যক্তিগত প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ এক প্রকার কবিতা—যাহার মূল মানব সাধারণে নাই, এবং যাহাতে কোন ব্যাপক বিশ্বাস নাই।

ইহাই নেপোলিয়নের পতনের মূল; ইহারই জন্য বাইরন্ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিলেন। সেণ্ট্ হেলেনা ও মিসোলঙ্গি সমাধির অভ্যন্তরে অতীত সময়ের সেই দুইটি পূর্ণ ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে। নেপোলিয়নের পর—ইউরোপে যথেচ্ছাচার-প্রণালী পুনঃ প্রতিষ্ঠাপন করিতে, বিজয় দ্বারা ইউরোপীয় জাতি-সমূহকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে এবং সভ্যতার অনুমোদিত মতের স্থলে নিজের মতের অবতারণা করিতে, আর কাহার সাহস হইবে? আবার বাইরণের পর—তদীয় কর্সেয়ার, লারা, ম্যান্ফ্রেড প্রভৃতির প্রচারের পর—কে, বিনা জঘন্য অনুকরণে, এমন একটী মানব-প্রতিকৃতি সংগঠনে সমর্থ, যাহা সামাজিক মানব অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্?

নেপোলিয়ন্! আর তোমায় আমরা চাহিনা; তোমার অনিয়ন্ত্রিত বলবতী ইচ্ছা, ইউরোপীয় জাতি সমূহের উপর তোমার অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা, তোমার গভীর ও অবিচলিত মনঃসন্নিবেশ, তোমার শিরঃকম্পনের অলৌকিক শক্তি—যে কম্পনে একদিন অগণিত জনরাশি উন্মত্তের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রধাবিত হইত—, তোমার

সামরিক যথেচ্ছাচার, এবং জাতীয় শুভ-নিরপেক্ষ সামরিক কীর্ত্তিকলাপ—এসমস্তে আমাদিগের এখন আর কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং ইহাদিগের নিকটে এক্ষণে আমরা বিদায় চাই। ব্যক্তিবিশেষের নিকট আমরা বিদায় চাই। এখন সময় আসিয়াছে, যখন লোকে আপনাদিগের কর্ত্তব্যনিচয় আপনারা সম্পাদন করিতে শিখিয়াছে। এখন জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সমস্ত ইউরোপ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা বাইরন্‌কেও আর চাহিনা। তাঁহার প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি-সৃষ্টি, ও অদৃষ্টের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ ব্যক্তিবিশেষের মূর্ত্তিকল্পনা দেখিতে, এবং জগৎ শূন্য মরুভূমি সদৃশ, ও কষ্ট যন্ত্রণাই বিশ্বের নিয়ম—ইত্যাদি ক্রন্দন শুনিতে চাহিনা।

বসুন্ধরা এক্ষণে আর মরুভূমি নাই। স্বাধীনতার নামে এখন ইহা বীরনিচয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে। নবযুগ ধীরে ধীরে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া কবিদিগের নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। যাহার জীবন পারিবারিক দুঃখযন্ত্রণায় ভারস্বরূপ হইয়াছে, সে এক্ষণে দেশের জন্য সগর্ব্বে জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিবে।

যে কবিতা জাতীয় জীবন সঙ্কীর্ত্তন করে, এবং যাঁহাদিগের জীবন জাতীয় কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে তাঁহাদিগের যশোগান করে, সেই কবিতাই অনন্ত-কাল-স্থায়িনী হয়।

সম্প্রতি এই মত প্রথমে ফ্রান্সে এবং ফ্রান্স হইতে ক্রমশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে যে—এক্ষণে কবিত্ব নির্ব্বাণপ্রায়; এবং কল্পনা, সৃষ্টি ও উৎসাহোন্মাদ মৃতপ্রায়। সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই এই মত। পৃথিবীতে যে—কোনপ্রকার সুখ আছে অথবা কোন আশা ভরসা আছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে মানব জাতি কেবল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই যেন পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন মানবজাতির ইহ জগতে অন্য কোন কার্য্য নাই।

এই সকল মত পাঠ করিলে হৃদয়ে যেন এক প্রকার শূন্য ও উদাস ভাব উদিত হয়; যেন শ্মশানের ভীষণ মূর্ত্তি আমাদিগের নয়ন-সমক্ষে অবতারিত হয়; মানবীয় বস্তুমাত্রেরই উপর গভীর বিদ্বেষ ভাব বদ্ধমূল হয়; জীবন শুষ্ক ও নীরস হয়; এবং কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি থাকে না।

কিন্তু মানব জাতির ভবিষ্য অদৃষ্টের উজ্জ্বলতার উপর আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস; সুতরাং কবিত্বের অস্তিত্বেও আমাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস। জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানবমাত্রই কতকগুলি কর্ত্তব্য-নিচয়ে আবদ্ধ হয় এবং সেই সকল কর্ত্তব্যের সংসাধনে যে গুরুতর মহত্ত্ব আছে, ও আত্মবিসর্জ্জনে যে অলৌকিক ঔদার্য্য আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। স্বদেশ ও স্বজাতি

যে ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু, পৃথিবী ও মানব জাতি যে ধর্ম্মের পরিধি; স্বাধীনতা, একতা ও বিশ্ব-প্রেমিকতা যে ধর্ম্মের ব্যাসার্দ্ধত্রয়,—সে ধর্ম্মে আমাদিগের অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস। এ ধর্ম্মের সমস্তই কবিত্ব-পূর্ণ। যে যে দেশে আক্রান্ত অধিকারনিচয়ের বিরুদ্ধে জাতীয় ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, সেই সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় ক্রন্দনের শক্তি অনুভূত ও অনুপেক্ষিত হয়, সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য অসংখ্য বীরপুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেই দেশেই কবিত্ব। জগতে এমন পদার্থ নাই, যাহাতে কবিত্ব নাই। ইহা সৌর কিরণের ন্যায় সকল পদার্থের উপরই পতিত হয়, এবং সকল পদার্থের সহিতই বিমিশ্রিত হয়। ইহার ঐকতানিক শক্তি কাব্যদেবীর বীণার প্রতি তারের সহিত মিশাইয়া আছে, কবির উন্মেষকারী করস্পর্শেই কেবল তাহা উদ্দীপিত ও স্ফুরিত হয়।

প্রত্যেক মানব-হৃদয়েই কবিত্বের উপাদান সকল নিহিত আছে, তাহাকে উদ্বোধিত করিতে কেবল গভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস চাই। যে দেশ এত কষ্ট পাইয়া আবার উঠিতেছে, সে দেশে সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের অসম্ভাব হইবে বোধ হয় না।

যত দিন যাইবে ততই এই কবিত্বের পরিণতি ও পরিপুষ্টি সংসাধিত হইবে। কবিত্বই মানবের জীবন, কবিত্বই মানবের গতি, কবিত্বই মানবের কার্য্য-প্রবৃত্তির প্রধান উদ্দীপক, কবিত্বই তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ-পথের একমাত্র ধ্রুবতারা; কবিত্বই উদ্ভ্রান্ত জাতিনিচয়কে মরুভূমির মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার একমাত্র অগ্নিস্তম্ভ, কবিত্বই মূর্ত্তিমতী উদ্দীপনা, কবিত্বই আমাদিগের উদাত্ত চিন্তানিচয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কবিত্বই আমাদিগের আত্মত্যাগের উপদেশক। কে বলে কবিত্ব মরিয়াছে? না, কবিত্ব মরে নাই, কবিত্ব অমর; কবিত্ব প্রেম ও স্বাধীনতার অনন্ত উৎসের ন্যায় অজর। রমণীয় নব্য ইউরোপকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই কবিত্ব প্রাচীন ইউরোপকে পরিত্যাগ করিয়াছে। চাতক যেমন আশ্রয়ভূত অট্টালিকা পতনোন্মুখ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতর আশ্রয় ও নির্ম্মলতর আকাশের অনুসরণ করে, সেইরূপ কবিত্ব পূর্ব্বাশ্রয় প্রাচীন ইউরোপকে পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতর ও নির্ম্মলতর নবীন ইউরোপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহা এখন রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মানবজাতিসাধারণরূপ অসীম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা এক্ষণে রাজবৃন্দের জয়োদ্ঘোষণ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির কার্য্যে উৎসর্গীকৃতজীবন বীরবৃন্দের জয়স্তোত্র আরব্ধ করিয়াছে।

এই নবীন কবিত্বের বলেই ফরাশি জাতীয় সভার আদেশে সাধারণ-তন্ত্রিণী সেনা আভ্যন্তরীণ বিবাদ, ভীতি ও দারিদ্র্য সত্বেও—রিক্ত পদে ও জীর্ণ বস্ত্রে,

প্রাচ্য সীমাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল; তাহাদিগের মুখে 'স্বাধীনতা' রব, উষ্ণীষে জাতীয় ককেড্, করে উজ্জ্বল বেয়নেট্ এবং অন্তরে দুর্জ্জেয় বিশ্বাস।

এই নবীন কবিত্বের মোহিনী শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়াই স্পেনের পার্ব্বতীয় গেরিলা সেনা নেপোলিয়নের অজেয় সেনারও গতিরোধ করিয়াছিল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে ইহার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়াই লোক-সাধারণকে বৈদেশিক উৎপীড়কের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল।

এই নবীন কবিত্বে জর্ম্মণী পরিপ্লাবিত হইয়াছে। ইহা এখানে একটি পবিত্র ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারই উদ্দীপনায় জর্ম্মান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া এবং গৃহের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

যে কবিত্বের জন্মদিন এরূপ অমানুষী অবদান-পরম্পরায় উদ্ভাসিত হইয়াছে, সে কবিত্বের কি এরূপ অসময়ে বিলয় সম্ভব? ব্যক্তিবিষয়ক কবিত্বের সহিত কি এই জাতীয় কবিত্বের তুলনা আছে? ব্যক্তিগত কবিত্ব সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া, রাজপ্রাসাদ দেবমন্দির বা কোন প্রাচীন বংশের সঙ্কীর্ত্তনে নিরত থাকিবে; এবং যে সঙ্কীর্ণ সীমায় তাহার উৎপত্তি সেই সঙ্কীর্ণ সীমাতেই তাহার লয় হইবে। কিন্তু সেই গম্ভীর, স্থির, বিশ্বাস-পূর্ণ জাতীয় কবিত্ব—অসীম জগৎ ও অনন্ত মানব জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া জগতে এক নূতন যুগের অবতারণা করিবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ কি এখনও নেপোলিয়ন-তনয় বা বোর্দো-রাজকুমারের যশোগান করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবে? পোলণ্ড—পবিত্রতার আধার, ও ঔদার্য্যের আবাসভূমি—পোলণ্ডের যে আর্ত্তনাদে সাইবীরিয়ার নির্ব্বাসনপথ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, সেই আর্ত্তনাদে কি কেহই উদ্দীপিত হইবেন না?

যে সহস্র সহস্র নির্ব্বাসিত ব্যক্তি অদৃষ্টের অদ্ভুত মহিমায় ফরাশি-ক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়া ভবিষ্য প্রকাণ্ড ইউরোপীয় মহাসভার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুঃখের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন, উপযোগে এমন কি একজনও কবি নাই?

অনন্ত উন্নতির দিকে মানব-হৃদয়ের এই অশ্রান্ত জিগমিষা; বিশ্বব্যাপী সম্মিলনের জন্য মানবজাতির এই দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা; যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জাতিসমূহের এরূপ অনন্ত যুদ্ধ-খ্যাপনা, অপহৃত সত্বনিচয়ের পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহাদিগের এরূপ অক্লান্ত চেষ্টা; লৌকিক অভ্যুত্থানের সমক্ষে প্রাচীন রাজবংশ সকলের এরূপ পতন; নূতনের জন্য এরূপ অশ্রান্ত অন্বেষণ; প্রাচীন ইউরোপ হইতে এরূপ অপূর্ব্ব নবীন ইউরোপের সৃষ্টি; অধিক কি শ্মশান-ভস্ম হইতে এরূপ উজ্জ্বল জীবনের উৎপত্তি—এ সমস্ত কি কবিত্ব নয়?

উনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ! আপনারা অনন্ত ভবিষ্যতের মূর্ত্তি পরিকল্পনা করুন্। কেন আপনারা অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন? অতীতের সহিত আপনাদিগের কোনও সম্বন্ধ নাই। ভবিষ্য পুরুষ-পরম্পরার ভাবী যশ কীর্ত্তন করুন্; বিশ্বপ্রেমিকতা স্বাধীনতা এবং উন্নতির পবিত্র নামে পুনরুজ্জীবিত জাতি সকলের নির্ব্বাণ-প্রায় বীর্য্য-বহ্নির সন্ধুক্ষণ করুন্। ইতস্ততঃ ও সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন্, দেখিবেন সমস্ত ইউরোপ আপনাদিগের মুখ পানে চাহিয়া আছে। ভবিষ্যতের গভীর তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে নামিয়া ভবিষ্য ঘটনাবলীর আবিষ্কার করুন্।

স্বদেশীয় কবিবৃন্দ! আমাদিগের জন্য জাতীয় সমরের উপযোগী গীতিমালা প্রস্তুত করুন; সেই গীতিরবে উত্তেজিত হইয়া ইতালীয় যুবকমণ্ডলী যেন অষ্ট্রিয় প্রভুশক্তিকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিতে পারে; যেন সেই জাতীয় সঙ্গীতমালা ভীষণ কালস্রোত অতিক্রম করিয়া অনন্ত ভবিষ্যতে চিরসংলগ্ন হয়!!

ক্রমশঃ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সুধীরঞ্জন—৺দ্বারকানাথ অধিকারী প্রণীত ও তৎপুত্র শ্রীনীলরত্ন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৷৷৵৹ আনা মাত্র। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কালেজের একজন ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাতনামা ছাত্র। কৃষ্ণনগর কালেজের দ্বারকানাথ অধিকারী, হুগলী কালেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হিন্দু-কালেজের দীনবন্ধু মিত্র ঈশ্বর গুপ্তের সময় প্রভাকরে এক ঘোরতর কবিত্ব-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এরূপ প্রবাদ যে—এই কবিত্ব-দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অধিকারী মহাশয়েরই জয়লাভ হয়। যাহা হউক ইহা প্রায় স্থির যে অধিকারী মহাশয় কবিত্ব-শক্তিতে বঙ্কিম বাবু বা দীনবন্ধু বাবুর ন্যূন ছিলেন না। দুর্ভাগ্য বশতঃ অধিকারী মহাশয় অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়ায়, তাঁহার বীণা অসময়েই নীরব হয়। অধিকারী মহাশয় জীবিত থাকিলে যে এতদিন বঙ্কিম বাবু ও দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় সাহিত্য-জগতে অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন তদ্বিষয়ে অল্প সন্দেহ।

অধিকারী মহাশয়ের কবিতাগুলি সদুপদেশ-পূর্ণ, কিন্তু প্রায় অধিকাংশই রূপক। এইজন্য সুকুমারমতি বালকদিগের পক্ষে দুর্ব্বোধ, কিন্তু ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষার্থী বা

নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের বিশেষ উপযোগী। সুধীরঞ্জনের শেষ প্রবন্ধটী "বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজী ভাষার কথোপকথন"। এটী অতি সুন্দর। ইহার গদ্যাংশও অতি সুললিত ও মুগ্ধকারী। ইহার পদ্যাংশ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল:—

বঙ্গভাষার উক্তি।

পয়ার।

কি ভয় দেখাও তুমি আর বার বার।
চাঁদে কি করিবে প্রিয় প্রভাকর যার॥
সে যদি আপন কর না করে প্রকাশ।
শশী কি কখন পারে শোভিতে আকাশ॥
কি কারণে তোষামোদ করিব সকলে।
পিপাসা যাবে না কভু গোষ্পদের জলে॥
বিশেষতঃ বারি বিনে কিছু নাই ডর।
একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর॥
তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান।
ত্বরায় উঠিবে মম যশের তুফান॥
কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয় কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়॥

ইংরাজি ভাষার উক্তি।

এরা সুলেখক বটে মানিগো সুন্দরি।
তুষিবে তোমার মন প্রাণপণ করি॥
কিন্তু ইহাদের মাঝে কেহ কবি নয়।
কোথা পাবে মনোহর ভাব সমুদয়॥
কবিতা-লেখক তব পুত্র ছিল যারা।
কাল সহকারে আঁখি মুদিয়াছে তারা॥

বঙ্গভাষার উক্তি।

কবির অভাব কিসে দেখিলে আমার।
দুই জন আছে দেশ-বিখ্যাত কুমার॥
সুকবি সুন্দর মম মদন-মোহন।
পড়িলে কবিতা তার মুগ্ধ হয় মন॥
প্রাণের ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকর-কর।
ধরিয়াছে কিবা দৈব শক্তি মনোহর॥
চাহিলে তপন পানে দুনয়ন ধরে।
যুড়ায় যুগল আঁখি তার প্রভাকরে॥

ইংরাজী ভাষার উক্তি।

ভাল আশা সুবদনি করিয়াছ মনে।
বাড়াবে তোমার মান এরা দুইজনে॥
এতদিন তুমি কিগো করোনি শ্রবণ।
মদন কবিতা আর করে না রচন॥
ক্রমে ক্রমে তার যত বাড়িতেছে পদ।
তোমায় ভাবিছে মনে বালাই আপদ॥
তোমার ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা-রচক।
লোকের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক॥
আর এক অলক্ষণ দেখি প্রতিদিন।
দেশের অনেক লোক দ্বেষের অধীন॥
সহজেই গুণগ্রাহি নাহি হেন জন।
সমাদর করি তোষে লেখকের মন॥

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার চতুর্দ্দশ বাৎসরিক বিবরণ—১৮৭৬—৭৭ খৃঃ। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রথম পৃষ্ঠায় মুরুব্বিস্থলে লর্ড নর্থব্রুকের পরিবর্ত্তে লর্ডলীটনের নাম পরিদৃষ্ট হইল; আমরা আহ্লাদিত হইলাম লীটন বাহাদুর সভার কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট

হইয়া সভার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এককালীন ২০০ শত টাকা দান করিয়াছেন। সভা ও বঙ্গদেশ এই জন্য তাঁহার নিকট ঋণী রহিল।

আমরা পূর্ব্ব বৎসরেই বলিয়াছি—দীন ও অনাথ বালকদিগের শিক্ষা বিধান, পীড়িত দীনদুঃখীদিগকে ঔষধ বিতরণ, দরিদ্র বিধবা ও অনাথ বালকদিগের ভরণ পোষণ, স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধন এবং উত্তরপাড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের সামাজিক নৈতিক ও মনোবৃত্তিবিষয়ক উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি উদার কার্য্য সকল ইহার লক্ষ্য। সভার এই মহতী লক্ষ্য-পরম্পরা যে কত দূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে তাহা সভার কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কার্য্য-বিবরণ বৈদেশিক ভাষায় লিখিত হওয়ায় সাধারণের তাহা অবগত হওয়ার নিতান্ত অসুবিধা। হিতকরী সভার মহৎ দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হওয়া দেশীয় লোক-সাধারণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। শুদ্ধ গবর্ণর জেনেরল বা দুই চারি জন সাহেবের অসুবিধা নিরাকরণের জন্য বঙ্গবাসি-সাধারণকে অন্ধকারে রাখা কোন মতেই সঙ্গত বোধ হয় না। আমরা গত বারই এই বিষয়ে বলিয়াছি এবারও বলিলাম। কিন্তু অরণ্যে রোদনের ফল কিছুই নাই।

হিতকরী সভা ভারতবন্ধু জষ্টিস্ ফিয়ারকে যে অভিনন্দন পত্র খানি দিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। পরলোকগত মহাত্মা বেথুনের ন্যায় ফিয়ারের নাম ভারত-বক্ষে অক্ষয় অক্ষরে অনন্ত কালের জন্য লিখিত থাকিবে। জষ্টিস্ ফিয়ার এই অভিনন্দনের যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ভারত-হিতৈষণা বিনয় ও সৌজন্যে পরিপূর্ণ। সভা বিখ্যাতনামা কর্ণেল ম্যালিসন্‌কেও এইরূপ আর একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সভা যে সকল গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তন্মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি সাধন গুরুতম। এবিষয়ে সভার নিকট বঙ্গদেশ বিশেষ ঋণী।

সাহিত্য-বোধ—প্রথমভাগ। শ্রী ঈশানচন্দ্র রায় প্রণীত। ময়মনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। হইতে অনুচিত সুখ-ভোগ ও তাহার ফল, কুসংস্কার, পরিচ্ছন্নতা, রামের বনগমন, বায়ু, পারিবারিক সুখ, আশ্চর্য্য পক্ষী, উপার্জ্জন, আশ্চর্য্য বৃক্ষ, প্রবৃত্তির অনুযায়িনী শিক্ষা, মেঘ ও বৃষ্টি, শিষ্টাচার ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!—এই কয়েকটী প্রস্তাব লিখিত আছে। আমরা মেঘ, বৃষ্টি, বৃক্ষ, পক্ষী ইত্যাদি প্রস্তাবের সহিত বিদ্যাসাগরের জীবনীর সংমিশ্রণ দেখিয়া গ্রন্থকর্ত্তার রুচির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এরূপ সংমিশ্রণ আমরা পূর্ব্বে আর কোন ভাষাতেই দেখি নাই। গ্রন্থখানির স্থানে স্থানে অক্ষয়কুমার দত্তের অনুকরণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন বালক বালিকাগণের নীতি ও ভাষার সহায়তা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমাদিগের বিশ্বাস সে উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সংসিদ্ধ হইয়াছে।